বিশ্ববাণী

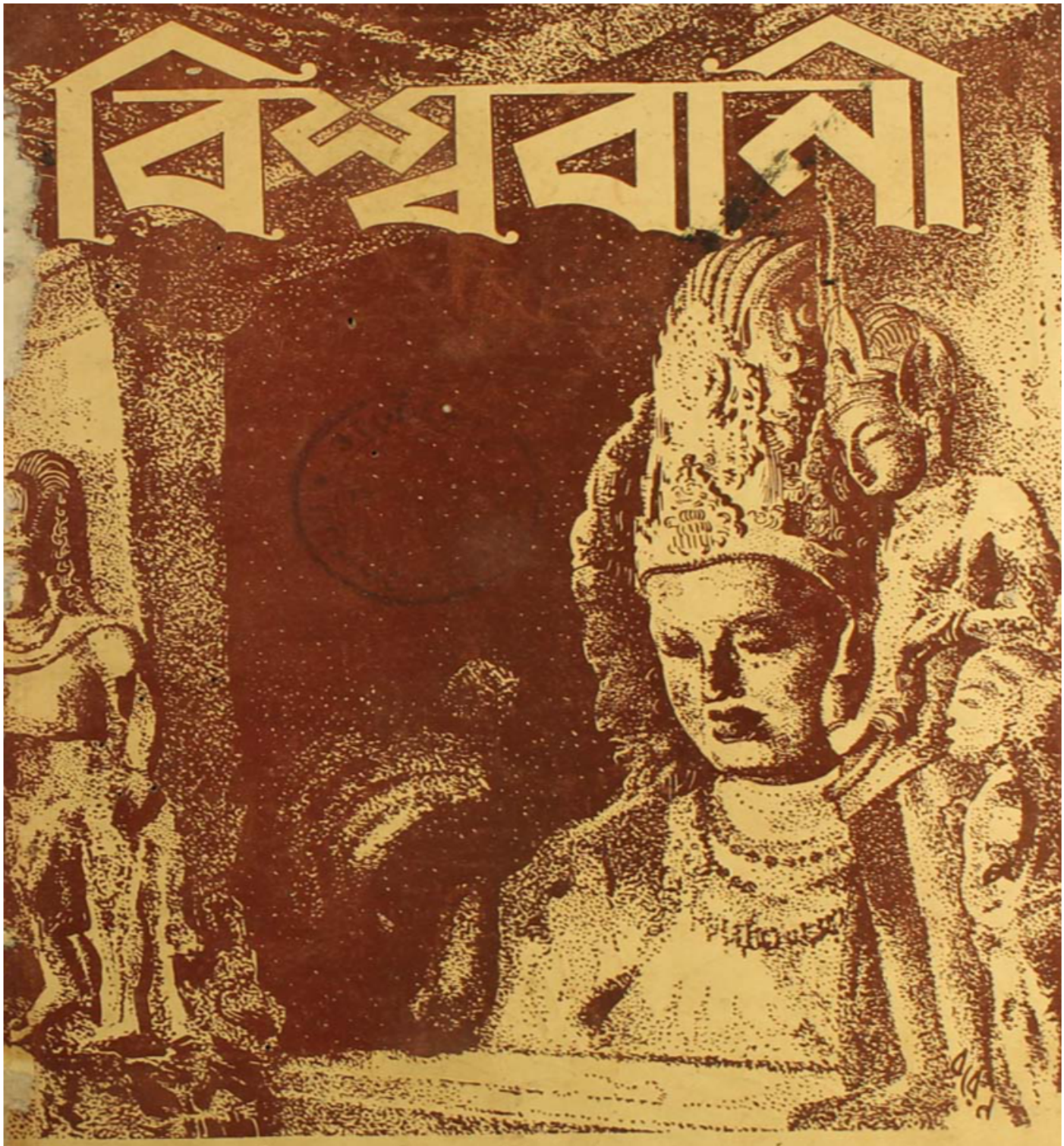

প্রতিষ্ঠাতা : স্বামী অভেদানন্দ

ঊনবিংশতি বর্ষ—তৃতীয় সংখ্যা

বার্ষিক মূল্য চারি টাকা চারি আনা

বৈশাখ, ১৩৬৪

প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট; কলিকাতা-৬ : ফোন : ৫৫—১৮০৫

॥ লক্ষ্মীদাস প্রেমজী · কলিকাতা ॥

সম্পাদক স্বামী সত্যাত্মানন্দ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে ব্রহ্মচারী বসন্তকুমার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৭০, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, মানসী প্রেস হইতে শ্রীসন্তুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

বিশ্ববাণী—বৈশাখ, ১৩৬৪

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	ধর্মতুলসী ও বিশ্বাস (শ্রীরামকৃষ্ণ গণ্ডি)		৯৭
২।	শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ভক্তিসিদ্ধান্ত,	শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়	৯৮
৩।	অর্পণ ও স্মরণ	শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন বসু	১০২
৪।	১লা বৈশাখ	শ্রীভজন গোপাল সান্যাল	১০৫
৫।	বুদ্ধদেবের অস্থির পিণ্ড	শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী	১০৭
৬।	বিশ্ব-বাণী (কবিতা) ...	শ্রীসুধীর গুপ্ত	১১০
৭।	রবীন্দ্র স্মরণে ...	শ্রীবিমল গোপাল বসু	১১১
৮।	সুর যে আমার (কবিতা) ...	শঙ্কর গুপ্ত ...	১১৩

জামসেদপুর—ব্রাঞ্চ

সদ্য প্রকাশিত !

বাংলা জীবনী-সাহিত্যের বিশিষ্ট কীর্তি

শঙ্করনাথ রায়ের—

ভারতের সাধক

১ম খণ্ড মূল্য—৫৲ ২য় খণ্ড মূল্য—৫৲

ব্রহ্মপুরুষ ও সাধুসন্তদের চরিত-সঙ্কলন গ্রন্থ। যোগী, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, মরমিয়া প্রভৃতি মহাপুরুষদের লৌকিক ও অলৌকিক জীবনের রসমধুর কাহিনীতে ভরপুর। একাধারে এতে রয়েছে প্রামাণ্য জীবনকথা, অধ্যাত্মসাধনের প্রসঙ্গ, অলৌকিক আখ্যান ও ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান।

- প্রতি খণ্ড স্বয়ংপূর্ণ। প্রত্যেকটিতে সাত-আটটি করে পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত জীবনচরিত রয়েছে, আর রয়েছে সাধুমহাত্মাদের অপরূপ চিত্রাবলী।

পড়বার, বারবার পড়ে সঞ্চয় করে রাখবার ও প্রিয়জনকে উপহার দেবার মত বই। রঙীন সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে মোড়ানো, ছাপা বাঁধাই অনবদ্য।

সাধারণ পাঠাগার ও ব্যক্তিগত গ্রন্থভাণ্ডারের পক্ষে অপরিহার্য চরিত-কোষ গ্রন্থ।

শিবনাথ শাস্ত্রীর—

মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে

স্বনামধন্য মনীষী ও আচার্যের—

'মেন্ আই হাভ সীন'-এর সার্থক অনুবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির রেখাচিত্র অপরূপভাবে ফুটিয়ে উঠিয়াছে।

প্রকাশক—রাইটার্স সিণ্ডিকেট. ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

সূচীপত্র

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
৯।	বেদানন্দ স্বামী	...	শ্রীনির্মলচন্দ্র ঘোষ	১১৪
১০।	তুমি ও আমি (কবিতা)	....	শ্রীদেবারতি ঘোষ	১১৬
১১।	কষ্টি-রহস্য		শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৭
১২।	কাড়গ্রামের লোকসংগীত		শ্রীঅংশুমান রায়	১২০
১৩।	ধ্যানযোগীয় সাধনা		শ্রীঅমলীমোহন চট্টোপাধ্যায়	১২৪
১৪।	এগিয়ে চল্ (কবিতা)		শান্তশীল দাশ	১২৯
১৫।	ভারতের তীর্থ দর্শনে		শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৩০
১৬।	পঁচিশে বৈশাখ (কবিতা)		শ্রীপ্রকৃতি দেবী	১৩৭
১৭।	ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ		শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ	১৩৮
১৮।	হরানন্দ ভট্টাচার্য		শ্রীরবীন্দ্র কুমার বসু	১৫০
১৯।	সংবাদ-বার্তা			১৫৭

নূতন বই

সারদামণি

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সহজ ও সরল ভাষায় শ্রীশ্রীমায়ের সম্পূর্ণ জীবনী

মূল্য : এক টাকা

Memoirs of Ramakrishna

by

SWAMI ABHEDANANDA

- The Best book on the wonderful teaching of the Master.
- The Stamp of the wisdom of the auther pervades throughout.

Price : Rs. 7/8

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH, 19B, Raja Rajkrishna St., Calcutta-6

'বিশ্ববাণী'-র নিয়মাবলী

১। 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে। বৎসরের যে কোন সময়ে আপনি গ্রাহক হইতে পারেন। তবে প্রথম বা সপ্তম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

২। ফাল্গুন ১৩৬৩, বিশ্ববাণীর ১৯শ বর্ষ আরম্ভ। ইহার বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা চারি আনা, প্রতি সংখ্যা আট আনা। ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ—এই ছয় মাসেরই জন্য গ্রাহক হইতে হইলে সডাক দুই টাকা চারি আনা এবং ভাদ্র হইতে মাঘ—এই ছয় মাসেরই জন্য গ্রাহক হইতে হইলে সডাক তিন টাকা লাগিবে। মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

৩। কোন গ্রাহকের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্তিত হইলে তিনি স্থানীয় ডাকঘরে তাহা নির্দেশ দিবেন; বেশীদিনের জন্য হইলে পূর্ববর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে বিশ্ববাণী অফিসে উহা জানাইবেন।

৪। 'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহক মূল্য মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। কোনও মাসের বিশ্ববাণী সেই মাসের ২০ তারিখের মধ্যে না পাইলে সে সংবাদ সেই মাসের ২৪ তারিখ হইতে পরের মাসের তিন তারিখের মধ্যে বিশ্ববাণী অফিসে আসা চাই। নচেৎ ঐ পত্রিকা সরবরাহ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে।

৫। 'বিশ্ববাণী'-র জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইবার কালে রচয়িতার নাম-ঠিকানা যেন তাহাতে বেশ স্পষ্টাক্ষরে সন্নিবেশিত থাকে। 'বিশ্ববাণী'তে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হয়। প্রবন্ধাদি হারাইয়া যাইলে বা কোন প্রকারে নষ্ট হইলে আমরা দায়ী থাকি না। প্রবন্ধ স্বল্পায়তনে, ফুলস্কেপ **চার পাতার মধ্যে**, রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘাকার প্রবন্ধ ছাপা অসম্ভব। কোনও লেখা প্রকাশিত করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপেক্ষ। ইহার জন্য সম্পাদক কোনও কৈফিৎ দিতে বাধ্য নহেন।

৬। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৭। কাহারও কোন বিষয় জানিতে হইলে (গ্রাহক হইলে, গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া) সর্বদা **রিপ্লাই কার্ডে** অথবা ডাক-টিকিট সমেত পূর্ণ নাম-ঠিকানা পাঠাইতে হইবে। অন্যথায় উত্তর দেওয়া হয় না।

ঊনবিংশতি বর্ষ | বৈশাখ—১৩৬৪ | তৃতীয় সংখ্যা

॥ ব্যাকুলতা ও বিশ্বাস ॥

"একটি ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ঠাকুরের সেবা ছিল। একদিন কোন কাজ উপলক্ষে তার অন্য স্থানে যেতে হয়েছিল। ছোট ছেলেটিকে বলে গেল, তুই আজ ঠাকুরের ভোগ দিস; ঠাকুরকে খাওয়াবি। ছেলেটি ঠাকুরের ভোগ দিল। ঠাকুর কিন্তু চুপ ক'রে বসে আছেন। কথাও কন না, খানও না। ছেলেটি অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে দেখলে যে, ঠাকুর উঠছেন না। সে ঠিক জানে যে, ঠাকুর এসে আসনে ব'সে খাবেন। তখন সে বার বার বলতে লাগল, ঠাকুর, এসে খাও, অনেক দেরী হ'ল; আর আমি বসতে পারি না। ঠাকুর কথা কন না। ছেলেটি কান্না আরম্ভ ক'রলে। বলতে লাগল—ঠাকুর, বাবা তোমাকে খাওয়াতে বলে গেছেন, তুমি কেন আসবে না, কেন আমার কাছে খাবে না? ব্যাকুল হ'য়ে যেই খানিকক্ষণ কেঁদেছে ঠাকুর হাসতে হাসতে এসে আসনে ব'সে খেতে লাগলেন! ঠাকুরকে খাইয়ে যখন ঠাকুরঘর থেকে সে গেল, বাড়ীর লোকেরা বল্লে, ভোগ হয়ে গেছে, সে সব নামিয়ে আন। ছেলেটি বল্লে, হাঁ হয়ে গেছে, ঠাকুর সব খেয়ে গেছেন। তারা বল্লে, সে কি রে? ছেলেটি সরল বুদ্ধিতে বল্লে, কেন ঠাকুর ত খেয়ে গেছেন। তখন ঠাকুরঘরে গিয়ে দেখে' সকলে অবাক!

বালকের মত বিশ্বাস! বালক মাকে দেখবার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হ'ল তো, অরুণ উদয় হ'ল। তারপর সূর্য্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বর দর্শন।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ভক্তিসিদ্ধান্ত

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

মানুষের মন আদি অন্তহীন পারাবার বিশেষ। রত্নাকরে কত রত্ন আছে তা নির্ধারণ করা যেমন অসম্ভব ব্যাপার, সেইরূপ মানব-মনে কত যে ভাবের উদয় হয় তা স্থির করাও সম্ভব নয়। সাধারণতঃ, ভাবগুলিকে সু ও কু এই দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ঐ সু-ভাবসকলের মধ্যে ভক্তিভাব চরম স্থান অধিকার করে। পরমেশ্বরে যে পরমা অনুরক্তি তাকে ভক্তি বলে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তির অবতার, তিনি জীবকে ভক্তি শিক্ষা দেবার জন্য ও সংসারে ভক্তি সিদ্ধান্ত স্থাপন করবার জন্য ভক্তিসাধনার অনুকূল বাংলার কোমল মাটিতে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। যে ভক্তি শ্রীরামানুজ ও তাঁর অগ্রজ ও অনুজ আচার্যগণের জীবনে বীজাকারে দেখা দিয়েছিল, তা মহাপ্রভুর ও তাঁর কৃপাপুষ্ট বৈষ্ণবাচার্য-গণের প্রাণবারি সিঞ্চনের ফলে ফলফুল শোভিত বৃক্ষে পরিণত হ'য়েছিল। ভক্তির মাধুর্য মহাপ্রভু স্বীয় জীবনে উপলব্ধি ক'রে উহা জগদ্বাসীকে উপভোগ করানর জন্যে কৃপা কোরে তিনি কয়েক বৎসরমাত্র নরদেহে বর্তমান ছিলেন। বহিরঙ্গ ভক্তগণসহ নাম সঙ্কীর্তন করলে এবং তাদিগকে উহার উপদেশ দিলেও তিনি অন্তরঙ্গ সনে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদনে আপনহারা হ'য়ে যেতেন। প্রথমোক্তটিতে তাঁর বাহ্যদশা ও শেষোক্তটিতে অর্ধবাহ্য দশা ও ক্রমশঃ তার চরম পরিণতি স্বরূপ অন্তর্দশার পরিচয় পাওয়া যায়। শাস্ত্রে উক্ত হ'য়েছে, প্রবল সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হ'লে যে-কোনও আশ্রম হ'তেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা যায়। মহাপ্রভুকে দেখি তিনি গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করার অব্যবহিত পরেই সংসার ত্যাগ করলেন; কারণ তখন তাঁর প্রেমোন্মাদ অবস্থা। ঐ অবস্থায় সংসার-ধর্ম পালন করা কখনই সম্ভব নয়। তিনি সন্ন্যাস যে গ্রহণ করলেন তার আর একটী উদ্দেশ্যও ছিল। এই উদ্দেশ্যটী বুঝতে হ'লে আমাদিগকে মহাপ্রভুর স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার প্রয়োজন।

বৈদেশিক ধর্মের প্রবল আক্রমণে যখন হিন্দুধর্ম বিধ্বস্তপ্রায়, পবিত্রতম মাতৃভাবে জগৎকারণকে উপাসনার পরিবর্তে যখন বৌদ্ধতন্ত্রোক্ত বাম মার্গ দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল, ভক্তিমার্গের বিশুদ্ধতা যখন লুপ্তপ্রায়, জাতিভেদের প্রবল গণ্ডীবদ্ধ হিন্দুজাতির যখন শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হ'য়েছিল, সেই ভীষণ মুহূর্তে শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে ভারত-ভূমিতে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। তিনি বুঝলেন যে, আচার্য শঙ্কর প্রবর্তিত জ্ঞানযোগের যথার্থ মর্ম গ্রহণ করতে দেশবাসী অক্ষম, মাতৃভাবে সাধনাও লুপ্ত-প্রায়, তাই তিনি বেদোক্ত হরিনাম সহায়ে শ্রীভগবানকে উপাসনা করবার সহজ প্রণালী প্রচার ক'রেছিলেন। যে সকল সাধক ভক্তিযোগের অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশ করতে সক্ষম তাঁদের নিকট তাঁর যথার্থ স্বরূপ প্রকটিত হ'য়েছিল। তিনি মহা-ভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার ও শ্রীভগবানের এক অপূর্ব মিলিত বিগ্রহ। আগরে শ্রীরাধারাণী প্রদর্শিত মহা-ভাবের প্রকৃত মহিমা এ পর্যন্ত কেহই হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়নি। জীবকে উহার মর্ম উপলব্ধি করানর জন্যে শ্রীভগবান যিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে-ছিলেন, তিনি ভিতরে কৃষ্ণ থেকেও বাহিরে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে পুনরাগমন করেছিলেন। মহাপ্রভুর তত্ত্ব সম্বন্ধে তাই বলা হ'য়েছে:

শ্রীরাধার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে কৈল অবতার॥

রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গকে যে

নমস্কার করবে, তারই মুক্তিলাভ অনিবার্য। জীবকে মুক্তি দিবার জন্যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীমৎ স্বামী কেশব ভারতীজীর নিকট হ'তে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। ভারতবর্ষ সন্ন্যাসীকে যত ভক্তি করে, দেশের রাজাকেও তত ভক্তি করে না। সন্ন্যাসীবেশধারী মহাপ্রভুকে দেখে সকলে তাঁকে প্রণাম করবে, তাই তিনি ভারতের সনাতন ধর্ম যে সন্ন্যাস, তা তিনি অবলম্বন করেছিলেন। এই সন্ন্যাস অবলম্বনের একমাত্র উদ্দেশ্য জীব-উদ্ধার। তাই তিনি ব'লেছিলেন :

"সন্ন্যাসী বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ পাইবে নিস্তার।"

অনন্তশক্তি শ্রীকৃষ্ণ যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তাঁর আনন্দাংশ বা হ্লাদিনী শক্তি হ'তে জাত মধুর প্রেম, —এর ফল মহাভাবে। শ্রীমতী রাধারাণী মহাভাবস্বরূপা বা ঘনীভূত কৃষ্ণপ্রেম। অতএব মূলতঃ যিনি শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই শ্রীরাধা। শ্রীমন্মহাপ্রভুতে ঐ দুই তত্ত্বের সম্মিলন। কিন্তু যিনি আনন্দস্বরূপ, তিনিই সংবিৎ বা চিৎস্বরূপ এবং সৎ ত তিনি বটেই। সত্য স্বরূপ পরতত্ত্ব একটী মাত্রই। তাঁকে বেদে বলা হয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, পুরাণে বলা হয় সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ ও তন্ত্রে বলা হয় সচ্চিদানন্দ শিবঃ। শাস্ত্রের এই প্রধান তিন বিভাগে এক পূর্ণ সচ্চিদানন্দকেই তিন নামে অভিহিত করা হ'য়েছে। নাম ভেদ হেতু বস্তুভেদ করা আমাদের সঙ্গত নয়। জীবও স্বরূপতঃই সেই সচ্চিদানন্দ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাই বলা হ'য়েছে :

"অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ পরকাশে।"

কিন্তু 'অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণম্' যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম তিনি যে অখণ্ড বস্তু, তাঁকে ত অংশাংশী ভাগ করা যায় না, তবে এখানে যে অংশ বলা হয়েছে এর অর্থ এই যে, পরমাত্মা যখন অবিদ্যাকৃত উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হন, তখনই তাঁর অংশ কল্পিত হয়। যেমন ঘটে আকাশের অংশ কল্পিত হয়, কিন্তু আকাশকে কি বস্তুতঃ অংশরূপে ভাগ করা সম্ভব হয়? অর্থাৎ তা যেমন সম্ভব নয়, সেইরূপ অখণ্ড সচ্চিদানন্দও অংশ বা 'অণু'রূপে বিভক্ত হ'তে পারেন না। প্রতি স্ফটিকে একই সূর্যের পূর্ণ প্রতিবিম্বই পরিলক্ষিত হয়।

দ্বৈতবাদাত্মক দর্শনে জীবাত্মাকে (যিনি বস্তুতঃ বিভু) যে 'অণু' বলা হয় উহার অর্থ এইরূপে বুঝলে আমাদের মনে কোন সাম্প্রদায়িক ভেদবোধের উদয় হবে না। পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম বা অখণ্ড শ্রীকৃষ্ণ বা নিষ্কল শিব একই বস্তুতো বটেই তবে তিনি যখন বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হন তখন বুদ্ধির নানার জন্যে তিনিও বিভিন্ন ব'লে প্রতিভাত হন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তিনি একই এবং পূর্ণ স্বরূপই। তবে ব্যবহারিক দশায় বুদ্ধির সাহচর্যে সেই বিভুকেই অণু বলা হয় মাত্র। পরমার্থতঃ যিনি নির্বিশেষ ব্রহ্ম—তিনি তাঁর অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়ারূপ উপাধি যোগেই সবিশেষ ও সাধারণের উপাসনার যোগ্য হন। বেদান্তে যিনি মায়া নামে ও তন্ত্রে যিনি মহামায়া বা আদ্যাশক্তি নামে অভিহিতা, তিনিই বৈষ্ণব-দর্শনে রাধা নামে অভিহিতা। যথা :

"রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তি মান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমান।
মৃগমদ তার গন্ধে যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি—জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ।
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।"

আচার্য শঙ্কর সচ্চিদানন্দের চিৎ বা জ্ঞানের দিকে ও মহাপ্রভু উহার আনন্দের দিকে বেশী জোর দিয়েছেন। কিন্তু উভয়ের এ জ্ঞান যথেষ্ট ছিল যে, ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ না বললে তিনি জড় ব'লে বিবেচিত হবেন। কারণ এমন কোন জড়বস্তু নাই, জ্ঞান বা চৈতন্য যার স্বরূপ। অতএব পূর্ণস্বরূপ জ্ঞানও বটে, আনন্দও বটে। জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি দেওয়ায় শঙ্কর যেন নির্বিশেষে ব্রহ্মবাদী ও আনন্দের দিকে দৃষ্টি দেওয়ায় মহাপ্রভু যেন সবিশেষ ব্রহ্মবাদী ব'লে

বিবেচিত হ'চ্ছেন। কিন্তু সামঞ্জস্যের দিক দিয়ে বিচার কর্‌লে আমরা দেখ্‌ব যে, শঙ্কর জগতের ব্যবহারিক সত্তা ও শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করছেন না এবং মহাপ্রভুও অদ্বৈতভাব অস্বীকার করছেন না। ভাষ্যকার তাঁর বিখ্যাত 'আনন্দলহরী'তে বল্‌ছেন :

"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো—যদি ভবতি শক্তঃ
প্রভবিতুং।
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।"

অর্থাৎ শক্তিকে বাদ দিয়ে শিব নড়তেও পারেন না। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে—তিনি যখন শক্তিযুক্ত তখন তিনি সগুণ ও সবিশেষ এবং 'যতোবাচো নিবর্তন্তে'—যে তত্ত্ব বাক্য মনের অগোচর। জ্ঞান-মার্গীদের শক্তির প্রতি তাচ্ছিল্যকে লক্ষ্য ক'রেই বলা হ'য়েছে :

"তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণত্বে হয় হানি।"

সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে মহাপ্রভুকে বুঝতে গেলে ও তাঁর সম্বন্ধে একটা সম্প্রদায় অনুকূল সিদ্ধান্ত কর্‌লে তাঁর মহত্ত্ব প্রকট করার পরিবর্ত্তে তাঁকে ছোট করাই হ'বে। তাঁতে কোন সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি যে ছিল না, তার প্রমাণ :

"প্রকাশ বিশেষে তেঁই ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান।
ঈশ্বরে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ।
একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ।"

যিনি সকল ধর্ম্মমতে সাধন ক'রে একই গন্তব্যস্থলে উপনীত হ'য়েছিলেন সেই মহাসমন্বয়াচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মহাপ্রভু সম্বন্ধে যা বলেছেন, তাই মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্ত ব'লে মনে হয়। তিনি বলেছেন : "হাতীর যেমন দু'রকম দাঁত থাকে, এক বাহিরের, আর এক ভেতরের, সেই রকম শ্রীগৌরাঙ্গের ভেতরে ও বাহিরে দু'রকম 'ভাব ছিল। বাহিরে তিনি নানাভাব সহায়ে কীর্ত্তনাদি কর্‌তেন ও জনকল্যাণ সাধন কর্‌তেন ও ভেতরে অন্তর্দশায় প্রেমের চরম পরিপুষ্টিতে অদ্বৈতভাবে লীন হ'য়ে থাক্‌তেন।" বাস্তবিকই যারা আচার্য্যোত্তম, তাঁদের জীবনে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা থাকতে পারে না। একবার এক মজা হ'য়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলেছিলেন, অবশ্য তখন স্বামিজী মহাপ্রভুতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞপ্রায় ছিলেন। "মশাই, আপনি ত কেবল চৈতন্য চৈতন্য করেন, কিন্তু উনি ত কেবল বৈষ্ণবদের ঠাকুর। ও দিয়ে জগতের কি হবে?" ঠাকুর ব'ল্লেন, "সে কি রে! তিনি যে ভগবান, তাঁর মধ্যে সব ভাব আছে। মানুষ নিজের বুদ্ধি দিয়ে বর্ণনা কর্‌তে গিয়ে তাঁকে একদেশী ক'রে ফেলেছে। নচেৎ সর্বভাবই তাঁর ভেতর ছিল। তিনি যে ভগবান।" মহাপ্রভু কি শিবমন্দিরে কি দেবীমন্দিরে ভাবে তন্ময় হ'য়ে যেতেন। অতএব মহাপ্রভুর কোনরূপ সাম্প্রদায়িক ভেদ-বোধ ছিল না। তাঁর ভেতরে—অদ্বৈত। কিন্তু বাহ্যতঃ তিনি মধুরভাবে ভগবানকে আস্বাদন কর্‌তেন। রায় রামানন্দের সহিত কথোপকথনেও তাঁর অদ্বৈত ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্বীকার কর্‌লেন—"নাসৌ রমণ, নাহং রমণী দুঁহু জন এক পেশল মানি।" যে পথেই সাধন করা যাক্ না কেন চরমে অদ্বৈত অবস্থায় উপনীত হ'তেই হবে। প্রেম ও একত্ব সম্পাদক। মহাপ্রভু প্রদর্শিত প্রেমমার্গে চরমে প্রেমাস্পদ ভগবান ও প্রেমিক ভক্তের মধ্যে আর কোন পার্থক্য থাকে না। ভক্ত হয় তো একীভূত হওয়া অপেক্ষা ভগবানের সেবাই পছন্দ করেন বা কর্‌বে। কিন্তু তিনি ভক্তকে টেনে নেবেন তাঁর ভেতরে আর তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে চিরতরে লোপ ক'রে তাকে আনন্দ স্বরূপত্ব দান কর্‌বেন। ঠিক যেমন বহুদিনের পুরাণ চাকরকে মনিব বলেন, "আরে আমার কাছেই বোস্, তুই আর আমি কি ভিন্ন?" এই উপমাটী শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত।

কেহ কেহ বলেন ভক্তিপথ সোজা, কিন্তু বস্তুতঃ উহা তত সোজা নয় তবে জ্ঞান বা বিচার পথ হ'তে কতকটা সোজা বটে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন : "

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।

অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ১২।৫

অর্থাৎ দেহে আত্মবোধ যাদের প্রবল সেই সকল ব্যক্তির অব্যক্তে অর্থাৎ নির্গুণব্রহ্মে চিত্তকে সমাসক্ত করা খুবই কষ্টকর। এখানে মধ্যম অধিকারীর উপযোগী সগুণ উপাসনার স্তুতির জন্যই উত্তম অধিকারীর উপযোগী নির্গুণ উপাসনাকে একটু যেন নিন্দা করা হ'য়েছে। তাই ব'লে নির্গুণ উপাসনা হেয় ও পরিত্যাজ্য—ইহা প্রতিপাদন করা উহার উদ্দেশ্য নয়। মধ্যম অধিকারীকে সগুণ-উপাসনায় প্রবৃত্ত করানর জন্যই নির্গুণ উপাসনার নিন্দা করা হ'য়েছে, কেননা তা না করলে অনধিকারী ব্যক্তি নির্গুণ উপাসনায় প্রবৃত্ত হ'লে নির্গুণ উপাসনা ত করতে পারবেই না, অধিকন্তু ঐ মার্গের নানারূপ উচ্ছৃঙ্খলতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ হবে। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে, সর্বোত্তম অধিকারীর জন্যই জ্ঞান যোগ বা বিচারপথ নির্দ্ধারিত। বিষ্ণু ভাগবতও এই কথাই বলেন। আচার্য শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্ত প্রচারের পর বাস্তবিকই দেশে অনেক অনধিকারী বেদান্ত অবলম্বন ক'রে নানারূপ উচ্ছৃঙ্খলতার উদাহরণ স্বরূপ হ'য়েছিল। দেশবাসীর এই বিকৃত মতকে সুসংযত করার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধারণের মধ্যে ভক্তিবাদ প্রচার ক'রেছিলেন। যে সামান্য দু' একটি উত্তম অধিকারী তিনি পেয়েছিলেন তাঁদিগকেই তিনি ভক্তির শ্রেষ্ঠতম ভাব শিক্ষা দিয়া তাঁদিগকে একত্বে উপনীত হওয়ার পথে সহায়তা করলেন। তাঁর মতে যাঁর সংসারের বন্ধন টুটে গেছে, যিনি পূর্ণানন্দ লাভে তন্ময়, যিনি শাস্ত্রমর্মবেত্তা ত্যাগীচূড়ামণি জীবন্মুক্ত এবং যিনি অপরের সংসার বন্ধন ছিন্ন করতে পারদর্শী এমনতর করুণাধার শ্রীগুরুকে তত্ত্বদর্শনারের রূপ গ্রহণ করে ভক্তিসাধনে নিযুক্ত হ'তে হবে। চরিতামৃতকার তাই বলেন :

"গুরু কৃষ্ণ রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।"

যে মনুষ্যাধারে স্বয়ং ভগবানের জীব উদ্ধারকারিণী গুরুশক্তি অবতীর্ণ হন, তিনিই গুরু। নচেৎ বিষয়বুদ্ধি-প্রবল, সাধারণ সংসারাসক্ত, অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে গুরু-ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ কখনও গুরু হ'তে পারেন না। এমন ব্যক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্র কখনই বলেন না যে, গুরু কৃষ্ণরূপ হন বা গুরুরূপে স্বয়ং কৃষ্ণ ভক্তগণকে কৃপা করেন। যথার্থ গুরু হ'তে শিষ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত হয়, যে-শক্তি ক্রমশঃ শিষ্যকে সংসার-বন্ধন হ'তে মুক্ত করেন। পূর্বেই বলা হ'য়েছে ভক্তি পথ সোজা হ'লেও তত সোজা নয়। কি জ্ঞানযোগী কি ভক্তিযোগী উভয়কেই সংসারাসক্তিকে নির্মম-ভাবে ত্যাগ করতে হবে। তারপর ভক্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণ হ'তে বুঝা যাবে উহা কিরূপ মহান ভাবদ্যোতক। ভক্তি সাধারণতঃ দুই প্রকার (১) বৈধী (২) রাগাত্মিকা বা উত্তমা। রাগাত্মিকা ভক্তি দুই ভাগে বিভক্ত (১) সম্বন্ধাত্মিকা (২) কামাত্মিকা। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য ভেদে চতুর্বিধ। (২) শুদ্ধ ও মাধুর্যময়। শ্রীমতী রাধারাণী এই মাধুর্যময় মহাভাবস্বরূপা। শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের জীবনেও মহাভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। রাধারাণী হ'তে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কাল পর্যন্ত আর কাহারও জীবনে মহাভাবের আবির্ভাবের কথা অবগত হওয়া যায় না। মনে হয় এই মহাভাবই বেদান্তের নির্বিকল্প সমাধি। এই অবস্থায় সাধকের প্রেমস্বরূপ ভগবান হ'তে নিজের স্বাতন্ত্র্য জ্ঞান থাকে না। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করেই যীশুখৃষ্ট বলেছেন, 'I and my father the same.' অর্থাৎ আমি ও আমার পিতা এক। গোপিকাদের উপলব্ধি যে কৃষ্ণোঽহং বা বেদান্তীদের সোঽহং উহাও ঐ উচ্চতম ভাবকে লক্ষ্য করেই বলা হয়। সাধারণ জীবের

পক্ষে শান্তভাবের পরিপক্ক অবস্থায় অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের ছিটাফোঁটা যদি লাভ করা যায় তো তাই যথেষ্ট। অষ্টসাত্ত্বিক বিকার যথা—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, অশ্রু, বৈবর্ণ্য এবং প্রলয়। এদের প্রত্যেকটির আবার পাঁচ অবস্থা আছে। যথা: ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত, উদ্দীপ্ত এবং সুদীপ্ত। শান্ত-ভাবের ফল সম্প্রজ্ঞাত বা সবিকল্প সমাধি। যে ভক্ত এই সমাধি লাভ করেন তিনি সুখে দুঃখে অবিচলিত এবং সম্পূর্ণ বাসনাজয়ী। ভক্তের প্রাথমিক অবস্থার সাধন ভক্তি—উহা স্মরণ, মনন ও ধ্যানে সন্নিবেশিত। মধ্যম স্তরে ভাবভক্তি যাহা হ'তে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব পর্যন্ত হ'তে পারে। সংক্ষেপে ইহাই ভক্তি-সিদ্ধান্ত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মে আমাদের বাংলাদেশ গৌরবান্বিত। তিনি যুগাবতার, যুগধর্ম স্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। ভারতের যে যে স্থানে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম পড়েছিল সেই সেই স্থান আমাদের নিকট তীর্থে পরিণত হয়েছে। নবদ্বীপ বৃন্দাবন তুল্য তাঁর জন্ম-স্থান। শ্রীধাম নবদ্বীপে তাঁর নিত্য প্রকাশ।

"শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ নর্ত্তনে।
শ্রীবাস কীর্ত্তনে আর রাঘব ভবনে॥
এই চারি ঠাঁই প্রভুর সদা আবির্ভাব।"

মহাপ্রভুর এক রহস্যময় ব্যক্তিত্ব, তাহার যথার্থ স্বরূপ বিশ্লেষণ করা আমাদের পক্ষে কখনই সম্ভব হবে না; তবে বাংলার গৌরবস্বরূপ মহাপ্রভুতত্ত্ব সম্বন্ধে একেবারে যাতে অজ্ঞ না থাকি, তাই তাঁর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা রেখে তাঁর সম্বন্ধে দু'এক কথা আলোচনা করা গেল। তাঁর প্রদর্শিত ভক্তিপথ দ্বারা যে কোন সম্প্রদায়ের সাধকই নিজ নিজ নিষ্ঠালাভ করতে পারবেন। সত্য তো একই, তবে রুচি অনুসারে যার যে ভাবে তাঁকে ভজনা করতে ইচ্ছা, তিনি তাই করুন, তাতে কিছু এসে যায় না, কেবল এই জ্ঞান থাকলেই হল যে, সব রূপই একের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও সব নাম একেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম!

'মহেশ্বর বা জগদাশ্রয়ে হরে জনার্দনে বা
জগদ্ব্যবস্থানি।
ন বস্তু ভেদে প্রতিপত্তিরস্তি মে, তথাপি'
ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে॥'

অর্পণ ও স্মরণ

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন বসু

জন্ম আর মৃত্যু। আলো আর অন্ধকার। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত। এমনি দুইপারের প্রশ্ন নিয়ে মানুষ জানতে চেয়েছে এ নাট্যমঞ্চের চালক কে? বার বার প্রশ্ন করেছে কে তুমি, তুমি কে? এ জগতের আরম্ভ কোথায়, শেষই বা কোন্‌টা,—সেই সীমারেখা খুঁজতে চেয়েছে মানুষ। উত্তরও পেয়েছে অন্তরের অন্তস্তল হতে। সার্থক হয়েছে জীবনবোধ; তিমির-হরণ জ্যোতির্ময়ের সন্ধান পেয়েছে হৃদয়ের গভীরে।

সে সন্ধান ঐ অপার্থিব সাধনার সার্থক, সার্থক সেই মাইঃ মন্ত্রের দীক্ষায়। উদাত্তকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে "সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম"। মনে প্রাণে বলেছে নাও নাও, ওগো, সব নাও আর স্মরণ করেছে সেই মুক্ত পুরুষকে। অর্পণে আর স্মরণেই মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ আহ্বান জানিয়েছে অমৃতকে, অন্তরে অনুভব করে বলেছে 'মধুময় এ পৃথিবী'।

তবু আমরা যে সাধারণ পথের পথিক। আমাদের অন্তরেই ব্রহ্ম এ বিশ্বাস করতে পারি না। তাই আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হই। চোখ চেয়ে থেকে দেখতে পাইনা কিছুই, কারণ হৃদয়দ্বার বন্ধ। ভীতু হয়ে আছি মনে, দুর্যোগে দুঃস্থ হই সামগ্রিক সৃষ্টি

দিয়ে দেখবার শক্তি নেই বলেই। অবিশ্বাসে অহং-সর্বস্বতা অনুভব করেছি, তাই পদে পদে আবদ্ধ হয়েছি পঙ্কিল আবর্তে। বাইরে ছুটেছি, বাইরে দোপদুরস্ত হয়েছি তবু অন্তরের গভীরে ফিরে তাকাবার সময় পাইনি। ওপরে কার্পেট পেতে তলায় অনেক ময়লা জমিয়েছি। তাই সেই জ্যোতির্ময় হৃদয়রাজকে বসাতে হৃদয়বেদিকাকে আবর্জনামুক্ত করতে হবে। তা নয়তো কেমন করে হৃদয়রাজ এসে বসবেন এ বেদিকায়। 'স্বঘাত সলিলে ডুবে' যে মরছি একি একবার চোখ খুলে দেখবার সময় হবে না!

আমরা মুক্তি পেতে চাই সকলপ্রকার বন্ধন থেকে। সেই মুক্তি পাওয়ার প্রচেষ্টা চলেছে এটা ওটা দেখে, ভোগ করে। বহুল প্রচেষ্টা একদিন সার্থক হবেই। বিপদে আপদে আঘাতে অপমানে অনেক শিক্ষা হচ্ছে। এমনি করেই একদিন আমরা সঠিক পথ চিনতে পারবো। বুঝবো ওই ত' আমাদের মুক্তির পথ, কিন্তু আলোকোজ্জ্বল হেসে যাবার সরল সরণী।

সমগ্র জগত যে সেই একের প্রকাশ। আমি বা আমরা তার থেকে আলাদা নই। একের মাঝে যে শক্তি সে শক্তিগ্রহণেই আমরা চলছি ফিরছি। আপনি প্রভু সৃষ্টির বাঁধনে বাঁধা প'ড়ে আছেন।

তাইতো সেই সুন্দর বাণী "যদ্যেকং স্মরণং ব্রজ।" অর্পণ করতে হবে সব। তখন আর লাভের লোভে শুভাশুভের হিসেবের কড়ি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে পাগল হতে হবে না। নিত্য পূজা চলবে মনের বেদীতে ধূপধুনা আর মাটির প্রদীপে।

স্মরণ আর অর্পণ। গ্রহণ নয় অর্পণ করলেই মুক্ত হওয়া যায়। সুন্দরে অসুন্দরে, সুখে দুঃখে যা আসে তাকেই নৈবেদ্য ক'রে চন্দনচর্চিত অগুরু সুগন্ধিত করে কেবল নিবেদন। লিপ্ত হলেই অহংমন্যতা দিনে দিনে দেহে মনে সংক্রান্ত হবে। তখন ছোট আঘাত বজ্রাঘাত হয়ে বুকে বাজবে। দুঃখে অভিভূত হয়ে অন্ধকারে হাতড়াতে হবে। তাইতো সকল কিছু তপস্যা, ভোগ্যবস্তু ও কর্মফল অর্পণ করা। পত্র, পুষ্প, ফল আর জল ভক্তিভরে দিলে তিনি গ্রহণ করেন। কিন্তু তার ভেতর আন্তরিকতা থাকা চাই। বিশ্বের ঘরেই তিনি বেমে আসেন। দেওয়া আর পাওয়ার হিসেব ওলে যাওয়া নয়। কেবলই দেওয়া; পাওয়ার হিসেব মনেও আসবে না। সেই হলো আন্তরিক অর্পণ।

স্মরণ ক'রে পথ চলা। কেবল অনুসরণেই হৃদয়-বীণা আনন্দের ঝঙ্কারে অনুরণিত হবে। 'জপিতে জপিতে নাম' মাঠে ঘাটে আর সংসারের হাটে ছুটতে হবে। দাঁত কন্‌কন্ ক'রলে মনটি যেমন পড়ে থাকে দাঁতে তেমনি ক'রে ভগবানে মনটাকে আটকে রাখতে হবে। ঘরদুয়ার-কাঁটের মাঝেও উপপতির প্রতি মন প'ড়ে থাকে যেমন ক'রে নারীর। কাজ করতে হবে সব; কর্ত্রী যে আমি নই, দ্রষ্টা—একথা অনুক্ষণ স্মরণ রাখতে হবে। আমি করার মাঝে যে গর্বাহুভব তাকে পুড়িয়ে ফেলতে তবে নিস্তার। দ্রষ্টা-ঘরের চাবি এলেই দিব্যচক্ষু লাভ। 'যা আছেন আর আমি আছি ভাবনা কি আছে আমার' ধ্রুব হয়ে বসবে আপদে বিপদে নিরন্তর দুঃখের মাঝে স্বরূপস্থায় আর সুখের সিংহাসনে।

এই হ'লো ঈশ্বরকে উপলব্ধি করবার পন্থা। প্রাত্যহিক কাজের মাঝে সকল শাস্ত্রবাক্যকে সাক্ষাতে হবে। 'হরি দিন ত' গেল, সন্ধ্যা হ'ল, পার করো আমারে' বলে ঘ্যান ঘ্যান ক'রে তামসিকতাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। দুঃখে মরিয়া আর সুখে উদাসীন থাকবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। ত্যাগ করতে হবে অনেক। অনেক ত্যাগে অনেক লাভ। অনেক ভোগে দুর্ভোগেরও সীমা নেই।

পাঁচদিকে মন রেখে মনকে ব্যতিব্যস্ত করা নয়। মন থাকবে একে, কাজ হবে অনেক। যেমন ক'রে চিঁড়ে কুটুনী চেঁকিতে চিঁড়ে ভানে, সন্তানকে মাই দেয় কিন্তু চেঁকির দিকে ঠিক লক্ষ্য থাকে যাতে হাতে না পড়তে পারে। দোলার মত দড়ি বাঁধা থাক ওপরে তারপর এধার ওধার যত পারো

দোলো। চোরের মত মনটি পড়ে থাকে বোঁচকার দিকে।

এমনি করে নিত্য স্মরণ করতে হবে জ্যোতির্ময়ের। তখন সকল অর্পণ হবে রক্তি আর আরতিতে জীবন যুদ্ধের প্রতিটি ক্ষেত্রে যা দেওয়ার আছে। হৃদয়পুরে যিনি শয়ন ক'রে আছেন তাঁকে জাগাবার ইচ্ছা জাগবে। ভূতে ভূতে যিনি বিভক্ত তাঁরই উপলব্ধি হবে। ভয়, হিংসা নুকতা আর গৃধ্নুতা আসবে না মনে। কারণ যা আসে সবই যে অর্পিত হয় হৃদয়রাজের চরণপদ্মে।

একের মাঝেই যে আমি। তিনি যে আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না। শুধু এইটুকু চিন্তাই দিবালোকে আর সুচীভেদ্য তিমিরে "অভীঃ অভীঃ" মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে নির্ভীক ক'রে তুলবে প্রতিটি মানুষকে। সকলই প্রভু তোমার, এই ভাব এলে তখন ত' চিন্তা-জ্বরে ছটফট করতে হবে না। হা হুতাশ ক'রে ক্রোধে ক্রন্দনে লোভে মোহান্ধ হ'তে হবে না।

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থাই জীবনের পথ। নটরাজের উত্তাল নৃত্যের তালই পৃথিবীর ছন্দ। আবার জলতলের নীরব প্রশান্তিও বিশ্বের ধর্ম। এ দুধারে স্থির গম্ভীর অন্তধারে উদ্দাম চঞ্চল। এ দুটি ধর্মকে চিন্‌তে হবে চলার পথে। তখনই প্রশান্তি আসবে মনে।

কেবল খেলা দেখার দর্শক হয়ে থাকা। খেলায় লিপ্ত হয়ে হাত পা জড়াবার প্রয়োজন নেই। জীবনের পথে যা আসে তাকেই অর্পণ করা। স্মরণ তখন হবেই। এই অর্পণে আর স্মরণেই পথ চলার পাথেয় খুঁজে পাওয়া যাবে, অভাব হবে না কখনও। তখনই রূপে-অরূপে, ব্যক্তে-অব্যক্তে, ভোগে-ত্যাগে আনন্দ পাওয়া যাবে। সবার মাঝে থেকেও মুক্তির আস্বাদ লাভ হবে। জীবন-যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে তখন কি অপরিসীম প্রভুত্বতা আসবে। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'তেও হবে অকুতোভয়। "চরৈবেতি চরৈবেতি' এগিয়ে আরো এগিয়ে চলার সাহস আসবে।

'ইদং অমৃতং ইদং ব্রহ্ম ইদং সর্বং' এ উপলব্ধি কেবল স্মরণে, অর্পণে ও নিবেদনে। 'অনলে অনিলে চিরনভোনীলে ভূধরে সলিলে গহনে'ই তাঁর লীলা, চকল অথচ শান্ত মধুর মনে প্রাণে অনুভব হবে। প্রভু যে সীমার মাঝেই অসীম, তাইতো সবার কাছে কাছে, অন্তরে অন্তরে, দীন-দরিদ্রে, শিশু-যুবা-প্রৌঢ়ে আর প্রবীনে, নবোন্মেষের আলোকে আর অন্তিম-শয়নে। তবে চলাপথের পাথেয় তিনি বিনে আর কে? তখন কি দরদ দিয়ে কবির মতো গাইবো না—

"যত দিতে চাও কাজ দিও, যদি
তোমারে না দাও ভুলিতে
অন্তর যদি জড়াতে না দাও জাল-জঞ্জালগুলিতে।
বাঁধিও আমায় যত খুসি তোরে
মুক্ত রাখিও তোমাপানে মোরে
ধূলায় রাখিও পবিত্র ক'রে তোমার চরণধূলিতে।
ভুলায়ে রাখিও সংসারতলে তোমারে দিওনা ভুলিতে।"

"উনানের উপরে ভিজে কাঠ রাখলে আঁচ লেগে লেগে ক্রমে সে কাঠ শুকিয়ে যায়, সংসারী লোক যদি সাধুসঙ্গ করে তা হলে ক্রমে তাদের কামিনী-কাঞ্চন-রস শুকিয়ে যায়, অন্তরে বিবেক-আগুন জ্বলে ওঠে।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

১লা বৈশাখ

শ্রীভজন গোপাল সান্যাল

'বর্ষ হয়ে আসে শেষ
দিন হয়ে এল সমাপন,
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্তবরষের
সর্বশেষ গান।'

মহাকালের যাত্রাপথে ১৩৬৩ সালটি মিলিয়ে গেল :

'কালের যাত্রার ধ্বনি, শুনিতে কি পাও
তারি রথ নিত্যই উধাও।'

চৈত্রশেষের ঝরাপাতার বেলায় এলো ১লা বৈশাখ—নববর্ষ। তাই আজ গীতবিতানে রবীন্দ্রনাথের 'উৎসব' গানটি বার বার মনে জাগছে :

"ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত অম্বর মাঝে,
দিকেদিগন্তরে ভুবন-মন্দিরে শান্তি সঙ্গীত বাজে।

* * *

কলুষ কন্দর, বিরোধ বিদ্বেষ
হউক নির্মল—হউক নিঃশেষ
চিত্তে হোক যত বিঘ্ন অপগত,
নিত্য কল্যাণ কার্জে।"

জানিনা সৃষ্টির কোন্ প্রভাতবেলা থেকে মানুষের ইতিহাসে যাওয়া-আসার পালা চলেছে। পুরাতনের প্রলয়যজ্ঞে—যুগে যুগে কালে কালে চলেছে জন্ম ও মরণ—তালে তালে একদিকে শুকনো ঝরাপাতা—আরেকদিকে নূতন কিশলয়ের উদ্গম। আলো-ছায়ার জোয়ার-ভাটায় কান্না-হাসির দোলদোলানোতে আগমনী ও বিসর্জন—সৃষ্টি ও ধ্বংস চলেছে মুক্ত সুরের ছন্দ জাগিয়ে নৃত্যের তালে তালে। তাই বর্ষশেষের দিনে ও নূতন বছরের প্রথম সন্ধিক্ষণে আজ মনে পড়ে—'অসীম কালের যে হিন্দোলে,
জোয়ার ভাটায় ভুবন দোলে,
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।'

১লা বৈশাখ,—আমাদের জীবনে একধারে আগমনী আরেকদিকে বিজয়া। পাওয়া আর না-পাওয়ার মাঝখানে এই দোলন। ফেলে-আসা দিনগুলির জন্য বিরহ, বেদনা আবার নূতনের মায়াময় স্বপ্নময় অদ্ভুত মিলনের আনন্দ! এই দুই প্রান্ত স্পর্শ করে দুলছে আজ বাঙ্গালীর হৃদয়। তাই পরিপূর্ণ ও অপূর্ণের মাঝখানে—'হারিয়ে যাওয়া আলোর মাঝে' নববর্ষ ১লা বৈশাখ হয়ে এসেছে চির নবীন। টুক্‌রো টুক্‌রো সুখদুঃখের ছিন্নদিনের খণ্ডমালা ১৩৬৩ সালের মালিকা থেকে খসে গিয়ে আগামী দিনের মহাস্রোতের আবর্তনে আত্মীয়তা ও নিবিড়তার আহ্বান বয়ে নিয়ে এসেছে।

পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি
ঐ কেটে গেল, ওরে যাত্রী।
তোমার পথের 'পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান
রুদ্রের ভৈরব গান।'

তাই আজ আবাহন জানাই—'ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল···হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ'কে :

'এসো এসো এসো হে বৈশাখ।
তাপসনিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক্।'

সেদিন সন্ধ্যায় দার্জিলিং শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের ছায়াঘেরা পথ দিয়ে আসছিলাম। দু'দিকে শাল পিয়ালের গাছ—মাঝখানে ছোট্ট পাকে-চলা রাস্তা। মনে পড়ল এই রাস্তায় কতবার জগৎ-বরেণ্য বাগ্মী ও সিদ্ধমহাপুরুষ স্বামী অভেদানন্দজী আসা-যাওয়া করেছেন, কত বড় বড় লোকের পায়ের ধূলি পড়েছে! স্বামিজীর সেই অপরাজিত

জীবন রহস্যের কথা আজ মনে জাগিয়ে দেয় :

'শুনিলাম, মানবের কত বাণী দলে দলে,
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে, অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
ধ্বনিছে উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে,
হেথা নয়, হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনখানে ?'

এই অপূর্ণ থেকে পূর্ণে, পূর্ণ থেকে পূর্ণতরের অভিসারই হোল ১লা বৈশাখের মর্মবাণী—এ চলার আদি নেই, অন্ত নেই, সীমা নেই—মধুর কলতানে ভরা প্রবাহই ১লা বৈশাখের পাথেয় !

'তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে,
তাকাস্‌নে ফিরে,
সম্মুখের বাণী,
নিক্ তোরে টানি,
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।'

তাই বারে বারে ফিরে আসে ঋতুচক্রের আবর্তনে ১লা বৈশাখ।

'তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে
স্মরণের গ্রন্থি টুটে। সে যে যায় ছুটে,
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।'

এক বছরে 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী···স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' দিনগুলো মিলিয়ে যায় আরেক নববর্ষের কলোল-তলে ! গত বছরের দিনগুলো আজ ১লা বৈশাখে মনে করলে কেবলই বেদনায় মন উঠে ভরে—

'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না,
সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি,
কান্নাহাসির বাঁধন তারা সইল না,
সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।'

তথাপি আজ নববর্ষে প্রার্থনা—ঠাকুর যেন আমাদের জীবন মধুময় করে তোলেন, যদিও "হিংসার উৎসবে আজি বাজে, অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী ভয়ঙ্করী"। বাংলার চারিদিকে হতাশা তবুও আশা করবার আছে রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী, দেশবন্ধু, বিবেকানন্দ, অভেদানন্দের বাংলা জ্বালবে প্রদীপ—যাতে আগামী দিনের অন্ধকারময় পথে মহাকালের পথিকরা, যাত্রীরা পাবে আলো—তাই আজ পরমপুরুষের কাছে ১লা বৈশাখের এই একমাত্র কাতর প্রার্থনা :

'আজ আলোকের ঝরণা ধারায়
ধুইয়ে দাও।'

"যখন সংসার বুদ্ধি একেবারে চলে যাবে, যখন ভগবানে বোল আনা মন হবে, যখন তাঁর উপরে পূর্ণ ভালবাসা হবে, তখনই প্রেমভক্তি বা রাগভক্তি। এই ভক্তিতেই ঈশ্বর দর্শন হয়।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

বুদ্ধদেবের অন্তিম শিষ্য

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী এম. এ., পুরাণরত্ন, বিদ্যাবিনোদ

(১)

গৌতম সিদ্ধার্থ ৩৫ বৎসর বয়সে বৈশাখী পূর্ণিমা রজনীতে নিরঞ্জনা তীরে উরুবিল্বের বোধিবৃক্ষমূলে সম্যক্ সম্বোধি লাভ করেন এবং আষাঢ়ী পূর্ণিমা রজনীতে ঋষিপত্তন মৃগদাবে (সারনাথে) পঞ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণ তাপসদের নিকট "ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র" দেশনা করিয়া সর্বপ্রথম তাঁহাদিগকে সদ্ধর্মে দীক্ষিত করেন। কৌণ্ডিন্য, অশ্বজিৎ, মহানাম, ভদ্রীয় এবং বপ্প নামক এই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুই বুদ্ধদেবের প্রথম শিষ্য।

৮০ বৎসর বয়সে বৈশাখী পূর্ণিমা রজনীতে ভগবান তথাগত কুশীনগরে মল্লদের শালবনে পরিনির্বাণ শয্যায় শায়িত। রাত্রির প্রথম যাম অতীতপ্রায়। এই সময় বিশেষ ঘটনাসূত্রে তিনি পরিব্রাজক সুভদ্রকে দীক্ষা প্রদান করেন। ইহাই তাঁহার অন্তিম দীক্ষাদান এবং পরিব্রাজক সুভদ্রই বুদ্ধদেবের অন্তিম শিষ্য।

সুভদ্র পরিব্রাজক কুশীনগরে বাস করিতেন। তিনি সমসাময়িক বহু আচার্যের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদের উপদেশ শুনিয়াছিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার সমস্যার সমাধান হয় নাই। তিনি যখন শুনিতে পাইলেন যে, অদ্য রাত্রির শেষ যামে শ্রমণ গৌতম পরিনির্বাণ লাভ করিবেন তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমি প্রাচীন আচার্যগণকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি : "কদাচি করহচি তথাগতা লোকে উপজ্জন্তি অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধাতি।"

কদাচিৎ কোনও কালে তথাগত অর্হৎ সম্যক্ জগতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। শ্রমণ গৌতম যদি সত্য সত্যই অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনিই ত একমাত্র ব্যক্তি যিনি আমার সকল সংশয় ছেদন করিয়া আমাকে সত্যের আলোক দেখাইতে পারেন। শুনিতে পাইতেছি, অদ্য রাত্রির শেষ যামেই তিনি পরিনির্বাপিত হইবেন, সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া এখনই শ্রমণ গৌতমের নিকট যাওয়া আবশ্যক।

"অত্থি চ মে অয়ং কঙ্খাধম্মো উপ্পন্নো, এবং পসন্নো অহং সমণে গোতমে, পহোতি মে সমণো গোতমো তথা ধম্মং দেসেতুং যথাহং ইমং কঙ্খাধম্মং পজহেয্যং।" (মহাপরিনিব্বানসুত্তং, ৪।৫৬)

ধর্মবিষয়ে আমার সংশয় উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রমণ গৌতমের প্রতি আমার চিত্ত এমন প্রসাদযুক্ত হইতেছে যে, শ্রমণ গৌতম আমাকে তেমন ধর্ম দেশনা করিতে পারিবেন, যাহাতে আমি এই সংশয় দূর করিতে পারিব।

পরিব্রাজক সুভদ্র অবিলম্বে মল্লগণের শালবনে উপস্থিত হইলেন এবং যে স্থানে বুদ্ধদেব পরিনির্বাণ শয্যায় শায়িত ছিলেন সেই স্থানের প্রবেশপথে দণ্ডায়মান আনন্দের নিকট তথাগতের দর্শনার্থ অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আয়ুষ্মান্ আনন্দ পরিব্রাজক সুভদ্রকে নিষেধ করিয়া কহিলেন : "অলং আবুসো সুভদ্দ, মা তথাগতং বিহেঠেসি। কিলন্তো ভগবাতি।" (আর না বন্ধু সুভদ্র, তথাগতকে এখন আর কষ্ট দিও না, ভগবান ক্লান্ত হইয়াছেন)।

সুভদ্র আনন্দকে বুঝাইতে লাগিলেন : আমি বৃদ্ধ পরিব্রাজক, ধর্মবিষয়ে আমার যে সংশয় রহিয়াছে তাহা সমাধান করিতে পারেন, শ্রমণ গৌতম ব্যতীত তেমন আর কেহই নাই। শুনিতেছি, তিনি অদ্য রাত্রিরই শেষ প্রহরে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন :

অতএব হে আনন্দ, আমি শ্রমণ গৌতমের দর্শন প্রার্থনা করিতেছি।

আনন্দ সুভদ্রকে পুনরায় নিষেধ করিয়া বুঝাইলেন,—বন্ধু সুভদ্র! ভগবান্ তথাগত দীর্ঘ ৪৫ বৎসরকাল গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়া অক্লান্তভাবে সদ্ধর্মের অমৃত বাণী বিতরণ করিয়া আসিয়াছেন। ঐ সময় একবারও তুমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার অবসর পাইলে না; আর এখন তিনি শ্রান্ত, ক্লান্ত, রোগজীর্ণ অবস্থায় পরিনির্বাণ শয্যায় শায়িত আছেন; রাত্রি প্রথম প্রহর অতীতপ্রায়, এই সময়ে তাঁহার সহিত তোমার ধর্ম-প্রসঙ্গ করা সমীচীন হইতে পারে না।

পরম কারুণিক ভগবান্ তথাগত পরিনির্বাণ শয্যা হইতে আয়ুষ্মান্ আনন্দ ও পরিব্রাজক সুভদ্রের কথোপকথন শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি আনন্দকে কহিলেন:

"অলং আনন্দ, মা সুভদ্দং বারেসি, লভতং আনন্দ সুভদ্দো তথাগতং দস্সনায়।" (ওহে আনন্দ, সুভদ্রকে আর নিবারণ করিও না। সুভদ্র তথাগতের দর্শনলাভ করুক)।

"যং কিঞ্চিনং সুভদ্দো পুচ্ছিস্সতি, সব্বন্তং অঞ্ঞাপেক্খোব পুচ্ছিস্সতি, নো বিহেসা।" (সুভদ্র যাহা কিছু আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তাহা কেবল সত্য জ্ঞাত হইবার অভিপ্রায়েই জিজ্ঞাসা করিবে, কষ্ট দিবার অভিপ্রায়ে নহে)।

"পেক্খো বক্খস্সাহং পুট্ঠো ব্যাকরিস্সামি, তং বিঞ্ঞস্সমেব আজানিস্সতীতি।" (জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি ইহার নিকট যাহা প্রকাশ করিব, তাহা শীঘ্রই সে বুঝিতে পারিবে)।

আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবান্ তথাগতের অভিপ্রায় অনুসারে সুভদ্রকে দ্বার ছাড়িয়া দিলেন এবং প্রবেশের অনুমতি দিয়া কহিলেন:

"গচ্ছাবুসো সুভদ্দ, কায়োতি তে ভগবা ওকাসন্তি।" (বন্ধু সুভদ্র! তুমি এখন প্রবেশ করিতে পার, ভগবান্ তোমায় জন্য অবকাশ করিয়াছেন)।

(২)

পরিব্রাজক সুভদ্র বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্বক তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন: ভো গৌতম! সমসাময়িক ছয়জন ধর্মনেতা (১) পূর্ণ-কাশ্যপ (পুরণকস্সপ), (২) মস্করী গোশাল (মক্খলি গোসাল), (৩) অজিত কেশকম্বল, (৪) ককুদ কাত্যায়ন (পকুধ কচ্চায়ন), (৫) সঞ্জয় বেলাট্ঠিপুত্র (বেলট্ঠিপুত্ত) এবং (৬) নির্গ্রন্থ নাথপুত্র (নিগণ্ঠ-নাথপুত্ত)—ইহারা সকলেই সঙ্ঘনায়ক, গণপালক, গণাচার্য, শাস্ত্রবিদ্, যশস্বী এবং বহুজন কর্তৃক সম্মানিত।

"সব্বে তে সকায় পটিঞ্ঞায় অত্তঞ্ঞুনো, সব্বেব ন অত্তঞ্ঞুনো, উদাহু একচ্চে অত্তঞ্ঞুনো, একচ্চে নাত্তঞ্ঞুনোতি?" (ইহারা সকলেই তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া দাবী করিতেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা কি সকলেই তত্ত্বজ্ঞ? অথবা ইহাদের কেহই তত্ত্বজ্ঞ নহেন? অথবা ইঁহাদের মধ্যে কে কে তত্ত্বজ্ঞ, কে কে তত্ত্বজ্ঞ নহেন)?

সুভদ্র পরিব্রাজক বুদ্ধদেবকে যে ছয়জন ধর্মাচার্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন, তাঁহারা সকলেই বুদ্ধদেবের সময়ে মগধরাজ্যে ধর্মপ্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। ইহাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ, সাধনপন্থা, শিষ্যসম্প্রদায় ছিল এবং ইঁহারা সকলেই লোক-সমাজে সম্মানিত হইতেন। দীঘনিকায়, মজ্ঝিম-নিকায়, বুদ্ধঘোষের অট্ঠকথা, জৈনসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ইঁহাদের সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। নিম্নে ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল:

(১) পূর্ণকাশ্যপ—ইনি পূর্বে এক ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে দ্বাররক্ষকের কার্য করিতেন, পরে বৈরাগ্যবশতঃ বনে গমন করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তিনি যখন ধর্মপ্রচারার্থ লোকসমাজে ফিরিয়া আসেন তখন নিজেকে "পূর্ণকাশ্যপ" নামে অভিহিত করেন।

সমস্ত বিদ্যায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া "পূর্ণ" এবং কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশসম্ভূত বলিয়া তিনি "কাশ্যপ" নাম ধারণ করেন। ইনি নগ্নাবস্থায় যখন গ্রামে উপস্থিত হন, তখন গ্রামবাসিগণ ইহার পরিধানের জন্য বস্ত্র প্রদান করিতে চাহিলে বলিয়াছিলেন, "পাপ হইতেই লজ্জার উৎপত্তি, আমি সমস্ত পাপ নির্মূল করিয়াছি, অতএব আমার বস্ত্রের প্রয়োজন নাই।" তজ্জন্যবশে লোকে তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিল। তাঁহার মতে পাপপুণ্য কিছুই নাই। অকুশল কর্ম করিলেও পাপ হয় না, কুশল কর্ম করিলেও পুণ্য হয় না। ইহার মতবাদ দৃষ্টে মনে হয়, ইনি পরমহংস অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পাপপুণ্যের উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। ৮০ হাজার লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, প্রধান শিষ্য ছিল পাঁচশত।

(২) **মস্করী গোশাল**—কোশলের সরবন গ্রামে এক ধনবান্ ব্যক্তির গোশালায় দাসীগর্ভে ইহার জন্ম হয়। তপস্যা করিয়া জিনত্বলাভ করিয়া তিনি শ্রাবস্তীনগরে ধর্মপ্রচারের জন্য আগমন করেন। জৈনগ্রন্থে তাঁহার শিষ্যবর্গ এবং উপাসক উপাসিকাগণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তিনি শ্রাবস্তীতে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শিষ্যগণ তদীয় উপদেশসমূহ সংগ্রহ করিয়া 'অষ্টমহানিমিত্ত' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মস্করী গোশালের প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায় 'আজীবিক' নামে খ্যাত। ইনি প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। তিনি বলিতেন পুরুষকার নাই, নিয়তির বশে যাহা হইবার তাহা হয়, যাহা না হইবার তাহা হয় না। ৮৪ মহাকল্প অন্তে অজ্ঞানী ও জ্ঞানী নির্বিশেষে সকলেই সংসারচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে দুঃখের অন্ত সাধন করিবে।

(৩) **অজিত কেশকম্বল**—ইনি পূর্বাশ্রমে এক ব্যক্তির গৃহে কার্যে নিযুক্ত ছিলেন; প্রভুর ভর্ৎসনা সহ্য করিতে না পারিয়া গৃহত্যাগ করেন এবং পরে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। ইনি কেশ নির্মিত কম্বল দ্বারা গাত্র আচ্ছাদন করিয়া রাখিতেন এবং মস্তক মুণ্ডন করিতেন। ইনি ছিলেন নাস্তিক্যবাদী। তাঁহার মতে দান, যজ্ঞ, অতিথিসৎকার, সুকৃত কিংবা দুষ্কৃত কর্মের কোন ফল বা বিপাক নাই। অজ্ঞানী ও জ্ঞানী উভয়েই কায়ভেদ হইলে বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যুর পর আর জন্মে না। যাহারা "অস্তিবাদ" বলে তাহারা তুচ্ছ মিথ্যা বিলাপ করে। অজিত কেশকম্বলেরও বহু শিষ্য প্রশিষ্য ছিল।

(৪) **ককুদ বা পকুদ কাত্যায়ন**—ইনি এক ব্রাহ্মণ-বিধবার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পকুদ-বৃক্ষমূলে জন্মগ্রহণ করায় 'পকুদ' এবং পৃষ্ঠদেশে একটি বৃহৎ ককুদ ছিল বলিয়া 'ককুদ' কাত্যায়ন নামে অভিহিত হন। কোন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে প্রতিপালন করিতেন। প্রতিপালকের মৃত্যু হইলে ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার মতে জগতে সাতটি পদার্থের সংযোগ ও বিয়োগের উপর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় নির্ভর করে। উক্ত সপ্ত পদার্থ যথা—ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, সুখ, দুঃখ ও জীবাত্মা।

(৫) **সঞ্জয় বেলাট্ঠিপুত্র**—বেলাট্ঠিনামী দাসীর গর্ভে ইহার জন্ম হয় এবং মস্তকে সঞ্জ (woodapple) ফলের ন্যায় একটি মাংসপিণ্ড বিদ্যমান থাকায় ইনি সঞ্জয় বেলাট্ঠিপুত্র নামে অভিহিত হন। মহাবস্তুর মতে ইনি ও সঞ্জয় পরিব্রাজক অভিন্ন। সঞ্জয় পরিব্রাজক সারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের পূর্বাচার্য ছিলেন। পরে তাঁহারা সঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। সঞ্জয় ছিলেন সংশয়বাদী। তাঁহার মতে জগৎ নিত্য কিংবা অনিত্য, মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব থাকে কি থাকে না, জগৎ আদি কি অনাদি ইত্যাদি বিষয়ের সমাধান হয় না। কতগুলি সংশয় থাকিয়া যায়। প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি কিছুতেই ধরা দিতেন না। "এইরূপও আমি বলি না, সেইরূপও আমি বলি না, অন্যথাও আমি বলি না, 'না' বলিয়াও আমি বলি না" এইরূপ উত্তর দিয়া বাক্য বিক্ষেপ করিতেন।

তাঁহার এই বাদ ব্রহ্মজাল সূত্রে 'অমরা বিক্ষেপ' নামে অভিহিত হইয়াছে।

(৬) **নিগ্রন্থ নাথপুত্র**—তিনি নাথ বংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহার অপর নাম মহাবীর। ইনি নিগ্রন্থ বা দিগম্বর জৈন-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা; নিজেকে সর্বপাপ হইতে, সকল বন্ধন হইতে মুক্ত বলিয়া 'নিগ্রন্থ' নামে অভিহিত করিতেন। মতান্তরে, তিনি বলিতেন "এমন কোন গ্রন্থ নাই যাহা আমি পাঠ করি নাই" এই হেতু তিনি 'নিগ্রন্থ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মহাবীরের মতে প্রাণীর জীবন নাশ করা উচিত নহে, চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করা উচিত নহে, মিথ্যা কথা বলা উচিত নহে, মদ মাৎসর্য ও কামের বশীভূত হওয়া উচিত নহে এবং যাহারা এই সকল ত্যাগ করিতে পারে না তাহারা নরকগামী হয়। তাঁহার মতে চারি প্রকার শীল এবং আত্মচেষ্টার দ্বারা আত্মার শান্তিপূর্ণ অবস্থা লাভ করা যায়। মহাবীর ও বুদ্ধ সমসাময়িক ছিলেন এবং এই দুইজন সুপ্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক কোশল, মগধ, অঙ্গ এবং বিদেহে তাঁহাদের ধর্মপ্রচার করিলেও পরস্পরের সহিত কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। মহাবীর বুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করেন।

পরিব্রাজক সুভদ্র ভগবান্ তথাগতকে পূর্বোক্ত ছয়জন ধর্মাচার্যের তত্ত্বজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি তাঁহাদের কাহারো কোনও প্রকার সমালোচনা না করিয়া সুভদ্রকে কেবল সত্য ধর্মই দেশনা করিলেন।

"অলং সুভদ্দ! তিট্ঠতেতং সব্বে তে সকায় পটিঞ্ঞায় অঞ্ঞতরঞ্ঞতরং, সব্বে ন অঞ্ঞতরঞ্ঞতরং, উদাহু একচ্চে অঞ্ঞতরঞ্ঞতরং, একচ্চে নাঞ্ঞতরঞ্ঞতরং ইতি?"

'কান্ত হও, সুভদ্র। এই বিষয়ে আলোচনা ত্যাগ কর যে, তাঁহারা সকলে স্বীয় বাক্যানুসারে তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন বা হন নাই, অথবা কেহ কেহ তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন, কেহ হন নাই।' বুদ্ধদেবের কথার তাৎপর্য এই যে, পরচর্চা ত্যাগ করিতে হইবে। ধর্মজীবন ইহা দ্বারা গঠিত হয় না ধর্মকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করিতে হইবে।

"ধম্মং তে সুভদ্দ দেসিস্সামি, তং সুণাহি, সাধুকং মনসি করোহি, ভাসিস্সামীতি।"

(মহাপরিনিব্বানসুত্তং, ৪।৬০)

হে সুভদ্র। আমি তোমাকে ধর্মদেশনা করিব, তাহা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি বলিতেছি।

(ক্রমশঃ)

বিশ্ব-বাণী

অধ্যাপক শ্রীসুবীর গুপ্ত

এ জনম জন্মাবাসে মহাকাল-মন্দাকিনী তীরে
সত্য-শিব-সুন্দরের সাযুজ্যের বীজমন্ত্রটিরে
জিজ্ঞাসুরা অন্ত-পুত প্রশান্তির পরিপূর্ণতায়
মূর্ত করি', মর্ত্যে যেন অমৃতের বার্তা দিয়ে যায়।

একই মহা-মানবতা আপনারই সম্পূর্ণতা খোঁজে
দেশে কালে নানা ভাবে, মর্ম তা'র মর্ম যেন বোঝে।
খণ্ড-কালে বিবর্তিত অখণ্ডের আনন্দ-লীলায়
লক্ষ রূপ রসোল্লাসে অপরূপে যেন মিশে যায়।

রবীন্দ্র স্মরণে

: শ্রীবিজয় গোপাল বসু

চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে দেশের আবহাওয়া এমন ছিল যে, কেউ এম.এ. পাশ করলে সাধারণের কাছে তিনি মস্তবড় লোক ব'লে প্রতিপন্ন হ'তেন। নিজেকে বড় মনে না করলেও দশজনের কথায় তাঁর মনে বড় ভাব এসে যেত। এই বড় ভাবই হল অহঙ্কার। ফলে তাঁর হাঁটা-চলা, বসা-দাঁড়ান, খাওয়া-শোয়া প্রভৃতি সবই সাধারণের চেয়ে পৃথক হয়ে পড়ত। বিয়ের বাজারে চড়া পণে তাঁর দাবী হ'ত।

আমার কোন বন্ধু এই সময় এম.এ. পাশ করে লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানির ম্যানেজার হন। কোম্পানিটির তখনও শৈশবাবস্থা। তাই বাইরে তেমন নাম ছিল না। ব্যবসায়ে উন্নতি করতে হলে বড় বড় লোকের প্রশংসাপত্র লাভ করা নিতান্ত দরকার। তেমন বড়লোক হ'লে একজনের সার্টি-ফিকেটই যথেষ্ট।

বন্ধুটির কোম্পানির এ-জাতীয় কোনই প্রশংসা-পত্র ছিল না। কর্তৃপক্ষ এর অভাব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে কবিসম্রাট রবি ঠাকুরের একখানা প্রশংসাপত্র সংগ্রহের সঙ্কল্প করেন। কিন্তু কার দ্বারা এ-কাজ সম্ভব হতে পারে কথা উঠতেই বন্ধুটি গর্বভরে বলে উঠলেন, তিনি সেদিনই রাতারাতি এ কাজ সেরে কলকাতায় ফিরতে পারবেন যদি তক্ষুণই বোলপুরে রওনা হ'তে পারেন। তিনি সবে মাত্র এম.এ. পাশ করেছেন। মেজাজটা তাঁর পাশের ওঘরে সরগরম আছে। বিশেষতি পোষাকে তিনি থাকেন, পাইপ টানেন, কাঁটা-চামচে খান। তিনি মনে করলেন তাঁর সম্মানে কবি নিশ্চয়ই সার্টিফিকেট দিতে রাজী হ'বেন। এইচ্ বোসকে (H. Bose) কবিতায় তিনি যা লিখে দিয়েছিলেন তা তাঁর পড়ে গেল।

"দাঁতে মাজ হস্তলীন,
রুমালেতে সেলখোস ;
মাথায় মাপ কুন্তলীন,
ধন্য হ'ক এইচ্ বোস।"

বন্ধুটিও এইরূপ কাব্যের আকারে কিছু লিখিয়ে আনতে পারবেন বলে বিশ্বাস করলেন। কবির এ লিখতে এক দু' মিনিটের অধিক সময় লাগবে না। একবার আনতে পারলে দৈনিকে, সাপ্তাহিকে এবং মাসিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে। হ্যাণ্ডবিলেও ছাপা হ'বে, দেওয়ালে সাইনবোর্ডেও লেখা থাকবে। কবির কাব্য সকলেই যত্ন করে পড়বে, মুখস্থও করবে, কোম্পানির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। এইরূপ সুখকল্পনা করতে করতে বন্ধুটির অন্তর আনন্দে উথ্‌লে উঠ্‌ল।

কোম্পানির গাড়ীতে হাওড়া ষ্টেশনে এসে তিনি চাপলেন বোলপুরগামী ট্রেণে এবং রাস্তার দু'ধারের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে বেলা তিনটে নাগাদ বোলপুর ষ্টেশনে পৌছলেন। পাইপ টান্‌তে টান্‌তে খোস মেজাজে চল্‌লেন তিনি শান্তিনিকেতনের দিকে। জায়গাটায় তিনি সবে নূতন। তাই সেখানকার মানুষ, মাটি, গাছ, গরু, প্রভৃতিতে কেমন একটা নূতন ভাব দেখতে পেলেন।

শান্তিনিকেতনের অনুপম শান্ত স্নিগ্ধ ও মনোরম পরিবেশের মধ্যে প্রথম পরম শান্তি পেলেন বটে কিন্তু সে শান্তি বেশিক্ষণ তাঁতে স্থায়ী হয় নি। কারণ তিনি যে মন নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন, সে মন আর তাঁর ছিল না। তাঁর কল্পনা ছিল শান্তিনিকেতনে তিনি খাতির-যত্ন পাবেন, কিন্তু

এমনই তাঁর অদৃষ্ট যে, কেউই তাঁর দিকে তাকায়ও না, কথা বলা তো দূরের কথা। অবশেষে বন্ধুটি সেখানকার একজনের কাছে বললেন যে, কলকাতা থেকে তিনি এসেছেন কবির সঙ্গে দেখা করতে। উত্তরে তিনি জানতে পারলেন যে, সেটা সহজ নয়। কবি কোন্‌দিন কোন সময় যে বেরোবেন, তা কেউই বলতে পারে না। সেজন্য ঐ ভদ্রলোককে কয়েকদিন গেষ্ট হাউস-এ (Guest house) পয়সা খরচ কোরে থাকতে হবে। কথাগুলি শুনে তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তাঁর সব রকম আশা নিমেষে উড়ে গিয়ে মনটাকে কোরে ফেললে শুষ্ক নীরস। কবির বাসভবন উত্তরায়ণের কথা বন্ধুটি আগেই শুনেছিলেন। হতাশ মনে, ভগ্ন হৃদয়ে, নিরুৎসাহ-চিত্তে তিনি উত্তরায়ণ দেখতে চললেন। উত্তরায়ণ দেখে তাঁর মনের ভাব সাময়িকভাবে লঘু হয়ে যায়। এমনি এর মহিমা। বাড়ীটা তাঁর কাছে খুবই ভাল লাগলো। আমেরিকান ইঞ্জিনীয়ারের প্লানে তৈরী—দোতলা কি তিনতলা তা বোঝবার উপায় নেই। বস্তুতঃ বাড়ীটা তেতলাই বটে। 'ইন্দ্রপুরী' বলে যে একটা কথা আছে, তা তো এই-ই। এর চেয়ে বেশি সুন্দর বাড়ী কি আর হ'তে পারে? তাঁর মন যখন এইরূপ ভাবনায় তোলপাড় হচ্ছিল, তখন তাঁর দৃষ্টি পড়লো হঠাৎ কবির সেক্রেটারির ওপর। সেক্রেটারি একতলার বারান্দায় বসে লেখাপড়া করছিলেন। বন্ধুটি তাঁর কাছে আশায় বুক বেঁধে গিয়ে বললেন যে, তিনি কবির সঙ্গে দেখা করতে চান। সে-কথা শুনে সেক্রেটারি যা বল্লেন, তাতে বন্ধুর ওপরে পড়লো 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা'। সেক্রেটারী বন্ধুকে জানিয়ে দিলেন যে, সেদিন কবির বাতির অসুখ বলে তিনি মোটেই নীচে নামবেন না। এদিকে কালো মেঘে সমস্ত আকাশটা ছেয়ে ফেলেছিল। সেইসঙ্গে বন্ধুটির হৃদয়-মনও গভীর নৈরাশ্যে ঢাকা পড়তে লাগল। হতাশ হয়ে তিনি একটা চেয়ারে বসে পড়লেন এবং কত কি ভাবতে লাগলেন।

যেখানেই নিরাশা, ভগ্ন-মন, নিরুৎসাহ, সেই-খানেই ভগবানের মহিমার প্রকাশ দেখা যায়। বন্ধুটি যেখানে বসেছিলেন, ঠিক তার সামনেই ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। দু'চার মিনিট পরেই তিনি দেখতে পেলেন কবিকে নেমে আসতে। রক্ত-মাংসের শরীরে পূর্বে কখনও কবিকে না দেখলেও ছবিতে যে তাঁকে তিনি অনেকবার দেখেছেন তা বলবার আবশ্যকতা হয় না।

দৃষ্টিমাত্রই তিনি বুঝে নিলেন যে, ইনিই কবি। তিনি হন্‌-হন্‌ ক'রে হেঁটে পেছনে চলে গেলেন, বন্ধুটির দিকে তাকানও নি। বন্ধুটি সেক্রেটারির কাছে অনুনয় কোরে বললেন ঐ সময় কবির সঙ্গে তাঁর দেখা করিয়ে দিতে।

সেক্রেটারী বন্ধুটির কথা শুনে কাজ রেখে চ'লে গেলেন এবং সামান্য একটু পরেই ফিরে এসে যেতে বল্লেন তাঁকে কবির কাছে। কবি সে সময় দু'হাতে রেলিং ধরে অনিমেষ নয়নে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন। তিনি মনে ক'রে-ছিলেন তাঁর জুতার শব্দে কবি মুখ ফেরাবেন। কিন্তু কবির যে বাইরের দিকে তখন জ্ঞান নেই, তা তিনি বুঝতে পারেন নি। বন্ধুটি অগত্যা তাঁর পায়ে হাত দিয়ে নিজের মাথায় সেই হাত দিলেন। এ সময় কবির চোখ তাঁর ওপর পড়লো এবং তিনি কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা না করেই বল্লেন—

"তুমি কি চাও?"

বন্ধু—"আমি এক নূতন লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর জন্য সার্টিফিকেট নিতে এসেছি।"

কবি—"তুমি ভুল স্থানে এসেছ। আমি কবিতা লিখি, প্রবন্ধ লিখি, লাইফ ইন্সিওরেন্স সম্বন্ধে আমার কোনই জ্ঞান নেই।"

কবি আর কোন কথা না বলেই আবার আকাশের ওপর নজর রাখলেন। ঘন মেঘে

আসে কবি-হৃদয়ে কবিভাব। সেই ভাব পূর্ণভাবে অনুভব করবার জন্যই তিনি ওইভাবে দাঁড়িয়েছিলেন।

আম পাকলে গাঢ় হলদে হয়, লঙ্কা পাকলে টুকটুকে লাল হয়। সজীববাবু বলেন, মানুষও বুড়ো হ'লে হয় সুন্দর। এ কথার সার্থকতা তিনি দেখলেন কবিতে। তাঁর বয়স তখন আশীর কাছাকাছি। চুল দাড়ি সবই পেকে সাদা হ'য়ে গেছে। তথাচ রূপলাবণ্য যেন বেড়েই চলেছে। পায়ের তলা, হাতের তলা যেন আলতা মাখান। চুল দাড়ি পেকে গেলেও তাঁর শরীরের সৌন্দর্য বাড়াতে সাহায্য করছে। গায়ে আলখেল্লা, পরণে চিলে পায়জামা, বিদ্যাসাগরে চটি পায়, সবগুলিই স্বয়ং বিশ্বকর্মা যেন কবির রূপের সাথে খাপ খাইয়ে নিজ হাতে পরিয়ে দিয়ে গেছেন। প্রায় পনর মিনিটকাল কবি সেইভাবে থাকেন। বন্ধুটিও ততক্ষণ তন্ময় হ'য়ে সেই অপরূপ রূপ-সুধা পান করছিলেন। ভাব পুরে গেলে কবি বায়স্কোপের ছবির মত স'রে গেলেন। বন্ধুটিরও চমক্ ভাঙলো। তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন, না—বাস্তব কোন দৃশ্য দেখছিলেন, এ জ্ঞান আনতে তাঁর অনেক সময় লাগে। এম.এ. পাশের গর্ব তাঁর আর রইল না।

সুর যে আমার

শঙ্কর গুপ্ত

কুড়িয়ে পাওয়া গানের বীণা
বাজাই আমি আপন মনে;
নিত্য নতুন ঝঙ্কারে সে
ছড়িয়ে পড়ে ফুলের বনে।

অবুঝ সে-সুর বাঁধ মানে না,
ছন্দে ধরা যায় না তারে;
শূন্যলোকে মৌন ধ্যানীর
প্রদীপ জ্বালে অন্ধকারে।

আনন্দেরই বন্যাধারায়
শিউলী বনে গন্ধ ছড়ায়;
নিখরিণীর কাঁকন হাতে
পাহাড়-দেশে নেচে বেড়ায়।

সুর যে আমার সাত-সাগরের,
আকাশ পাড়ের লক্ষ মাণ;
ব্যাকুল হাওয়ায় আলো-ছায়ায়
কান্নাহাসির অরূপ ধ্বনি।

সুর যে আমার আত্মহারা
প্রজাপতির পাখায় চড়ে;
ত্রিলোক-ত্রিকাল এক ক'রে সে
চরণ ফেলে রঙীন করে।

এমন ক'রে বাজিয়ে যাওয়া
মুখর করা ক্ষণিক গানের;
রইবে সেকি বুকটি ভ'রে
সঙ্গী হয়ে চিরকালের।

বেদানন্দ-স্মরণে

শ্রীনির্মলচন্দ্র ঘোষ

স্বামী বেদানন্দজী মহারাজ আমাদের মধ্যে নাই ইহা চিন্তা করিতেও পরম দুঃখানুভব করি। তাঁহার সস্নেহ ও মাধুর্যময় ব্যবহার, অমায়িক প্রকৃতি এবং আমার সহিত আকৈশোর সম্পর্কের বিষয় চিন্তা করিয়া কিছুতেই বিমূঢ় ভাব কাটাইতে পারিতেছি না। যেটুকু স্মৃতিকথা মনে আসিতেছে তাহার সবটুকু লিখিবার মত পরিসর এখানে নাই। সুতরাং বিশেষ কয়েকটি ঘটনা বা বিষয় অবলম্বন করিয়া তাঁহার স্মৃতি-তর্পণ করিতেছি।

স্বামী বেদানন্দজীর বাল্যজীবন চন্দননগরে অতিবাহিত হয়। তাঁহার সংসারাশ্রমের নাম ছিল দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি জনাইয়ের বিখ্যাত মুখোপাধ্যায় বংশের লোক ছিলেন। তাঁহার সহিত আমার অতি বাল্যবয়সেই পরিচয় হয়। আমরা উভয়ে একই বিদ্যালয়ে পড়িতাম। তিনি এক শ্রেণী উঁচুতে পড়িতেন, তবুও আমাদের হৃদ্যতা অতি গভীর ছিল। আমরা উভয়ে কখনও কেহ কাহাকেও কোন বিষয় গোপন করিতাম না।

অতি অল্প বয়স হইতেই তাঁহার জীবনে ধর্ম-ভাব জাগিয়া উঠে। যখন তিনি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, তখন হইতেই কথামৃত বা বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্কর, যীশু, রামানুজ প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনী লইয়া আলোচনা করিতেন। আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই কথকতা বা গৌরাঙ্গলীলা হইত। বালক দেবেন্দ্রনাথ অনেক সময় উপস্থিত থাকিতেন এবং তন্ময় হইয়া বসিয়া শুনিতেন। অন্যান্য বালকদের ন্যায় তিনি বাজে কৌতুক বা খেলায় রত হইতেন না। তবে নিয়মিত ব্যায়াম করিতেন। আমাদের সহিত বৈকালে প্রায়ই গঙ্গাতীরে বেড়াইতে যাইতেন কিন্তু একটু সন্ধ্যা হইলে হঠাৎ তিনি নিখোঁজ হইয়া যাইতেন। পরে আমরা খোঁজ করিয়া দেখিতে পাইতাম যে, তিনি সে সময় গঙ্গার ধারে নির্জন স্থানে স্থিরভাবে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। এইরূপ প্রায়ই হইত বলিয়া অন্যান্য বালকেরা তাঁহাকে বড়ই বিরক্ত ও বিদ্রূপ করিত। সেইজন্য চন্দননগরে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু তিন-চারিটির বেশী ছিল না, কিন্তু কি জানি কেন আমাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তাঁহার মনের মধ্যে যেখানেই যে ভাব আসিত তিনি তাহা অকপটে ব্যক্ত করিতেন।

চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িবার সময় হইতেই তিনি মধ্যে মধ্যে গভীর রাত্রে শ্মশানে চলিয়া যাইতেন (শ্মশান তাঁহাদের গৃহ হইতে কিছুদূরে ছিল) এবং নির্জনে ধ্যান করিতেন। এ কথা যখন তাঁহার মাতা এবং জ্ঞাতিবর্গ জানিতে পারেন, তখন তাঁহাকে রাত্রে বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে রাখিতেন। বালক দেবেন হতাশ না হইয়া কক্ষ মধ্যেই জপ ও ধ্যান করিতেন।

তাঁহার ঘরটি ছোট ছিল—সেইখানেই তিনি পড়াশুনা ও রাত্রে শয়ন করিতেন। পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত বাইবেল, কথামৃত, গীতা, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক তাঁহার নিত্যপাঠ্য ছিল। এই সময় হইতেই তিনি প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন এবং কিছু-কিছু ছবিও আঁকিতে আরম্ভ করেন। ঠিক মনে নাই কবে, তবে এই সময়কার কথাই হইবে, তিনি একটি কবিতা লিখিয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট পাঠান। রবীন্দ্রনাথ সেই কবিতা পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া দেবেনকে আশীর্বাদ করিয়া পত্র দেন।

তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র দেবেন্দ্র একদিন কাহাকেও

কিছু না জানাইয়া বেলুড় মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে দর্শন করিয়া আসেন। ফিরিয়া আসিয়াই আমাকে বলেন যে, তিনি বেলুড়ে রাখাল মহারাজকে দর্শন করিয়া আসিয়াছেন এবং মহারাজ তাঁহাকে খুব আদর ও যত্ন করিয়া মধ্যে মধ্যে যাইবার জন্য বলিয়াছেন। তারপর হইতে তিনি কিরূপ হইয়া যান—সদাসর্বদা যেন কি এক ভাবে মগ্ন থাকেন আর, ঘন ঘন মঠে যাতায়াত করেন। একদিন ব্রহ্মানন্দজীর কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করিয়া এক অনির্বচনীয় শান্তি উপলব্ধি করিলেন। কোন সময় দেবেন আমায় অতি দুঃখের সহিত জানাইলেন যে, মহারাজের কাছে মন্ত্র লইবার জন্য যাইলে তিনি বলিয়াছেন 'তোমার অন্য সৎগুরু লাভ হইবে, তবে আমার আশীর্বাদ সর্বদা থাকিবে।' এ কথা কত সত্য তা ইদানীং দেবেন মহারাজ প্রতি মুহূর্তেই জানিতে পারিতেন। যা হউক, সে সময় আমার কলিকাতার বাসভবনে তিনি প্রতি সপ্তাহে ২।১ দিন করিয়া আসিতেন এবং বড় মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর) কৃপার কথা নানাভাবে আমাকে জানাইতেন। স্বপ্নে বা ধ্যানে তিনি যে কত উপদেশ এবং আদেশ পাইতেন, তাহা আমাকে প্রায়শঃই বলিতেন।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কি করিব এইরূপ চিন্তায় আমরা অস্থির, তখন হঠাৎ আমরা শুনিলাম যে, স্বামী অভেদানন্দজী চন্দননগরে সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য আসিতেছেন। আমরা দুইজনে যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সুন্দর বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম। পরে দেবেনকে এই সন্ন্যাসীটির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। দেবেন হাসিয়া বলিলেন, 'জান না? ইনিই তো কালী তপস্বী—যাঁর কথা তোমাদের বলতাম, যিনি স্বামী বিবেকানন্দের গুরু-ভাই, দ্বিতীয় বিবেকানন্দ।' অভেদানন্দজীর সহিত পরিচিত হইবার জন্য দেবেনকে বলিলাম: 'চলুন, কলিকাতায় গিয়ে স্বামিজীকে দর্শন করে আসি।'

দেবেন আনন্দে উৎফুল্ল; আমরা দুই বন্ধুতে একদিন মধ্যাহ্নে কিছু ফল লইয়া Edan Hospital Rd.-এ মহারাজকে দর্শন করিতে গেলাম (১৯২৩ খৃঃ)। তখন তিনি সবেমাত্র বিশ্রাম করিতে গিয়াছেন। কিন্তু আমরা দুইজন কিশোর চন্দন-নগর হইতে আসিয়াছি জানিয়া তৎক্ষণাৎ আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং নানাভাবে আমাদের সহিত আলাপ করিয়া আমাদের আসিবার কারণ জানিয়া লইলেন। পরে বলিলেন: 'যখনই সুবিধা হবে, তখনই তোমরা আসবে। আমার Classlecture-এ join করবার সময় ঠিক করে নিলে ভাল হয়। যা না বুঝতে পারবে তা আমার কাছে জেনে নিও।' দেবেন মহারাজ তাহার পর হইতে স্বামিজীর কাছে মধ্যে মধ্যে যাইতে আরম্ভ করিলেন। স্বামিজীর দিব্য সান্নিধ্যে দেবেনের অন্তরে সত্য লাভের স্পৃহা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল।

দু'তিন মাস পরে দেবেন একদিন টীনের বাক্সে তাঁহার কয়েকটি জামাকাপড় ও পুস্তক লইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া বলিলেন: 'ভাই বাড়ী থেকে চলে এলাম, আশ্রমে থাকব।' দুইদিন আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া স্বামিজীর কাছে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। আমি মধ্যে মধ্যে স্বামিজীকে দর্শন করিতে যাইতাম এবং দেবেনের আধ্যাত্মিক উন্নতি লক্ষ্য করিতাম। দেবেনকে একদিন বলিলাম: 'ভাই, মহারাজ তো তোমায় দীক্ষা দিলেন এবং ব্রহ্মচারীও করে দিলেন। আমায় কি তিনি কৃপা করবেন না?' দেবেন বলেন: 'ভাই তোমার কথা ওঁর কাছে বলেছিলাম, বল্লেন—সময়ে সব হয়। তবে (আমার দিকে তাকিয়ে) ওকে গৃহেই থাকতে হবে।'

১৯২৪ খৃঃ মহাষ্টমীর দিন ভোরবেলা মহারাজকে দর্শন করিতে যাইয়া দেবেনের সহিত দেখা হইতেই বলিলেন: 'আজ ২।৩ জন বালকের দীক্ষা হবে,

তুমি কি দীক্ষা নেবে?' আমি যেন হাতে চাঁদ পাইলাম এবং বলিলাম: 'আমি কি শ্রীগুরু মহারাজের কৃপালাভ করবো!' দেবেন বলিলেন: 'কাল রাত্রে তোমার কথা হচ্ছিল, বলছিলেন যে, নির্মল থাকলে কাল ওকেও দীক্ষা দিতাম। তোমার বরাত খুব ভাল, তাই তাঁরই কৃপায় আজ তুমি এত ভোরে এসেছ। যাও একটা কাপড় পরে' চাদর করে এসো—আমি মহারাজকে খবর দিচ্ছি।' সেদিন তাঁহারই কৃপায় আমি মহারাজের কৃপা লাভ করি—এ কথা আমি কোন-দিনই ভুলিতে পারিব না। দেবেন মহারাজের ন্যায় অকৃত্রিম বন্ধু আমি আর কাহাকেও পাই নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সহিত যাঁহারা সংশ্লিষ্ট সকলেই তাঁহার মধুরালাপের সহিত পরিচিত ছিলেন। তিনি একাধারে মহাপণ্ডিত ও কর্মী ছিলেন। 'বিশ্ববাণী' পত্রিকা যাহাতে নিয়মিত নিজ বৈশিষ্ট্য রাখিয়া প্রকাশিত হইতে পারে, তাহার দিকে সদা-সর্বদা দৃষ্টি দিতেন। তাঁহার তিরোধানে বিশ্ববাণীরও মহা ক্ষতি হইল। কতদিন বিশ্ববাণীর Proof sheet লইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া কাজ করিতেন। বলিতেন: 'মঠে সর্বদা লোকজন আসে, ভাল করে প্রুফ দেখবার সময় হয় না। তাই তোমাদের এখানে এসে রথ দেখা, কলা বেচা দুইই করে নিই।'

ইদানীং প্রায়ই বলিতেন: 'ভাই শরীরটা ভেঙ্গে গেছে আর বোধহয় বেশীদিন কাজ করতে পারব না। সুতরাং মঠের বাইরে কোথাও গিয়ে থাকবো। তোমরা মাঝে মাঝে খবরাখবর নেখো। জান তো? মহারাজ আমায় বলেছিলেন, 'যেদিন থেকে মঠের কাজকর্ম করতে পারবে না, সেদিন থেকে মঠে থেক না।' তাই মনে করেছি—গঙ্গার ওদিকে কোন জায়গায় গিয়ে বাকী দিনগুলো জপ ধ্যান করে কাটিয়ে দেব। তোমরা দুই-একজন যারা আমায় ভালবাস মাসে কিছু দিও, আমার কোন রকমে দিন চলে যাবে।'

শরীর খারাপ থাকিলেও যতক্ষণ আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন সদাসর্বদা সৎকথা, ভজন, ছেলেদের সহিত নানান বিষয় গল্প ও নানা দেশের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিতেন। তাঁহার পদার্পণে আমার গৃহ পবিত্র হইত এবং এই অশান্তিময় সংসারে তাঁহার উপস্থিতিতে শান্তির ভাব বিরাজ করিত। গুরু মহারাজের অভাব আমি এই গুরুভায়ের সান্নিধ্যলাভ করিয়া অনুভব করিতাম না। আজ দেবেন মহারাজের অভাবে আমি পুনরায় নূতন করিয়া উভয়েরই অভাব বোধ করিতেছি। প্রার্থনা করি—তাঁহার আত্মা যেন চির শান্তি লাভ করে।

ওঁ শান্তি।

তুমি ও আমি

শ্রীদেবব্রতি ঘোষ

তুমি সুন্দর, চির বিস্ময়
তুমি অপূর্ব, তুমি সদা স্মরণীয়।
আমি অন্ধ, তোমারি আলোকে
অন্তরে হেরি কত তুমি রমণীয়॥

আমি হ'ব ফুল,
তুমি হ'য়ো তাহে সুমধুর গন্ধ।
যদি ব্যথা পাই,
তুমি হ'য়ো সেই ব্যথাতে আনন্দ।

P 30407

সৃষ্টি-রহস্য

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

সৃষ্টি-রহস্যের আলোচনার প্রথমেই বলি সৃষ্টি সম্পূর্ণই কাল্পনিক। তবে কল্পনারও আধার আছে, অর্থাৎ কাকেও বা কোন জিনিসকে আশ্রয় ক'রে কল্পনার উদ্ভব হয়। ব্রহ্মে সৃষ্টি-কল্পনার আশ্রয় বা আধার মায়া বা অজ্ঞান। মায়া বা অজ্ঞানই আসলে সৃষ্টির কারণ, কারণ উপাধিবিহীন নিরুপাধিক ব্রহ্ম কোনদিনই সৃষ্টি-রহস্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নন। যাহা হউক, বিভিন্ন দার্শনিকগণ তিন প্রকারে জগতের সৃষ্টি নিরূপণ ক'রেছেন ও তা থেকে দর্শনশাস্ত্রে তিনটি বাদের উদ্ভব হ'য়েছে, যথা—আরম্ভবাদ, বিবর্তবাদ ও পরিণামবাদ। ন্যায়দর্শনপ্রণেতা গৌতম, বৈশেষিক দর্শন-প্রণেতা কণাদ ও মীমাংসাদর্শনকার জৈমিনি, এঁরাই ছিলেন আরম্ভবাদী, বেদান্তদর্শনকার ব্যাসদেব ছিলেন বিবর্তবাদী বৈদান্তিক এবং সাংখ্যদর্শনকার কপিল ও পাতঞ্জলদর্শনকার পতঞ্জলি ছিলেন পরিণাম-বাদী। আরম্ভবাদী গৌতম ও কণাদের মতে নিত্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণু থেকে দ্ব্যণুক, দ্ব্যণুক থেকে ত্রসরেণু, ও ত্রসরেণু থেকে কতকগুলি অবয়ব ও কতকগুলি অবয়ব থেকে স্থূলাতিস্থূলক্রমে ঈশ্বরের ইচ্ছা-শক্তিবলে এই বিশাল বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। পরিণামবাদী কপিল ও পতঞ্জলির মতে দুগ্ধ বিকার প্রাপ্ত হ'লে যেরূপ তা দধিরূপে পরিণত হয়, প্রকৃতি তদ্রূপ বিকার প্রাপ্ত হ'য়ে মহত্তত্ত্ব ও অহংকারাদি ক্রমে জগৎরূপে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতি অচেতন হলেও চৈতন্যময় পুরুষের চিৎ প্রতিবিম্বিত হ'য়ে ক্রিয়াশীল হয়। পরিণামবাদীদের মত—যে সকল বস্তু রূপান্তরিত হলেও সত্য বলে ব্যবহৃত হয় তাদেরই বিকার বলা হয়—যা পরিণামেরই নামান্তর। দুগ্ধ রূপান্তরিত হ'য়ে দধিরূপে পরিণত হলেও তা সত্য বা সৎ বলে ব্যবহৃত হয়। পরিণামবাদীদের মতে সকল বস্তুই সৎ, কেননা সদ্বস্তু থেকেই সদ্বস্তুর উৎপত্তি হয়, সুতরাং অসৎ বা মিথ্যা কোন বস্তুই নয়।

উপরিউক্ত মতত্রয় থেকে ব্যাসদেব যে পৃথকভাবে উৎপত্তিক্রম নির্দেশ করেছেন তাই বিবর্তবাদ নামে প্রসিদ্ধ। বেদান্তমতে সকল বস্তুই সৎস্বরূপ ব্রহ্মের বিবর্তিত রূপ। সাধারণতঃ উৎপন্ন বস্তুমাত্রই অসৎ বা মিথ্যা, অর্থাৎ ভ্রমের উপাদান মাত্র; সুতরাং যে সকল পদার্থ সৎস্বরূপ ব্রহ্ম থেকে বিবর্তিত বা ভিন্ন তারাও মিথ্যা অর্থে অসৎ। রজ্জুতে সর্প-বুদ্ধি যেমন মিথ্যা, ব্রহ্মে আরোপিত পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্ম থেকে বিবর্তিত ব'লে মিথ্যা বা অসৎ,—ইহাই বিবর্ত-বাদীর মত। এখন বোঝা গেল—নির্গুণ ব্রহ্ম অবিদ্যা বা মায়াশক্তি দ্বারা আবৃত হ'য়ে আকাশাদিক্রমে এই দৃশ্যমান জগৎ ব'লে প্রতিভাত হচ্ছে। বৈদান্তিকগণ বলেন, সৃষ্টির প্রথমে পরমেশ্বর স্বভাবসিদ্ধ বৈচিত্র্যের কারণস্বরূপ প্রাণিগণের কর্ম ও অপরিমিত শক্তি-বিশিষ্ট মায়ার সহিত নামরূপাত্মক সমগ্র বস্তুকে বুদ্ধিতে প্রতিভাত ক'রে "এরূপ ক'রব" এই সংকল্প করেন। শ্রুতিতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টি মনে যখনই উদয় হল "একোঽহম্ বহুস্যাম,"—অর্থাৎ 'এক আমি বহু হব' তখনই সৃষ্টির আরম্ভ; সুতরাং মায়া দ্বারা উপহিত পরমেশ্বরই সৃষ্টির কারণ, অথচ শুদ্ধব্রহ্মে সৃষ্টি নাই। এখন জানা উচিত মায়ার স্বরূপ কি? নিত্যজ্ঞান আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতিচ্ছায়া অর্থাৎ প্রতিবিম্ববিশিষ্ট সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সূক্ষ্ম অবস্থাকে 'প্রকৃতি' বলা হয়। এই প্রকৃতি দুই প্রকার, মায়া ও অবিদ্যা। সত্ত্বগুণের স্বচ্ছতার জন্য প্রথম প্রকারের নাম 'মায়া', এবং সত্ত্বগুণের মালিন্য হেতু দ্বিতীয় প্রকারের নাম 'অবিদ্যা'। উক্ত মায়াতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য

অথচ মায়াকে বশীভূত করে সর্বজ্ঞ, তিনিই ঈশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। আবার উক্ত মায়াতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য যখন মায়ার অধীন হয় তখনই তা জীব। জীব অবিদ্যার বশীভূত। সৃষ্টিকে স্বীকার ক'রলে এ' কথা বুঝতে হবে যে, সৃষ্টির পূর্বক্ষণে পরমেশ্বর প্রথমে সৃজ্যমান সমস্ত পদার্থের নাম ও রূপ বুদ্ধিতে আরোপ করেন। তৎপরে 'বহু' জ্ঞান দ্বারা 'এরূপ করব' ব'লে যেন সংকল্প করেন। অবশ্য প্রাণিগণের কর্ম ও সংস্কারকে সহায় করেই তিনি যেন সৃষ্টি করেন। তখন মায়া-উপহিত পরমেশ্বর থেকে আকাশ প্রভৃতি অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত রূপ গ্রহণ করে ও তাদেরই 'তন্মাত্র' বলা হয়। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটি সূক্ষ্মতন্মাত্র, যেমন আকাশ-তন্মাত্র, বায়ু-তন্মাত্র প্রভৃতি। ঠিক এই অবস্থায় তন্মাত্র পাঁচটির একের সহিত অপরের মিশ্রণ নাই। পাঁচটির মিশ্রণ না থাকাতেই তাদের অপঞ্চীকৃত বলা হয়। এই অপঞ্চীকৃত পঞ্চ তন্মাত্রায় পাঁচটি গুণ আরোপিত দেখা যায়, যেমন আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নির গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই পঞ্চতন্মাত্রে গুণ কল্পনা করলেই তাকে মায়ার কার্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। গুণ আসলে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ; সুতরাং গুণোপাধিক পঞ্চতন্মাত্রকেও ত্রিগুণাত্মক বলে কল্পনা করা হয়। আকাশের গুণ অর্থাৎ সত্ত্বগুণ থেকে শ্রোত্রেন্দ্রিয়, বায়ুর সত্ত্বগুণ থেকে ত্বগিন্দ্রিয়, তেজের সত্ত্বগুণ থেকে চক্ষুরিন্দ্রিয়, জলের সত্ত্বগুণ থেকে জিহ্বেন্দ্রিয় ও পৃথিবীর সত্ত্বগুণ থেকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু আকাশাদি গুণাত্মক হলেও জড়ের উৎপাদক বলে তাতে তমোগুণের প্রকাশ অধিক থাকে, সেজন্য সত্ত্বাদিগুণের কার্য প্রকাশাদি ধর্ম আকাশে পরিলক্ষিত হয় নাই। আকাশাদির সাত্ত্বিক অংশ মিলিত হয়ে মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত উৎপন্ন হয়,—যা অন্তঃকরণ নামে অভিহিত। মন সংকল্প-বিকল্পাত্মক, বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক, অহংকার অভিমানাত্মক ও চিত্ত অনুসন্ধানাত্মক। আবার আকাশের রজোগুণ থেকে বাক্যেন্দ্রিয়, বায়ুর রজোগুণ থেকে হস্তেন্দ্রিয়, তেজের রজোগুণ থেকে পাদ-ইন্দ্রিয়, জলের রজোগুণ থেকে পায়ু-ইন্দ্রিয় এবং পৃথিবীর রজোগুণ থেকে উপস্থ-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়েছে। সমুদয় পঞ্চভূতের রজোগুণের সমষ্টি থেকে প্রাণ উৎপন্ন। প্রাণ বৃত্তিভেদে পাঁচ প্রকার :—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। নাসিকাস্থিত বায়ুর নাম প্রাণ, পায়ুস্থিত বায়ুর নাম অপান, উদরস্থ দ্রব্যের পচনকারী বায়ুর নাম সমান, কণ্ঠস্থিত বায়ুর নাম উদান এবং সমস্ত শরীরব্যাপী বায়ুর নাম ব্যান। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি—সপ্তদশ অবয়বের নাম সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীর। মলিনসত্ত্বপ্রধান মায়া তথা অবিদ্যার নাম কারণশরীর এবং সেই কারণশরীরে অভিমানী জীবসকলকে 'প্রাজ্ঞ' বলা হয়, সুতরাং মলিনসত্ত্বপ্রধান অবিদ্যাতে উপহিত যে প্রাজ্ঞ, লিঙ্গশরীরে অভিমানবশতঃ তৈজস ও বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান মায়াতে উপহিত যে ঈশ্বর, লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম-শরীরে অভিমানবশতঃ 'হিরণ্যগর্ভ' শব্দে কথিত হন। তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ উভয়েই লিঙ্গশরীরাভি-মানীরূপে সমান হলেও উহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ব্যষ্টিলিঙ্গশরীরাভিমানীর নাম তৈজস এবং সমষ্টি-লিঙ্গশরীরাভিমানীকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। এই হিরণ্যগর্ভই ভাগবত মতে ব্রহ্মা। হিরণ্যগর্ভ লিঙ্গশরীরোপাধিবিশিষ্ট সমুদয় তৈজস জীবদিগের সহিত আপনাকে অভেদ জানেন বলে সমষ্টি এবং সেই জ্ঞানের অভাব হেতু তৈজসসকল ব্যষ্টি শব্দে অভিহিত।

মোট কথা, অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত থেকে পঞ্চীকৃত ভূতসকলের আবির্ভাব হয়। শ্রুতিতে আছে: 'তাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ (ত্র্যাত্মক বা তিন বিশিষ্ট) করিব।' (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬ষ্ঠ প্রপাঠক,

৩ খণ্ড ৩)। এখানে ত্রিবৃৎকরণ (তিনের মিশ্রণ) দ্বারা পঞ্চীকরণই (পাঁচটির মিশ্রণ) বুঝাচ্ছে। পূর্বোক্ত প্রাজ্ঞ প্রভৃতির ভোগের নিমিত্ত ভোগ্য অন্নপানাদি ও ভোগের স্থান জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি চতুর্বিধ শরীরের উৎপত্তিবিধানার্থ ঈশ্বর সেই সকল আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেককে পঞ্চপঞ্চাত্মক করলেন, অর্থাৎ নিম্নোক্ত অংশ অনুসারে মিশ্রিত করলেন। যেমন,

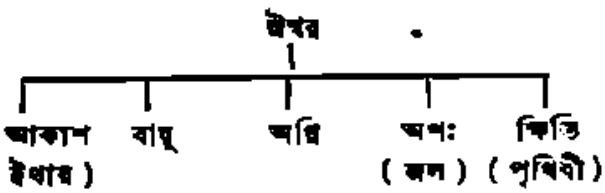

অর্থাৎ ঈশ্বর থেকে পঞ্চভূত। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, আপ ও ক্ষিতি প্রথমে সূক্ষ্মাকারে উৎপন্ন হয় এবং তৎপরে, পঞ্চীকরণ দ্বারা তা স্থূল ভূতে পরিণত হয়।

পঞ্চীকরণ-বিধি :—আকাশাদি প্রত্যেক পঞ্চভূতকে প্রথমতঃ দুই অংশে বিভক্ত করা হয়, এবং তৎপরে সেই দুই দুই অংশের এক এক অংশকে চারি চারি খণ্ড করে স্বীয় স্বীয় অংশ পরিত্যাগপূর্বক অন্য চারি ভূতের প্রথমোক্ত অর্ধ অর্ধ অংশে সেই চারি অংশের এক এক অংশ যোগ করলে সকল ভূত প্রত্যেকেই পঞ্চ পঞ্চ হল। এরই নাম পঞ্চীকরণ :

আকাশ :—½ আকাশ + ⅛ বায়ু + ⅛ জল + ⅛ অগ্নি + ⅛ পৃথিবী।

পৃথিবী :—½ পৃথিবী + ⅛ আকাশ + ⅛ বায়ু + ⅛ জল + ⅛ অগ্নি।

জল :—½ জল + ⅛ আকাশ + ⅛ বায়ু + ⅛ অগ্নি + ⅛ পৃথিবী।

বায়ু :—½ বায়ু + ⅛ আকাশ + ⅛ জল + ⅛ অগ্নি + ⅛ পৃথিবী।

অগ্নি :—½ অগ্নি + ⅛ আকাশ + ⅛ বায়ু + ⅛ জল + ⅛ পৃথিবী।

এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত থেকে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। সেই ব্রহ্মাণ্ডে ভূলোকাদি পাতাল পর্যন্ত চতুর্দশ ভুবন ও ভোগ্য পদার্থ এবং ভোগের উপযুক্ত শরীরসকল উৎপন্ন হয়। সেই স্থূল শরীরের সমষ্টিতে অভিমানী হিরণ্যগর্ভের 'বৈশ্বানর' বা 'বিরাট' সংজ্ঞা হয় এবং ব্যষ্টিতে অভিমানী চৈতন্যের 'বিশ্ব' সংজ্ঞা হয়, অর্থাৎ দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতিকে 'বিশ্ব' বলা হয়। এই সকল বিশ্বাদি চৈতন্য আবার অন্ন-প্রাণাদি দ্বারা অভিমানী হয়। এই অভিমানই আবরণ। এই আবরণকে 'কোষ' বলা হয়, যেমন স্থূলশরীরের নাম 'অন্নময়কোষ'। কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণাদি বায়ু পঞ্চকের নাম 'প্রাণময়কোষ', কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত মনের নাম 'মনোময়কোষ', জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধির নাম 'বিজ্ঞানময়কোষ' এবং সংসারের মূলীভূত অজ্ঞান বা অবিদ্যাকে 'আনন্দময়কোষ' বলা হয়। এই পঞ্চকোষ আত্মা নয়, অভিমানাত্মক অহং। বিজ্ঞানময়কোষের অভিমানী আত্মা জ্ঞানশক্তিমান, কর্তৃরূপ; ইচ্ছাশক্তিমান মনোময়কোষ করণস্বরূপ; ক্রিয়াশক্তিমান প্রাণময়কোষ কার্যরূপ এবং মিলিত মনোময়, প্রাণময় ও বিজ্ঞানময়কোষকে লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর বলা হয়। লিঙ্গশরীর আবার পর ও অপর এই দুটি নামে অভিহিত। হিরণ্যগর্ভের সূক্ষ্ম শরীরকে পর ও মহত্তত্ত্ব এবং আমাদের লিঙ্গশরীরকে অপর ও অহংকারতত্ত্ব বলা হয়। হিরণ্যগর্ভই সৃষ্টির প্রথম জীব। প্রলয়ে পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ জীবাহঙ্কারে, জীবাহঙ্কার হিরণ্যগর্ভাহঙ্কারে ও হিরণ্যগর্ভাহঙ্কার অবিদ্যায় লয় হয়। আসলে ব্রহ্ম জগতের উপাদান অথচ ব্রহ্মে জগৎ নাই। সুতরাং একথা ঠিক যে, জগতের বাস্তব সৃষ্টি নাই, তবে আপাতসত্যতা আছে। আপাতসত্য বলতে যতক্ষণ ব্রহ্মের উপলব্ধি না হয় ততক্ষণ জগতকে সত্য ব'লে মনে হয়, কিন্তু উপলব্ধি হলে বোঝা যায়, ব্রহ্ম ছাড়া জগতের পৃথক অস্তিত্ব নাই। আচার্য

সংকরও জগতের ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করেন জীবের অজ্ঞানাবস্থা পর্যন্ত, কিন্তু জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে পারমার্থিক সত্যস্বরূপ ব্রহ্মেই সত্যতা উপলব্ধি হয়। তখন জগতকে মিথ্যা বলে মনে হয়—অর্থে জগৎ ব্যবহারিক সৎ বা প্রাতীতিক সৎ মাত্র, কিন্তু পারমার্থিক সৎ নয়। ত্রৈকালিক সৎ একমাত্র ব্রহ্মই। মায়াহীন ব্রহ্মে মায়ার আরোপই সৃষ্টি এবং সৃষ্টি-রহস্যের এটাই আসল কথা। সৃষ্টি যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই স্রষ্টা ঈশ্বরের কল্পনা, কিন্তু ব্রহ্মে মায়ার স্থান নাই। তাই আসলে মায়ার কল্পনা করা হয় দ্বিতীয় স্তরে ঈশ্বরে বা সুষুপ্তিতে—যেখানে কারণোপাধিক ব্রহ্মচৈতন্যের কল্পনা। তবে এখানেও সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টির বীজ এখানে মাত্র প্রসুপ্ত থাকে। সৃষ্টির বিকাশ বাস্তবে পরিণত হয় হিরণ্যগর্ভ থেকে, আর তাঁকেই ঠিক সৃষ্টির ঈশ্বর বা স্রষ্টা বলা হয়। অদ্বৈত বেদান্তে সৃষ্টিরহস্যের এটিই মূলকথা। ব্রহ্মের দিক থেকে স্রষ্টাও নাই, সৃষ্টিও নাই এ' দুটিই আছে মায়া-উপহিত ব্রহ্মে—কারণ ও কার্য ব্রহ্মে—ঈশ্বরে ও হিরণ্যগর্ভে। ব্রহ্ম তুরীয়চৈতন্য—তাও তার তুরীয় বা চতুর্থ এই উপাধি দেওয়া হয় তৃতীয় অব্যক্তচৈতন্য ঈশ্বরকে লক্ষ্য ক'রে। আসলে উপাধি বা কল্পনার স্তর তিনটিই—অব্যক্ত বা ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট। মায়ার লেশমাত্রবিহীন নিরুপাধিক ব্রহ্ম সকল অভিধান, নাম বা উপাধির অতীত; তাতে সৃষ্টি নাই, সৃষ্টির রহস্যও নাই, কিংবা সৃষ্টি-রহস্যের সমাধানের কথাও নাই। সৃষ্টির রহস্য-কথার আরম্ভ কাল্পনিক মায়ার সীমানা থেকে, শুদ্ধ বা কেবল ব্রহ্মে মায়ার লেশ নাই সুতরাং সৃষ্টি নাই।

ঝাড়গ্রামের লোকসংগীত

শ্রীঅংশুমান রায়

(পাতানাচের গান)

বাংলাদেশ তার লোকসংগীতের জন্য বিখ্যাত। দেশে বিদেশে সমাদৃত তার সুর আর ভাবের বৈচিত্র্যের জন্য। বিভিন্ন জায়গায় দেশ-কাল-পাত্র ভেদে কত রকম রকম লোকসংগীত! নদীর বুকে জ্যোৎস্নালোকোদ্ভাসিত আলোছায়ার বৈঠার তালে তালে মাঝির কণ্ঠ-নিসৃত যে ভাটিয়ালী তা যেমন মধুর তেমনি দূর হতে ভেসে একতারা হাতে যে বাউলের গান তাও শুনতে তেমনি মধুরই লাগে।

বাংলার অন্যান্য জায়গার মত ঝাড়গ্রামেও বিভিন্ন ধরণের লোকসংগীত আছে—বিশেষ করে মাহাতোদের মধ্যে যেমন, 'পাতানাচের গান', 'ভিন্না ফুলের গান', 'ভাদু গান', 'টুসু গান', 'ভাওয়াইয়া', 'ঝুমুর', 'টুসু গান' 'জারিগান'—এমন আরও অনেক প্রকার। এখানে 'পাতানাচের গান' নিয়েই আলোচনা করব। একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, কয়েক পুরুষ ধরে এখানে (ঝাড়গ্রামে) আমাদের বাস। মাহাতদের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে মেলবার সুযোগ আমার হয়েছে। আমি মুগ্ধ হয়েছি ওদের বিভিন্ন ধরণের লোকসংগীত শুনে, তৃপ্তি পেয়েছি ওদের গানের সংগে ঘুরা ধরতে পেরে। কাজেই এই লোকসংগীতগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করতে চাই তাঁদের যাঁরা এগুলি সম্পর্কে জানতে চান, কিন্তু জানার সুযোগ পান না। যাই হোক এই প্রসংগে আরও একটা কথা বলে রাখি—যে গানগুলি এখানে উদ্ধৃত হবে সেগুলি

যেমন উচ্চারণে শুনেছি ঠিক সেইরকম ভাবেই লিখতে চেষ্টা করেছি। তবে যদি কোন মাতৃভাষী বন্ধু এতেও কোন ত্রুটি পান তবে তিনি যেন তা নিজগুণে মার্জনা করেন।

এখন আলোচনা করা যাক এখানের এই লোক-সংগীতগুলি কী ভাবে সৃষ্ট হয়। সবচেয়ে মজার কথা এগুলির রচয়িতার কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় না। কে এবং কখন যে এই সংগীতের কথাগুলি বেঁধেছিলেন তা জানা মোটেও সম্ভব নয়। সাধারণতঃ পুরুষানুক্রমে মুখে মুখেই এগুলি বেঁচে থাকে। তবে কোন কোন গানে, বিশেষ করে 'স্নেহতত্ত্বের গান'-এ রচয়িতার নাম গানের সংগেই পাওয়া যায়। যেমন, 'কাশিরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান' অথবা 'কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি' ইত্যাদিতে আমরা গানের বাণীর সংগে সংগে রচয়িতার নাম পেয়ে থাকি। এইভাবে রচয়িতার নাম দিয়ে যে সমস্ত গান শেষ হয়, সেগুলির শেষের সে অংশে ঐ নামের সংগে ঐ ব্যক্তির কেনে challenge বা বিনয় থাকে তাকে এঁরা বলেন 'ভণ্ডা'। যাই হোক এ ধরণের গানের সংখ্যা বেশ কম। আর কম থাকাই স্বাভাবিক কারণ নিজের নামের সংগে মিল রেখে গান রচনা করার যে ক্ষমতার প্রয়োজন তা সমস্ত গ্রাম্য কবির কাছে আশা করাও যায় না। যাই হোক এগুলির সৃষ্টির পরিবেশ সম্বন্ধে আমি যেটুকু খোঁজ নিয়েছি তাতে জেনেছি যে, সাধারণতঃ এইরকম ভাবেই তৈরী হয় এই লোকসংগীতগুলি। যেমন, 'কেউ হয়ত চলেছে কোন বনপথ ধরে। পথিপার্শ্বে শালগাছের কচি কিশলয় আর লাল রঙের কলির মধ্যে একটা মিল পায়। হঠাৎ মনে পড়ে বন্ধুরও তো একটা লাল গামছা আছে!'—এই হঠাৎ ভাবের ঐক্যতান রূপ নেয় গানে—

শাল গাছে লাল পলাড়া, কদম গাছে কলি রে
বঁধার (বন্ধুর) গাছে লাল গামছার,
ছটক দেখে মরি রে।

এখানে বেশ বোঝা যায় যে, আসলে এঁরা প্রকৃতির পূজারী। গ্রাম্য কবির তৈরী তাই হয়ত ভাষার চটক নেই।

প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে যে একটি বিশিষ্ট রূপ আছে তার সন্ধান নিতে চেষ্টা করেছেন কোন কোন গীতিকার। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে একটি ঘটনা। একদিন এমনই একটি গান গীত হবার পর যখন গায়িকাটীর কাছে জানতে চাইলাম এটি আগে তাঁর জানা ছিল কিনা। তখন উত্তরে যা শুনলাম তাতে বুঝলাম এই গানটি এইমাত্র জন্মলাভ করল। হয়ত তখনই তার মৃত্যু হোল। আর হয়ত কোনদিন শোনা যাবে না ঐ গানটি; তবু তার ভাবটি ছিল বড় মনোরম—'পশ্চিমের লাল আকাশের সংগে রং মিলিয়ে বাঁধের ঐ যে লাল পদ্ম ফুলটি ফুটে উঠেছে, ওগো বিদেশী পথিক, ঐটি আমার এনে দাও! আর আমি তা মাথার পরে' আমার স্বামীর কাছে যাব।' বলা বাহুল্য, পশ্চিম আকাশে সূর্য তখন অস্তপ্রায়। আর আমায় উত্তর দিতে গিয়ে ঐ লাল আকাশ আরো লাল পদ্মফুলের মত নিজেকেও বাড়িয়ে ফেলেছিল। যাক যা বলছিলাম, এর থেকে বোঝা যাবে কত সাবলীল ভাবে সৃষ্ট হয় এই লোকসংগীতগুলি। প্রশ্ন উঠতে পারে সুর নিয়ে। কিন্তু এঁদের এই লোক-সংগীতগুলির মধ্যে সুরের যে বৈচিত্র্য তা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কাজেই এক শ্রেণীভুক্ত গানগুলির সুর প্রায় একই রকম হয়ে থাকে।

ঠিক এমনই একটি লোকসংগীত 'পাতা' নাচের গান। 'পাতা' কথাটা পংক্তি কথা থেকে এসেছে। আসলে 'পাতা' কথাটির মানে বোঝা যাবে এঁদের ঐ গানের সংগে নাচের পদ্ধতি দেখলে। প্রথমে একজন মূল গায়েন একটি গান করেন। তারপর তার ধুয়া ধরে অন্যেরা সারি বেঁধে মাদলের তালে তালে নাচ করেন। মাদল বাদকের দল এবং মূল গায়েন প্রকৃতির কেন্দ্র করে অনেকটা অর্ধ বৃত্তাকার রচনা করে ঘুরে ঘুরে নাচা এই নাচের পদ্ধতি।

এই গানের সংগে যে তাল থাকে তা অনেকটা ঝুমুর তালের মত। মধ্যলয়েই সাধারণতঃ গাওয়া হয়। একবার একটি গান মূল গায়েন গেয়ে দিলে বেশ কিছুক্ষণ ধরে অন্যেরা তার ঘুরা ধরে ঐ গানটিরই Repetition করে যান। বলা বাহুল্য, সংগে নাচ চলতে থাকে। পরে 'হেহাই' দিয়ে নাচ শেষ হয়। এই পাতা নাচের একটি গান এইরকম :

এক মুঠা সুরগুজা
বু-উ নিলাম গটা বিঘা
সুরগুজা ফুইটে লালে লাল গো সজনী—
সুরগুজা ফুইটে লালে লাল ॥

দেখা যাক মানে করলে কি দাঁড়ায়।—'এক বিঘা পরিমাণ ভূমিতে এক মুঠা সুরগুজা ফুলের বীচি ছড়িয়ে দিলাম।' প্রথম দুটি লাইনের মানে ঐ রকম। কিন্তু কবির চিন্তা ঐখানেই থেমে যায় নি। তিনি ঐটুকুতেই সন্তুষ্ট হননি। ঐ ফুলের বীচি থেকে একদিন অঙ্কুরিত হবে জমি-ভর্তি ঐ ফুলের গাছ। তারপর প্রতিটি গাছে লাল সুরগুজা ফুল ফুটে চারিদিক আলোকিত করে দেবে। শেষের দুটি লাইনে কবি ঐ সম্ভাবনাকেই মানসচক্ষে দেখে বলেছেন, 'সুরগুজা ফুটে চারিদিক লালে লাল হয়ে গেছে গো সখী, সুরগুজা ফুটে চারিদিক লালে লাল হ'য়ে গেছে!'

আমি আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এই গীতিকাররা গ্রাম্য। একান্ত গ্রাম্য। চোখের সামনে দিনের পর দিন যে বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করছেন তাই গানের ছন্দে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। এই ধরণের গানগুলি মনে করিয়ে দেয় প্রকৃতির কবি ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থকে। তিনিও প্রকৃতির ক্ষুদ্র সৃষ্টিতে আবিষ্ট হতেন। তাঁরও মনে রেখা কাট্‌ত ডেফোডিল ফুলের বন। কিন্তু তিনি সেই ডেফোডিলের মহিমা যেভাবে শ্রোতাদের শুনিয়েছেন, এই গ্রাম্য কবিরা তা পারেন নি। কে বলতে পারে সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর ঐ গ্রাম্য কবি যিনি হয়ত একাধারে চাষী, অন্ধকার কুঁড়ে ঘরে তাঁর মন থেকে মশার কনসার্ট মিলিয়ে গিয়ে সেখানে ঐ লাল সুরগুজার গুঞ্জন উঠত না? কে বলতে পারে দিনের আলোয় ঐ গানের সংগে যে নাচ তিনি নেচেছেন তা কোন এক অলস অবসরে আবার তাঁর মনে নাচন লাগাত না?

যাক আবার আসল কথায় আসা যাক। এই পাতা নাচের গানগুলি এইরকম ছোট ছোটই হয়ে থাকে। একটি চরণেই একটি গান শেষ হয়ে যায়। আয়তনে ছোট হলেও কোন কোনটি যে ভাবের ক্ষেত্রে অসীম তা তো একটু আগেই দেখালাম। সোম্পদে চন্দ্রবিম্ব দেখার মতন যেন ঐ পাতা নাচের গানগুলি।

শুধু যে প্রকৃতির বিশিষ্ট রূপ নিয়েই এই গানগুলি হয় তা নয়। জীবনের সুখ-দুঃখ মান-অভিমান নিয়েও এই পাতা নাচে প্রচুর গান আছে। যেমন এইটি—স্বামী রতনমণির উপর তার স্ত্রীর অভিযোগ অনেক। তাই সে একদিন বলে ফেলল, 'কি করবে রতনমণি, আজ যাছা যোরগ মারব।' আক্ষেপ করে, 'আমাদের মিলন যেন 'খাল বাটনার' মত হয়েছে। ও ভাবে বৌ যেন ওর বাপ-কালের সম্পত্তি।' এই ভাবটি নিয়েই এই গানটি :

কি করিবে রতনমণি-
কুকড়া মরাব ধনি
খাল বাটনায় হইয়েছে মিলন গো
বহু যেন বাপ-কেইলা ধন ॥

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই যে মন কষাকষি তা আর কোন সংসারে নেই। কিন্তু কথা তা নয়। অভিযোগ আছে এবং থাকবে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, তার প্রকাশের মাধ্যম নাচ আর গান। আনন্দের মধ্য দিয়ে এই যে প্রকাশ, তার যে একটা সুফল আছে তা সর্বজনস্বীকার্য। এই ধরণের আর একটি গান :

ডালে বসে কালো কোকিল,
সে যে বোবা হইয়ে গেছে গো।
এখন কেন চিনবে বঁধু,
সুখের সময় গেছে ॥

গানটির মানে সোজা। 'দুখের পায়রা'র মত অকৃতজ্ঞকে স্মরণ করেই এই গান রচিত হয়েছে।

দৈনন্দিন জীবনে বাস্তব ক্ষেত্রে যা ঘটে চলেছে তা নিয়েও গীতিকার গান বেঁধেছেন। 'কাঁধে কোদাল আর হাতে খড় দিয়ে পাকান আগুনের বেণীটি নিয়ে মনের মত লালপাতার তৈরী বিড়িটি খেয়ে আমি মাঠে আলের কাজ করব।' চাষীর এই উক্তিটিই রূপ নিয়েছে গানে :

কাঁধে লিব কদালটি
হাতে লিব খুঁদিটি
মনের মত খাঁয়ে লিব ছুটিটি
লহকে ধরিব আড় ছুটি।

পাতা নাচের গানে সাধারণতঃ একটির সংগে অপরটির কোন Link পাওয়া যায় না। কিন্তু এমন কতকগুলি গান পাওয়া গেছে যেগুলি মনে হবে একটির সঙ্গে অপরটির একটা সামঞ্জস্য রেখেই যেন তৈরী হয়েছে। আসলে এমনটি যে হয়েছে তাকে হয়ত নেহাৎ একটা Accident বলা যায়। উপরের গানটির সংগে মিল রেখে তৈরী হয়েছে বলে মনে হবে নীচের এই গানটি :

হিড়ে হিড়ে যাতেছিলাম্
পিছলে পড়িয়ে হোলম
খালভরাদের বাইসম ভাত সকল
পড়ে গেল গো—
ডরেতে অন্তর কাঁপে গেল।

গানটি একটি গ্রাম্যবধূর জবানীতে তৈরী। আগের গানটিতে দেখা গেল চাষী মাঠের কাজ করতে গেল। হয়ত সে অনেক তোরে গেছে। এখনও হয়ত সে অভুক্ত আছে। কাজেই তার স্ত্রী চলল তার স্বামী দেওরের সকালের খাবার নিয়ে।— 'যাচ্ছিলাম মাঠে আলের উপর দিয়ে। হঠাৎ পিছলে পড়ে গেলাম। হতভাগা স্বামী দেওরের সবার খাবার সব পড়ে গেল। ভয়ে অন্তর কেঁপে গেল।' সহজেই বোঝা যায় ঐ ভীতিমূলক উচ্চারণ 'ডরেতে অন্তর কাঁপে গেল' কিন্তু সংগে গালি দেবার একটু ইচ্ছা 'খালভরাদের বাইসম ভাত' তা কতখানি বাস্তব ঘেঁষা।

পরব-পার্বণ নিয়েও গান আছে এই পাতা নাচে। যেমন,—

যখন উঠে ইন্দ্রটি
তখন ভাঙ্গে নিদটি
ও হাতি চলে চুমকি চুমকি
ও ঝাড়গাঁর গড়ে॥

গীতিকার এই গানটি লিখেছেন এখানের একটি বিখ্যাত পরব স্মরণ করে। পরবটি হোল 'ইন্দ্র'। ইন্দ্রের পুজো করা হয়। পুজোর সময় মধ্যরাত্রি। একটি মোটা লালদণ্ড সোজা খাঁড় করান হয়। পরে মাচানের উপর পুজো করা হয়। যাই হোক, এখন উপরিউক্ত গানটি বোঝা সহজ হবে।—'যখন ইন্দ্র কাঠটি উঠে তখন আমার নিদ্রা ভেঙ্গে যায়। (ঐ উৎসবে) হাতী চুমকি চুমকি ছন্দে চলে ঝাড়গ্রামের গড়ে।' এক কালে ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ী নাকি বিরাট এক গড়ের মধ্যে ছিল। এখনও তার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এখানে ঐ গড়ের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

চাষ আবাদ নিয়ে তৈরী একটি গানে লক্ষ্য করার মত। যেমন,—

আষাড়ে বু-উনিলাম ধান শ্রাবণে গাছি।
চল মোরা দুটি ভাই সন্ধাসে বাইরাব;
মা বলে, 'বাছা বাছা' বাপে বলে, 'দুর'—
চল মোরা সন্ধাসে যাইরাব॥

—'আষাঢ় মাসে ধান বোনা হ'ল। শ্রাবণ মাসে চারা লাগান হ'ল। চল এখন আমরা দুটি ভাই সন্ধাসে বেরিয়ে যাই। মা বলে 'আহা বাছারে আমার' বাবা বলেন, 'বেশ বেরিয়ে যাও।' চল আমরা সন্ধাসেই বেরিয়ে যাই'।

কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে প্রচুর গান এই পাতা নাচে আছে। এই ধরণের একটি গান সম্বন্ধে একটু ইতিহাস আছে। ইতিহাস বললে ভুল হবে আসলে

এটিকে প্রচলিত প্রবাদ বলাই ঠিক হবে। যাই হোক কাহিনীটি এইরকম,—

নারদ একবার শ্রীকৃষ্ণকে বললেন,—'মামা, তোমার তো ষোলশত গোপিনী। তার ভেতর থেকে আমায় একটি দাও না।' উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, —'বেশ তো। এ' আর বেশী কথা কি। তবে একটি সর্তে আমি তোমায় একটি গোপিনীকে দিতে পারি। সর্তটি হ'ল, যে কুঞ্জে আমি উপস্থিত থাকব না, সেই কুঞ্জের গোপিনীকে তুমি নিতে পার।'

নারদ তো আনন্দে আটখানা। 'বৃন্দাবনে এত কুঞ্জ। এর মধ্যে কি মামার অনুপস্থিতিতে একটি গোপিনী নিতে পারব না!' কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল যে নারদ যে কুঞ্জেই যান সেই কুঞ্জেই শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান। প্রত্যেক গোপিনীর সংগেই শ্রীকৃষ্ণ আছেন।—এই কাহিনীর উপর ভিত্তি করে নীচের এই গানটি সৃষ্ট হয়েছে। যেমন,—

যত বিই তেত গোপী হেরিলি—
গো নারদ সরমে পোরলি
শপত পা তলে থাকি
অয় দিছে আপনি লীলাবরণী॥

এই পর্যায়ের অপর একটি গান। যেমন,—

আমি তোমার মনের মতন
তুমি কি আরই মতন
আমি তুমার তুমি কি আমার
হবে ললিতে?

আর একটি। যেমন,—

হারিলে হার দিব জিতিলে মুরলী দিব,
আর দিব বনফুলের মালা
ললিতাগো আরো দিব বনফুলের মালা॥

উপরি উক্ত দুটি গানই শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলছেন। বলা বাহুল্য, ললিতাই এখানে রাধা। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। এক ধরণের লোক আছেন যাঁরা একটু ধার্মিক। কাজেই তাঁদের কাছে ঐ গান দুটির অর্থ বুঝতে গেলে তাঁরা একে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কথাই বলেন। কিন্তু ঐ একই গানের অর্থ আমি বিভিন্ন ধরণের লোকের কাছে বিভিন্ন রকম শুনেছি। ভক্তের কাছে ঐ একই গানের ব্যাখ্যা শুনেছি একেবারে উল্টো রকম। সে বলে, কোথায় কোন এক প্রেমিক তার প্রিয়াকে স্মরণ করে ঐ গান-গুলি রচনা করেছিলেন। যাই হোক, যিনি যে ভাবেই নিন না কেন, এর প্রত্যেকটিরই যে একটি বিশিষ্ট ভাব আছে তা সহজেই অনুমেয়।

পাঁতা নাচে এই পর্যায়ের আর একটি গান, যেটিকে 'কৃষ্ণলীলার গান' বলে মেনে নেবার যথেষ্ট যুক্তি রয়ে গেছে। তার কারণ এর ভাষার মানে, যা থেকে ঐ কথাটি বোঝা যাবে। যেমন,—

কালিয়া বরণ যার
কালো বাঁশী হাতে তার
গেল বাঁশী কুলে দাগা দিয়ে॥

গানটির প্রথম দুটি লাইনে যে পরিষ্কার কৃষ্ণের কথাই বলা হয়েছে সে বিষয়ে কোন মতভেদ হবে না। কিন্তু শেষের লাইনটি?—জানি না এটি শ্রীকৃষ্ণের 'বাঁশীর সুর' আর রাধার 'ব্যাকুল মন'কেই বুঝিয়েছে কিনা!

এ ধরণের অসংখ্য 'পাঁতা নাচের গান' আছে যা সমস্ত লিখে শেষ করা সম্ভব নয়। এই পাঁতা নাচের গানের আর একটি শাখা আছে যা 'ঝিঙা ফুলের গান' নামে পরিচিত। সে সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রইল। একটি কথা বলা হয়নি যা না বললে 'পাঁতা নাচের গান' সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বলা হবে না। তা হোল বছরের কোন্ সময় এই গান ও নাচ হয়। সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি থেকে আশ্বিনের প্রথম পর্যন্ত এই গান ও নাচ করবার রেওয়াজ। সকাল সন্ধ্যা যে কোন সময় গাওয়া যায়। এই নাচ করবার জন্য যে বেশ তা অত্যন্ত সাধারণ। কেবল একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলেই হোল।

'গীতাঞ্জলি'র সাধনা

শ্রীঅবনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমার রচনার মধ্যে যদি কোন ধর্মতত্ত্ব থাকে তো তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ; যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত, আর একদিকে অদ্বৈত; একদিকে বিচ্ছেদ আর একদিকে মিলন; একদিকে বন্ধন, আর একদিকে মুক্তি।"

'গীতাঞ্জলি'র মধ্যে এই অনন্ত মহিমার সুরটিই ধ্বনিত হইয়াছে, গীতাঞ্জলির সাধনায় অবিচ্ছেদ্য অভেদ্য বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির মধ্যে আনন্দঘনের লীলাসৌষম্যের রাগিণী। প্রকৃতির লীলাচঞ্চল স্পর্শের বিদ্যুৎকণা অনুভূতিই কবির প্রাণে অনুপ্রেরণা আনিয়াছে, আত্মাভিব্যক্তির উদ্দাম বাসনা, দুর্লঙ্ঘ্য আহ্বান; সৃষ্টি প্রতিভার উদ্দীপনা, অতুল ব্যাকুলতা অনন্তভাবের প্রচাপে রূপায়িত হইয়াছে। মানব জীবনের সমগ্রতার, রূপের মাঝে অরূপের ব্যঞ্জনার প্রেরণার অব্যক্ত আনন্দের উত্তুঙ্গতার গীতাঞ্জলির ভাবধারা উচ্ছল, উজ্জ্বল। গীতাঞ্জলির গীত এজন্য মাধুর্যপূর্ণ, সুখস্রাব; অঞ্জলি-নৈবেদ্য।

'গীতাঞ্জলি'র গীতিসাধনা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ভারতের অধ্যাত্মসাধনার সুর কবির কণ্ঠে কবির উদাত্ত স্বরে ধ্বনিত হইয়া বিশ্বের মাঝে ছড়াইয়া গিয়াছে, কবির অন্তর্দেবতা বিশ্বাত্মার একাত্মতা লাভ করিয়াছে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক যোগ কবিকে নানাভাবে নানারূপে সুর মিলাইতে আহ্বান জানাইয়াছে। কবি দুঃখে সুখে, আশা-নৈরাশ্যে, মিলন-বিরহের মধ্য দিয়া ভূমানন্দের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, আত্মোপনিষদ উপলব্ধি করিয়াছেন।

'গীতাঞ্জলি'র সাধনা অসীমের সঙ্গে সসীমের মিলনেই সসীমের পূর্ণতা, প্রেমাস্পদের সঙ্গে কবিতার মিলনেই বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের সার্থকতা। পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের জীবাত্মার চলার পথকে যে সকল বাধা আসিয়া বহুল করিয়া তোলে তাহাদের মধ্যে 'অহংকার'ই সর্বপ্রধান এই অহংকারই আত্মোপলব্ধির বাণী, প্রেমাস্পদের সঙ্গে কবিতার দুস্তর ব্যবধান প্রণেতা। "অহংকারঃ বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।" এইহেতু, এই অহংকার পাপমুক্ত হইয়া রমণের সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষায় কবি প্রথমেই গাহিলেন, 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে—'

প্রকৃতির লীলার ভাব-বিলাস বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রকৃতির নিয়ন্তাকে সহায়তা করিতে ষড়রিপুর বন্ধুকরী প্রভাব স্বীকার্য। কবি ষড়রিপুর বন্ধনে জড়িত হইয়া সত্তার অবমাননা করিতে চাহেন না, প্রার্থনা করেন করুণাময়ের কৃপা কঠিন আঘাতের ছদ্মবেশে,—

"মোহ বন্ধ ছিন্ন করো করুণ-কঠিন আঘাতে
অশ্রু-সলিল-ধৌত হৃদয়ে থাকো দিবসযামী।"

আত্মসচেতন কবি দুঃখকে বরণ করিতে দ্বিধাগ্রস্ত নহেন। মানব চিত্ত ব্যথায় আঘাতে করুণা-নিদানের সেবায় নিযুক্ত হইতে চাহে, ধূপ-দীপ দগ্ধ হইলেই চরিতার্থতা লাভ করে। কবির চিত্ত দুঃখ-বেদনায় আপনার আপনকে সন্ধান করিয়া পাইয়া উঠে,—

'নিশীথে ঘন অন্ধকারে
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে
দুঃখ দিয়া রাখেন তোর মান
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।"

কবি জানেন যে, বেদনা না থাকিলে আনন্দানুভব থাকিত না, বেদনাই আনন্দের দূতী, জীবনের দুঃখ রাত্রিতেই আনন্দময়ের আসে প্রেমাভিসারের জয়যাত্রা। কবির আত্মপ্রত্যয় যে,—

"নিন্দাসুখ অপমানে
যত আঘাত খাই
তবু জানি কিছুই সেথা
হারাবার ত নাই।"

কবির এই সুখে দুঃখে সমভাব, সমতা ও তিতিক্ষাই অধ্যাত্ম সাধনার পথে তাঁহাকে কর্ম-যোগের গৌরব ও জয়মাল্য দান করিয়াছে।

কবির বাসনা, সঙ্কোচ ও লজ্জা যে মাত্র তাঁহাকে অভিভূত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে সে মাত্র তিনি আত্মসচেতনতায় নিম্নপ্রকৃতির এই ধারাগুলিকে করুণানিদানের নিকট সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন। প্রেমময়ের প্রেমের অন্ত নাই, করুণার অতুল আবেগে দয়িতার হৃদয়ে মান, অপমান, লজ্জা, ভীতি থাকিবে কেন?

তবুও সংশয় আছে—প্রিয়তমকে চিরন্তনী প্রীতি বন্ধনে রাখিতে পারার অনিশ্চয় সার্থকতার সংশয়। বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীর গীতিসুধায়ও এই সুর স্তরে স্তরে সঞ্চিত দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর মিলন এষণা ব্যাকুলতা যেন কবির সত্তায় সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইয়াছে; শ্রীমতীর আত্মনিবেদনের উদ্ভাস কবির আত্মসমর্পণের গীতিমাধুর্যে মনোহারিত্ব লাভ করিয়াছে। শ্রীমতী বাঞ্ছিতকে, পরমপুরুষকে লাভ করিয়াও সংশয়মুক্ত হইতে পারেন নাই—মুকুলিত বক্ষোরে বহুত হইয়াছে শ্রীমতীর সংশয়িত হৃদয়ভারটি।

"এ ভর উঠে মনে এই ভয় উঠে
কানুর পীরিত সেই তিলে তিলে টুটে।"

শ্রীমতীর ন্যায় কবির সংশয়ও ভিত্তিহীন বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, সার্থকতা আসিয়া বিফলতা দূর করিয়াছে, কবি গাহিয়াছেন:

"দেখা দিয়ে তাক দিয়ে যাও প্রাণে
তাহার পরে লুকাও যে কোনখানে
মনে করি এই হারালেম বুঝি,
কোথা হতে আবার যে দাও সাড়া।"

এই সাড়া কবি শুনিয়াছেন, শুনাইয়াছেন। বিশ্বভুবনমাঝে যে অতিমানস চেতনার ব্যাপক বিস্তৃতি তাহার সঙ্গে চেতনার যোগসূত্র স্থাপনে সকলের সঙ্গে একাত্মতা রক্ষা করিতে হইবে। ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করিয়া, আংশিকতা বর্জন করিয়া বৈচিত্র্যময় পূর্ণত্বে আসীন হইতে হইবে,—ক্ষর ও অক্ষরের অতীত পুরুষোত্তমের সঙ্গে একাত্মতায় বিরাজ করিতে হইবে, ইহাই জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন, ইহাই যোগ। নৈসর্গিক রাজ্যে যাঁহার সিংহাসন, যাঁহার স্থিতি লৌকিক পারলৌকিক সর্বক্ষেত্রে, তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবার পন্থা ও তাঁহাকে বিশ্বচরাচরে স্বীকার করা আত্মানুভূতিতে অন্তরাত্মার উপলব্ধি করা। কবির ভাষায়—

"চন্দ্রকিরণ-সুধা-সিঞ্চিত অম্বরে
অশ্রুসরস মহানন্দে
আমি পুলকিত কার পরশনে
গন্ধবিধুর সমীরণে।"

এই ভাব বিশ্লেষণের অপেক্ষায় থাকে না, স্বতঃ উদ্ভাসিত সহস্রকিরণমালার ন্যায় স্বপ্রকাশে সমুজ্জ্বল, ভাস্বর। কবি বলিয়াছেন, "নিজের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চির পুরাতন একাত্মতা আমাকে একান্তভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। কতদিন নৌকায় বসিয়া সূর্যকরোদ্ভাসিত জলে স্থলে আকাশে আমার অন্তরাত্মাকে বিশেষে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছি; তখন মাটিকে আর মাটি বলিয়া দূরে রাখি নাই, তখন জলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে আনন্দগানে বহিয়া গেছে, তখনি এ কথা বলিতে পারিয়াছি:

"হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,

জীবসাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা।"

এই 'অন্তবিহীন আপনা' হওয়া সাধারণের পক্ষে সহজসাধ্য নহে, কবি সক্রিয় চৈতন্যের প্রেরণায় এই অসীমত্ব লাভ করিয়াছেন। এই আধ্যাত্মিক উদ্দীপ্তির মূলেও আছে আত্মানুশীলন, দৈহিক, মানসিক, প্রাণিক ও ভূমাত্মিক উৎকর্ষসাধন। এই সাধন মিলনের, শুধু 'পাওয়া'র নয়, 'হওয়া'রও বটে, কবির ভাষায়, 'Union has its significance not in the realm of to have, but in that of to be'.

এইরূপে বিশ্লেষণে আমরা দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, প্রেম পরম্পরায় একমুখী গতি লাভ করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই গতি আত্মার পরিপূর্ণতার গন্তব্যে উপনীত হওয়ার গতি, স্থিতির আশ্রয়ে সম্পূর্ণতার গতি। কবি কোথাও macrocosmকে microcosm-এ উপলব্ধি করিয়াছেন, কোথায় বা তাঁহার জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর উপলব্ধি করিয়াছেন সর্ববন্ধনমুক্তির, দুর্দমনীয় উল্লেলতায়, অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ভাষায় 'Humanism' ও অমৃতের সন্ধান দিতে তাঁহাকে কার্পণ্য করে নাই। 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা'র ব্যাহৃতি তাঁহার কণ্ঠেও ধ্বনিত এই কারণেই শুনা যায়।

অধ্যাত্মসাধনায় রবীন্দ্রনাথের প্রক্রিয়াবেষণ সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ বিষয়ক কিনা বিচারাধীন নহে, তবে ভিত্তি তাঁহার জ্ঞানপরিধির বিরাট অসীমে। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্"—সেই পরম পুরুষের মহিমা উপলব্ধি করিবার অনুভূতি দিব্যপ্রেরণাতেই কবি লাভ করিয়াছিলেন। মানুষ আত্মিক চেতনার পরিবর্তে প্রেয় ভাবিয়া বাহ্যিক নাম ও রূপে বিমুগ্ধ হয়—সত্যদ্রষ্টা কবির এই ভ্রান্তি নাই, আত্মিক চেতনার রশ্মিচ্ছটায় রবীন্দ্রনাথ বিবস্বান। কবি জ্ঞানানন্দে গাহিয়া উঠেন :

"আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,
তাই ত আমি এসেছি এই ভবে।"

কিংবা,

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

চৈত্য-পুরুষের সঙ্গে অতিমানস চেতনার এই যোগ কবির কাব্যালোকের দ্যুতিতে ভাস্বর দেখিতে পাওয়া যায়। চেতনার ঊর্ধ্বগতি ও অতিমানস চেতনার অবতরণের সন্ধিক্ষণে মিলনের আনন্দ ভক্তির আশ্রয়ে জ্ঞানযুক্ত কর্মের মাধ্যমেই বাস্তবপর হইতে পারে,—কল্পনা-নির্ঝরের স্বপ্নস্বপ্নে নহে, ভাবগঙ্গার পবিত্রতায়, সত্যানুসন্ধিৎসার অধ্যাত্মবেদীমূলে।

সাধনায় একান্ত প্রয়োজন আস্পৃহা, সমতা, তিতিক্ষা, কর্তৃত্বাভিমান বর্জন; Perfection ব্যতীত 'শান্ত শিবং অদ্বৈতম্'-এর একাত্মতায় লীন হওয়া যাইবে কি করিয়া? পূর্ণত্বের জন্য পরম প্রেমিক মানবকে বাসনায় পরিতৃপ্ত হইতে দেন না; অসম্পূর্ণতা-বর্জিত চরিতার্থতাই পরিপূর্ণতা—

ঋষিকবি বলেন,—

"নিতে চাও বলে' ফিরাও আমায়
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন
তব মিলনের যোগ্য করে'
আধা ইচ্ছার সঙ্কট হতে বাঁচায়ে মোরে।"

এই 'আধা ইচ্ছার' ভিত্তি যদি থাকা হয় তাহা হইলে পূর্ণ ইচ্ছা হইতে সাধকের বিলম্ব হয় না; কারণ অসম্পূর্ণতার তমিস্রাচ্ছন্নতা 'আলোর আলো'র পরশে সম্পূর্ণতার প্রভায় প্রভাময়ী হইয়া উঠে, 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্'-এর রসপিপাসী হৃদয় আনন্দ-বিহ্বল হইয়া পড়ে।

'সত্যং শিবং সুন্দরম্'-এর বৈচিত্র্যে একত্বের পূজাই হয়। কবির নিকটে শিবের শান্ত সমাহিত মূর্তির ন্যায় রুদ্রের ভীষণমূর্তিও বরণীয়, প্রেয়।

রুদ্রের ভীষণমূর্তি ও শেষ নয়, অশান্তের মাঝে শান্তির সুমহান প্রশান্ত প্রসন্নমুখও যে দেখা যায়। সংহারই সৃষ্টিপ্রসারের সহায়ক, কূল ভাঙিয়া কূল গড়িয়া উঠে, অশান্তিতে শান্তির বীজ বপিত হয়। কবির প্রাণের আহ্বানে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের 'পাগল' কি সাড়া না দিয়া থাকিতে পারে,—

"আরাম হতে ছিন্ন করে'
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান।"

অশান্তির গহ্বরেই শান্তির সুমহান স্থিতি, আঁধারেই মণির ঔজ্জ্বল্য,—সত্যদ্রষ্টা কবির নিকট এই দ্বিক-দিশারী সত্য বিমল দ্যুতিতে বিভাসিত।

কবির নিকট জীবনকে বাদ দিয়া জগৎ নয়, জীবন ও জগৎ ওতঃপ্রোতভাবে মিশ্রিত। 'সৎ'এর সর্বনিমিত্ত সত্তা সৃষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া স্বয়ম্ভু, স্বপ্রতিষ্ঠ। পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করিলে স্থিতি ও গতি যেমন স্বীকার করিতে হয়, শিব-শক্তির পরমতত্ত্ব ও মহামায়াকেও স্বীকার করিতে হয়, জীব শিবকে প্রবর্তন ও নিবর্তনের একান্ত বন্ধু-বন্ধীরূপে মানিয়া লইতে হয়। কবির এই অন্তর্দৃষ্টি চেতনা বিদ্যমান থাকায় 'Humanity'র পূজায় তাঁহার সাড়া জাগিয়াছে, মানবত্বের মহিমাবোধ ঐশী প্রেরণায় সম্ভব হইয়াছে। কারণ, কবি বলেন,—

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে
সবহারাদের মাঝে।"

অথবা, কবি দেখেন,—

"তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ,—
পাথর কেটে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারো মাস।"

তাই ত কবি আহ্বান জানালেন,—

"রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তারি মতন শুচি বসন ছাড়ি'
আয়রে ধূলার পরে।"

জগতে কেহই ঘৃণ্য, নগণ্য নহে; নগণ্যই অগণ্য, অগ্রগণ্য। স্বামী বিবেকানন্দের মানবকল্যাণবাদের সেই দিব্য বাণী স্মরণে প্রণিধানযোগ্য যে, 'Above all I believe in my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races.' একই ভাবের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম। মানব-পূজার পথে উত্তরসাধকে পথিককে এই ভাব যে গৌরবরশ্মিতে প্রভা দান করিবে সন্দেহ নাই।

অবশেষে কবির জীবন-জিজ্ঞাসা মৃত্যুর গণ্ডী অতিক্রম করিয়া চলে। মরণ কবির নিকট লইয়া আসে পরিপূর্ণতার রূপ, তাই ত কবি গাহেন,—

"আমার আমি ঘুচে মুছে
তোমার মধ্যে যাবে ঘুচে,
সত্য, তোমার সত্য হব
বাঁচব তবে,—
তোমার মধ্যে মরণ আমার মরবে কবে।"

সৃষ্টি থাকিলেই লয় আছে, জন্ম হইলেই মৃত্যু অপেক্ষমান, তবে মরণকে আহ্বান যেন কাপুরুষতার নামান্তর না হয়, সত্যোপলব্ধির পথে জয়যাত্রায় সহায়ক হয়। স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে, 'Worship death!...yet this is not the coward's love of death, not the love of the weak or the suicide. It is the welcome of the strong man who has sounded everything to its depths, and knows there is no other alternative.' বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের মরণের প্রেমাভিসারে যাত্রা কাপুরুষের শৌর্য-হীনতাকে স্বীকার করিয়া লওয়া নহে।

সত্য শাশ্বত, আত্মাও শাশ্বত। জীবনধারায় আত্মা চিরন্তনী মুক্তিলীলায় শাক্তির চৈতন্যের অংশ

গ্রহণ করে। জীবনমরণ ত অবস্থার ব্যক্তভাব ; অব্যক্ত অব্যয়ের সম্পূরক নহে। কবির বাণীতে, 'মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়ে জীবনের জয়যাত্রা'। মৃত্যু যদি জীবনের শেষ হইত তাহা হইলে জীবন হইত পঙ্কিল কলুষিত সরোবরের তুল্য, সাগরের বিরাট উদারতা সে হারাইত, হারাইত উদার বিস্তৃতি। এ হেতু কবির কাছে মরণ 'জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা', জীবনের শেষ অর্থে আত্মার শেষ নহে, কবি জানেন, 'শেষের মধ্যে অশেষ আছে'—আর এই অশেষে আছে পূর্ণতা,—আছে অজর, অমর, অসীম, অব্যয়।

অবশেষে ইহা স্বীকার্য যে 'গীতাঞ্জলি'র অধ্যাত্ম-সাধনায় অসীমের সঙ্গে সসীমের প্রেমে জ্ঞান ও কর্মের সাম্যাবস্থায় যে জীবন রচিত হইয়াছে তাহা অতীন্দ্রিয় ধ্বনির স্তোতকরূপে আত্মানন্দী হৃদয়কে সহজেই অতুল গীতে, প্রতি ব্যঞ্জনিতে,—নিবেদিতা, প্রকীর্তিতা। এহেতু,ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির চিরাগত বৈশিষ্ট্যে প্রণিত 'গীতাঞ্জলি'র কবি রবীন্দ্রনাথ,—সর্বাত্মীয়তার আত্মজ্ঞানে আত্মনিষ্ঠ, স্থিতপ্রজ্ঞ, সত্যদ্রষ্টা ঋষি।

এগিয়ে চল্

(শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী)

শান্তশীল দাশ

ভারি সে গরীব কাঠুরিয়া একজন,
বনে বনে ঘোরে, কাঠ করে আহরণ :
কোনদিন পায়, কোনদিন নাহি পায়,
অভাবের দিন বড় দুখে কেটে যায়।
এমনি করেই একদিন এক বনে
দেখা হয়ে গেল একজন সাধু-সনে।
দুইটি চরণে প্রণাম করিয়া তাঁর
কহিল, "দুঃখ সহিতে পারি না আর ;
করে দাও তুমি এমন কিছু উপায়,
অভাব আমার যেন দূর হয়ে যায়।"

প্রসন্ন হেসে সাধু কহিলেন তারে,
"থাকিস্ নে বসে বৎস, এগিয়ে যা রে।"
খুশি মনে ঘরে ফিরে আসে কাঠুরিয়া,
পরদিন চলে বনের ভিতর দিয়া ;
বহুদূরে গিয়ে পেলে চন্দন বন,
সঞ্চয় ক'রে ভারি খুশি হ'ল মন।
চন্দন কাঠ—অনেক মূল্যবান ;
দুঃখ তাহার হয়ে গেল অবসান।
তবু কানে তার সাধুর মন্ত্র বাজে,
আরও এগিয়ে চলে সে বনের মাঝে।
যত দূরে যায়, সন্ধান পায় তত
তামার, রূপার, সোনার খনি যে কত
লুকিয়ে রয়েছে,—একে একে পায় সবে,
ভাণ্ডার তার ভরে ওঠে বৈভবে।

'থাকিস্ নে বসে চল্ রে এগিয়ে চল্'
এই মন্ত্রেই জীবন হয় সফল।

ভারতের তীর্থ দর্শনে

শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গুণের আদর সর্বত্র; সৎ কাজের আদর সর্বত্র। কতযুগ আগে কোন্ জায়গায়, কোন্ গভীর জঙ্গলে, নদীতীরে, কোন্ পাহাড়-পর্বতে কোন্ মহাপ্রাণ আর্য ঋষি কঠোর তপস্যা করেছেন, কোথায় কোন্ ভক্ত তাঁর ইষ্টদেবের সাক্ষাৎদর্শনে লালায়িত হয়ে তাঁর প্রাণের ঠাকুরের মন্দির নির্মাণ করে তার মধ্যে মূর্তি স্থাপন করেছেন ও কত বৎসর ধরে কঠোর সাধনা করে তাঁর একান্ত ইপ্সিত প্রাণের প্রিয়তম ইষ্টের দর্শন লাভ করে ধন্য হয়েছেন, ভারত আজও ভুলেনি। কোথায় কোন্ মহাতপস্বী কতকাল ধরে যাগ-যজ্ঞাদি করে এসেছেন, কোথায় কোন্ সতী-সাধ্বী তপস্বিনী কায়মনোবাক্যে স্বীয় পতিসেবা করে এসেছেন, জনকল্যাণের জন্য কত তপস্যা করেছেন, ভারত আজও তা' ভুলেনি। তাই আজ ভারতের আর্য নরনারী সেইসব প্রাতঃস্মরণীয় তপস্বী ও তপস্বিনী-দিগকে সর্বদা স্মরণ করে, তাঁদের অমূল্য উপদেশ সকল শ্রবণ করে ও সুবিধা পেলেই, কত পথশ্রম সহ্য ক'রে আকুল হৃদয়ে ছুটে চলে তাঁদের আশ্রম দেখতে, ছুটে চলে তাঁদের আরাধ্য দেবতাকে দেখতে। সেই সব তপস্যার জায়গায় মন্দির ও মূর্তি প্রভৃতি স্থাপিত হয়ে আজকাল তীর্থস্থান হয়েছে। এই সব আশ্রম বা তীর্থ-স্থান ভারতের নানা প্রদেশে অবস্থিত। যদিও আজকাল সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়, তা হলেও এইসব তীর্থ দর্শন পায়ে হেঁটেই করার নির্দেশ আমাদের শাস্ত্র দিয়েছেন; বিশেষ করে লিখেছেন, পায়ে হেঁটেই তীর্থ দর্শন করলে তার ফল অধিক। হেঁটে তীর্থ দর্শন করতে হলে নানাদেশের নানা লোকালয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, অনেক নদী, পাহাড়, বন, জঙ্গল পার হ'তে হয়। তাতে সব দেশের সব জাতির লোকদের সঙ্গে মিশামিশা ও কথা-বার্তা বলার সুবিধা হয় ও সুন্দর সুন্দর পাহাড়-পর্বত প্রভৃতির মনোরম দৃশ্য সকল দেখবার সুযোগ হয়। প্রত্যেক তীর্থেই কিছুদিন বাস করবার বিধি আছে—কমপক্ষে তিনদিন। তাতে সেখানকার লোকদের সঙ্গে মিশামিশা করে নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের প্রণালী সব, চাষবাসের কাজ, ব্যবসা বাণিজ্যাদির প্রণালী ও সুবিধা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে অনেক উপকারী ও দরকারী বিষয় জানতে পারা যায়। তীর্থস্থানবাসীরাও নানাদেশের যাত্রীদের কাছ থেকে নিজেদের দরকারী ও উপকারী বিষয় সব জানতে পারে। এইভাবে পরস্পরের নানাবিধ আলাপ-পরিচয়ের মধ্যে নিজেদের প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়েরই শিক্ষা লাভ করা যায়, কুয়োর ব্যাং হয়ে এক জায়গায় বসে থাকলে, এই ভারতেই কোথায় কোন্ জায়গা আছে, কোথায় কি জিনিষ পাওয়া যায় ইত্যাদি বিষয়ের সম্যক জ্ঞান হয় না। বইয়ে পড়া বা লোকের কাছে শোনা, আর নিজের চোখে দেখা, দুইয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য।

তপস্বী ঋষিমুনির তপঃক্ষেত্রের প্রভাবেই হউক বা সুন্দর দৃশ্য সকলের প্রভাবেই হউক স্থান-বিশেষে গেলে সংসারের শোকদুঃখাদি সব ভুলে যেতে হয়, মনে হয় এই স্থানেই থেকে যাই; সেখান থেকে ফিরে আসতে ইচ্ছা হয় না। প্রায় প্রত্যেক তীর্থস্থানেই অনেক সাধু-সন্ন্যাসী বাস করেন, সংসারের নানাবিধ দুঃখে ও অশান্তিতে দুঃখী নরনারী এই সব তপস্বীদের দর্শন করলে ও তাঁদের অমূল্য উপদেশাদি শ্রবণ করলে ও সেইসব

জায়গার অপূর্ব শোভা দেখলে মনের দুঃখ-কষ্ট সব ভুলে গিয়ে প্রাণে শান্তি পান। তাঁকা জায়গা, নদী বা পাহাড় হওয়ায় জন্য এইসব জায়গা বেশ স্বাস্থ্যকরও। সেইজন্যই আমাদের তীর্থ দর্শনের বা তথায় বাসের ব্যবস্থা।

বহুদিন থেকেই বিশেষ ইচ্ছা ছিল ভারতের তীর্থদর্শনে যাত্রা করি। সেইজন্য সময়মত সুবিধা পাওয়াতে হিমাচল হ'তে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অনেক তীর্থস্থান, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, নূতন ও পুরাতন সহর, কত লোকের অতীতকালের কত সব কীর্তি —অনাহারে, অর্ধাহারে, দুর্গম পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গলে, বালুময় সমুদ্রতীরে, হেঁটে পথশ্রমের অশেষ কষ্ট সহ্য করে দেখে এসেছি। তার বৃত্তান্ত পড়ে যদি কোনও নরনারী আনন্দ পান, শান্তি পান, বা কোনও তীর্থদর্শনেচ্ছু কেহ আবশ্যকীয় সব বৃত্তান্ত জেনে কোনও উপকার পান, তাহলে নিজের লেখার পরিশ্রম সার্থক মনে করব। আমাদের তীর্থযাত্রায় প্রথমতঃ উত্তরপ্রদেশ থেকে আরম্ভ করে পরপর এক এক প্রদেশে আমরা গমন করি।

যাত্রা-স্থানের তালিকা ; বিন্ধ্যাচল, এলাহাবাদ বা প্রয়াগ, চিত্রকূট, ফৈজাবাদ (অযোধ্যা), লক্ষ্ণৌ, বালাঘাট (নৈমিষারণ্য ও মিস্‌রিখ) হরদ্বার (হৃষীকেশ, কনখল) কুরুক্ষেত্র, দিল্লী, মথুরা (বৃন্দাবন), আগরা, জয়পুর, অজমের (পুষ্কর তীর্থ), কাঁকরোলী, নাথদ্বারা, উদয়পুর, চিতোরগড়, উজ্জয়িনী, ওঁকারেশ্বর, ডাকোর, আহমদাবাদ, বীরমগ্রাম, দ্বারকাধাম, (ভেট্‌দ্বারকা), সোমনাথ বা সুরাষ্ট্রপুরী, জুনাগড় (সোমনাথ ও প্রভাসতীর্থ), বরোদা, ভড়োচ বা শুক্ল তীর্থ, সুরাট, বোম্বাই, নাসিক, পুণা, কুর্‌ডুবাড়ী, শোলাপুর, বাদামী, হোস্‌পেট (কিষ্কিন্ধা), মহীশূর, বাঙ্গালোর, তিরুপতি হিল্‌, তিরুবন্নমলয়, ত্রিচিনাপল্লী, মাদুরা, রামেশ্বর (রামেশ্বরম্‌), তাঞ্জোর, কুম্ভকোণম্‌, চিদম্বরম্‌, চিঙ্গল পেট, কাঞ্চীবরম্‌, মাদ্রাজ, বেজবাড়া, ওয়ালটিয়ার, পুরী, ভুবনেশ্বর, কলিকাতা, বৈদ্যনাথধাম, গয়া, বারাণসী।

আজ ৫ই নভেম্বর, ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ। আমাদের তীর্থযাত্রা-গাড়ী ছাড়বার নির্দিষ্ট তারিখ। প্রায় ২০।২৫ দিন আগেই খবর পেয়েছি, কাশীর হিন্দী বেলগুরে টাইমটেবল্‌ অফিস থেকে এ বৎসর ভারত তীর্থ-যাত্রা গাড়ী ছাড়বার ব্যবস্থা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ মাসে-মাসে তীর্থ-যাত্রার ব্যবস্থা ক'রে এপ্রিল থেকেই গাড়ী ছাড়েন। গাড়ীতে প্রত্যেকের রাত্রে শোবার জন্য একখানা পুরা বেঞ্চ থাকে ; তার জন্য প্রত্যেকের তৃতীয় শ্রেণীর সমস্ত যাত্রার ভাড়া ৩৪৫৲ টাকা। কেবলমাত্র বসবার জন্য ভাড়া ২৫৫৲ টাকা। গাড়ীতেই দু'বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। দুপুরে ভাত, দাল, রুটি, তরকারী আর রাত্রে লুচি তরকারী। সমস্ত যাত্রার জন্য খাওয়া খরচ ১১০৲ টাকা ও মাসিক হিসাবে ৪৭৲ টাকা, রেলের ভাড়া ছাড়া আরও আলাদা দিতে হবে। যাত্রীদের মধ্যে যাঁরা নিজেরা রান্না করে খেতে চান, তাঁরা নিজেদের ব্যবস্থা করে নিতে পারেন। কোনও তীর্থস্থানে থাকবার জন্য ধর্মশালা খুঁজতে হবে না, কোনও ষ্টেশনে বাক্স বিছানা নামা-উঠান করার জন্য কুলীর দরকার হবে না : জিনিষ-পত্র সব গাড়ীতেই থাকবে। দেবদর্শনাদি ক'রে এসে আপন আপন নির্দিষ্ট বেঞ্চে শুয়ে থাক বা বিশ্রাম কর। যাত্রীদের অনুপস্থিতিতে চৌকিদার গাড়ী পাহারা দিবে। যাত্রীরা অগ্রিম ৪০৲ টাকা রেল-কোম্পানীর কাছে জমা দিয়ে আপন আসন ঠিক করে রাখতে পারেন ; যাত্রার সাতদিন পূর্বে ভাড়ার বাকী টাকা সব জমা দিতে হবে।

এই তীর্থযাত্রার প্রতিবেশী বা পরিচিত সহযাত্রী অনেক ছিল। সকলে একসঙ্গে মিলে-মিশে আরামে ও আনন্দে কাটবে, কাজেই এই গাড়ীতেই যাত্রা করা স্থির হলো ও তীর্থযাত্রার সমস্ত ভাড়া ও খাওয়া খরচ জমা করে, ছাপান রসিদ পেলাম। ইতোমধ্যে নিজের কাজকর্মের সব ব্যবস্থা করতে ও যাত্রার

দরকারী জিনিষপত্রের জোগাড় করতে আরম্ভ করলাম।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাত্রার নির্দিষ্ট তারিখ এসে পড়ল। ঠিক্ সময়ে বাবা বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণার চরণে নতমস্তকে বার বার প্রণাম জানিয়ে ও করজোড়ে নিজের নিরাপত্তা কামনা করে ষ্টেশনে রওনা হলাম। অনেক আগেই অনেক সহযাত্রী এসে উপস্থিত হ'য়েছেন ও তাঁদিকে বিদায় দিতে আপন আপন অনেক আত্মীয়স্বজনও তাঁদের সঙ্গে এসেছেন। নিজের নিজের জিনিষপত্র গাড়ীতে উঠান বা সে সকল গোছগাছ করা, বা কে কোথায় আরামে বস্‌বেন ও শোবেন তার জন্য পছন্দমত জায়গা অধিকার করার জন্য সকলেই ব্যস্ত: আগে থেকেই প্রত্যেকের জায়গা ঠিক্ করা ছিল। যাত্রার ম্যানেজারের নির্দেশমত, যে যার জায়গায় বসে পড়ল। যারা মনের মত জায়গা পেলে তারা বিশেষ আনন্দিত, আর যারা পছন্দমত জায়গা পেলে না তারা মনঃক্ষুণ্ণ হল। যথাসময়ে গাড়ী ছাড়ল। প্ল্যাট্‌ফরমে দাঁড়িয়ে আত্মীয়-স্বজন সজল নেত্রে আপন আপন লোককে বিদায় দিলে। গয়ার পোলের উপর এসে করজোড়ে গঙ্গাকে প্রণাম করলাম ও করজোড়ে মঙ্গল আশীর্বাদ প্রার্থনা করলাম। অনেকে গাড়ী থেকেই গঙ্গা-গর্ভে পয়সা ফেলে দিলে।

মোগলসরাইয়ে গাড়ী পৌঁছাল। এখান থেকে আমরা প্রথমে বিন্ধ্যাচল যাব, বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর দর্শন করতে। যাত্রার আগে ছেলে মাতৃচরণে প্রণাম করে আশীর্বাদ চাবে। যাত্রায় এই আমাদের প্রথম দর্শন।

১

বিন্ধ্যাচল : উত্তর রেলওয়ের মোগলসরাই ও এলাহাবাদের মধ্যে বিন্ধ্যাচল ষ্টেশন। ষ্টেশন থেকে দুই ফার্লং দূরে লোকালয়, এই লোকালয়ের মধ্যেই দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির। বিন্ধ্যাচলে প্রধান করণীয়—গঙ্গাস্নান, দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর দর্শন, অষ্টভুজা দেবী ও মহাকালীর দর্শন। বড় ষ্টেশন মীর্জাপুর থেকেও বিন্ধ্যাচল যাওয়া যায়, দূরত্ব চার মাইল। যাতায়াতের জন্য মোটর বাস, রিক্‌সা প্রভৃতি পাওয়া যায়, রাস্তাও ভাল। বিন্ধ্যাচল ছোট ষ্টেশন, গাড়ী কেটে রাখ্‌বার জন্য ষ্টেশনে পার্শ্ব লাইন (Siding line) সুবিধামত না থাকায় ও গাড়ী কেটে রাখার জন্য বা জোড়ার জন্য আলাদা ইঞ্জিন না থাকায় আমাদের গাড়ী মির্জাপুরেই কেটে রাখ্‌তে হ'ল। বিন্ধ্যাচল যাতায়াতের জন্য সকলে মিলে একখানা বাস ভাড়া করলাম্। বিন্ধ্যাচল ছোট সহর হলেও রাস্তাতে বৈদ্যুতিক আলো ও জায়গায় জায়গায় কলের জলের ব্যবস্থা আছে। সব রকম খাবারের দোকান, তরিতরকারী ও অন্যান্য জিনিষের বাজারও আছে। যাত্রীদের থাক্‌বার জন্য ষ্টেশনের কাছে ও সহরের মধ্যে দেবীর মন্দিরের কাছে সর্বশুদ্ধ তিন চারখানি ধর্মশালা আছে, তাছাড়া যাত্রীরা সেখানকার পাণ্ডাদের বাড়ীতেও থাকতে পারে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে "বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে। শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যাবুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ। নন্দ গোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা। ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনৌ।" এই বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী অষ্টভুজা দেবীই হলেন নন্দগোপ ও যশোদার কন্যা "মহামায়া"। কংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে অষ্টভুজারূপে এখানেই বিরাজমানা। আর বিন্ধ্যবাসিনীদেবী হলেন কৌষিকীদেবী। জগদম্বা পার্বতীর দেহকোষ হতে সঞ্জাত হওয়াতে লোকে কৌষিকী নামে প্রথিতা হয়েছেন। বিন্ধ্যবাসিনী বা কৌষিকী দেবী, মহাকালী ও অষ্টভুজা এই তিন দেবীর যাত্রাকে ত্রিকোণ যাত্রা বলে। বিন্ধ্যাচল শক্তি-উপাসকদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। সেজন্য অনেক দূর দূর থেকে বহু যাত্রী এখানে দর্শন করতে আসে। আশেপাশের অনেক সহরের ও গ্রামের লোকেরা তাদের সন্তানের প্রথম মস্তক মুণ্ডন এই স্থানেই করে। সেজন্য প্রায় প্রতিদিনই যাত্রীদের বেশ ভীড় হয়।

আশ্বিন মাসের ও চৈত্র মাসের নবরাত্রির সময় নয়দিন যাবৎ এখানে নানা স্থান থেকে বহু যাত্রীর সমাবেশ হয় ও মেলাও বসে। বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির থেকে দুই ফার্লং দূরে গঙ্গা। স্নানের জন্য বাঁধান ঘাট আছে। বিন্ধ্যবাসিনীর সিংহবাহিনী দেবীমূর্তি কালো পাথরের নির্মিত, প্রায় ২৷৷০ হাত উঁচু। এখানে ছাগ ও মেষ বলিদানের প্রথা আছে। আশপাশের গ্রামের লোকেরা পশু বলিদান দিতে স্থানে আর সহরের লোকেরা দেবীকে "হালুয়া"-ভোগ দেয়। মন্দিরের পাশেই অনেক-"হালুয়াই"-এর দোকান আছে। পরিমাণ বলে দিলে সেই মধ্যেই সব তৈরী ক'রে দেয়। বলিদেওয়া পশুর রক্তপান করবার জন্য বহু কুকুর সর্বদা মন্দিরের চারপাশে ঘোরা-ফিরা করছে। সর্বত্র অবাধ গতি; কারো কিছু বলবার উপায় নেই। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেবী মন্দিরের চারদিকের বারান্দায় বসে শ্রীশ্রীচণ্ডী প্রভৃতি পাঠ করেন। দূর হতে তাঁদের গুন্‌গুন্ পাঠধ্বনি শুনতে বেশ মধুর বোধ হয়; যেন এক সঙ্গে বহু মৌমাছি বা ভ্রমর গুন্‌গুন্ করছে। রক্তলোলুপ কুকুরেরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ক'রে অনেক সময়ে এই সব পাঠে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের গায়ে গিয়ে পড়ে ও পূজার জিনিষপত্র সব উল্টিয়ে দেয়। দেবীর মন্দির ও মন্দিরের উঠান বেশ বড়। মন্দিরের ভিতরে রেলিং লাগিয়ে দেবীর আসন ও প্রবেশদ্বার ছোট করা হয়েছে। এই ছোট দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মন্দিরের পাণ্ডা দর্শনার্থী লোকদের কাছ থেকে দর্শনী নিয়ে দেবীকে দর্শন করতে দেয়। নিজপাণ্ডা সঙ্গে নিয়ে এলে দর্শনার্থীদের কাছ থেকে দর্শনী চায় না। মন্দিরের পশ্চিমে বারভুজা দেবীর মূর্তি, অন্য মন্দিরে খর্পরেশ্বরশিব, দক্ষিণে মহাকালীর মূর্তি। বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দিরের কিছুদূরে বিন্ধ্যেশ্বর মহাদেবের মন্দির ও পাশেই হনুমানজীর মন্দির।

বিন্ধ্যাচল থেকে দুই মাইল দূরে "কালীখোহ" বলে জায়গা আছে। এইখানেই মহাকালী বা চামুণ্ডাদেবীর মন্দির। এই চামুণ্ডাদেবীই চণ্ড ও মুণ্ড অসুরদ্বয়কে বধ করেছিলেন। এখানেও পশুবলি দেওয়া হয়। জায়গাটি বড় নির্জন ও বনজঙ্গল-পূর্ণ; সেজন্য সন্ধ্যাতে বা রাত্রিতে একলা যাওয়া নিরাপদ নয়। পাশেই ছোট পাহাড়ের উপর ভৈরবের মন্দির। এখান থেকে ১২৫টি সিঁড়ি উঠলে "গোরক্ষাতলাব" নামে একটি পুকুর পাওয়া যায়। এর জল সর্বদা গেরুয়া রংয়ের। যাত্রীরা এই জলে তাদের কাপড় প্রভৃতি রং করে নেয়। কাছেই কৃষ্ণ-মন্দির; সেখান থেকে অন্য রাস্তায় ১০০ সিঁড়ি নেমে সীতাকুণ্ড; এখানে সীতার চরণচিহ্ন আছে। সীতাকুণ্ডের কাছেই একটি ঝরণা আছে। অন্য প্রান্তে অষ্টভুজা দেবীর মন্দির। কালীখোহ থেকে অষ্টভুজা দেবীর মন্দির প্রায় এক মাইল। এই অষ্টভুজা দেবীই নন্দ ও যশোদার কন্যা 'যোগমায়া'। অষ্টভুজার মন্দিরের কাছেই অন্য এক গুহাতে আরও অন্য একটি কালীমূর্তি আছে। এখান থেকে আধ মাইল দূরে জঙ্গলে মঙ্গলাদেবীর মন্দির। প্রবাদ আছে—শ্রীরামচন্দ্র এই মূর্তি স্থাপনা করেন। দেবীপীঠ হওয়ার জন্য বিন্ধ্যাচলের অধিবাসীরা অধিকাংশই শাক্ত বা দেবীর মন্দিরে পশুবলি হওয়ার জন্য এঁরা অনেকেই বলিদানের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। বিন্ধ্যাচল সহরের বাহিরে পাহাড়ের উপরে ধনীব্যক্তিদের অনেক বাসগৃহ ও বাগানবাড়ী আছে। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়েরও আশ্রম আছে। বিন্ধ্যাচল দর্শন শেষ করে ভোরের গাড়ীতে এলাহাবাদ দর্শনে যাত্রা করলাম।

২৫শে বৈশাখ

শ্রীপ্রকৃতি দেবী

আজ ২৫শে বৈশাখ,
চতুর্দিক শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত —
কবিগুরু—তোমার আবির্ভাব তিথি।
ধ্যানের অন্তর্লোকে তোমার অমর মূর্তি
দিগন্তের অঞ্চল তোলে কাঁপিয়ে ;—তাই,
প্রাণের মধ্যে জেগেছে চাঞ্চল্য
সেই ভাবঘন ছবিকে ঘিরে।
২৫শে বৈশাখ আবার আসবে,
আসবে ২২শে শ্রাবণ—
জীবন আর মৃত্যুর তরণী বেয়ে আসবে আবার
ঘন ঘন স্মরণ-উৎসবের আমন্ত্রণ :
কিন্তু তুমি কি আসবে ফিরে ?
উত্তর দেবে কে ?
হায় মূক প্রতিকৃতি,
আমাদের এ' মাল্যদান আর স্তবস্তুতি তোমায় কি স্পর্শ করেছে ?
'১৩০০ সালের' পাঠক-পাঠিকা আর
গুণমুগ্ধ ভক্তের দল নমস্কার করে।
সে প্রণাম কি পৌঁছয় তোমার পা'য় ?
ব্যঙ্গ আর বিকৃতিতে তোমার মুখে ভাষা নেই
অথচ কত মুখে তুমিই ভাষা দিয়েছিলে একদিন।
পাণ্ডুর হয়ে এলো ঘোলাটে আকাশের চাঁদ
হায় মূঢ় হৃদয় ! মৃত্যু কি জীবনকে ফিরে দেবে ?
আজ তুমি কার
সে সুযোগে আমাদের প্রণতি চলেছে মিছিল করে।
আবার যদি তুমি কথা কও
থমকে দাঁড়াবে সে শোভাযাত্রা।
হায় ! কথা কইবে কবে ?

—:০:—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, বি.এল. বিদ্যাবিনোদ

হুগলী জেলার অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রাম বঙ্গদেশের একটি তীর্থস্থান হইয়া থাকিবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর যেমন সারা ভারতের একটি পুণ্যপীঠ, ঐ কামারপুকুরও তেমনি তাঁর জন্মস্থান বলিয়া ভক্তগণের পরম তীর্থে পরিণত হইবে।

জন্ম ও শৈশব-লীলা

এই কামারপুকুরে ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন বুধবার শুক্লা দ্বিতীয়ার ব্রাহ্মমুহূর্তে যে দেবশিশু জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। শীতের শেষ, নির্মল প্রকৃতির বুকে চঞ্চলতা ও মৃদুতা যখন চতুর্দিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে, বসন্ত তাহার সদা-জাগ্রত মাধুর্য যখন জগতে বিকীরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে সেই সময় আবির্ভূত হইলেন ভক্তিরসের অবতার, দয়া-সহানুভূতি-প্রেমের ঘনমূর্তি এই ঠাকুর। পিতা ক্ষুদিরাম দিব্যপ্রভায় সমুজ্জ্বল এই মনোজ্ঞাত পুত্রের নাম রাখিলেন—গদাধর। গদাধর যখন মাত্র সাত বৎসরের বালক, তখন তাঁর পিতার দেহাবসান হয়। এই দৈব দুর্বিপাকে তখন সংসারের সমস্ত ভার জ্যেষ্ঠ সহোদর রামকুমারের উপর পড়ে। কিন্তু তাঁহার উপার্জন অধিক পরিমাণে ছিল না বলিয়া অতি কষ্টে সংসার চালাইয়াও ক্রমশঃ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। সম্বল ছিল মাত্র তাঁহার মনের জোর, ন্যায়নিষ্ঠা ও ঈশ্বরের প্রতি অকপট বিশ্বাস। তিনি উপযুক্ত উপার্জনের একটা ব্যবস্থা করিতে এক শুভ লগ্নে মাতা চন্দ্রমণি দেবীর অনুমতি ও পদধূলি গ্রহণান্তর অনতিবিলম্বে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

রামকুমার কলিকাতার লোকসমাজের মধ্যে প্রথমে একটু যেন বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এখানে বহুল-জনতা, বহু-সমাবেশ, দোকান-পাট, হাট-বাজার সব কিছুরই প্রাচুর্য। যাহা হউক পরে তাঁহার একাগ্রতা ও চেষ্টার নিবিড়তা তাঁহাকে জয়মালা পরাইল। তিনি ভগবৎকৃপায় কামার-পুকুরে একটি টোল খুলিতে কৃতকার্য হইলেন। রামকুমার কলিকাতা আসিবার প্রাক্কালে জ্যেষ্ঠ বৎসর বয়স্ক কনিষ্ঠ সহোদর গদাধরের উপর নিজ বাটীর কুলদেবতা শ্রীশ্রীরঘুবীরের পূজার ভার দিয়া আসেন। কনিষ্ঠ সহোদরও সাগ্রহে উহা গ্রহণ করেন। ঈশ্বর-চিন্তায় যাঁহার মন অতি শৈশবকাল হইতে নিবিষ্ট—তিনি ঈদৃশ ভার পাইয়া যেন পরমার্থ লাভ করিলেন ও আনন্দে আত্মহারা হইয়া নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান জ্ঞান করিলেন।

গদাধর তখন গ্রাম্য পাঠশালার বিদ্যাশিক্ষা শেষ করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে এই বিদ্যালাভে তাঁহার প্রগাঢ় আগ্রহও ছিল না; নিয়ত ঈশ্বর-চিন্তায় ও ধর্মাচরণে অহরহ আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন। কখন বা সুমধুর কণ্ঠে ধর্মসঙ্গীত গাহিতেন, কখন বা উদাসভাবে ঈশ্বর-চিন্তা করিতেন। সকলেই বালক গদাধরকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন—যেন কোন বিষয়ে তাঁহার আকর্ষণ নাই, আগ্রহ নাই। এই নিস্পৃহ ভাব ক্রমশঃ তাঁহার চরিত্রগত গুণ হইয়া দাঁড়াইল।

বাল্যলীলা

তিনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ হইলেও এবং সম্পূর্ণরূপে শুচিতা পালন করিলেও, তাঁহার অন্তরে ভেদ-বিচার আদৌ ছিল না। যে কেহ তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিয়া লইতেন তিনি সেখানেই

গিয়া সাগ্রহে তাঁহার সুকণ্ঠের সুমিষ্ট গানে সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া আসিতেন।

এদিকে অগ্রজ রামকুমার স্বীয় সর্বকনিষ্ঠ সহোদর গদাধরের দেশের বাড়ীতে কিছুই হইতেছে না দেখিয়া অতিশয় মনক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁহাকে তিনি কলিকাতায় লইয়া আসিতে মনস্থ করিলেন এবং মাতার অনুমোদনক্রমে একদিন তাঁহাকে নিজেরই সঙ্গে লইয়া কামারপুকুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি একদিন জগদ্বাসীর মনের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাইবেন, ভারতবাসীকে ভক্তিরসে উদ্বুদ্ধ করিয়া সন্ন্যাসী ও গৃহবাসীর সমগ্র জীবন উন্নত সুরে তুলিয়া ধরিবেন, সন্ন্যাস গ্রহণ দ্বারা সত্যের উপলব্ধি, ধর্মের রহস্যভেদ ও ধর্মসাধনার অভিনব উপায় দ্বারা সমাজ, দেশ ও জগতের কল্যাণসাধন করিবেন, তিনি নিজে পার্থিব ভোগ বিলাসের আশায় নিজ প্রাণ-মন নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে পারেন না। সত্যই দেখা গেল কলিকাতায় আসিবার কিছুকাল পরেই গদাধরের পার্থিব জীবনের পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। নিম্নোক্ত ঘটনাটি ইহার প্রমাণ দিবে। ঐ সময়ের একটি ঘটনা এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতার জানবাজার পল্লীর বর্ধিষ্ণু পরিবারের রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই স্বধর্মনিষ্ঠা, তেজস্বিনী রমণী রাসমণি দেবী ত্রিবেণীর সন্নিকটে কোণা নামকস্থানে জন্মগ্রহণ করেন বাং ১২০০ সালে। কোণা গ্রামের মাহিষ্যবংশ সম্ভূত হরেকৃষ্ণ দাস ও তাঁহার পত্নী রামপ্রিয়া দাসীর একমাত্র কন্যা এই রাসমণি। পিতামাতার নিষ্ঠা ও কৃষ্ণভক্তি রাসমণি দেবী উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন। দরিদ্রসেবা, মন্দির-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকর্মের জন্য রাণীর প্রাণ এখন আকুল। তিনি কলিকাতার তিন মাইল দূরে দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে কয়েক বিঘা জমি ক্রয় করিয়া এক ঠাকুরবাড়ী করিলেন। তথায় নির্মিত হইল সুন্দর কালীমূর্তি ও রাধাগোবিন্দের অপরূপ বিগ্রহ। ইহাতে ভক্তিমতী রাসমণি মনে শান্তি পাইলেন বটে, তবে পূজার্চনা সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করিবার সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। শাস্ত্রানুসারে যথাবিহিত পূজার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অভিমত ও উপদেশ সংগ্রহের জন্য তিনি স্বগৃহে তাঁহাদিগকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন। যাঁহারা আসিলেন তাঁহারা সমবেত কণ্ঠে জানাইলেন, রাণী জাতিতে মাহিষ্য (চাষী কৈবর্ত) বলিয়া তাঁহার নির্মিত মন্দিরে কোন বিগ্রহ কোন ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বা অর্চিত হইতে পারেন না।

ভক্তির টান

ইহাতে রাণী রাসমণি মর্মাহত হইলেন বটে,কিন্তু দমিলেন না। দেশ বিদেশের সুশিক্ষিত ধার্মিক পণ্ডিতগণের মতামত চাহিয়া পাঠাইলেন। ইহাতে বহু ব্যবস্থাপত্র আসিতে লাগিল। ঠাকুরের বিচক্ষণ তত্ত্বজ্ঞানী জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের কর্ণে এই কথা উঠিলে তিনি বিচারবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া এই মর্মে অভিমত দিয়া পাঠাইলেন যে, রাণী যদি স্বীয় গুরুদেবকে তাঁহার ঠাকুরবাড়ী নির্ব্যূঢ় সর্তে দান করেন তাহা হইলে কালীমাতা ও রাধাগোবিন্দ-জীউর পূজায় বাধা অন্তর্হিত হইবে। তখন তাঁহার এই মন্তব্য ধার্মিক পণ্ডিতমণ্ডলী সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিলেন এবং গ্রহণ করিলেন। বিচক্ষণতা ও কূটাগ্রবুদ্ধির জন্য ধর্মপ্রাণ রামকুমারকে সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। রাণী রাসমণির একান্ত অনুরোধে ১২৬২ বঙ্গাব্দের ১৮ই জ্যৈষ্ঠের শুভ লগ্নে রামকুমার মহাসমারোহের সহিত মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন; সেদিন কনিষ্ঠ সহোদর রামকৃষ্ণও তাঁর সঙ্গে আসিয়াছিলেন। নিত্যপূজার ভার কিন্তু শ্রীরামকুমারেরই উপর পড়িল।

অতঃপর রামকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত দক্ষিণেশ্বরেই বসবাস করিতে লাগিলেন। রাণী রাসমণি স্থিরপ্রজ্ঞা, মেধাবী ও উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্না রমণী ছিলেন। ঈশ্বরনিষ্ঠা ভিন্ন বিষয়াভিজ্ঞতা তাঁহার গভীরভাবে ছিল। তিনি স্বীয় জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাসের উপর দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাড়ী পরিচালনার ভার দিলেন। তত্ত্বাবধান কার্যে তাঁহার নিরলস দক্ষতা দেখা যাইত। সর্বপ্রকার ব্যবস্থা, হিসাবপত্র তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতেন। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিচারশক্তি, হিতাহিত বোধ এবং ভগবদ্ভক্তি অবশ্যসাধারণ ছিল। তিনি বিবেকের সহিত কর্তব্য পালন করিয়া যাইতেন। একদিন তত্ত্বাবধান কার্যে ব্যাপৃত থাকিবার কালে রামকৃষ্ণের সরল-প্রসন্ন-দিব্য জ্যোতিপূর্ণ আকৃতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন, তিনি বিজ্ঞ রামকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহার চল চল, ভক্তিরসাপ্লুত মুখখানি দর্শন করিয়া ঠাকুর-সেবা-কার্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া শ্রীশ্রীভবতারিণীর বেশকারীর পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ কার্যের দায়িত্ব স্বহস্তে লইবেন না বলিয়া প্রথমে অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন; অবশেষে মথুরানাথের অনুরোধে ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপদেশে বাধ্য হইয়াই ঐ কার্যে ব্রতী হইলেন। এইবার যেন নদী আসিয়া সমুদ্রে পড়িল, সব একাকার হইয়া গেল! ইহাই ভক্তের আকর্ষণ, আকস্মিক যোগাযোগ, কার্যকারণের অপূর্ব সংযোগ। দৈব নির্বন্ধ বৃথা ভার।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আরিষ্টটলের মতে—"God moves the world as the beloved object moves the lover"—"ঈশ্বর সমস্ত জগৎ চালনা করেন, যেমন প্রিয়বস্তু প্রিয়জনকে চালনা করিয়া থাকে।" ঈশ্বর তাঁহার নিকট "অপরোক্ষী সত্তা যাহা অপণ্ডনীয়, স্থানাতীত, দিশাতীত, নিরাসক্ত, অপরিবর্তনীয়, সনাতন এবং সম্পূর্ণ।"

বহুপূর্বে গীতায় শ্রীভগবানের স্বরূপ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—তিনি অক্ষর-অব্যয়, অনাদি-অনন্ত, সর্বভূতাশয়স্থিত। পরমাত্মাই জীবাত্মার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, প্রাণময় হইয়া শক্তিদান করিয়া থাকেন। ভক্তি দ্বারা সর্বশক্তিময় ভগবানকে লাভ করা যায়। তিনি জীবকল্যাণের হেতু, সকলের আশ্রয়, ভয়নাশন। ভক্তির আকর্ষণে তিনি জীবের সন্নিকট হইয়া থাকেন। পার্থের সারথিরূপে তিনি পাণ্ডবগণকে ধর্মযুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন:

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ১০।২০

কিন্তু চরম কথা তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন ষষ্ঠ অধ্যায়ের ত্রিংশ শ্লোকে:

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৬।৩০

নিয়তির গতি স্থূল দৃষ্টিপথে অবরুদ্ধ। বেশকারীর পদগ্রহণ করিবার পর হইতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের অন্তর চঞ্চল হইয়া উঠিল। ইহার কারণ কি? ভাবাবেগ না বাহ্যিকের মিলন,—না ঈপ্সিত দ্রব্য প্রাপ্তিজনিত হৃদয়োচ্ছ্বাস? ক্রমশঃ এমন হইল তিনি যেন ভাবাবেগ চাপিতে পারেন না। উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তিনি চঞ্চলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাত-পা কাঁপিতে লাগিল, মাকে বেশ করাইতে গিয়া তিনি ভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেন। জননীর ক্রোড়ে শিশুর মত তিনি অস্বাভাবিক সারল্যে অভিভূত হইতেন, সকলে এ দৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া উঠিতেন।

নিয়তির গতি দুর্বোধ্য। জগজ্জননী সন্তানকে আরও নিকটে টানিয়া আনিলেন। কয়েকদিন রোগ-ভোগের পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন। তদবধি কালী-

পূজার সমস্ত ভার পড়িল ভক্তপ্রবর রামকৃষ্ণের উপর। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে ভক্তিরসে সিক্ত করিয়া তিনি পূজার পুষ্পার্ঘ্য দিতে লাগিলেন। একাগ্র ও অনাবিল ভক্তি-অশ্রুতে তিনি প্লাবিত হইতে লাগিলেন। কয়েকদিন পরে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। মায়ের স্বরূপ-মূর্তি দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। তিনি পূজার সময়ে নৈবেদ্য প্রভৃতির কথা ভুলিয়া 'মা মা' বলিয়া কাঁদিয়া ভাসাইতেন। সকলে ভাবিলেন তিনি প্রকৃতিস্থ নহেন। দেবতার প্রাঙ্গণে এরূপ সাধু কেহ আসেন নাই। দেবীর উঠানে এরূপ ক্রন্দন কেহ করেন নাই। মথুরবাবু, রাণী রাসমণি স্বয়ং এ দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রাণীমা ভাবিলেন তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়াছে। এই ভক্ত একজন অসাধারণ সাধক, একজন মহাপুরুষ, তিনি মায়ের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, ভক্তিভরে শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার তাঁহার স্থান কুলাইতেছে না, তাই তিনি কাঁদিয়া ভাসাইতেছেন।

গর্ভধারিণী চন্দ্রামণি দেবী এই কথা শ্রবণ করিয়া পুত্রকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, পুত্রকে কাছে রাখিয়া সান্ত্বনা দিতে চাহিলেন। সকলে পরামর্শ করিয়া ভক্ত রামকৃষ্ণকে জননীর নিকট কামারপুকুরে পাঠাইয়া দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ একবার বলিয়াছিলেন,—"শালগ্রাম শিলা তো কিছুই দেখায় না, ভক্তি সেই রূপ-হীনতার মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথের রূপকে প্রকাশ করে আপন জোরে। যেখানে দেখা যাচ্ছে না সেইখানেই দেখব এই হোক আমার সাধনা, যেখানে ঠাকুর লুকিয়ে থাকেন সেইখানে গিয়েই তাঁর চরণে আপনাকে দান করব, তিনি আমাকে এড়াতে পারবেন না।" (যোগাযোগ পৃঃ ৮২)। মীরাবাঈ প্রভৃতি ভক্ত-হৃদয়ের মনোভাব ছিল এই প্রকার। গদাধরের (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের) আন্তরিকতা ও ভক্তির গভীরতার গুণে তিনি জগজ্জননীকে আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। মা কালীর উপর তাঁহার কত জোর ছিল। সুগভীর আস্থা, বিশ্বাস, সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন তাঁহাকে সিদ্ধিলাভে লইয়া গিয়াছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের দেহাবসানের পর যখন কালীমাতার পূজা-অর্চনার ভার প্রাপ্ত হইলেন, তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণ (গদাধর) মন্দির মধ্যে মাতৃমূর্তি দর্শনে আকুল হইয়া দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ীর যেখানে-সেখানে মা-মা বলিয়া লুটাইয়া পড়িতেন। তিনি উপলব্ধি করিতেন মাতৃদারিধ্য, লাভ করিতেন মাতৃস্নেহ, ভক্তি প্রাবল্যে ইহজগৎ তাঁহার নিকট অবলুপ্ত হইত।

জননী চন্দ্রামণি দেবী পুত্রকে গৃহী করিবার জন্য আত্মীয় স্বজনের সহিত পরামর্শ করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কামারপুকুরের নিকটবর্তী জয়রামবাটির রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটি কন্যা ছিল। এই পঞ্চ বৎসর বয়স্কা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হইল। স্নেহময়ী জননী কনিষ্ঠ তনয় গদাধরকে (রামকৃষ্ণকে) সংসারী করিবার উদ্দেশ্যে বালিকা-কন্যা সারদামণির সহিত শুভ-লগ্নে তাঁহার বিবাহ দিলেন। [শ্রীসুধীরকুমার মিত্র প্রণীত 'হুগলী জেলার ইতিহাস' পৃঃ ৭০৮ দ্রষ্টব্য]

মহাসাগরের জলোচ্ছ্বাস সম্বন্ধে যাঁহার অভিজ্ঞতা আছে, তিনি নদী বা তড়াগের জল বিস্তার দেখিয়া আকৃষ্ট হইবেন কেন? নদীর জলস্রোত তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না। বিবাহ-বন্ধন তাঁহার মনে কোন রেখাপাত করে নাই। বিবাহের কিছুদিন পরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন। মায়ের সন্তান পুনরায় মায়ের কোল পাইলেন। তিনি দিবারাত্র মাতৃ সম্বোধন করিতেন, মা-মা বলিয়া ডাকিতেন, নিজের রিক্ততা ও মানসিক শূন্যতার কথা বলিতেন। এমন সময়ে একজন সন্ন্যাসিনী আসিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। তিনি ঠাকুরকে দেখিয়া একজন মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিলেন। তাঁহার ভক্তির নিবিড়তা, একাগ্রতার

ও আন্তরিকতা দেখিয়া জানিলেন তিনি একজন অসাধারণ সাধক, অভাবনীয় ভক্ত। সন্ন্যাসিনী ছিলেন তন্ত্রশাস্ত্রে অদ্বিতীয়া পণ্ডিত, তিনি তান্ত্রিক প্রণালীতে সাধনা শিক্ষা দিলেন। ঠাকুর তাঁহার নিকট তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন। ['হুগলী জেলার ইতিহাস' পৃঃ ৭০৮ দ্রষ্টব্য]

কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের পূজা-অর্চনায় ভিতর জীবন কাটিতে লাগিল; তৎপরে আসিল ভাবমূলক পরিবর্তন। একদিন তোতাপুরী স্বামী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তিনি ছিলেন একজন পরমহংস পরিব্রাজক পরম ভাগবত নিষ্ঠাবান সাধক। পরাবিদ্যায় তাঁহার জ্ঞান ছিল অসীম। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দেখিয়া তিনি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আভাস পান। তাঁহার নিকট ঠাকুর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, তাঁহার নাম দিলেন রামকৃষ্ণ; গদাধর এখন হইতে হইলেন রামকৃষ্ণ।

বঙ্গদেশের কৃষ্টি, ধর্ম ও জীবন-দর্শনের ধারা প্রতিভাত হইয়াছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণীতে। দক্ষিণেশ্বরের ঋষি শ্রীরামকৃষ্ণ আপাত-দৃষ্টিতে নিরক্ষর হইলেও, দিব্যজ্ঞানে, ধর্মবিশ্বাসে ও ঈশ্বর-প্রেরণায় অতীব উন্নত ছিলেন। তাঁহার নিষ্ঠা, পরাভক্তি ও ধর্মসাধনা তাঁহাকে যুগাবতারের শ্রেষ্ঠ আসন দান করিয়াছে। গভীর-ধ্যান, অধ্যাত্মজ্ঞান ও অনন্যভক্তি অন্যান্য ব্যক্তি হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছিল। ঈশ্বর-সান্নিধ্য, বিশ্বপ্রেম ও তত্ত্বজ্ঞান তিনি বিশেষভাবে লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালীন কৃতবিদ্য, পণ্ডিত, মনীষা-সম্পন্ন বঙ্গকোলের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী তাঁহার গুণগ্রাহিতার অকপট দৃঢ়তার, অকৃত্রিম প্রেম পরিচয়ে ও জ্ঞান-ভক্তির সুনিবিড় ভাবপ্রবণতায় সর্বদা বিমুগ্ধ হইয়া থাকিতেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তিনি যখন বুঝিলেন, তাঁহার ভৌতিক দেহ শীঘ্র নিঃশেষের পথে অগ্রসর হইতেছে, তিনি তখন শিষ্যবর্গকে আহ্বান করিয়া উপদেশ দেন। তিনি ঐদিন আনন্দাতিশয্যে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। দেহ-বন্ধন মুক্ত হইবে বুঝিয়া তিনি অপার আনন্দ লাভ করিয়া পরম ঈশ্বরের নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ভক্তবৃন্দ চতুর্দিকে আসীন ছিলেন, তাঁহারা এ আকুলতা দেখিয়া মুগ্ধ হন। অকপট চিত্তে, পবিত্র মনে তিনি তাঁহাদের আশীর্বাণী বর্ষণ করেন। বৈজ্ঞানিক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ভক্ত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ঈশ্বরপরায়ণ বাগ্মী কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি গুণমুগ্ধ প্রতিভাবান পুরুষ তাঁহার ভাবের গভীরতা ও ঐকান্তিক ভক্তি দেখিয়া এবং সরলভাবে তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাখ্যা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। বিহারের রাজ্যপাল বরেণ্য শ্রীযুত আয়ার, আর, দিবাকর ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী "কল্পতরু উৎসব"-এর বাৎসরিক অধিবেশনে বলিয়াছিলেন,—"এই দিবস আশীর্বচনের দিন। আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ লাভ করিবার জন্য যাঁহাদের তীব্র বাসনা ছিল তাঁহাদের তিনি ঐদিন উপদেশ দিয়াছিলেন, আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। অন্তর্নিহিত তত্ত্বজ্ঞান, অধ্যাত্ম বিদ্যার সাধনার ফল, সঞ্চিত জ্ঞানা-মৃত তিনি ঐদিন সকলকে বিতরণ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জগতে প্রমাণ করিয়াছেন —ভারতাত্মা এখনও যে বিদ্যমান কেবল তাহাই নহে, ইহা ভারতের প্রাণকেন্দ্র, ইহা জীবনের নূতন মূল্য সৃষ্টি করিবে এবং সমগ্র মানবজাতির উপকারে আসিবে। আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা, আন্তরিক বাসনা ও ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে যাঁহাদের মনে, তাঁহাদের পক্ষে ইহা শুভদিন। আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটাইবার জন্য যাঁহারা ব্যগ্র, তাঁহাদের নিকট ইহা পবিত্র দিবস। আধ্যাত্মিক ক্ষুধা বা আকাঙ্ক্ষা অনন্ত জীবনের জন্য, বিস্তৃত অধ্যাত্ম-জীবন লাভের জন্য যাহা ধনৈশ্বর্যের মধ্য দিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যাহা লাভ করা যায় রিপুগুলির দ্বারা, অশিষ্ট উচ্ছৃঙ্খল মনের উপর বিজয় লাভের দ্বারা এবং যাহাকিছু মনকে অশান্ত করিয়া তুলে ও পীড়া দেয় সেগুলির দমনের দ্বারা।

বাহ্য-প্রকৃতির উপর আত্মার জয়লাভই হইতেছে মানব জীবনের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, সকলকে নারায়ণ জ্ঞান করিবে। ভগবান সকল মানুষের মধ্যে আছেন ভাবিয়া তাঁহার সেবা করিবে। এই শিক্ষা তিনি শিষ্যদের দিতেন, এই আদর্শ তিনি নিজ জীবনে সকলকে দেখাইতেন। মানব যে কতদূর অগ্রসর হইতে পারে, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা কি পরিমাণে লাভ করিতে পারে, ঈশ্বর-চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া ও ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া রামকৃষ্ণের জীবন তাহারই পূর্ণ প্রতীক, জীবন্ত দৃষ্টান্ত, ও বিশদ ব্যাখ্যা। সমগ্র বিশ্বের সহিত একত্ব স্থাপন করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের বাণী। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের নির্বিকল্প সমাধি দেখিয়াই যে সন্তুষ্ট হইতেন তাহা নহে, অধ্যাত্মবাণী বিশ্বের সর্বত্র প্রচার করিতে স্বামিজীকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। বিশ্বমানবের কল্যাণে তিনি কি করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্দৃষ্টি ছিল অসাধারণ। তিনি সর্বভূতে নারায়ণ দেখিতেন; সকলকে পবিত্র চক্ষে, স্নেহের চক্ষে, প্রেমের চক্ষে দেখিতেন। নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার-সাধন, দুঃস্থের সেবা-কার্য প্রভৃতি পরম ধর্ম বলিয়া অন্তর হইতে ঘোষণা করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, ধর্মক্ষেত্রে সকল পথই ঈশ্বর-সান্নিধ্যে লইয়া যাইতে পারে। সকল সম্প্রদায়ের প্রতি উদারনীতি, সাম্যভাব ও সহিষ্ণুতা তাঁহার আদর্শের ভিত্তি। পণ্ডিতপ্রবর পাদ্রী-অধ্যাপক ফাদার ফ্যালোঁ (Prof. Father Fallon M. A.) বলিয়াছেন: 'In Sri Ramkrishna's life I see a clear sign of God's grace which can transform a man into a son of God. As a christian I sincerely believe that in the life of Ramkrishna we found a new shining evidence of this divinising power of God's grace and that is why I bow to him with deep respect seeing in him the wonderful effects of God's sanctifying grace.'

[আগামী-বারে সমাপ্য]

হরানন্দ ভট্টাচার্য

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

মনীষী শিবনাথ শাস্ত্রীর নাম আমাদের দেশে শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে আজ অজানা নয়। তাঁর চরিত্রের মাধুর্য—সহৃদয়তা, সত্যবাদিতা, একনিষ্ঠা, মনের নির্ভীকভাব—এ সমস্তই তাঁর পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে পাওয়া।

এক

গ্রীষ্মকাল। মজিলপুর গ্রামের একজন প্রতিবেশীর পুষ্করিণীর মাছ মরে ভেসে উঠল। পরদিন সকালে দেখা গেল—শিবনাথদের বাড়ীর ঝি পুষ্করিণীর পাড়ে বাসন মাজতে গিয়ে একটা বড় মাছ জল থেকে তুলে বাড়ীতে নিয়ে এল। শিবনাথের মা—হরানন্দের স্ত্রী গোলকমণিকে ঝি বললে: মা, বৃন্দাবন মুখুজ্যের পুকুরে রাত্রে অনেক মাছ মরে ভেসে উঠেছে। পাড়ার যত সব লোক কোঁচড়ভর্তি করে মাছ নিয়ে যাচ্ছে। তাই, আমিও একটা নিয়ে এসেছি।

গোলকমণি মনে করলেন—পাড়ার লোক যখন নিয়ে যাচ্ছে, তখন নিশ্চয় বাড়িওয়ালারা মাছ বিলচ্ছে। সেই জন্য, তিনি ঝিকে কিছু বললেন না।

ওদিকে বাজারে যাবার সময় হতে হরানন্দ স্ত্রীর কাছে এসে বললেন : কই, বাজারের পয়সা দাও ? বেলা হয়ে গেছে।

গোলকমণি বাজার করবার পয়সা দিলেন স্বামীর হাতে। কাঁচা বাজার কি কি আনতে হবে, বলে দিলেন। কিন্তু মাছের কথা কিছু বললেন না।

হরানন্দ বললেন : কই, মাছের পয়সা ত' দিলে না গা' ! মাছ কি আজ আসবে না ?

গোলকমণি বললেন : আজ মাছ আনতে হবে না। মাছ আজ আছে। বৃন্দাবন মুখুজ্যের পুকুরে রাত্রে অনেক মাছ মরে ভেসে উঠেছে। বিস্তর লোক নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ঝিও এনেছে একটা। বেশ বড় মাছ।

স্ত্রীর কথা শুনে হরানন্দ ক্রোধে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। রাগলে তাঁর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। 'ভিসুভিয়াসের আগ্নেয়গিরির মতো তিনি হয়ে পড়েন। এ ক্ষেত্রেও তাই হ'ল। চুপড়ি শুদ্ধ কোটা-মাছ দেখবার জন্ত নিজের কাছে আনালেন। ঝি-ই নিয়ে এল। হরানন্দ তখন ঝিকে ভীষণ বকাবকি করলেন। এই মারেন ত এই মারেন। তবে ঝিয়ের মুখ কাগজের মতো ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। হরানন্দ রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঝুড়িশুদ্ধ কোটা-মাছ বৃন্দাবন মুখুজ্যের বাড়ী ঝিয়ের মাথায় চাপিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর নিজে হন্ হন্ করে বাজারে বেরিয়ে গেলেন মাছ আনতে।

দুই

ক'লকাতার বাংলা পাঠশালায় তখন হরানন্দ 'পণ্ডিতী' করেন। গ্রীষ্মের ছুটি পড়েছে। শিবনাথকে নিয়ে তিনি দেশের বাড়ী মজিলপুরে এসেছেন। সে সময় দেশে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ। চারিদিকে গরীব লোক অন্নের জন্ত হাহাকার করছে। এই দুঃস্থ লোকেদের জন্ত তখনকার ইংরাজ-সরকার একটা রিলিফ-কমিটি গঠন করেছেন। হরানন্দের প্রতি এই রিলিফ-কমিটির সভ্যদের অসীম বিশ্বাস। তিনি, মানে হরানন্দ, যাকে সাহায্য করা উচিত বলে মনে করতেন, কমিটির সভ্যেরা অম্লানবদনে তাই করতেন। হরানন্দ কখনো অন্তায় করতে পারেন না, এই অটল বিশ্বাস তাদের ছিল। কাউকে সার্টিফিকেট দিতে হ'লে, হরানন্দ তার গ্রামে গিয়ে তার উঠন অবধি দেখে এসে উপযুক্ত মনে করলে তবে তাকে সার্টিফিকেট দিতেন।

ক'লকাতায় ফিরে যাবার সময় হ'ল। যাত্রা করতে হবে। পাঠশালার ছুটি শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু হরানন্দ শুনলেন—তাঁদের গ্রাম থেকে মাইল তিন-চার দূরে কোনো একটি চাষা সপরিবারে ক'দিন হ'ল অনাহারে আছে। শোনামাত্রই তিনি নিজের গোলা থেকে কিছু চা'ল নিজের কোঁচড়ে বেঁধে পায়ে হেঁটে তাদের দিতে গেলেন। চা'ল দিয়ে তাদের বললেন : পরশু হাটবারে তোমরা আমার কাছে যেও। আমি তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব রিলিফ-কমিটির বাবুদের কাছে। তাঁদের কাছ থেকে সাহায্য পাবার ব্যবস্থা করে দেব।

হরানন্দ ওদের এই প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাঁর মনে ছিল না যে, ঐদিন তাঁর কলকাতায় ফিরে যাবার দিন। সেই হাটবারের দিন-ই তাঁকে স্কুলে পড়াবার জন্ত ক'লকাতায় যেতে হবে। যদি অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে ছুটির দু'মাসের মাইনে আর পাবেন না। তখন নিয়মটা এইরকমই ছিল।

পরদিন যথাসময়ে পিতাপুত্রে পালকি ভাড়া ক'রে কলকাতার দিকে রওনা হলেন। পালকি ধীরে ধীরে নদীর ওপর দিয়ে যাচ্ছে। গ্রাম থেকে গ্রাম মাইল চারেক পথ এগিয়ে এসেছে পালকি। শিবনাথ ভিতরে বসে বাইরের প্রকৃতির শোভা দেখছেন। হরানন্দ ওদিকে ছোট হুঁকাটি হাতে নিয়ে তামাক খাচ্ছেন বাইরে ব'সে। হঠাৎ তিনি আপন মনে বলে উঠলেন : এই যাঃ—ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে। ওরে, তোরা থাম্ থাম্। আমাকে এখুনি যে ফিরে যেতে হবে।

শালতির চালকেরা বেশ কিছুটা আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা হরানন্দের মুখের দিকে চেয়ে বললে: সে কি কর্তা? এতদূর এগিয়ে এসে ফিরতি-পথ ধরব?

হরানন্দ ঘন ঘন তামাক টানতে টানতে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ব্যস্তভাবেই বললেন: হাঁ—হাঁ! ফিরে যেতেই হবে। বড় ভুল হয়ে গেছে রে, বড় ভুল হয়ে গেছে! তা তোমরা চিন্তা করো না বাপু। তোমাদের প্রাপ্য আমি দেব। তোমাদের অপরাধ নেই। আমি শালতি ভাড়া না করলে তোমরা অন্য যাত্রী পেতে।

শিবনাথের বুদ্ধি প্রখর। ছেলেমানুষ হ'লে হবে কি? তিনি পিতাকে বললেন: বাবা, আপনাকে কাল ত' স্কুলে হাজিরা দিতেই হবে। তা না হ'লে, আপনার ছ'মাসের মাইনে কাটা যাবে যে!

হরানন্দ বললেন: তা আর কি করা যাবে বল্? ওদিকে যে মহেশ কাওরা-রা অনাহারে সপরিবারে মারা যায়! আমি হাটবারে ওদের বলেছি আসতে। আমি গরীবদের কাছে কথা দিয়েছিলুম। এটা আমি গিয়েছিলুম ভুলে। এখন যখন মনে পড়েছে, তখন আর তা' ভঙ্গ করতে পারিনে।

হরানন্দ ভট্টাচার্যকে সকলেই ভালো ক'রে চিনতেন। 'না' বললে ওঁকে 'হাঁ।' বলান' যায় না। 'হাঁ।' বললে 'না' বলান' যায় না। সুতরাং শালতির চালকদের অনিচ্ছার সঙ্গে শালতির মুখ হরানন্দের বাড়ীর দিকে ফেরাতে হ'ল।

তিন

হরানন্দ ভট্টাচার্য গ্রামের হাডিঞ্জ-মডেল বাংলা-স্কুলে হেড পণ্ডিতের কাজ করছেন তখন। ইংরেজ-সরকার স্কুলঘর মেরামতের জন্য হরানন্দের কাছে কিছু টাকা পাঠালেন। যথাসময়ে হরানন্দের তত্ত্বধানে স্কুলঘর মেরামত হয়ে গেল। বাঁচল কতকগুলি শালের খুঁটি। এই খুঁটিগুলির কি বন্দোবস্ত করা যায়—এই সম্বন্ধে জানবার জন্য তিনি সরকারের কাছে চিঠি লিখলেন। একমাস গেল। ছ'মাস গেল। চিঠির জবাব আর আসে না। তখন হরানন্দ ভেবে-চিন্তে খুঁটিগুলো পুষ্করিণীর মধ্যে ডুবিয়ে রাখলেন। গ্রামের অনেকেই এই সংবাদ জানতেন।

কিছুদিন পর। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। হরানন্দ ঘরের দাওয়ায় বসে প্রণয়চিত্তে তামাক খাচ্ছেন। গ্রামের একটি ভদ্রলোক এলেন। হরানন্দকে প্রণাম ক'রে তিনি সবিনয়ে বললেন: পণ্ডিতমশাই, আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন।

: কল্যাণ হোক বাপু, কল্যাণ হোক। বসো এখানে। তামাক খাও। বললেন হরানন্দ।

: না থাক। বসব' না। আমার বেশী সময় নেই। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি—এই স্কুলের পুকুরে যে শালের খুঁটিগুলো ডুবিয়ে রেখেছেন ওগুলো কি হবে?

হরানন্দ বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই বললেন: কি হবে তা' ত' জানিনে বাপু। সরকারের জিনিষ। হয় অন্য কোনো স্কুলের মেরামতের কাজে লাগবে, আর নয় ত' নিলামে বিক্রী করতে হবে!

ভদ্রলোক একটু চুপ ক'রে থেকে ঈষৎ হাস্যে বললেন: ওগুলো আমাকে দিন না, পণ্ডিতমশাই! কিছু ধ'রে দিচ্ছি আপনাকে!

সরলচিত্ত হরানন্দ ভদ্রলোকের দুরভিসন্ধি বুঝতে পারলেন না। মনে করলেন, ভদ্রলোক ঐ শালের খুঁটিগুলো কিনতে চান। হুঁকোর শেষ টান দিলেন। দাওয়ার একটা দেয়ালের কোণে ঠেস্ দিয়ে হুঁকোটি রাখলেন। বললেন স্বাভাবিক স্বরে: তুমি কি বাপু আমার কথাটি শুনতে পেলে না? বললুম না ওটা সরকারের জিনিষ! তাঁরা যেমনটি বলবেন, তেমনটি হবে। ওঁদের হুকুম ছাড়া কি বেচতে পারি বাপু?

ভদ্রলোক এবার একটু গম্ভীর হয়ে বললেন: পণ্ডিতমশাই, আমি বধির নই। আপনার সমস্ত বাক্যই আমার কাণে গিয়েছে। কিন্তু সে কথা থাক!

আসল কথা শুনুন। আমি একখানা ঘর তুলছি। শালের খুঁটির দরকার। আপনাকে দশ-বারো টাকা ধ'রে দিচ্ছি। আমাকে খুঁটিগুলো দিন না, পণ্ডিত-মশাই!

ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন হরানন্দ। চেয়ে থাকতে থাকতে ওঁর মনের অভিসন্ধিটা এবার সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করলেন হরানন্দ। মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর প্রসন্নচিত্ত ক্রোধ ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি সিংহবিক্রমে লাফ দিয়ে ভদ্রলোকের একখানা হাত চেপে ধরলেন। রক্তচক্ষে চীৎকার ক'রে বললেন: তুমি এমন ছোটলোক যে, তুমি আমাকে দশ-বারো টাকা ঘুষ দিয়ে খুঁটিগুলো অমনি নিতে চাও? তুমি আমাকে এমন ছোটলোক মনে করেছ যে, শালের ধন ঘুষ নিয়ে তোমাকে দেব। চল—তোমাকে থানায় দেব। তুমি নিশ্চয় খুঁটিগুলোর কিছু চুরি করেছ!

সে যাত্রা ভদ্রলোক বেঁচে গেলেন শিবনাথের মধ্যস্থতায়। শিবনাথ পিতাকে অনেক ক'রে শান্ত করলেন।

চার

গোলকমণি গ্রামের একটি চাষাকে ষোল টাকা ধার দিয়েছিলেন। সর্ত ছিল—সুদের পরিবর্তে চাষাটি প্রতি হাটবারে কিছু কিছু কাঁচা বাজার দিয়ে যাবে। পরে যখন টাকা হাতে আসবে তখন সে ঐ ষোলটি টাকা পরিশোধ করবে। প্রায় চার বছর সে প্রতি হাটবারে কিছু কিছু কাঁচা আনাজ গোলকমণিকে দিয়ে যেতে লাগল। এই সময়ের মধ্যে গোলকমণির টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় তার কাছে টাকা চাইলেন। এতে ফল হ'ল এই যে, সে আর ওপথ দিয়ে চলা বন্ধ করে দিলে। গোলকমণি তার দেখা পান না। ওদিকে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে গ্রামের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। এমনি সময় পথে গোলকমণির সঙ্গে চাষাটির দেখা হয়ে যায় একদিন। তিনি ওকে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিলেন: টাকা ধার নিয়ে বুঝি শোধ করবার কথা মনে থাকে না তোমাদের? চার বছর পার হয়ে গেছে। টাকা শোধ করার নামটি নেই। দেখো বাছা, তোমাকে আবার বলছি—দু'-একদিনের মধ্যে আমার টাকাটা দিয়ে যেও।

হরানন্দের কাণে সে কথা আসতে দেরী হ'ল না। তিনি বাড়ীতে এসে স্ত্রীকে বললেন: তুমি না হিন্দুর মেয়ে? তুমি কোন্ আক্কেলে এই দুর্ভিক্ষের সময় তাকে টাকার জন্যে পীড়াপীড়ি করো?

বিকেলবেলা হরানন্দ নিজের চা'লের গোলা থেকে কিছু চা'ল কোঁচড়ে বেঁধে তিন-চার মাইল পথ পায়ে হেঁটে সেই চাষাকে দিয়ে এলেন। ঋণের টাকা আদায় দূর হ'ল, উপরন্তু হরানন্দ ঐ দরিদ্র চাষার পরিবারে নিয়মিত অন্ন যোগাতে লাগলেন।

মজিলপুর নিবাসী এই পণ্ডিত হরানন্দ ভট্টাচার্য ছিলেন তেজস্বী, নির্লোভ এবং ত্যাগী ব্রাহ্মণ। পুত্রের মতো পুত্র শিবনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় তাঁর মনে যে কষ্ট হয়েছিল তাতে তিনি ছেলের মায়া এরূপ পরিত্যাগই করেছিলেন। তিনি সংকল্পচ্যুত হন নি। সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত 'নলোপাখ্যান' গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য সন্দেহ নেই। এ ছাড়া, বাল্মীকির রামায়ণের আদিকাণ্ডটি হরানন্দ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। শিবনাথের সাহিত্য-প্রতিভা পিতার কাছ থেকেই পাওয়া। হৃদয়ের বিশালতার দিক দিয়ে হরানন্দের সমকক্ষ ব্যক্তি সহসা চোখে পড়ে না। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর মনের তেজোদীপ্তি পূর্ণমাত্রায় বর্তমান ছিল। পঁচাশি বছর বয়সে তিনি সজ্ঞানে ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

হরানন্দ ১৩১৮ সালের ২৭শে শ্রাবণ পরলোকগমন করেন। এর দু'এক দিন আগে শিবনাথ পিতাকে ক'লকাতা থেকে দেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর সময় শিবনাথ উপস্থিত ছিলেন না। মৃত্যুর দিন হরানন্দ বারংবার শিবনাথের নাম ক'রে বলতে

লাগলেন :—বড় প্রয়োজন ছিল যে! হায় হায়! তার সঙ্গে আমার আর দেখা হ'ল না!

মৃত্যুর দিনেও হরানন্দ দুর্বল শরীরে লাঠি ধ'রে বারান্দায় বেড়িয়ে ছিলেন। পা ঠিক রাখতে পারছেন না। দেহ টলছে। কাছেই কন্যা কুসুম ছিল। বললে : বাবা, কেন হাঁটছ? পড়ে যাবে যে!

হরানন্দ শুনে রাগ ক'রে বললেন : কেন, আমি কি শিশু, যে চলতে গেলে পড়ে যাব?

ওদিকে কবিরাজ এলেন। নাড়ি টিপে বললেন : আর বেশিক্ষণ নয়। গঙ্গাযাত্রা করো। তখন ধরাধরি ক'রে সকলে হরানন্দকে শুইয়ে দিলেন। ভাগ্নে কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে : মামা, নাম করো!

হরানন্দ কখনো কারো আদেশ সহ্য করতে পারতেন না। তাই জীবনের শেষ মুহূর্তেও তিনি ঐ আদেশ শুনে বিরক্ত হ'লেন। বললেন : মরবার সময় নাম করছি না ত' করছি কি?

তাঁর কথা শেষ হ'ল।

তাঁর পুণ্যাত্মা,—দেহটা পরিত্যাগ ক'রে মিশিয়ে গেল অনন্তে। কর্তব্যপরায়ণ পিতার উপযুক্ত পুত্র শিবনাথ কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। পিতাকে তিনি পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় বলে ভক্তি করতেন। শিবনাথ লিখেছেন :

'কর্তব্য বুঝিব যাহা, নির্ভয়ে করিব তাহা,
যায় যাক্, থাকে থাক্ ধনপ্রাণ মান রে;
পিতারে ধরিয়া রব পর্বত সমান রে।....'

সংঘবার্তা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম, দার্জিলিঙ : বিগত ১২শে ফাল্গুন, ১৩৬৩ (ইং ৩রা মার্চ, ১৯৫৭) রবিবার, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২২-তম আবির্ভাব তিথি দিবসে উক্ত আশ্রমে বিশেষ পূজা ও ভজন-সংগীতাদি হইয়াছিল। সহস্রাধিক বাঙালী, নেপালী, ভুটিয়া ও চাইনিজ্, নর-নারী ঐ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেই প্রসাদ পাইয়াছিলেন। ঐ দিবস ভোর হইতে অধিক রাত্র পর্যন্ত আনন্দোৎসব চলিয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম, নিলকুঠী : কুচবিহারের অন্তর্গত নিলকুঠী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে স্বামী সত্যরূপানন্দজী ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর নেতৃত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১২২-তম শুভ জন্মোৎসব প্রতিপালিত হইয়াছিল। এবার এখানে কয়েকদিন যাবৎ যেরূপ বিরাটভাবে পূজা, পাঠ, ভজন, কীর্তন ও সভাদি হইয়াছিল সেরূপ ইতিপূর্বে কখনও হয় নাই।

দোলযাত্রা : বিগত ২রা চৈত্র, ১৩৬৩, শনিবার শ্রীশ্রীঠাকুরের দোলযাত্রা উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে বিশেষ পূজা ও ভজন সংগীতাদি হইয়াছিল।

বিশেষ পূজা : ২১শে বৈশাখ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য-দেবের জন্মতিথি দিবসে ও ৩০শে বৈশাখ, বুদ্ধপূর্ণিমা দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজাদি হইবে।

ধর্মালোচনাদি : বিগত ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের প্রতি সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় শ্রীভাগবত শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যান হয়। প্রতি শনিবার অপরাহ্ণ তিনটার সময় সংগীতবিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী ও সম্প্রদায় কর্তৃক শ্রীশ্রীরামনাম কীর্তন ও ভজনসংগীত হয়; এবং প্রতি রবিবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর সংগীতাচার্য কথকশিরোমণি পাঁচকড়ি ব্যানার্জী মহাশয় কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত কথকতা হয়। বৈশাখ মাসেও এইভাবে প্রত্যহ ধর্মালোচনাদি হইতেছে।

পণ্ডিত শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহার পরিবর্তে পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বেদান্ত-তীর্থ মহাশয় গত মাস হইতে শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার পাঠ ও ব্যাখ্যা-পদ্ধতি প্রশংসনীয়।

বিশ্ববাণী

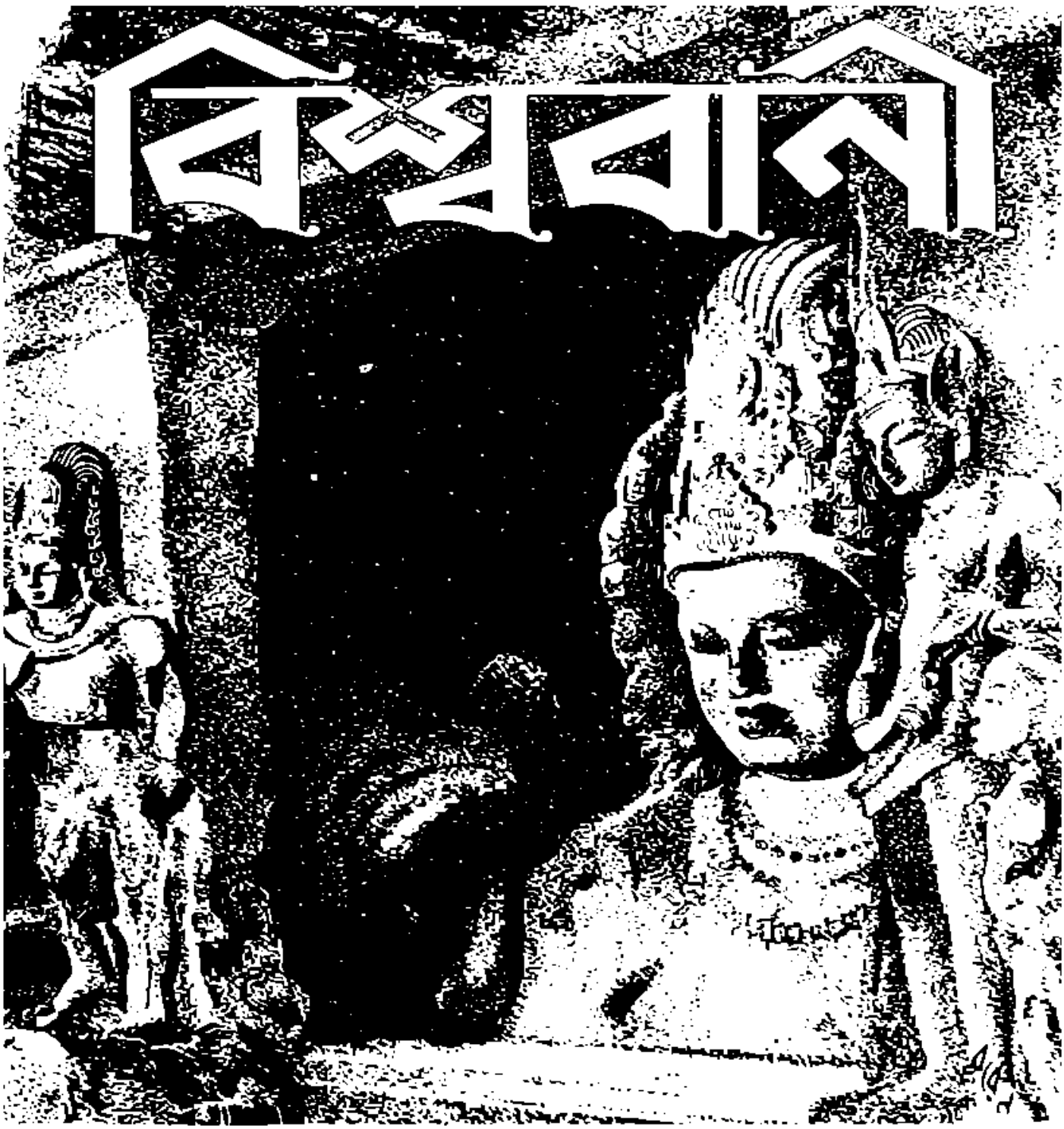

প্রতিষ্ঠাতা : স্বামী বিবেকানন্দ

উনবিংশতি বর্ষ—চতুর্থ সংখ্যা

বার্ষিক মূল্য চারি টাকা চারি আনা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪

প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট; কলিকাতা-৬ : ফোন : ৫১—১৮০২

সম্পাদক স্বামী সত্যজ্ঞানন্দ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে ব্রহ্মচারী বসন্তকুমার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৭০, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, মানসী প্রেস হইতে শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

বিশ্ববাণী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪

সূচীপত্র

	বিষয়			পৃষ্ঠা
১।	পঞ্চকূটের চাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে (শ্রীরামকৃষ্ণবাণী)			১৭৫
২।	ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ		১৭৬
৩।	বৌদ্ধদর্শনের দু'একটি কথা	শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য		১৭৯
৪।	বিশ্বাস ও আত্মনিবেদন	বিদেহ		১৮৩
৫।	বৈষ্ণব-সাহিত্যে মহোৎসব	শ্রীসন্তোষকুমার কুণ্ডু		১৮৪
৬।	উপনিষদের ব্রহ্মবস্তু	শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়		১৮৯
৭।	বর্ষের প্রথম দিনে (কবিতা)	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	...	১৯২
৮।	চুচুঁড়ার সংগীত-শিল্পী	শ্রীবিপ্রদাস বসী	...	১৯৩

জামসেদপুর—ব্রাঞ্চ

সদ্য প্রকাশিত !

বাংলা জীবনী-সাহিত্যের বিশিষ্ট কীর্তি

শঙ্করনাথ রায়ের—

ভারতের সাধক

১ম খণ্ড মূল্য—৫৲ ২য় খণ্ড মূল্য—৫৲

ব্রহ্মপুরুষ ও সাধুসন্তদের চরিত-সঙ্কলন গ্রন্থ। যোগী, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, মরমিয়া প্রভৃতি মহাপুরুষদের লৌকিক ও অলৌকিক জীবনের রসমধুর কাহিনীতে ভরপুর। একাধারে এতে রয়েছে প্রামাণ্য জীবনতথ্য, অধ্যাত্মরসের প্রস্রবণ, অলৌকিক আখ্যান ও ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান।

● প্রতি খণ্ড স্বয়ংপূর্ণ। প্রত্যেকটিতে সাত-আটটি করে পূর্বাঙ্গ ও বিস্তৃত জীবনচরিত রয়েছে, আর রয়েছে সাধুমহাত্মাদের অপরূপ চিত্রাবলী।

পড়বার, বারবার পড়ে সঞ্চয় করে রাখবার ও প্রিয়জনকে উপহার দেবার মত বই। রঙীন সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে মোড়ানো, ছাপা বাঁধাই অনবদ্য।

সাধারণ পাঠাগার ও ব্যক্তিগত গ্রন্থভাণ্ডারের পক্ষে অপরিহার্য চরিত-কোষ গ্রন্থ।

শিবনাথ শাস্ত্রীর—

মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে

স্বনামধন্য মনীষী ও আচার্যের—

'মেন্ আই হাভ সীন'-এর সার্থক অনুবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির রেখাচিত্র অপরূপভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রকাশক—রাইটার্স সিণ্ডিকেট, ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

সূচীপত্র

	বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
৯।	বারে বারে (কবিতা)	...	শ্রীহাসিরাশি দেবী		১২৫
১০।	জাতির উন্নয়নে জনশিক্ষা	...	শ্রীছায়া ভট্টাচার্য		১৬৬
১১।	ভারতের তীর্থ দর্শনে		শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		১৬৯
১২।	শ্রীশ্রীমা (কবিতা)		শ্রীভোলানাথ গুপ্ত		১৭৭
১৩।	বৈষ্ণব-সাহিত্যে শ্রীরাধা		শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য		১৭৪
১৪।	বুদ্ধদেবের অন্তিম শিষ্য		শ্রীবাসমোহন চক্রবর্তী		১৮৮
১৫।	কামরূপ		স্বামী জগদীশ্বরানন্দ		১৮০
১৬।	জীবে প্রেম	...	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার দেব		১৮৩
১৭।	ধর্মের প্রয়োজনীয়তা	...	শ্রীঅবনীনাথ রায়		১৮৫
১৮।	"অন্নদামঙ্গল" কাব্যে মানবতা		শ্রীদন্তোষকুমার দত্ত		১৮৭
১৯।	"অন্তরে আলো আলো" (কবিতা)		শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়		১৯২
২০।	সংঘবার্তা	...		....	১৯৩

নূতন বই

সারদামণি

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সহজ ও সরল ভাষায় শ্রীমায়ের সম্পূর্ণ জীবনী

মূল্য : এক টাকা

Memoirs of Ramakrishna

by

SWAMI ABHEDANANDA

- The Best book on the wonderful teachings of the Master.
- The Stamp of the wisdom of the auther pervades throughout.

Price : Rs. 7/8

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH, 19B, Raja Rajkrishna St, Calcutta-6

'বিশ্ববাণী'-র নিয়মাবলী

১। 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে। বৎসরের যে কোন সময়ে আপনি গ্রাহক হইতে পারেন ; তবে প্রথম বা সপ্তম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

২। ফাল্গুন ১৩৬৫, বিশ্ববাণীর ১৯শ বর্ষ আরম্ভ। ইহার বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা চারি আনা, প্রতি সংখ্যা আট আনা। ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ—এই ছয় মাসেরই জন্য গ্রাহক হইতে হইলে সডাক দুই টাকা চারি আনা এবং ভাদ্র হইতে মাঘ—কেবল এই ছয় মাসেরই জন্য গ্রাহক হইলে সডাক তিন টাকা লাগিবে। সর্বপ্রকার গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া মূল্য অগ্রিম পাঠাইবেন।

৩। কোন গ্রাহকের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্তিত হইলে তিনি স্থানীয় ডাকঘরে তাহা নির্দেশ দিবেন ; বেশীদিনের জন্য হইলে পূর্ববর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে বিশ্ববাণী অফিসে উহা জানাইবেন।

৪। 'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহক মূল্য মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। কোনও মাসের বিশ্ববাণী সেই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে না পাইলে সে সংবাদ সেই মাসের ২০ তারিখ হইতে পরের মাসের তিন তারিখের মধ্যে বিশ্ববাণী অফিসে আসা চাই। নচেৎ ঐ পত্রিকা সরবরাহ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে।

৫। 'বিশ্ববাণী'-র জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইবার কালে রচয়িতার নাম-ঠিকানা যেন তাহাতে বেশ স্পষ্টাক্ষরে সন্নিবেশিত থাকে। 'বিশ্ববাণী'তে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হয়। প্রবন্ধাদি হারাইয়া যাইলে বা কোন প্রকারে নষ্ট হইলে আমরা দায়ী থাকি না। প্রবন্ধ ফুলস্কেপ চার পাতা এবং কবিতা আধ পাতার মধ্যে রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘাকার প্রবন্ধ ছাপা অসম্ভব। কোনও লেখা প্রকাশিত করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপেক্ষ। ইহার জন্য সম্পাদক কোনও কৈফিৎ দিতে বাধ্য নহেন।

৬। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৭। কাহারও কোন বিষয় জানিতে হইলে (গ্রাহক হইলে, গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া) সর্বদা রিপ্লাই কার্ডে অথবা ডাক-টিকিট সমেত পূর্ণ নাম-ঠিকানা পাঠাইতে হইবে। অন্যথায় উত্তর দেওয়া হয় না।

৮। বিশ্ববাণীতে প্রকাশের জন্য সর্বপ্রকার বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। পত্রদ্বারা অথবা বিজ্ঞাপন-দাতাকে স্বয়ং বিশ্ববাণীর কার্যাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত বিষয় জানিতে হয়।

ডি. রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফাটা
২২-১, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬
ফোন: ৩৪- ৩৭১১

উনবিংশতি বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৪ | চতুর্থ সংখ্যা

॥ পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে ॥

"দেখ না রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হ'য়ে কাঁদতে লাগলেন। আবার হিরণ্যাক্ষকে বধ করবার জন্য বরাহ অবতার হ'লেন। হিরণ্যাক্ষ বধ হ'লো, কিন্তু নারায়ণ স্বধামে যেতে চান না। বরাহ হ'য়ে আছেন। কতকগুলি ছানাপোনা হয়েছে! তাদের নিয়ে একরকম বেশ আনন্দে রয়েছেন। দেবতারা বল্‌লেন, একি হলো, ঠাকুর যে আস্‌তে চান না। তখন সকলে শিবের কাছে গেল ও ব্যাপারটি নিবেদন ক'রলে। শিব গিয়ে তাঁকে অনেক জেদাজেদি ক'রলেন, তিনি ছানাপোনাদের মাই দিতে লাগলেন। তখন শিব ত্রিশূল এনে শরীরটা ভেঙ্গে দিলেন। ঠাকুর হি হি করে হেসে তখন স্বধামে চলে গেলেন।

...পাঁকালমাছের মত থাকবে। সংসারে থেকে তফাতে গিয়ে, নির্জ্জনে ঈশ্বর-চিন্তা মাঝে মাঝে করলে, তা'তে ভক্তি জন্মে। তখন নির্লিপ্ত হয়ে থাক্‌তে পারবে। পাঁক আছে, পাঁকের ভিতর থাকতে হয়, তবু গায়ে পাঁক লাগে না।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

(উত্তরার্ধ)

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, বি. এল., বিদ্যাবিনোদ

সাধনার আদর্শ

ঠাকুর তাহার পর বার বৎসর ধরিয়া সাধনা করেন। ভারতবর্ষে যত প্রকার ধর্মমত প্রচলিত আছে, প্রায় সবগুলিতে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। সাধনার সময় তিনি তন্ময় হইয়া থাকিতেন : নিষ্ঠা ও একাগ্রতাবশতঃ যখন যে সাধনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতেই আত্মহারা, বিভোর হইয়াছেন।

"যেভাবে যে জন করে ভজন আমায়
সেইভাবে অনুগ্রহ করি আমি তায়।
সকাম নিষ্কাম পূজা যে করে যেমন
সর্ব্বথা আমার পথে করে আগমন।"

(সুধাকর কৃত গীতা)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখা গেল ভক্তির আপন সৌন্দর্যে সকলই কেমন যেন সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

ঠাকুরের ভাবপ্রবণ মন সুগভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া যাইত। ঈশ্বরচিন্তায় তন্ময়ভাবে তিনি যখন নিমগ্ন থাকিতেন, তখন তাঁহার ভাব-সমাধি হইত, বাহ্যজ্ঞান অবলুপ্ত হইত। তন্ময়তা তাঁহার সাধনার লক্ষণ ; একাগ্রতা, নিবিড়তম ভক্তি তাঁহার প্রাণের প্রকৃতি। ভগবান বুদ্ধ, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি ভক্ত-সাধকবৃন্দের এইরূপ হইত। ইহা নিবিষ্টমনপ্রসূত, পরাভক্তিসঞ্জাত। তখন বাহ্যজ্ঞানের বিলোপ হওয়া স্বাভাবিক : এই অবস্থায় তিনি আরাধ্য দেবীকে লাভ করিতেন। ইহাই 'communion with God'-এর অবস্থা। বাহ্য বিলোপ করিতে পারিলেই অন্তর উদ্ভাস হইয়া উঠিবে, শান্তি-প্রীতির নির্মল আলোকে প্রাণ উদ্ভাসিত হইবে। ঈশ্বরের স্পর্শলাভে প্রাণ পুলকিত হয়, দেহে পুলক সঞ্চার দেখা যায়। ঠাকুরের ঈদৃশ ঈশ্বর-কৃপা প্রায়ই ঘটিত।

প্রীতিপূর্বক ভাবসমন্বিত ভজনের কথা গীতায় উক্ত হইয়াছে। দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, যিনি এক নিবিষ্টমনে তাঁহাকে ভজনা করিতে পারেন, তিনি সেই ভক্ত সাধককে বুদ্ধি যোগ দান করেন। তাহার ফলে সাধক অধ্যবসায় অর্জন করেন এবং তাঁহার একনিষ্ঠতা বর্ধিত হয়। আর ইহার দ্বারা তিনি ঈশ্বরে উপগত হন।

ভক্তি দ্বারা ভগবদনুকম্পা প্রাপ্ত হইলে পরমেশ্বরের অভিজ্ঞান লাভ হয় ; সেই জ্ঞান অজ্ঞানজতমঃ নাশ করিয়া দেয়, তাহা হইতে পরমেশ্বরে প্রবেশ সিদ্ধ হয় ও ঈশ্বরভাব-প্রাপ্তি সরল হইয়া উঠে। ভগবান রামকৃষ্ণের ভক্তির প্রাবল্যে ভাবাবেশে ঈশ্বর-দর্শন প্রাপ্তি প্রায়ই ঘটিত।

ভাব-সমাধি

সুপণ্ডিত ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বলিয়াছেন, 'In our country we regard human beings as spark of spirit. The full nature of the human mind is realised by man when he is in communion with the Divine'. (আমাদের দেশে আমরা মানবসাধারণকে আত্মার স্ফুলিঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করি। মানবচিত্তের পূর্ণ প্রকৃতি উপলব্ধ হয়, যখন তিনি ঈশ্বর-সান্নিধ্যে আসেন)।

"বুদ্ধিতে অবিচ্ছেদ ধারায় ঈশ্বরকে ধ্যান বা চিন্তা করিলে বুদ্ধিতে যে কম্পন উপস্থিত হয়, অন্তর্যামী সেই পরমাত্মজ্ঞানে তদনুসারে অনুকম্পন হয়। সেই অনুকম্পন হেতু পরমেশ্বরের বিশেষ

অনুকম্পা হয়, সেই অনুকম্পা বা অনুকম্পন হইতে আমাদের চিত্তে জ্ঞানদীপ প্রদীপ্ত হয়।"*

"যিনি ভগবানের বিভূতি ও যোগতত্ত্ব ও তাঁহার সর্বকারণত্ব জানেন সেই বুধগণ অবিকল্পিত যোগে যুক্ত হন, ভাবসমন্বিত হইয়া ঈশ্বরকে ভজনা করেন। তাঁহারা সমাহিত অবস্থায় ঈশ্বরগতচিত্ত থাকেন ও ব্যুত্থিত অবস্থায় সাধুসঙ্গে পরস্পর ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা ও কথোপকথন করিয়া নিত্যতুষ্ট ও আনন্দিত থাকেন। যখন তাঁহারা এইরূপে সতত ঈশ্বরে অভিযুক্ত হইতে পারেন ও প্রীতিপূর্বক ভাবসমন্বিত হইয়া ভগবানকে ভজনা করিয়া থাকেন, তখন ভগবান তাঁহাদিগকে বুদ্ধি-যোগ প্রদান করেন। এই বুদ্ধিযোগফলে তাঁহারাও ভগবানে উপগত হন,—চিত্তে ধ্যেয়, জ্ঞেয়, চিন্তনীয় রূপে তাঁহারা ভগবানকে সদা সমীপবর্তী রাখিতে পারেন। আর ভগবান শুধু তাঁহাদের এই বুদ্ধিযোগ দেন না। তিনি অনুকম্পাপূর্বক তাঁহার আত্মভাবস্থ হইয়া তাঁহার চিত্তে আত্মভাবে বা পরমাত্মা পরমেশ্বর ভাবে স্থিত হইয়া তাঁহার চিত্তে জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত করিয়া দেন। ভগবান সর্বজ্ঞ, জ্ঞানস্বরূপ। সেই জ্ঞান সেই সাধকের সাধনাশুদ্ধ নির্মল চিত্তে প্রতিবিম্বিত করিয়া সেই জ্ঞানস্বরূপ দীপ দ্বারা ভগবান সে সাধকের চিত্তের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করেন। ভগবান আত্মভাবস্থ হইলে এই ভাবে সূর্যবৎ প্রকাশিত হয়।"*

শেষ জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ কর্কট রোগে আক্রান্ত হন। বহু চিকিৎসক তাঁহাকে অযাচিতভাবে ভক্তি-প্রণোদিত হইয়া চিকিৎসা করিতে আসেন। বহু গৃহী, ভক্ত, শিষ্য, ধনী তাঁহার সেবা-পথ্যের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তিনি ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িলেন, মায়ের নামই ছিল তাঁহার ঔষধ, ধ্যান আরাধনাই ছিল তাঁহার পথ্য। ভক্ত রামপ্রসাদের শ্যামা-সঙ্গীত তাঁহাকে জীবনীশক্তি দান করিত। বাঙ্গলা ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ ঠাকুর পার্থিব লীলা সংবরণ করেন।

তাঁহার অনেকগুলি প্রিয় গান ছিল, অনেকগুলি শ্যামা-সঙ্গীত ও ধর্মবিষয়ক। প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) ও অন্য কোন গায়ক ভক্ত তাঁর রোগশয্যা পার্শ্বে আসিলে তিনি তাঁহাদের আকুলতার সহিত গাহিতে বলিতেন। তাঁহারাও সাগ্রহে গাহিয়া তাঁহাকে তৃপ্তি দান করিতেন, নিজেরাও আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন ও শান্তি পাইতেন। একটি প্রিয় গান :

"মজলো আমার মন ভ্রমরা
শ্যামাপদ নীল কমলে—"

জড়বুদ্ধি সাধনা দ্বারা অধ্যাত্ম-বুদ্ধিতে রূপান্তরিত হয়। ভক্ত্যাপ্লুত হৃদয় ইহাতে প্রচুর সাহায্য প্রদান করে। ধ্যান দ্বারা মনের মালিন্য দূর হয়, পার্থিব চিন্তা অন্তর্হিত হয় বলিয়া ঠাকুর প্রায়ই ধ্যানে বসিতেন। একাগ্র চিন্তা ধ্যানের নামান্তর, একনিবিষ্ট মনে ঈশ্বরচিন্তা ছিল ঠাকুরের সাধনা। অখণ্ড, অব্যয়, অনন্ত বিরাট পুরুষকে তিনি কালীমূর্তিতে, মাতৃমূর্তিতে সাধনা করিতেন। জগদ্ধিতায় যিনি বিশ্ব সৃষ্টি পরিপালন করিতেছেন, সেই আদ্যাশক্তি জগৎ জননী ছিলেন তাঁহার আরাধ্যা দেবী। শ্রীভগবান নানারূপে প্রকট হন; সন্তানের নিকট মাতৃরূপে—জগদ্ধাত্রী, কালী, দুর্গারূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দশমহাবিদ্যার রূপ আমরা অনুধাবন করিয়াছি।

কেহ কেহ অনাদি শূলপাণি, দেবাদিদেব মহাদেব রূপে তাঁহাকে ভজনা করেন, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের আদি কারণ জীব-জগতের নিয়ামক বিভূতিভূষণের মূর্তি বারাণসী তীর্থের বিশ্বনাথ কাহারও আরাধ্য দেব, কাহারও বা জগদ্বন্ধু জগন্নাথ মহাপ্রভু পুরীর্ধা

*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিমলা ব্যাখ্যা, ৺দেবেন্দ্রবিজয় বসু কৃত, পৃঃ ৪৩ ও পৃঃ ৪৭, দশম অধ্যায়।

শ্রদ্ধাঞ্জলি পান। কেহবা নবকিশোর মুরলীধারী প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণদেবকে পূজা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। হৃদয় দেবতা এক এক বেশে প্রকটিত হইয়াছেন এক একজন ভক্তের নিকট।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিরাট পুরুষ অক্ষর, অব্যয়, শ্রীভগবানের পূজা করিতেন—সৃষ্টি-পালিনী জগৎ-জননীর কালী মূর্তিতে। তাঁহার একনিষ্ঠা ভক্তির গভীরতা, তদ্‌গতভাব তাঁহাকে ঈশ্বরসান্নিধ্যে লইয়া গিয়াছিল। মা মা ছিলেন তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান, চিন্তা-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা। ধ্যানে বসিলে তাঁহার মন পরিষ্কার হইয়া যাইত; সকল সংশয়-প্রশ্ন-সন্দেহ বিদূরিত হইত। জননীর স্নেহস্পর্শে তিনি লাভ করিতেন নির্মল শান্তি, অপার ঐশ্বর্য, অতুল মহিমা। ঐহিক শুক্তির অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানই তাঁহাকে তীব্র বৈরাগ্যের সুরধুনী তীরে আনয়ন করিয়াছিল।

বিভিন্ন ধর্মের সাধনায় তিনি তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। সকল নদী যেমন বিশাল সমুদ্রে গিয়া সার্থকতা লাভ করে, তিনি বুঝিতেন, সাধনা যে-প্রকারই হউক না কেন, উদ্দেশ্য সমান, সিদ্ধি সমান, প্রাপ্তি মিলন সকল পথেই একইভাবে প্রতিভাত হয়।

পয়সাম্ অর্ণব ইব।

শ্রীগৌরাঙ্গের জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি, বৈরাগ্যের একনিষ্ঠায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনমঞ্চের পদ্মাসনে আধ্যাত্মিকতার স্বর্গলোকে উন্নীত হইতেন। ঐকান্তিক প্রার্থনা, ব্যাকুলতা, একাগ্রতা, কঠোর বিশ্বাস, মানসিক দৃঢ়তা—ইহাই ছিল তাঁহার সাধনোপায়। এই আধ্যাত্মিক তুরীয়ভাব ছিল তাঁহার সাধনার বৈশিষ্ট্য।

কঠোপনিষদে আমরা দেখিতে পাই—একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা, যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥ বৃহদারণ্যকের বাণী—যঃ সর্ব্বাণি ভূতানি অন্তরং সমযতি—তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে "বিভূতিযোগ" বর্ণনায় ভগবান স্বয়ং দ্বাবিংশ শ্লোকে বলিয়াছেন :

"বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥"

ঠাকুর ধ্যান-স্তিমিত অন্তরে এই অনন্ত-চেতনা অনুভব করিতেন বলিয়া সাধনার সময়ে তাঁহার বাহ্য জ্ঞান লোপ পাইত, তিনি আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। জার্মান পণ্ডিত সোফেনহর (Schophonhoaur) এই চৈতন্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'Consciousness that sleeps in stones, dreams in animals and wakes in man.'

ঠাকুরের সাধনার আদর্শ স্বল্পকথায় শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায় "অভ্যাস যোগে" বিবৃত হইয়াছে : অন্তরে একান্ত সুখ ব্রহ্ম পরশনে, নিত্য, সত্য অমৃতের রসাস্বাদনে।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ (২৯-৩১)

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যেন একখানি গীতার ভাষ্য। পার্থিব কোন দ্রব্যে তাঁহার আসক্তি ছিল না। গৃহী তিনি হইতে পারেন নাই, বিবাহ-বন্ধন তাঁহাকে মায়া-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারে নাই। পার্থিব বিদ্যালাভেও তাঁহার আসক্তি ছিল না, পরা-বিদ্যায় তাঁহার মন নিত্য উন্নত, অপরা বিদ্যার মোহ তাঁহার চিন্তার মধ্যে স্থান পায় নাই। একমাত্র চিন্তায় তিনি নিমগ্ন থাকিতেন, তাহা এই :

'ওমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং,
ওমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ওমব্যয়ঃ শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা,
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥'

(গীতাঃ ১১।১৮)

বৌদ্ধদর্শনের দু'এক কথা

শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, এম. এ

বৌদ্ধদর্শনের মূল তথ্যগুলো বিশেষ করে অনুধাবন করলে আমরা তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি প্রথমতঃ। প্রথম কথা, বৌদ্ধদর্শন দুঃখবাদী। অভাবই দুঃখ। সব বিষয়েই এ কথা সত্য। ভগবদ্ভক্ত ঈশ্বরের অভাব চারদিকে অনুভব করেন তাই তাঁর দুঃখ। বিরহিনী প্রিয় বিরহেও কম দুঃখ বোধ করেন না। পাই চাই না, আবার চাই পাই না—এই তো আমাদের মর্মবাণী। চাওয়ার ক্ষেত্রে পাওয়ার অভাব, আবার পাওয়ার ক্ষেত্রে চাওয়ার অভাব তো আমাদের সাথে সাথে লেগেই রয়েছে। জরা-মৃত্যু-ব্যাধি-বিবর্তন জর্জরিত এই পৃথিবীতে চাওয়ার ও পাওয়ার মিল কোথায়? যেটা চাই সেটা যদিই বা পাই তবুও আমাদের হাহাকার মেটে না, কারণ জিনিষটি আমাদের আপনার করে পেতে পেতে অনেক পরিমাণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। কবি সাহিত্যিকেরা তো যার যাকে লক্ষ্য করেছেন, যাকে শৈশবে পাই, তাকে যৌবনে পাই না; যাকে যৌবনে চাই, তাকেই আবার বার্ধক্যে চাই না। মৃত্যুর বীজ যে জীবনের শেষে বিশেষ কোনও ক্ষণে নিহিত আছে তা নয়, এই জীবনের ক্ষণে ক্ষণেই মৃত্যুর বীজ ছড়িয়ে আছে। আমরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখি তবে বুঝি যে সব সময়েই আমাদের মৃত্যুর নৈরাশ্যের ঘনতমসার মাঝ দিয়েই এগিয়ে চলতে হচ্ছে। জীবনে হাসি শুধু বুদ্বুদ, অশ্রুই সমুদ্র।

দ্বিতীয়তঃ, বৌদ্ধদর্শনের বাস্তববাদী স্পষ্টবাদ আমাদের মুগ্ধ করে। প্রেমিকের অদর্শনে প্রেমিকা মনের গহনে প্রাণের অন্তরালে যে তীব্র ব্যথা অনুভব করে, সে ব্যথা তাকে তার বাবা মায়ের বলে বোঝাতে হয় না। প্রেমিকা নিজে নিজেই অনুক্ষণ ব্যথার কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়। দুঃখ বিয়োগ ব্যথাই তো এই জগতের চরম কথা—এই দুঃখ আমাদের একান্ত নিজস্ববোধ। আমাদের সংবেদন ও যুক্তিই দুঃখবোধের পক্ষে যথেষ্ট। বেদ উপনিষদের গম্ভীর তত্ত্বমূলক উপদেশের অত প্রয়োজন কি? যার দুঃখ সে নিজেই সব চাইতে বেশি বোঝে।

অর্থক্রিয়াকারিত্ব বৌদ্ধদর্শনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। কি তত্ত্বের দিকে, কি জ্ঞানের দিকে বৌদ্ধদর্শন অর্থক্রিয়াকারিত্ব স্বীকার করেছে। বুদ্ধদেব একদিন শিংশপাগাছের তলায় বসে কতগুলো গাছের পাতা নিয়ে বললেন, এগুলোই কি গাছের সব পাতা অথবা আরও পাতা গাছে আছে। শ্রমণেরা তখন বিনীত-ভাবে বললেন: তথাগত! গাছে নিশ্চয়ই আরও বহু পাতা রয়েছে। ভগবান তথাগত উত্তর করলেন—ঠিক এমনিভাবেই আমরা যা জানি তার বাইরে আরও বহু কিছু জানার যোগ্য রয়ে গেছে। কিন্তু এত সব কিছুতে আমাদের প্রয়োজন কি? আকাশের তারা গুণে গুণে আমাদের অনুসন্ধিৎসার ক্ষুধা কিছুটা মিটতে পারে, কিন্তু সন্নিহিত বিপদত্রাণের কি হ'ল? যে জলে ডুবে মরছে তাকে পাড়ে না তুলে নীতি বা তত্ত্ব শোনানোর কোনও অর্থ সত্যি হয় না। আমাদের এই বিষাদ অবসাদ ঘেরা জীবনে দুঃখনিবৃত্তি না ঘটিয়ে অন্য কোনও চিন্তা করা নিরর্থক। বাস্তব প্রয়োজন সিদ্ধির কাজে জ্ঞান ও তত্ত্বকে লাগানোই অর্থক্রিয়াকারিত্ব। বৌদ্ধদর্শনের প্রায় সর্বত্রই এইটি লক্ষ্য করা যায়।

এবার আমরা বৌদ্ধনৈরাত্ম্যবাদ আলোচনা করছি। বৌদ্ধাচার্যেরা আত্মা বা জড়বস্তু স্বীকার করেন না। চিন্তা ও সংবেদনের বেশি আর কিছু নেই। নাম ও রূপের সংঘাতকেই আত্মা বলা

হয়েছে। ঔপনিষদিক নাম ও রূপ অবশ্য স্বীকার করা হয়নি; এখানে নামরূপের অর্থ অনেকটা বিভিন্ন। অনেক সময়ে আবার আত্মাকে রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই পঞ্চস্কন্ধের সংঘাতও বলা হয়েছে। এর মধ্যে রূপস্কন্ধটি জড়-বস্তুর প্রতীক, অন্যান্য সব মানসবৃত্তির প্রতীক। রূপস্কন্ধ বিজ্ঞানাদি স্কন্ধের চাইতে অনেক বেশি চঞ্চল। মানুষের মন কখনও অচঞ্চল প্রদীপশিখা হয় না। জড়বস্তু সংবেদনই। "মিলিন্দ প্রশ্নে" এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা আছে। নাগসেন মিলিন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজ, আপনি কি হেঁটে এসেছেন অথবা রথে এসেছেন? মিলিন্দ বললেন, আমি কোথাও হেঁটে যাই না, আমি রথেই এসেছি। এবার নাগসেন প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, তা হলে বলুন তো, রথটা কি, চাকাগুলোই কি রথ, সত্যিকারে কোনটা রথ? নাগসেন নিজেই শেষে বললেন, অবয়বের কোনটাই অবয়বী নয়, অথচ, অবয়বের সংঘাতেই অবয়বী উৎপন্ন হয়। রথের কোনও অংশই রথ নয়, সবগুলো মিলিয়েই রথ হয়। আত্মা বলে বিশেষ কোনও বস্তু নেই, দেহ মন বুদ্ধি সব কিছুর সমষ্টিই আত্মা।

প্রতীত্যসমুৎপাদের দ্বারা জগতের কার্য ও কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। প্রতীত্যসমুৎপাদ মানে "যদি এরূপ ঘটে, তবে স্বাভাবিকভাবেই এরূপ ঘটবে, যদি এরূপ না ঘটে, তবে এরূপ ঘটবে না।" যেমন, যদি প্রদীপে তেল প্রভৃতি থাকে এবং প্রতিকূল হাওয়া না থাকে তবে প্রদীপ জ্বালালে প্রদীপ জ্বলবে। আপাতদৃষ্টিতে স্বভাববাদের মত মনে হলেও এ কিন্তু স্বভাববাদ নয়। স্বভাববাদে যা হবার তা হবেই, কিছুতেই অন্যথা নেই, প্রতীত্যসমুৎপাদে আমরা কারণকে ভেঙে দিয়ে কার্য রোধ করতে পারি। জগৎ দুঃখময়। এই দুঃখ ও জগতের কারণই অজ্ঞান। অজ্ঞান থেকেই সব কিছুর উদ্ভব হয়েছে। অজ্ঞানকে নিরোধ করলেই জগৎ-প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যাবে। সব চাইতে বড় দুঃখ নিজের অজ্ঞানতা না বোঝা। অবিদ্যা থেকে সংস্কার, সংস্কার থেকে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান থেকে নামরূপ, নামরূপ থেকে ষড়ায়তন (ছয় ইন্দ্রিয়), তার থেকে স্পর্শ, স্পর্শ থেকে বেদনা, বেদনা থেকে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা থেকে উপাদান, উপাদান থেকে ভব (জন্ম), ভব থেকে জাতি (পুনর্জন্ম), জাতি থেকে জরা-মরণ আসে। তা হলে দেখা যায় অবিদ্যাই সবকিছুর মূলে। জিনিষগুলো যে রকম ঠিক সে রকমই আছে। আমরাই তাদের যথার্থতঃ দেখি না, বুঝি না। প্রতিদিন তাই আমরা চাই পাই না; পাই চাই না। ফলে, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক দুঃখের কোনটা না কোনটা আমাদের সাথে সাথেই রয়েছে।

বৌদ্ধদর্শন ক্ষণভঙ্গবাদী। 'বিজ্ঞান-সন্তান' অথবা বস্তুসংঘাত প্রতিক্ষণেই পরিবর্তিত হচ্ছে। আমরা এক নদীতে কখনই দু'বার স্নান করতে পারি না; কারণ নদীর জল সব সময়েই পরিবর্তিত হচ্ছে আর যে স্নান করবে সেও দুই ক্ষণে দুই পৃথক ব্যক্তি। এই বিবর্তন সামগ্রিক। একটি জিনিষ বা কোনও ব্যক্তিবিশেষ যখন বিবর্তিত হয় তখন তার অংশ বিশেষ মাত্র পরিবর্তিত হয় না। গোটা মানুষটাই বা জিনিষটাই পরিবর্তিত হয়। দ্বিতীয়তঃ এই বিবর্তন সার্বকালিক। কোনও বিশেষ সময়ে যে জিনিষটি বা ব্যক্তিটির পরিবর্তন হয়, অপর সময়ে হয় না, তা নয়। বিবর্তনের লীলাচঞ্চল নৃত্য অনুক্ষণ সমুদয় বিশ্বের বুকে বয়ে চলেছে।

বৌদ্ধদর্শন মহাযান ও হীনযান এই দুইভাগে বিভক্ত। যোগাচার বিজ্ঞানবাদ ও মাধ্যমিক শূন্য-বাদকে মহাযান দর্শন বলে, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক বাদ হীনযান দর্শন। অসঙ্গ ও বসুবন্ধু যোগাচার বিজ্ঞানবাদের গোড়াপত্তন করেন। এই মতবাদীরা বলেন, কেবল যোগীরাই বোধি লাভ করেন, অন্য কেহ অন্য উপায়ে বোধি লাভ করেন না। এখানে

বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়নি বলে এই মতকে বিজ্ঞানবাদও বলা হয়। স্বপ্নে আমরা যখন কিছু দেখি, তখন আমাদের সামনে তো কিছুই থাকে না, আমরা যে কিছু দেখি একথা তো অস্বীকার করা যায় না। তবে কিছু দেখি বলেই যে বস্তুটি আছে তা কেমন করে বলি? দ্বিতীয়তঃ, একই জিনিষ নানাজনে নানাভাবে দেখে। বস্তুর নিজস্ব যদি কোনও স্বরূপই থাকত, তবে সবাই একইভাবে জিনিষটি দেখতে বাধ্য থাকত। তা যখন হয় না, তখন বস্তুর স্বরূপ বলে কিছুই নেই। যার স্বরূপ নেই, তাকে বস্তুই বা কেমন করে বলি? তৃতীয়তঃ দেখি জ্ঞান নিজেই নিজের বিষয় হ'তে পারে। তবে আর পৃথক করে একটি বিষয় স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা কি? এই সব জন্য যোগাচার-বিজ্ঞানবাদীরা জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, সারা জগতই বুদ্ধিময়; সর্বং বুদ্ধিময়ং জগৎ। মাধ্যমিক শূন্যবাদীরা বলেন শূন্যই একমাত্র সত্য—একটু পরে আমরা দেখি, আমাদের পূর্বতন প্রতীতি মিথ্যা ছিল। জ্ঞানের অথবা শূন্যপদার্থের বিচিত্র শক্তি বলেই অসত্য জ্ঞানের রাজ্যে স্ফুটিত হয়। অসৎ পদার্থের কোনও অর্থক্রিয়াকারিত্ব নেই, সেইজন্য অসতের কোনও বিচিত্র শক্তিও নেই। জ্ঞানের বিচিত্র শক্তিতেই সব সংঘটিত হয়। সহনন্তর প্রত্যয় অথবা শুধু সংস্কারের দ্বারাই জ্ঞান অসতেরও প্রতীতি ঘটায়। সৌত্রান্তিকেরা বলেন, আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও বস্তুর প্রতীতি লাভ করি না। ক্ষণবাদী বৌদ্ধদের মতে একই জিনিষ দুই ক্ষণ থাকে না, পূর্বক্ষণের জিনিসটি পরক্ষণে অন্য হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে সত্য বস্তুটির আমরা প্রতীতি পাই না। পূর্বক্ষণের প্রতীতির অনুরূপ আরেকটি প্রতীতি মাত্র পাই, কিন্তু ঠিক ঠিক সেই প্রতীতিটিই পাই না। পরবর্তী প্রতীতি থেকেই পূর্ববর্তী বস্তুর প্রতীতি ও বস্তুটির অস্তিত্ব অনুমান করি। সৌত্রান্তিক মতবাদের সাথে লক্ষীয় মতবাদের মিল আছে। সৌত্রান্তিকেরা দ্রব্য ও গুণের পার্থক্য স্বীকার করেন নি। সৌত্রান্তিকেরা বলেন, জগৎ কোনও একটি কারণ (ঈশ্বর) থেকে উদ্ভূত হয় নি। জগতের অনাদ্যন্ত-কালীন সৃষ্টি লীলা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে এসেছে, কোনও এক বিশেষ সময়ে সামগ্রিক সৃষ্টি রূপ লাভ করে নি। আপতিক কার্যপুঞ্জের জন্য কারণ-পুঞ্জই স্বীকার করতে হয়। বৈভাষিকেরা বলেন, আমরা বস্তু প্রত্যক্ষতঃ সংবেদন করি, যদি প্রত্যক্ষানুভূতি না-ই থাকে তবে সৌত্রান্তিকের অনুমান থাকে না। প্রত্যক্ষানুভূতির উপরেই অনুমান নির্ভর করে। অবশ্য বৈভাষিকেরা বলেন না যে, সবকিছুই আমরা প্রত্যক্ষ করি। বস্তুর স্বলক্ষণই মাত্র আমরা প্রত্যক্ষ করি।

বৌদ্ধেরা জ্ঞানের প্রামাণ্য নিরূপণে 'সংবাদে'র উপর জোর দেন। আমার পুস্তক বিষয়ক জ্ঞানটি তখনই সত্য হ'বে যখন আমার পুস্তক জ্ঞানের অনুরূপ পুস্তকটি সত্যি সত্যি থাকবে। অর্থপ্রাপ্তি (বস্তু প্রাপ্তি) আর কিছুই না, শুধুই সমর্থপ্রবৃত্তিজনকতা। ধর্মোত্তর বলেন, যে জিনিষটি আমরা পাই আর যে জিনিষটি আমরা জানি, উভয়ে এক নয়। অর্থক্রিয়াকারিত্বের বিষয়ে নৈয়ায়িকদের ও বৌদ্ধদের মতে মিল আছে। তবে উভয়ের প্রভেদও আছে, বৌদ্ধেরা বলেন, জ্ঞানের অপ্রামাণ্য স্বতঃ প্রামাণ্য পরতঃ, আর নৈয়ায়িকেরা বলেন, জ্ঞানের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য পরতঃ। বৌদ্ধেরা পারমার্থিক ও সাংবৃতিক দু'রকম সত্য স্বীকার করেছেন, নৈয়ায়িকেরা এ রকম কিছু মানেন নি। জ্ঞান অর্জনের পাঁচটি সোপান আছে বৌদ্ধ মতে—প্রথমতঃ, বস্তুর উপস্থিতি। কোনও বস্তুর সংস্কার আদৌ না থাকলে দর্শন, স্পর্শন কিছুই সম্ভব হয় না। দ্বিতীয় পর্যায়ে, বস্তুসংস্কারের পুনরুপস্থাপন পাই। স্বলক্ষণের প্রত্যক্ষানুভূতির সাথে কল্পনা মিশিয়ে নিই। তৃতীয় পর্যায়ে, ইহা আমার কোনও ইষ্টসাধন করবে, এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন করে। আম খেলে মিষ্টতারূপ ইষ্ট আমি আস্বাদন করি। এইটি

ইষ্টসাধনতা। চতুর্থ পর্যায়ে, এই ইষ্টসাধনতা থেকেই জিনিষটি পাওয়ার জন্ত ইচ্ছা হয়। একে ফলকামনাও বলা যায়। একেবারে শেষে বস্তুপ্রাপ্তির জন্ত আমাদের কর্মে প্রবৃত্তি হয়। যে পর্যন্ত কর্ম-প্রবৃত্তি না হয়, সে পর্যন্ত কামনা শুধু কামনাই থাকে। বৌদ্ধদর্শনের অর্থক্রিয়াকারিত্ব মানেই কর্মে প্রবৃত্তি। স্বাপ্নিক সংবেদনও ত সংবেদন, সেখানেও কামনা থাকে, কিন্তু অর্থক্রিয়াকারিত্ব নেই বলে ওখানে সংবেদনটি সত্য হ'তে পারে না।

এর পরে বৌদ্ধনীতির আলোচনা প্রয়োজন। প্রশ্ন হ'তে পারে, বৌদ্ধদর্শন যখন শূন্যবাদী, তখন সব কিছুই তো শূন্য, অর্থাৎ নেই। তা হ'লে আবার নীতির কথা কেন? এ কথার উত্তরে আমরা বলি, সব কিছু শূন্য হ'তে পারে, কিন্তু সব কিছু যে শূন্য এ বোধ কি আমাদের হচ্ছে? আমরা তো সব-সময়েই কিছু না কিছু দেখছি, কোনও সময়েই তো একেবারে শূন্য দেখি না। এই শূন্য দেখি না বলেই ত আমাদের দুঃখ। আঠটুকু শূন্য প্রতীতি হয় না, নিয়ম পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েই পারমার্থিক শূন্যবোধের উদয় হয়। তাই নীতির প্রয়োজন আছে। নীতির ব্যাপারে বুদ্ধদেব তিনটির উপরে বিশেষ জোর দিয়েছেন। শ্রদ্ধা, দর্শন ও ভাবনা। শ্রদ্ধাবান জ্ঞান লাভ করেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে। শ্রদ্ধাবান শুধু যে জ্ঞানই লাভ করেন, তা নয়। শ্রদ্ধালু কর্মী প্রতি কর্মেই সাফল্যমণ্ডিত হ'ন। বুদ্ধদেব বলেন, সব সময়েই সত্য দৃষ্টির জন্ত সাধকের নিজের উপরেই নির্ভর করতে হ'বে। এমন কি তত্ত্বোপদেষ্টা গুরুর কথাও নির্বিকারভাবে মেনে নিতে হ'বে, নিজের কোনও রূপ বিচার চলবে না এমন কথা অন্তত বুদ্ধদেব বলেন না। আনন্দকে তিনি বারবার বলেছেন, বোধিতীর্থ পথ তীর্থ-পথিককেই কেটে নিতে হ'বে। বোধি শুধু অপরের কাছে শোনা কথা নয়, এ নিজের দেখা একান্ত বোধ। অন্যের কাছে শোনা জিনিষ আমরা যতই বিশ্বাস করি, নিজের দেখা জিনিষের মত কিছুতেই হয় না। তত্ত্বসাক্ষাৎ-কারই মাত্র যথেষ্ট নয়, তত্ত্বের সাথে আমাদের এক হয়ে যাওয়া দরকার। ভাবনার মাঝ দিয়ে আমরা তত্ত্বের সাথে ঐক্য লাভ করি। ভাবনার চরম ফল প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা আবার প্রেম ও ঔদার্য ছাড়া নিষ্ফল হয়ে যায়। ভারতীয় দর্শনের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের সাথে শ্রদ্ধা, দর্শন ও ভাবনার মিল পাই। বৌদ্ধদর্শন নীতির দিক দিয়ে মধ্যপন্থী। জৈনধর্মের উগ্রতা আমরা বৌদ্ধদর্শনের কোথাও পাই না। শ্রমণ বা ভিক্ষুর বেলায় যে নীতি খাটে, সংসারীর বেলায় সে নীতি প্রযোজ্য নয়। সংসারীরা নিজেদের জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে' যথাসম্ভব সন্ন্যাসীর নীতি পালন করবেন। বিস্তৃত বৌদ্ধদর্শনে আটটি নীতি পাই। সদ্বিশ্বাস, সংসংকল্প, সদ্বাক্য, সৎকর্ম, সজ্জীবন, সৎ-প্রচেষ্টা, সচ্চিন্তা, সদ্ভাবনা—বৌদ্ধদের এই আটটি নীতি নীতিবাদী প্রত্যেক দর্শনই স্বীকার করবেন। নৈতিক জীবনযাপনের ফলে শীল, প্রজ্ঞা ও সমাধি লাভ হয়। শীল মানে শুধু অসৎ কর্ম থেকে বিরতি হয়, শীল অর্জনের ফলে আমাদের একটি বিশেষ মানসীবৃত্তির উদয় হয়, যাতে করে কেবলমাত্র সৎকর্মেই আমরা অনুপ্রাণিত হই। শীলের চরম অবস্থায় আমরা প্রজ্ঞাবান হই। সমাধিতে আমরা নির্বাণপ্রাপ্ত হই। আমাদের সকল সংকীর্ণতার ছোটগণ্ডী সমাধিতে কেটে যায়। জীবন্মুক্তেরা মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা লাভ করেন। সাধক মৈত্রী লাভ করলে প্রত্যেকের মিত্র হয়ে যান। করুণায় সাধক অহিংসাই পরমধর্ম উপলব্ধি করেন, মুদিতায় সাধক সব কিছুতেই হৃষ্ট হ'ন, পরের স্তরে ক্ষুদ্রতাগুলোকে উপেক্ষা করেন।

ভারতীয় আস্তিক দর্শনগুলোর সাথে বৌদ্ধদর্শনের মিল আছে। আমাদের এই বর্তমান জীবন দুঃখময়, নির্বাণ বা মুক্তিতে সকল দুঃখমুক্তি ঘটে। মুক্তিতে কোনও দুঃখ নেই, তবে যে দুঃখাভাসটি আমরা পাই, তা' মুক্তি সন্ধানেই মাত্র পাই, আসলে মুক্তিতে কিছুমাত্র দুঃখ নেই। বৌদ্ধদর্শনের 'মিলিন্দ প্রশ্ন'

গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। জীবন্মুক্তির ব্যাপারেও উভয় দর্শন একমত প্রায়। সাংখ্য, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনের সাথে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও বৌদ্ধদর্শনের সাথে শাংকর বেদান্তের সব চাইতে বেশি সাদৃশ্য আছে, অনেকে মনে করেন। পদ্মপুরাণে পরিষ্কার করে বলাই হয়েছে, মায়াবাদ (শাংকর বেদান্ত) মিথ্যাবাদমাত্র, কারণ ইহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র-মাত্র। এ সম্বন্ধে প্রখ্যাত দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর "ভারতীয় দর্শনে" বলেন, "Samkara's philosophy is largely a Compound of Vijnānavāda and Sūnyavāda Buddhism with the upanisadic notion of the Permanence of the self superadded (PP. 493-94, Indian Philosophy)। মাধ্যমিকেরা যা'কে চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত বলেন, তার সাথে আমাদের ব্রহ্মের মিল আছে মনে হয়। শংকরের মায়া শব্দটি লংকাবতার সূত্রে পাই, বুদ্ধ ঘোষও এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার মতে বৌদ্ধদর্শন শাংকর বেদান্ত ছাড়াও বোঝা যায়। তিনি বলেন, "Was Samkara's philosophy itself 'possible or intelligible' without reference to Buddhist philosoper. The Madhyamika in particular, which flourished in South India? The question, as we are now parsuaded, must be answered in the negative" (Prolegomena to a History of Buddhist philosophy. P. 19)। আচার্য শংকর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বৌদ্ধদর্শনকে খণ্ডন করেছেন।

বিশ্বাস ও আত্মনিবেদন

বিদেহ

আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তিই হল বিশ্বাস। সেখানে বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্যের মূল্য কম। বিশ্বাস যেন অকূল সমুদ্রে ভেসে থাকবার একমাত্র অবলম্বন। যার বিশ্বাস আছে, সে রাজার মত জীবন-যাপন করে। বিশ্বাস হল নিজস্ব সম্পদ। নিজের কিছু না থাকলে কি অন্যের সাথে মেশা যায়? সংসারী যেমন সংসারের সব ঠিক রেখে মেশে, তেমনি নিজের বিশ্বাসটি সযত্নে রক্ষা করতে হয়। বিশ্বাস ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। অবিশ্বাস একটা রোগ-বিশেষ। সুস্থ মনের লক্ষণ সেটা নয়। অবিশ্বাসের ফল হতাশা। বিশ্বাস এলেই আশা জাগে, অভীষ্টপ্রাপ্তি সম্বন্ধে একটা দৃঢ় প্রত্যয় হয়।

কর্তৃত্ব-বুদ্ধি চলে গেলেই বিশ্বাস আসে, আমার বিশ্বাস হলে কর্তৃত্ব-বুদ্ধি চলে যায়। বিশ্বাসী কখনো ধৈর্য হারায় না। বিপদ এলে আমরা যে অধীর হয়ে পড়ি তাতেই বোঝা যায় বিশ্বাস আমাদের কত অল্প; সংসারে বিশ্বাস থাকলে ভগবানে বিশ্বাস হয় না। একটা ভাবলে আর একটা পড়ে। ভগবানে বিশ্বাস হলে কোন ভাবনা চিন্তা থাকতে পারে না। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত গাছের একটি পাতাও যে স্থানচ্যুত হতে পারে না, সাধক এটি তখন প্রাণে প্রাণে অনুভব করে।

যার যেরূপ প্রকৃতি, তার সেরূপ বিশ্বাস। মানুষ যেটা বিশ্বাস করে সেই অনুকূলে যুক্তি খোঁজে। যুক্তি দিয়ে কখনো বিশ্বাস হয় না। ভালবাসলেই বিশ্বাস হয়। বিশ্বাস জীবনকে বড় করে দেয়। একটা পাথরকে ভগবান মনে করতে পারলে ভক্তি লাভ হয়। গুরু ইষ্টে বিশ্বাস হলে

জ্ঞানস্পৃহা ক্রমেই বেড়ে যায়। তখন আর কোন প্রকারে গতানুগতিকভাবে জীবনটা কাটাবার ইচ্ছা হয় না। জগতের কোন বিষয়ে আস্থা থাকলে ভগবানে বিশ্বাস হয় না। তাই সাধুর পক্ষে রিক্ত হয়ে বেড়াবার নিয়ম; বালকের মত নিশ্চিন্ত অবস্থা। প্রকৃত বিশ্বাস হলে তা দৃঢ় হয়, কিছুতেই নষ্ট হয় না। মরুভূমিতে চলবার সময় উট যেমন অনেক দিনের খোরাক সঙ্গে নিয়ে মাথা নীচু করে চলে ঝড়-ঝাপ্‌টা এড়াবার জন্য, সাধক তেমনি বিশ্বাসকে অবলম্বন করে সংসার-মরুপথের সব দুঃখ কষ্ট অগ্রাহ্য করতে পারে। বিশ্বাসই সাধককে টেনে নিয়ে যায়।

তিনি আমার সঙ্গে আছেন এটা প্রথমে বিশ্বাস করে নিতে হয়, তারপর সেই বিশ্বাসই তাঁকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করায়। হয় আত্মাতে বিশ্বাস করতে হয়, নতুবা ভগবান বা আত্মবান পুরুষে বিশ্বাস করে চলতে হয়। সবাই একটা না একটা বিশ্বাস নিয়ে চলে। পরীক্ষায় পাশ হবে এই বিশ্বাসে পড়াশুনা করে। সুখ পাবে এই বিশ্বাসে বিবাহাদি করে' সংসার পাতে। ধন লাভ হবে এই বিশ্বাসে ব্যবসা করে। রোগী ডাক্তারকে বিশ্বাস করেই চিকিৎসার জন্য ডাকে। বিশ্বাস ছাড়া কিছুই দাঁড়াতে পারে না। তবে বাহিরের জিনিষে বিশ্বাস করলে সেটার অভাবে মানুষ ভেঙ্গে পড়ে, কিন্তু নিজের ভিতরে এমন একটা স্থান আছে সেখানে নির্ভর করলে নিজের আনন্দেই নিজে ভরপুর থাকা যায়।

বিশ্বাস নিজের চেষ্টায় হয় না। তিনি কৃপা করে বিশ্বাস দিলে তবেই বিশ্বাস হয়। অবতার বা ঈশ্বরকোটি পুরুষেরা বিশ্বাস দিতে পারেন। পার্থিব দেহ ছেড়ে চলে গিয়েই তারা কৃপা করেন, তখন সাধক বুঝতে পারে তিনিই কৃপা করে হৃদয়ে আসেন বিশ্বাসরূপে।

বিশ্বাসই জীবন, বিশ্বাসই শক্তি। যে যা বিশ্বাস করে সে তাই হয়। বিশ্বাসে ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত সাধক লাভ করতে পারে। শুধু দেখতে হবে বিশ্বাসে যেন ঘোল আনা হয়, তাতে কোন ফাঁক না থাকে।

আত্মনিবেদন জীবনের প্রথমেই হওয়া খুব কঠিন। তার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘদিনের অভ্যাস। মানুষ যখন অনেক ঘুরে ক্লান্ত হয়, তখনই সুরু হয় আত্মনিবেদনের সাধনা। আমিত্ব চলে গেলে তখন এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, এক মহাশক্তি এই জগৎকে চালাচ্ছেন। ঠিক ঠিক আত্মনিবেদন করতে হলে চাই ঠিক ঠিক বিশ্বাস।

আত্মসমর্পণ কথাটিতে রয়েছে দেওয়ার ভাব। সম্পূর্ণ নিজস্ব জিনিষই অপরকে দেওয়া যায়। আত্মনিবেদন অর্থাৎ নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। এই নিজ বা আমি কে? তাকে প্রথমে খুঁজে বার করতে হবে। চিত্তশুদ্ধি না হলে, নিজের মন আয়ত্তে না এলে তা সম্ভব হয় না। নিজেকে যে পায় সেই পারে নিজেকে সমর্পণ করতে, যতদিন এই অবস্থা না হয়, ততদিন সব থাকে মুখস্থ। আমরা আমি বলতে যা বুঝি সেটা মিথ্যা বা কাল্পনিক। এই মিথ্যা আমিকে অর্থাৎ জীবত্বকে চৈতন্য সত্তায় পরিণত করতে পারলে তবেই যথার্থ আত্মনিবেদন হতে পারে।

একবিন্দু জল যদি সমুদ্রে পড়ে, সে সমুদ্রই হয়ে যায় কিন্তু জলবিন্দুটি আলাদা থাকলে শুকিয়ে যায়। আমরা ক্ষুদ্র হলেও যদি নিজত্ব ছেড়ে ভগবানে আত্মনিবেদন করতে পারি, তবে তাঁর শক্তি, তাঁর আলো আমাদের মধ্যে আসবেই। মানুষের ভিতর কতগুলি থাকে পশুভাব আর কতগুলি থাকে দেবভাব। পশুভাবগুলি ঊর্ধ্বমুখী করে দেবভাবে পরিণত করবার শক্তি মানুষেরই আছে। পশুত্ব নষ্ট হয়ে দেবত্বে আরূঢ় হতে পারলেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারে তার নিজের

কিছুই ক্ষমতা নেই। তখনই তাঁর ইচ্ছার কাছে আত্মনিবেদন হয়।

যে আত্মনিবেদন করতে পেরেছে তার প্রাপ্য অপ্রাপ্য কিছু থাকে না। সে ভাল-মন্দ আলো-আঁধারের পারে চলে যায়। সংসারের মানদণ্ডে তার কোন কাজেরই বিচার হতে পারে না। সে ভগবানের বিধানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে সর্ব অবস্থাকেই শান্ত চিত্তে মেনে নেয়। তবে এরূপ আত্মনিবেদন নিজের চেষ্টায় হতে পারে না। তিনি যখন আত্মনিবেদন করিয়ে নেন তখনই সাধক নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তাঁর পায়ে সঁপে দিয়ে বলতে পারে "তোমার ইচ্ছা হউক হে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে"।

ভালবাসায় হৃদয় পূর্ণ হলেই প্রকৃত আত্ম-নিবেদন হয়। অকৃতকার্যতায় বা ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে মানুষ যখন বলে ভগবান আমায় রক্ষা কর, তখনও আত্মনিবেদন হয় না। একটি গল্প আছে—"একজন ধনী ব্যক্তির একটি বিশ্বাসী ভৃত্য ছিল। প্রভু তাকে আদর করে একদিন খানিকটা ভরমুজ খেতে দিল। সে খুব তৃপ্তি ও আনন্দ-সহকারে খাচ্ছে দেখে প্রভু ভাবলো সেটি নিশ্চয়ই খুব সুস্বাদু কিন্তু মুখে দিয়েই দেখলো তীষণ তেতো। তখন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করলো 'তুমি কি করে এটা খেলে?' ভৃত্য বললো 'প্রভু এ তো তোমারই হাতের দান, তুমি নিত্য আমাকে কত ভাল জিনিষ খেতে দাও আর আজ যদি একদিন একটু খারাপ জিনিষ দিয়ে থাক, আমার আপত্তি করার কি থাকতে পারে।' ভালবেসে নিজস্ব বিসর্জন দিলে এমনি করে আত্মনিবেদন হয়।

আত্মনিবেদন জোর করে হয় না। সাধকের জীবনে এক সময় আপনিই এই অবস্থা আসে। তবে কতগুলি উপায় বা সাধনা আছে যা সেই অবস্থাপ্রাপ্তির সহায়তা করে। যেমন তাঁর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ বা একটা ভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবিত করা অথবা গভীর ভালবাসা। এই সব উপায়ে অভিমান নষ্ট হয় ও আত্মনিবেদনের ভাব জাগে।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে মহোৎসব

শ্রীসন্তোষকুমার কুণ্ডু

'মহোৎসব' বা 'মচ্ছব' কথাটা এসেছে বৈষ্ণব মহোৎসব থেকে। শ্রীচৈতন্যের সমকালে উৎসবের অন্ত ছিল না। কিন্তু তথ্যজ্ঞানীদের মতে প্রথম মহোৎসব অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়ার পর (১)। শ্রীচৈতন্য ও তাঁর অনেক প্রিয় পরিকরের অন্তর্ধান ঘটেছে, সমগ্র দেশের বৈষ্ণবদের মধ্যে ভাবগত ঐক্যসূত্র অব্যাহত থাকছে না—এই সময় তৎকালীন বৈষ্ণবসমাজের আচার্য শ্রীনিবাস একটি বৈষ্ণব সম্মেলনের প্রয়োজন অনুভব করলেন।

প্রথম দিকে প্রত্যেক মতবাদেই জীবনদর্শন ও জীবনবাদ এত বলিষ্ঠ থাকে যে, সে সম্পর্কে কোন করণীয় বা আচরণীয় কিছু ঠিক করতে সভা ডাকার প্রয়োজন হয় না। পরবর্তীকালে মূল মতবাদ বিভিন্ন ব্যবহারগত বিচার বিশ্লেষণের ফলে যখন জটিল হ'য়ে পড়ে ও জীবনবাদ থেকে ঘুরে সরে যায় তখন মত ও পথ ঠিক করার জন্য আচার্যদের সম্মেলন অপরিহার্য

(১) অবশ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মতে মহাপ্রভুই মহোৎসবের প্রথম ভোক্তা। হরিদাসের অপ্রকটের পর মহাপ্রভু এই মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন।

ভক্ত রঘুনাথের দৌড়ক্ষে পানিহাটিতে প্রভু নিত্যানন্দের চিঁড়া দধি মহোৎসব উল্লেখযোগ্য।

হ'য়ে পড়ে। বৌদ্ধমহাসঙ্গিতী এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রথম মহোৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল কণ্টকনগর বা কাটোয়ার গদাধরদাসঠাকুরের তিথি উৎসব উপলক্ষ্যে। দাসঠাকুরের শিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্তীর আহ্বানে বৈষ্ণবসমাজের আচার্যগণ সমবেত হলেন। তিথি কার্তিকী কৃষ্ণা-অষ্টমী। প্রধান আচার্যপদে বৃত হ'লেন শ্রীনিবাস। দলে দলে বৈষ্ণবগণ আসতে লাগলেন। এলেন অদ্বৈতপ্রভুর পুত্রদ্বয়, বীরচন্দ্রপ্রভু, রঘুনন্দন গোস্বামী, আর এলেন—

"প্রভুপ্রিয় শ্রীপতি শ্রীনিধিবিদ্যানন্দ।
বাণীনাথ বসু রামদাস কবিচন্দ্র॥
পুরুষোত্তম সঞ্জয় শ্রীচন্দ্রশেখর।
শ্রীমাধবাচার্য্য কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীবর॥
শ্রীকমলাকান্ত বাণীনাথ বিপ্রবর।
বিষ্ণুদাসনন্দন পণ্ডিত পুরন্দর॥
শ্রীচৈতন্যদাস কর্ণপুর প্রেমময়।
শ্রীজানকীনাথ বিপ্রগুণের আলয়॥
শ্রীগোপাল আচার্য্য গোপালদাস আর।
মুরারি চৈতন্যদাস পরম উদার॥
রঘুনাথবৈদ্য উপাধ্যায় নারায়ণ।
বলরামদাস আর দাস সনাতন॥
* * * * *
রামচন্দ্র কবিরাজ বসন্তবাবনি।
* * * * *
নৃসিংহ চৈতন্যদাস দাস বৃন্দাবন॥

(ভক্তিরত্নাকর)

এটিই বৈষ্ণবজগতে প্রথম মহোৎসবের মর্যাদার অধিকারী। মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্য ও অনুচরদের অনেকের আগমনে উৎসব ধন্য হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্যের ভবনে। কণ্টকনগর থেকে শ্রীখণ্ড যাবার পথে বৈষ্ণবেরা যাজীগ্রামে সমবেত হলেন। কোন উপলক্ষ্য ব্যতীতই এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকটের পর অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর প্রিয় পরিকরবৃন্দ একে একে অপ্রকট হতে লাগলেন। অবশিষ্ট যে ক'জন জীবিত রইলেন, তাঁরা লোকদৃষ্টির অন্তরালে গভীর সাধনায় মগ্ন হলেন। শ্রীজীবগোস্বামী বৃন্দাবনে সমগ্র বৈষ্ণবসমাজের সূত্র নির্দেশক ও নেতা হলেন, আর গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের অবিসংবাদিত নেতা হলেন শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য। অবশ্য নিত্যানন্দপত্নী শ্রীজাহ্নবী ঠাকুরাণী ও তৎপুত্র বীরচন্দ্র প্রভুর খ্যাতি তাঁদের জীবিতকালে অম্লান ছিল। উত্তরবঙ্গে নরোত্তম ও উড়িষ্যায় শ্যামানন্দ শ্রীনিবাসের সহযোগী-রূপে কাজ করেছেন। কাজেই শ্রীনিবাসের ভবন তৎকালীন বৈষ্ণব ভক্তদের প্রিয় সে কথা বলাই বাহুল্য।

বাংলার বৈষ্ণবসমাজ তৃতীয়বার সম্মিলিত হলেন শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি ঠাকুরের পুণ্য আশ্রমে। তিনি অপ্রকট হ'য়েছেন। তাঁর প্রথম তিথি উৎসব অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে। শ্রীনরহরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দের পুত্র ও সরকার ঠাকুরের শিষ্য শ্রীরঘুনন্দনের আহ্বানে বৈষ্ণব আচার্যগণ এসে পৌছলেন। এখানেও প্রধান আচার্যের কাজ করলেন শ্রীনিবাস আচার্য। তিনি অর্চনার পর ভাগবত পাঠ করলেন। বৈষ্ণব পরিকরবৃন্দ খোল মৃদঙ্গ সহকারে মধুর কীর্তন গান করলেন —

"দেবগণ মিলাইয়া মনুষ্যের মেলে।
ভাসে সঙ্কীর্ত্তন সুখ-সমুদ্র হিল্লোলে॥
* * * * *
শ্রীখণ্ড নগরে মহা মহোৎসব কথা।
যারে তারে যে সে লোক কহে যথা তথা॥
শ্রীমহোৎসবের কথা শুনে যেই জন।
অনায়াসে হয় তার তাপ বিমোচন॥

(ঐ, ৯ম তরঙ্গ)

তারপর মাল্যচন্দন উৎসব। বীরচন্দ্র, রঘুনন্দন, শ্রীনিবাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ মাল্যচন্দন নিয়ে ক্রীড়া

শুরু করলেন। "পর পর হৈল মালা চন্দন গ্রহণ।" এই আনন্দ উৎসবের অঙ্গ হিসাবে ভোজ্যবস্তুরও অপ্রতুল ছিল না।

"কদলীর পত্র, পাত্রে সুবাসিত বারি।
পরিবেশে কতজন মহাযত্ন করি॥
• • • • •
গোধূমচূর্ণের পূপাদিক বহু হয়।
দুগ্ধের বিকার নানা ফলমূলাদয়॥
• • • • •
হরিধ্বনি করি সবে তুলিল কৌতুকে।" (ঐ)

দ্বিজ হরিদাস আচার্যঠাকুর মাঘ মাসের কৃষ্ণা-একাদশী তিথিতে বৃন্দাবনে অপ্রকট হন। তাঁর পুত্রদ্বয় শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ আচার্য ঠাকুরের তিথি পালন উপলক্ষ্যে এক মহোৎসবের আয়োজন করলেন। ঠিক হোল ঐদিনে শ্রীনিবাস আচার্য দুই ভাইকে দীক্ষা দিবেন। হরিদাস আচার্যের শ্রীপাট কাঞ্চন-গড়িয়ায় মহোৎসবের আয়োজন করা হোল।

"এই মাঘকৃষ্ণা একাদশী শুভদিনে।
দীক্ষা দিব হরিদাসাচার্যের নন্দনে॥
আচার্য্যের তিরোভাব তিথি এই হয়।
হবে মহোৎসব এ মহৎ আয়োজন।" (ঐ)

বাংলাদেশের সমস্ত প্রধান বৈষ্ণবদের সমাগম ঘটলো কাঞ্চন-গড়িয়ায়। হরিকথার সঙ্কীর্তনে মহানন্দে চার-পাঁচদিন অতিবাহিত করে সকলে স্ব স্ব স্থানে চলে গেলেন।

পঞ্চম এবং শ্রেষ্ঠ মহোৎসব হোল খেতুরীর উৎসব। জনশ্রুতি ও বিভিন্ন বৈষ্ণবগ্রন্থে খেতুরীর উৎসবের উচ্ছ্বসিত বিবরণ পাওয়া যায়। সে যুগের তিন প্রধানের অন্যতম ত্যাগীশ্রেষ্ঠ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর স্বগ্রামে খেতুরীতে গৌরসুন্দরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে এক মহতী সভার আয়োজন করলেন। নরোত্তমের বৈমাত্রেয় ভাই সন্তোষদত্ত সপারিষদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। সুদূরের পথে নিমন্ত্রণ-পত্রিকা দেশে-দেশান্তরে প্রেরিত হোল। খেতুরীর উৎসবের বার্তা দেশে-দেশান্তরে রটে গেল। পদ্মাপার হ'য়ে শত শত ভক্ত খেতুরীতে সমাগত হলেন। পূর্বাহ্ণেই সশিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য এসে পৌঁছলেন। উৎকল থেকে এলেন শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুর। খড়দহ থেকে এলেন সশিষ্য নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবী ঠাকুরাণী। আর এলেন কাঁদড়া থেকে কবি জ্ঞানদাস, কমলাকর পিপলাই, নৃসিংহ, পরমেশ্বরীদাস, চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাস, কবি মুকুন্দ ইত্যাদি। অম্বিকানগর থেকে প্রভু হৃদয়চৈতন্য, শান্তিপুর থেকে এলেন অদ্বৈত প্রভুর পুত্রদ্বয় শ্রীঅচ্যুতানন্দ ও শ্রীগোপাল। আর এলেন কণ্টকনগর থেকে শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্তী ও শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর। শিবানন্দ বিপ্র বাণীনাথ, ভাগবতাচার্য, বল্লভচৈতন্য, কাশীনাথ পণ্ডিত এবং নয়নমিশ্র এসে জাহ্নবীর সঙ্গে যোগ দিলেন। মহাসমারোহে উৎসবের আয়োজন শুরু হোল।

"কি অপূর্ব চন্দ্রাতপ অঙ্গন আবৃত।
কতশত কদলী বৃক্ষাদি সুশোভিত।
কেহ কেহ পুষ্পমালা প্রস্তুত করণে।
কেহ বহু লোক যুক্ত চন্দন ঘর্ষণে॥" (ঐ)

শুভ ফাল্গুনী-পূর্ণিমা তিথিতে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হবে। ভক্ত পরিকরবৃন্দ একে একে এসে সমবেত হলেন। লক্ষ লক্ষ লোকে খেতুরী পূর্ণ হোল। সকলের অনুরোধে শ্রীনিবাস আচার্য বিগ্রহের অধিবাস ক্রিয়া সমাপ্ত করে' তাঁদের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। দুটি বিগ্রহের অপরূপ রূপলাবণ্যে ভক্তগণ মুগ্ধ হলেন।

"গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীব্রজমোহন।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকান্ত শ্রীরাধারমণ॥
এ দুয়ের অভিষেক শোভা অতিশয়।
না ধরে বৈষ্ণব দে বারেক নিরীক্ষয়॥"

প্রতিষ্ঠান্তে শ্রীনিবাস আচার্য মন্ত্রপাঠ করে প্রণাম করলেন,—

"গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোহস্তুতে॥"

তারপর শুরু হোল সংকীর্তন। বিশেষজ্ঞদের মতে এই মহোৎসব থেকেই কীর্তন গান প্রচলিত হ'য়েছে। বাস্তবিকপক্ষে গরাণহাটি কীর্তনের শুরু খেতুরীর উৎসব থেকেই।

নরোত্তম সংকীর্তন শুরু করলেন। মাদলে ঘা দিলেন দেবীদাস। শ্রীবল্লভদাস ও শ্রীগৌরাঙ্গদাস বাদ্যযন্ত্রাদির বাদন শুরু করলেন। অপূর্ব কীর্তন গানে ভক্তগণ বিমোহিত হলেন। অশ্রুতপূর্ব গীতিকুশলতায় নরোত্তম সবার প্রীতি আকর্ষণ করলেন।

"কেহ কহে কি অদ্ভুত গীতাদি প্রকাশে।
আহা মরি ইহে যা না কার দুঃখ নাশে॥
কেহ কহে ঐছে গীত বাস্তাদি না হয়।
না জানয়ে নরোত্তম কৈছে প্রকাশয়॥"

(ভক্তিরত্নাকর)

কীর্তনাবসানে ভক্তগণ ফাগুখেলায় মত্ত হলেন। পরস্পরে অঙ্গে ফাগ নিক্ষেপ করে পরমানন্দে প্রীতি উৎপাদন করলেন। তারপর পংক্তিভোজন। শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী মহাপ্রসাদ পরিবেশন করলেন। আনন্দে কয়দিন অতিবাহিত হোল।

অনেক বৈষ্ণব ভক্তের উপস্থিতিতে ঘটা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় বোরাকুলিতে। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তীর বাড়ী বোরাকুলি। গোবিন্দ চক্রবর্তীর আমন্ত্রণে বাংলাদেশের প্রায় সকল বৈষ্ণব-মোহান্তগণ মহোৎসবে যোগ দিলেন। সম্ভবতঃ এ সময় শ্রীচৈতন্যপার্ষিকদের মধ্যে কেউ জীবিত ছিলেন না। বীরচন্দ্রপ্রভু, কৃষ্ণমিশ্র, হৃদয়ানন্দ, শিশু গোপীরমণ, রঘুনন্দন-তনয় ঠাকুর কানাই, যদুনন্দন, নয়নানন্দ মিশ্র, রামচন্দ্র, শ্রীদাস, গোকুলানন্দ প্রভৃতি প্রধান বৈষ্ণবেরা সমবেত হয়েছিলেন। শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হোল। আচার্যের কাজ করলেন শ্রীনিবাস। তারপর কীর্তন শুরু হোল। এখানেও মূল গায়কের স্থান নিলেন নরোত্তম। মৃদঙ্গবাদক দেবীদাস ও শ্যামদাস। প্রথমেই গৌরচন্দ্রিকা গাওয়ার পর মূলকীর্তন গীত হোল। সম্ভবতঃ এখানেই সর্বপ্রথম সাধারণভাবে গৌরচন্দ্রিকা গীত হোল।

বৈষ্ণবগ্রন্থে আর একটি মহোৎসবের সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগোবিন্দদাস কবিরাজের প্রচেষ্টায় তেলিয়াবুধরিতে। এই সপ্তম বৈষ্ণব মহাসম্মেলনেও পৌরোহিত্য করেন শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভু।

বৈষ্ণব প্রাধান্যের দ্বিতীয় যুগ প্রায় শেষ হয়ে এল। সমগ্র বৈষ্ণবসমাজের একচিত্ততা ও ভাব-ভাবনার যোগসূত্র ছিন্ন হ'য়ে এল। পরবর্তীকালে খণ্ড খণ্ডভাবে উৎসব অনুষ্ঠিত হ'লেও সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের মহাসম্মিলন অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল বলে মনে হয় না।*

*কুলনগর মহাপ্রভু গৌরহরিজীউর বিশেষ অনুষ্ঠানে পঠিত।

উপনিষদের ব্রহ্মবস্তু

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

সসীম মন ও বুদ্ধি দ্বারা যে বস্তু ধারণা করা যায় না ও বাক্যদ্বারাও প্রকাশ করা যায় না অথচ যাহা চিরসত্য, নিত্য অখণ্ড ও অনন্তস্বরূপ সেই বস্তুই ব্রহ্ম। যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—'সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হ'য়েছে। অর্থাৎ মুখে প্রকাশ করা হ'য়েছে একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই উচ্ছিষ্ট হয় নি, অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কি তা কেউ এ পর্যন্ত ব'লে বুঝাতে পারে নি।' কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ, এবং যে বস্তু হ'তে ব্রহ্মজ্যোতি বিচ্ছুরিত হয় সেই বস্তু ব্রহ্ম হ'তেও বড়। সেই বস্তু হ'চ্ছেন নির্গুণ শ্যামসুন্দর। আবার কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্ম ত কাঠ, পাথরের মত নিষ্ক্রিয়, শক্তিযোগেই ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব; এই কারণ শক্তিই ব্রহ্ম অপেক্ষা বড়। ব্রহ্ম সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণার অভাব বশতঃই নানা জনে নানারূপ কথা ব'লে থাকেন, কিন্তু যে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্ম, সেই শাস্ত্ররাশির আকর ও শাস্ত্রশিরোমণি উপনিষৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধে কি বলেন তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। উপনিষৎ বা জ্ঞানকাণ্ডাত্মক বেদ অপৌরুষেয়। এই বেদ বা নিত্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানরাশি অনাদি কাল হ'তেই আছে ও অনন্তকাল ধ'রেই থাকবে। ভারতীয় আর্যঋষিগণের নিকট তাঁদের গভীর ধ্যানাবস্থায় যখন এই জ্ঞানরাশি প্রতিভাত হ'য়েছিল এবং তাঁরা যখন উহা পবিত্র দেবভাষায় লিপিবদ্ধ ক'রেছিলেন, তখন পৃথিবীর আর কোন স্থানে ঐরূপ মহান ভাবদ্যোতক ধর্মশাস্ত্র আত্মপ্রকাশ করে নি। এই কারণ পৃথিবীর অন্যান্য অংশ বিশেষ ক'রে পাশ্চাত্য জগৎ জড়বিজ্ঞানের এই চরমোৎকর্ষের দিনে ভারতীয় ধর্মবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হ'য়ে উহার আলোচনায় আত্মনিয়োগ ক'রেছে। অবশ্য যাঁরা মনীষী অর্থাৎ যাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিপুষ্ট ও যাঁরা জ্ঞানানুশীলনে পারদর্শিতা লাভ ক'রেছেন, তাঁরাও এই মহান উপনিষৎ বা বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনায় তৃপ্তি ও আনন্দলাভ করেন। পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম ও উন্নততম ধর্মশাস্ত্র আমাদের এই বেদ উপনিষদের জন্য আমাদের গৌরব বোধ করার যথেষ্ট কারণ র'য়েছে। আমাদের ঘরের রত্নের জন্য গৌরব বোধই আমাদের ভাবী অনুসন্ধানের বনিয়াদ স্বরূপ হবে। ভারতের এই গৌরবময় প্রাচীন যুগের কথা স্মরণ ক'রেই কবি গেয়েছেন 'সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।'

যাঁরা ব্রহ্মকে জ্যোতিঃমাত্র বলেন, তাঁদের জানা আবশ্যক যে, ব্রহ্ম জ্যোতিঃ বা প্রকাশ স্বরূপ তো বটেই, অধিকন্তু তিনি সৎ ও আনন্দস্বরূপ। অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন বস্তুর পারমার্থিক সত্তা নেই এবং ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুতে আনন্দ পাওয়া যায় না। বিষয় কখন আনন্দ দিতে পারে না। আনন্দ আত্মারই স্বরূপ। অতএব ব্রহ্ম যদি বস্তু হন, যিনি একমাত্র শাশ্বত এবং যিনি ভিন্ন আর কিছুর অস্তিত্বই নেই,—তখন এমন বলা সঙ্গত হয় না যে, ব্রহ্ম শ্যামের অঙ্গজ্যোতিঃ। শ্যামকে যদি অনন্ত আনন্দস্বরূপ বলতে হয় তো শ্যামই ব্রহ্ম—এইরূপ বলাই সঙ্গত। মুণ্ডক ও কঠ উপনিষদে তাই বলা হয়েছে:—ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনু ভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। অর্থাৎ সেখানে সূর্য কিরণ দেয় না, চন্দ্রতারকাও নহে, অগ্নিই বা কি প্রকারে সেখানে প্রকাশিত হয়? তাঁরই দ্যুতিতে সমস্ত পদার্থ দ্যুতিমান বা প্রকাশমান। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলেন—তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্, তং দেবানাং পরমং চ দৈবতম্।

শক্তিং শক্তীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥

যাঁরা বলেন, শক্তি ব্রহ্ম অপেক্ষা বড় তাঁদের জানা আবশ্যক যে, শক্তি ব্রহ্ম হ'তে কোন অতিরিক্ত বস্তু নহে। শক্তি ব্রহ্মের স্বভাববিশেষ। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন—পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। শক্তি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপিনী ইহা উপনিষদে উক্ত হয়েছে। ইহার অর্থ এই যে, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। অন্নপূর্ণা-উপনিষদে উক্ত হ'য়েছে যে নিত্য বিদ্যা আনন্দ-স্বরূপা এবং স্বয়ং প্রকাশরূপা। ইহা দ্বারা বুঝা যায় সত্য বস্তু একটী মাত্র, উহাকে যেদে ব্রহ্ম বলা হ'য়েছে। সেই ব্রহ্ম তাঁর শক্তিকে আশ্রয় ক'রে সৃষ্টি-কর্তা ঈশ্বর হন। অতএব ব্রহ্ম ও শক্তির মধ্যে কেহ অপর অপেক্ষা বড় বা ছোট নন্। ব্রহ্ম যখন বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হন তখন তিনি গুণাশ্রয়ী ব্রহ্ম হন, এইজন্য তাঁকে বলা হয় সগুণ ব্রহ্ম বা মায়াশবলিত ব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্ম বা প্রকৃতিকে যিনি অতিক্রম করেন, তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম। সগুণও যিনি, নির্গুণও তিনি। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ মতে মায়ার প্রতিবিম্বিত ব্রহ্ম সমষ্টিভাবে ঈশ্বর ও ব্যষ্টিভাবে জীব। মায়ার আবরণী শক্তি প্রভাবে জীব নিজের যে ব্রহ্মস্বভাব তাহা বিস্মৃত হয়। কৈবল্য উপনিষৎ বলেন, ব্রহ্ম অব্যক্ত ও অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলময়, প্রশান্ত, অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, উমাসহায় পরমেশ্বর, ত্রিলোচন অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নিরূপ নয়নযুক্ত, সদাশিব, অবিনাশী, স্বয়ংপ্রকাশ বিষ্ণু ও কালরূপী বৈশ্বানর। বৃহদারণ্যক বলেন—ব্রহ্মের দুই রূপ :—(১) মূর্ত, (২) অমূর্ত। পৃথিবী, জল ও তেজঃ ব্রহ্মের মূর্ত রূপ এবং বায়ু ও আকাশ তাঁর অমূর্ত রূপ। নিরালম্ব উপনিষদে আছে—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। সবই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ব্যতীত নানা আর কিছুই নেই। মহানারায়ণ উপনিষৎ বলেন—ব্রহ্মের প্রথম পাদ অবিদ্যাপাদ। এতে সংসারকারণ অবিদ্যা বা মায়াশক্তি আছে। শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ দ্বিতীয় পাদের নাম বিদ্যাপাদ। আনন্দস্বরূপ তৃতীয় পাদের নাম আনন্দপাদ। অমৃতাত্মক চতুর্থপাদের নাম তুরীয়পাদ। তুরীয় ব্রহ্মই পরমজ্যোতিঃস্বরূপ, নিজে নিজ আনন্দস্বরূপ।

যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম তিনি কোন কার্যের কারণ নন। অমৃতবিন্দু বলেন :—ব্রহ্ম নিষ্কল, অনন্ত, হেতু ও দৃষ্টান্ত রহিত, অপ্রমেয় ও অনাদি। ব্রহ্ম কখন জ্ঞেয় হতে পারেন না, কারণ তিনি অদ্বৈত ও তুমা। যাঁর দ্বারা সমস্ত জ্ঞাত হয়—তাঁকে আবার কিরূপে জানবে? যিনি জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা তাঁকে কিরূপে পৃথক ভাবে জানবে? বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা উপলব্ধি করবে? (বৃহদারণ্যক)। ব্রহ্ম প্রজ্ঞানঘন, প্রজ্ঞানময়। বৃহদারণ্যক শ্রুতি আরও বলেন যে, ব্রহ্ম প্রশ্নের অতীত, জ্ঞানের অতীত, তাঁকে কোন প্রশ্নের সীমার মধ্যে আনা যায় না। যিনি নিজে দর্শনীয় নন, কিন্তু সকলের দ্রষ্টা, শ্রবণীয় নন, কিন্তু সকলের শ্রোতা। যিনি স্বয়ং মনের অতীত, কিন্তু সকলের মননকর্তা, বুদ্ধির অগম্য, অথচ নিজে বিজ্ঞাতা তিনিই অন্তর্যামী অবিনাশী ব্রহ্ম। ইনি কার্য্য কারণের অতীত। ইহাকে কোন লক্ষণে চিহ্নিত, ওতে গুণান্বিত এ বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। তিনি গুণাতীত হ'য়েও গুণময়। সর্ব-গুণের আধার হ'য়েও নির্গুণ। কেন-উপনিষৎ বলেন—যে বস্তু বিদিত বা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তাহাই পরিচ্ছিন্ন, বিনাশশীল ও দুঃখাত্মক। ব্রহ্ম ইহার বিপরীত। অর্থাৎ ব্রহ্ম দেশ, কাল ও বস্তু-পরিচ্ছেদ শূন্য, অবিনাশী ও আনন্দস্বরূপ। অধ্যাত্ম-উপনিষৎ বলেন—ব্রহ্মে কোনরূপ পরিচ্ছেদ নাই। ইনি নিরবচ্ছিন্ন—সত্তা ও চৈতন্য মাত্র, আনন্দঘন ও অব্যয়, ত্রিগুণাতীত, নিষ্ক্রিয়। ব্রহ্ম এইরূপ, এইভাবে ইহার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। কারণ ইনি বাক্যমনের অবিষয়। ত্রিপুরতাপনীয় শ্রুতি বলেন—ব্রহ্ম শাশ্বত, তাঁর কোন বর্ম নেই, এইজন্য

তাঁর স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ করা যায় না; ইনি কোন উপাধির সহিত সংসৃষ্ট নন, কিন্তু উপাধি দ্বারাই লক্ষিত হন। তিনি অদ্বিতীয় দ্যুতি ও সুখ-স্বরূপ। অন্নপূর্ণা উপনিষৎ বলেন—ব্রহ্ম এক নয় অর্থাৎ তাঁহাতে একত্ব ধর্ম নেই, আবার দ্বিতীয় বস্তুর অভাবের জন্য ব্রহ্ম বহুও নন। ব্রহ্ম দ্বিতীয় শূন্য ও অবিনশ্বর।

অতএব ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপনিষদের মন্তব্যগুলি আমাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, কারণ অপৌরুষেয় উপনিষৎ ভিন্ন ব্রহ্ম সম্বন্ধে অধিকতর প্রামাণ্য শাস্ত্র আর নেই। নশ্বর এই জগতের সত্তা সেই ব্রহ্ম সত্তার উপরই নির্ভর করে। আবার কর্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় যুক্ত ও মনবুদ্ধিচিত্ত, এবং অহঙ্কার বিশিষ্ট জীব ও মায়ায় প্রতিবিম্বিত ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নয়। ব্রহ্ম সর্বব্যাপক, তিনি হস্তপদাদি বিহীন হ'য়ে সকল কর্ম করেন বা সর্বত্র গমন করেন বা সব কিছু জানতে পারেন। তাই শ্বেতাশ্বতর ও নারদ পরিব্রাজক উপনিষৎ বলেন :

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥

তবে উপনিষৎ ইহাও বলেন যে, ব্রহ্ম নিরাকার হলেও পরব্রহ্মণঃ পরমার্থতঃ সাকার-নিরাকারৌ স্বভাবসিদ্ধৌ। (মহানারায়ণ)। অন্যত্র উক্ত হয়েছে

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা ॥
(রামতাপনীয়।)

অতএব সর্বব্যাপক ব্রহ্ম, তাঁর শক্তি প্রভাবে যে কোন মূর্তি ধারণ করতে পারবেন নাই বা কেন? তিনি ভক্তের অভিপ্রায় অনুসারে যে কোন স্থানে উপস্থিত থাকতে পারেন। অতঃপর মহানারায়ণ উপনিষদের ব্রহ্ম সম্বন্ধে কয়েকটী সারগর্ভ উক্তির উল্লেখ ক'রে প্রবন্ধের উপসংহার করা যাচ্ছে।

কালত্রয়াবাধিতং ব্রহ্ম। সত্তপ নির্গুণ স্বরূপং ব্রহ্ম। আদিমধ্যান্তশূন্যং ব্রহ্ম। সর্বং খবিদং ব্রহ্ম। মায়াতীতং গুণাতীতং ব্রহ্ম। অনন্তমপ্রমেয়মখণ্ডং পরিপূর্ণং ব্রহ্ম। অদ্বিতীয়পরমানন্দং শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-সত্যস্বরূপ ব্যাপকাপরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম। সচ্চিদানন্দ স্বপ্রকাশং ব্রহ্ম। মনোবাচামগোচরং ব্রহ্ম। অখিল প্রমাণাগোচরং ব্রহ্ম। অমিতবেদ্যাদ্যবেদ্যং ব্রহ্ম। তুরীয়ং নিরাকারমেকং ব্রহ্ম, অদ্বৈতমনির্বাচ্যং ব্রহ্ম। পাদচতুষ্টয়াত্মকং ব্রহ্ম। অর্থাৎ—ব্রহ্ম কালত্রয় বা ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপ কাল দ্বারা বাধিত নন, অর্থাৎ ব্রহ্ম তিনকালেই বর্তমান। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্গুণ হ'য়েও জগৎলীলা ব্যাপারে তিনি যুগপৎ সগুণ। ব্রহ্মের আদি নেই, মধ্য নেই, অন্তও নেই, অর্থাৎ ব্রহ্মের আদি, মধ্য ও অন্ত সম্বন্ধে কোন ইতিহাসই জ্ঞাত হওয়া যায় না; তিনি অনাদি ও অনন্ত। সবই ব্রহ্ম, যেমন বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কারের মধ্যে একই স্বর্ণ, সেইরূপ এই বৈচিত্র্যময় বিশ্ব ব্রহ্মই। ব্রহ্ম মায়ার অতীত ও সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই ত্রিগুণেরও তিনি অতীত, তাই তিনি নির্গুণ। ব্রহ্ম অনন্ত, অপ্রমেয় ও অখণ্ড পরিপূর্ণতা স্বরূপ। ব্রহ্মের দ্বিতীয় স্বরূপ কিছুই নেই, ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করলে ব্রহ্মের অখণ্ডত্বের হানি হয়। তিনি পরমানন্দ স্বরূপ; শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও সত্য স্বরূপ। তিনি ব্যাপক ও দেশাদি পরিচ্ছেদবিহীন। অর্থাৎ এমন দেশ ও স্থান নেই, যেখানে ব্রহ্ম নেই, এমন কাল নেই বা হবে না, যখন ব্রহ্ম ছিলেন না বা থাকবেন না, এবং ব্রহ্মের স্বজাতীয় বা বিজাতীয় কোন বস্তুও নেই, এবং স্বয়ং ব্রহ্মের মধ্যেও কোন ভেদ নেই। ব্রহ্ম সৎস্বরূপ, চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান বা চৈতন্য স্বরূপ এবং আনন্দ স্বরূপ। তিনি স্বপ্রকাশ, মন ও বাক্যের অগোচর এবং জাগতিক কোন প্রমাণেরই তিনি গোচর নন। ব্রহ্মের স্বরূপের আভাস একমাত্র অপৌরুষেয়, মানবীয় ভ্রান্তিবিহীন বেদান্তরূপ উপনিষদেই পাওয়া যায়। তিনি তুরীয়,

নিরাকার এবং অদ্বিতীয়। তিনি অদ্বৈত স্বরূপ ও অনির্বচনীয়। তিনি অংশবিহীন হ'লেও তাঁর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা করবার জন্য তাঁকে বলা হয় যে, তিনি পাদচতুষ্টয়াত্মক। ব্যষ্টি বৈশ্বানর বা সমষ্টি বিরাট—যিনি কর্মেন্দ্রিয়াদি ও পঞ্চপ্রাণ ও অন্তঃকরণ চতুষ্টয় বিশিষ্ট—তিনি এঁর প্রথম পাদ। লিঙ্গশরীর বিশিষ্ট—ব্যষ্টি, তৈজস ও সমষ্টি হিরণ্যগর্ভ এঁর দ্বিতীয় পাদ। কারণ শরীর বা আনন্দময় কোষ বিশিষ্ট ব্যষ্টি প্রাজ্ঞ ও সমষ্টি—মায়াধীশ ঈশ্বরচৈতন্য ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ। এই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদ আত্মার জাগ্রতাবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্তি অবস্থা। এই তিন অবস্থার অতীত যে তুরীয় অবস্থা, উহাই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। প্রথম তিন অবস্থা আত্মার উপর আরোপিত উপাধি মাত্র। তুরীয় ব্রহ্মই চৈতন্যস্বরূপ, দেশ-কাল-কারণের অতীত ও প্রকৃতি-বিকৃতিশূন্য।—(মাণ্ডুক্য)। ইহাই উপনিষদে ব্রহ্মবস্তু সম্বন্ধে সার কথা।

বর্ষের প্রথম দিনে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

বর্ষের প্রথম দিনে সুন্দর প্রভাতখানি
আনিল কি নব বাণী
রহস্যের অন্তরাল হোতে মোর মায়াচ্ছন্ন মনে ?
একটি আঘুর পত্র করে গেল জীবন প্রাঙ্গণে।
এ সংসারে আনি
ক্ষণিকের প্রমোদ কৌতুক সবি—তারে লাগে ভালো ?
মনন-মাধুরী ভরা নীলাম্বরে কে জ্বালিছে আলো। ১

সমুদ্রের নীলাম্বু নভো-নীলিমার মায়া
প্রেমের আলেখ্য আঁকা
বিশ্বময় পরম বিস্ময়রূপে। বৈশাখী উৎসবে
কে আসিছে আলোকের উত্তরীয় উড়াইয়া নভে।
আপনারে রাখা
গৃহমাঝে কেমনে সম্ভব ? সাধ আছে, সাধ্য নাহি ;
নিত্য গাওয়া গান মোর কার কাছে যাবো আজ গাহি ? ২

প্রাণের আকাশে মোর মেঘের কবরী খুলে
বিদ্যুৎবল্লরী দু'লে—
করে ব্যাকুলিত। চিত্তে মম সঙ্গীতের অভিসার
কে এনেছে সুরে সুরে বাজাইয়া বাঁশরী নিসার !
হৃদি-মর্মমূলে
কামনা-পল্লবদল দুয়ে দুয়ে তাহারে প্রণাম
করে কেন ? আত্মার অমৃতপথে কারে হেরিলাম ? ৩

চুঁচুড়ার সংগীত-শিল্পী

(২)

শ্রীবিপ্রদাস মন্ধী, এম. এ.

গোপালচন্দ্র পাঠক

(১৭৯১—১৮৭৬)

সঙ্গীতাচার্য গোপালচন্দ্র পাঠকের পিতা পঞ্চানন পাঠক প্রসিদ্ধ কথক ছিলেন। পঞ্চানন, রামচন্দ্রের পিতা জগমোহন শীল মহাশয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা থাকায় আপন পুত্রের সংগীত শিক্ষার ভার রামচন্দ্রের উপর অর্পণ করেন। পঞ্চানন ভগবদ্বিষয়ক সংগীত চর্চা করিতেন ও পুত্র গোপালকে বাল্যকালে সেই সংগীতের অনুশীলন করাইয়াছিলেন, যাহার ফলে রাগরাগিণীর জ্ঞান গোপালের অন্তরে বাল্যকাল হইতেই ফুটিয়াছিল। গোপালের কণ্ঠস্বর গম্ভীর ও মিষ্টরসপূর্ণ হওয়ায় তাঁহার সংগীত শ্রোতাদের হৃদয়গ্রাহী হইত। ইনি রামচন্দ্রের নিকট একাদিক্রমে চব্বিশ বৎসর সংগীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। গোপালের মেধা তীক্ষ্ণ থাকায় অল্প সময়ের মধ্যে সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার যশঃসৌরভ কলিকাতা ও চুঁচুড়ার পার্শ্ববর্তী সহরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি বিখ্যাত "সংগীত-সমাজের" আসরে স্বচ্ছ সংগীত রসপরিবেশন করিয়া বিশেষ-ভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রভৃতি গুণীদিগের সহিত পরিচিত হন। গোপালচন্দ্র কলিকাতার তুলাপটির বিখ্যাত সেন-পরিবারের সংগীত শিক্ষক ছিলেন। তিনি প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব উপলক্ষে গোবরডাঙ্গার জমিদার সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে গান গাহিতে যাইতেন। জমিদারবাবুরা তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান দান করিতেন। গোবরডাঙ্গার ভারত বিখ্যাত মৃদঙ্গী ও তাবলিক গোলাম আব্বাসের ছাত্র তারাপ্রসাদ রায় তাঁহার সহিত সংগত করিতেন। গোপালচন্দ্র বর্ধমানের মহারাজার নিকট হইতেও নিমন্ত্রণ পত্র পাইতেন। গোপাল তাঁহার পুত্রদিগের, যথা—লালবিহারী, দ্বারিকানাথ ও নিমাইকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ লালবিহারী পিতার সুনাম বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে শিব-চন্দ্র মল্লিক, কুমুদচন্দ্র দে ও মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি দীর্ঘকাল সংগীত সাধনা করিয়া পঁচাশী বৎসর বয়সে সুরলোকে গমন করেন।

লালবিহারী পাঠক

(১৮৩৪—১৯০৬)

লালবিহারী পাঠক পিতা গোপালচন্দ্রের নিকট খেয়াল শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি ধ্রুপদেরও যথেষ্ট অনুশীলন করিয়াছিলেন। লালবিহারী পিতার স্নেহের অধিকারী হওয়ায়, প্রতি সঙ্গীতানুষ্ঠানে পিতার সহকর্মী হিসাবে যোগদান করিতেন। তাঁহার বাগেশ্রী ও বাহার রাগে বিশেষ দখল ছিল।

কণ্ঠসংগীত ব্যতীত তিনি তারাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের নিকট তবলা ও মৃদঙ্গ শিক্ষা করিয়াছিলেন। তারাপ্রসাদবাবু লালবিহারীর গৃহে অবস্থানকালে দেহত্যাগ করেন।

লালবিহারী উস্তাদ মহম্মদ খাঁর নিকট সেতার শিক্ষা করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর লালবিহারী বর্ধমানের মহারাজার রাজসভায় ও উত্তরপাড়ার জমিদার অরুণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের সংগীত-জলসায় নিয়মিত নিমন্ত্রণ পাইতেন।

লালবিহারীর গীতবাদ্য শুনিতে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয় সরকার, দীননাথ ধর প্রভৃতি সুসাহিত্যিকবৃন্দ তাঁহার আবাসে সমবেত হইতেন। তিনি কৃতী সুরকার ও সুশিক্ষক হিসাবে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করিয়াছেন। এই দুই মহাশক্তির সমন্বয় বহু গুণীর ভিতর পাওয়া যায় না। তাঁহার বহু সুযোগ্য ছাত্র ছিল তন্মধ্যে যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ লাহিড়ী, অবিনাশচন্দ্র

ভূপ, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, সাতকড়ি পাঠক, দীননাথ সেন (উকিল), রায় গোপীনাথ সেন বাহাদুর, সিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, এম. এ., বি. টি, ডাক্তার শিবচরণ ভট্টাচার্য, অতুলচন্দ্র শেঠ, কালীচরণ রায়, গিরীশচন্দ্র মল্লিক, নীলরতন আঢ্য, শশিভূষণ শীল, সিদ্ধেশ্বর শীল, গদানারায়ণ শীল, অনন্তনারায়ণ শীল, ক্ষেত্রনাথ শীল (রাজাবাবু), নন্দলাল বড়াল প্রভৃতি। রামচন্দ্র অধিকারী, মন্মথ অধিকারী, শ্যাম চক্রবর্তী ও গোবর্ধন শীল তাঁহার নিকট মৃদঙ্গ ও তবলা শিক্ষা করিয়াছিলেন। লালবিহারী কলিকাতার হরিদাস দত্ত পরিবারের সংগীত শিক্ষক ছিলেন। মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা তাঁহার সংগীতের সমঝদার ছিলেন।

স্ত্রী-বিয়োগের পর লালবিহারী সংসার ত্যাগ করিয়া তীর্থপর্যটনে বাহির হন। এই উপলক্ষে তিনি বহু রাজা ও মহারাজার দরবারে আপন কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন ও সর্বজনের প্রশংসাভাজন হন: পরিণত বাহাত্তর বৎসর বয়সে লালবিহারী ইহলোক ত্যাগ করেন। চুঁচুড়ায় উচ্চাঙ্গসংগীত প্রসারে লালবিহারীর দান অসামান্য এবং এক্ক প্রতিভায় বহু ছাত্রকে বিভিন্ন বিষয়ে যথাযোগ্য বিদ্যাদান করা তাঁহার এক বিস্ময়কর ব্রত ছিল।

লালবিহারীর কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত এবং মৃদঙ্গ ও তবলায় সমান অধিকার থাকায়, চুঁচুড়ার সংগীতবিদ্‌দিগের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে অবস্থিত ছিল।

বিজয়কৃষ্ণ লাহিড়ী

বিজয়কৃষ্ণের মধুর কণ্ঠ এক ঐশ্বরিক দান। যাঁহারা তাঁহার কিন্নরকণ্ঠের গান শুনিয়াছেন তাঁহারা বলেন, এমনটি শোনা যায় নি আর শোনা যাবেও না। বিজয়কৃষ্ণ প্রথমে যশোহরতলা নিবাসী হলেবাবার নিকট আগত এক সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসিয়া টপ্পা ও দেহতত্ত্ব গান শিক্ষা করিয়াছিলেন। পরে ইনি লালবিহারী পাঠকের নিকট খেয়াল ও টপ্পা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সংগীতরস আহরণের জন্য কিছুকাল বাংলার বাহিরের ওস্তাদের নিকট সাকরেদি করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ বাংলার সুপ্রসিদ্ধ টপ্পা গায়ক রমজান আলি খাঁর নিকট কিছুকাল শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার মার্জিত স্বরে রস-বিন্যাস শ্রোতাদের অভিভূত করিত। কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে তাঁহার যথেষ্ট সমাদর ছিল। তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ মালিয়া, দ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরাণচন্দ্র সানার নাম উল্লেখযোগ্য।

যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যাদবচন্দ্র লালবিহারীর নিকট খেয়াল শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনাই নিবাসী দীননাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট বংশী, বেহালা ও এস্‌রাজ শিক্ষা করেন। ইনি যাত্রাগানের সুরকার হিসাবে যশঃ অর্জন করেন। ইনি ঐকতান দলের নায়কত্ব করিতেন। যাদবের কণ্ঠস্বর প্রশংসনীয় ছিল বলিয়া বহু ছাত্র তাঁহার নিকট গীতবাদ্যাদি শিক্ষা করিতেন। ইঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে নৈহাটী নিবাসী শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত ও যুগল চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য।

যাদবচন্দ্র কলিকাতার এমারেল্ড থিয়েটারে গানের সুর দিতেন এবং সময়ে সময়ে অংশ গ্রহণ করিতেন। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের বহু ব্রহ্মসঙ্গীতে সুর দিতেন ও নিজেও গাহিতেন। রবীন্দ্রনাথ-ঠাকুরের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথের কিছু ব্রহ্মসঙ্গীতে সুর দিয়া তাহার স্বরলিপিও করিয়াছিলেন। বহু যাত্রা ও থিয়েটার সম্প্রদায়ের সুরকার ও গায়ক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি জনপ্রিয় গায়ক ছিলেন এবং সাধারণ লোকে তাঁহাকে 'যাদু মাষ্টার' বলিয়া ডাকিত।

বারে বারে

শ্রীহাসিরাশি দেবী

কোনদিন উঠেছিনু এক সুরে একটি প্রণাম—
বুদ্ধের স্মরণ লইলাম,
সঙ্ঘের স্মরণ লইলাম,
ধর্মের স্মরণ লইলাম।
তারপর
বহুকাল কেটে গেছে ; বহুদিন, রাত্রির প্রহর
কতবার এলো, গেলো,—আকাশ মাটিরে ছুঁয়ে বরষা ও বসন্ত বনে,
কম্পিত অশ্বত্থ শাখে, মুকুলিত মাধবী কাননে
সৌরভ আকুল সেই বৈশাখী-পূর্ণিমা
হে ক্ষমা-সুন্দর।
তুমি গেলে, রেখে গেলে অনন্ত অশেষ প্রশ্ন,—
তারপর,—শুধু তারও পর ;
হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি। অন্নে অন্নে বাজিছে ঝঞ্ঝনা,
রুধিরাক্ত পথ বাহি' চলিয়াছে মরণ মিছিল,
আকাশের অন্ধকার মাটির এ-আলোকেরে করে পরিহাস,
অভিশপ্ত অনন্ত নিখিল
ঘুমুর্ষু ক্লান্তির ক্ষণে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
বিলুপ্ত বিশ্বাস মাঝে গুমরিছে আত্ম-প্রবঞ্চনা।
মানুষ—মানুষ নয়। ক্ষমারে সে গিয়াছে ভুলিয়া
প্রেমেরে সে দিয়াছে বিদায়
কলহ কুশ্রীর মাঝে সুন্দরের সমাধি রচিয়া—
আপনি করিছে হায় হায়।

তবু তুমি এসেছিলে।
পৃথিবীর পথে পথে, মাটির এ ঘরে ঘরে
প'ড়েছিল তোমার পায়ের
সেই সে স্মারক-লিপি।

সহস্র সহস্র বছরের
ক্লেদাক্ত ক্লান্তিরে বহি' উন্মত্ত উচ্ছ্বাসভরা হিয়া
তব বাণী শুনিল না ; দাঁড়ালো না নীরবে আসিয়া
তোমার বেদীর তলে
বেদনায়—অশ্রুজলে
সব ভুল সব ভ্রান্তি করিতে ক্ষালন,
আসিল সে মহালগন
সম্রাটে ভিক্ষুক করি গৃহীরে সে করিয়া বৈরাগী—
সেদিনের চণ্ডাশোক ধর্মাশোকে উঠিল না জাগি।
তাই নিজ রক্ত দিয়া
এ হিংসা কুটিল পথে লিখে গেলে নাম,
লিখে গেলে, "ডাকো নাই, তবু আমি আসিয়াছিলাম।"

জাতির উন্নয়নে জনশিক্ষা

শ্রীছায়া ভট্টাচার্য, এম. এ.

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার আগে পাঠশালা, টোল, মক্তব ও মাদ্রাসা—এইগুলিই ছিল ভারতের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। হিন্দুদের পাঠশালা ও মুসলমানদের মক্তব ছিল প্রাথমিক শিক্ষা-বিতরণের ক্ষেত্র, আর টোল ও মাদ্রাসা ছিল যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমানদের উচ্চতর শিক্ষার কেন্দ্র। এ শিক্ষায় ইংরেজী জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল না। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রচলন করেন বিদেশীয় মিশনারীরা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মিশনারীরা এসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেন। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিদ্যালয়গুলিতেই সর্বপ্রথম ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়।

মিশনারিগণ এবং রামমোহন রায় প্রমুখ কয়েকজন উদ্যোগী দেশী ও বিদেশী সংস্কারকের প্রচেষ্টায় এ দেশের শিক্ষাবিধির আমূল পরিবর্তন ঘটে। তা' ছাড়া বিভিন্ন বড়লাটের আমলে নতুন নতুন আইনের বলে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা চলতে থাকে এবং প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার জন্য ক্রমে ক্রমে বহু স্কুল ও কলেজ স্থাপন করা হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে সর্বোচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এর পরে অন্যান্য প্রদেশেও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।

কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার এত সংস্কার সাধনের পরেও দেশে যথার্থ শিক্ষিতের সংখ্যা মুষ্টিমেয়ই থেকে গেল। দেশের সাধারণ লোক ছিল অতি দরিদ্র। সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করবার মত সামর্থ্যও থাকত না সকলের, যাদের

থাকত তারাও ছেলেদের এর বেশি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারত না। তার চেয়ে সংসারের অভাব অনটনে সাহায্যের জন্য জীবিকার উপায় করতে পারলেই উপকার হত বেশি। এমন অবস্থায় উচ্চ শিক্ষার প্রসার কতখানিই বা হতে পারে? যেটুকু হত তা সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ থাকত অর্থবান্ অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই।

এত বাধা সত্ত্বেও জাতীয় জীবনের উন্নতির পথে শিক্ষার অপরিহার্যতা উপলব্ধি করেই শিক্ষা-সংস্কারকেরা অশিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাদানের উপায় চিন্তা করতে সুরু করেন। এইভাবেই প্রথম জনশিক্ষার কথা ওঠে। এই সম্পর্কে মেয়েদের শিক্ষা বিষয়েও যথাযোগ্য ব্যবস্থা করার চেষ্টা হয়। বয়স্ক-শিক্ষার পরিকল্পনাটি এই রকম—যে সব প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যথাসময়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে পারে নি তাদের ব্যবহারিক জীবন-যাত্রার সুবিধাকল্পে লিখতে ও পড়তে পারার মত অক্ষর-শিক্ষা এবং কাজ চালিয়ে নেওয়ার মত যৎসামান্য গণিত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

বয়স্ক-শিক্ষার বিষয়টি জন-শিক্ষার পরিকল্পনার মধ্যেই পড়ে। শিল্প-বিপ্লবের যুগে যখন পাশ্চাত্য জগৎ থেকে একটির পর একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ঢেউ এসে লাগতে থাকে এদেশে, তখনই প্রথম জন-শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়। বাষ্পযানের চল হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে নানা রকম নতুন যন্ত্রের আমদানি হতে থাকে। সেই সময়ে কলকারখানার শিল্প-শ্রমিকেরা যখন কোনও নতুন যন্ত্র নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে যেত, তখন যন্ত্রের কল-কব্জার খুঁটিনাটি এবং ব্যবহারপ্রণালী সম্পর্কে তাদের কিছু জ্ঞান রাখতে হত। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা না থাকলে যন্ত্রের তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান আহরণ সম্ভবপর হত না। কাজেই শ্রমিকদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন ছিল খুব বেশি। এ ছাড়া বাষ্পযানের সাহায্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যাতায়াত সহজ হয়ে আসায় নানা ভাষা ও ভাবের পরস্পর পরিচিতি ও আদান-প্রদানের সুযোগ ঘটলো। কিন্তু এ রকম ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টির পক্ষে প্রবল বাধা ছিল—এ দেশের জনসাধারণের শিক্ষার অভাব। এই সূত্রেই ব্যাপকভাবে জনশিক্ষার প্রয়োজন যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়ে দেখা দেয়। যে জাতির জীবন-ধারা নিজ দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, নিজ ভাবধারার বৈশিষ্ট্য দিয়ে অপরাপর জাতিকে প্রভাবিত করবার বা অন্যান্য সভ্য জাতির ভাবধারা জানবার জন্যও যে জাতির আগ্রহের লেশমাত্র নেই, সে জাতির উন্নতির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হয়ে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির জীবনধারা ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে, নিজের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তার সমন্বয় সাধন করে একটি জাতির জীবন ধীরে ধীরে পুষ্টিলাভ করতে থাকে। এই জন্যই সমগ্র জগতের জীবনধারার সঙ্গে পরিচিতি লাভের জন্যই জনশিক্ষার প্রয়োজন।

অনেকের মতে গণতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত হওয়ার ফলেই জন-শিক্ষা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের মতামত অনুসরণ করেই শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হতে থাকে। কাজেই সে রাষ্ট্রের উন্নতির দায়িত্বও জনগণেরই। সেই দায়িত্বের ভার সুষ্ঠুভাবে বহন করতে হলে সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের হালচাল সম্বন্ধেও জনগণের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতি নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি স্বীয় কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত থাকা উচিত। এই জন্যও জনশিক্ষা আবশ্যক। অশিক্ষিত জনগণের হাতে রাষ্ট্রশাসনের গুরুভার অর্পণ করা চলে না।

রাষ্ট্রের মুখপাত্রগণ আজকাল জনশিক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছেন। জনশিক্ষার বিষয়টিকে জাতীয় উন্নতি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে একটি কার্যসূচী প্রস্তুত করা হয়েছে। জনগণ যাতে

সচ্ছল আর্থিক অবস্থা, স্বাস্থ্যকর আবাস এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিয়ে সুস্থ ও সহজ জীবন যাপন করতে পারে ও প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর অবসর সময়ে সংস্কৃতি ও কলাচর্চায় মনোযোগ দিতে পারে তারই ব্যবস্থা করা হয়েছে এই কার্যসূচীতে।

পরিকল্পনা অনুসারে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বহু জনশিক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এসব শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ্যপুস্তক ছাড়া সামাজিক ও যৌথ কার্যকলাপ বিষয়েও শিক্ষাদান করা হয়। এখানে সংস্কৃতি ও কলাচর্চারও সুযোগ থাকে। এ ছাড়া এক একটি রাষ্ট্রে জনসাধারণের শিক্ষা-বিধানের জন্য বহু পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। এই সব পাঠাগারে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের জন্য বিশেষভাবে লিখিত গ্রন্থের মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। এইভাবে জনশিক্ষার পরিকল্পনাটিকে এখনও বাধ্যতামূলক করা হয় নি। কিন্তু সাফল্য সুনিশ্চিত হয়ে উঠবে যদি এটিকে বাধ্যতামূলক করা হয়। যাই হ'ক উহা সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার প্রচেষ্টা চলছে।

জাতীয় জীবনকে উন্নত করতে হলে জনশিক্ষার প্রয়োজন যে কতখানি তা এখন সকলেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এ দেশের দারিদ্র্য-নিপীড়িত জনসমাজ দৈনন্দিন জীবনের অভাব অভিযোগের তাড়নায় সঙ্কীর্ণ পারিবারিক জীবনের বাইরে আর কোনও উচ্চতর বিষয়ে চিন্তা করার অবকাশ পায় না। লক্ষ্মী সরস্বতী—দুই দেবতাই তাদের প্রতি বিমুখ। তাই যেমন একদিকে কোনও রকম নিশ্চিন্ত আনন্দ চর্চার সুযোগ তাদের নেই, তেমন অপরদিকে শিক্ষার আলোকেও তারা বঞ্চিত। সংস্কৃতি ও কলাচর্চার অবসর কোথায় তাদের? জীবনের সৌন্দর্য ও মহিমার দ্বার তাদের কাছে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের নিজ নিজ জীবনের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলবার জন্য এ দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে হবে। জীবনের দুঃখের দিক্—অন্ধকার দিকটার সঙ্গেই কেবল তাদের পরিচয় ঘটেছে, এবারে আলোর দিকটাও উন্মুক্ত করে দেখাতে হবে। অজ্ঞতা ও সঙ্কীর্ণতার রাজ্য থেকে জনগণকে উদ্ধার করবার পক্ষে এই একমাত্র পথ। দরিদ্র অশিক্ষিত জনগণকে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা নির্ভীক চিত্তে জীবনের প্রতিটি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সংগ্রাম করে যেতে পারে। তাদের বুদ্ধির বিকাশ এবং চিন্তাধারার উন্নতিসাধনই হবে এ শিক্ষার লক্ষ্য। রাষ্ট্রের ও জাতীয় জীবনের উন্নতি-সাধন করতে হলে জনগণের উৎসাহ ও সহযোগিতা যে অপরিহার্য এই কথাটি তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। তবেই তারা নিজেদের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হবে এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিজেদের জীবনকে উন্নততর করে তুলতে তৎপর হবে। এই কল্যাণকর উদ্দেশ্যটি মনে রেখে জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারলেই জনশিক্ষার পরিকল্পনা সার্থক হয়ে উঠবে।

•

জনশিক্ষার প্রচেষ্টায় একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। জনশিক্ষা বলতে কেবল প্রাথমিক শিক্ষা বোঝায় না, শিক্ষা কথাটির অর্থ আরও ব্যাপক। অক্ষর শিক্ষা ও হিসাবের কাজে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু গণিতের জ্ঞান—এই হলো প্রাথমিক শিক্ষা। এ শিক্ষায় জীবনের মান কতটা উন্নত হয়? সে শিক্ষাই শিক্ষা যাতে অন্তর হয় প্রসারিত, বুদ্ধি হয় বিকশিত এবং চরিত্র হয়ে ওঠে সুগঠিত। চিন্তা-ধারা উন্নততর করে তোলাই হলো প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য। জনশিক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষার এই লক্ষ্যটি মনে রেখে কাজ করতে হবে।

ভারতের তীর্থ দর্শনে

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীনবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

২

প্রয়াগ : ভোর বেলাতেই মীর্জাপুর থেকে এলাহাবাদে আমরা রওনা হয়েছিলাম। রাস্তাতে সকাল হ'তেই যাত্রা-গাড়ীর ম্যানেজার প্রত্যেক কুঠরিতে এসে, প্রত্যেক যাত্রার কাছ থেকে তীর্থ-যাত্রার রেলভাড়া জমা দেওয়ার রসিদ দেখে একখানি ছাপান কার্ডে তার নাম ও তীর্থযাত্রা গাড়ীর নম্বর লিখে দিলেন। এই কার্ডখানিই হোল তীর্থযাত্রীর রেলযাত্রার টিকিট। প্রত্যেক ষ্টেশনেই বাইরে যাওয়া আসার সময় এই কার্ডখানি আবশ্যক মত দরজায় দেখাতে হবে। সমস্ত তীর্থযাত্রীদের নাম লেখা একখানা বড় কার্ড ম্যানেজারের কাছেই থাকে।

সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরে এলাহাবাদ জংশনে এসে পৌঁছলাম। এলাহাবাদে বড় লাইন ও ছোট লাইন মিলে চারটি ষ্টেশন আছে। প্রত্যেক ষ্টেশন থেকেই ত্রিবেণী সঙ্গমে বা অন্যান্য মন্দিরে যাওয়ার রাস্তা পৃথক পৃথক। আমাদের গাড়ী জংশন ষ্টেশনেই রাখার ব্যবস্থা ছিল, তাই এখান থেকেই স্নান ও দর্শনে যাওয়ার ব্যবস্থা হোল। প্রত্যেক ষ্টেশনের বাইরে যাতায়াতের জন্য ঘোড়ার গাড়ী ও সাইকেল রিক্সা পাওয়া যায়। ত্রিবেণী সঙ্গম পর্যন্ত গাড়ীতে যাওয়া যায় না। সেখানে যেতে হলে গঙ্গা বা যমুনা দিয়ে নৌকাতে যেতে হয়। সেখানের করণীয় কার্য (মুণ্ডন, স্নান ও দর্শনাদি) হয়ে গেলে আবার সেই যাত্রা করার জায়গাতেই ফিরে আসতে হয়। নৌকা ফিরে না আসা পর্যন্ত তীরে ঘোড়ার গাড়ী বা রিক্সা অপেক্ষা করে ও পরে যাত্রীদের নিয়ে অন্যান্য মন্দিরাদি ও সহর দেখিয়ে যাত্রীদের নির্দেশমত কোনও ধর্মশালায় বা ষ্টেশনে পৌঁছিয়ে দেয়। চার পাঁচজন বসবার মত ঘোড়ার গাড়ী ২৷৷০ টাকা থেকে ৩৲ টাকার মধ্যে ভাড়া পাওয়া যায়। মেলার সময় বা বেশী যাত্রীর সমাগম হলে গাড়ী ভাড়া ও নৌকা ভাড়া অনেক বেড়ে যায়। আমরা ষ্টেশন থেকে ঘোড়ার গাড়ীতেই যমুনাতীরে উপস্থিত হলাম ও সেখান থেকে নৌকাতে ত্রিবেণী সঙ্গমে পৌঁছলাম।

এলাহাবাদ বা প্রয়াগকে "তীর্থরাজ" (সমস্ত তীর্থের অধিপতি) বলে। সাত পুরী এঁর রাণী ও অন্যান্য তীর্থসকল এঁর প্রজা। গঙ্গা ও যমুনার ধারা সমস্ত প্রয়াগক্ষেত্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছে। এই তিন ভাগকে পবিত্র যজ্ঞাগ্নির সমতুল্য জ্ঞান করা হয়। গঙ্গা-যমুনার মধ্যকে গার্হপত্যাগ্নি, গঙ্গার অপর ভাগ (কুলী) আহবনীয় অগ্নি, আর যমুনার অপর ভাগ (অলর্কপুর ও অরৈল) দক্ষিণাগ্নি নামে অভিহিত। এই সব স্থানে পবিত্রভাবে এক এক রাত্রি বাস করলে অগ্নি উপাসনার ফল হয়। অন্যান্য তীর্থসকল তীর্থরাজ প্রয়াগের দর্শনের জন্য প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এখানে উপস্থিত হন। সেজন্য মাঘ মাসে প্রয়াগে স্নান ও বাস করলে সর্ব তীর্থের জলে স্নান ও সর্বতীর্থ করা হল বলে মনে করা হয়। এজন্য প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এখানে মেলা হয়। অনেক শ্রদ্ধালু যাত্রী গঙ্গা-যমুনার মাঝের চড়ায় কুটির নির্মাণ ক'রে 'কল্পবাস' করেন। এখানেই প্রত্যেক ছয় বৎসরে 'অর্ধকুম্ভ' ও বার বৎসরে 'পূর্ণকুম্ভ' হয়। সে সময় এখানে ভারতের নানা স্থান থেকে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী সমবেত হন ও

ধর্মশাস্ত্রাদি আলোচনা করেন। তখন এই চড়া "ধর্ম-নগরীতে" পরিণত হয়। সরকারী ব্যয়ে বহু রাস্তাঘাট নির্মিত হয়, বৈদ্যুতিক আলো ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়। পাহারা দেওয়া ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার সুবন্দোবস্ত হয়। কথিত আছে সম্রাট হর্ষবর্ধন এই পর্বের আরম্ভ করেন এবং পর্বের শেষদিনে তিনি আপন বসন ভূষণ পর্যন্ত দান করতেন। সেই থেকে আজও পর্যন্ত এই মেলা হ'য়ে আসছে। এই মেলা দর্শনের জন্ত ও ত্রিবেণীতে স্নানের জন্ত ভারতের নানা স্থান থেকে বহু লক্ষ নরনারীর সমাগম হয়। মেলার কয়টা দিন যাত্রীদের সুবিধার জন্ত সঙ্গমের নিকটে প্রয়াগ-ঘাট ষ্টেশন ও ত্রিবেণী-সঙ্গম ষ্টেশন তৈরী হয়। যাত্রীদের থাকার জন্ত সহরে অনেক ধর্মশালা, বোর্ডিং ও হোটেল আছে। জংশন ষ্টেশন থেকে সঙ্গম প্রায় চার মাইল।

প্রয়াগের মুখ্য কর্ম মস্তকমুণ্ডন। বহু বৎসরের জটাধারী সাধুরাও এখানে জটা মুণ্ডন করেন। সধবারা পর্যন্ত চুলের অগ্রভাগ কেটে ফেলেন। ত্রিবেণী-সঙ্গমের কাছে কোন নির্দিষ্ট জায়গায় ঐ মুণ্ডন-কার্য হয়। মুণ্ডনের পর গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলন-স্থান ত্রিবেণীতে স্নান করা হয়। স্ত্রীলোকের বেণীর ন্যায় ঐ তিন নদীর ধারা এসে মিলিত হয়েছে ব'লে এই জায়গার নাম ত্রিবেণী। বর্তমানে কেবল গঙ্গা ও যমুনা দেখতে পাওয়া যায়। সরস্বতীর কোনও চিহ্ন নেই। তবে, দুর্গের দক্ষিণে যমুনার তীরে একটি কুণ্ড আছে; তাকেই পাণ্ডারা সরস্বতী বলেন। শীত ও গ্রীষ্মকালে ত্রিবেণী-সঙ্গমের দৃশ্য অতি মনোরম। একদিক থেকে গঙ্গার সাদা রঙের জলধারা, অপর দিক্ থেকে যমুনার নীল জলধারা, আর মাঝে সাদা ও নীলের মিশ্রণ ধারা—এই তিন ধারাই বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। লোকে বলে—গঙ্গা, হিমালয়কন্যা ব'লে তাঁর জল শীতল, যমুনা সূর্যদেবের কন্যা বলে তাঁর জল ঈষৎ উষ্ণ। এই দুই ধারার মিলিত জল উষ্ণ ও ঠাণ্ডার মিশ্রণ জলের মত। অনেকে বলেন, গঙ্গার জলে স্নান করে এসে যমুনার জলে স্নান করলে এই পার্থক্য বেশ বোঝা যায়। ত্রিবেণী-সঙ্গমে প্রায় এক মাইল পরিমিত স্থানের গভীরতা খুব কম। আর ওখানে নীচে বালু থাকায় স্নানের সময়ে পিছ্‌লে পড়ার বা জলে ডোবার ভয় নাই। এখানে কোন বাঁধান ঘাট নাই। পাণ্ডারা কাঠের তক্তা পেতে আসন তৈরী করেন; সেইখানেই যাত্রীরা কাপড় প্রভৃতি রেখে স্নান করেন। এখানে প্রত্যেক পাণ্ডার পৃথক পৃথক চিহ্নিত উঁচু পতাকা টাঙান থাকে, যাতে যাত্রীরা নিজ নিজ পাণ্ডার স্থান অনায়াসেই চিনে নিতে পারেন। গঙ্গার স্রোতের জন্ত সঙ্গমের স্থান বদলায়; বালুচরও কখনও কখনও স্রোতের এধারে বা ওধারে হয়। ত্রিবেণী-সঙ্গমের কিছুদূরে দুর্গ। এর মধ্যে পাতালপুরীতে ধর্মরাজ, শিব, অন্নপূর্ণা, সত্যনারায়ণ প্রভৃতি নানা দেবদেবীর কালো পাথরের তৈরী বড় বড় মূর্তি অনেক আছে। এই পাতালপুরীতেই অন্ত এক কুঠরির মধ্যে লাল কাপড়ে ঢাকা ছটি শাখাযুক্ত একটি বটবৃক্ষ আছে। ইহাই অক্ষয় বট। দুর্গের উপরে এই বটবৃক্ষের কোনও ডালপালা দেখা যায় না। প্রবাদ—এর বিস্তার দেখে স্বয়ং ব্রহ্মা সব শাখা-প্রশাখা কেটে দেন। বহু বৎসর থেকে এই বটশাখাই অক্ষয় বট বলে পরিচিত ও পূজিত হয়ে আসছে; কিন্তু আজ কয়েক বৎসর হোল প্রকৃত বা আদি অক্ষয় বটের সন্ধান দুর্গেরই অন্ত এক জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। ইহা দুর্গের দক্ষিণ ভাগে যমুনাতীরে। মোগল সম্রাট আকবর বাদশাহ যখন এই দুর্গ নির্মাণ করান, সে সময় আদি অক্ষয় বট দুর্গের ভিতরে পড়ে। দুর্গ মধ্যে দর্শনার্থী জনসাধারণের আসা-যাওয়া দুর্গের পক্ষে নিরাপদ নয় বা অন্যান্য আরও বহু অসুবিধা হতে পারে, এই ভেবে বাদশাহ প্রয়াগের প্রধান প্রধান পাণ্ডাদের প্রচুর অর্থ দেন ও

দুর্গ মধ্যে অন্য এক সুবিধাজনক জায়গায় এই কৃত্রিম অক্ষয় বট স্থাপন করান। দর্শনার্থী জনসাধারণের কাছে ইহাই অক্ষয় বট বলে প্রচার করান হয়েছিল। ইহার দর্শন ও পূজনের জন্য একটি নির্দিষ্ট পথ রেখে দেন। প্রকৃত বটবৃক্ষকে চারধারে দেওয়াল দ্বারা আড়াল করে সাধারণকে দর্শন হতে বঞ্চিত রাখেন। পরে ক্রমে ক্রমে এক এক করে ইহার ডাল সব কেটে ফেলা হয় এবং যাতে ঐ সব কাটা জায়গা হতে আর অন্য নূতন ডালপালা না জন্মায়, সেজন্য ঐ জায়গায় লোহার ভারি ভারি কড়া চাপান হয়। কিন্তু ভগবৎ মহিমা অপার। এত চেষ্টা সত্ত্বেও বাদশাহের ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। সেই চাপা দেওয়া জায়গা থেকেই নূতন নূতন শাখা-প্রশাখা বের হতে থাকে।

বর্তমানে উহা বেশ বড় বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। বহু বৎসরাবধি এই আদি বটবৃক্ষ গুপ্ত অবস্থাতেই ছিল; তৎপরে অনেক অন্বেষকের বহু অনুসন্ধানের ফলে ইহার আবিষ্কার হয়েছে। বহু উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্ একে অনেক প্রাচীন বৃক্ষ বলে অভিমত দিয়েছেন। আর এরূপ প্রাচীন বটবৃক্ষ দুর্গ মধ্যে আর অন্য কোনও না থাকায়, একেই আদি অক্ষয় বট বলে সাব্যস্ত করেছেন। বর্তমানে এই বটবৃক্ষকে দর্শন করতে দেওয়া হয় ও যমুনাতীরে একটি ফটক তজ্জন্য নির্দিষ্ট আছে। শুনলাম, সপ্তাহে দুই দিন ইহা দর্শন করতে দেওয়া হয়। বর্ষাকালে যমুনার জল বাড়লে ফটকের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। তখন দর্শনার্থীরা দুর্গ মধ্যে যেতে পারে না; বাইরে যমুনাবক্ষ হতেই অক্ষয় বটকে দর্শন করে। দুর্গ মধ্যে একটি প্রস্তর স্তম্ভ আছে, ইহার আদি নাম কুলস্তম্ভ; পরে সম্রাট অশোক ইহার উপরে শিলালেখ লেখাতে বর্তমানে অশোক স্তম্ভ বলা হয়। দুর্গের কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি ছাড়া ইহা দেখতে পাওয়া যায় না।

দুর্গের পাশে গঙ্গার বাঁধের নিম্নে শোয়ান হয়েছে হনুমানজীর বিশাল মূর্তি। দেখলে মনে হয়, হনুমানজী রাবণ বধের পর শুয়ে বিশ্রাম করছেন। বর্ষায় গঙ্গার জল বাড়লে মূর্তিটি ডুবে যায়। দুর্গের পশ্চিমে কিছুদূরে মনকামেশ্বর শিবমন্দির। মাঝে সরস্বতী কূপ। দারাগঞ্জ পাড়া থেকে প্রায় এক মাইল দূরে বক্সী মহল্লায় গঙ্গাতীরে নাগবাসুকীর মন্দির। নাগ-পঞ্চমীতে এখানে মেলা হয়। এখান থেকে প্রায় দুমাইল পশ্চিমে গঙ্গাতীরে বলদেবজীর মন্দির। ত্রিবেণী-সঙ্গম থেকে কিম্বা সোমেশ্বরনাথের দর্শনের পর গঙ্গা পার হয়ে মুঙ্গিবাগানে বিন্দুমাধবজীর দর্শন করতে হয়। এইসব স্থানে গঙ্গা দিয়ে নৌকাতেও যেতে পারা যায়।

সহরের ভিতরে কর্ণেলগঞ্জ পাড়াতে মহর্ষি ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম ও গুহা; পাশেই ভরদ্বাজেশ্বর শিবলিঙ্গ এবং অন্য মন্দিরে হাজার ফণাযুক্ত অনন্ত নাগ। আশ্রমের কাছেই, রাস্তার অপর পাশে ভারতের বর্তমান প্রধান মন্ত্রীর বাসস্থান "আনন্দ-ভবন", কংগ্রেস-সৌধ "স্বরাজ ভবন" ও "কমলা নেহরু হাসপাতাল"। সহরের মধ্যে ইউনিভারসিটী, সায়েন্স কলেজ, মিউজিয়াম ও এক প্রান্তে সুন্দর সাজান ফুলের বাগান "খুসরুবাগ" দর্শন যোগ্য। ৫২ শক্তিপীঠের মধ্যে এক পীঠ, ললিতাদেবীর মন্দির এবং ভব ভৈরবের মন্দিরও দর্শনের স্থান। এখানে সতীর হাতের আঙুল পড়েছিল। অক্ষয়বটের কাছেও ললিতাদেবী ও ভৈরব ললিতেশ্বরের মন্দির আছে। প্রকৃত পীঠস্থান হোল প্রথম ললিতাদেবী বা অলোপীদেবী।

গঙ্গার অপর পারে ঝুসী নামে একটি ছোট সহর আছে; ইহাই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানপুর, পুরূরবার রাজধানী। এখানেও অনেক সাধু সন্ন্যাসীদের আশ্রম ও মঠ আছে। ঠিক ত্রিবেণী সঙ্গমের সামনে গঙ্গার ওপারে একটি পুরাতন দুর্গ, উচ্চ টিলার মত দেখতে পাওয়া যায়। ওর উপরে সমুদ্রকূপ নামে একটি পবিত্র কূয়ো আছে। ওখান থেকে কিছুদূর

উত্তরে পুরাতন ও নূতন ঝুসী সহরের মাঝে হংসকূপ ও তার কাছেই হংসতীর্থ নামে মন্দির। নূতন ঝুসীতে তেওয়ারীজীর নির্মিত শিবালয়ও দেখবার যোগ্য। এখানেই প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীর আশ্রম; প্রতিদিন ভগবৎ কথা ও কীর্তন হয়। গঙ্গার তীরে এখান থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে ককরা গ্রামে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম। শ্রাবণ মাসে এখানে মেলা হয়। ঝুসী থেকে ছোট লাইনে বেনারসের দিকে রামনাথপুর ষ্টেশন। এখান থেকে ককরা গ্রাম তিন মাইল। যমুনার অপর পারে অরৈল গ্রামে বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের মহাপ্রভুর মন্দির ও বৈঠক আছে।

প্রয়াগের স্নান ও দর্শনাদি সমাধা করে, তীর্থরাজ ও তীর্থ দেবদেবীদিগকে ভক্তিভরে করযোড়ে প্রণাম করে রাত্রের গাড়ীতে চিত্রকূট দর্শনে রওনা হলাম।

৩

চিত্রকূট: এলাহাবাদ থেকে চেউকী হয়ে কাটনী যেতে মাঝে মাণিকপুর জংশন পাওয়া যায়। এই মাণিকপুর থেকে ঝাঁসী পর্যন্ত আবার একটি লাইন গিয়েছে। এই লাইনেই মাণিকপুর থেকে চব্বিশ মাইল দূরে চিত্রকূট ষ্টেশন। ষ্টেশনটি ছোট ও বনজঙ্গলপূর্ণ। এখান থেকে সহর চার মাইল। যাতায়াতের গাড়ী পাওয়া যায় না, রাস্তাও ভাল নয়। এখানে গাড়ী রাখা নিরাপদ নয় ও অন্যান্য অনেক অসুবিধা থাকায়, অপেক্ষাকৃত বড় ষ্টেশন করোন্দীতে আমাদের গাড়ী রাখা হোল। গাড়ী এখানে চারদিন থাকবে। করোন্দী এ অঞ্চলের ব্যবসায়ী সহর। নানাবিধ দ্রব্যের দোকান, খাবারের দোকান ও হাট বাজার আছে। এখানে ভাল ঘি পাওয়া যায়, দামও সস্তা, সেজন্য ঘিয়ের ব্যবসায়ী অনেক আছে। যাত্রীদের থাকবার জন্য এখানে কয়েকটি ভাল ধর্মশালা আছে। চিত্রকূট দর্শনে যাওয়ার জন্য এখান থেকে মোটর বাস পাওয়া যায়, রাস্তাও ভাল। সব রকমের সুবিধা থাকায় অধিকাংশ যাত্রীই করোন্দী থেকে চিত্রকূট দর্শনে যাত্রা করে। এখান থেকে চিত্রকূট সহর প্রায় ছয় মাইল। মোটর বাসে পাঁচ মাইল এসে সীতাপুর নামক স্থানে নামতে হয়। সীতাপুর বেশ বড় গ্রাম। তীর্থ দর্শনের যাত্রী নিয়ে বহু জায়গা থেকে অনেক মোটর-বাস, ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতি যানবাহনের যাতায়াত থাকায় এখানের বাজার বেশ বড় আর নানারকম জিনিষে পরিপূর্ণ। এখানে অনেক রকম কাঠের খেলনা তৈরী হয়। বাস-ষ্টেশনের কাছে ও গ্রামের মাঝে তিন চারটি বড় ও ভাল ধর্মশালা আছে। দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে। সীতাপুর গ্রামেরই সংলগ্ন এবং পয়স্বিনী নদীর তীরে চিত্রকূট একটী ছোট সহর। চিত্রকূটের প্রকৃত নাম সীতাপুর। আশপাশের পাহাড়-পর্বতে নানাবিধ ওষধির গাছগাছড়া পাওয়া যায় ব'লে এ ভাগটিকে চিত্রকূট বলে। এই চিত্রকূটের হাঁপানীর ঔষধ ভারতবিখ্যাত।

তেজস্বী, শাস্ত্রজ্ঞ ও সাধন-নিষ্ঠ মুনিদের আশ্রমের জন্য বহু যুগ থেকেই এই পুণ্যভূমি সর্বত্র অতি পবিত্র। একদা এখান শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য ক্রীড়াভূমি ছিল বলে আজও অনেক সাধুসন্ন্যাসী এখানে বাস করেন। শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম স্পর্শে পবিত্র এই চিত্রকূট ক্ষেত্রে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বিধিপূর্বক তপস্যা করেছেন; বীরশিরোমণি রাজা নল দুষ্ট কলির প্রভাবে কৃত অক্ষক্রীড়াদি অশুভ কর্মফলের প্রায়শ্চিত্ত করে পুনঃ নষ্ট রাজ্য ফিরিয়ে পেয়েছেন। এই সব মহাপুরুষদের পবিত্র পদরজ, মুনিঋষিদের তপস্যা ও পুণ্যশ্লোক রাজাদের যাগযজ্ঞাদির প্রভাবে চিত্রকূট সদাই তপস্বীদের পবিত্র তপোভূমি। এখনও আশেপাশে বহু সাধু সন্ন্যাসী অনেক আশ্রমে তপস্যা করেন। পয়স্বিনীর তীরে বহু মঠ, মন্দির ও আশ্রম থেকে দেবপূজার ঘাঁসর ঘণ্টার শব্দ, নানারূপ ভজন

কীর্তনের শব্দ অতি পবিত্র ও মনোহর। নদীতীরে মঞ্চের উপর ও নদীবক্ষে নৌকাতে অনেক ভক্ত সুমধুর ভজন করেন। ভোর হতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত চারদিকেই ভজন কীর্তনের মধুর শব্দ। সদাসর্বদা সকলেরই মুখে "রাম রাম" উচ্চারণ; জলে, স্থলে, পাহাড়-পর্বতে সর্বত্র রাম রাম ধ্বনি, তার প্রতিধ্বনিও "রাম রাম"। এই পরম পবিত্র ধ্বনি সর্বদা শুনতে শুনতে পশুপ্রকৃতি লোকের মনও ধর্মভাবাপন্ন হয়ে ওঠে।* চিত্রকূট বড় পবিত্র ও মনোরম স্থান। ইহার আশপাশে অনেক পাহাড় পর্বত থাকায় এখানের জলবায়ু স্বাস্থ্যের অনুকূল। মহর্ষি বাল্মীকির উপদেশে শ্রীরামচন্দ্র এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রেই বনবাসের সময়ে বার বৎসর বাস করেন। তিনি নিকটস্থ মুনিঋষিদের আশ্রম দেখতে ও তাঁদের উপদেশ শুনতে সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

পয়স্বিনী নদীতে স্নানের জন্য চল্লিশটী বাঁধান ঘাট আছে ও বিভিন্ন ঘাটের বিভিন্ন নামও আছে। তার মধ্যে রাঘবপ্রয়াগ, কৈলাসঘাট, রামঘাট ও ভরতকুণ্যাঘাট প্রধান। রাঘবপ্রয়াগ ঘাটে, পয়স্বিনীর সঙ্গে মন্দাকিনী ধনুকাকারে এসে মিলিত হয়েছে এবং প্রয়াগে ত্রিবেণীসঙ্গমে সরস্বতীর মত, গায়ত্রী বা সাবিত্রী নদী অলক্ষ্যে পয়স্বিনীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সাবিত্রী দেখা যায় না। এ জায়গাকেও ত্রিবেণী বলে। প্রবাদ—শ্রীরামচন্দ্র স্বর্গগত পিতা দশরথের উদ্দেশ্যে এই ঘাটেই তিলাঞ্জলি দিয়েছিলেন এবং সেই সময়েই গায়ত্রী নদী পয়স্বিনী ও মন্দাকিনীর সহিত মিলিত হন। এই ঘাটে পান্নার ধার্মিক রাজা অমানসিংহের নির্মিত শ্রীমত্তগজেন্দ্রেশ্বরের বড় ও সুন্দর মন্দির আছে।

রামঘাটে গোস্বামী তুলসীদাস চন্দন ঘসছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ বালক-বেশে এসে তাঁকে দর্শন দেন ও সেই চন্দন নিয়ে তিলক করেন। তখন মহাবীর হনুমান অলক্ষ্যে থেকে বলেছিলেন, "চিত্রকূট কে ঘাটপর, ভই সন্তন কী ভীর। তুলসীদাস চন্দন ঘিসৈ, তিলক দেত রঘুবীর"। ঘাটের উপরে শ্রীরামমন্দির ও পাশেই গোস্বামীজীর মন্দির। এখানে অনেক রামভক্ত সাধু বাস করেন। নদীতীরেও অনেক ধর্মশালা এবং নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিষের অনেক দোকান আছে।

ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্রের প্রসাদে চিত্রকূটে ও আশপাশের প্রায় প্রত্যেক তীর্থস্থানেই তাঁর বানর-সৈন্যের দৌরাত্ম্য অত্যধিক। পোষা ছাগল ভেড়ার মত ইহারাও দলে দলে অবাধে মানুষের সঙ্গে রাস্তায় বেড়িয়ে বেড়ায় এবং গৃহপালিত কুকুর বিড়ালের মত যখন তখন যার তার ঘরে ঢুকে পড়ে। বাজার কোনও কিছু খাবার জিনিষ নিয়ে যাওয়া মুস্কিল। কপাট বন্ধ করে রান্না করতে ও খেতে হয়। এক কুঠরি থেকে অন্য কুঠরিতে কোনও খাবার জিনিষ নিয়ে যেতে হ'লে, লাঠি হাতে পাহারা দিতে হয়। এখানের অধিবাসীরা বানরের উৎপাত থেকে রক্ষা করবার জন্য নিজেদের ঘরের খোলার ও খড়ের চালা প্রচুর কাঁটা দিয়ে ঢেকে রেখেছে।

চিত্রকূটের আশপাশে কয়েক মাইলের মধ্যে দর্শনীয় যত তীর্থ আছে ও পয়স্বিনী নদীর কোন্ ঘাটে স্নান ক'রে কোন্ দিন কোন্ তীর্থ দর্শনে যাত্রা করতে হয়, চিত্রকূট-মাহাত্ম্যে তার নির্দেশ দেওয়া আছে। যাত্রীদের মধ্যে যাঁরা অধিক দিন থাকতে চান না, এই নির্দেশে তাঁদের পক্ষে সুবিধা হয় না। তাঁরা আপন আপন সুবিধামত অন্যান্য তীর্থসকল দর্শন ক'রে থাকেন। সব তীর্থস্থান দর্শন করতে অন্ততঃ ৭।৮ দিন সময় লাগে।

নির্দেশমত প্রথম দিনে রাঘবপ্রয়াগ-ঘাটে স্নান ক'রে সহরের দেড় মাইল দূরে পবিত্র কামদগিরি দর্শন ও প্রদক্ষিণ করতে হয়। এই কামদগিরির মাহাত্ম্য এখানে বড় বেশী। এখানেই ভরতবাহিনীসমেত শ্রীরামচন্দ্র সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও

হনুমানের সহিত রাজবেশে দর্শন দিয়ে গোস্বামী তুলসীদাসের মনস্কামনা পূর্ণ করেন। বনবাসের সময়ে এই পাহাড়ের গুহায় শ্রীরামচন্দ্র বাস করতেন। গোস্বামী তুলসীদাস এই পবিত্র পাহাড়ের অশেষ মহিমা রামায়ণে কীর্তন করেছেন: "কামদ ভয়ো গিরি রামপ্রসাদা। অবলোকত, অপহরত বিষাদা।" এই পর্বত দর্শন করলে শোক দুঃখ দূর হয় ও মনস্কামনা পূর্ণ হয়। নানাস্থানের বহু লোক এখনও এখানে নানারূপ 'মানত' করে ও সে সকল পূর্ণ হলে, ইহাকে দর্শন ও প্রদক্ষিণ করে। শুনলাম, অনেকে দণ্ডবৎ হয়েও প্রদক্ষিণ করে। এই পাহাড়ের উপরে উঠ্‌তে হয় না। প্রদক্ষিণের জন্য রাস্তাটী তিন মাইল হবে। উহা বাঁধান ও বেশ চওড়া। পান্নার ধার্মিক রাজার ইহা পুণ্যকীর্তি। শুনলাম, সহরে ও পর্বতে সর্বশুদ্ধ ৩৬০টি মন্দির আছে; তার মধ্যে প্রদক্ষিণ পথে মুখারবিন্দ, হনুমানজী, সাক্ষী গোপাল, লছ্‌মীনারায়ণ, শ্রীরামজীর স্থান, তুলসীদাসের স্থান ও চরণ-পাদুকা স্থান—এই কয়টী প্রসিদ্ধ মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। উক্ত মুখারবিন্দ মন্দিরটী শ্রীরামচন্দ্রের বাস করবার গুহার মুখ। পাহাড়ের এরূপও বড় শিলা প্রকৃতির প্রভাবে আপনিই মনুষ্য-মুখাকৃতি হয়েছে। সেজন্য ইহাকে মুখারবিন্দ বলে ও ইহাই কামদগিরির মুখ। চরণ-পাদুকা স্থানে বনবাসের সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত ভরতের, ও সীতাদেবীর সহিত কৌশল্যা প্রভৃতি রাণীদের মিলন হয়। লোকে বলে সে সময়ে সেখানকার পাথরসকল পরমপুরুষের পাদস্পর্শে মাখনের মত নরম হওয়ায় সকলের চরণচিহ্ন পড়েছিল এবং সে সব আজও রয়েছে। কাছেই লক্ষ্মণ পাহাড়, ১৫০টি সিঁড়ি উঠে উপরে লক্ষ্মণের মন্দির। এখানে ব'সে তিনি সীতা ও রামকে রাত্রে পাহারা দিতেন। এই জায়গা তাঁর অতি প্রিয় ছিল। প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে দীপাবলীর দিনে ও চৈত্র মাসে রামনবমীর সময়ে চিত্রকূটে বড় মেলা হয়। সে সময়ে বহু দূর থেকে অনেক লোকের সমাগম হয়। শারদী পূর্ণিমার দিনে এখানে বিনামূল্যে হাঁপানী রোগের ঔষধ বিতরণ হয়, সে সময়েও বহুদূর থেকে অনেক লোক আসে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমা

শ্রীভোলানাথ গুপ্ত

দেখাল যে সকল পথ একই সেই
যদিও নানান নাম, তবু ভেদ নেই
তোমার এই আসা কেবল তারি সহায় হতেই
শ্রীশ্রীমা!

নিজেরে তুমি প্রদীপ করে জেলেছিলে
সবার 'পরে আশীষ-ধারা ঢেলেছিলে,
করুণায় কত রিক্ত-হৃদয় ভরে যে তুলেছিলে
শ্রীশ্রীমা।

ঠেলেছিল যাদের ঘৃণাভরে সবাই
তুমি মা তাদের স্নেহভরে দিলে ঠাঁই।
জীবন দিয়ে শিখালে তুমি, "যেই নয়,
শুধু সে-ই হয় ময়ী, সে-ই শুধু রয়।"
তুমি মাতা সবাকার, কিন্তু
পাতানো মা-তো সে নয়
শ্রীশ্রীমা।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে শ্রীরাধা

শ্রীভারাপদ ভট্টাচার্য, এম.এ., বি.টি., কাব্যতীর্থ

শ্রীমতী রাধার যে রসভাবময়ী সমুজ্জ্বল মূর্তি বৈষ্ণব-সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার উৎস সম্বন্ধে বৈষ্ণবাচার্যগণ বিভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ যে প্রেমময় তুলিকায় বিচিত্র রসের বর্ণরাজিতে শ্রীমতীকে সুচিত্রিত করিয়া উহাকে প্রাণময় করিয়া তুলিয়াছেন তাহার মূল ভিত্তি শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের মধ্যেই নিবদ্ধ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রধান উপজীব্য শ্রীমদ্ভাগবতে "রাধার" প্রত্যক্ষ উল্লেখ নাই। বিষ্ণু-পুরাণ, হরিবংশ বা মহাভারতে এবং পদ্মপুরাণে রাধার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের রাধাতত্ত্ব বিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হয়। বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্রে কেবল বর্ণিত আছে "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পর দেবতা।" চৈতন্যচরিতামৃতে পদ্মপুরাণে লিখিত বলিয়া একটি শ্লোক দৃষ্ট হয়; তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলে রাধা যে শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগিণী ইহা প্রমাণিত হয়। "যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীমতী রাধা শ্রীকৃষ্ণের পরাশক্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু অন্যত্র রাধিকার রূপ কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী – সমাজ ভয় বিচলিতা পরকীয়া গোপরমণী ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁর দশাবতার চরিতে রাধার স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "জাতী মধুকরস্যেব রাধৈবাধিকবল্লভা"। বহু গোপবধূর প্রতি আসক্ত হইলেও ভ্রমরের প্রীতি জাতীপুষ্পের প্রতি যেমন অধিক, রাধাও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা ছিলেন।

প্রেমভক্তির প্রধান আদর্শ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য-গণের চিত্রিত রাধিকার সহিত উপরিউক্ত রাধিকার তুলনা হয় না। বৈষ্ণবকবিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে চণ্ডীদাসের স্থান সর্বোচ্চে। তাই প্রেমিকের নিকট নানুর পল্লী দ্বিতীয় বৃন্দাবনতুল্য। এখানে পাগলচণ্ডীর স্বর্গীয় অকলঙ্ক প্রেমের অপূর্ব স্ফূর্তি ও অলৌকিক প্রতিভার বিকাশ। এখানে প্রেমের নিষ্কাম-মাধুর্য নয়নজলে পূর্ণ শতদলের ন্যায় বিকশিত। চণ্ডীদাসের রাধিকা সর্বত্র শ্যামসুন্দরের রূপ নিরীক্ষণ করিতেছেন। "—সব শ্যামময় হেরি", কেবল নাম শুনিয়াই পাগলিনী :

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সখি তারে॥"

তারপর যমুনার জল আনিবার ছলে বংশীবদন শ্যামসুন্দরের নটবর রূপ দর্শনে কিরূপ অবস্থা দেখুন :

"যমুনা যাইয়া শ্যামেরে হেরিয়া
ঘরে আইলা বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া মোহিত হইয়া
ধেয়ায় শ্যামরূপখানি॥
নিজ করোপর রাখিয়া কপোল
মহাযোগিনীর পারা।
ও দুটী নয়নে বহিছে সঘনে
শ্রাবণ মেঘেরি ধারা॥"

ভালবাসিয়া কত দুঃখ পাইতে হয় তাহা চণ্ডীদাসের রাধা দেখাইয়াছেন। এখানে আছে "স্বার্থের আহুতি, অধিকারের বিলোপ; বাঞ্ছিতের দেহ স্পর্শ করিতে, দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতে, অপূর্ব

পরিমল আঘ্রাণ করিতে, মধুগন্ধে অন্ধ অলির ন্যায় রাধিকা কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুলা"। সীমার বাঁধন টুটিয়া সে অসীমের আহ্বানে সুমধুর বাঁশরীর সুরে নিজেকে মিলাইয়া দিতে চায় অনন্তের সাথে; প্রেমের বিহ্বলতায়, অনুনয় বিনয়ে, কাঠিন্যহীন মধুমাখা ক্রোধে, কতশত দুঃখের নিবেদনে এই রাধিকা যুগযুগান্তরের কালের বিবর্তনের মধ্যেও ভক্ত-হৃদয় আরাধিতা রূপে চিত্রিতা। এই শ্রীমতী রাধা কষ্টের মধ্যেও সুখের সন্ধান পাইয়াছে। তাই চণ্ডীদাসের লেখনীতে দেখিতে পাই: "যথা তথা যাই আমি যতদূর যাই, চাঁদমুখের মধুর হাসে ভিজেক জুড়াই।" অন্যত্র "নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার"। "এহেন বঁধুয়ে মোর যে মন ভাঙ্গায়, হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়"। নলিনী চোল-পরিহিতা বিদ্যাপতির রাধার সঙ্গে চণ্ডীদাসের রাধার তুলনা হয় না। বিদ্যাপতির রাধা নীলবসনে আবৃতা ও মণিময় হারে সুসজ্জিতা হইয়া শ্যাম-অভিসারে চলিয়াছেন:

"নব গোধূলি সময় বেলি ধনি মন্দির বাহর ভেলি
নব জলধর বিজুরি রেহা দ্বন্দ্ব পসারিয় গেলি॥
গোরী কলেবর নুনা জানি কাঞ্চনে উপর সোনা
কেশরী জিনি মাঝ খিনি দুলহ লোচন কোনা।"

নীলবসনাবৃত শ্রীরাধিকার স্বর্ণময় গলে মুক্তাহার শোভা পাইতেছে:

"আওর পেলল কুচযুগ মাঝে
লোহিত মোতিম হারে।
কনক মহেশ কামহু পূজন
জানি সুর নদী ধারে॥

(কুচযুগল মধ্যে দোদুল্যমান মুক্তাহার দর্শন করিয়া মনে হইল যেন গঙ্গাতীরে বসিয়া কনক মহেশ পূজা নিরত।) কি অপূর্ব শুচিতা প্রকাশ পাইয়াছে। অভিসারে গমনোদ্যতা রাধিকা কোন বাধাই মানিতেছেন না। "নব অনুরাগিণী রাধা, কিছু নহি মানয় বাধা। একলি করল পয়াণ, পথ বিপথ নাহি মান।" বর্ষাভিসার বর্ণনায় লিখিয়াছেন—"বাট বিকট ফণিমালা, চৌদিস বরষএ জলধর জালা"। পথে বিষধর সর্প এবং আকাশে মেঘজাল বর্ষণরত, তবুও রাধা চলিয়াছেন: "সখি হে আজ জাএব মোহী ঘর গুরুজন ভয় ন মানব বচন চুকব নোহি।" আজ আমি যাইবই। ঘরে গুরুজনের কথা মানিব না। বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাস গাহিয়াছেন:

"এ সখি রসময় অন্তর যার শ্যামগুনাগর গুণগণ-সাগর কো ধনি বিছরই পার" যাহার অন্তরে প্রেমরস রহিয়াছে সে কি গুণসাগর শ্যামসুন্দরকে বিস্মৃত হইতে পারে? অন্যত্র: "গুরুজন গরজন গৃহপতি তরজন কুলবতি কুবচন ভাষ। যত পরমাদ সবই পুনঃ মেটই মধুর মুরলী আশোয়াস।" আমি গুরুজনের তিরস্কারাদি যত বাধা সকলই ভুলিয়া যাই যখন শ্যামসুন্দরের মধুর মুরলীধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করে।

অন্যত্র:

"কুল মরিয়দ কপাট উদ্‌ঘটনু তাহে কি কাঠকী বাধা
নিজ মরিয়দ সিন্ধু সঞ্চে পওরনু তাহে কি তটিনী
অগাধা"॥

আমি নিজ কুলমর্যাদারূপ কপাট উদ্‌ঘাটন করিয়াছি, সামান্য কাঠের দরজা আমায় বন্ধ রাখিতে পারিবে না। আমি নিজ মর্য্যাদা মহা সমুদ্রের অতল তলে নিমজ্জিত করিয়াছি, সামান্য নদী আমায় অভিসারে বাধা জন্মাইতে পারিবে না।

মানস-সুরধুনীর পরপারে শ্যামসুন্দরের অভিসারে রাই চলিয়াছেন, বর্ষার প্রবল ধারাও তার পথরোধ করিতে অসমর্থ, তাই কবি লিখিয়াছেন:

"মন্দির বাহির কঠিন কপাট, চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট
তাহ অতি দুরতর বাদর দোল বারি কি বারহ পীন নীচোল

ভাবের গভীরতায় বর্ণনার চাতুর্যে ও ভাষার আড়ম্বরে বিদ্যাপতি বৈষ্ণবকবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী কিন্তু চণ্ডীদাসে দেখি ভাষার সরলতা, প্রেমের মাধুর্য ও আত্মত্যাগের অপূর্ব নিদর্শন—তাই রাধিকার

"—বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে যেমন যোগিনী পারা।" প্রেম, পূর্বরাগ ও আধ্যাত্মিকতার চরম আদর্শ এখানে দেখিতে পাই। রাধা যোগিনী বেশে শ্যামসুন্দরের পানে ছুটিয়াছেন :

"যোগিনী হইয়া যাব সেই দেশে যথায় নিঠুর হরি" অন্যত্র :

"বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান।
• • •
পীরিতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমারি পায়।
তুমি মোর গতি তুমি মোর পতি
মন নাহি আন ভায়।
কলঙ্কী বলিয়া জানে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
(বঁধু) তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।"

অন্যত্র দেখিতে পাই :

"কাজ কি গো কুল কাজ কি গোকুল
গোকুলের লোক হোক প্রতিকূল
আমি যে সঁপেছি গো কুল
অকূল কাণ্ডারীর করে।
কাজ কিগো বাস কাজ কি বাসে
কাজ কিগো তার পীতবাসে
সে থাকে যার হৃদয় বাসে
সেকি বাসে বাস করে।

শ্রীরাধিকার এখানে জাগতিক মান মর্যাদার দিকে দৃষ্টি নাই, এমনকি বেশভূষার প্রতিও ভ্রূক্ষেপ নাই ; তাই সদা তার মুখে একই বাণী :

"শ্যামসুন্দর শরণ আমার
শ্যাম শ্যাম সদা সার।"

দীনেশচন্দ্রের ভাষায় :

"এই স্বর্ণপুত্তলি প্রেমিকের নয়নপুত্তলি কোন সুন্দরীর ছবি বলিয়া মনে করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না ; যিনি ধূলিময় ভূমিতে ইতরজাতির মুখেও হরিনাম শ্রবণে অবলুণ্ঠিত এ সেই গৌরহরিই পূর্বাভাষ।" ইহা মানবী প্রেমের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বর্গীয় প্রেমপারাবারের অতলতলে যেন নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া ধন্য হইতে প্রয়াসী।

বৈষ্ণবকবিগণের মধ্যে জয়দেবের স্থান নির্ণয় করা কঠিন। চণ্ডীদাসের রাধিকার প্রেমের সরলতা, বিদ্যাপতিতে ভাবের গভীরতা এবং জয়দেবে প্রেমের চরম উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়, এখানে "জীবাত্মা পরমাত্মায় অভেদ" হইয়া গিয়াছে। এখানে সত্যই রাধা—"Pure-love personified"। কোন স্মরণাতীত কালে উক্ত কবিগণ রাধাকৃষ্ণ লীলা-কীর্তন করিয়া গিয়াছেন কিন্তু আজও তার মোহিনীর বেশ কবি ও ভক্তচিত্ত স্পন্দিত করিতেছে। "দেহি পদপল্লব-মুদারম্"—ইহার মধ্যে নন্দনন্দন গোপীবল্লভ রাধা-কান্তের কোমল করপল্লের আঁচড় লাগিয়াছে কিনা জানি না কিন্তু ভাব ও প্রেম রাজ্যের যে চরমোৎকর্ষ ইহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাই আজও প্রাণ আকুল করিয়া তুলে যখন বৈষ্ণবপদকর্তাদের পদ পাঠ করি, মনে হয় আজও শ্যামসুন্দরের বংশীরব শ্রবণে পূর্বেরই মত 'প্রাণ রাধিকা' 'জমযমুনার তীরে' 'অনন্ত অভিসার'-এর জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন।

বুদ্ধদেবের অন্তিম শিষ্য

(উত্তরাংশ)

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী এম.এ., পুরাণরত্ন, বিদ্যাবিনোদ

৩

ভগবান্ তথাগত পরিব্রাজক সুভদ্রকে বলিতে লাগিলেন,—"হে সুভদ্র! যেই ধর্ম-বিনয়ে (doctrine and discipline) সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি—এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের উপলব্ধি নাই, সেই ধর্ম-বিনয়ে প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পবিত্র শ্রমণজীবন গঠিত হইতে পারে না। ঐ ধর্ম-বিনয় শূন্যগর্ভ ও নিরর্থক। কিন্তু যেই ধর্ম-বিনয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের উপলব্ধি আছে, তাহাতেই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর উন্নত, পবিত্র শ্রমণ জীবন গঠিত হইতে পারে। অতএব হে সুভদ্র। ভিক্ষুগণের ঐরূপ ধর্ম-বিনয়ই লাভ করিয়া সম্যক্রূপে ধর্মজীবন যাপনপূর্বক বিচরণ করা কর্তব্য, তাহা হইলেই এই পৃথিবী কখনও অর্হৎ বিহীন হইবে না। অর্হৎ গুরুদেরাই উপদেশ দানের যথার্থ অধিকারী, তাঁহারাই সত্যধর্মের উপদেশ প্রদান করিতে পারেন।"

একূনতিংসো বয়সা সুভদ্দ
যং পব্বজিং কিংকুসলানুএসী।
বস্সানি পঞ্চাসি সমাধিকানি
যতো অহং পব্বজিতো সুভদ্দ॥
ঞায়স্স ধম্মস্স পদেসবত্তী
ইতো বহিদ্ধা সমণোপি নত্থি॥

(মহাপরিনিব্বাণ সুত্তং, ৫।৬১),

হে সুভদ্র। উনত্রিশ বৎসর বয়সে আমি 'কুশল কি' তাহা অন্বেষণ করিতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলাম। তখন হইতে ৫১ বৎসর যাবৎ সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছি। আমার আচরিত এই ন্যায় ধর্মের বাহিরে থাকিয়া যথার্থ শ্রমণ জীবন গঠিত হইতে পারে না।

আকাসে চ পদং নত্থি, সমণো নত্থি বাহিরে।
পপঞ্চাভিরতা পজা, নিপ্পপঞ্চা তথাগতা॥
আকাসে চ পদং নত্থি, সমণো নত্থি বাহিরে।
সঙ্খারা সস্সতা নত্থি, নত্থি বুদ্ধানমিঞ্জিতং॥

(ধম্মপদ, ২৫৩, ২৫৫)

যেমন আকাশে পথ নাই, সেইরূপ আমার শাসনের বাহিরে লোকে শ্রমণ হইতে পারে না। সাধারণ লোকে তৃষ্ণাদি প্রপঞ্চবশীভূত, কিন্তু তথাগতগণ নিষ্প্রপঞ্চ।

যেমন আকাশে পথ নাই, সেইরূপ আমার শাসনের বাহিরে লোকে শ্রমণ হইতে পারে না। সংস্কার সকল (পঞ্চস্কন্ধ) শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য নহে। বুদ্ধগণ কদাচ বিচলিত হন না।

ধম্মপদের টীকাকার আচার্য বুদ্ধঘোষ "বাহিরো" পদের অর্থ করিয়াছেন—'মম সাসনতো বহিদ্ধা' অর্থাৎ আমার (বুদ্ধের) শাসনের বাহিরে।

ভগবান্ তথাগতের উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরিব্রাজক সুভদ্র নূতন আলোক ও নবজীবনের সন্ধান পাইলেন। পরম আনন্দ ও উল্লাস সহকারে বুদ্ধদেবকে অভিনন্দিত করিয়া বলিতে লাগিলেন:

"অভিক্কন্তং ভন্তে, অভিক্কন্তং ভন্তে। সেয্যথাপি-ভন্তে নিক্কুজ্জিতং বা উক্কুজ্জেয্য, পটিচ্ছন্নং বা বিবরেয্য, মূল্হস্স বা মগ্গং আচিক্খেয্য, অন্ধকারে বা তেলপজ্জোতং ধারেয্য চক্খুমন্তো রূপানি দক্খন্তীতি, এবমেব ভগবতা অনেক পরিয়া যেন ধম্মো পকাসিতো।"

বড়ই সুন্দর প্রভু, বড়ই মনোরম! আপনি যেন অধোমুখ পাত্রকে উর্ধ্বমুখ করিয়া দিলেন, অথবা যেন পথভ্রষ্টকে গন্তব্য পথ প্রদর্শন করিলেন, কিংবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করিলে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি যেমন যাবতীয় রূপ দর্শন করিয়া থাকে, এইরূপেই ভগবান্ অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিলেন।

তৎপর পরিব্রাজক সুভদ্র ত্রিশরণ গ্রহণ করিয়া বুদ্ধদেবের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রার্থনা করিলেন :

"এসাহং ভন্তে ভগবন্তং সরণং গচ্ছামি, ধম্মঞ্চ ভিক্খু সঙ্ঘঞ্চ। লভেয্যাহং ভন্তে ভগবতো সন্তিকে পব্বজ্জং, লভেয্য উপসম্পদন্তি।"

এই আমি ভগবান্ বুদ্ধ, ধর্ম ও ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদ লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছি।

৪

পরিব্রাজক সুভদ্রের প্রার্থনার উত্তরে বুদ্ধদেব বলিলেন,—"হে সুভদ্র! অপর ধর্মসম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি যদি এই ধর্ম-বিনয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাকে চারিমাসকাল ভিক্ষু-সঙ্ঘে 'পরিবাস' করিতে হয়। এই চারিমাস কাল তাহাকে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। উক্ত সময় মধ্যে সে যদি তাহার চরিত্র ও আচরণ দ্বারা ভিক্ষু-সঙ্ঘকে সন্তুষ্ট করিতে পারে তাহা হইলেই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভের যোগ্য বিবেচিত হয়। "অপিচ মেত্থ পুগ্গল বেমত্ততা বিদিতাতি।" যদিও সাধারণ ক্ষেত্রে ঐ নিয়মই প্রচলিত তথাপি অধিকারী বিশেষের পক্ষে যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে, তাহা আমি বিদিত আছি।"

বুদ্ধদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুভদ্র উত্তর করিলেন : "চারিমাস কেন প্রভু, আমি চারি বৎসর-কালও পরিবাস করিতে প্রস্তুত আছি। চারি বৎসর-কাল অন্তে যদি ভিক্ষুসঙ্ঘ আমাকে উপযুক্ত মনে করেন, তখনই যেন আমাকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করা হয়।"

পরিব্রাজক সুভদ্রের প্রশান্ত ধৈর্যে পরম প্রসন্নতা লাভ করিয়া তাঁহাকে অতি উত্তম অধিকারী বিবেচনা করতঃ বুদ্ধদেব আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন :

"তেনহানন্দ সুভদ্দং পব্বাজেপাতি।"

তাহা হইলে আনন্দ, তোমরা সুভদ্রকে এখনই প্রব্রজ্যা দান করিতে পার। "সাধু ভন্তে" বলিয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবানের আদেশে সম্মতি প্রদান করিলেন।

পরিব্রাজক সুভদ্র আনন্দকে কহিলেন,—"বন্ধু আনন্দ, আপনাদের মহালাভ, মহাসৌভাগ্য যে, আপনারা এতাদৃশ শাস্তার সহিত বাস করিতেছেন এবং তৎকর্তৃকই অন্তেবাসী রূপে অভিষিক্ত হইয়াছেন।"

আয়ুষ্মান্ আনন্দ সুভদ্রকে কহিলেন : "ভ্রাতঃ সুভদ্র, তুমিও তো আজ ভগবান্ তথাগতের অন্তিম দর্শন লাভ করিয়া তাঁহারই সমক্ষে অভিষিক্ত হইতে যাইতেছ, ইহা কি সামান্য সৌভাগ্যের কথা?"

অনন্তর আয়ুষ্মান্ আনন্দ পরিব্রাজক সুভদ্রকে এক পার্শ্বে নিয়া মস্তক ধৌত করাইয়া কেশ শ্মশ্রু মুণ্ডন করাইলেন এবং কাষায় বস্ত্র পরিধান করাইয়া ত্রিশরণ প্রদান করতঃ ভগবান্ তথাগতের নিকট উপস্থিত করিলেন। পরিব্রাজক সুভদ্র ভগবানের সন্নিকটে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন।

উপসম্পদা লাভ করিয়া আয়ুষ্মান্ সুভদ্র একাকী নির্জনে অপ্রমত্ত ভাবে উৎসাহ সহকারে নির্বাণগত চিত্তে বিচরণ করতঃ অচিরেই অর্হত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

"খীণাজাতি, বুসিতং ব্রহ্মচরিয়ং, কতং করণীয়ং, নাপরং ইত্থত্তায়াতি অব্ভঞ্ঞাসি।"

তাঁহার পুনর্জন্ম হয় হইল, ব্রহ্মচর্য আচরণ সুসিদ্ধ হইল, সমুদয়কর্তব্য শেষ হইল, এখন পুনঃ এই পঞ্চস্কন্ধ হইতে অন্য পঞ্চ স্কন্ধ-সন্তান নাই, ইহা তিনি অভিজ্ঞাত হইলেন।

"অঞ্ঞতরো খো পনায়স্মা সুভদ্দো অরহতং অহোসি। সো ভগবতো পচ্ছিমো সক্খিসাবকো অহোসীতি।"

আয়ুষ্মান্ সুভদ্র ভগবান্ তথাগতের শ্রাবক অর্হৎগণের মধ্যে অন্যতম অর্হৎ হইলেন। তিনিই ভগবানের শেষ সাক্ষাৎ শ্রাবক হইলেন।

কামরূপ

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

আধুনিক আসামের পূর্বনাম কামরূপ। রাজা ভগদত্তের রাজত্বকালে মহাভারতীয় যুগে কামরূপ আখ্যা উক্ত দেশ প্রাপ্ত হয়। যোগিনীতন্ত্রে আছে, কামরূপঃ ইতি খ্যাতঃ সর্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতঃ। ইহার অর্থ, সর্বশাস্ত্রে উক্ত দেশ কামরূপ নামে খ্যাত। রায়বাহাদুর কে. এল. বড়ুয়া তৎপ্রণীত "কামরূপের প্রাচীন ইতিহাস" নামক ইংরাজি পুস্তকে কামরূপের প্রাচীন সীমানা পর্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

কামরূপ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণে এই আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। একদা কামদেব ধ্যানমগ্ন মহাদেবকে পুষ্পবাণ নিক্ষেপপূর্বক ধ্যানচ্যুত করেন। ইহাতে মহাদেবের তৃতীয় নয়ন হইতে যে ক্রোধাগ্নি বিনির্গত হয়, তদ্দ্বারা কামদেব ভস্মীভূত হন। কামপত্নী রতি দেবী ইহাতে মুহ্যমানা হইয়া মহাদেবকে কাতর প্রার্থনা দ্বারা প্রসন্ন করেন এবং শিব-কৃপায় কামদেব পূর্বদেহ প্রাপ্ত হন। উক্ত ঘটনা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে সংঘটিত হয়। ইহার পর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর কামরূপ নামে অভিহিত হয়। সুতরাং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরই কামরূপের আদি নাম। মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত পুরাণ, কালিকা পুরাণ প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর উল্লিখিত। প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের রাজধানী ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। বর্তমান গৌহাটি নগরের চতুঃসীমার মধ্যেই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অবস্থিত ছিল। ইংরাজ ঐতিহাসিক গেইট্ সাহেব তৎপ্রণীত "আসামের ইতিহাস" পুস্তকে বলেন, "প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ছিল পূর্বভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার কেন্দ্র স্থল"। কালিকাপুরাণে আছে, "ব্রহ্মা প্রথমে উক্ত দেশে নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করেন বলিয়া ঐ নগর তন্ত্রমতে কথিত হয় এবং উহা ইন্দ্রপুরী সমতুল্য। এই প্রবাদের মূলে কিঞ্চিৎ সত্যতা আছে বলিয়া মনে হয়; কারণ বর্তমান গৌহাটি নগরের পূর্ব অংশে চিত্রাচল পর্বতের শিখরদেশে সুপ্রাচীন নবগ্রহ মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান।

রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে আছে, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর রত্নময় নগর। মহাভারতের দ্রোণ পর্বে আছে, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা কোন যুদ্ধে মহাগজ প্রেরণ করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বর্তমান বাংলা ও আসাম ও নেপালের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত।

কামরূপের প্রথম শাসক ছিলেন নরকাসুর। ভগবান বিষ্ণুর বরাহ অবতারে নরকাসুর পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হন। তিনি কামাখ্যা দেবীর অনুরক্ত মহাভক্ত ছিলেন। কামরূপের কেন্দ্রস্থলে

কামাখ্যা পর্বতে কামাখ্যা দেবীর প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। উহা ভারত-বিখ্যাত শক্তি-পীঠ এবং ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে বিরাজিত। কামাখ্যা দেবীর আরাধনা করিয়া তিনি অলৌকিক শক্তি লাভ করেন; কিন্তু নরকাসুর ঐ সকল দৈবী সিদ্ধির অপব্যবহার আরম্ভ করিলে দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ মাতা হইয়া দেবী কামাখ্যার সম্মান রক্ষার্থ এই স্বেচ্ছাচারী মহাসুর নিধন করেন।

নরকাসুরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ভগদত্ত পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধীশ্বর হন। তাঁহার ভগিনী ভানুমতীকে ধার্তরাষ্ট্র দুর্যোধন বিবাহ করেন। যোদ্ধারূপে তিনি ইন্দ্র অপেক্ষা সৌর্যে ন্যূন ছিলেন না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্যোধনের সহযোগীরূপে তিনি প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। তিনি যখন নারায়ণী অস্ত্র নিক্ষেপ করেন তখন পাণ্ডব পক্ষের রথীবৃন্দ রথ হইতে নামিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু ভীম তদ্রূপ করিতে অসম্মত হওয়ায় সারথি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে রথ হইতে টানিয়া নামাইলেন। কারণ যিনি রথ হইতে নামিবেন না বা অস্ত্র ত্যাগ করিবেন না তিনি নারায়ণী অস্ত্রে নিশ্চয়ই নিহত হইবেন। অর্জুনের সহিত যুদ্ধে ভগদত্ত এক বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করেন। পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিলে উক্ত অস্ত্রদ্বারা অর্জুন অচিরে নিহত হইবেন; কিন্তু পৃষ্ঠপ্রদর্শন বীরের পক্ষে অপমানজনক ভাবিয়া অর্জুন ইহাতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় সখা অর্জুনের প্রাণরক্ষার্থ তাঁহাকে আড়াল করিয়া বুক পাতিয়া উক্ত অস্ত্র স্বীয় দেহে গ্রহণ করিলেন। অবশেষে ভগদত্ত অর্জুন কর্তৃক নিহত হন।

ভগদত্তের পরে নরকাসুরের প্রিয় বন্ধু বাণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা হন। রাজা বাণ মহাভৈরব মন্দিরে শিবারাধনা করিতেন। তাঁহার দুহিতা উষা দেবী শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের সহিত পরিণীতা হন। রাজা বাণের বন্ধু ভীমও কিয়ৎকাল উক্ত রাজ্যের অধিপতি হন। তিনি তাম্রেশ্বরী মন্দিরে চণ্ডিকাদেবীর আরাধনা করিতেন। তাঁহার কন্যা রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেন।

কামরূপ রাজ্যের রাজাগণ ভারত-প্রসিদ্ধ ছিলেন। উল্লিখিত রাজাগণের পরে শ্রীহর্ষ রাজা হইয়া উড়িষ্যা পর্যন্ত কামরূপ রাজ্যের সীমা বিস্তার করেন। তৎপরে ভাস্করবর্মা কামরূপের রাজা হন। উত্তর ভারতে শিলাদিত্য কর্তৃক আহূত নিখিল ভারত সমাজ ও ধর্ম সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্ সাঙ উক্ত ঐতিহাসিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ভাস্করবর্মার সহিত হিউয়েন্ সাঙ পরিচিত হওয়ায় তিনি কামরূপে গমন করেন এবং ভাস্করবর্মার রাজ্য সম্বন্ধে মূল্যবান বিবরণ লিখিয়া যান।

রাজা ভাস্করবর্মার পরে শিতারী, পাউল, বারহু'ইয়া, খেন, কলিতা, কাচারি, চুতিয়া প্রভৃতি রাজবংশ কামরূপ রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে রাজত্ব করেন। শিতারী ও খেন রাজবংশের পতনের পরে কামরূপ রাজ্যের রাজন্যবর্গের মধ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হয় এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রাধান্য ঘোষণা করেন। এই সুযোগে কোচ বংশের বীর হাজো কামরূপের পশ্চিমাংশের রাজা হন। তৎপরে পরাক্রমশালী কোচরাজ বিশ্বসিংহ কামরূপের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি কামরূপের রাজধানী কুচবিহারে স্থাপনপূর্বক তথায় পঁচিশ বৎসরাধিক রাজত্ব করিয়া ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি মল্লদেব ও শুক্লধ্বজ নামক দুই পুত্র রাখিয়া যান। মল্লদেব নরনারায়ণ নাম গ্রহণপূর্বক পিতৃদত্ত সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, তখন তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজ চিলা রায় নামে দেওয়ান পদপ্রাপ্ত হন।

ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে উত্তর বর্মার ভাই রাজবংশের আহোমগণ কামরূপের পূর্বাংশ অধিকার

করেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে কামরূপ আহোম রাজ্য নামে কথিত হয়। প্রথম আহোম রাজা চুকফা ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে আহোম রাজ্যের রাজা হন। এই আহোম শব্দই আসাম শব্দে কালক্রমে পরিণত হয়। সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতক হইতে কামরূপ আসাম নামে বিদিত হইয়াছে।

কোচরাজ নরনারায়ণ যখনসময়ে শক্তিশালী হইয়া ১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আহোম রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করেন এবং আহোম রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিয়া ভ্রাতা চিলা রায় সেনানের সহিত সমস্ত বিরোধ মিটাইয়া ফেলেন। সুপ্রাচীন কামাখ্যা মন্দির ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুধর্মের মহাশত্রু কালাপাহাড় কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়। কোচরাজ নরনারায়ণ কর্তৃক উক্ত মন্দির পুনরায় নির্মিত হয়। রাজা নরনারায়ণের দরবারে যে সকল পণ্ডিত ও বিদ্বান থাকিতেন তন্মধ্যে শংকরদেব অগ্রগণ্য। শংকরদেব ছিলেন আসামের বৈষ্ণব সংস্কারক ও ধর্মগুরু। তৎকর্তৃক প্রচারিত মতবাদের নাম 'এক শরণ ভাগবতী ধর্ম।' শংকরদেবের সঙ্গীত, স্তোত্র ও উপদেশ আসাম প্রদেশের সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হয়। আসামের সামাজিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে শংকরদেবের প্রভাব অদ্যাপি অপ্রতিহত। শংকরদেব কৃষ্ণভক্ত ছিলেন এবং মন্দিরে কৃষ্ণমূর্তির কৃষ্ণের বাণীরূপ ভাগবত গ্রন্থপূজা প্রবর্তন করেন।

রাজা নরনারায়ণের দরবারে সাংস্কৃতিক অনুশীলন হইত। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পঞ্চরত্নের ন্যায় রাজা নরনারায়ণের দরবার বহু রত্নে ভূষিত ছিল। ব্রাহ্মণ পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য, সর্বানন্দ ভট্টাচার্য, মাধব দেব, বকুল, রাম সরস্বতী, শ্রীধর ও শংকরদেব প্রভৃতি পণ্ডিতগণ রাজসভায় সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী ছিলেন। পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ রুক্মাবলী ব্যাকরণ রচনা করেন। রাম সরস্বতী মহাভারত, রামায়ণ ও অষ্টাদশ মহাপুরাণ অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করেন। শংকরদেব কর্তৃক সমগ্র ভাগবৎ অসমীয়া পদ্যে অনূদিত হয়। শ্রীধর পণ্ডিত জ্যোতিষশাস্ত্রের পন্থানুবাদ করেন। রাজা নরনারায়ণ বাল্যকালে কাশীধামে থাকিয়া সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং অসমীয়া ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুবাদ করিয়া মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করেন। তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য সংসদের মূল কেন্দ্র ছিল কুচবিহার। এই সাহিত্য-সংসদ রাজদরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। বিদ্যানুরাগী নরনারায়ণের প্রচেষ্টায় আসামের সাহিত্য সমৃদ্ধ ও সংস্কৃতি সুপুষ্ট হয়। পূর্বোক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন শংকরদেব। শংকরদেব প্রায় শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন এবং মধ্যযুগে আসাম প্রদেশে ভক্তিধর্মের প্রচার করেন।

রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে ইংরাজ পর্যটক র‍্যালফ্ ফিচ্ কামরূপে উপস্থিত হন এবং উহার সাংস্কৃতিক রাজধানী কুচবিহার পরিদর্শন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, "কামরূপের রাজা ও প্রজাবৃন্দ সকলেই হিন্দু। এই সময় রাজা নরনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় নব্য বৈষ্ণব ধর্ম এত ব্যাপকভাবে শংকরদেব কর্তৃক প্রচারিত হয় যে, জনসাধারণ প্রাণীহত্যায় পরাঙ্মুখ হইয়াছে।" সম্ভবতঃ ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে আসাম ভ্রমণকালে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, শংকরদেবের ভক্তিধর্ম উক্ত প্রদেশে কী গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

জীবে প্রেম

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার দেব

এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা একজন বড় শিল্পী, তাঁহার শিল্পনৈপুণ্য বুঝা বড় শক্ত। চিত্রকর যেমন তুলি দিয়ে রং-এর সমাহারে ছবি আঁকে, ফুলে তুলে তাকে প্রাণবন্ত—ঠিক তেমনই এই বিশ্বশিল্পী করেন এই জগতের সৃষ্টি নানা রকম প্রাণীর সমাহারে। চিত্রকরের চিত্রে ফুটে উঠে শিল্পীমনের ভাবধারা আর বিশ্বশিল্পীর এই জগৎরূপ শিল্পে লুকিয়ে আছে তাহার ভাবের রহস্য। এই রহস্য উদ্ঘাটনের ভার দিয়েছেন তাঁহারই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে। মানুষকেই করতে হয় তাহার সৃষ্টি-রহস্য মন্থন। মহাভারতে দেখা যায় অমৃতের সন্ধান করতে গিয়ে দেবতা ও দানবরা করেছেন সমুদ্র-মন্থন—তাতে এসেছিল অনেক বাধা, অনেক বিপত্তি, করতে হয়েছিল অনেক কষ্টস্বীকার, আর যখন মন্থনরজ্জু বাসুকী যাতনায় বিষোদ্গীরণ করেছিল তখন হয়েছিল জীবন সংশয়। কিন্তু ক্ষান্ত হয়নি ওরা, মহাদেব সেই বিষপান করে রক্ষা করলেন বিপদের হাত থেকে—হলেন নীলকণ্ঠ আর সার্থক হলো তাদের সমুদ্র-মন্থন, জেগে উঠল অমৃতের ভাণ্ডার।

স্মরণাতীত কাল থেকে ঠিক তেমনই ভাবে মানুষ লেগেছে এই সৃষ্টিরহস্য মন্থনে—তাতে এসেছে অনেক বাধা, অনেক বিপত্তি—কিন্তু মানুষ তাতে ক্ষান্ত হয়নি—চালিয়ে চলেছে তাদের সাধনা, সাধনার অভিষে তাদের পৌঁছতেই হবে। এখন প্রশ্ন উঠে—সবাই কি একই পথ ধরে সাধনার পথে এগিয়ে চলেছে? আমরা দেখতে পাই—চিত্র আঁকে চিত্রকর আর বিচার করে তার অন্য লোক—শিল্পী তখন তাহার শিল্পের ধারও ধারে না। নানা লোক নানা ভাবে ব্যাখ্যা করে যায় আপন আপন বিচার-বুদ্ধি দিয়ে আর প্রত্যেকেই ভাবছে বুঝি তাহাই বিচার সত্য, ঠিক তেমনই মানুষ এই সৃষ্টির মধ্যে থেকে তাদের নিজ নিজ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে চেষ্টা করছে এই সৃষ্টিরহস্য-উদ্ধারের আর জানতে চেয়েছে সেই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে।

এখন দেখতে হবে এভাবে দিনের পর দিন লোক সাধনা করে কতটুকু কৃতকার্য হয়েছে বা হতে পারে। এই বিচার করতে হলে আমাদিগকে দেখতে হবে আজ পর্যন্ত যত মহাপুরুষ এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের জীবনে সাধনার প্রভাব কতখানি ছিল আর তাঁরা কতটুকু কৃতকার্য হয়েছেন। তাঁদের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় সাধনার পথে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নিয়েছেন গুরুর আশ্রয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এই রকমের সাধকদের অন্যতম। তাঁদের মানবীয় জীবন উৎসর্গ করেছেন সাধনায়, যার ফলে আজ আমরা ভারতবাসী হয়ে গৌরব অনুভব করি। তাঁদের সাধনার মূলমন্ত্র ছিল—'জীবে প্রেম আর গুরু ভক্তি'। স্বামিজী তাঁর সাধনপথে একা এগুতে পারেন নি—তিনি যখন ঈশ্বরকে জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন অথচ পথের সন্ধান পাচ্ছেন না, তখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন গুরুরূপে পথপ্রদর্শক হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। স্বামিজী তাঁকে সহজে মেনে নিতে চাননি—দিনের পর দিন চলল, যাচিয়ে দেখার পালা—শেষে যখন তাঁরই মধ্যে খুঁজে পেলেন অমৃতের সন্ধান, লুটিয়ে পড়লেন তাঁর চরণে, শান্ত হলো তাঁর বিক্ষুব্ধ মন। গুরুর চরণে আত্মসমর্পণ করে সাধনার নিবিড়তম প্রদেশে পৌঁছতে লাগলেন।

স্বামিজীর কার্যাবলী আলোচনা করলে দেখা

যায় তিনি শুধু ঈশ্বরকে জেনেই শান্ত হতে পারেন নি, তিনি চেয়েছিলেন এই জগতের প্রত্যেকটী জীবের মধ্যে দেখতে পাবেন ঈশ্বরকে, আর তখনই হবে প্রকৃত ভগবানের সাধনা। শিবজ্ঞানে জীবসেবাই হবে মানুষের একমাত্র ধর্ম। এই 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-কেই প্রকৃত ধর্ম বলে প্রচার করে গিয়েছেন স্বামিজী তার আজীবন। কিন্তু তিনি এই ভারতবর্ষে দেখতে পেলেন কি? দেখতে পেলেন মানুষ মানুষকে করছে ঘৃণা, মানুষ করেছে মানুষকে মনুষ্যত্বের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। তাই পারে না ভাইকে ভাই বলে গ্রহণ করতে, একই পরম পিতার সন্তান হয়ে একে করছে অন্যকে হিংসা। যখন ভারতবাসীর এই অবস্থা তখন স্বামিজী ভারতবাসীকে শুনিয়েছিলেন—"হে ভারতবাসী, ভারতবাসী তোমার ভাই। চণ্ডাল ভারতবাসী, মুচি ভারতবাসী, ধনী দরিদ্র ভারতবাসী সবাই আমরা ভাই—সবাই আমরা এরই সেই পরম পিতার সন্তান। সকলের উপরই তাঁর আশীর্বাদ সমানভাবে বর্ষিত হচ্ছে।" স্বামিজী শুনতে পেলেন এই যুগেজনে ঐশ্বর্যশালী ভারতের নগরে নগরে, গ্রামেগ্রামে, ঘরেঘরে মানুষের কাতর ক্রন্দন। মানুষের পেটে ভাত নেই, পিঠে কাপড় নেই আর তারই মধ্যে ছড়িয়ে আছে উচ্চনীচ মহামারীর বীজ, যার কবলে পড়ে এই ঐশ্বর্যশালিনী ভারতমাতা শীর্ণ শরীরে, জীর্ণ বস্ত্রে দণ্ডায়মান। মোটা কাপড় আর মোটা ভাতের জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীকে চেয়ে থাকতে হচ্ছে বিদেশীর দিকে, করতে হচ্ছে দয়া যাচ্ঞা। যে ভারত ছিল একদিন অন্নপূর্ণার দেশ—আজ সেই অন্নপূর্ণার দেশে চলেছে খালি পেটে ধর্মের নামে আত্মহত্যা—তাই হয়ত কবি মার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, "অন্ন যে অন্ন দেগো অন্নদা" বলে। যখন শুধু ভাতের জন্য ঘরে ঘরে ক্রন্দন উঠেছে অথচ ধর্মের রেষারেষিতে জাতি ছিন্নমাথ তখন স্বামিজী বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন, "রেখে দে তোর ধর্মকর্ম, ধর্মকর্ম গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আগে পেটের ভাত ও পিঠের কাপড় যোগাড় কর—তখন ধর্ম আপনা হতেই আসবে, খালি পেটে ধর্ম হয় না।"

বাস্তবিকই আজও আমরা ধর্মের দোহাই দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছি অধর্মের বন্যা, ছুঁৎমার্গরূপ মহামারীর বীজ এখনও ছড়িয়ে আছে চারিদিকে আর তারই কবলে পড়ে দেশ চলেছে ধ্বংসের পথে। আজ অন্ধ সমাজের আইন-কানুনকে ধরা হয়েছে ধর্মের বিশেষ অঙ্গ; আর সমাজপতিরা হয়ে বসেছেন ধর্মের ফলদাতা। সমাজে আছে শুধু স্বার্থপরতার বিষ আর সেই বিষে জলে পুড়ে মরছে নিরীহ হতভাগ্যদের দল; নেই তার বিচার, নেই তার প্রতিকার—ঈশ্বরের বিধান দিচ্ছেন সমাজপতিরা।

এই যখন দেশের রূপ তখন আমরা কেমন করে আশা করতে পারি দেশের উন্নতি আর মানব জাতির কল্যাণ। যেখানে নিজের কল্যাণের জন্য নিজের চেষ্টা নাই—সেখানে ধর্মও নাই—আর হতভাগা মানবজাতি সেখানে সেই পরম পিতার করুণা দৃষ্টি পায় না। ধর্মের নামে অধর্মের বোঝা বাড়িয়ে ঈশ্বর-সেবা হয় না। ঈশ্বর-সেবা করতে হলে করতে হবে তাঁর সৃষ্টির সেবা, আর সেই জীবের সেবাতেই হন ঈশ্বর সন্তুষ্ট।

আজ এই অগণিত মনুষ্য জাতির আছে নানা মত আর নানা ধর্ম। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মতানুযায়ী করছে ঈশ্বরের সেবা। রামকৃষ্ণদেবও বলে গিয়েছেন —"যত মত তত পথ।" যত মতই হউক না কেন, যদি উদ্দেশ্য হয় সেই পরম পুরুষের সেবা তবে সেই সেবা তাঁর পাদপদ্মে পৌঁছাবার তত পথও বের হবে, যেমন জলের গতি সাত সমুদ্রের দিকে। নালা, খাল, বিল, নদী আঁকাবাঁকা যত রাস্তাতেই যাক না কেন, সমুদ্রে গিয়ে ঠিক পড়বেই। ঈশ্বরের সেবাতেও আছে ভিন্ন ভিন্ন মত আর ভিন্ন ভিন্ন পথ। তিনি সর্বত্র বিরাজিত অন্তর্যামী। তাঁকে যে যেমন ভাবে ডাকে ঠিক তেমনি ভাবে পায়। তিনি সাকার

আবার তিনি নিরাকার। তিনি প্রত্যেক জীবে সমাসীন। জীব ব্যতিরেকে তাঁকে ভাবা যায় না, যেখায় জীব নাই সেখায় তাঁর অস্তিত্বও নাই। আজ ধর্মের এই সংকট মুহূর্তে মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" তাঁর এই বাণীতে যে আছে শুধু সেই বিশ্বশিল্পী ঈশ্বরের সেবা তা নয়, তাতে আছে তাঁর এই সৃষ্টির রহস্য ভেদের মূলমন্ত্র—"জীবে প্রেম"।

আজ যদি সমগ্র মানব জাতি স্বামিজীর বাণীকে জীবনের পাথেয় রূপে গ্রহণ করতে পারে তবে তার মধ্যে গড়ে উঠবে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধন, জীবনে হবে নব অরুণোদয়। নব অরুণের আলোকে মুছে যাবে পশ্চাতের কলংক রেখা, আসবে চিরশান্তি আর মাটির পৃথিবী পরিণত হবে স্বর্গরাজ্যে।

ধর্মের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীঅবনীনাথ রায়

মানুষের সমাজে ভগবানের কথা নিয়ে বহু তর্ক আছে। কেউ বলেন তিনি আছেন। কেউ বলেন তিনি নেই—আবার কেউ বলেন তিনি আছেন কি নেই, এর কিছুই আমি জানিনে।

এর থেকে একটা জিনিষ বেশ বোঝা যায়—সে হ'ল মানুষের অহঙ্কার। মানুষ মনে করে সে যেন 'আছেন' বল্লেই ভগবান থাকেন, 'নেই' বল্লেই ভগবান নস্যাৎ হয়ে যান—অর্থাৎ তার (মানুষের) মর্জির কিংবা ইচ্ছার কিংবা অপরিণত বুদ্ধির উপর যেন ভগবানের থাকা না থাকা নির্ভর করে।

প্রকৃত ব্যাপার জানলে কিন্তু সে বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে যেত। সে ঘটনাটা হল এই যে, ভগবান আছেন বলেই সে নিজে আছে। ভগবান না থাকলে সে নিজেও থাকতো না। যে বুদ্ধির দ্বারা, যে শক্তির দ্বারা ও যে বাক্যের দ্বারা সে উচ্চারণ করছে: ভগবান আছেন কিংবা নেই—সেই বুদ্ধি, সেই শক্তি, সেই বাক্য তাকে কে দিয়েছে? সে বল্‌বে—কে দিয়েছে তা সে জানে না; সে জানে যে সে কারো কাছ থেকে পেয়েছে। কিন্তু এই জানার জন্য সে কি কোনদিন চেষ্টা করেছে? অপরপক্ষে যাঁরা চেষ্টা করেছেন তাঁরা জেনেছেন যে ভগবানই এই শক্তি, এই বুদ্ধি, এই বাক্য দেওয়ার একমাত্র দাতা। অপর কোন দ্বিতীয় দাতা নেই।

কথাটা তবু পরিষ্কার হল না। আমরা ছোট বেলায় পাঠ্যপুস্তকে পড়েছিলাম যে, ভগবান জগৎসৃষ্টি করেছেন। কথাটা কিন্তু আসলে তা নয়। প্রকৃত কথা হ'ল ভগবান জগৎ আকারে সৃষ্ট হয়েছেন। কারণ তিনিই একমাত্র বস্তু; আর তদ্বিতীয় কোন বস্তু নেই যার থেকে তিনি সৃষ্টি করতে পারতেন। গুটিপোকার মুখের সূতাতন্তুর মত তিনিই আধার—তিনিই আধেয়। সুতরাং নিজেকেই তিনি নিজে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আরো আশ্চর্যের বিষয় হ'ল এই যে, এই সৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি যেমন ছিলেন তেমনি আছেন—তাঁর কোন পরিবর্তন হয় নি। তিনি যুগপৎ সর্বব্যাপী আবার সর্বকে অতিক্রম করে নির্বিশেষ রূপেও অবস্থিত। (Eminent and transcendental).

এই ব্যাপারটা অবশ্য আমরা অনুধাবন করতে পারি নে। কারণ মানুষের অভিজ্ঞতার এ বাইরের জিনিষ। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে যদি কোন বস্তু সর্বব্যাপী হয়, তবে সে আবার নতুন করে পৃথক সত্তায় থাকতে পারে না। সেইখানেই তার সত্তা শেষ হ'য়ে গেল। কিন্তু ভগবানের বেলায় সে রকম হিসাব নয়। তাঁর বেলায় সবই হ'তে পারে।

অসম্ভব বলে কোন কথা তাঁর সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব। তিনি সব পারেন, সব করেন, তাঁর ইচ্ছায় কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয়, আবার কোটি ব্রহ্মাণ্ড লয় পেয়ে যায়। এই জগৎ তাঁর একটা খেলা। শ্রীশ্রীগীতায় শ্রীভগবান বলেছেন যে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁর ষোল আনার এক আনা মাত্র। বাকি পনেরো আনা আমাদের (অর্থাৎ এই পৃথিবী উপগ্রহের জীবদের) জ্ঞানের বাইরে রয়েছে। তা হলেই বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা কতটুকু জানি। যে পৃথিবীতে আমরা বাস করছি তারই কিকিৎ অংশ আমরা জানি বা দেখি বা আমাদের জ্ঞানের অন্তর্গত হয়। কাজেই এক আনা সম্বন্ধেই আমাদের জ্ঞান যখন এত সীমাবদ্ধ, তখন বাকি পনেরো আনা যে আমরা কিছুই জানি নে সেটা প্রমাণ হ'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এতটুকু সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়েও আমাদের অহঙ্কারের অন্ত নেই। মনে করি আমরা সব জানি, সব বুঝি। যা আমার মনে হচ্ছে নেই, সেটা সত্যিই নেই বলে ফতোয়া জারি করি। ধীর স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করলেই আমাদের এই আহাম্মকী দেখে হাসি পাবে।

ভগবান যে আছেন—তিনি যে সর্বশক্তিমান, তিনি যে সর্বান্তর্যামী, তিনি যে দয়াময়, তিনি যে কৃপাময়—এ সব বুঝতে সময় লাগে। এর জন্যই এত সাধনা। যতক্ষণ সময় না হয় ততক্ষণ মানুষ এই সব কথা হেসে উড়িয়ে দেয়: বিশ্বাস করতে চায় না। সে মনে করে, বেশ ত আছি। ভগবান দিয়ে আবার দরকার কি? ভগবানকে বিশ্বাস করলে তার মুস্কিল হয়। কেননা ভগবানকে বিশ্বাস করলে তাঁর শক্তিকেও বিশ্বাস করতে হয়। সব জায়গায় তাঁর চক্ষু রয়েছে, সব জায়গায় তাঁর কাণ পাতা রয়েছে, সর্বত্র তাঁর হস্ত প্রসারিত হয়ে রয়েছে—এই সব বিশ্বাস করলে অন্যায় কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ তিনি ত দেখ্‌ছেন, তিনি ত জান্‌তে পারছেন—আমি অন্যায় কাজ করি কি করে? তারপরে কি ক'রে তাঁর কাছে মুখ দেখাব? এর চেয়ে তিনি নেই কিংবা আছেন কিনা জানি নে বা থাকলেও আমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই—এই ভাবতে পারলে লক্ষ লক্ষ নিশ্চিন্ত।

কিন্তু এই রকম ভাবার পথ মানুষের পক্ষে কল্যাণের পথ নয়, তাই তিনি এই ভাবে মানুষকে থাকতে দেন না। কঠিন আঘাত দিয়ে একদিন তিনি মানুষকে জাগিয়ে তোলেন—তাকে বুঝিয়ে দেন যে, তুমি যেগুলো ধরে আছ সেগুলো সত্য নয়—তাদের কোন স্থায়িত্ব নেই। পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন সব মরে গিয়ে প্রমাণ করে দেয় যে তারা অনিত্য। অর্থ, নাম-যশ, স্বাস্থ্য, যৌবন সব চলে গিয়ে প্রমাণ করে দেয় যে তারা নশ্বর। তখন মানুষকে কোন অবিনশ্বর, কোন নিত্য বস্তুর জন্য সন্ধান করতে হয়। তখন ভগবানের দিকে মানুষের নজর পড়ে। কারণ তিনি ছাড়া নিত্য এবং অবিনশ্বর আর দ্বিতীয় কিছু ত নেই।

কিন্তু তাঁকে বুঝতে হলে জান্‌তে হলে, বুদ্ধি দ্বারা পাণ্ডিত্য দ্বারা হয় না। কেননা এই সব দিয়ে তাঁর নাগাল পাওয়া মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। কিন্তু একটা উপায়ে হয়। তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ। সব সাধকেরাই এই উপায়টি নানাভাবে বলে দিয়েছেন। যদি আমরা বলতে পারি—হে প্রভু হে দয়াময় হে কৃপাময়! আমরা অবোধ, আমরা অজ্ঞান, আমরা কিছুই জানি নে; কিন্তু তুমি ত সব জান। তুমি আমাকে সব বুঝিয়ে দাও সব জানিয়ে দাও—আমার কিসে কল্যাণ, কিসে অকল্যাণ বলে দাও। আমি তোমার কাছে সর্বতোভাবে নিজেকে ছেড়ে দিলাম—আত্মসমর্পণ করলাম। তখন তিনি নিজের হাতে তাদের ভার তুলে নেন। এটা তাঁর প্রতিশ্রুতি। চিরকাল ধরে তিনি এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে আস্‌ছেন—চিরকাল রক্ষা করবেন। এর মধ্যে কোন কবি কল্পনা নেই। এ তাঁর আচরিত সত্য।

"অন্নদামঙ্গল" কাব্যে মানবতা

শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত

যে সময়ে ভারতচন্দ্রের জন্ম, তা হচ্ছে প্রাক্-বৃটিশ যুগ। এই বৃটিশ-পূর্ব যুগের কবিকে নিয়ে সম্যক্ আলোচনা অতি অল্প ক্ষেত্রেই হয়েছে বলে মনে হয়। অধিকাংশ স্থলে কবির যুগকে উপেক্ষা ক'রে কাব্যালোচনা হয়েছে। কিন্তু স্বীয় যুগ ও কালকে অতিক্রম করা সহজ ও সম্ভব নয়। চর্যাপদের কবি থেকে কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের রচনাতেও যুগোপযোগী প্রভাব কমবেশী দেখতে পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রেও সেই প্রভাব বর্তমান।

প্রাচীনকালে অধিকাংশ রাজসভায় এক একজন সভাকবি থাকতেন। রাজ-অন্নে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ হ'তো। তাঁরাও কায়মনোবাক্যে এবং সানন্দে কাব্যালোচনা করতেন। তবে তার কিছুটা ছিল রাজতুষ্টির ব্যাপার। রাজার আজ্ঞায় এবং সময় সময় তাঁরই বিষয়-বস্তু নির্দেশে কবিরা কাব্য রচনা করতেন। অনেকে হয়ত তাকে ফরমায়েসী কাব্য বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু নির্বাচনে রাজার অভিমত থাকলেও কাব্য রচনার ব্যাপারে কবির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। কবি তাঁর শিল্পদৃষ্টি, সৌন্দর্যবোধ, অভিজ্ঞতা—সমস্ত কিছু সেই কাব্যে প্রয়োগ করতে পারতেন। এমনি সভাকবির দৃষ্টান্ত —যেমন বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাস, লক্ষ্মণ-সেনের সভায় জয়দেব, শিবসিংহের সভায় বিদ্যাপতি, এবং কংসনারায়ণের সভায় কৃত্তিবাসের অবস্থিতি, তেমনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব দেখতে পাই।

ভারতচন্দ্রের গৌরব—তাঁর "অন্নদামঙ্গল" কাব্যখানি নিয়ে। এই কাব্যরচনায় তিনি প্রায়ই বলেছেন :

"আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর॥"

তাহলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, "অন্নদামঙ্গল" রচনায় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমতি ছিল। কিন্তু তাই বলে ভারতচন্দ্র কেবলমাত্র দেবদেবীর গুণকীর্তনের জন্য কাব্য রচনায় মন দেননি। স্বীয় যুগ ও কালের স্বরূপটীর মর্মোদ্ঘাটন করা যথার্থ শিল্পীর কর্তব্য; প্রকৃত শিল্পীর পক্ষে যুগ-সচেতনতা প্রথম ও প্রধান গুণ। ভারতচন্দ্রে এর ব্যতিক্রম নেই, তা তাঁর "অন্নদামঙ্গল" কাব্যের প্রথম দিকেই আলীবর্দীর বাংলার নবাব হওয়ার এবং বর্গীর অত্যাচারের বর্ণনায় দেখা যায় :

"বর্গী মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রকৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি॥
লুটি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গাপার হইল বাড়ি নৌকার জঞ্জাল॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী॥
পালাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল॥"

সে বর্গীর হাঙ্গামা যে কী বস্তু, তা একালে অনুমান করা সহজ নয়; অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত "সিরাজদ্দৌলা" নামক ইতিহাসে তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয়, বাংলার ভাগ্যাকাশে তখন 'দুর্যোগের ঘনঘটা'। একদিকে লুণ্ঠনকারী বর্গীদল, অন্যদিকে সাম্রাজ্যলোভী ইংরেজ বণিক —আর এই দু'টী রাহুর মাঝখানে নবাব আলীবর্দীর দেশরক্ষার প্রাণপণ প্রয়াস। সুতরাং বিস্তবান ছাড়া দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা সচ্ছল ছিল বলে মনে হয় না। ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" সেই মানুষের

প্রাত্যহিক জীবনের স্পর্শে উজ্জ্বল—মিলন বিরহ, হাসি-কান্না ও সুখ-দুঃখের মাঝখানে যে মানুষ আর পাঁচজনের থেকে পৃথক নয়।

তাহলে, তিনি সাধারণ লোকের জীবনকে কাব্যের বিষয়বস্তু করলেন না কেন?—এমন প্রশ্ন উঠতে পারে। এ প্রশ্নের সমাধানও আছে।

পূর্বেই বলেছি, "অন্নদামঙ্গল" রচনায় কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমতি ছিল। তিনি নিজে দেবী অন্নদার ভক্ত ছিলেন এবং কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রণীত "চণ্ডীমঙ্গল" রচনার প্রণালীতে ভারতচন্দ্রের নিকট "অন্নদামঙ্গল" রচনার অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁরই আদেশে এই কাব্যের সূচনা। দ্বিতীয়তঃ জীবনের বাস্তব আর সাহিত্যের বাস্তব এক নয়—এ কথা শুধু একালে কেন, সেকালের কবিরাও জানতেন। রামায়ণ, মহাভারত তার দৃষ্টান্ত। রামায়ণের রাম এবং মহাভারতের কৃষ্ণ দেবতা হয়েও সম্পূর্ণ দেবতা নন। অধিকাংশ স্থলে মানুষের বেশে ও প্রকৃতিতে তাঁদের প্রকাশ। 'অন্নদামঙ্গলে' দেবচরিত্র আছে বটে কিন্তু সে দেব-দেবীরা কোন অতীন্দ্রিয়লোকের অধিবাসী নন—পরন্তু মর্ত্যের মানুষের সমগোত্রীয়, তা সর্বতোভাবে সত্য। অথচ ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, তাঁর অন্নদামঙ্গলের চরিত্রগুলি কাঠের পুতুল—প্রাণসঞ্চার সেখানে আদৌ আছে কিনা সন্দেহ। এ সম্বন্ধে, বিচারের প্রয়োজন আছে।

কবি-সাহিত্যিকদের মনের এবং জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সঞ্চয়ই তাঁদের মূলধন। যেখানে এই সঞ্চয়কে কাজে লাগান হয়, সেখানে তা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পর্যায়ে ওঠে; যেখানে তা হয় না, সেখানে সাহিত্য কৃত্রিমতার দোষে দুষ্ট হয়। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে গিয়ে ভারতচন্দ্রকে যে পতন ও অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে, তাতে তাঁর পক্ষে যুগ-সচেতনতা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সেই সচেতন মনোভাব নিয়েই কাব্য রচনায় তাঁর মনঃসংযোগ—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। অতি-আধুনিক সাহিত্য সমালোচক প্রবন্ধের নারায়ণ চৌধুরী এ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তাতে এই কথাই আরও স্পষ্ট হয়: "এই প্রাক্-বৃটিশ বাঙালী কবির ভিতর ফরাসী লেখকসুলভ বিবিধ আধুনিক গুণ—শব্দচেতনা, চিন্তার স্বচ্ছতা ও পারিপাট্য, কৌতুকপ্রিয়তা, অতীন্দ্রিয়বাদবিমুখতা—বিস্ময়করূপে এক আধারে বিধৃত হয়েছিল।"

তার কারণ, বাঙালীর শিল্পসৃষ্টি মানবতাকে কেন্দ্র করেই পূর্ণায়িত হয়েছে, অতুচ্চ মহামানবতার প্রতি তেমন আকর্ষণ বিশেষ দেখতে পাওয়া যায় না। সেইজন্য বাঙালী কবিই বলতে পেরেছেন: "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গলে" সেই মানুষের তথা বাঙালীর জীবনকে প্রত্যক্ষ করি—যে বাঙালী আদর্শবাদী, দেহবাদে বিশ্বাসী; যে বাঙালী কবি বৈরাগ্য সাধনে মুক্তিকে পেছনে রেখে অসংখ্য বন্ধনের মাঝখানে আনন্দময় মুক্তির আস্বাদ লাভ করেছিলেন,—সেই বাঙালী-সংসার ও সমাজের আলেখ্যগুলি "অন্নদামঙ্গল" কাব্যের প্রাণস্পন্দন।

এই কাব্যের প্রথমে দেব-বন্দনা। তারপর গ্রন্থসূচনায় তৎকালীন বাংলার রাষ্ট্রবিপ্লবের কথা এবং কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনা ও গুণবর্ণনা মিলে একটি পরিচ্ছেদ। শিবপ্রিয়া সতীর পিতৃগৃহে গমনোদ্যোগ থেকেই প্রকৃত কাব্যের সূচনা। এই সময় শিবের সঙ্গে সতীর কথোপকথন লক্ষ্যের বিষয়:

"নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব পিতার ভবন॥
শঙ্কর কহেন বটে বাপ ঘরে যাবে।
নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে॥"

তার উত্তরে:

"সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা।
বাপ ঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা॥"

এ যেন সতীর বেশে কোন বাঙালী দুহিতা

পিত্রালয়ে গমনের জন্য স্বামীর কাছে অনুনয়ে রত। পরিশেষে অনুরোধ ব্যর্থ, সতীর ক্রোধ। দশমহাবিদ্যা-রূপে তার প্রকাশে সত্যিই অভিমানীর কতকগুলি আলেখ্য ফুটে ওঠে; কিন্তু আধুনিক যুগের সহধর্মিণীরা স্বামীকে নিজ মতের অনুকূলে সম্মত করতে না পেরে মান-অভিমান, ক্রোধ-ক্রন্দন, অসহযোগ প্রভৃতি অহিংস-অস্ত্রের দ্বারা স্বামী-বশীকরণের যে সকল পন্থা গ্রহণ করেন, তার তুলনায় সতীর দশমহাবিদ্যারূপ বোধ হয় অকিঞ্চিৎকর। তাই আধুনিক যুগের স্বামীদের মতই স্ত্রীর মায়ায় বশীকৃত শিবের "যে ইচ্ছা করহ বলি" বিদায় দিয়ে নিষ্কৃতি পাবার প্রবৃত্তি সহজ এবং স্বাভাবিক।

পিত্রালয়ে গমনের পর দক্ষের মুখে শিব-নিন্দায় সতীর দেহত্যাগের কাহিনীতে অলৌকিকতা যতখানি, সংসারের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর মধ্যে একটি নারীর অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ উদ্ঘাটনে যথার্থ শিল্পদৃষ্টির পরিচয় তার চেয়েও কম নয়। হিন্দুনারীর নিকট যে স্বামী দেবতাস্বরূপ, যে কুলীনকন্যা বৃদ্ধ অথর্ব স্বামীকে কন্দর্পের চেয়েও কান্তিমান মনে করে, স্বামীর সুখের নিমিত্ত যে নারী সহস্র নির্যাতন বুক পেতে নেয়, মৃত স্বামীর সহিত সহমরণে যার দুঃখ নেই; হোক সে স্বামী দরিদ্র, কুৎসিৎ, পরদারনিরত —তবু সেই স্বামীনিন্দা সহ্য করা হিন্দুনারীর পক্ষে সম্ভব নয়। সে নিন্দাকারী নিজ পিতা হলেও তাকে মার্জনা করা অস্বাভাবিক। কোথাও এই ক্রোধ নারীর বুকের মধ্যে গুমরে মরে, কোথাও বা সহস্রধারে হয় তার বিস্ফোরণ। তাই রাগে, দুঃখে, অপমানে সতী তার পিতাকে অভিসম্পাত করলো —"যে মুখে পামর, নিন্দিলে শঙ্কর; সে মুখ হবে ছাগল।"

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের "অমাবাই" কবিতায় এর কিঞ্চিৎ রূপান্তর দেখা যায়। স্বামীহত্যাকারী পিতাকে অমাবাই বলছে:

"……অন্যায় সমরে তিনি
স্বহস্তে বধিলা তুমি পতিরে আমার,
হায় পিতা, তবু তুমি পিতা।"

সতীর বেদনার অপেক্ষা অমাবাইয়ের আঘাত আরও বেশী। স্বামীহত্যাকারীকে সম্মুখে পেয়েও তার ওপর প্রতিশোধ নিতে না পারার যে অক্ষমতা তথা অসহায়তা—তাই-ই অমাবাইয়ের জীবনের ট্র্যাজেডী। অমাবাইয়ের হৃদয়ে যেখানে বেদনার সঙ্গে বিবেকের মিতালী, সতীর প্রাণে সেখানে সম্পূর্ণ অসহযোগ। বেদনার আঘাতে বিবেক সেখানে চূর্ণ আর সেই বিপুল হৃদয়াবেগের পথ দিয়ে দক্ষের জীবনে নেমে এল চরম সর্বনাশ। এ বিষয়ে ভারতচন্দ্রের চেয়েও রবীন্দ্রনাথের শিল্পদৃষ্টি আরও সচেতন। পার্থক্য শুধু ঐখানে।

সতীর দেহত্যাগ শিবের প্রাণে গভীরভাবে আঘাত করে। তারই ফলে দক্ষযজ্ঞ নাশ। শিব সংসারে উদাসীন। তার ওপর সতীর মৃত্যুতে সে ঔদাসীন্য আরও গভীর ভাবে তাঁর চারদিকে বেষ্টন ক'রে রয়েছে। সেই প্রাকার ভেঙে শিবকে নিত্যকার জগতে, সংসারের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাই নারদের ওপর পড়লো ঘটকালীর ভার।

"ঘটক হইয়া তুমি হিমালয়ে যাও।
উমা সহ মহেশের বিবাহ ঘটাও॥"

ঘটকের যে সব গুণ—হাস্যরসপ্রিয়তা, নিজকর্মের প্রতি আস্থা—তার কোনটার অভাব নারদের মধ্যে নেই। তাই 'জয়পাত্র' ক'রে বিবাহের দিন স্থির করা তার পক্ষে অসম্ভব হলো না। এর পরে শিবের ধ্যানভঙ্গ এবং কামভস্ম। এর অনেকখানি "কুমার-সম্ভব" কাব্যের সঙ্গে তুলনীয়। শিবের ধ্যানভঙ্গের কাজে মদন ও তার সহচর বসন্তের কার্যকলাপ এবং মদনভস্মের পর রতির বিলাপ পর্যন্ত "কুমার-সম্ভবের" প্রভাব। কিন্তু ভারতচন্দ্রের প্রতিভা সেই-খানে, যেখানে তিনি আলেখ্যটা গ্রহণ করেও তার প্রকাশভঙ্গী তথা অঙ্কনরীতিতে মৌলিকতা এনেছেন।

শিবের বিবাহ এবং তৎপরবর্তী ঘটনাবলীর মধ্যে বাঙালী সমাজের বিবাহের শাস্ত্রীয় বিধিগুলি দেখা যায়। কারণ অন্নদামঙ্গলের অধিকাংশ চরিত্রগুলি দেবতারূপী মানুষ—'পাপে-পুণ্যে, সুখে দুঃখে উত্থানে পতনে' যাদের জীবনযাত্রা। তাই বিবাহের পর হর-গৌরীর কথোপকথন লক্ষণীয়। নব বিবাহিতা পত্নীর প্রতি স্বামীর একটা আকর্ষণ থাকে। স্ত্রী যখন সংসারের কর্ত্রী থেকে প্রণয়িনীর আসনে অধিষ্ঠিত হয়; হাস্যে, লাস্যে, কটাক্ষে সে যখন মনোমোহিনী মূর্তি ধারণ করে, তখন সকল স্বামীর পক্ষে এই কথা বলাই স্বাভাবিক —"সত্য কহি কহ মোরে না ছাড়িবে আর।"

নবদম্পতির মধ্যে পরস্পর প্রেমের প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। উভয়েই উভয়ের ভালবাসাকে বড় ক'রে দেখে। তাই শিবের প্রেমসম্ভাষণের উত্তরে :

"হাসিয়া কহেন দেবী এমন কি হয়।
সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়॥
নারীর পতির প্রতি যেমনা যেমন।
পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন॥
পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাধ করে।
তার সাক্ষী মৃত পতি সঙ্গে পুড়ে মরে॥"

এই কথাগুলির মধ্যেও আমরা একটি দম্পতির সন্ধান পাই, প্রেমের ক্ষেত্রে যারা সৌভাগ্যবান। এর মধ্যে দেব-ভাব অপেক্ষা মানব-চৈতন্য যথেষ্ট বেশী।

কিন্তু সংসারে বাস করলে মতদ্বৈধতা আছেই। মানুষের বিশেষত্ব সেইখানে। বিশেষ ক'রে অভাব-অনটনের সংসারে সে মতদ্বৈধতা আরও বড় হয়ে দেখা দেয়। স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর। এ বিষয়ে অক্ষম স্বামীকে স্ত্রী সহ্য করতে পারে না। তাই হরগৌরীর সংসারে অশান্তি এল। শিব এই বলে দুঃখ করে :

"বিধাতার লিখন কার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী॥
সর্ব্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়।
রস কথা কহিতে বিরস হয়ে যায়॥"

নিত্য অভাবের সংসারে প্রেম থাকে না। পূর্ণিমার চাঁদকে তখন ঝলসানো রুটি বলে মনে হয়, শিবের হাসিতে যেন ভাগ্যদেবীর বিদ্রূপ ঝরে পড়ে। অন্ন-কথায় ক্রোধ আসে, দুঃখ হয়, মুখের কথায় মধুর পরিবর্তে বিষ ঝরে। তাই :

"শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে।
ধক্ ধক্ জ্বলে অগ্নি ললাট লোচনে॥
শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল॥

কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া।
কেন সব কটুকথা কিসের লাগিয়া॥"

স্ত্রীর কটুভাষণে স্বামী লজ্জা পায়। নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে আক্ষেপ জাগে; কিন্তু তবুও দুঃখ হয় এই কথা ভেবে—"নারী যার স্বতন্ত্রা, সে জন জীয়ন্তে মরা, তাহার উচিত বনবাস।" শিবের গৃহত্যাগে কুপিতা সতীও পিত্রালয়ে গমন করেন। উদাসীন পুরুষ সংসারে ব্যর্থ এবং বিড়ম্বিত—অন্নদামঙ্গলে শিব-চরিত্রে তারই প্রকাশ।

অন্নদার পূজার কারণে শাপভ্রষ্ট বসুন্ধরা এবং নলকুবেরকে যথাক্রমে হরিহোড় এবং ভবানন্দ মজুমদার রূপে জন্মগ্রহণের পশ্চাতে দেব-ভাব আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই দেবতারাও ভারতচন্দ্রের লেখনীর গুণে মানুষের পর্যায়ে উপনীত। সাহিত্যে মানবতা বোধ ও মানব-প্রীতি সম্বন্ধে প্রাচীন বাংলার লেখক সম্প্রদায় অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তবে বৃটিশ-পূর্ব যুগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত অধ্যায়টি ছিল প্রধানতঃ কাব্যের যুগ। কাব্য ভাবের প্রধান বাহন হিসাবে তখন সাহিত্যে আবেগ, অনুভূতি এবং কল্পনার দিকটা বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। কিন্তু তা মানবতাবোধকেই কেন্দ্রস্থির ক'রে তার চারপাশে ভাব-কল্পনার এক সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। সে কারণ বসুন্ধর এবং নলকুবের দেবতা

হয়েও প্রকাশভঙ্গীতে মানুষের স্বভাবটী গোপন করতে পারেনি।

হড়িহোড়ের গৃহ থেকে ভবানন্দ মজুমদার ভবনে অন্নদার যাত্রাকালে মাঝির সহিত কথাবার্তা লক্ষ্যের বিষয় :

"অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিল পাটুনীরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বর পাটুনী।
স্বরায় আনিল নৌকা ধামা স্বর শুনি॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বর পাটুনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি॥"

অতি সহজ সরল ভাষায় এই আলেখ্যটীর বর্ণনা করা হয়েছে। গৃহস্থের কুলবধূকে ঘাটে একা দেখে পরিচয় জিজ্ঞাসা করা মাঝির পক্ষে অস্বাভাবিক নয় এবং এ কথা বলা তার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক :

"পরিচয় না দিলে করিতে নাহি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে কেরফার॥"

পরিচয়হীনা নারীকে নিয়ে একা খেয়া পাড়ি দিতে মাঝি রাজী নয়। কারণ এতে কত বিঘ্ন-বিপত্তি আসতে পারে। তারপর অন্নদার বিশেষণ পূর্ণ পরিচয়ের পর :

"পাটনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল॥"

কুলীনের সংসারে অমন ঝগড়া অনেক ঘটে। স্ত্রী অভিমান ক'রে বাপের বাড়ী গেলে স্বামীই তাকে ফিরিয়ে আনে। সে কারণ নিরবিচ্ছিন্ন মাঝি বলে—"শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল।" সে মাঝি। খেয়া পারাপারের ওপর তার সংসার চলে। সেজন্য ঝগড়াঝাটি ক'রে তাড়াতাড়ি নৌকা নিয়ে যাওয়াই সঙ্গত। পরিশেষে অন্নদার আত্মপরিচয়ের পর পাটুনীর প্রার্থনা বড় বিস্ময়কর।

দেবতার কাছে মানুষ যশ, মান, ঐশ্বর্য চায়। কিন্তু মাঝির চাওয়ার মধ্যে বিশেষত্ব ছিল। সে নিজের জন্য কিছু চায় না। নিজের জীবিকার জন্য প্রকৃতির বৃত্তির ওপর তার বিশ্বাস আছে। শুধু সন্তানের জন্য তার চিন্তা। তাই দেবীর নিকট প্রার্থনা :

"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।"

আবির্ভূত দেবতার নিকট এমন ক্ষুদ্র প্রার্থনা বড় দুর্লভ। মাঝির এই প্রার্থনা তৎকালীন নিপীড়িত দরিদ্র বাঙালীর অন্যতম পরিচয়।

"অন্নদামঙ্গলের" মধ্যে বাঙালীর সংসার ও সমাজের পরিচয় প্রকট হ'য়ে উঠেছে। বাংলার বধূ-কন্যাদের গার্হস্থ্য জীবন, বিবাহ, পূজার্চনা, ঘরকন্নার সহস্র খুটিনাটী, সমাজের বিভিন্ন দিকের আলেখ্য-গুলিই দেখা যায়। যে সব দেব-চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে, তারা নামে দেবতা হলেও কথাবার্তা, চালচলন ও মনে-প্রাণে বাংলার সাধারণ মানুষ; যে মানুষ ভালবাসে, স্বপ্ন দেখে, আশা করে—মিলন-বিরহে, দ্বন্দ্বে-আনন্দে, সুখে-দুঃখে যারা সম্পূর্ণ মানুষ।

যুটিশ-পূর্ব যুগের শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" এই মানুষের জয়গানে মুখর।

যতই ঈশ্বরের নিকট যাওয়া যায়, ততই অন্তরে ভাব ভক্তির বিকাশ হয়। নদী সাগরের নিকটে যত যায়, ততই তাতে জোয়ার ভাঁটা বেশে।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

"অন্তরে জ্বালো আলো"

শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়

অন্তরে জ্বালো আলো তুমি প্রভু
মিথ্যা আলেয়া নাশি,
মনের গহনে যত মোহ, যেন
ফুল হ'য়ে ওঠে হাসি।
বিবাগীরা সব ঘোরে পথে পথে
যে আলোর সন্ধানে
সবারে ধন্য কর তুমি সেই
আলোকাঞ্জন দানে।
সংসার মাঠে চরে মানবেরা
পশুরাও পাশে রয়
মনের আলোক-আঁধারে মিলেমিশে
উভয়ের পরিচয়।
ক্ষমা-প্রেম-জ্ঞানে দীক্ষিত করি
জ্বালো অন্তরে আলো
অমৃতে স্নান করাও মানবে
দূর কর সব কালো।
সেবার মহান্ মন্ত্রে মানবে
দীক্ষিত কর তুমি
বুদ্ধ-জ্ঞানের আলো পাই যেন
তব পদরেণু চুমি।

সংঘ-বার্তা

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র ব্যাখ্যা : কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে প্রত্যেক সপ্তাহে সোমবার হইতে শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকা হইতে একঘণ্টা পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বেদান্ততীর্থ মহাশয় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

ভজন-সংগীত : উক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে প্রতি শনিবার বেলা তিন ঘটিকা হইতে দেড় ঘণ্টা সঙ্গীত-বিশারদ যোগেশ্বর চক্রবর্তী মহাশয় ও সম্প্রদায় ভজনসংগীত ও শ্রীশ্রীরামনাম করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত পাঠ : প্রতি রবিবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধ্যারাত্রিকের পর দেড় ঘণ্টা উক্ত মঠে কথকচূড়ামণি শ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীতাচার্য মহাশয় 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত' হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর লীলাকথা কহিয়া থাকেন।

বিশেষ পূজা : ২৭শে আষাঢ় (ইং ১১ জুলাই) বৃহস্পতিবার, 'গুরু পূর্ণিমা' উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজাদি হইবে।

ভুল সংশোধন

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
১০৫	মুমূর্ষু		মুমূর্ষু
১১০	অজ্ঞপুত প্রশস্তি		প্রজ্ঞাপূত প্রশস্তি
১২০	এখানে (ঝাড়গ্রামে) আমাদের বাস	...	এখানে (ঝাড়গ্রামে) মাহাতদের বাস

বিশ্ববাণী

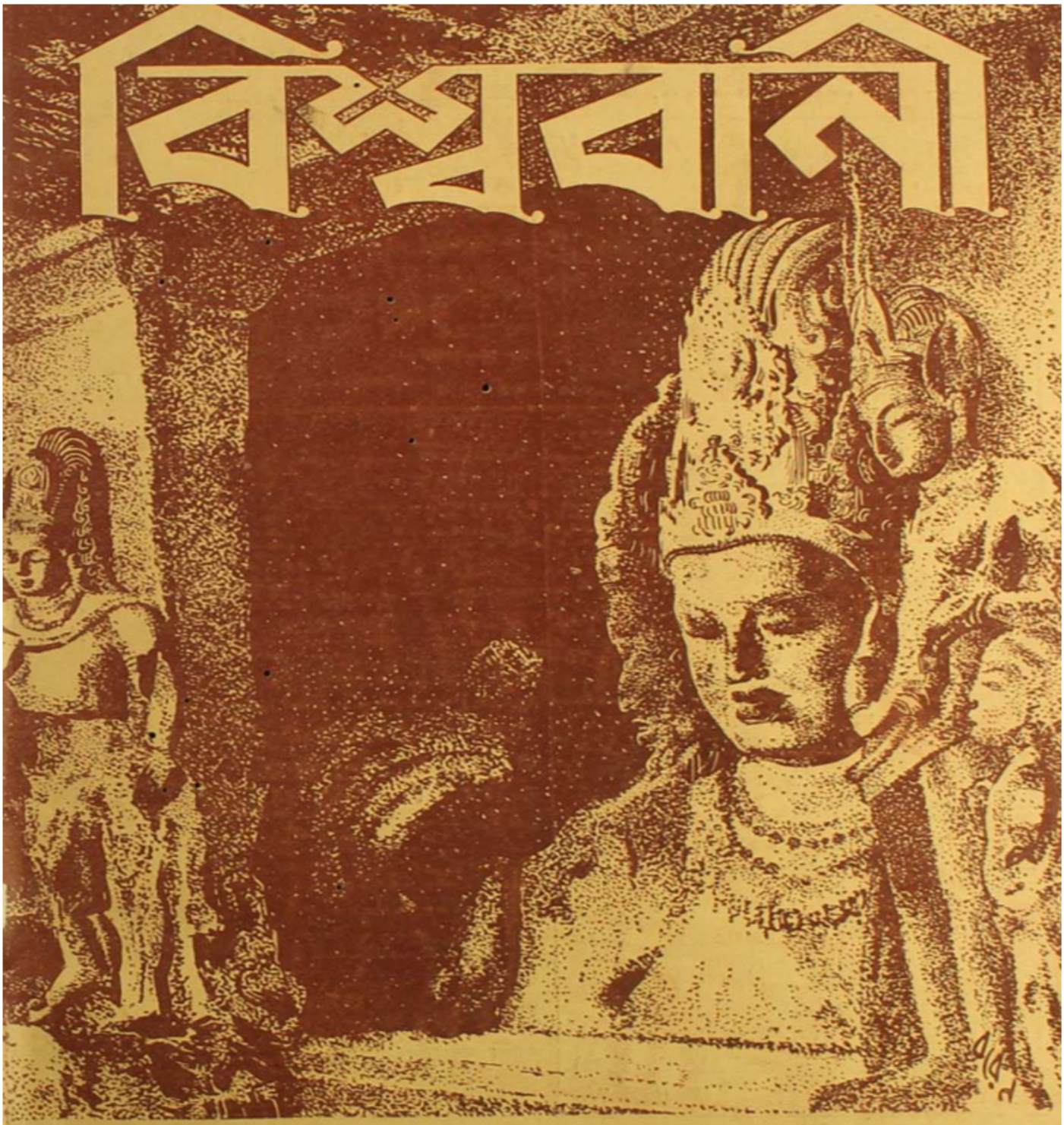

প্রতিষ্ঠাতাঃ স্বামী অভেদানন্দ

১৯শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪।০ আনা

আষাঢ়, ১৩৬৪

প্রতি সংখ্যা ।০ আনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট; কলিকাতা-৬ : ফোন : ৫৫—১৮০৫

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ প্রকাশিত কয়েকটী গ্রন্থ

BY SWAMI ABHEDANANDA :

Mystery of Death	Rs. 8/8
Life Beyond Death	6/8
India and Her People	6/8
True Psychology	6/-
Science of Psychic Phenomena	4/-
Doctrine of Karma	3/-
Lectures in India	3/8
Songs Divine	2/-
Ideal of Education	1/-
Reincarnation	2/-
How to be a Yogi	4/-
Philosophy and Religion	6/8
Divine Heritage of Man	4/-
Sayings of Ramakrishna	3/-
Attitude of Vedanta Towards Religion	6/8
Vivekananda and His work	1/-
Human Affection & Divine Love	1/3
Spiritual Unfoldment	2/-
Path of Realization	4/-
Self-knowledge	3/-
Philosophy of Panchadasi	1/-
Religion of the 20th Century	As. 12
Christian Science and Vedanta	,, 12
Woman's Place in Hindu Religion	,, 12
Memoirs of Ramakrishna	7/8
Great Saviours of the world Vols I & II (In the Press)	
Mystic Tales of Lama Taranatha (2nd Edition)—Just Out	

At Six Annas each

Why a Hindu accepts Christ and Rejects Churchianity : Why a Hindu is a Vegetarian : Unity and Harmony : Word and Cross in Ancient India.

An Apostle of Monism :
by Sister Shivani (*Mrs. Mary Lepage*)
(Life and Activities of Swami Abhedananda)
Rs. 7/8

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

মরণের পারে	৫৲
কাশ্মীর ও তিব্বতে	৫৲
ভারতীয় সংস্কৃতি	৪৲
মনের বিচিত্র রূপ (১ম সংস্করণ)	২৷৷০
হিন্দুনারী (৩য় সংস্করণ)	২৷৷০
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম	২৷৷০
যোগশিক্ষা (২য় সংস্করণ)	২৲
আত্মজ্ঞান (৫ম সংস্করণ)	২৲
পুনর্জন্মবাদ	২৲
কর্মবিজ্ঞান	২৲
প্রেমরত্নাকর (৫ম সংস্করণ)	২৲
পত্র সংকলন	১৲
স্বামী বিবেকানন্দ	৷৷০
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম (৫ম সংস্করণ)	১৲
আত্মবিকাশ (৩য় সংস্করণ)	১৲
অভিভাষণ	৷৷০
প্রতীক ও তাহার অর্থ	৷৷০
অর্চনা	৷৷০

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

তীর্থরেণু	৩৷৷০
শ্রীদুর্গা	৩৷৷০
রাগ ও রূপ	৮৲
সঙ্গীত ও সংস্কৃতি—১ম ও ২য় খণ্ড প্রত্যেকটী	৭৷৷০
অভেদানন্দ স্মরণ	৮৲
রামকৃষ্ণ-চন্দ্রিকা	২৲
বাঙ্গালা রূপদর্শনা	১৸০

স্বামী শঙ্করানন্দ প্রণীত

স্বামী অভেদানন্দের জীবন-কথা	৪৲
শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত	২৲

স্বামী বেদানন্দ প্রণীত

বাঙ্গলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২৲

নূতন বই

সারদামণি

জয়ন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

মূল্য : এক টাকা

সম্পাদক স্বামী সদাত্মানন্দ

১৯বি, রাজা রামকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে ব্রহ্মচারী বসন্তকুমার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, মানসী প্রেস হইতে শ্রীসুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

বিশ্ববাণী—আষাঢ়, ১৩৬৪

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	পরলোক কি রকম ? (শ্রীরামকৃষ্ণবাণী)		১৯৩
২।	রবীন্দ্র-দর্শনের ধারা	শ্রীমৎ পুরাণ পরমপন্থা	১৯৪
৩।	ঘুমে কেন মধুগন্ধ ? (কবিতা)	শ্রীঅমিতাভ আচার্য	১৯৮
৪।	উপনিষদে ভাবমুক্তের অবস্থা	শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়	১৯৯
৫।	আশার গান (কবিতা)	শ্রীদীপালী বসু	২০১
৬।	যোগদর্শন	শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ	২০২
৭।	সাংখ্যদর্শনে সৃষ্টি ও মোক্ষ	শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৬
৮।	সমবায়	শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য	২১০
৯।	মুহূর্ত লোক-সাহিত্য	শ্রীসন্তোষকুমার দে	২১৪
১০।	ছন্দ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ	শ্রীরবীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য	২১৮
১১।	মাইকেল স্মরণে	শ্রীবিজয়গোপাল বসু ...	২২২

জামসেদপুর—ব্রাঞ্চ

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১২।	ভারতের তীর্থ দর্শনে	শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২২৪
১৩।	মায়ের পায়ে (কবিতা)	শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবর্তী	২২৭
১৪।	মনস্বিনী গোলকমণি	শ্রীধীরেন্দ্রকুমার বসু	২২৮
১৫।	গৌরীমা (কবিতা)	শ্রীসুবোধ রায়	২৩১
১৬।	কাড়গ্রামের লোক-সংগীত	শ্রীশংকুমার রায়	২৩২
১৭।	শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী-স্মৃতি বিবেকানন্দ	পুরাঙ্গনা	২৩৬
১৮।	গ্রন্থসমালোচনা	....	২৩৯

বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রম

কলিকাতা: অফিস ও আউটডোর : ২৯এ, বিবেকানন্দ রোড : ফোন : ৩৩-৫২২০

টেলিগ্রাম : "উন্মাদ আশ্রম" : হাসপাতাল—দত্তনগর, কলিকাতা-৩০ : ফোন : দমদম ১০৫

প্রতিষ্ঠাতা ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট : কবিরাজ, অতুলবিহারী দত্ত, বি-এস্‌সি, কবিরত্ন

অগস্ত্যকল্পদ্রুমঃ

বহুবল সম্মোহিনস্ত কণায় পরিমিত নির্দিষ্ট মাত্রায়
ট্যাবলেট আকারে সংযত

সক্রিয় ষড়্‌গুণ মকরধ্বজ

চরম-বিভাজনের ফলে ইহার ভেষজশক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি
পাইয়াছে সেইজন্য ইহা সমধিক নির্ভরযোগ্য।

প্রতি শিশিতে ১৪ ট্যাবলেট (৭ পূর্ণমাত্রা) থাকে

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

শুভবিবাহে কালের উপযোগী আধুনিক
রুচিসম্মত প্রাচ্যের অপূর্ব্ব
সুসম্পন্ন নবকল্পিত
সৌন্দর্য্যমণ্ডিত

বেনারসী
তসর. গরদ. মটকা
সিল্ক. টিস্‌. শাড়ী
জহরলাল পান্নালাল
৭ নেজ ক্লীট মার্কেট কলিকাতা
ব্রাঞ্চ বেনারস. অমৃতসহর

ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক, এম. এ, এম্, ডি, বি, এল, আবিষ্কৃত

পেটেণ্ট

ইক্-মিক্ কুকার

ইহাতে এক ঘণ্টার ভিতরে বিভিন্ন আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য অতি সহজে এবং সুলভরূপে রন্ধন করা যায়। যে কোন আলানী দ্রব্যের দ্বারা বিনা তত্ত্বাবধানে অতি অল্প খরচে রান্না চলে। মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন। ম্যানেজার—ইক্-মিক্ কুকার প্রাইভেট্ লিমিটেড্, ২১১।১এ, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মোটর গাড়ীর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী

প্রাইভেট লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৮

হেড অফিস :—হাওড়া মোটর বিল্ডিংস্,
পি ৬, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা-১
ফোন—২৩-১৮০৫ (৫ লাইন)

শাখা :—
বম্বে, দিল্লী, পাটনা, ধানবাদ,
কটক, গৌহাটী ও শিলিগুড়ি।

বস্ত্র শিল্পে মোহিনীর অবদান অতুলনীয়

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

— ১নং মিল — — ২নং মিল —

কুষ্টিয়া (পাকিস্তান) ● বেলঘোরিয়া (ভারত)

এই মিলে প্রস্তুত ধুতি শাড়ী লংক্লথ প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে সমভাবে সমাদৃত

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ঃ

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস :—২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্যলহরী ঃ

পদ্যছন্দে লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী। প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা : সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই। মূল্য ৫৷৷০ মাত্র। ভিঃ পিঃতে ৬৲

শ্রীবিবেকানন্দ কাব্যগীতি ঃ

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত "স্বামী বিবেকানন্দের পিতৃবংশের পরিচয়" সম্বলিত—স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী পদ্যছন্দে লিখিত। সুন্দর বাঁধাই, প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায়। মূল্য ৪৲ ভিঃ পিঃতে ৪৷৷০

প্রাপ্তিস্থান—**স্বামী শ্যামানন্দ** (গ্রন্থকার) ১নং উমেশ দত্ত লেন, (বিডন ষ্ট্রীট), কলিকাতা-৬

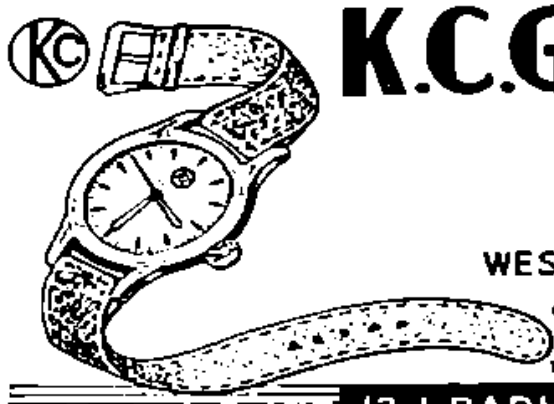

K.C.GANGULY
& CO.

Dealers in:-

WEST END • FAVRE-LEUBA
& ANGLO SWISS

★ REPAIRING OUR SPECIALITY

12-1 RADHA BAZAR ST. CAL-1

ঊনবিংশতি বর্ষ | আষাঢ়—১৩৬৪ | পঞ্চম সংখ্যা

॥ পরলোক কি রকম ? ॥

"যতক্ষণ মানুষ অজ্ঞান থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ ঈশ্বরলাভ হয় নাই, ততক্ষণ জন্মগ্রহণ করতে হবে।" কিন্তু জ্ঞানলাভ হ'লে আর এ সংসারে আসতে হয় না। পৃথিবীতে বা অন্য কোন লোকে যেতে হয় না।

কুমোরেরা হাঁড়ি রৌদ্রে শুকুতে দেয়। দেখ নাই, তার ভিতর পাকা হাঁড়িও আছে, কাঁচা হাঁড়িও আছে। গরু-টরু চ'লে গেলে হাঁড়ি কতক কতক ভেঙ্গে যায়। পাকা হাঁড়ি ভেঙ্গে গেলে কুমোর সেগুলোকে ফেলে দেয়, তার দ্বারা কোন কাজ হয় না। কাঁচা হাঁড়ি ভাঙ্গলে কুমোর তাদের আবার লয়; নিয়ে চাকাতে তাল পাকিয়ে দেয়, নতুন হাঁড়ি তৈয়ার হয়। তাই যতক্ষণ ঈশ্বর-দর্শন হয় নাই, ততক্ষণ কুমোরের হাতে যেতে হবে, অর্থাৎ এই সংসারে ফিরে আসতে হবে।

সিদ্ধ ধান পুঁতলে কি হবে? গাছ আর হয় না। মানুষ জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ হলে তার দ্বারা আর নূতন সৃষ্টি হয় না, সে মুক্ত হয়ে যায়।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

রবীন্দ্র-দর্শনের ধারা

শ্রীমৎ পুরাণ পরমপন্থী

॥ ১ ॥

রবীন্দ্র-দর্শন মানবকেন্দ্রিক ও মানবতার আদর্শে রূপায়িত। তাই রবীন্দ্র-দর্শনের ভিত্তি মানব-মানবে, মানব-প্রকৃতি ও মানব-ভগবানের ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত। ঐক্য ও স্বাধীনতার, প্রেম ও সৃজনীশক্তির, সত্য শিব ও সুন্দরের, অসীম ও সসীমের, ভক্ত ও ভগবানের মিলনের উদ্গাতা রবীন্দ্র-দর্শন।

॥ ২ ॥

রবীন্দ্রনাথ মানবকে বিবর্তন প্রক্রিয়ার অন্তিম অথচ অনন্ত সম্ভাবনাসূচক অবদানরূপে অবলোকন করেন। তাঁর মতে বিবর্তন-প্রক্রিয়া মানবতায় সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি লাভ করেছে এবং তাহা মানবে এক সীমাহীন অভিব্যক্তি ও স্বাধীনতার সন্ধান পেয়েছে। মানবের আবির্ভাবের পূর্বে বিবর্তন জড়-জগতে সীমাবদ্ধ ছিল—তখন সে জড় ও পশুরাজ্যে বহু দেহ ও আকার সৃষ্টির পরীক্ষায় মগ্ন ছিল।

বিবর্তনের সৃষ্টির পরীক্ষা সফল হয়েছে ও পরিপূর্ণতা লাভ করেছে মানবদেহ ও মনের আবির্ভাবে। কারণ, সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষের প্রকাশ বিবর্তনের ধারার আমূল পরিবর্তন সাধন করে' তাকে অনির্দিষ্ট জড়-জগতের বিকার হতে মুক্ত পূর্ণতার স্বাধীনতায় নিয়ে গেছে। বিবর্তনের এই পরিবর্তন একদিকে যেমন মানব প্রগতিকে বহুমুখী ও বন্ধনমুক্ত করেছে, অন্যদিকে তেমনই মানবের প্রচ্ছন্ন অসীমতাকে ব্যক্ত করতে সহায় হয়েছে। মানব এখন আত্ম-স্বরূপ অবগত হতে পারবে।

সুতরাং মানব বিবর্তনের অন্তিম ফল-স্বরূপ এবং ঐ বিবর্তনে কোন দ্বন্দ্ব নেই। বিবর্তন ও মানবে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করাই সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ প্রচ্ছন্ন সত্যকে প্রকাশ করাই বিবর্তনের স্বভাব ও সত্তাকে প্রকাশ করতে একমাত্র মানবই উপযুক্ত। সে ক্রমাগত সত্য-শিব-সুন্দরের প্রকাশ করে' বিবর্তনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছে ও করবে।

বিবর্তন-প্রক্রিয়ার দুইটি রূপ বা অভিব্যক্তি আমরা দর্শন করি। প্রথমতঃ অসীম তার অভিব্যক্তির জন্য সসীম রাজ্যের বিভিন্নতার মধ্যে অবতরণ করেছে; দ্বিতীয়তঃ সসীম তার আত্ম-বিকাশ ও আত্ম-উপলব্ধির জন্য অসীমের ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত হতে সচেষ্ট। সুতরাং সৃষ্টির ক্ষেত্রে দেখি, একদিকে অসীমের সসীমের বহুত্বে অবতরণ, অন্যদিকে সসীমের অসীমের ঐক্যে আরোহণ-প্রক্রিয়া এবং এই দুইটি ধারা অনন্ত সত্যের পূর্ণ চক্র প্রতিষ্ঠা করে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: "The Infinite for its self-manifestation comes down into the manifoldness of the Finite; and the Finite for its self-realisation must rise into the unity of the Infinite. Then only is the cycle of Truth complete." (Creative Unity, P. 80)

মানব এই অসীম ও সসীম লীলার ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান—কারণ সে অসীম ও সসীমের মধ্যে সংযোগের সূত্র-স্বরূপ। সে অভিব্যক্তিকে জড়রাজ্যের বন্ধন হতে মুক্ত করে' অধ্যাত্ম ও অনন্তের রাজ্যের সন্ধান দান করেছে ও সত্য-শিব-সুন্দরের বিকাশ সম্ভব করেছে। সে অসীম ও সসীমের মিলন স্থান।

সৃষ্টির জগতে এক ও বহুর মধ্যে সংঘর্ষ নেই, কারণ জড়-জগত ও অধ্যাত্ম-জগত উভয়ই স্বভাবগত ঐক্যকে প্রকাশ করতে সচেষ্ট। বিভিন্নতা ও বহুত্ব ঐক্য ও সমন্বয়ের বিরোধী নয়। এক সত্তা আপনাকে বহুরূপে ব্যক্ত করেছে আবার বহু তার

বহুত্বকে একক সত্তায় সমর্পণ করে' ঐক্যের পূর্ণতা প্রতিষ্ঠা করে। রবীন্দ্রনাথ বলেন: "Thus we find it is the One which expresses itself in creation; and the many, by giving up opposition make the revelation of unity perfect. (Ibid, P. 6)

মানুষের সহিত সমগ্র বিশ্ব-চরাচরের আদিম ঐক্য বর্তমান এবং এই অন্তর্নিহিত ঐক্যের উপলব্ধি একান্ত প্রয়োজন। বিরাট সাম্যকের অনুরণন গানের ন্যায় সৃষ্টির লীলা দেশকালে অভিব্যক্ত। স্রষ্টা আনন্দ ও প্রেম, ঐক্য ও সত্য, পূর্ণতা ও সুন্দর ও শিবের মহিমায় ও প্রকাশে বিশ্বকে মহান ও অপরূপ করেছেন। মানুষের কর্তব্য এই লীলার সম্পূর্ণ সহযোগী হওয়া।

॥ ৩ ॥

রবীন্দ্রনাথ মানবের স্বরূপকে দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। একদিকে প্রত্যেক মানুষ নিজ পৃথক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন, অন্যদিকে সে বিশ্ব-চরাচরের সহিত নিজের ঐক্য উপলব্ধি করতে ব্যগ্র। একদিকে ব্যক্তি স্বতন্ত্র, পৃথক ও অন্য হতে স্বাধীন আবার অন্যদিকে সে বিশ্বের সমগ্র স্বরূপের সত্তার সহিত একীভূত।

কিন্তু যখন ব্যক্তি কেবল আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সচেষ্ট তখন সে তার বিরাটের সত্তার সহিত অচ্ছেদ্য ঐক্যের কথা বিস্মৃত হয়। তখনই স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্রতা, নীচতার অশিবের সৃষ্টি হয়। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি হয় যখন মানুষ বিশ্ব-চরাচরের সহিত নিজের ঐক্যবোধে জাগ্রত হয়—যখন সে বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত অন্তর্নিহিত যোগসূত্র আবিষ্কার করে।

এই ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কিন্তু ব্যক্তিত্বের নাশ বা লয় নেই। অপূর্ব বিচিত্র ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও অভিব্যক্তি সৃষ্টির সার্বিক রূপকে মহিমান্বিত ও সার্থক করে তোলে। ব্যক্তির সহিত সমষ্টির সংঘর্ষ শুরু হয় যখন ব্যক্তি নিজেকে সমষ্টি হতে বিচ্ছিন্ন করতে সচেষ্ট হয়—যখন সে সমষ্টির অস্তিত্ব অস্বীকার করে' সৃষ্টির প্রকাশ ও গতিকে এড়িয়ে চলতে চায়। আবার ব্যক্তি পরিপূর্ণতা, সার্থকতা লাভ করে, যখন তার ব্যক্তিত্ব সমষ্টির সহিত ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ও বিশ্বের সহিত সমন্বয় বোধে জাগ্রত হয়।

আপনাকে বিশ্বে বিলিয়ে দিয়ে ব্যক্তি তার প্রকৃত স্বরূপের ও স্বভাবের সন্ধান পায়। যতক্ষণ সে সঙ্কুচিত, ভীত ও ঐক্যবোধে অপ্রতিষ্ঠিত—যতক্ষণ সে কৃপণের মত নিজ অধিকার ও রূপ আপনাতে প্রচ্ছন্ন করে' রাখে, ততক্ষণ নিজের স্বরূপের উপলব্ধি হয় না—ততক্ষণ সে তার লক্ষ্য ও স্বরূপের বিরুদ্ধে চলে। যেমন প্রদীপের তেলের সার্থকতা আপনাকে আলোকরূপে ব্যক্ত করা—তেমনই ব্যক্তির সার্থকতা আপনাকে বিশ্বে বিলিয়ে দিয়ে আপনার স্বরূপের উপলব্ধি করা। সুতরাং আত্মত্যাগ, আত্ম-অতিক্রম, আত্মবিসর্জনই জীবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ—তাহাতেই তার পূর্ণতা, সার্থকতা ও সার্বিক রূপের অভিব্যক্তি সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ বলেন: "It is our ignorance which makes us think that our self as self, is real, that it has its complete meaning in itself." (Sadhana, P. 72)

সুতরাং মানবের দুইটি রূপ: একটি ব্যক্তিরূপ (individual man), আর একটি সমষ্টিরূপ (man the universal)। ব্যক্তিরূপে মানুষ সীমাবদ্ধ, পৃথক ও একক। সমষ্টিরূপে মানুষ বিরাট—অনাদি ও অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ এবং দেশকালের অতীত। সমষ্টি মানব ব্যক্তি-মানবের মধ্যে আপনাকে ধীরে ধীরে দেশকালে, কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে প্রকাশ করছে। ব্যক্তির সার্থকতা আপনাকে সচেতন বহুস্বরূপ করার সফলতায় বিরাট মানবতার পূর্ণ

অভিব্যক্তির জন্য। ব্যক্তির অভিত্ব সমষ্টির প্রকাশের জন্য—সে সমষ্টিকে প্রকাশ করবে সৃষ্টির বিচিত্র ভাবে, বর্ণে, সৌন্দর্যে, সত্যে। মানবের এই সমষ্টি রূপ সকল সত্য, জ্ঞান, আদর্শ, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শনের সম্ভাবনার আধার এবং ব্যক্তি সর্বদা সচেষ্ট থাকবে এই অব্যক্ত রূপকে ব্যক্ত করতে সৃষ্টির প্রকাশ মুখে।

আমরা মানবের এই বিরাট রূপকে নিজ নিজ সীমাবদ্ধতার দ্বারা উপলব্ধি করতে সক্ষম। রবীন্দ্রনাথ বলেন—"We realise the supreme man who has individual limitations through our limitations." (The Religion of man, P. 222)

এই বিরাট রূপই নরনারায়ণ রূপে অবিভূত আর এই বিরাট স্বরূপের যথার্থ উপলব্ধি আমাদের, ভগবৎ স্বরূপের সন্ধান দান করে। অর্থাৎ ভগবৎ সত্তা বিরাট মানবের সমষ্টিরূপ—নরনারায়ণ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে রবীন্দ্র-দর্শনে। রবীন্দ্রনাথ বলেন: "But those that have attained a greater height aspire for their fulfilment in union with Narayana the Supreme Reality of man, which is divine." (Ibid. P. 67)

॥ ৪ ॥

রবীন্দ্র-দর্শন অশিব, অসত্য ও পাপ প্রভৃতি সমস্যাকে সার্বিক সত্তার ক্রমাগত অগ্রগতির পট-ভূমিকায় বিচার করে। অশিব, অসত্য, পাপ, বেদনা প্রভৃতির সমস্যা সমগ্র সৃষ্টির সমস্যা। সৃষ্টি একটী অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়া—তাহা ক্রমাগত পূর্ণতার দিকে ধাবমান—সুতরাং তাহাও অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। সৃষ্টির এই অসম্পূর্ণতাই আমাদের নিকট অশিব, দুঃখ, বেদনা, অপূর্ণতা, অসত্যের আকারে প্রতিভাত হয়। কারণ বিশ্বচরাচর একটি ক্রমিক প্রক্রিয়া যাহা ধীরে ধীরে অন্তর্নিহিত পূর্ণতাকে ব্যক্ত করছে এবং যতদিন পর্যন্ত না অব্যক্ত পূর্ণতা ব্যক্ত হয় ততদিন অশিব, অসত্য, অপূর্ণতা দুঃখ, কষ্ট জগতে থাকবে।

তাই রবীন্দ্র-দর্শন ঘোষণা করে যে, ইহারা অনন্ত-ধর্মী বা অমর বা চিরস্থায়ী নয়। ইহারা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ক্ষণস্থায়ী ঘটনামাত্র এবং সৃষ্টির পূর্ণতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা লোপ পাবে—নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সুতরাং রবীন্দ্র-দর্শন এই সিদ্ধান্তে উপনীত যে অসত্য, অশিব, দুঃখ-কষ্ট, বেদনা, অপূর্ণতা প্রভৃতি চিরস্থায়ী বা মৌলিক উপাদান নয়। তাহারা ক্ষণস্থায়ী ও সর্বদা সার্বিক সত্তার ক্রমাগত অগ্রগতির দ্বারা ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তাহারা অখণ্ড সত্তার আংশিক প্রকাশমাত্র। (completeness manifested in parts, infinity revealed within bonds) যখন অখণ্ড সত্তা পূর্ণরূপে অবিভক্তভাবে আপনাকে প্রকাশ করবে তখন সীমা, বন্ধন, দুঃখবেদনা প্রভৃতি চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথ বলেন: "As in intellectual error, so in evil in any form, its essence is impermanence, for it cannot accord with the whole." (Sadhana, P.49)

রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেন যে, প্রতিক্ষণে অখণ্ড সত্তার অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে অশিব বা বিভ্রান্তি সংশোধিত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তাহা সৃষ্টির জীবন-প্রবাহকে রুদ্ধ করতে পারে না। কিন্তু তবুও তাহারা বর্তমান এবং অসত্য, দুঃখ, বেদনা, মৃত্যু আমাদের অভিভূত করে যখন আমরা তাদের বিরাট রূপ মিথ্যা কল্পনা করি। যেমন যদি আমরা কেবল মৃত্যুর কথা চিন্তা করি তাহলে এই পৃথিবী একটি মৃত্যুর পৃথিবীরূপে আমাদের সামনে প্রতিভাত হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা সত্য নয়—কারণ মৃত্যু একটি অনন্ত অমর জীবন-প্রবাহে সাময়িক ঘটনা মাত্র। মৃত্যু জগৎ-অস্তিত্বকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে পারে না। (it does not blacken existence)। তেমনি রবীন্দ্রনাথ বলেন যে,

নিরাশাবাদ একটি ভাণ মাত্র—কারণ জীবন ও প্রাণ সর্বদা আশা-আনন্দের ছন্দে চঞ্চল ও আনন্দ-মুখর। জীবন সর্বদা সম্মুখে ধাবমান। কারণ বিশ্বমানব ক্রমাগত অশিব হতে শিবে, অপূর্ণতা হতে পূর্ণতায় অগ্রসর হচ্ছে—কারণ বিশ্বে একমাত্র চিরস্থায়ী সত্য হ'ল মহামঙ্গল বা সত্য-শিব ও সুন্দর। আমরা যখন আমাদের প্রকৃত সাত্ত্বিক স্বরূপের আদর্শে অনুপ্রাণিত হই—যখন আমরা আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্ম-সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হই—তখনই আমাদের প্রাণে শিবের, সত্যের ও সুন্দরের (goodness) আবির্ভাব হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: "For good is that which is desirable for our greater self. (Sadhana, P. 54)

শিবের প্রধান ভিত্তি মানব-জীবনে নিঃস্বার্থ-পরতা ও ত্যাগের উপর। ত্যাগময় জীবনই অনন্ত জীবন—বিরাট জীবন। যখন আমরা আমাদের আত্মার বিরুদ্ধে কাজ করি তখন পাপের সৃষ্টি হয়—যখন আত্মার প্রকৃত স্বরূপ ও স্বভাবের সহিত ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে কাজ করি তখন আমরা যথার্থরূপে পবিত্র ও ধন্য—মহিমান্বিত ও পুণ্যবান। স্বার্থপরতা—অবিদ্যা, অহং-জ্ঞান বন্ধনের কারণ।

॥ ৫ ॥

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের সহিত সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির ঐক্য বর্তমান। মানুষ মানুষে, মানুষ ভগবানে ও মানব প্রকৃতিতে যে অন্তর্নিহিত ঐক্য বর্তমান সেই ঐক্যকে উপলব্ধি করাই মানুষের ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "..... the consciousness of this unity is spiritual, and our effort to be true to it is our religion." (The Religion of man, P. 16).

এই ঐক্যবোধ ধর্মের জনক এবং আমাদের মধ্যে ভগবৎসত্তার উপলব্ধিরও জনক। আমরা বর্তমান ভগবৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, তাই আমাদের জীবন উৎসর্গ করা উচিৎ এই মহাকার্যে। আমাদের অন্তরস্থিত ভগবত্তার উপলব্ধি যথেষ্ট নয়—আমাদের কার্যে, ভাবনায়, চিন্তায়, শিল্পে, সাহিত্যে, ধর্মে তাহাকে প্রকাশ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। মানব কেবল স্থূল শরীরী নয়, তার অসীমতা সূক্ষ্ম, তাহা জড়ের স্থূল বিশালতা নয়। সুতরাং মানুষের প্রকাশ ও অভিব্যক্তির আদি অন্ত নেই—তাহা শাশ্বত, অফুরন্ত ও চিরন্তন। সে অসীম, পূর্ণ ও বিরাট—তাই মানব চিরকাল বিরাট—অসীম ও পূর্ণতার সন্ধানে ধাবমান। মানবই জগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই জগৎ মানবীয় জগৎ—ভগবান ও মানবের ভগবান। রবীন্দ্রদর্শন ঘোষণা করে—এমন কোন সত্য, জ্ঞান বা বস্তু নেই যাহা মানবীয় উপলব্ধির ঊর্ধ্বে, যাহা মানবীয় অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞানের বাহিরে। অমানবীয় বস্তুর কোন মূল্য নেই মানবের নিকট।

মানবই একমাত্র জীব যে শুধু গ্রহণ করে না নিজে দান করতেও সক্ষম। সে ক্রীতদাস নয়—কারণ তার স্বাধীন সৃজনীমুখর সত্তা বিদ্যমান: শারীরিক প্রয়োজনের জন্য সে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল কিন্তু আত্মিক ধ্যানে, চিন্তায় ও প্রকাশে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কারণ তার মধ্যে বিরাট 'উদ্বৃত্ত' বর্তমান যার নাম দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—'the great surplus'. ইহাই মানুষের ধর্মের জনক যাহা বিশ্ব-প্রেম—বিশ্ব-সৌন্দর্য ও অসীম অনন্তের সন্ধান দান করে মানুষকে।

রবীন্দ্র-দর্শন কর্মহীন জ্ঞানের বিরোধী। রবীন্দ্রনাথ বলেন, নিষ্কাম সৃজনী কর্মে মানুষ আপন সত্তার চরিতার্থতা লাভ করে। তাঁর ভাষায়—"Thus man is continually engaged in setting free in action his powers, his beauty, his goodness, his very soul." (Sadhana, P. 121.)

বাসনার তাড়নায় কর্ম বন্ধনের কারণ—স্বাধীন, বাসনা-কামনামুক্ত কর্মই মুক্তির কারণ—যে

কর্ম ভগবানে উৎসর্গিত। ত্যাগ বা বৈরাগ্য মানব-জীবনের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু। তিনি বলেন, —"We see everywhere in the history of man that the spirit of renunciation is the deepest reality of the human soul".

(Ibid, p. 151)

মানব জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হল নারায়ণের সহিত ঐক্য-স্থাপনা। ভক্ত কেবল ভগবানের চরণে ভক্তি প্রেম দান করে না। এক তরফা ভক্তি প্রেমের পক্ষপাতী রবীন্দ্রনাথ নন, কারণ তাহাতে ক্রীতদাসবৎ আচরণ পরিস্ফুট হয়। ভগবানও ভক্তের জন্য উদ্‌গ্রীব—তিনিই ভক্তের জন্য অকাতরে স্নেহ-ক্ষমা-প্রীতি অফুরন্ত ধারায় বিলিয়ে দেন। ভগবানকে লাভ করা যায় আত্মবলিদান দ্বারা—স্বার্থশূন্যতার দ্বারা। ভক্ত-ভগবান মিলন মহাশূন্যে পরিণতি নয়। দেশকালধর্ম-অতীত মিলনের তিনি পক্ষপাতী নন। ভক্ত-ভগবান মিলন মহা কর্মে, আদর্শে, স্বজনী-শক্তিতে, রূপে, রসে, গন্ধে, সৌন্দর্যে, সত্যে, শিবে ফলপ্রসূ ও অভিব্যক্ত হবে। ভক্ত ভগবান সম্বন্ধ সম্পূর্ণ মানবীয় সম্বন্ধ—মানবের পূর্ণতা তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ভগবান মানুষের—মানুষ ভগবানের ইহাই রবীন্দ্র-দর্শনের চরম সিদ্ধান্ত।

ঘুমে কেন নারায়ণ ?

শ্রীঅমিতাভ আচার্য

কোথায় তোমার পাঞ্চজন্য
কোথায় সুদর্শন ?
মুরারি, তোমারে চাহিছে ধরার
নিপীড়িত জনগণ।

শত সীতা আজ লাঞ্ছিতা পথে
দ্রৌপদীরা কাঁদে হায়,
কত আশা আর প্রতিভার কুঁড়ি
অকালেই ঝরে' যায়।

ভিখারীর কড়ি কাড়িয়া লইতে
কাঁপে না ধনীর প্রাণ,
মানুষ অবাধে মানুষের বুকে
হানিছে মরণ-বাণ।

আর্ত জগৎ কাতরে শুধায়—
"ঘুমে কেন নারায়ণ ?
শঙ্খে, চক্রে শঙ্কা হরিষে—
একি নহে সেই ক্ষণ ?"

বাউল দু'হাতে দুটো বাজনা বাজায়, আর মুখে গান করে। সংসারী! তুমিও সেইরূপ হাতে কাজ কর, আর মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকো। যাতে নিজের জ্ঞানভক্তি লাভ হয়।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

উপনিষদে জীবন্মুক্তের অবস্থা

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

সংসারাবদ্ধ মানুষ আমরা সাধারণতঃ অর্থোপার্জন ও অন্নসংস্থানে জীবনের অধিকাংশ সময় নিয়োগ করি এবং অজ্ঞতাবশতঃ উহাই আমাদের জীবনের একমাত্র কাম্য ও উদ্দেশ্য ব'লে মনে করি। অবশ্য ইহা ঠিক যে, অর্থ-উপার্জন ভিন্ন অন্নসংস্থান সম্ভব হয় না ও অন্ন ব্যতীত জীবনধারণ অসম্ভব; কিন্তু তাই ব'লে উহাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। উদ্দেশ্য উহা অপেক্ষা স্বতন্ত্র প্রকারের ও উন্নততর। তবে আমাদের স্বীকার করতে হ'বে যে, উহা উন্নততর উদ্দেশ্য সাধনের উপায় স্বরূপ; এই উন্নততর জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ। আমরা দেহবান জীব বটে, কিন্তু দেহটী একটী বাহ্য উপাধি মাত্র। উহার অভ্যন্তরে যিনি দেহী, তিনি নিত্যমুক্ত ও সদানন্দময়। দেহী ও দেহের মধ্যে পরস্পর অধ্যাসবশতঃ দেহী নিজের আনন্দময় সত্তা ভুলে গিয়ে নিজেকে সুখ দুঃখময়, অবস্থার অধীন মনে করেন ও সুখ দুঃখ ভোগ করেন। যদি আমরা ভাগ্যক্রমে সদ্গুরুর আশ্রয়-গ্রহণের ফলে মুমুক্ষুত্ব লাভ করতে পারি তাহ'লে কালে জীবিত অবস্থাতেই মুক্তির আনন্দ লাভ করতে পারি। এই মুক্তির আনন্দলাভই আমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য। নিত্যমুক্ত আত্মা কোন সংসার-বাসনা পূরণের জন্য দেহ ধারণ করেন না। তিনি নিজ মায়াশক্তির প্রভাবে নিজের ওপর জীবত্বের আরোপ করেন ও কিছুকাল সংসার ভোগের পর যেন মুক্তির আনন্দ ভোগ করেন। আত্মা স্বভাবতঃই মুক্ত, তা যদি না হ'ত ত তিনি মুক্ত হ'তে পারতেন না, কারণ স্বভাবকে কেহ পরিত্যাগ করতে পারে না। এই জীবন্মুক্তিসুখ লাভ করার জন্যই আত্মা দেহ ধারণ করেন। অতএব জীবরূপী আমাদের সেই স্বরূপানন্দলাভ করাই উদ্দেশ্য। যদি আমরা অষ্টপাশ হ'তে মুক্ত হ'তে পারি তাহ'লেই আমরা জীবন্মুক্ত হ'তে পারি। স্কন্দ উপনিষদে আছে:

জীবঃ শিবঃ শিবো জীবঃ সজীবঃ কেবলঃ শিবঃ।
পাশবদ্ধস্তথা জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ॥

মুক্ত পুরুষ যিনি জীবন্মুক্তিসুখ লাভ ক'রেছেন তাঁর অবস্থা সম্বন্ধে উপনিষৎ কি বলেন তার আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই সমুন্নত অবস্থালাভই যখন আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন ঐ অবস্থার লক্ষণগুলি সর্বদা আমাদের সামনে রাখা আমাদের প্রয়োজন, তাহ'লে ঐগুলি আমাদের গন্তব্যে উপস্থিত হ'তে সহায়তা করবে।

জীবন্মুক্তি লাভ করতে হ'লে আমাদের সংসার বিষয়ে আসক্তিশূন্য হ'তে হ'বে। মনকে সর্ববিধ কামনাশূন্য করতে হ'বে। অন্নপূর্ণা উপনিষৎ বলেন—যদি তোমার কোন বিষয়ে আসক্তি থাকে, তাহ'লে বুঝতে হ'বে যে, তুমি সংসারে আবদ্ধ আছ; আর যদি তোমার কোন বিষয়ে আসক্তি না থাকে, তাহ'লে বুঝবে যে, তুমি মুক্তিলাভ ক'রেছ। মুক্তিক উপনিষদে শ্রীরামচন্দ্র মহাবীরজীকে বলছেন: "আমার নাম ভজনার ফলে, একাগ্রচিত্তে আমাতে অনুরক্ত হ'লে ও আমার অবিনাশী স্বরূপ ধ্যান করলে বিভিন্ন প্রকার মুক্তিলাভ হয়। ভক্তিপথ অনুসরণ করলে যে মুক্ত হওয়া যায়, তাহাই মুক্তিক উপনিষদে উক্ত হয়েছে। মৈত্রেয়ী উপনিষৎ অনুসারে তিনিই মুক্তিলাভে সমর্থ যিনি অহঙ্কাররূপ পুত্রকে, চিত্তরূপ ভ্রাতাকে, মোহরূপ গৃহকে ও আশারূপা ভার্যাকে ত্যাগ করতে পারেন। আবার যিনি বিদ্যারূপা জননী, বৈরাগ্যরূপ জনক, শ্রদ্ধারূপা

ভার্যা ও জ্ঞানরূপ পুত্রকে পরিত্যাগ করেন না, তিনিই মুক্তিলাভে সমর্থ। এইগুলি মুক্তিলাভের সাধন। সংশয়াপন্ন ব্যক্তির মুক্তি হয় না, সংশয়মুক্ত ব্যক্তিরই মুক্তিলাভ হয়। নারদ পরিব্রাজক উপনিষৎ অনুসারে জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র উপায়,—আশ্রমচিহ্ন প্রভৃতির বিশেষ কিছু মূল্য নেই।

জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সর্ব বস্তুতে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন ও নিজেকে বিশ্বের সহিত মিলিয়ে দেন। জগতের কোন পরিবর্তন তাঁদের চিত্তপ্রশান্তি ভঙ্গ করতে পারে না, তবে প্রারব্ধবশতঃ তাঁদের দেহটী থাকে। প্রারব্ধক্ষয়ে দেহ বিলয়ে বিদেহ মুক্তি অর্থাৎ সেই অব্যয়ের সহিত একত্বপ্রাপ্তি হয়। নদী যেমন নিজ নামরূপ পরিত্যাগ ক'রে সমুদ্রে মিলিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানী নামরূপ হ'তে মুক্ত হ'য়ে সেই দিব্য পরাৎপর পুরুষকে লাভ ক'রে তাঁর সহিত একীভূত হয় (মুণ্ডক উপনিষৎ)। জীবন্মুক্ত পুরুষের আরও লক্ষণ এই যে, তিনি সারল্যের আধার ও বালকের ন্যায় নিরভিমান। পাণ্ডিত্য লাভ ক'রেও তিনি জ্ঞানের জন্য অহঙ্কারশূন্য, তিনি ব্রহ্মভাবে তন্ময়, সমাহিত ও ব্রহ্মানন্দে আত্মহারা হ'য়ে থাকেন (বৃহদারণ্যক)। এইরূপ ব্যক্তির স্বভাবই এই যে তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না, ইহা কোনও বিধির বা আদেশ বাক্যের ফল নয় (ঈশোপনিষৎ)। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি প্রজ্ঞাবান অর্থাৎ এই প্রজ্ঞা তাঁর আছে যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক। তিনি সাধুগণ কর্তৃক পূজিত ও দুর্জন কর্তৃক পীড্যমান হ'য়েও সমভাবে অবস্থিত থাকেন (অধ্যাত্ম)। আত্মজ্ঞ জীবন্মুক্ত পুরুষ কর্মফলমুক্ত। তিনি তীর্থক্ষেত্রে বা চণ্ডালগৃহে যেখানেই দেহত্যাগ করুন না কেন, তিনি মুক্ত হবেনই অর্থাৎ কৈবল্যলাভ করবেনই। (পৈঙ্গল ও অন্নপূর্ণা)। শুদ্ধ জ্ঞান ও আনন্দাত্মক অবস্থার নাম জীবন্মুক্ত অবস্থা। ইহাই পঞ্চমী ভূমিকা (অন্নপূর্ণা)। জ্ঞানী জীবন্মুক্তের দ্বিতীয় বস্তুর জ্ঞান না থাকায় তাঁর কোন ভয় বা শোক দুঃখাদি হয় না, কারণ দ্বিতীয় বস্তুর সত্তা থাকলেই ভয় ও শোকাদি হ'য়ে থাকে (পাশুপত ব্রহ্ম)। শুদ্ধজ্ঞ ব্যক্তি সংসারে লোকের সহিত বালক, উন্মত্ত, জড় ও পিশাচের ন্যায় ব্যবহার করেন (মৈত্রেয় ব্রাহ্মণ)।

বরাহ-উপনিষৎ বলেন :

যস্য নাহং কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
কুর্বতোঽকুর্বতো বাপি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষ ভয়োদ্বেগৈঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥
প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বাংস্ত্রিবিধ গতানুমন্।
ময়ি সর্বাত্মকে তুষ্টঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥

অবধূত উপনিষদে আছে : যেমন সূর্য সকল রস ভোগ করেও তদ্দ্বারা লিপ্ত হন না, অথবা অগ্নি সকল বস্তু ভক্ষণ অর্থাৎ দগ্ধ করেও তাদের দোষে লিপ্ত হন না, সেইরূপ জীবন্মুক্ত যোগী ব্যবহারকালে বিষয় ভোগ করলেও অবিদ্যাদোষ না থাকায় পুণ্য ও পাপে লিপ্ত হন না। পৈঙ্গল উপনিষৎ বলেন যে, মুক্ত পুরুষের বেদাধ্যয়ন নিষ্প্রয়োজন এবং তাঁর কোন কর্তব্যও থাকে না। ব্রহ্ম উপনিষদে আছে—যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন তিনি দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ হ'তে মুক্তিলাভ করেন। তাঁর নিকট দেবগণ যজ্ঞ, ঋষিগণ বেদাধ্যয়ন ও পিতৃগণ শ্রাদ্ধের আকাঙ্ক্ষা করেন না। যিনি জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান দ্বারা জীবাশ্রিত অজ্ঞানকে দূর করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত পরমহংস বা পরমাত্মা (হংস উপনিষৎ)।

অতঃপর নির্বাণে উপনিষদোক্ত জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ উল্লেখ ক'রে প্রবন্ধের উপসংহার করা যাচ্ছে। পরমহংস জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসী প্রপঞ্চবিহীন ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানময় আসনে সদা প্রতিষ্ঠিত। তাঁর ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত যে, ব্রহ্ম ভিন্ন সমুদয় প্রপঞ্চই মিথ্যা। ব্রহ্মরূপ অমৃতময়ী নদীর পীযূষময় তরঙ্গে তিনি সদা নিমগ্ন। তিনি সংশয়শূন্য ঋষি। সর্বভূতে করুণাই তাঁর ক্রীড়া। ব্রহ্মানন্দধারাই তাঁর মালা, তিনি সদা ব্রহ্মানন্দে পরিতৃপ্ত। হংসরূপ পরমাত্মা সকল

প্রাপ্তিতে অবস্থিত ইহাই তাঁর স্থির ধারণা। প্রপঞ্চের শূন্যতা ও পরমাত্মার সত্যতাই তাঁর মত। কুলকুণ্ডলিনীশক্তি প্রভাবে তিনি মুক্ত। অবিদ্যা-নাশ প্রাপ্ত হওয়ায় জীবিত অবস্থায়ও তিনি সদামুক্ত ব্রহ্মরূপে অবস্থিত। পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্যরূপ সমাধি তাঁর নিদ্রা। ইহার অর্থ এই যে গাঢ় নিদ্রাকালে যেমন জীবের বিষয় অনুভব হয় না, আত্মার একত্ববশতঃ তাঁরও বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকে না। স্বপ্নে বা মেঘমালাতে দৃষ্ট পুষ্পমালার ন্যায় এই জগৎ যে অনিত্য এই জ্ঞানে তিনি সুপ্রতিষ্ঠ। দেহ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি অবিদ্যাকল্পিত গুণের পরিণাম; উহা রজ্জুতে সর্পতুল্য মিথ্যা ও অপারমার্থিক ইহাই তাঁর জ্ঞান। নিবৃত্তিই তাঁর পথ। পরমাত্মার সত্তাতে সিদ্ধিলাভই তাঁর মঠ বা আবাসস্থান। নিত্য ব্রহ্মপদই তাঁর স্বরূপ। অজপা হংসমন্ত্র তাঁর সংসারত্রাণকারক গায়ত্রী। অদ্বৈতবুদ্ধিই তাঁর কাঁথা, আত্মজ্ঞানই তাঁর ভিক্ষান্ন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্বজ্ঞান তাঁর পরম আস্বাদ্য বিষয়। স্বেচ্ছাচার তাঁর স্বভাব। ইহার অর্থ এই যে—তিনি কোন বিধিনিষেধের অধীন নন। তুরীয় শিবই তাঁর যজ্ঞোপবীত। আত্মচৈতন্যের সহিত তন্ময়তাই তাঁর শিখা। তাঁর পক্ষে বাহ্য শিখাসূত্র সম্পূর্ণরূপে অপ্রয়োজনীয়। দৃঢ়তাই তাঁর কৌপীন। পরব্রহ্ম স্বরূপই তাঁর মোক্ষ।

ইহা অপেক্ষা উন্নততর অবস্থা মানব-কল্পনার অতীত। করুণাময় শ্রীগুরুর প্রসাদে এরূপ অবস্থা-লাভও সম্ভব হয়।

আশার গান

শ্রীজীপালী বসু

জীবন-মুকুল ফুটবে ওরে ফুটবে।
ব্যর্থতার মনোব্যথা নিভে-আসা দীপের মত
কেন রে তোর জ্বলবে?
জীবন-মুকুল ফুটবে রে তোর ফুটবে।
জীবনটা এক মিথ্যা মায়া, মরীচিকার মিথ্যা ছায়া
গাইবি কেন নিরাশবাণী
সুদিন রে তোর আসবে;
না-পাবারও প্রবল ব্যথা, না-পাবারও অক্ষমতা
ঘুচবে যেদিন শক্তি রে তোর
কিরবে আবার জাগবে।
নিশালোকে হাসিমুখে ফুলের সুবাস লয়ে বুকে
জাগবি যেদিন, এ ধরণী
সরবে তোর হাসবে।
সফলতার বিজয়-ভেরী একদা ঠিক বাজবে।
বিশ্বজয়ের শক্তি আছে, চিত্তে সে ঘুমায়—
সোনার কাঠির স্পর্শ নিয়ে জাগিয়ে তোল্ তায়;
ধৈর্য রাখিস হৃদিমাঝে, নিষ্ঠা দে'রে ছোট কাজে
তবে, ঝড়ের শেষে বৃষ্টিধোওয়া
মিষ্টি আলোক হাসবে
সফলতার বিজয়-ভেরী বাজবে তখন বাজবে।

যোগ-দর্শন

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, বি. এল., বিদ্যাবিনোদ

যোগদর্শনের আর একটি নাম বা অভিধা—পাতঞ্জল দর্শন, কারণ পতঞ্জলি মুনি ইহা প্রবর্তন করেন। ইহাকে যোগশাস্ত্রও বলা হইয়া থাকে। পাতঞ্জল মতে, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। অজ্ঞানবশতঃ সংসারে প্রবৃত্ত হইয়া আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি বোধ হইতে থাকে। 'আমি কর্তা' এরূপ জ্ঞানও অসাধারণ বা অবিদ্যমান নহে। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে অজ্ঞান রহিত হইয়া যায়, কেবল চিন্ময় স্বরূপ বিদ্যমান থাকে।

'পুরুষ জড়-জগৎ হইতে পৃথক' এই জ্ঞান মূলতঃ তত্ত্বজ্ঞান। জীবের আত্মা আছে, চৈতন্য আছে, জড়ের নাই। জীব এ কারণ জড় হইতে পৃথক। জীব-জগৎ ও জড়-জগৎ যে পৃথক তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। সূক্ষ্মদৃষ্টি দ্বারা, অনুভূতি ও বিচার বোধ দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, পুরুষ বা জীবাত্মা জড়ময় জগৎ হইতে ভিন্ন বা অনমান। জড় প্রাণহীন বলিয়া জানা যায়, জীবের সত্তা আছে। লোষ্ট্র, প্রস্তর, লৌহ, তাম্র, ইষ্টকখণ্ড প্রভৃতি অচেতন পদার্থ, কঠিন তরল বায়ব অবস্থায়—প্রকৃতি ভেদেও ইহারা নিত্য জড়। সাধারণতঃ আপাতদৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে প্রাণ, শক্তি, চেতনা সত্তা প্রভৃতি নাই। উচ্চ মানে, গভীরতম দৃষ্টিতে, বিজ্ঞতম দর্শনে, উচ্চতম বিজ্ঞানে সকলই যদি শক্তিমান, প্রাণময় হয় হউক। চর্মচক্ষুতে, সাধারণ বুদ্ধি ধারণাও প্রজ্ঞা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, জড় পদার্থ প্রাণহীন, নির্জীব। এই প্রকার জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। কেহ কেহ ইহাকে বিবেকখ্যাতি আখ্যা দিয়াছে। সে যাহা হউক, স্ফটিক যেমন স্বভাবতঃ শুভ্রতা গুণ লাভ করিয়াছে, জীব বা প্রাণী তদ্রূপ চিন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। জীব যে স্বাভাবিক রূপে চিন্ময়মাত্র, তাহা প্রতিভাত হইবে অজ্ঞান-যবনিকা অন্তর্হিত হইলে।

উল্লিখিত তত্ত্বজ্ঞান-সূর্য মানসিক আকাশে উদিত হইলে, অজ্ঞান-অন্ধকার তিরোহিত হইবে, তখনই কেবল ঐ চিন্ময়স্বরূপ বিদ্যমান থাকিবে। ইহাই কৈবল্য এবং মুক্তি নামে অভিহিত। যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান অধিগত হইয়াছে, তিনি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন তাঁহার এইরূপ বোধ হইতে থাকে—"আমি যাহা কিছু জানিবার জানিয়াছি, আমার সমুদয় ক্লেশ অন্তর্হিত হইয়াছে, সর্বপ্রকার দুঃখ অনিষ্ট তিরোহিত বা বিনষ্ট হইয়াছে। আমার বুদ্ধির গুণাবলী চরিতার্থ হইল, আমার তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন ও সমাধি সুসম্পন্ন হইল—আমার প্রকৃত স্বরূপ এতদিন এক্ষণে প্রকাশ পাইয়াছে।"

ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন, অনুভূতি-পরায়ণ পতঞ্জলি মুনি বিশ্বরচয়িতা সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের সত্তা স্বীকারপূর্বক উহা উপলব্ধি করিয়া যোগশাস্ত্র প্রবর্তন করেন। তাঁহার মতে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও বিশ্বসৃষ্টিপ্রণেতা বা নির্মাতা হইলেও তিনি বিশ্বাতীত। পতঞ্জলি মহর্ষির যোগশাস্ত্র বা যোগদর্শন প্রবর্তনের উদ্দেশ্য মনুষ্য-জাতির পরিত্রাণ-সাধন। এই সকল কারণে যোগদর্শন বা পাতঞ্জলদর্শন ঈশ্বরবাদী বা সেশ্বর এবং সাংখ্যদর্শন বা কপিলদর্শন নিরীশ্বরবাদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

দর্শন হিসাবে সাংখ্যদর্শনের সহিত পাতঞ্জল দর্শনের বহু বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। কপিল মুনির সাংখ্যদর্শনে পঞ্চবিংশতি মূল তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, যথা পুরুষ প্রভৃতি। পতঞ্জলির শাস্ত্র এ ক্ষেত্রে অবিকল, তবে একটি প্রভেদ দৃষ্ট হইবে যে, কপিল মুনি

ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। পাতঞ্জল শাস্ত্রে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের স্বীকৃতি আছে, ঈশ্বর লইয়া ষড়্‌বিংশতি। জগৎ-কারণ শ্রীভগবান, পতঞ্জলি মুনির বিশ্লেষণ ও অনুভূতিতে স্বেচ্ছানুসারে শরীর ধারণ করিয়া জগৎ নির্মাণ করিয়াছেন। এই ব্যাপার লইয়া বিচার করিলে যোগদর্শন প্রণেতাকে সাকার-বাদীও বলা যাইতে পারে। যুগে যুগে ভগবান ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়া সৃষ্টিকার্য সাধন করিয়াছেন। দশাবতারের পরিকল্পনা অবিস্মরণীয়। "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" [গীতা ৪-৮।]

তত্ত্ব কথা

ষড়্‌বিংশক্ত পরমেশ্বরঃ। সেই পুরুষ ক্লেশ-কর্ম-বিপাক-আশয়-বর্জিত। তবে বিশ্ব রচনার্থ স্বেচ্ছানুসারে শরীর ধারণপূর্বক বৈদিক ও লৌকিক সম্প্রদায় প্রবর্তিত করেন। তিনি সংসারানলে দহ্যমান প্রাণিগণের উদ্ধারার্থ বা কল্যাণ মানসে তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের পর ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব, তিনি আদি ও মূল কারণ। পরমেশ্বর বিশেষরূপে সগুণ, তিনি দয়াময়, কৃপাদানে তৎপর।

মানব প্রবৃত্তি-নিচয় এবং নানাপ্রকার চিত্তবৃত্তি ও উহার ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নির্ধারিত আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,—দর্শনের বিষয় রূপ, শ্রবণের বিষয় শব্দ, রসনার বিষয় রস বা আস্বাদ ঘ্রাণের বিষয় গন্ধ, ত্বক বা স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয় স্পর্শ বলিতে পারা যায়। অন্তঃকরণকে ঐ সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া পরমেশ্বরাদি ধ্যেয় বস্তুকে সংস্থাপন করিতে পারিলে যোগসাধনা হয়—ঐভাবে তন্মাত্র ধ্যান করাকে যোগ বলে। যম, নিয়মাদি অষ্ট যৌগিক অঙ্গ প্রশস্ত।

পাতঞ্জলদর্শন বা যোগদর্শন মতে ক্লেশ পাঁচ প্রকার, যেমন—(১) অনিত্যে নিত্যবস্তু জ্ঞান, স্থায়ী বা স্থিতিশীল ভাবিয়া অস্থায়ী বস্তুতে আকৃষ্ট বা মুগ্ধ হওয়া, অনিত্য বিষয়ের অনুশীলন, উপভোগ বা প্রাপ্তি প্রচেষ্টায় নিযুক্ত থাকা। দুঃখে সুখ-বোধ ইত্যাদি ভ্রম। দুঃখ যাহার পরিণাম তদ্বিষয়ে উপরতি, আগ্রহ বা আশ্রয় লাভ কিংবা আশ্রয়জনিত আপাততুষ্টি। পরম পুরুষ এই প্রকার ক্লেশ-বিবর্জিত। ক্লেশ আরও চারি প্রকার দৃষ্ট হয়, যেমন—(২) 'আমি দেহাদির তুল্য বা স্বরূপ' এইরূপ জ্ঞান। আমাকে দেহাদির স্বরূপ বোধ করিলে পরিণামে ক্লেশ অনুভব করিতে হয়। এই বোধই দুঃখ বা ক্লেশের কারণ। 'আমি' আত্ম-প্রধান, দেহ-প্রধান বা অনিত্য জড়প্রধান নহে, আত্মা অবিনশ্বর, দেহ বিনাশী অতএব অবিনাশী আত্মাকে—আমাকে দেহ বলিয়া ভ্রম করিলে ক্লেশ অনিবার্য।

তৃতীয় প্রকার ক্লেশ—রাগ, অনুরাগ, ক্লেশ উৎপাদক। অনুরাগী পুরুষ অনুরক্তের প্রতি তুষ্ট, আকৃষ্ট, সমবেদনপর। তাহার দুঃখে, কষ্টে, ক্ষতি বা অনুপস্থিতিতে ক্লেশ অনুভব করিতে হয়, বিরহ সকল সময়ে পীড়াদায়ক, মিলন শান্তি-প্রীতি উৎপন্ন করে।

চতুর্থ প্রকার ক্লেশ—দ্বেষ। দ্বেষ অপ্রেমপ্রসূত, দ্বেষ-হিংসা ভালবাসার অভাবজনিত ভাবলক্ষণ। এই দ্বেষ হইতে মন ভারাক্রান্ত হয়, ইহা যে মানসিক অশান্তি আনয়ন করে তাহা ক্লেশদায়ক, পরের ভাল দেখিলে মনে যেথায় বিষাদের ছায়া পড়ে, সেথায় অন্তর দ্বেষে পরিপূর্ণ বুঝিতে হইবে। সংসারের যাবতীয় কলহ-বিবাদ দ্বেষ-সঞ্জাত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে কৌরবদের হৃদয় হিংসাবিষে জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বেষ-তাপে উত্তপ্ত অন্তর অশান্তি সৃষ্টি করিবে, যাহা ক্লেশপ্রদ।

পঞ্চম ক্লেশ—মরণত্রাস। মৃত্যুভয় তিলে তিলে মনুষ্যকে ক্ষয় করে। এই সুন্দর জগৎ, পরিচিত আশ্রয়, মনোরম গৃহ, স্নেহের আত্মীয় পরিজন পরিত্যাগ করনা ক্লেশ উৎপাদন করে। আসক্তিজনিত দেহ-মায়া-মমতা-প্রেম পরিশেষে

আনিবে ক্লেশ, যখন মৃত্যুভয় গ্রাস করিয়া থাকে। মরণত্রাস সকল সময়ে যে অন্তর দগ্ধ করে তাহার মূলে আত্মীয়-বিয়োগ চিন্তা। স্বজনমৃত্যু মরণ-ভয় উৎপাদন করে। পরের বা স্বকীয় মৃত্যুভয় অহর্নিশ প্রাণে বলক্ষয় করিয়া থাকে। শরীর-মন তাহাতে ভাঙ্গিয়া যায়। মরণত্রাস ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আপসা করিয়া দেয়, আশা-আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম-আনন্দ তাহাতে লোপ পায়। মনের ও শরীরের যৌবন মরণভয়ে শুকাইয়া যায়, ইহা নিঃসন্দেহ; তাহার ফলে প্রতিনিয়ত সংসার বিস্বাদ হইয়া পড়ে, এই চিন্তা সর্বদা ক্লেশ উৎপাদন করে।

পরম পুরুষ উক্ত প্রকার ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় বর্জিত। কর্মফলে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়—হিন্দুশাস্ত্র ও বৌদ্ধদর্শনে ইহার সমর্থন আছে। কর্মফলে পাপ পুণ্য ভোগ করিতে হয়, এই সিদ্ধান্তও ঐ দুই দর্শন অনুমোদিত। পরম পুরুষ সনাতন শাশ্বত, জন্ম-মৃত্যুর অতীত, পাপ পুণ্যের অতীত, তিনি অনাসক্ত, নির্বিকার, অক্ষর-অব্যয়। পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি পুণ্যের কেন্দ্র, পুণ্যগ্রস্থ অথচ পাপ-পুণ্য দ্বৈতভাব বিবর্জিত অথবা উহার বহু উর্ধ্বে বিরাজিত। তিনি সকল ক্রিয়া-কর্মের মূল উৎস—আদি কারণ এই হেতু যে, তিনি শক্তির উৎস, হেতুমূল, শক্তি ভিন্ন কর্ম করিবে কে? তিনি কর্ম করান—স্বয়ং কর্ম দ্বারা আসক্ত, লিপ্ত, প্রভাবান্বিত হন না।

পূর্বে কথিত বিপাক অর্থে বুঝায়—জন্ম, আয়ু, সুখ-দুঃখভোগরূপ কর্মফল। এই বিপাকে জন্মান্তর রহস্য নিহিত। বৌদ্ধদর্শনেও জন্মচক্র প্রবর্তন কথা লিখিত আছে। পরজন্মে মানব ভিন্ন দেহধারী হইয়া ফিরিয়া আসে, আত্মা পশু-পক্ষী প্রভৃতি, প্রাণীদেহ মধ্যেও গমন করিয়া থাকে ইত্যাদি। কর্মবিপাকে মানব ভিন্ন ভিন্ন রূপে ফল ভোগ করে, জন্ম বিপাকে বহুতর বৎসর কাটিয়া যায়, তাহার পর আত্মার মুক্তি হয়। জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়—কর্মক্ষয় হইলে, ভোগ রহিত হইলে। এই সকল সংঘটন পাপ-পুণ্য বিচার ফলে ঘটিয়া থাকে। সুখ-দুঃখভোগরূপ কর্মফলে আয়ুকাল নির্ধারিত হয়; পরজন্ম গ্রহণও নির্দিষ্ট হয়; এই সীমায়িত নির্দিষ্ট পন্থা বা প্রথা জন্মান্তর প্রবর্তন। এই প্রথার পরিসমাপ্তিতে আত্মার উদ্ধার, জীবাত্মার মুক্তি।

পরম পুরুষ পরমেশ্বর বিপাক বর্জিত, আশয় বর্জিতও বটে। আশয় অর্থে কর্মজনিত বাসনা নামক সংস্কার বিশেষ। এই সংস্কার জন্ম মাঝারে অবস্থিতি করে। ইহা হইতে কর্মফলের উৎপত্তি হয়। বাসনা ও প্রবৃত্তি হইতে যে কর্মফল সঞ্জাত হয়, বাসনা যে কর্মসমূহের মূল, এ বিষয়ে হিন্দু-দর্শন ও বৌদ্ধ-দর্শন একমত। বাসনা-বিবর্জিত হইবার নির্দেশ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে। আধুনিক কবি রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন:

'বাসনায় দাও আগুন জ্বেলে ক্ষার হবে তার পরিপাটি,
কর মনকে ধোলাই, আশা বালাই মনের ময়লা
যাবে কাটি।'

যোগের অঙ্গ প্রধানতঃ অষ্টবিধ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। শরীর বিশুদ্ধ না হইলে হঠযোগ সাধনের উপযুক্ত হয় না। এই হঠযোগের সাত প্রকার সাধনবিধি আছে, যেমন—শোধন, দৃঢ়তা, স্থৈর্য, ধৈর্য, লাঘব, প্রত্যক্ষ ও নির্লিপ্ততা। ষট্‌কর্ম দ্বারা শরীর শোধন, আসন সিদ্ধি দ্বারা দৈহিক দৃঢ়তা, মুদ্রার দ্বারা স্থিরতা, প্রত্যাহারে ধৈর্য, প্রাণায়ামে শরীরের লাঘব, ধ্যানধারণায় শ্রীভগবানের শক্তির প্রত্যক্ষ অনুভূতি, সমাধির দ্বারা নির্লিপ্ততা লাভ হয়।

পতঞ্জলি মুনির যোগসূত্রে যোগশাস্ত্রের পূর্ণ আলোচনা আছে। পাতঞ্জল ভাষ্য বেদব্যাস মুনি বিরচিত বলিয়া প্রচলিত আছে, ঐ গ্রন্থেও যোগ-তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা পরিদৃষ্ট হইবে। ভোজরাজ

রণরঙ্গ মল্ল প্রণীত রাজমার্তণ্ড নামক গ্রন্থে যোগশাস্ত্র বিবেচিত হইয়াছে। নাগোজীভট্ট বিরচিত পাতঞ্জল সূত্রবৃত্তি পুস্তকে ও যোগশাস্ত্রে এই দর্শনের মত বিচারিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন বিজ্ঞান-ভিক্ষুর যোগ-বার্তিক এই দর্শনের তথ্য পরিপূর্ণ।

মহাপণ্ডিত পতঞ্জলি মুনি পাণিনি ব্যাকরণের "মহাভাষ্য"ও প্রণয়ন করেন, শুনা যায় ইহা ফণিভাষ্য নামেও পরিচিত।

ষড়্‌গুরু-শিষ্য কাত্যায়নকৃত অনুক্রমণিকার ভাষ্যে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যাহার অর্থাৎ পাণিনির প্রণীত বাক্যসমূহ ভগবান পতঞ্জলি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং যোগাচার্য, তিনি নিদান ও যোগশাস্ত্রের প্রণেতা বলিয়া খ্যাত।

ইহা নিশ্চিত যে, ষট্‌কর্মকাহিনী ব্যক্ত না করিলে যোগদর্শনের বা যোগাভ্যাসের কথা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। ষট্‌কর্মের দ্বারা দৌতি সিদ্ধি হইলে প্রাণায়াম করা যাইতে পারে। ষট্‌কর্মের ছয়টা বিশেষ অঙ্গ আছে, যেমন দৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী, ত্রাটক, কপালভাতি—এই সকল অভ্যাস দ্বারা দেহ চৈতন্য সম্পন্ন অর্জন হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত প্রকারে ষট্‌কর্ম বলে দৌতি সিদ্ধি হইলে প্রাণায়াম অভ্যাস করা যাইতে পারে, তাহার পর ধ্যানের অভ্যাস, তাহার পর সমাধি। দেহ-শুদ্ধির পরবর্তী কর্ম—আসন অভ্যাস, আসন সিদ্ধির পরবর্তী কর্ম—মুদ্রা অভ্যাস। আসন-সিদ্ধি সম্পূর্ণ হইলে পর মুদ্রাভ্যাস সহজ ও সুগম হইয়া উঠে।

গীতার নবম অধ্যায়ে রাজযোগে প্রোক্ত শ্লোকটির বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। শ্রীভগবানকে অর্থাৎ আমাকে আত্মভাবে চিন্তা করিয়া যে সন্ন্যাসীকুল আমার ধ্যান করেন, সেই নিত্য সমাহিত ব্যক্তিদের যোগ ও ক্ষেম আমি বহন করিয়া থাকি। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি সাধারণ অর্থে যোগ এবং প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণের নাম সাধারণের নিকট ক্ষেম। শ্রীধর স্বামী কিন্তু ব্যাখ্যা করিয়াছেন মুক্তি অর্থে। এই শেষোক্ত অর্থ অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যোগ সাধনের দ্বারা ভগবৎ-কৃপা লাভ করা যায়। ধ্যান ধারণা, চিন্তা, যোগাভ্যাস দ্বারা মুক্তির পথ সহজ হইয়া উঠে, অনন্যমনা হইয়া ঈশ্বরের অনুধ্যান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশ। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন বা যোগ সাধনার আদর্শ হিন্দুশাস্ত্রে ও ধর্মগ্রন্থে ওতঃ-প্রোতভাবে মিশ্রিত। পরমাত্মার অনুভূতি পরমাত্মার স্পর্শ, তাঁহার সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের উপলব্ধি বা যোগ স্থাপনার প্রচেষ্টা যোগ সাধনার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশবিশেষ বা উহা হইতে অভিন্ন, এই ধারণা মুক্তি লাভের সোপান।

যোগের উপকারিতা

মহামনা পতঞ্জলি মুনির মতে মন্ত্রের অর্থ-ভাবনাই জপ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন, মনসা সুলক্ষ্য উচ্চারো জপঃ। নির্দিষ্ট মনে জপ সাধনায় প্রায়ই যোগ সাধনের কার্য নির্বাহ হয়।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, কর্মফলের আশা না করিয়া যিনি কর্তব্য, নিত্যকর্ম করেন, তিনিও সন্ন্যাসী, তিনিও যোগী। অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত্র ও তপোদানাদি স্মার্ত কার্য যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেবল তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী নহেন। শাস্ত্র তাহাকে সকল কর্ম ও ফল ত্যাগরূপ সন্ন্যাস বলেন, সেই নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান-যোগও সন্ন্যাসপদবাচ্য। এই প্রকার কর্মফল-ত্যাগী ব্যক্তি যখন যোগারূঢ় হন তখন কর্মসকল হইতে নিবৃত্তিই তাঁহার যোগারূঢ়ত্বের সাধন। তিনি যেমন কার্য হইতে উপরত হন তাঁহার চিত্ত সেইভাবে সমাহিত হয় এবং তিনি শীঘ্র যোগারূঢ় হন। সর্ব-সংকল্পত্যাগী ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় ও নিত্যকর্মে অনাসক্ত ব্যক্তিই যোগারূঢ়। বিবেকযুক্ত মন আপনাকে যোগারূঢ় করিবে, সংসার-বন্ধন হইতে উদ্ধার করিবে, বিষয়াধীন করিবে না। বিশুদ্ধ মন

মানবের প্রকৃত হিতকারী বন্ধু, মুক্তির হেতু; বিষয়াসক্ত মন মানব-শত্রু, বন্ধন হেতু। জিতেন্দ্রিয় ও প্রশান্ত যোগাঙ্গ ব্যক্তির সাক্ষাৎ আত্মভাবে ব্রহ্ম পরমাত্মা বিদ্যমান থাকেন; এইরূপ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি শীতাতপ, সুখ-দুঃখ, সম্মানে-অপমানে অবিচলিত। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে তৃপ্তাত্মা, নির্বিকার, সমদর্শী, লোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনে সমজ্ঞানী। যিনি অরিমিত্রে উদাসীন, আচারী-পাপীতে সমবুদ্ধিপরায়ণ তিনিই যোগী—তিনি নির্জন স্থানে নিরাকাঙ্ক্ষ ও সংযমী হইয়া অন্তর সর্বদা সমাহিত করিবেন।

যোগী সাধনা উদ্দেশ্যে শুদ্ধস্থানে, যথাক্রমে কুশ, মৃগচর্ম ও বস্ত্র দ্বারা রচিত নাতি-উচ্চ নাতি-নিম্ন স্বীয় আসন স্থিরভাবে স্থাপন করিবেন। বাহ্য এবং অন্তরের কার্য সংযম দ্বারা চিত্তশুদ্ধির জন্য একাগ্র মনে যোগাভ্যাস করিবেন, মেরুদণ্ড, গ্রীবা, মস্তক সরল ও নিশ্চল থাকিবে, প্রশান্ত চিত্ত, নির্ভয়, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ও গুরুসেবাব্রতী মনস্তচিত্ত ও মৎপরায়ণ যোগী সদা সংযতভাবে মন সমাহিত করিলে, আমার স্বরূপভূত "নির্বাণ পরমাং শান্তিম্" প্রাপ্ত হন।

সাংখ্যদর্শনে সৃষ্টি ও মোক্ষ

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

সাংখ্যদর্শন প্রণেতা মুনিপ্রবর কপিল ছিলেন সৎকার্যবাদী। তাঁর মতে উৎপত্তির পূর্বে কার্য অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যসকল স্ব স্ব কারণে সূক্ষ্মরূপে বর্তমান থাকে। যা অসৎ অর্থাৎ অস্তিত্বশূন্য তা সর্বথাই অসৎ। যে বস্তু কোনদিনই ছিল না, কিরূপে তাকে উৎপন্ন করা যেতে পারে? "সতঃ সজ্জায়ত এব"—সদ্বস্তু থেকে সদ্বস্তুই উৎপন্ন হয়। যা উৎপন্ন হয়, তা উৎপন্ন হবার পূর্বেও ছিল—'কারণ' দ্রব্যে। ইহাই সাংখ্যের সৎকার্যবাদ। যাতে যা নাই বা থাকে না, তা থেকে তা কদাচ সৃষ্ট হয় না। অসংখ্য উপায় অবলম্বন করলেও কেহ নীলকে পীত করতে পারে না, বালুকা থেকে কেহ তৈল বার করতে পারে না; সুতরাং যে কার্য যে উপাদানে শক্তিরূপে নিহিত থাকে, সে কার্য সেই উপাদান থেকে উৎপন্ন হয়, অন্য কিছু হয় না। সুতরাং কার্যকেই 'সৎ' বলতে হয়। শক্তিসম্বন্ধযুক্ত কারণই কার্য উৎপন্ন করতে পারে। অস্তিত্বশূন্য কার্যের সঙ্গে শক্তিসম্বন্ধ সম্ভবপর নয়। কার্য ও কারণ আবার ভিন্ন নয়, তারা বস্তুতঃ একই। সুতরাং কারণের বর্তমানে কার্যের বর্তমানতা অবশ্যম্ভাবী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এর প্রমাণ পাই: "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ॥" অর্থাৎ অসৎ বস্তুর উৎপত্তি নাই, অসৎ থেকে ভাব বা সদ্বস্তুর উৎপত্তি অসম্ভব। 'সৎ' বস্তুর অভাব নাই সদ্বস্তু সব সময়েই 'সৎ' অর্থাৎ বিদ্যমান।

'নাসদুৎপদ্যতে ন চ সদ্বিনশ্যতি'—ইহাই সাংখ্যের সিদ্ধান্ত। কোন বস্তুরই বিনাশ নাই। স্থূল বস্তুর সূক্ষ্মরূপে 'কারণ' শরীরে প্রবেশই বস্তুর নাশ, আর সূক্ষ্মের স্থূলরূপে প্রকাশই বস্তুর উৎপত্তি। উৎপত্তির অপর নাম আবির্ভাব ও নাশের অপর নাম তিরোভাব। আবির্ভাবের পূর্বে কার্য ও কারণের পরস্পর সম্বন্ধ না থাকলে, কার্যের উৎপত্তির পূর্বে কেহই কার্যের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ'ত না। ঘট প্রস্তুত করতে হলে মাটির আবশ্যক ও পট তৈরী করবার জন্য তন্তুর আবশ্যক।

অসম্বন্ধ বস্তু থেকে কার্য উৎপন্ন হলে, তন্তু থেকে 'পট' উৎপন্ন না হয়ে 'ঘট' উৎপন্ন হ'ত এবং মৃত্তিকা থেকে 'পট' উৎপন্ন হ'ত। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে কার্য ও কারণে' বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই। কার্য ও কারণ—ঘট ও মৃত্তিকা, স্বর্ণ ও বলয়—একই পদার্থ, ভিন্ন নয়। উৎপত্তির পূর্বে 'ঘট' মৃত্তিকাতে সূক্ষ্মরূপে ছিল; বলয়ও স্বর্ণে সূক্ষ্মরূপে বর্তমান ছিল; সুতরাং কার্য 'সৎ' বাসদুৎপদ্যতে?

সাংখ্যমতে কারণ দুই প্রকার: নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ। কারণ শব্দের সাধারণ অর্থ এই যে, "যেন বিনা যৎ ন ভবতি তৎ তস্য কারণম্।" —অর্থাৎ যাহা বিনা যাহা আত্মলাভ করে না, সে তার কারণ। এই লক্ষণ অনুসারে নানা পদার্থ 'কারণ' সংজ্ঞা পেতে পারে সত্য, তার মধ্যে কতকগুলি কর্তা, কর্ম, করণ, অধিকরণ ও সম্প্রদান প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ এবং অন্য একটির নাম হচ্ছে—অপাদান। এই অপাদানই সাংখ্য ভাষায় উপাদান ও ন্যায়ের ভাষায় সমবায়ী নামে কথিত। অবশ্য প্রভেদ কিছু আছে বটে। উপাদান-কারণের সহিত নিমিত্ত-কারণের পার্থক্য এই যে, প্রত্যেক উৎপন্ন কার্যে উপাদানের অনুবর্তন আছে, কিন্তু নিমিত্তের অনুবর্তন থাকে না। যেমন ঘটের উপাদান মৃত্তিকা এবং নিমিত্ত দণ্ড, চক্র, সলিল, সূত্র প্রভৃতি। ঘটে মৃত্তিকা থাকে, কিন্তু নিমিত্তকারণের কোন সংস্রব থাকে না। নিমিত্তকারণ কেবল সম্বন্ধ দ্বারা কার্য জন্মায়। কল কথা—কারণে যে কার্যশক্তি থাকে, তা থাকে উপাদান-কারণে, নিমিত্ত-কারণে নয়। সাংখ্যমতে জগতের উপাদান প্রকৃতি। প্রকৃতিতে এই জগৎব্রহ্মাণ্ড বীজরূপে বর্তমান ছিল বলে এই বিচিত্র বিশ্বের উৎপত্তি সম্ভব হয়েছে। সাংখ্য শাস্ত্রে চার প্রকার পদার্থ দেখতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথম হচ্ছে মূলা প্রকৃতি। ইনি মৌলিকভাব পরিত্যাগ করেন না; অথচ ইনি সকল পদার্থের উপাদানকারণ। ইহার উৎপত্তি-বিনাশ নাই, আবির্ভাব-তিরোভাবও নাই—ইনি নিত্য ও ব্যাপক। সাংখ্যাচার্যগণ ইহাকে প্রধান, অব্যক্ত, ব্রহ্মমায়া প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ব্যবহার ক'রে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ মহাতত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব ও রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দাত্মক সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্র। এই সাতটিকে প্রকৃতি-বিকৃতি বলা হয়; কারণ ইহারা কার্য ও কারণ উভয় ভাবই প্রাপ্ত হয়; যেমন মহত্তত্ত্ব, অহংকারতত্ত্বের কারণ ও প্রকৃতির কার্য; অহংকারতত্ত্ব পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের উপাদান-কারণ ও মহত্তত্ত্বের কার্য, এবং পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ-মহাভূতের কারণ ও অহংকারতত্ত্বের কার্য। তৃতীয়তঃ ১৬টি, বিকার যথা—মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত। এই ১৬টি পদার্থ কেবল বিকারপ্রাপ্ত হয়, ইহারা কারও প্রকৃতি নহে। পঞ্চমহাভূত পঞ্চতন্মাত্রের কার্য ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহংকারের কার্য। স্থূল পঞ্চভূত ঘট, পট, মঠ প্রভৃতি দৃশ্য পদার্থ সকলের কারণ হ'লেও উহারা পঞ্চভূত থেকে ভিন্ন নয়। এখন দেখা যাক্ পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় বলতে আমরা কি বুঝি? রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই পাঁচটি সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্র। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন—সর্বশুদ্ধ এই একাদশ ইন্দ্রিয়। চক্ষুর কার্য দর্শন, ত্বকের কার্য স্পর্শন, কর্ণ শব্দ গ্রহণ করে, নাসিকা গন্ধ গ্রহণ করে এবং জিহ্বার কাজ রসাস্বাদন, এইগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য। তদনুরূপ, বাক্য দ্বারা শব্দোচ্চারণ, পাণি দ্বারা গ্রহণ, পদদ্বারা গমন, পায়ুদ্বারা মলাদির ত্যাগ ও উপস্থ দ্বারা আনন্দ উপভোগ—এইগুলি কর্মেন্দ্রিয়ের কার্য। মহাত্মা কপিলের মতে মন উভয়াত্মক, "উভয়াত্মকং মনঃ"—কর্মেন্দ্রিয় বটে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বটে, তবে মন বুদ্ধি থেকে ভিন্ন। কিন্তু ভিন্ন হলেও অভিমানাত্মিকা বুদ্ধির সহিত ইহার সম্পূর্ণ যোগ বা অংশাংশি ভাব আছে। মন, বুদ্ধি

ও অহঙ্কার এই তিনটি অন্তঃকরণ নামে প্রসিদ্ধ। চতুর্থতঃ পুরুষ। ইনি কাহারও কার্য নহেন এবং কারণও নহেন; সুতরাং কাহারও প্রকৃতিও নহেন ও বিকৃতিও নহেন। এই পুরুষ—অনন্ত, কূটস্থ (অপরিণামী নিত্য) চেতন। প্রকৃতি থেকে মহত্তত্ত্ব পর্যন্ত সকলই অচেতন। ইহারা পুরুষের সন্নিধান-বশতঃ চেতন পদার্থ বলে মনে হয় এবং উদাসীন পুরুষ অকর্তা ও নির্লিপ্ত হলেও প্রকৃতির সন্নিধান-বশতঃ কর্তার ন্যায় হয়। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিই কর্ত্রী ও পুরুষ ভোক্তা, পুরুষের ভোগসাধনের জন্য প্রকৃতি কার্য ক'রে থাকে। যে কার্য করে, তারই বন্ধ ও মুক্তি সম্ভব; বস্তুতঃ বন্ধ ও মুক্তি প্রকৃতির ধর্ম হলেও পুরুষেই অধ্যারোপিত বন্ধ ও মুক্তিরূপ ধর্ম আছে; সুতরাং পুরুষেরই বন্ধ ও পুরুষেরই মুক্তি বলা হয়।

সৃষ্টিকালে পুরুষ কি প্রকৃতি কেহ কাহাকে ছেড়ে থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ পঙ্গু ও অন্ধের ন্যায় কার্যকালে ইহাদের সংযোগ হয়ে থাকে। পঙ্গুর দেখবার শক্তি আছে, কিন্তু সে নিজে চলতে পারে না; অন্ধের গতিশক্তি আছে, কিন্তু সে দেখতে পায় না। এখানেও পুরুষ যেন পঙ্গু এবং প্রকৃতি অন্ধ। পুরুষ ক্রিয়াশক্তিহীন এবং প্রকৃতি দর্শন-শক্তিহীন: অন্ধ যেরূপ পঙ্গুকে স্কন্ধে নিয়ে পঙ্গু-নির্দিষ্ট পথে অনায়াসে চলতে পারে, প্রকৃতিও সেরূপ পুরুষকে স্কন্ধে চাপিয়ে কার্য করতে সমর্থ হয়। তাই সাংখ্যাচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় বলেছেন:

'প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহংকারস্তস্মাদ্গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি॥'

অর্থাৎ চেতন পুরুষ অচেতন প্রধানে আরোহণ (আলিঙ্গন) করায় মহত্তত্ত্বাদি জন্মে; যেমন প্রকৃতি থেকে মহৎ, মহৎ থেকে অহঙ্কার, এবং অহঙ্কার থেকে ১৬ সংখ্যক (ইন্দ্রিয় ১১, তন্মাত্র ৫) তত্ত্ব জন্মে। এই ১৬ সংখ্যক তত্ত্বে অপরটি ৫ অর্থাৎ পঞ্চ তন্মাত্র থেকে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত জন্মেছে।

মহাত্মা কপিলের মতে আত্মা ও জগৎ উভয়ই বিচার্য। জগতের মূলতত্ত্ব চতুর্বিংশতি ও আত্মতত্ত্ব নিয়ে সমুদয়ে পঁচিশ তত্ত্ব। এ সম্বন্ধে ইতি-পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যকারিকায় "অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ" এই সূত্র দ্বারা অধ্যবসায়কে বুদ্ধি বলেছেন। অধ্যবসায় ('আমার ইহা কর্তব্য' এরূপ নির্ণয়) মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধির ধর্ম, এই বুদ্ধি জ্ঞান-পর্যায়ক নহে। মহত্তত্ত্ব ও বুদ্ধি একার্থক শব্দ। জ্ঞান, ঐশ্বর্য, বৈরাগ্য ও ধর্ম—এগুলি বুদ্ধির সাত্ত্বিক রূপ। ধর্ম বলতে কর্মের জন্য অদৃষ্ট, আর প্রকৃতি পুরুষের ভেদ-সাক্ষাৎকারকে জ্ঞান বলা হয়। বৈরাগ্য বলতে বিষয়ভোগে বিতৃষ্ণা এবং অনিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, মহিমা, প্রকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামবশায়িতা ভেদে ঐশ্বর্য আট প্রকার। অনিমা অর্থে স্থূলকে সূক্ষ্ম করে নেওয়া, লঘিমা—ভারী শরীরকে লঘু করে সূর্যকিরণ অবলম্বনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করা। প্রাপ্তি—অঙ্গুলি দ্বারা চন্দ্রমণ্ডল স্পর্শ করা। মহিমা—সূক্ষ্মকে স্থূলে পরিণত করা, প্রকাম্য ঐশ্বর্যের ফলে ইচ্ছার ব্যাঘাত হয় না, বশিত্ব ঐশ্বর্যের দ্বারা সকলেই বশ্যতা স্বীকার করে, ঈশিত্ব অর্থে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করতে সমর্থ হওয়া ও কাম-বশায়িতা দ্বারা যা মনে উদয় হবে তদনুরূপ কার্য করা। এগুলি হল বুদ্ধির ধর্ম।

"অভিমানোঽহঙ্কারঃ"—এই সূত্র দ্বারা অভি-মানকেই অহংকার বলা হয়েছে; বাস্তবিকই অভিমান যার বৃত্তি তাকেই অহংকার বলে। পূর্বেই বলা হয়েছে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারের কার্য এবং মনও একটি উভয়াত্মক ইন্দ্রিয়। মনের সাহায্য ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়ই কোন কার্য করতে পারে না। সঙ্কল্প ও বিকল্প, মনের সাধারণ ধর্ম। বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও ইন্দ্রিয় একত্র হয়ে কার্য করে। সাংখ্যশাস্ত্র মতে লয় ও সৃষ্টি অনেকটা প্রগাঢ় নিদ্রা ও নিদ্রা থেকে জাগরণের ন্যায় বলে বোধ হয়। জ্ঞান-

শক্তিযুক্ত অন্তঃকরণের সহায়ে আমরা নিদ্রার জড়ভাব থেকে মুক্তিলাভ করি। এই জড়ভাব দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তঃকরণের 'অহং' ভাব উপস্থিত হয়, এবং তারপর আসে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া। সাংখ্য-সিদ্ধান্তেও দেখা যায়, পুরুষ প্রতিবিম্বিত প্রকৃতির কার্য জ্ঞানশক্তিযুক্ত মহৎ বা বুদ্ধি থেকে অহঙ্কার, ও অহঙ্কার থেকে ইন্দ্রিয়-কার্য উপস্থিত হয়। আবার লয়কালেও স্থূলকৃত সূক্ষ্মে, এবং সূক্ষ্মকৃত ও ইন্দ্রিয় অহঙ্কারে লয় প্রাপ্ত হয়। অহঙ্কার আবার বুদ্ধিতে বা মহতে লীন হয় এবং মহৎ প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। তাহলে প্রগাঢ় নিদ্রায় প্রথমে শরীরের স্থূলাংশ নিস্তব্ধ হয়, তারপর ইন্দ্রিয়াদি স্তব্ধ হয়, তৎপরে অহংভাব লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানশক্তির বিলোপ হয় অর্থাৎ প্রকৃতি যখন তরঙ্গহীন নিস্তেজ নদীবক্ষের ন্যায় অনুভূত হয়, তখনই ইহাকে গভীর নিদ্রা বা সাংখ্যের 'লয়' বলা হয়, আবার তরঙ্গহীন নদীবক্ষে যখন ক্ষীণ মৃদু তরঙ্গের স্পন্দন দেখা যায় তখনই হয় সৃষ্টির আরম্ভ—যাকে সাংখ্যাচার্যগণ মহৎ বা বুদ্ধির উৎপত্তি বলেন, এরপর একটু উচ্চ ও দ্রুতগতি স্পষ্ট তরঙ্গ-রেখাই অহঙ্কার। তদপেক্ষা তরঙ্গের উচ্চ-তাকে ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্মভূতের সৃষ্টি এবং উত্তাল তরঙ্গ ও প্লাবনই মহাভূতের সৃষ্টি। এইভাবেই সাংখ্যমতে অনন্ত অনাদি সৃষ্টি ও প্রলয় সংঘটিত হচ্ছে।

সাংখ্যদর্শনকার "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্র দ্বারা ঈশ্বর পদার্থ খণ্ডন করেছেন। তজ্জন্য কেহ কেহ ব'লে থাকেন সাংখ্যদর্শনকার নাস্তিক ও তৎকৃত দর্শন নাস্তিকদর্শন। আমরা এ মতটি সমর্থন করতে পারি না। যাঁরা জন্মান্তর স্বীকার করেন না, ঈশ্বরও মানেন না তাঁরাই নাস্তিক পদবাচ্য, এবং তাঁদের দর্শনই নাস্তিক দর্শন ব'লে প্রসিদ্ধ। পরন্তু সাংখ্যদর্শনকার জন্মান্তর স্বীকার করেন ও সাংখ্যের পুরুষই অন্যান্য দর্শনে আত্মা, ব্রহ্ম বা ঈশ্বরপদবাচ্য। অন্যান্য দর্শনে আত্মা এক, কিন্তু সাংখ্যকার 'বহু আত্মা' স্বীকার করেন, এই বা প্রভেদ, সুতরাং সাংখ্যদর্শন যে আস্তিক দর্শন ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মহামুনি কপিল বলেন,—শরীর ত্রিবিধ, সূক্ষ্ম ও স্থূল। সূক্ষ্মদেহ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম পঞ্চভূত বা পঞ্চতন্মাত্রা দ্বারা গঠিত। এই সূক্ষ্মদেহের অপর নাম লিঙ্গশরীর। সৃষ্টিকালে পূর্ব-জন্মার্জিত ধর্মাধর্ম সহকারে এই লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মদেহ আবির্ভূত হয়, এবং প্রলয়কালে ইহা ইহকালের জন্মার্জিত ধর্মাধর্ম লয়ে প্রকৃতিতে লীন হয়ে থাকে। মাতৃপিতৃজ দেহই স্থূল দেহ। এই স্থূল দেহকে আশ্রয় ক'রে সূক্ষ্মদেহ ভোগ্যবস্তু উপ-ভোগ ক'রে থাকে। ভোগ শেষ হলে কিছুকাল পরে, স্থূল দেহ পঞ্চভূতে লয় হয়ে যায়। ফিরে আসে না। সূক্ষ্ম শরীর যতদিন না মুক্তি হয়, যতদিন না প্রাকৃতিক প্রলয় উপস্থিত হয় ততদিন থাকে ও ইহলোক পরলোক গমনাগমন করে। ইহাকেই জন্মান্তর বলে।

মুক্তি সম্বন্ধে সাংখ্যের অভিপ্রায় এই যে আত্মাতে যে সুখদুঃখমোহাদি প্রাকৃতিক ধর্ম প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, তা তিরোহিত হলেই আত্মার মুক্তি হয়। মহর্ষি কপিল গ্রন্থ শেষে সেই কথাই বলেছেন, "তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ"—অর্থাৎ যে কোন প্রকারেই হ'ক প্রাকৃতিক সম্বন্ধের উচ্ছেদ হওয়াই পুরুষার্থ। ফল কথা এই যে, জড় সম্বন্ধ রহিত হওয়াই সাংখ্যের মুক্তি।

সাংখ্যদর্শনের ভূমিকায় ঈশ্বর কৃষ্ণাচার্য সাংখ্য-দর্শনের প্রয়োজন সম্বন্ধে পূর্বপক্ষ ও উত্তর প্রত্যুত্তর দ্বারা যা সিদ্ধান্ত ক'রেছেন তা থেকে আমরা বুঝতে পারি, আধ্যাত্মিকাদি দুঃখত্রয়, দৃষ্ট কোন উপায় দ্বারা নাশযোগ্য নহে। শরীরকে আশ্রয় ক'রে যে দুঃখ উপস্থিত হয় তা আধ্যাত্মিক দুঃখ। এই আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দুই প্রকার—রোগাদি হ'তে যে দুঃখ তা শরীর-বৃত্তি আধ্যাত্মিক দুঃখ এবং কামক্রোধাদি

হ'তে যে দুঃখ আসে তা মানস আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। এই আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই উপায় ঔষধাদি সেবন ও মণিমন্ত্রাদি ভোগ দ্বারা বিনাশ হ'লেও তারা আবার ফিরে আসে। পুত্র, কন্যা, পশুপক্ষীজনিত দুঃখের নাম আধিভৌতিক দুঃখ। পুত্রাদি উৎপাদন দ্বারা আধিভৌতিক দুঃখ একেবারে বিনষ্ট হয় না, তাদের বিয়োগাদির জন্য দুঃখ আবার ফিরে আসে। দেবযোনিবিশেষ অর্থাৎ ভূতপ্রেতজনিত দুঃখকে আধিদৈবিক দুঃখ বলে। মন্ত্র ও কবচাদির দ্বারা কথঞ্চিৎ এই দুঃখ দূরীভূত হ'লেও আবার কাল-বিশেষে তা ফিরে আসতে পারে। স্বর্গসুখভোগ ও যাগযজ্ঞাদি দ্বারা তাদৃশ সুখও চিরস্থায়ী নহে; কারণ স্বর্গের ক্ষয় আছে, ও যাগযজ্ঞাদিতে পশু প্রভৃতি হিংসাজনিত দুঃখও আছে। তবে প্রকৃতি পুরুষ প্রকৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হলে, প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান হ'য়ে থাকে এবং এই ভেদজ্ঞানই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তির সাংখ্যসম্মত প্রকৃষ্ট উপায়। এই ভেদজ্ঞানে হিংসাদি দোষ নাই; সুতরাং ইহার ফল চিরস্থায়ী। ব্যক্ত (স্থূল পদার্থ), অব্যক্ত (প্রকৃতি) ও পুরুষের তত্ত্বজ্ঞানই এই ভেদজ্ঞানের হেতু।

সাংখ্যসিদ্ধান্ত অনেকটা আমাদের ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে মিলে যায়। আমরা দেখতে পাই, স্ত্রী, পুরুষ সংযোগ ব্যতীত সৃষ্টি নির্বাহ হয় না, এবং স্ত্রী-পুরুষ সংযোগ নষ্ট না হলে পুরুষ নিষ্কৃতি পাতে সমর্থ হয় না। অনেক স্থলে দেখতে পাওয়া যায়, সাধ্বী স্ত্রী পুরুষের সুখস্বচ্ছন্দের জন্য লালায়িতা, এবং পুরুষের ভোগ সিদ্ধ হ'লে সহধর্মিণী পুরুষের সঙ্গ ত্যাগ করে ও পুরুষও স্ত্রীর কার্য দর্শনে ক্ষান্ত হয়ে অনাসক্তভাবে অবস্থান করে। সাংখ্যসিদ্ধান্তেও দেখতে পাওয়া যায়, প্রকৃতির কার্য দর্শন করে পুরুষ যখন বুঝতে পারে, আমি প্রকৃতি থেকে ভিন্ন, আমার সহিত প্রকৃতির কোন সম্বন্ধ নাই, আমাতে কোন কিছুর কর্তৃত্ব নাই, স্বামিত্ব নাই, তখন পুরুষ নিষ্ক্রিয় ও অনাসক্ত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে উদাসীনভাবে প্রকৃতিকে দর্শন করেন। পুরুষ মনে করেন আমি প্রকৃতিকে দর্শন করেছি ও প্রকৃতিও মনে করেন আমি পুরুষ কর্তৃক দৃষ্ট হয়েছি। উভয়েই তখন কৃতকৃতার্থ হয়ে উদাসীন হয়ে যায়। "প্রকৃতি পুরুষের আর সংযোগ হয় না; সুতরাং সৃষ্টিও আর হয় না। তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হলে সৃষ্টির কারণ ধর্ম ও অধর্মাদির লোপ পায়। কারণ অভাবে কার্যের নাশ হয়। এইভাবে পুরুষের মুক্তি ঘটে থাকে। শরীরপাত হ'লে পুরুষের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক দুঃখের উচ্ছেদ বা পরিসমাপ্তি হয়। দুঃখের উচ্ছেদই পরম পুরুষার্থ।

সমবায়

শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য এম. এ.

সম্বন্ধ কি এই নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে প্রচুর মত-ভেদ আছে। এক কথায় সম্বন্ধ কি, ব'লে বোঝান যায় না। যেমন ধরা যাক, কোনও তরুণী গভীর রাতে কোনও তরুণের কাছে অতি সন্তর্পণে পত্র লিখছে। কেননা, সেই তরুণের তরুণীটির সাথে বিশেষ কোনও সম্বন্ধ আছে। এখন এই বিশেষ সম্বন্ধটিকে না পারা যায় বুদ্ধি বিচার দ্বারা বুঝতে, না পারা যায় সঠিক কোনও অর্থভেদ করতে। তবে, 'তর্ক তারে উপহাসে, মর্ম তারে সত্য বলি জানে'। শকুন্তলার তৃতীয়াংককে দেখি শকুন্তলা দুষ্মন্তের কাছে লিখছেন:

তব ন জানে হৃদয়ং মম পুনঃ দিবাপি রাত্রাবপি
নির্ঘৃণ তপতি বলীয়স্ত্বয়িবৃত্ত মনোরথানি অঙ্গানি।

এই ধরণের মানসিক দুর্বলতা শকুন্তলা কেন প্রকাশ করলেন, অথবা দুষ্মন্তের সাথে শকুন্তলার কি সম্পর্ক শকুন্তলাকে এরূপ উদাস করে দিল ঠিক বুঝি না। এই সম্বন্ধটিকে হয়তো কেউ প্রেম, ভালবাসা ইত্যাদি বলবেন অথবা বলতে চাইবেন। সে পক্ষে আমাদের বক্তব্য এই যে, একটি জিনিষকে একাধিক নামে অভিহিত করা যেতে পারে, কিন্তু শুধু মাত্র এতেই জিনিষটির উপরে বিশেষ আলোকসম্পাত সম্ভবপর হয় না। পূর্বে যেমন প্রশ্ন করেছিলাম এই বিশেষ সম্বন্ধটি কি, ঠিক তেমনই এখানেও প্রশ্ন করতে পারি, প্রেম কি? ভালবাসা কি? প্রেম কি একটা ক্ষণিকের উত্তেজনা, প্রেম কি একটা মনোবিকার অথবা দৈহিক ক্ষুধা? তবে, যাই বলা হোক না কেন, কিছুতেই সত্যিকার সমাধান হয় না।

এই বিশেষ সম্বন্ধের ক্ষেত্রে যে কথা, সব বিশেষ সম্বন্ধের ক্ষেত্রেই ঐ একই কথা। প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য কোনও দার্শনিক সম্বন্ধটি যে ঠিক কি তা' পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যান নি। সব কিছুকে বোঝানোর জন্যই সম্বন্ধের অবতারণা করা হয়েছে, কিন্তু সম্বন্ধ বোঝানোর জন্য আর সম্বন্ধের অবতারণা করা হয় নি। Stace স্বীকারই করলেন যে, সম্বন্ধকে বোঝানো যায় না। তিনি বলেন: Relation appears to be an indefinable ultimate. It is true that certain kinds of relation may be defined in terms of simpler relations. But relation as such cannot be defined." (১) আলেকজাণ্ডার সম্বন্ধকে মোটামুটি বোঝাতে চেয়েছেন, তিনি বলেন: "the whole situation into which its terms enter in virtue of that relation. (২)। এখন "whole situation" যে ঠিক কি আলেকজাণ্ডারের কথায় পরিষ্কার হয় নি। অধ্যাপক Ewing তাঁর "Idealism"এ দশ রকম আন্তর সম্বন্ধের বিভাগ করেছেন, কিন্তু আসলে সম্বন্ধটি যে কি তা ঠিক ঠিক বলে বোঝান নি।

ন্যায় বৈশেষিক মতে সমবায়ও একটি বিশেষ সম্বন্ধ, তাই সমবায়েরও সঠিক স্বরূপ নির্ধারণ সম্ভবপর নয়। তর্কশাস্ত্রে সব কিছুরই সংজ্ঞা (definition) দেওয়া সম্ভব না হ'লেও সব কিছুরই অন্ততঃ একটা বর্ণনা দেওয়া যায়। সমবায়েরও ঠিক এমনি একটা বর্ণনা (description)ই দিয়েছেন প্রশস্তপাদ। তিনি বলেন: অযুতসিদ্ধানাং আধার্যাধারভূতানাং যঃ সম্বন্ধঃ ইহপ্রত্যয়হেতুঃ স সমবায়ঃ (৩)। অবিভাজ্য পদার্থদ্বয় যদি আধার-আধেয়ভাবে থাকে এবং 'ইহা ইহাতে' এরূপ বোধের উদয় হয় যে সম্বন্ধের ফলে তাকে সমবায় বলে। সমবায় সম্বন্ধ হ'তে গেলে কোনও না কোনও রকমের আধার-আধেয়ভাবের প্রতীতি থাকা চাই-ই। শ্রীধর বলেন, পুণ্য ও সুখ, শব্দ ও অর্থ সমবায় সম্বন্ধে সম্বন্ধ নয়, যেহেতু এদের মধ্যে কোনও আধার-আধেয়ভাব নেই।

কণাদ মনে করেন কার্য ও কারণের মাঝেই শুধু সমবায় থাকে। প্রশস্তপাদ বলেন, কার্য ও কারণের মাঝেই যে শুধু সমবায় থাকবে তা নয়, যা কার্য-কারণের সম্বন্ধে আবদ্ধ নয়, সেখানেও সমবায় থাকতে পারে। পাঁচ রকম ভাবে সমবায় থাকতে পারে। দ্রব্য ও তার গুণের, দ্রব্য ও তার কর্মের, জাতি ও তার ব্যক্তির, অন্য পদার্থ ও তার বিশেষের, সমগ্র ও তার অংশের সম্বন্ধকে সমবায় বলে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে সমবায় স্বীকারের সার্থকতা কি? ন্যায়বৈশেষিক দর্শন বহুবাদী। ইহা কোনও কিছুকে আর একটি দ্রব্য থেকে মনে মনে পৃথক করতে পারলেই দুটো জিনিষকে পৃথক্ বলে স্বীকার করে। একটি দ্রব্য

(১) W. T. Stace, The Theory of knowledge and Existence p. 331.

(২) Alexander, Space, Time and Deity Vol. I, p. 240.

(৩) পদার্থধর্মসংগ্রহ: পৃ: ১৪

থেকে মনে মনেই তার গুণগুলিকে পৃথক করা যায়, সত্তাকারে কিন্তু আলাদা করা যায় না। দ্রব্য থেকে কোনও ক্রমেই কর্মগুলো বাদ দেওয়া যায় না বাস্তবে, মনে মনেই শুধু পৃথক করা চলে। কিন্তু ন্যায়বৈশেষিক দর্শন মনে মনে যাকে পৃথক করা যায় তাকে পৃথকই বলে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই মানস-বিভাজন কার্যের জন্যই সমবায় সম্বন্ধকে আনা হয়েছে। তাছাড়া সমবায় একটি অপূর্ব (unique) সম্বন্ধ। সমবায় এমন একটি সম্বন্ধ যে, এখানে অংশ সমগ্র ছাড়াও থাকতে পারে, কিন্তু সমগ্র অংশ ছাড়া থাকতে পারে না। ঘট তার ঘটকারক অংশগুলো (ন্যায়ের পরিভাষায় কপালাদি) ছাড়া থাকতে পারে না, কিন্তু ঘটকারক অংশগুলো ঘটনির্মাণ না করেও থাকতে পারে। সমবায়ের পদার্থগুলো একটু বিশিষ্ট ধরণের। সমবায় তাই 'অপূর্ব' দ্রব্য এবং গুণ, ঘট ও তার কপালাদি সমবায় সম্বন্ধের দ্বারা দ্রব্য ও গুণ, সমগ্র ও অংশ হয় না। প্রত্যেকেরই একটি স্বকীয় সত্তা আছে, সমবায় দ্রব্য-গুণাদির একটি স্বাভাবিক সম্বন্ধ মাত্র। তাই দেখা যায় সমবায় যাকে আন্তর সম্বন্ধ বলে ঠিক তা নয়। সমবায়ও সংযোগের মত একটি বহিঃসম্বন্ধ। তবে সংযোগের মত সমবায় উৎপন্নও হয় না, ধ্বংস অথবা কালে গুণ হিসাবে বর্তমানও থাকে না। সংযোগ সম্বন্ধে সংযুক্ত পদার্থের একটা স্বতন্ত্র সত্তা থাকে কিন্তু আধার-আধেয় ভাবাপন্ন সমবায় সম্বন্ধবদ্ধ পদার্থের একটি থেকে আর একটিকে অন্ততঃ একটি নষ্ট না করে আলাদা করা যায় না। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হ'বে। দ্রব্য ও গুণ পরস্পর সমবায় সম্বন্ধে আবদ্ধ। এখন গুণগুলিকে ধ্বংস না করে দ্রব্য থেকে গুণ পৃথক করা যায় না। কারণ, নিরাশ্রয় গুণ থাকতে পারে না। গুণ থাকলেই কোনও দ্রব্যে গুণ থাকবে। তাই দেখা যায়, প্রথমেই গুণগুলির বিনাশসাধন না করে কিছুতেই দ্রব্য ও গুণ পরস্পর আলাদা করা যায় না। এই হিসেবে সমবায়কে আন্তর সম্বন্ধও বলা চলে।

প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা বলেন, সংযোগ ও সমবায় উভয়ই প্রত্যক্ষ সংবেদ্য। সমবায় দর্শনও স্পর্শেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। আমরা প্রত্যক্ষই দেখতে পাই কাপড় সুতোগুলিতে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান। বৈশেষিক আচার্যেরা বলেন—সমবায় প্রত্যক্ষযোগ্য নয়, অনুমানবেদ্য; সমবায় এক এবং অনাদি। প্রাচীন নৈয়ায়িকেরাও এ সম্বন্ধে একমত। শ্রীধর সমবায়ের অনাদিত্ব সম্বন্ধে বলেন, বস্ত্রের সমবায় বস্ত্রাবির্ভাবের পূর্বে সম্ভব নয় কারণ সমবায় বস্ত্রোৎপত্তির পূর্বে কোথায় থাকে আমরা ধারণাই করতে পারি না। সমবায় বস্ত্রোৎপত্তির সাথে উৎপন্ন হতে পারে না কারণ বস্ত্র তো সমবায়ের আধার; সমবায় বস্ত্রের সাথে সাথেই বা উৎপন্ন কেমন করে হ'বে? বস্ত্রাবির্ভাবের পরেও সমবায়ের উদ্ভব হ'তে পারে না, কারণ এক্ষেত্রেও বস্ত্র সমবায়ের আধার হ'তে পারে না। এজন্যই শ্রীধর সমবায়কে বলেছেন অনাদি।

অনেক নব্য নৈয়ায়িক বলেন, সমবায় ঠিক এক প্রকারের নয়। এক পদার্থই বিভিন্ন প্রকারে নানা পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে সম্বন্ধ হতে পারে। তাই সমবায় বহু প্রকারের। বিভিন্ন বস্তু সংস্থানে বিভিন্ন সমবায় থাকে।

শ্রীধর তাঁর ন্যায়কন্দলীতে (পৃঃ ১৪) সমবায়ের সম্বন্ধে বলেন, যেখানেই আধার-আধেয় ভাব আছে, সেখানেই সমবায় সম্বন্ধ আছে তা বলা যায় না। ভূতলে ঘটের সম্বন্ধকে সমবায় বলা যায় না। যেহেতু, ভূতল ও ঘটকে আলাদা করা যায় এবং ইহাতে ভূতল কিংবা ঘটের কিছুই আসে যায় না। আবার, চিৎসুখাচার্য বলেন, কোনও কিছুর কোনও স্থানে অভাবকে আলাদা করে দেখা যায় না, তাই বলে এই প্রকারের সম্বন্ধকে বিশেষ্য-বিশেষণ লক্ষণই বলতে হয়, কিন্তু সমবায় আর বলা চলে না।

এ বিষয়ে ন্যায়াচার্যেরা বলেন, অযুতসিদ্ধভাব-পদার্থের মধ্যেই সমবায় থাকে, অযুতসিদ্ধ অভাব-পদার্থের মধ্যে নহে।

সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি, সমবায় ব্যাপ্যবৃত্তি। দু' একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি সুপরিস্ফুট হ'বে, আশা রাখি। কোনও সুন্দরী কোনও সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করল, এখানে সুন্দরীর সাথে নিশ্চয়ই সুন্দর পরিচ্ছদের সংযোগ ঘটল, তার হাতের ঘড়ির সাথেও হাতের সংযোগ আছে, নিশ্চয়ই। এখানে সংযোগ কিন্তু ব্যাপ্যবৃত্তি নয়। পরিচ্ছদ সুন্দরীর সারা দেহ আলতো ভাবে ছুঁয়ে আছে সত্য, কিন্তু সুন্দরীর দেহের অভ্যন্তরভাগে তার অস্থি-মেদ-মজ্জা-রক্তের সাথে নিশ্চয়ই পরিচ্ছদের সংযোগ নেই, হাতের ঘড়িটিও সুন্দরীর হাতের ক্ষুদ্র প্রদেশই মাত্র ব্যাপ্ত করেছে। তাই দেখা যায়, সংযোগের ব্যাপ্তি সর্বানুস্যূত নয় সমবায়ের ক্ষেত্রে ঠিক এ কথা বলা চলে না। রক্ত পুষ্পের রক্তত্ব সমবায় সম্বন্ধে স্থিত। এখন, আমরা বলতে পারি না, পুষ্পের রক্তত্ব ঠিক এখানে আছে আর ওখানে নেই। সমবায় তাই ব্যাপ্যবৃত্তি।

এইবার ন্যায়দর্শনে সমবায়ী কারণ কাকে বলে আমরা বুঝতে চেষ্টা করব। অবয়বই সংক্ষেপে অবয়বীর সমবায়ী কারণ। সমবায় নিত্য পদার্থে থাকে না। গগন নিত্য পদার্থ। কেহ আকাশের উৎপত্তি বা বিনাশ দেখেন নি। তাই আকাশের সাথে যদি কোনও বস্তু আধার-আধেয় ভাবে থাকে, অবশ্য বিশ্বের সব কিছুই আকাশেই আছে তথাপি আকাশের সাথে বস্তুর সম্বন্ধকে সমবায় সম্বন্ধ বলা চলে না। সমবায় নিত্য নিরবয়ব দ্রব্যে থাকে না। ভাবকার্যমাত্রই এরূপ নয়। অবয়ব সংযোগের ফলেই কাপড় উৎপন্ন হয়, আবার অবয়ব সংযোগ বিনাশের ফলেই কাপড়ের বিনাশ হয়। দ্রব্য ও গুণ, অংশ ও অংশীর ক্ষেত্রেও এ কথা খাটে। এই ধরণের ভাবকার্যেই সমবায় থাকে।

এখন আবার প্রশ্ন উঠতে পারে, ঈশ্বরকে জগতের সমবায়ী কারণরূপে ধরা যায় কি না? প্রথমেই দেখা যায় কোনও কিছুরই সমবায়ী কারণ একটি হ'তে পারে না। একটি সুতো দিয়ে একটি কাপড় তৈরী করা যায় না। ঈশ্বরকেও যদি জগতের সমবায়ী কারণ হ'তে হয় তবে ঈশ্বরকেও বহু হ'তে হ'বে, এক থাকা আর চলবে না। কিন্তু, কোনও দর্শনই বহু ঈশ্বর স্বীকার করেন না। কারণ, ঈশ্বর যদি বহুই হ'লেন তবে বহু অণু-পরমাণুই তো আছে, আর নতুন করে ঈশ্বর স্বীকার করা কেন? দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বর যদি জগতের সমবায়ী কারণ হ'তেন তবে কাপড় বিশ্লেষণ করে যেমন কাপড়ের সমবায়ী কারণ সুতো পাই ঠিক তেমনি জগৎ বিশ্লেষণ করেও শেষে অণু পরমাণু না পেয়ে বিভু ঈশ্বরকে পেতাম, তা কিন্তু পাই না—তাই ঈশ্বর জগতের সমবায়ী কারণ নন।

সমবায় যেমন সংযোগ হ'তে বিভিন্ন, ঠিক তেমনি সমবায় 'স্বরূপ সম্বন্ধ' থেকেও পৃথক। আগে স্বরূপ সম্বন্ধ কি দেখি, তার পর সমবায় কেন স্বরূপ সম্বন্ধ নয় বুঝতে পারব। আমি যখন ঘট-পট-মঠ জানি তখন নিশ্চয়ই আমার সাথে ঘট-পট-মঠের কোনও না কোনও সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। আর, ঐরূপ কোনও সম্বন্ধ স্থাপিত না হ'লে তো কোনও জ্ঞানই হয় না, যেমন অদেখা রূপকন্যার দেশের রূপসীদের সম্বন্ধে আমার বা আপনার কোনও জ্ঞানই হয় না। তাই দেখি, জ্ঞান হ'তে হ'লেই চেতনকর্তার বিষয়ের সাথে একটা সম্বন্ধ থাকতে হ'বে। এই সম্বন্ধকেই বলা হয় স্বরূপ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধচেতন কর্তাতেই থাকে, ঠিক বিষয়ে থাকে না। কারণ, আপনি বা আমিই বলি, আমার এই বিষয়ে জ্ঞান হ'য়েছে, কিন্তু বিষয়টি প্রচার করে বেড়ায় না যে, আমার চেতন কোনও কর্তা সম্বন্ধীয় জ্ঞান হয়েছে। সুতরাং, স্বরূপ সম্বন্ধ চেতন আত্মাতেই থাকে। সমবায় কিন্তু চেতন আত্মাতেই থাকে না। সমবায়

বিষয়ে থাকে। অন্যান্য দিক বিবেচনা করলে সমবায় স্বরূপ সম্বন্ধেরই মত।

সমবায় আবার তিন রকমের হ'তে পারে। সংযুক্ত সমবায়, সমবায় ও সমবেত সমবায়। এই তিন রকমের সমবায় আমরা দ্রব্য প্রত্যক্ষে উপলব্ধি করি। গোলাপ ফুলটিকে যখন প্রত্যক্ষ করি তখন সংযুক্ত সমবায় সম্বন্ধেই প্রত্যক্ষ হয়। গোলাপের সহিত আমার চক্ষুর সংযোগ রয়েছে আর গোলাপে গোলাপী রঙ, আভা সমবায় সম্বন্ধে আছে, গোলাপ দ্রব্যে তার রঙ, আভা সমবায় সম্বন্ধেই থাকবে। তাই গোলাপের সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষের দ্বারা গোলাপের সহিত অযুতসিদ্ধ সমবায় সম্বন্ধে স্থিত গোলাপী আভারও প্রত্যক্ষ হয়ে যায়। এই বিশেষ প্রত্যক্ষের নামই সংযুক্ত সমবায় প্রত্যক্ষ।

যখন কাণের সাহায্যে শব্দ শোনা যায় তখন সমবায় সন্নিকর্ষেই প্রত্যক্ষ হয়। কর্ণেন্দ্রিয় ন্যায় বৈশেষিকের মতে আকাশ পদার্থ, শব্দ আকাশের গুণ। আকাশে শব্দ সমবায় সম্বন্ধেই থাকে। তাই শব্দের সমবায় সন্নিকর্ষেই প্রত্যক্ষ হয়। অবশ্য অনেক নৈয়ায়িক আকাশ সমবায় সম্বন্ধে আছে নাহয় বলেন।

শব্দের ধর্ম শব্দত্বের যখন প্রত্যক্ষ হয়, তখন শব্দত্ব শব্দে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, শব্দ আবার আকাশে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এরূপ শব্দত্বের প্রত্যক্ষ সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষেই ঘটে। শব্দত্ব প্রত্যক্ষে দুইটি সমবায় সমবেত বা একত্রিত হয়েছে। প্রথম সমবায়টী শব্দত্ব ও শব্দের মাঝে, দ্বিতীয় সমবায়টি শব্দ ও আকাশের মাঝে। শব্দত্ব প্রত্যক্ষে দুইটি সমবায় একত্রিত হয় বলেই "সমবেত-সমবায়" বলে।

সংক্ষেপে ন্যায় বৈশেষিকের সমবায় এইরূপ। আচার্য শংকর ব্রহ্মসূত্রের (দ্বিতীয় অধ্যায়) ভাষ্যে সমবায় খণ্ডন করেছেন। "যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৮) সূত্রের ভাষ্যে শংকর জিজ্ঞাসা করেন, কারণ রূপ অবয়ব দ্রব্য যে কার্যরূপী অবয়বীতে থাকে তাহা কি সমুদয় অবয়বে থাকে, না অংশক্রমে প্রতি অবয়বে থাকে? সূত্র কি সমুদয় বস্ত্রে থাকে, না অংশক্রমে প্রতি বস্ত্রখণ্ডে থাকে? সমুদয় অবয়বে থাকতে পারে না, তা হ'লে অবয়বীর অনুভবই হ'বে না। কারণ, সমস্ত অবয়বীর সহিত আমাদের চক্ষুরাদির সংযোগ হয় না। একই ক্ষণে গোটা দ্রব্যটির সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ হয় না, প্রথম ক্ষণে দ্রব্যটির কিছু অংশই গোচরীভূত হয়, অন্যান্য অংশ ব্যবহিত থাকে। তাই দেখা যায় অবয়ব সমুদয় অবয়বীতে থাকতে পারে না। আরও দেখা যায়, দ্রব্যের এক অবয়ব সন্দর্শন করলেই সমস্ত অবয়বীর জ্ঞান হয় না। কোনও মানুষের হাত বা মুখ দেখলেই সমস্ত মানুষটিকে দেখা হ'ল কেউ স্বীকার করবেন না। অংশে অংশে প্রতি অবয়বেও থাকতে পারে না, তাহ'লে অবয়বের অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার করতে হয়। ন্যায়বৈশেষিক-দর্শন অবয়বের অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার করে না। তাই কোনও ভাবে সমবায় অবয়ব-অবয়বীতে থাকতে পারে না। "সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ" (ব্রহ্মসূত্র ২।২।১৩) সূত্রের ভাষ্যেও আচার্য শংকর সমবায় খণ্ডন করেছেন। অবয়বী ন্যায়ের মতে সমবায় সম্বন্ধে অবয়বের সহিত সংযুক্ত হয়। এখন অবয়ব ও অবয়বী যেমন বৈশেষিকের মতে পদার্থ, তেমনি সমবায়ও একটি পদার্থ। তাই অবয়ব-অবয়বী, দ্রব্য ও গুণ ভিন্ন পদার্থ বলে সংযুক্ত করার জন্য অন্য একটি সমবায় নামক পদার্থের যদি প্রয়োজন হয় তবে সমবায় নামক পৃথক্ একটি পদার্থকেও দ্রব্য-গুণ, ঘট ও তার অংশগুলির (কপাল-কপালিকার) সাথে সংযুক্ত করার জন্য আর একটি সমবায়ের প্রয়োজন হয়, এই সমবায়কে সংযুক্ত করার জন্য আর একটি সমবায়ের প্রয়োজন হয়। এই ভাবে অনবস্থায় ডুবে যেতে হয়। শংকর তাই সমবায় মানেন নি।

বেদান্ত পরিভাষাকার ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বেদান্ত পরিভাষার প্রথম পরিচ্ছেদে বলেন, ব্রহ্ম ভিন্ন নিখিল

জগৎপ্রপঞ্চই মিথ্যা, তাই সমবায়ের দ্বারা সিদ্ধ নিত্যত্ব সমবেতত্ব ঘটিত জাতিত্বও মিথ্যা। সমবায়কে মিথ্যা বলার আরও কারণ এই সমবায় বিষয়াশ্রয়ী। সমস্ত বিষয়ই যদি মিথ্যা হয়, তবে তদাশ্রিত সমবায়ও মিথ্যা। বেদান্ত সমবায়ের পরিবর্তে তাদাত্ম্য স্বীকার করেছে।

এবার আমরা দেখি বেদান্তোক্ত সমবায় খণ্ডনের বিপক্ষে ন্যায়ের কি বলার আছে। এ কথা সত্য যে, গুণ, কর্ম, জাতি কোনও দ্রব্য ছাড়া থাকতে পারে না। কিন্তু তাই বলে আমরা এ কথা বলতে পারি না যে,দ্রব্যটি তার গুণগুলিই,রক্ত পুষ্প শুধু তার রক্তত্ব নয়, দ্রব্যটি শুধু তার কর্মগুলোও নয়, একটি জিনিষ আর একটি থেকে অবিভাজ্য হ'তে পারে, দ্রব্য ও গুণ অবিভাগ সিদ্ধ হ'তে পারে। তাই বলে দ্রব্য ও গুণ এক নয়। দ্রব্য ও গুণ যেহেতু এক নয় সে হেতুই কোনও না কোনও পার্থক্য দ্রব্য ও গুণের মধ্যে আছে। এই পার্থক্য দূর করে দ্রব্য ও গুণকে সংযুক্ত করার জন্যই সমবায়ের প্রয়োজন। সমবায়ের কাজই সংযুক্ত করা, সমবায় তাই আর একটি সমবায়ের অপেক্ষা করে না।

মুমূর্ষু লোক-সংগীত

শ্রীসন্তোষকুমার দে, এম. এ. (ক্যাল.) এইচ. ডিপ্. এড্. (ডাবলিন)

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই লোক-সংগীত আছে আর এই লোক-সংগীতের রচয়িতা সর্বত্রই নিরক্ষর চাষী, মজুর। যুগ যুগ ধরিয়া এই সব লোক-সংগীত মানুষের মুখে মুখে গীত ও প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে। কবে, কে এই সব লোক-সংগীত রচনা করিয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না, বা তাহার অনুসন্ধানেও কেহ মাথা ঘামায় না, পুরুষানুক্রমে এই সব লোক-সংগীত চলিয়া আসিতেছে। এই জন্যই একজন পাশ্চাত্য সমালোচক লোক-সংগীত আলোচনা উপলক্ষে বলিয়াছেন :

"Whatever the sources, however, it is oral circulation that is the best general criterion of what is a folk song" অতি খাঁটি কথা। মুখে মুখে গীত হয় বলিয়াই লোক-সংগীতের কোন লিখিত পুঁথি আজও আবিষ্কৃত হয় নাই।

লোক-সংগীতের সুর অতি সরল, সাধারণ ও গতানুগতিক ; তাই ইহা শিক্ষার জন্য কোন গুরুর প্রয়োজন হয় না। মার্গ-সংগীতের মতন সুদীর্ঘ সাধনার বিষয়ও লোক-সংগীত নয়। যাহারই কণ্ঠস্বর কোমল ও মিষ্ট সেই ইহা গাহিয়া থাকে—অন্যে ইহার অনুকরণ করে। ইহাতে তালের বাড়াবাড়ির বাঁধন নাই, একটা লয়ের মাত্রা আছে—উদ্দেশ্য, কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে ফুটাইয়া তোলা—কোন রাগিণী বা তালকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা নহে। সব দেশেই সমাজ-জীবনের প্রয়োজনেই লোক-সংগীত জন্মলাভ করিয়াছে। তাই দেখা যায় সমাজে যখনই দুর্বলের উপর প্রবলের, দরিদ্রের উপর ধনীর অত্যাচার ও অবিচার চলিয়াছে পল্লীবাসী তখন তার সক্রিয় প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া অন্তরের বেদনা সংগীতের মধ্যে রূপায়িত করিয়াছেন। শুধু অত্যাচার, অবিচারের প্রতিবাদ হিসাবে লোক-সংগীতের জন্ম, ইহা ভাবিলে সম্পূর্ণ ভুল করা হইবে। সাধারণ কাব্য ও সংগীতের মতন ইহার পিছনে আছে আনন্দের সৃষ্টি ; কাজেই নিরক্ষর পল্লীকবি রস-

উদ্বেলিত হইয়া নরনারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ, মিলন ও বিরহের গানও গাহিয়াছেন আবার ভাবগভীর হইয়া আধ্যাত্মিক গানও গাহিয়াছেন। (খাঁচার মধ্যে অচিন পাখী কমনে আসে যায়, প্রভৃতি)। অনেকে অবশ্য এই শ্রেণীর সংগীতগুলিকে লোক-সংগীত না বলিয়া মুর্শীদা, মারফতী, সহজিয়া, নাথ-গীতির মত তত্ত্ব-সংগীত বলিয়া মনে করেন; তাঁহাদের মতে এই সব সংগীতের মধ্যে গূঢ়ার্থ (Mysticism) আছে এবং এগুলি সমাজ-মানস হইতে জন্মগ্রহণ না করিয়া ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক চৈতন্যবোধ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু একথাও ত ভুলিলে চলিবে না যে, এই সকল সংগীত হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পল্লীর সহজ, সরল, নিরক্ষর চাষীমজুররাই রচনা করিয়াছে এবং তাহা সমগ্র সমাজের অনাবিল আনন্দের কারণ হইয়াছে। যাহাই হউক সাধারণ লোক-সংগীতের মধ্যে ভাবের গভীরতা ও বিষয়ের বৈচিত্র্য না থাকিলেও, ইহারা পল্লীর আকাশ বাতাস, নদনদী, বন, প্রান্তরের সৌন্দর্য ও পল্লীবাসীর মনের মর্মকথা প্রকাশ করিয়া সমাজ-জীবনে প্রচুর আনন্দের উপাদান যোগাইয়াছে।

এই যে লোক-সংগীত যা একদিন জনমনকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল, যা সরল পল্লীবাসীদের দিয়াছিল প্রচুর আনন্দ; আজ তা মুমূর্ষু—মৃতপ্রায়। শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র লোক-সংগীত আজ মরণোন্মুখ। কেন এ অবস্থা হইল? কেন আজ লোক-সংগীত শহরবাসী ত পরের কথা, পল্লীবাসীকেও আনন্দ দিতে পারিতেছে না; সে-কথা ভাবিয়া দেখা দরকার।

যে পল্লীসমাজের উপর ভিত্তি করিয়া লোক-সংগীতের জন্ম, সে পল্লীসমাজ আজ ভগ্নপ্রায়। পল্লীর সমাজদেহে যেন আর জীবনের সাড়া পাওয়া যায় না। মানুষ আজ শহরমুখী, সমাজমুখী,—কৃষিমুখী নয়। শহরের সস্তা ছায়াচিত্র ও রেডিওর আনন্দে জনমানস আজ পূর্ণ। ইহার ঢেউ গিয়া লাগিয়াছে সুদূর পল্লীগ্রামে। পল্লীবাসীরও আজ রুচির পরিবর্তন হইয়াছে। যে রুচি ও সংস্কৃতি লইয়া মানুষ একশত বা দুই শত বৎসর পূর্বে সন্তুষ্ট ছিল, আজ আর তাহা নাই। লোক-সমাজদেহ যতদিন ততদিন লোক-সংগীত ছিল নিরাপদ। পুরাতন যুগের রুচিবোধ, সরল অনাড়ম্বর জীবন আজ আর নাই। এক কথায় পুরাতন সমাজ আজ অতীতের স্মৃতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র এই একই অবস্থা। বর্তমান যন্ত্রযুগের শিক্ষা ইহার জন্য অনেকটা দায়ী। A. William তাঁর Folk song of the upper Thames নামক পুস্তকে ইংলণ্ডে লোক-সংগীত বিলুপ্ত হইবার যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর সর্বক্ষেত্রে সমভাবে প্রযুজ্য। এই পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন:

"শিক্ষার ফল ধরিয়াছে। গ্রাম্য পাঠশালায় বালক বালিকাদের যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা প্রাচীন পল্লীকবিদের গীতের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়াই প্রমাণ হইয়াছে। গ্রামের সরল, অনাড়ম্বর ভাষা আজ গ্রাম্যভাষা বলিয়া অনাদৃত। শহর হইতে যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষাদানের জন্য গ্রামে আসিতেছেন, তাঁদের গ্রাম্যজীবন ও গ্রাম্য রীতি-নীতির উপর কোন শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি নাই। পল্লীসংগীতগুলির বাক্য ও অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তার অনেককে তাঁরা অতি পাকা-মাথা বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন। ইহার উপর রেলপথ, সন্নিহিত জেলাগুলির সহিত গ্রামের সংযোগ সম্বন্ধ ও বড় বড় নগর ও শহরের সহিত পল্লীর সংস্পর্শের ফল পল্লী-সংগীতের উপর প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিয়াছে। গ্রামের বহু শ্রমিক নিকটবর্তী শহরে চলিয়া গিয়াছে; তাহারা গ্রামের পুরাণ গীতগুলির প্রতি আকর্ষণ হারাইয়া ফেলিয়াছে, অথবা আপনাপন কাজে এখন এত ব্যস্ত যে পল্লীগীতিগুলি মনে করিয়া রাখিবার মতন অবসর আর তাদের নাই।

সুখের বিষয় এই যে, লুপ্তপ্রায় লোক-সংগীতকে পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা অন্যান্য দেশের মতন আমাদের দেশেও হইতেছে; শহরে ও শিক্ষিত সমাজে গানগুলি আদর পাইতেছে। কিন্তু শহরের ও শিক্ষিত সমাজের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য পল্লী অঞ্চলের ভাটিয়ালী, সারি, জারিকে আজ তাহাদের সহজ ও স্বাভাবিক পরিবেশ হইতে ছিন্ন করিয়া আনিয়া হারমোনিয়ম প্রভৃতি নানাবিধ যন্ত্রের সহকারে গাহিতে হইতেছে; ফলে ইহাদের আসল রূপটি ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে। লোক-সংগীতে বাদ্যযন্ত্রের স্থান অতি নগণ্য। অধিকাংশ লোক-সংগীতই কোন প্রকার বাদ্যযন্ত্র ব্যতীতই কেবলমাত্র মুখে মুখে গীত হয়। সে ক্ষেত্রে ঢাক, ঢোল, মাদল, খঞ্জনী বা একতারা ব্যবহৃত হয়। তাহা কেবল কণ্ঠস্বরে মাধুর্য যোগ করিবার জন্যই—অন্য গীতের মত গায়কের কণ্ঠস্বর ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।

য়ুরোপ, আমেরিকাতেও দেখা যাইতেছে লোক-সংগীতের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলিতেছে। নব-জাগ্রত চীনেও শুধু লুপ্তপ্রায় লোক-সংগীতগুলির উদ্ধার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থাই করা হইতেছে না, নবযুগের উপযোগী করিয়া নূতন নূতন লোক-সংগীতও রচিত হইতেছে।

পূর্বযুগে চীনদেশে দরিদ্র চাষী, মজুরেরা দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার বা উৎপীড়ন লোক-সংগীতে আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিত। নূতন যুগে যে সব লোক-সংগীত রচিত হইতেছে, সেগুলি অত্যাচার, উৎপীড়ন হইলে স্পষ্ট ভাষায় প্রতিবাদের ধ্বনি জাগাইয়া তুলিতেছে, অর্থহীন ভাষায় বিপ্লবের মহিমা, লাল ফৌজের বীরত্ব-কাহিনী, বিপ্লব যুগের নেতাদের, কমিউনিষ্ট দলের, মাও-সে-তুং, লিউ-চি-টান, সেনাপতি সো-চুয়ান প্রভৃতির মহত্ত্ব বর্ণন ও কীর্তন হইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, "আরক্ত পশ্চিম" নামক নব রচিত লোক-সংগীতে চেয়ারম্যান মাও-সে-তুংএর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইয়াছে। সিকিয়াং প্রদেশের সুলতান মুরাট রচিত "পেকিং এর অর্ঘ্য" নামক নূতন লোক-সংগীতটি সমগ্র চীনে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। সে দেশের সমালোচকেরা বলেন, এটি একটি উৎকৃষ্ট লোক-সংগীত। সংগীতটির প্রথম স্তবক এইরূপ:

"আকাশের কৃষ্ণ মেঘ কাটিয়া গিয়াছে
পৃথিবী হইয়াছে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন,
প্রভাত-শিশির-কণার মত হৃদয় মোদের সমুজ্জ্বল:
মহান্ নেতা মাও-সে-তুং মোদের জীবন, মোদের আশা;
উদ্যানে সুখের বীজ হ'য়েছে উপ্ত
সুন্দর বৃক্ষ শিশু হ'তেছে অঙ্কুরিত;
পণ করিলাম সর্বস্ব, সুখের ফুল জীবন হয় প্রস্ফুটিত।"

নূতন লোক-সংগীত রচনার এই প্রচেষ্টা কতটা সার্থক হইবে তাহা বিচার্য বিষয়। লোক-সংগীত স্বতঃস্ফূর্ত ও সহজ; কৃত্রিমতা তাহার মধ্যে আসিলে লোক-সংগীতের প্রাণ পিষ্ট হইয়া পড়ে। নিরক্ষর লোক-সংগীত রচয়িতারা প্রকৃতির মধ্যে তার মর্মবাণীর সন্ধান পাইয়া তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ কোমল কণ্ঠের সুরের আকুতিতে আকাশ, নদী, বন, প্রান্তর মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। নবরচিত লোক-সংগীতে সে আকুতি কোথা হইতে মিলিবে? ইহা নামে ও আকারে লোক-সংগীত হইতে পারে, কিন্তু পুরাণ যুগের লোক-সংগীতের মাধুর্য ইহাতে মিলিবে না। যে যুগ অতীত হইয়াছে, যে পরিবেশের পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাকে ত আর ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইবে না: কাজেই এই নব লোক-সংগীত রচনাপ্রচেষ্টা সফল হইবার আশা দেখা যায় না। লোক-সংগীতকে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে কোন রকমে রক্ষা করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহাদের পূর্ব গৌরবে আসীন করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে,

পুরাতন পরিবেশ, পুরাতন জন-মানস এখন আর নাই। য়ুরোপীয় সভ্যতা ও শিক্ষার সংস্পর্শে মানুষের মনোজগতের পরিবর্তন হইয়াছে। যে উন্মাদনা, যে ভাবের বন্যা পল্লীকবিরা একশত কি দুই শত বৎসর পূর্বে আপন সহজ ও সরল পরিবেশের মধ্যে বহাইতে পারিতেন, এখন আর তাহা সম্ভব নয়। বর্তমান যুগের একমুখী স্রোতোধারাকে ভিন্নমুখে ফিরাইবার উপায় নাই। বনের মৃগকে সখের মৃগদানিতে ঘরের মধ্যে রাখিলে যতটুকু শোভা হইতে পারে, চেষ্টার দ্বারা লোকসংগীতকে তাহার বেশী শোভনীয় করিতে পারা যাইবে না বলিয়াই বিশ্বাস।

ছন্দ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য

বর্তমানকাল সর্বতোভাবে সবদিক দিয়ে খুব উচ্ছৃঙ্খল ও আবেগচঞ্চল। এখন ছন্দ সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তবু না বলেও পারা যায় না। বাঙলা কবিতায় এখন এত বেশী গরমিলের গোঁজামিল চালু হয়েছে, যে দুঃখিত না হয়েও থাকা অসম্ভব। তাই কিছু-কিঞ্চিৎ বলতে অগ্রসর হয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবি ও কবিতা সম্বন্ধে রহস্য করে' যা বলেছেন, সে কথাগুলোই প্রারম্ভে বলতে চাই। তিনি বলেছেন :

"মন উড়ু উড়ু, চোখ ঢুলু ঢুলু,
ম্লান মুখখানি কাঁদ্‌নিক—
আলুথালু ভাষা, ভাব এলোমেলো,
ছন্দটা নির্বাঁধুনিক।
পাঠকেরা বলে,—'এতো নয় সোজা,
বুঝি কি বুঝিনে যায় না সে বোঝা।'
কবি বলে, 'তার কারণ, আমার
কবিতার ছাঁদ আধুনিক।"

এখনকার কবিতায় আলুথালু ভাষা, এলোমেলো ভাব এবং বাধা-বন্ধনহীন নির্বাঁধুনিক ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যা বলে গেছেন, তার আর সরল ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন হয় না। আধুনিক কবিতায় কবিত্ব নেই, এমন কথা বলিনে। কবিত্ব বেশ আছে, কবিত্ব থাকলে কি হবে? ছন্দ-স্পন্দ ও মিল না থাকাতে, তা মনে গেঁথে বসে না। ছন্দস্পন্দহীন অমিল কবিতা মনে দোলা দেয় না বলেই, স্মরণ রাখা যায় না এবং আবৃত্তি করাও সম্ভব হয় না। ভাবাবেগ-স্পন্দিত, ছন্দিত, স্বাক্‌বিভূতিপূর্ণ রচনাই প্রকৃত কবিতা।

জগৎসংসার ছন্দ ছাড়া চলতেই পারে না। ছন্দের তালে তালে সংসার চলছে। ছন্দের তাল, মান ভঙ্গ হলেই ধ্বংস ও মৃত্যু অনিবার্য। এই বিশ্বসৃষ্টি ছন্দস্পন্দে ভরপুর। সূর্য-চন্দ্র, সিন্ধু, নদ-নদী ছন্দবন্ধে আনন্দে ছুটে চলেছে। পাখী ছন্দে পাখা ঝাপ্‌টায়, সুর-তরঙ্গে এবং নৃত্যভঙ্গে মিল রেখে ছন্দের তালে তালে চলে। পাখীর দুটি পাখায় সুন্দর ছন্দের তাল-মান না থাকলে, পাখীর সাধ্য ছিল না উড়ে বেড়াবার। একটা পাখার ছন্দ ভঙ্গ হয়ে গেলে, শুধু আর একটা পাখার ছন্দে নির্ভর করে'ও পাখীটা উড়ে যেতে পারে না। ঘুমন্ত ছেলে-মেয়েরা দোলনায় দোল খাচ্ছে। সেই দোলনায় ছন্দ আছে বলে'ই বেশ ঘুম যাচ্ছে। দোলনায় যদি ছন্দ না থাকে,

তবে আনন্দ পাবে না, ঘুম ভেঙে যাবে। হাসি-কান্নারও ছন্দ আছে। মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে, কথা-বার্তায়, চাল-চলনে, নৃত্য-গীতে, সুখ-সম্ভোগে—আর বেশী বলতে চাইনে—সর্বত্র ছন্দ আছেই। ছন্দই আনন্দ, ছন্দহীনতাই দুঃখ-নিরানন্দ! বর্ষা-বর্ষণে, বজ্রগর্জনে, ঝড়া-ঝঞ্ঝায়, বৃক্ষ-পত্রে, পল্টনের সৈন্যদের কুচ্‌কাওয়াজে পর্যন্ত ছন্দ আছে। জলে মাছ প্রভৃতি জলচর জীবও ছন্দ মেনে চলে। হাঁস প্রভৃতি উভচর প্রাণীও ছন্দের তালে পা ফেলে জল টেনে টেনে সাঁতরায়। ছন্দ-ছাড়া মানে ছন্নছাড়া। তাই বলছিলাম :

ছন্দে উদ্ভব, ছন্দে লয় সব,
ছন্দোময় প্রাণ বিশ্বে দুর্লভ!
ছন্দে যৌবন হচ্ছে উন্মন,
স্বপ্ন হয় মোর ছন্দে বাস্তব।

সুতরাং কবিতায় ছন্দ থাকবে না, এ হতেই পারে না। অল্প অর্বাচীন যারা, ছন্দ তারাই মানে না, মানতে চায় না। যে মূঢ় ছন্দ অস্বীকার করে' গায়ের জোরে চলতে চায়, তার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দ হঠাৎ থেমে গেলে, ক্ষমতা নেই কারুর, যে তাকে আবার বাঁচাতে পারে। স্বয়ং ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এলেও তাকে আর বাঁচানো যাবে না। যৌবনে শিরা-ধমনীতে রক্ত যখন টগ্‌বগ্ করে, তখন অনেকেই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে জীবনে ছন্দ, তাল, মান কিছুই মানে না। তার ফলে কত না দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যাধিতে ভোগে! কিছুকাল শয্যাশায়ী হয়ে ছন্দের শুশ্রূষা মেনে চিকিৎসকের পরামর্শে ও উপদেশে সুস্থ হয়ে ওঠে। রক্তের জোর কমে এলেই সকলে বার্ধক্যে সানন্দে ছন্দ মেনে চলে এবং বেশীদিন বেঁচেও থাকে। তবু যে মরে, তা হলো বিধাতার অমোঘ বিধান। জন্ম হলেই মৃত্যু হবে।

প্রাণের কথা ছন্দে ভর করে'ই সর্বপ্রথম বাল্মীকির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল। কবিতা ছন্দের সুরে রণিত হয় মর্মমূলে, তারপর আবেগে উৎসারিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। প্রাণের কথাই হোলো কবিতা।

জ্ঞানের কথাই হোলো গদ্য রচনা। কবিতা হৃদয় থেকে বেরোয়, জ্ঞানের কথা গদ্য রচনা মস্তিষ্ক থেকে বেরোয়। কবিতা হৃদয় থেকে বেরোয় বলেই সহজবোধ্য ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট হয়ে থাকে। গদ্য রচনা মস্তিষ্ক থেকে চিন্তাপ্রসূত হয়ে বেরোয় বলেই তা তেমন সহজবোধ্য হয় না। প্রকৃত কবিতা প্রাণের জিনিস, গদ্য রচনা চিন্তার জিনিস। কবিতা ও গদ্য রচনা সম্বন্ধে এমনধারা অনেক কথাই বলার আছে।

এখন আমি আর্যভাষার সংস্কৃত ছন্দের কয়েকটি দুর্গত ছন্দের নমুনা বাঙলা ভাষায় কি রূপ ধরেছে, তা দেখাতে চাই। ১৩৫৮ সনের বোশেখ মাস থেকে ১৩৫৯ সনের ভাদ্র মাস পর্যন্ত "প্রবর্তক" পত্রিকায় সংস্কৃত অসংখ্য ছন্দের মাত্র পঁচাত্তরটি ছন্দের বাঙলা রূপ যা প্রকাশিত হয়েছে, তা ছন্দরসিক সুধীবৃন্দকে এই সঙ্গে পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি। কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালী এতগুলো সংস্কৃত ছন্দে কবিতা রচনা করে' প্রকাশিত করেছেন কি না, আমার তা জানা নেই।

সর্বপ্রথম ধরা যাক্ **শার্দূল বিক্রীড়িত** ছন্দ। এটি একটি দুর্গত সংস্কৃত ছন্দ। এর প্রতি পাদে ক্রমে তিনটি গুরু দুটি লঘু একটি গুরু একটি লঘু একটি গুরু তিনটি লঘু এবং একটি গুরু বর্ণের পর যতি পড়বে। বাকী অংশে দুটি গুরু একটি লঘু দুটি গুরু একটি লঘু ও একটি গুরু বর্ণ থাকবে। চারটি পাদে একটি শ্লোক বা গুচ্ছ বা স্তবক হয়। একটি পাদ বা ছত্রে এতগুলো বর্ণ লিখলে ছত্রটি খুব দীর্ঘ হবে বলেই একটি পাদ ভেঙে দুটি পাদে লিখছি। সুতরাং চার ছত্রের স্থলে আট ছত্রে শ্লোকটি শেষ হবে, তা বলাই বাহুল্য।

++ + । । +। + । । ।+
সত্যের জয় হবে, মিথ্যা সব হবে বিলয়,

বাকী অংশের মধ্যে দুটি গুরু একটি লঘু দুটি গুরু একটি লঘু এবং একটি গুরুবর্ণ থাকবে ও যতি পড়বে।

+ + । + +। +

সুন্দর হবেই মর্ত্যলোক ;

এখন সম্পূর্ণ শ্লোকটি লিখছি। চার ছত্রের স্থলে আটটি ছত্রে লিখছি :

সত্যের জয় হবে, মিথ্যা সব হবে বিলয়,
সুন্দর হবেই মর্ত্যলোক :
দুর্দিন রইবে না, সত্য যুগ হবে উদয়,
দূর হয় কলুষ দুঃখশোক।
স্বর্গের সঙ্গীতে প্রাণ ব্যাকুল আশাবাদীর,
রেণু তাই ছড়াই আজ মধুর ;
অন্তর স্পর্শিতে তাই শোনাই হয়ে অধীর
শার্দুল ক্রীড়ার ছন্দ সুর।

এখন ধরা যাক্ **লীলাখেল ছন্দটি**। এই ছন্দের শ্লোকের প্রতি পাদে অর্থাৎ প্রতি ছত্রে পনেরোটি দীর্ঘ অক্ষরের ধ্বনি ফুটে ওঠা চাই।

+ + ++ + + + + ++ + + + + +

ওই শোন্ দুর্বার বিপ্লব-হুঙ্কার চিত্তের কর্ণের দূর্ পর্দায়!
একসাথ আজ সব অক্ষম দুর্বল দুর্ভর দুঃখের
নিঃশেষ চায়!
উচ্চের সাথ আজ নিম্নের লোকজন এইবার শেষবার
চায় সংগ্রাম :
নির্মম দুর্মর অর্ঘের দুর্লোভ প্রাণ বধ করবার পায়
দুর্নাম !!

তারপর ধরছি **মন্দাক্রান্তা ছন্দটি**। এটিও একটি দুর্দান্ত ছন্দ। বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ এটিকে প্রথম লোক খানিয়েছেন। এর প্রত্যেক চরণে চারটি গুরু পাঁচটি লঘু দুটি গুরু একটি লঘু দুটি গুরু একটি লঘু ও শেষে দুটি গুরুবর্ণ বসাতে হবে। চারটি গুরু বর্ণের পর যতি, পাঁচটি লঘু ও একটি গুরুবর্ণের পর আর একবার যতি এবং শেষে একটি গুরু একটি লঘু দুটি গুরু একটি লঘু ও দুটি গুরুবর্ণের পর আবার যতি পড়বে। প্রত্যেক ছত্রে তিনবার করে' যতি পড়বেই। সুর টেনে টেনে পড়তে অনুরোধ করি।

যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্ণ, হসন্ত বা ব্যঞ্জনান্ত বর্ণের পূর্ববর্ণ যে গুরুবর্ণ হয়ে থাকে, তা বর্তমানে সবাই জানেন। এ-সম্বন্ধে বেশী বলা অনাবশ্যক।

মন্দাক্রান্তা ছন্দের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি :

+ + ++ ++ ।। । । । +

অন্তর অস্থির, নয়নে নাহি ঘুম,
+ । ++ । + +
হায় কি বিচ্ছেদ জীবন যার !
তার সেই মুখখান, তারি সে এলো-চুল,
দেখতে একবার হৃদয় চায়।
কই সেই কৈশোর, পুলকে-ভরা বুক,
স্বপ্নে ভরপুর দৌহার প্রাণ !
যৌবন যায়-যায়, তবুও বঁধুয়ার,
নয় তো ভুলবার প্রেমের দান !!

এখন **তুলক ছন্দের** একটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি। এর প্রতি ছত্রে গুরু-লঘু গুরু-লঘু গুরু-লঘু গুরু-লঘু গুরু-লঘু গুরু-লঘু এবং গুরুবর্ণ বসাতে হয়। উদাহরণ যেমন :

+ । +। + । + । + । +। + ।+

বইছে রুদ্র ঝঞ্ঝা মর্তে, শোন্‌রে কর্ণে আর্তনাদ।
অন্তরীক্ষে কৃষ্ণ অস্ত্র পূর্ণ করবে ধ্বংস-সাধ!
ঝরছে বৃষ্টি পড়ছে বজ্র জ্বলছে অগ্নি দীপ্তিকায় ;
আজকে চিত্ত করছে নৃত্য বাহ্যদৃষ্ট-মত্ততায়।

অচলধৃতি ছন্দের একটি শ্লোক ধরা যাক্ তারপর। ষোলটি লঘু অক্ষর বা বর্ণের দ্বারা এর প্রতি চরণ তৈরী হয়েছে। উদাহরণ যেমন :

।। । ।।। ।। । ।। ।। । ।।

তুমি কি বুঝিবে নারী কি তুমি বুঝিতে পার।
নাহি সে-ধারণা তব, অনুভূতি নাহি গাঢ়!
ভাসিয়া চলেছ তুমি উপরে সফরী সম।
ডুবিয়া থাকোনি কভু হৃদয়ে কি ব্যথা মম !!

খুব ছোট ছোট ছত্রেরও সংস্কৃত ছন্দের বহু আছে কবিতা। **তুর্মিল ছন্দ** সে-রকম ছোট একটি

ছন্দ। এর প্রতি চরণে দুটি লঘু ও একটি গুরু বর্ণ থাকে। যেমন :

। । +
শোভমান
মণিলাল (গাঙ্গুলী)
তারে নাশ
করে কাল !!

এ রকম ছোট ছোট ছত্রের আর একটি সংস্কৃত ছন্দ হোলো সতী ছন্দ। যেমন :

। । । +
পুঁথি আমার
নিয়েছে বল্ !
মরু-হিয়ায়
এনেছে চল !
ঘাতনা ভয়
পেয়েছে লয়,
জীবনে জয়,
সবি সফল !
মরু-হিয়ায়
এনেছে চল !!

এর প্রতি ছত্রে তিনটি লঘু ও একটি গুরু বর্ণ থাকবে। আমি চারটি ছত্রের স্তবকের স্থলে দশটি ছত্রের গুচ্ছ বা স্তবক সৃষ্টি করে' কেমন শোনায়, তা পরীক্ষা করেছি।

শ্রী ছন্দেও একটি ছোট ছোট ছত্রের কবিতা লেখা যায়। যেমন :

+ +
রাত দিন
রূপ তার
হয় ধ্যান
এন্তার !!

এর প্রতি ছত্রে দুটি মাত্র গুরু বর্ণ থাকবে।

প্রিয়া ছন্দেও ছোট ছোট ছত্রের কবিতা বেশ লেখা যায়। এই ছন্দের শ্লোকের প্রতি পাদে দুটি লঘু একটি গুরু একটি লঘু ও একটি গুরু বর্ণ থাকবে। যেমন :

। । + । +
তুমি বুঝ ছ ছাই !
জানো অঙ্ক-তিন !
করো তর্ক খুব,
কথা তিক্ত নিম ॥

আজ আর বেশী বলতে চাইনে। তা হোলে আমার কথাও তিক্ত নিমের মতো ঠেকবে। এতেই না জানি পত্রিকের কবিবৃন্দ কি ভাবছেন।

সর্বশেষে বলতে চাই—যা ছন্দোবদ্ধ নয়, যাতে মিল নেই, যা আবৃত্তি করা যায় না, যে-সব কবিতা অশেষ চিন্তা করে' বুঝতে হয়, মস্তিষ্ক থেকে বেরোয়, তা কবিতা নয় গবিতা। এসব গবিতা মহাকালের দরবারে শাশ্বত হয়ে টিঁকে থাকবে না। এভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার দিন ফুরিয়ে এসেছে। আর কেন ?

সংসার-যাত্রার জন্য যেটুকু দরকার, সেইটুকু কাজ করবে। বেশী কাজ জড়াবে না। আর নির্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে যেন সেই কাজগুলি নিষ্কামভাবে হয়। তাঁর শরণাগত হয়ে থাকবে।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

মাইকেল স্মরণে

শ্রীবিজয়গোপাল বসু

আজ থেকে প্রায় এক শ' বছর হ'তে চলল, আমার এক দাদামশাই যশোরের নর্মাল স্কুলে পড়তেন। সে স্কুলটি যশোর হ'তে অনেক কাল উঠে গেছে। যশোর জেলা থেকে খুলনা জেলা তখনও পৃথক হয় নি। খুলনা ছিল যশোরের একটি মহকুমা মাত্র। বঙ্কিমবাবু খুলনায় সে সময় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। রূপসা নদীর পাড়ে তিনি থাকতেন। নদীর শোভা তাঁর বই লেখার উপাদান যোগাত। তখনও রেল-গাড়ী খুলনায় যায় নি। খুলনা থেকে সাধারণ লোকে হাঁটাপথে যশোরে যেত। পথে চট্টি থাকত। চট্টিতে রেঁধে খাওয়ার সুবিধা ছিল। আর যাঁরা সঙ্গতিপন্ন তাঁরা হয় পাল্কীতে না হয় নৌকায় যাতায়াত করতেন। ঘোড়ায় চড়েও কেউ কেউ চলাফেরা করতেন।

কলকাতা থেকে বনগাঁ পর্যন্ত রেলগাড়ী ছিল। বনগাঁয় ঘোড়ার গাড়ী মিলত। পাঁচ-ছয় জনে শেয়ারে (share) তা ভাড়া করতেন। ধনীরা নিজেরাই ভাড়া ক'রে গাড়িতে চড়তেন; আর কাউকে তাতে নিতেন না।

ঐ সময় মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্যারিষ্টারিতে বেশ নাম হ'য়ে উঠেছে। সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর নাম তারও আগে ছড়িয়েছিল। তাঁর "মেঘনাদ বধ কাব্য" ধ্রুব নক্ষত্রের মত সাহিত্য-গগনে ভাস্বর হ'য়ে আছে। 'মাইকেলের মেঘনাদ বধ' কথাটা নিরক্ষর ব্যক্তির মুখেও শোনা যেত।

একবার একটি ফৌজদারি মোকর্দ্দমায় আসামী-পক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি যশোরে এসেছিলেন। মামলার ধার্য তারিখের দিন আট-দশ আগে মাইকেল মধুসূদনকে বায়না করা হ'লে বিদ্যুৎগতিতে সংবাদটা যশোর শহরে এমন কি সুদূর পাড়াগাঁয়েও প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। বালক, যুবক, বৃদ্ধ প্রত্যেকেই তাঁকে দেখবার জন্য উৎসুক হ'য়ে ওঠেন। মাইকেল যশোর জেলার লোক। যশোর শহরে তাঁর নিকট-আত্মীয়ও যে পাঁচ-দশজন না ছিলেন, তা নয়। তাঁরাও মধুসূদনের গৌরবে গৌরব বোধ করছিলেন।

কলকাতার বাইরে জনসাধারণের নিকট মাইকেল এক নূতন জীব ব'লে গণ্য ছিলেন। হিন্দুর ছেলে বাপ-মার সামনে খৃষ্টান হ'য়ে মেম বিয়ে ক'রে ঘর-কন্না করছেন। বিলেতে কয়েক বছর থেকে বিলেতি আদবে লেখাপড়া শিখে ব্যারিষ্টার হয়েছেন। মফঃস্বলের লোক মোক্তার বল্‌লে বেশ বোঝেন, উকিল বল্‌লে তার চেয়ে বড় কিছু বোঝেন। ব্যারিষ্টার যে কত বড় তা ধারণায় আনতে পারেন না। উপরন্তু তিনি আবার 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র লেখক!

যেদিন বনগাঁ ষ্টেশনে নামলেন সেদিন তাঁকে দেখবার জন্য ষ্টেশনে খুব ভীড় হয়। সাধারণ ঘোড়ার গাড়ীতে মাইকেলের মত লোককে যশোরের মত যায়গায় চড়ালে তাঁর মর্যাদার উপযোগী কাজ হবে না এবং অন্য যায়গায় নিন্দে হবে, এজন্য চাচড়ার রাজবাড়ী থেকে সাতঘোড়ার একখানা সুন্দর গাড়ী আসে।

যশোরের ডাকবাঙ্গালায় তখন খড়ের ছাউনি এবং ইটের দেওয়াল ছিল। মাইকেলের মক্কেলেরা আগে থেকেই একটা ঘর ভাড়া ক'রে রেখেছিল এবং তাঁর খাবার ব্যবস্থাও তাদের ব্যয়ে সেখানে হয়েছিল। দাদামশায় বলেছেন—সকালে কফি, টোষ্ট, কেক আর ডিম-সেদ্ধ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। এক বোতল হুইস্কিও টেবিলের ওপর রাখা হয়। তিনি ঘন ঘন মদ খেতেন।

মাইকেল বনগাঁ থেকে রওনা হয়েছেন শুনে তাঁর যাতায়াত রাস্তার দু'ধারে তাঁকে দেখবার আশায় লোক জমা হতে লাগলো। পুরুষমহিলারাও ঘোমটা দিয়ে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছিলেন।

ডাকবাঙ্গালায় পৌঁছিলে যশোরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এসে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁর এক মাতুল মধুসূদনকে রাত্রিবেলায় খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছিলেন।

আমার দাদামশাইএর বয়স তখন চৌদ্দ-পনর —নর্মাল স্কুলের দ্বিতীয় বর্ষ শ্রেণীর ছাত্র। স্কুলের আর কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে তিনি বিকেলবেলায় মাইকেলকে দেখতে যান। তিনি এ সময় খাবারের পরিচারী করছিলেন। ছাত্রেরা দূর থেকে দেখলো তাঁকে। কাছে যাবার সাহস কারো হয় নি। তাঁর গায়ের রং ছিল ঘোর কালো, মাথায় পাট করা কোঁকড়ান চুল, মুখের চাপদাড়িও পাট করা এবং কোঁকড়ান, থুথনিটায় কোন দাড়ি ছিল না। তাঁর পোষাক ছিল বিলেতী। তবে অন্তরটা ছিল দেশী। তা যদি না হবে তবে তিনি রামায়ণের কাহিনী নিয়ে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় 'মেঘনাদ বধ কাব্য' রচনা করতে পারতেন না।

মধুসূদন ছেলেদের ভালবাসতেন। তিনি বলতেন ছেলেরাই দেশের ভাবী মেরুদণ্ড। তিনি তাদের হাত-ইসারায় কাছে ডাকেন। শিক্ষক যদি কোন ছাত্রকে নিকটে আসতে বলেন তবে সে ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে পড়ে আর মাইকেলের মত লোকের কাছে তাঁদের যেতে হ'চ্ছে তাঁদের দেহ মনের অবস্থা তখন যে কি রকম হ'য়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। মুখে ভাষা ছিল না, পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল। স্কুলের ছাত্রেরা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নমস্কার ক'রে সম্ভ্রম করতে জানে। দাদামশাইরা মাইকেলের সামনে এসে তাঁকে নমস্কার করলেন। মধুসূদন প্রথমতঃ তাঁদের নাম, বাড়ী এবং পিতার নাম প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করলেন। কাউকে কাউকে তিনি চিনতে পারেন। তারপর কে কোন্ ক্লাশে পড়েন তারও খোঁজ নেন। মাইকেল তাঁদের উৎসাহ দিয়ে বলেন যে, তাঁরা পড়া শেষ ক'রে যেন বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিতে মন দেন। বঙ্গদেশে বাঙ্গালাভাষার উন্নতি করতে উপকরণের অভাব হ'বে না। তাঁরা হয়ত মনে করতে পারেন বিদেশী ভাষা না শিখলে বাঙ্গালা সাহিত্যের উপাদানের অভাব হ'য়ে পড়বে। কিন্তু সে ধারণা ভুল। এ সময় তিনি কাশীরাম দাসের মহাভারতের কথা পাড়লেন। খাঁটি বাঙ্গালী হ'য়ে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় কেমন সুখপাঠ্য মহাভারত রচনা করে গেছেন, তেতলায় বসে ধনীর সন্তান কাশীদাসী মহাভারত পড়ছেন আবার গাছতলায় বসে ভিখারিও কাশীদাসী মহাভারত পড়ছে।

কথাগুলি বলা হ'লে মধুসূদন তাঁদের ঘরে গিয়ে পড়াশুনা করতে বলেন। দাদামশাই মাইকেলকে জীবনে আর কখনও দেখেন নি।

ঘোড়ার চোখের দুই পাশে ঢাকা দিয়ে দিলে ঘোড়া ঠিক সোজা যায়। সেইরূপ সংসারী ব্যক্তি যদি জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করে সংসারে চলে, তবে সে ঠিক ধর্মপথে থাকতে পারে—কুপথে যাবার ভয় থাকে না।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

ভারতের তীর্থদর্শনে

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নির্দেশমত দ্বিতীয় দিনে পয়স্বিনী নদীর রামঘাটে স্নান কোরে চার মাইল দূরে সংকর্ষণ পর্বতে 'কোটীতীর্থ' দর্শন করতে যাই। এই তীর্থদর্শনের পথ বড় দুর্গম। ঝোপজঙ্গলের মধ্যে প্রায় আড়াই মাইল উঁচু-নীচু পাথুরে মাঠের রাস্তা চলার পর খয়ের কাঁটার বনের মধ্য দিয়ে একটা পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হ'লাম। এখানেও ঘন বন। এরূপ বনে ব্যাঘ্রাদি যে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই বনের মধ্য দিয়েই আবার পাহাড়ে উঠবার সিঁড়ি। তিন শত ষাটটি ধাপ এই সিঁড়ির। পান্নার ধার্মিক রাজা এই সব সিঁড়ি তৈরী করিয়েছেন। আমরা ধীরে ধীরে সবগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠে কোটীতীর্থে পৌঁছাই। যিনি হাঁটতে পারেন না, তিনি আট-দশ টাকায় একটা ডুলি ভাড়া কোরে চিত্রকূট থেকে কোটীতীর্থে যাতায়াত করেন। কোটীতীর্থকে স্থানীয় লোকেরা চল্‌তি ভাষায় 'কোট তীরথ' বলে। এখান থেকে চার-দিকের দৃশ্য অতি মনোরম; দেখতে দেখতে পথশ্রম সব দূর হয়ে গেল। এখান থেকে একটা নির্মল শীতল জলের ঝরণা নীচের কুণ্ডে পড়ছে। এই জল যাত্রীগণ স্নানার্থ ও পানার্থ ব্যবহার করেন। আবার এই কুণ্ড উপছে গিয়ে যে জল এর নীচের একটা কুণ্ডে পড়ছে তা কাপড় কাচা, বাসন মাজা প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়। কুণ্ডের একটু উপরে পর্বতগুহায় তীর্থদেবতা মহাবীর হনুমানের মূর্তি, তার পাশে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুমূর্তি। গুহার পাশের কুঠরীতে রামানুজাচার্য স্বামীর মূর্তি। এঁকে কোটিমুনি বলা হয়। এক কুঠরীতে কয়েকজন রামভক্ত সাধু বাস করেন। মন্দিরের প্রধান মোহান্ত বেশ পণ্ডিত, জ্ঞানী ও সদাশয়।

আমরা পাহাড়ের উপর ভাগের দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শন করতে করতে নিবিড় জঙ্গলের ভিতর দিয়ে প্রায় তিন মাইল পাথুরে রাস্তা চলে পর্বতের প্রান্তদেশে হাজির হলাম। এখানে নীচে নামবার সিঁড়ি। এ সিঁড়িরও ৩৬০টি ধাপ। কিছুদূর নেমে দর্শনীয় "বাকে সিদ্ধ" মহাপুরুষের আশ্রম, পম্পাসর ঝরণা, ঋষতীর্থ, দেবাঙ্গনা, সিদ্ধাশ্রম ও গৃধ্রাশ্রম দেখা হল। সিদ্ধাশ্রমের দুই মাইল পূর্বে মণিকর্ণিকা তীর্থ। সিদ্ধাশ্রম ও মণিকর্ণিকার মাঝে চন্দ্র, সূর্য, বায়ু, অগ্নি ও বরুণদেবের বাসস্থান পাঞ্চতীর্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। কিছুদূরে ব্রহ্মপদ তীর্থ। পর্বতের প্রায় শেষপ্রান্তে সীতাদেবীর রান্না করার স্থান—"সীতার সোই" দেখলাম। সিঁড়ির আর কয়েক ধাপ নেমে "হনুমান ধারা" দর্শন হলো। হনুমানজীর শায়িত মূর্তির উপর একটি ঝরণার শীতল জলধারা সর্বদাই পড়ছে। এ স্থানের ও এর আশেপাশের দৃশ্য অতি মনোরম। "হনুমান ধারা" সংকর্ষণ পর্বতের শেষ তীর্থ। এখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রায় চার মাইল গেলে চিত্রকূটে ফেরা যায়।

তৃতীয় দিনে রামঘাটে প্রাতঃস্নান করে দশ মাইল দূরে মহর্ষি অত্রিমুনি ও তৎপত্নী অনুসূয়া দেবীর আশ্রমে যাওয়া হয়। এ রাস্তা আরও দুর্গম ও সঘন বনে পরিপূর্ণ।

চিত্রকূট থেকে নদীর অপর পারে গিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। চিত্রকূট থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে নদীগর্ভে "জানকী কুণ্ড"। জনকনন্দিনী এখানে মন্দাকিনীতে স্নান করতেন। নদীগর্ভে বড় কালো পাথরের উপর জানকীর পদচিহ্ন আছে। এখান থেকে দেড় মাইল আগে "স্ফটিকশিলা"। এতে শ্রীরামচন্দ্র, জানকী ও লক্ষ্মণের পদচিহ্ন রয়েছে।

এই স্ফটিক-শিলাতেই দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত কাকরূপ ধরে চঞ্চু দ্বারা সীতাদেবীর বক্ষে আঘাত করলে শ্রীরামচন্দ্র কাকটীর উপর ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেন। জয়ন্তের এই ঘোর বিপদে তৎপত্নী নানা স্তবস্তুতির দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রকে সন্তোষবিধান করেন এবং শ্রীরামচন্দ্রও ঐ মৃত্যুবাণ ফিরিয়ে নেন। তদবধি উক্ত ঘটনাস্থল 'দেবাঙ্গনা তীর্থ' নামে অভিহিত করা হয়। উক্ত সাধ্বী রমণীর একটি মূর্তিও ওখানে আছে। স্ফটিক-শিলা পর্বতের সীমানা পার হয়ে, গাড়ী থেকে নেমে লাঠির ভরে পর্বতে উঠতে লাগলাম ও ক্রমশঃ আরও গভীর জঙ্গলে গিয়ে পড়লাম। এইরূপ কোথাও গাড়ীতে, কোথাও হেঁটে পাঁচ মাইল অতিক্রম করার পর মহর্ষি অত্রিমুনির আশ্রমে উপস্থিত হই। সেখানে চারধারের অপূর্ব শোভা দেখে ও মন্দাকিনীর শীতল জলে স্নান করে পথশ্রম অচিরে দূর হল; এখানে আছে মহর্ষির মন্দির, তৎপুত্র দত্তাত্রেয়ের মন্দির ও অনসূয়া দেবীর মন্দির। তপস্বিনী সতী অনসূয়া দেবীর তপঃপ্রভাবে মন্দাকিনী নদী এই স্থান হতে উদ্ভূতা। ধন্য মহর্ষি অত্রি, ধন্য তাঁর তপস্যা। ধন্য দেবী অনসূয়া, ধন্য তাঁর আদর্শ পাতিব্রত্য, ধন্য তাঁর কঠোর তপস্যা। কত যুগ অতীত হয়েছে এখনও তাঁদের কীর্তি অটুট। কত শত নরনারী আজও দারুণ পথশ্রম সহ্য করে তাঁদের পবিত্র আশ্রম দর্শন করতে চলেছে ও তাঁদের তপোধন মূর্তি দর্শন করে ধন্য বোধ করছে।

আশ্রমের পাশেই মহর্ষি দুর্বাসা ও চন্দ্রদেবের মন্দির আছে। শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষি অত্রিমুনির আশ্রম থেকে যে রাস্তাতে শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে গিয়েছিলেন, সেই রাস্তাই এখনও আছে। সতী অনসূয়া দেবীর মন্দির থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে একটি ঝরণা ও তার কাছে গুহাতে একটি হনুমান মূর্তি আছে। এখান থেকে দেড় মাইল দূরে প্রকাণ্ড বিরাধ কুণ্ড। লক্ষ্মণ এখানে গর্ত খুঁড়ে বিরাধ রাক্ষসকে পুঁতেছিলেন। গর্তটী খুব গভীর। ইংরাজ রাজত্বের সময় গভীরতা মাপবার চেষ্টা হ'য়েছিল, ফল হয় নি। এই বিরাধ কুণ্ড থেকে 'টিকরিয়া' গ্রামে রাত্রিবাস করে পরদিন বন পথেই প্রায় দশ মাইল ঘুরে মহর্ষি শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে যেতে হয়। একদা এই মুনিবর, শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত ক'রে তাতে আপন শরীর পরিত্যাগ করেন। এখানে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির আছে। হিংস্র বন্যজন্তুর ভয়ে সন্ধ্যার অনেক আগেই এই মন্দিরের বাইরের দরজা বন্ধ করা হয়। যাত্রীরা মন্দিরের ভিতরে থাকতে পারে। এখান থেকে প্রায় দশ মাইল ঘুরে, মহর্ষি অগস্ত্য মুনির শিষ্য সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রম। এই আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্র অনেক দিন ছিলেন। এখানেও রাম-মন্দির আছে।

সতী অনসূয়া দেবীর আশ্রম থেকে গুপ্ত গোদাবরী যেতে হ'লে এখান থেকে চার মাইল ঘুরে বাবুপুর গ্রামে সেদিনের মত রাত্রিবাস করতে হয়। যাত্রীদের থাকবার জন্য গ্রামে ধর্মশালা ও আবশ্যকীয় খাবার জিনিষের দোকান আছে। চতুর্থ দিনের স্নান, পরদিন এখান থেকে দুই মাইল ঘুরে গুপ্ত-গোদাবরীতে করতে হয়। অন্ধকার গুহার মধ্যে ১৫।১৬ গজ গিয়ে সীতাকুণ্ড নামে একটি কুণ্ড পাওয়া যায়। ঝরণার জল সর্বদা এর মধ্যে পড়ছে। সীতাদেবী এখানে নিভৃতে স্নান করতেন। কুণ্ডটি গভীর নয়; বসে স্নান করতে হয়। অন্ধকারের জন্য মশাল জ্বালিয়ে এখানে যেতে হয়। দুটি জল-ধারা এখান থেকে গুহার বাইরে এসে অন্য দুটি কুণ্ডে পড়ছে; তারপর জলস্রোত অদৃশ্য অর্থাৎ গুপ্ত হয়ে গেছে; সেজন্য এর নাম গুপ্ত গোদাবরী। এখানেও চারদিকের দৃশ্য বড় সুন্দর। কেহ কেহ এই জায়গাকে গোদাবরী নদীর উৎপত্তি স্থান বলেন। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে ইহা প্রবাহিত হ'য়ে নাসিকের কাছে বের হয়েছে। বিন্ধ্যবাসী—এই অন্ধকার গুহার শেষ দেখবার জন্য পান্নার মহারাজ লোকজন সঙ্গে নিয়ে ও গুহামধ্যে মশাল জ্বালাবার জন্য ১৮ মণ

তেল নিয়ে গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে নয় ঘট তেল শেষ হয়ে গেল, তবুও গুহার শেষ মিলল না। ফেরৎ যেতে বাকী নয় ঘটের দরকার হবে, সেজন্য সেখান থেকেই তাঁকে ফিরতে হ'ল। গুহার বাইরে পাহাড়ের উপর মানুষের আকৃতির একটি ১০।১২ ফিট উঁচু পাথর আছে; একে হাত দিয়ে নাড়ালে খটখট শব্দ ক'রে দুলতে থাকে। সেজন্য এটীকে খটখটা চোর বলে। প্রবাদ,—কোন দুষ্ট প্রকৃতির লোক লুকিয়ে সীতাদেবীকে গুহামধ্যে কূপে স্নানের সময় দেখত। পরে এই ঘটনা জানতে পারায় সীতাদেবী তাকে অভিশাপ দেন। তদবধি সে এখানে পাষাণ হয়ে আপন দুষ্কর্মের সাক্ষ্য দিচ্ছে। গুপ্ত গোদাবরীর আশপাশে ঋষভ-তীর্থ, বদরিকাশ্রম, তামস-তীর্থ এবং পুষ্কর তীর্থ দর্শন করে অনেকে চিত্রকূটে ফিরে যান এবং সেখান থেকে তার পরদিন পঞ্চম দিনের তীর্থাদি দর্শনে যাত্রা করেন। চিত্রকূট এখান থেকে সাত মাইল। অনেকে চিত্রকূটে না ফিরে এখান থেকেই পঞ্চম দিনের তীর্থাদি দর্শনে যান ও সে সমস্ত দর্শন করে চিত্রকূটে ফিরে আসেন এবং এখানকার তীর্থযাত্রা সমাপ্ত করেন। গুপ্ত গোদাবরী থেকেও শরভঙ্গ মুনির আশ্রম ও বিরাধ কূপে যাওয়ার রাস্তা আছে। এ পথও জঙ্গলে পূর্ণ ও দুর্গম।

পঞ্চম দিনের কৃত্য, চিত্রকূট থেকে চার মাইল দূরে ভরতকূপে স্নান ও ভরতের মন্দির দর্শন। গুপ্ত গোদাবরী থেকে ওখানে যেতে হ'লে, প্রায় দুই মাইল দূরে চৌবেপুর গ্রামে রাত্রিবাস করতে হয়। পরদিন ওখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল গেলে ভরতকূপে পৌঁছান যায়। ভরতকূপ নামে রেলষ্টেশন থেকে এই জায়গা এক মাইল। শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের সময়ে যখন ভরত তাঁকে ফিরিয়ে আনতে যান, তখন কুলগুরু বশিষ্ঠ ও অন্যান্য বহু মুনিদের আদেশে এবং পাত্রমিত্র ও প্রজাদের অনুরোধে, রামের রাজ্যাভিষেক করবার জন্য সমস্ত তীর্থের পবিত্র জল তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র রাজসিংহাসন গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে মহর্ষি অত্রিমুনির আদেশে সেই পবিত্র তীর্থজল এক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। ঐ কূপই সর্বতীর্থময় ও ভরতকূপ নামে অভিহিত। যাত্রীরা এর পবিত্র জলে স্নান করে ও নিকটেই ভরতের মন্দির দর্শন করে।

এই স্নান ও দর্শন শেষ ক'রে যাত্রীরা চিত্রকূটে ফিরবার পথে 'রামশয্যা' দেখতে যায়। (কোন এক সময়, শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে ভ্রমণ করতে করতে নিজ পর্ণকুটির হ'তে অনেক দূর গিয়ে পড়েন। অনেক রাত হয়ে পর্ণকুটিরে ফিরতে; অগত্যা শ্রীরামচন্দ্র এখানেই রাত্রিবাস করেন। সেজন্য একে 'রামশয্যা' বলে)। এক খণ্ড বড় ও সমতল পাথরের উপরে দু'জনের শোওয়ার চিহ্ন রয়েছে। এক পাশে শ্রীরামচন্দ্রের, মধ্যে ধনুর্বাণের ও অন্যপাশে সীতাদেবীর। এই দর্শন শেষ করে চিত্রকূটে ফিরে এলে এখানের তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ হয়।

অনেকে আবার কামদা পর্বত থেকে ১৫ মাইল দূরে বন জঙ্গলের মধ্যে মহর্ষি বাল্মিকী মুনির আশ্রম দেখতে যান। এখানে হেঁটে যেতে হয়, গাড়ী যাওয়ার রাস্তা নেই। ছোট্ট নদীর তীরে বন জঙ্গলের মধ্যে মহর্ষির আশ্রম। এখানেই তিনি রামায়ণ রচনা করেন। এই আশ্রমেই সীতা নির্বাসিতা হয়েছিলেন। এখানেই তিনি লবকুশ নামে যমজ পুত্র প্রসব করেন। এই স্থান লালাপুর পাহাড়ে 'বছোই' নামক গ্রামে অবস্থিত। কামদা পর্বতের কাছেও একটি বাল্মিকী আশ্রম আছে। চিত্রকূটে শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করতে এলে মুনিবর এখানে থাকতেন।

চিত্রকূট থেকে ২০ মাইল ও করোয়ী থেকে ১৮ মাইল দূরে গোস্বামী তুলসীদাসের জন্মস্থান 'রাজাপুর' গ্রাম। এখানে একটি উঁচু টিলার উপর গোস্বামীজীর সুন্দর একটী মন্দির আছে। রাজপুরে তাঁর এক বংশধর এখনও আছেন ও তাঁর কাছে গোস্বামীজীর স্বহস্ত লিখিত রামায়ণের কেবলমাত্র অযোধ্যাকাণ্ড অতি জীর্ণাবস্থায় সযত্নে রক্ষিত আছে। কোনও

সময়ে চোর তাঁর গৃহের সমস্ত জিনিষ চুরি করে, সঙ্গে সোটা রামায়ণও চুরি যায়। পরে কেবলমাত্র এই খণ্ডটি গ্রামের পাশে নদীতে পাওয়া যায়। যাই হ'ক চিত্রকূট ও আশপাশের তীর্থাদি দর্শন এখন শেষ হল। এইবার এখান থেকে অযোধ্যা দর্শনে যাত্রা করব। সে কথা আগামীতে বল্‌ব।•

মায়ের পায়ে

শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবর্তী, এম্. এ., কাব্যতীর্থ

তোমার অরূপ সায়র-কূলে
যাগো, আমায় তোলো,
শ্রান্ত আমার চরণ দুটি,
দুয়ার তব খোলো।
তন্দ্রা নামে নয়নপাতে
ভাঙে হিয়া কঠোর ঘাতে,
আজি অমা-গহন রাতে
দৈন্য আমার তোলো,
একটুকু ঠাঁই চাই যা শুধু
আমায় কোলে তোলো।

হেথায় হাসি ফুরায় না আর
আলোয় আলো সব,
নুতো গানে জীবনটা এক
বিপুল মহোৎসব!
শূন্য ভিক্ষাঝুলিটিরে
হেথায় বহি' পেলেম ফিরে
বিদায়বেলায় অশ্রুনীরে
পরম অনুভব—
তুমি আছো জননী গো,
এ মহাগৌরব!

মরুমায়ার মৃগতৃষায়
মরম জ্বলি' যায়
দুঃখে তবু দুঃখ আমি
মানব না ধরায়।
তুমি আছো সকল মাঝে
হৃদয়ে মোর এ গান বাজে,
দুঃখনিশার শুকতারা যে
তোর ভাতি ছড়ায়
অশ্রু-সজল শিউলি হিয়ায়
ঝরে মা তোর পায়।

• এই প্রবন্ধের কয়েকটি স্থানের বিস্তৃত বর্ণনা সংক্ষিপ্ত করা হ'ল। সঃ চিঃ

মনস্বিনী গোলকমণি

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

এক

মনীষী শিবনাথ শাস্ত্রীর জননী গোলকমণি।

শিবনাথের শৈশব থেকেই গোলকমণি তাঁর মনের সেরা ভাবগুলি শিবনাথের মনে জাগিয়ে দিয়েছেন। শিবনাথের বর্ণপরিচয় যখন সম্পূর্ণ হ'ল এবং যখন তিনি বেশ পড়তে শিখলেন, তখন গোলকমণি নিয়ম করলেন—যেদিন শিবনাথের পাঠশাল বা স্কুল বন্ধ থাকবে সেদিন কৃত্তিবাসের রামায়ণ প'ড়ে শোনাতে হবে তাঁকে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর গোলকমণি বিশ্রাম করতেন। তখন শিবনাথ তাঁকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ সুর ক'রে প'ড়ে শোনাতেন। এতে সুফল ফল পাওয়া গেল। কৃত্তিবাসের রামায়ণের বহু অংশ শিবনাথের কণ্ঠস্থ হয়ে গেল। যৌবনে যখন তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন, তখনো রামায়ণের ওপর প্রবল আকর্ষণ তাঁর ছিল। রামায়ণের আদর্শ থেকে আর কোনো উচ্চতর আদর্শ পৃথিবীতে থাকতে পারে, এ শিবনাথ ভাবতে পারেন নি।

যে কাজ গোলকমণি একবার কর্তব্য ব'লে মনে করতেন, হাজার বাধাবিপত্তিতেও সঙ্কল্পচ্যুত হতেন না।

একবার দুর্ভিক্ষ হ'ল গ্রামে।

বহু লোক একদিন ওঁদের গ্রামে এল। ওদের মধ্যে একটি নীচজাতির লোক চরম অবস্থায় মৃতপ্রায় হয়ে এসে পড়ল ওঁদের পাড়ায়। অনেক কুলনারী সেখানে জড় হলেন। গোলকমণিও খবর পেয়ে এলেন।

: তুমি কতদিন খাওনি? স্নেহময় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন গোলকমণি।

ক্ষুধার জ্বালায় লোকটি অস্থির। তার মুখ দিয়ে কোনো বাক্যই নিঃসৃত হ'ল না। শুধু ইসারা ক'রে কি জানি কি বললে। গোলকমণি ওর অন্তরের কথা বুঝতে পারলেন। তিনি অস্থির হয়ে বলে উঠলেন,—আমি ওর মুখে ভাত দেব।

ব'লেই গোলকমণি বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন।

তখন অন্য সব কুলনারীরা গালে হাত দিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি ক'রতে লাগলেন: ওমা! তা' কেমন ক'রে হবে! ও কি জাত, তার ঠিক নেই। কোনো নীচু জাতের লোককে ডেকে এনে খাওয়ালেই ত' হয়।

গোলকমণি ফিরে এলেন। এক থালা ভাত হাতে ক'রে ফিরে এলেন। ভাতের পাশে তরকারী।

ভাত দেখে গোলকমণি ওর মুখে দিতে লাগলেন। লোকটি পেট ভরে ভাত খেলে। গোলকমণি জল এনে দিলেন। সে জল খেলে।

কিন্তু লোকটি জল খেয়েই মারা গেল। গোলকমণি কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতেই বললেন: ও বোধ হয় পূর্বজন্মে আমার কোনো আত্মীয় ছিল।

দুই

গোলকমণি পুত্রের সৌরবে নিজেকে সৌভাগ্যবতী ভাবতেন। শিবনাথের সম্বন্ধে কেউ কোনো নিন্দে করলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। শিবনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলে গ্রামের প্রায় অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে নানা অপ্রিয় কথা বলতে লাগলেন। গোলকমণির কাণে পুত্রের নিন্দে এল। তিনি ক্রোধে অস্থির হয়ে উঠলেন। তারপর একদিন যখন গ্রামের একটি মহিলা শিবনাথকে বিধর্মী বলে তাঁর সামনে নিন্দে করতে লাগলেন, তখন তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। চীৎকার ক'রে তাঁকে শুনিয়ে

দিলেন : কী, তোরা আমার ছেলের নিন্দে করিস্? তা দেখ., বেটা ও এক এ দেশের ভিতর আমিই প্রসব করেছি।

থামলেন-গোলকমণি। আবার বললেন : ওলো লক্ষ্মীছাড়িরা, তোরা ত' পাঁচটা প্রসব করেছিস্। আমার বেটার আবার নিন্দে করিস্? খবরদার!

স্বামী-স্ত্রীতে স্নেহ-ভালোবাসা এবং প্রেমের অভাব ছিল না যেমনি, ঝগড়া-ঝাঁটিরও বিরাম ছিল না। কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'ত না। বারো বছর বয়েসে গোলকমণির সঙ্গে হরানন্দের বিয়ে হয়। ঐ বয়স থেকেই গোলকমণি শ্বশুর ঘর করতে থাকেন। হরানন্দ কিন্তু স্ত্রৈণ ছিলেন না। তিনি বলতেন : যারা স্ত্রীর কথা শুনে চলে, তারা এক একটা আস্ত পাঁঠা। তাদের তিনি এত ঘৃণা করতেন যে, তা' কথায় প্রকাশ করবার নয়। গোলকমণি যখন তাঁকে কোনো কাজ করবার জন্ত বলতেন, তখন তিনি অত্যন্ত রাগ করতেন। বলতেন : তুমি কি আমাকে আজ্ঞাকারী কিঙ্কর পেয়েছ? হরানন্দের কোষ্ঠীতে স্ত্রীর কথা শুনতে লেখেনি।

টাকাকড়ি খরচ করা সম্বন্ধে হরানন্দ তেমন কার্পণ্য করতেন না। খরচ ক'রে অনেক সময় হিসেব রাখতে পারতেন না। পৃথিবীতে যেমন সমস্ত স্বামীর বাক্স থেকে সমস্ত স্ত্রীই লুকিয়ে টাকাকড়ি সরিয়ে নিজেদের আঁচলে বাঁধেন, গোলকমণিও তাই করতেন। টাকা-পয়সার হিসেব না থাকার জন্ত হরানন্দ এই কর্মটি করতে পারতেন না। যখন টাকা থাকত না, টাকা খরচ করবার সময়—তখন হরানন্দ মুস্কিলে পড়তেন। স্ত্রীর কাছে এসে বলতেন : বিপদ হ'ল দেখছি। হাতে পয়সা নেই। অথচ খরচ রয়েছে প্রচুর। কি করি বল ত' গিন্নী?

গোলকমণি তখন সহানুভূতি দেখিয়ে বলতেন : পাড়াপড়শীর কাছ থেকে সুদে টাকা ধার করে এনে দিতে পারি।

হরানন্দ আশ্বস্ত হতেন। বলতেন : তাই না হয় কর গিন্নী!

গোলকমণি বেরিয়ে পড়েন। পুকুর পাড় থেকে ঘুরে এসে নিজের বাক্স থেকে টাকা দিয়ে যথাসময়ে সুদ সমেত টাকা আদায় করতেন।

বস্তুতঃ, হরানন্দের টাকাই অসময়ে তাঁর-ই কাজে লাগত। স্বামীর খরচের বহর দেখে গোলকমণি চোখে অন্ধকার যে সময়-সময় দেখতেন না, তা নয়। ভবিষ্যতে টাকার দরকার হ'লে স্বামী কি পরের কাছে দেনা করতে যাবেন? যাঁরা সাধারণ স্ত্রীলোক, তাঁরা সংসারে স্বামীর পকেট মারেন বা বাক্স থেকে টাকা সরান্ নিজেদের স্বর্ণালঙ্কারের মোহে বা বাপের বাড়ীর সাহায্যের জন্ত। গোলকমণি এসব কখনো চিন্তা করবার অবসর পেতেন না। তাঁর মন, তাঁর চরিত্র, তাঁর প্রকৃতি ছিল অনন্তসাধারণ। সাধারণের থেকে অনেকখানি তফাৎ।

দাম্পত্য কলহটা ওঁদের খানিকটা ছেলেমানুষী বলে মনে হ'ত। একটা কিছু ত্রুটী হলেই হরানন্দ স্ত্রীকে দশ কথা শুনিয়ে দিতেন। গোলকমণিও চুপ ক'রে থাকতে পারতেন না সব সময়ে। যদিচ তিনি স্বামীর ক্রোধকে অত্যন্ত ভয় করতেন, তবু সময়-সময় ঝগড়া করতেও ছাড়তেন না। গোলকমণি হরানন্দের চক্ষের আড়াল হ'লেই বৃদ্ধ বয়সেও হরানন্দ ক্রোধে ভেঙ্গে পড়তেন। একদিনের ঘটনা বলি :

পুত্র শিবনাথ আছেন চন্দননগরে। হরানন্দ ও গোলকমণি চন্দননগরে এলেন ও রইলেন কিছুদিন।

এই কিছুদিন থাকবার সময়, একদিন গোলকমণি তাঁতি-পাড়ায় বেড়াতে গেলেন।

হরানন্দ বাড়ী এসে একজনকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : গিন্নী কোথায়?

: তাঁতি-পাড়ায় বেড়াতে গেছেন।

হরানন্দ চলে গেলেন বাড়ীর বাইরে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে আবার তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন : গিন্নী আসেনি?

উত্তর হ'ল : না।

আবার হরানন্দ বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আবার ফিরলেন হরানন্দ। তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। হরানন্দ জিজ্ঞাসা করে জানলেন, তখনো গোলকমণি ফেরেন নি।

ভয়ানক রেগে গেলেন হরানন্দ। দু'হাত ওপর দিকে তুলে চীৎকার ক'রে বললেন : গিন্নীকে বলে পাঠাও—তাঁর আর ঘরে আসবার দরকার নেই। তিনি যেনো তাঁতিদের বাড়ীতেই থাকেন।

এই ব'লে হরানন্দ একখানা গামছা টেনে নিয়ে, কাঁধে ফেলে, সেই সন্ধ্যার সময়, রাগে ফুলতে ফুলতে গঙ্গার দিকে হন্ হন্ ক'রে চলতে সুরু করলেন।

হরানন্দ একদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবার পরই অন্য দিক দিয়ে গোলকমণি এসে বাড়ী ঢুকলেন। শুনলেন স্বামী বাড়ী নেই। চিন্তিত হয়ে বললেন : হ্যাঁরে, বুড়ো গেল কোথায় রে ?

বলতে বলতেই হরানন্দ এসে বাড়ী ঢুকলেন। তখন স্বামী-স্ত্রীতে মান-অভিমানের কলহ আরম্ভ হয়ে গেল। এমনি প্রায় প্রত্যহ।

দিন যায়। হরানন্দ একবার কঠিন পীড়ায় শয্যা নিলেন। বাঁচবার আর আশা নেই। তাঁদের একটি মেয়ে বাবার শয্যার পাশে বসে কাঁদছে। গোলকমণি তাকে ধমক দিয়ে বললেন : কাঁদিস কেন ? বুড়ো কখনো মরবে না। মলেই হ'ল কিনা ? আমি বুড়ো বয়সে একাদশী করে মরি ! বুড়োকে মরতে হবে না। তুই কাঁদিস নে।

হরানন্দ সে যাত্রা বেঁচে উঠলেন।

গোলকমণি মাথায় সিঁদুর নিয়েই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন।

কিন্তু হরানন্দ বলতেন : যত ঝগড়া করছ, একাদশী ক'রে শোধ করবে।

গোলকমণি গর্বভরে বলতেন : মরে গেছে আমার একাদশী করতে। ড্যাং ড্যাং ক'রে বুড়ো বোষাল ফেলে পালাব !

হরানন্দের মৃত্যুর তিন বছর আগে গোলকমণি মারা যান।

তিন

শিবনাথকে গোলকমণি প্রাণাধিক ভালোবাসতেন। যৌবনে শিবনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলে গোলকমণি বিশ্বাস করলেন—তাঁর পূর্বজন্মের কোনো পাপের জন্যই শিবনাথের এই দুর্মতি হয়েছে। তিনি শিবনাথের প্রতি কর্কশ ব্যবহার করলেন না। জন্মান্তরবাদের ওপর আস্থা রেখে জপতপ এবং ব্রতনিয়মের মাত্রা বেশ বাড়িয়ে দিলেন। যদি শুনতেন —ওমুক জায়গায় একজন ভালো জ্যোতিষী এসেছেন, অমনি তাঁর কাছে ছুটতেন শিবনাথের ঠিকুজী-কোষ্ঠী নিয়ে। পয়সা খরচ ক'রে কোষ্ঠীবিচার করাতেন।

১৯০৭ সালের জুন মাসে শিবনাথ জীবনসংশয় পীড়ায় শয্যাশায়ী হন। খবর পেয়ে গোলকমণি কলকাতায় শিবনাথের বাসায় এলেন। ছেলের রোগশিয়রে বসে সেবা করতে লাগলেন। সঙ্গে ক'রে তিনি এনেছিলেন—শিবনাথের প্রপিতামহের জপের মালা। গোলকমণির বিশ্বাস ছিল—ঐ জপের মালা শিবনাথের বুকে স্পর্শ করালে শিবনাথ রোগমুক্ত হয়ে উঠে বসবেন। আর হ'লও তাই। গোলকমণি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় ঐ জপের মালা শিবনাথের বুকে স্পর্শ করাতেন। শিবনাথ যমের হাত থেকে ফিরে এলেন।

একদিন গোলকমণির বড় ইচ্ছা হ'ল—ব্রাহ্মমন্দিরে গিয়ে শিবনাথের উপাসনা-উপদেশ শুনবেন।

যথাসময়ে গোলকমণি তাঁর এক নাত্নীকে সঙ্গে ক'রে এলেন ব্রাহ্মমন্দিরে। একেবারে সামনে গিয়ে একখানা বেঞ্চিতে বসলেন। শিবনাথ তখন উপদেশবাণী দিচ্ছিলেন। অনেক বাণী গোলকমণির কেন লাগল। তিনি শোনেন আর আনন্দে মাথা নাড়েন। কিন্তু শিবনাথ যখন বললেন : তোমরা সবাই শাস্তশক্তি না দেখে ঝাঁপ দিয়ে পড়,—তখন গোলকমণি

অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি থাকতে না পেরে চীৎকার করে বলে উঠলেন: যেসব জ্ঞানীরা তোমার মতো এত বোকা নয়। যা পড়বার তুমিই পড়েছ। ওদের পড়তে বয়ে গেছে'।

শিবনাথ জননীকে অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় তাঁর জনক-জননী অন্তরে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন। এটা শিবনাথও অন্তরের সঙ্গে উপলব্ধি করতেন। তাই তিনি লিখলেন:

'জননীর হাহাকারে ঘর ফেটে যায় রে,
পিতার পবিত্র শির ধূলিতে লুটায় রে!...'

'অন্তে ডাকি কেন কোথা গো জননী!
এস মা আমার জনম দুঃখিনী!
মায়ের বেদনা অন্তে ত জানে না,
সন্তানের মায়া অন্তে ত বোঝে না,
তুমি মা আমার স্নেহ কল্লোলিনি!
সন্তানের প্রাণে এস একবার।
এ দুস্তর সৃষ্টি শোণিতে তোমার
তব পদার্পণে, পুত্র-পাগলিনী,
জাগিবে হৃদয়, নাচিবে লেখনী।'

গোলকমণি ১৩১৪ সালে ৮১ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

গৌরী-মা

শ্রীসুবোধ রায়

জীবনেরে নিত্যকাল ডাক দেন জীবনবিধাতা,
আকাশে বাতাসে ভাসে সেই শান্ত ধ্রুব প্রতিধ্বনি।
সকল আঁধার ভেদি' মর্ম ছেদি' সে আহ্বান-গাথা
যে শুনেছে কানে,—তার শোণিতের কণা রণরণি'
সেই গান সে আহ্বান করে তারে অধীর পাগল।
গৃহের গহন স্নেহ তার কাছে যেন কারাগার,
আকুল বন্যার বেগে ভাঙে সে যে সকল আগল
সমুদ্রের আহ্বানেতে নদী যথা উদ্দাম দুর্বার।

তুমি মাতা, বৈশোরেতে শুনেছিলে সে অপূর্ব ডাক,
বাহিরিলে গৃহ হ'তে সকল ভাবনা তব ছাড়ি'।
তোমার জীবন-নদী যেন শুনি' ভগীরথ শাঁখ
আনন্দে সমুদ্রমাঝে আপনারে দিল যে উজাড়ি'।
পথের শতেক বাধা ব্যথা তব মিথ্যা হ'ল সবি,
প্রাণের বন্যার বেগে নিজপথ আপনি সৃজিলে
তোমার সাধনা যেন নারীর জীবনাকাশে রবি
ভাস্বর আলোকপাতে সমাজেরে দীপ্ত করি দিলে

তোমার পরশে শত মৃতপ্রাণ লভিল জীবন
খুলি দিলে আলো-দ্বার অন্ধকার মম কারাগারে
সকলের তরে তুমি আহরিলে পরম রতন,
নবশক্তি দিয়ে গেলে জননী-ভগিনী-দুহিতারে।

তোমার সাধনাসিদ্ধি সে যে চিরদীপ্ত অরুণিমা
জ্বালিল দেশের মাঝে চিরতরে অনির্বাণ শিখা।

ঝাড়গ্রামের লোক-সংগীত

শ্রীঅংশুমান রায়

(ঝিঙা ফুলের গান)

গত বৈশাখের 'বিশ্ববাণী'তে 'ঝাড়গ্রামের লোক-সংগীত' পর্যায়ে 'পাতা নাচের গান' আলোচনা করেছি। এবার আলোচনা করব 'ঝিঙা ফুলের গান' সম্বন্ধে। 'ঝিঙা ফুলের গান' এই 'পাতা নাচের গান'-এরই একটি শাখা বা একটি বিশেষ সংস্করণ। এই 'ঝিঙা ফুলের গান'-এ যে সমস্ত গান আছে তার অর্থ এবং ভাব একটু আলাদা।

'পাতা' কথাটার যেমন একটা অর্থ আছে, এই 'ঝিঙা ফুল' কথাটারও তেমনই একটা বিশেষ অর্থ আছে। ঝিঙা—যা আমরা সবজীর সঙ্গে খেয়ে থাকি এক রকম লতানো গাছে ফলে। প্রথমে কুঁড়ি হয়। পরে তার ফুল ফোটে; কোন কোনটার পরিণতি হয় ফলে, আবার কোনটা শুকিয়ে ঝরে যায়। এই ঝিঙা ফুলের পরমায়ু অত্যন্ত কম। মাত্র কয়েক ঘণ্টা এই ফুল তাজা থাকে। তারপর ক্রমশঃ নেতিয়ে পড়ে এবং দু'-একদিনেই ঝরে যায়। এঁরা কল্পনা করে নিয়েছেন এই ঝিঙা ফুলকে মানুষের যৌবনের সঙ্গে। মানুষের ক্ষণস্থায়ী যৌবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছেন এই ঝিঙা ফুলের কয়েক ঘণ্টা রূপ আর সতেজতার মধ্যে। আর এ কথা অতি সত্য যে, সারা জীবনের তুলনায় মানুষের যৌবনের সত্যিকারের সজীবতা কত অল্প সময়ের জন্য থাকে!

এই 'ঝিঙা ফুলের গান'গুলিতে এই ধরণের একটি ভাবকে প্রায় সর্বত্রই ব্যক্ত করা হ'য়েছে। আর এই গানে 'ঝিঙা ফুল' এই কথাটি প্রায়ই থেকে থাকে। যথা :

'সাঁঝে ফুটে ঝিঙা ফুল
সকালে মলিন রে,—
আজ বঁধা ছাঁড়ে গেলে
পরের অধীন রে॥'

এতক্ষণ যা বোঝাতে চাইছিলাম গানের প্রথম দুটি লাইনে তাই পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে। শেষের দুটি লাইন—'আজ বন্ধু আমায় ছেড়ে গেল। আর সে পরের অধীন হ'য়ে গেল।' অর্থাৎ গীতিকার যার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলেন তা হ'য়েছিল ঝিঙা ফুলের মত অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। যখনই সে অন্যের অধীন হ'য়ে গেল তখনই তার বন্ধুত্ব চলে গেল।

এখন বোধ হয় ব'লতে হবে না কেন 'ঝিঙা ফুলের গান' এই নামটি হোল। এখন দেখা যাক কেন এই গানগুলিকে 'পাতা নাচের গান'-এর শাখা বললাম। এখানে একটা কথা ব'লে রাখি, এইসব গান যাঁরা করেন তাঁরা কিন্তু 'ঝিঙা ফুলের গান' আর 'পাতা নাচের গান' অভিন্ন দেখেন। তাঁরা বলেন, 'দুটোই এক, কেবল 'পাতা নাচ' আর 'ঝিঙা ফুল' যা আলাদা আলাদা গান।' এ বলার কারণ এই যে, 'পাতা নাচ' আর 'ঝিঙা ফুল' এই দুটি গানের সুর একই রকম। শুধু তাই নয়, এই দু'রকম গানের নাচের পদ্ধতিও এক। কয়েকটি ছাড়া মাদলের বোল প্রায় ক্ষেত্রেই একই রকম। যাই হোক, নাম আলাদা ক'রে ভিন্ন শ্রেণীতে ফেলা হ'য়েছে ব'লে 'ঝিঙা ফুলের গান'কে পাতা নাচের সঙ্গে আলোচনা না করে আলাদা ভাবে করছি। ওঁদের ঐ মত আর বাস্তবক্ষেত্রে সামঞ্জস্যগুলি দেখে আমি এটিকে 'পাতা নাচের গানের' শাখা বলেছি। তাছাড়া বছরে যে সময় অর্থাৎ বৈশাখের শেষ থেকে আশ্বিনের প্রথম পর্যন্ত 'পাতা নাচের গান'গুলি গাওয়া হয়, এই 'ঝিঙা ফুলের গান'গুলিও সেই সময় গাওয়া হয়।

'ঝিঙা ফুলের গান'-এর আর একটি এই রকম :

'ঝিঙা ফুলে লিল আতিকুল
রে বাঁশির গানে॥

"মনে করি আসাম যাব
জোড়া পাখা টানাইব
রে বাঁশির গানে ॥
আসামে যে সাহেব দিল
বারমাসে তোর কপালের কীর্ত্তি,
তুয়ার লিল জাতি কুল
রে বাঁশির গানে ॥'

এই গানটি এখানে বিশেষ প্রচলিত। এর সঙ্গে যে তাল বাজে তা কিন্তু ঝুমুর নয়, কাহারবা। আট মাত্রার তাল। ঝুমের পার্থক্যের জন্ত সুরও একটু অন্ত রকম।

এখন দেখা যাক গানটির মানে করলে কি দাঁড়ায়। আসামের চা বাগানের কোন এক সাহেব হয়ত কোনকালে এসেছিল তার কাজের জন্ত লোক সংগ্রহ করতে। এখানে একটা কথা বলি,—আদৌ কোন কালে কোন সাহেব সত্যিই চা-বাগানের জন্ত লোক সংগ্রহ করতে এসেছিল কিনা তা জানা যায় না। তবে, এখানের লোক-সংগীতের গীতিকারেরা বাস্তবক্ষেত্রে কিছু না ঘটলে গান বাঁধতে পারেন না: তাই অনুমান করে নিচ্ছি যে, সাহেব এসেছিল। যাক, আসামে গেলে যে অনেক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারা যাবে—অবশ্যই এ সমস্ত লোভ সাহেব দেখিয়েছিল। সরল গীতিকার লোভ সামলাতে পারেন না। যৌবনের উন্মাদনায় সাড়া দেন সাহেবের ডাকে। দেশ ভিটা ছেড়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন। এখানে 'বাঁশির গান' আসলে সাহেবের ডাক। কবি ভেবেছিলেন, 'আসামে যাব আর (বড়লোক হয়ে) ঘরে জোড়া পাখা টানাবার ব্যবস্থা করব।' কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল একেবারে অন্ত রকম। কবি তাই আত্মনিরীক্ষা করে বলেছেন, 'আসামে সাহেব তোকে (অর্থাৎ কবিকেই) খাব মাস কোদাল কুপিয়ে রোজকারের একটা কাম দিল।' তাদের ঘর ভেঙে গেল। লাভের মধ্যে বিবেচনা করে কাজ না করার জন্ত, 'তোর (অর্থাৎ কবির নিজের) দেশের থেকে, সমাজের থেকে বঞ্চিত করল (বাঁশির গান)। হায় রে বাঁশির গান!' কেমন সুন্দর একটি চিত্র এঁকেছেন গীতিকার তাঁর গানের মধ্যে। মাদলের তালে তালে এই গানটি যখন গাওয়া ও নাচা হয় তখন মনে হয় 'খিঙা ফুলের' মোহে আর কখনও এমন দেশত্যাগী হব না। আর পরক্ষণেই গানের কথাগুলি যেন বিদ্রূপের মত কাণে এসে বাজে। বিশেষতঃ প্রথম দুটি লাইন যখন কেবলই Repetition করা হয়, তখন ঐ বিদ্রূপটি যেন স্পষ্ট হ'য়ে উঠে। বলা বাহুল্য, 'খিঙা ফুল' যে আসলে ক্ষণস্থায়ী যৌবনের উন্মাদন', তা এখানে আরও পরিষ্কার হ'য়েছে।

আর একটি গান শুনেছিলাম এক তরুণের মুখে। আপন মনে গাইতে গাইতে সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে থামিয়ে গানটি লিখে নিতে চাইলাম। মজার কথা, প্রথমে সে কিছুতেই গানটি পুনর্বার ব'লতে চায় না। শেষে অনেক করে বলাতে আমায় গানটি লিখে নিতে দিল। যাই হোক, গানটি দেখলেই বুঝতে পারবেন কেন দিতে ইতস্ততঃ করছিল।

গানটি হল :

'খিঙা ফুল কাঁকুড় ফুল
দেনা গাঁথি মোকে,
আর সকাল হ'লে
বেহা হব তোকে ॥'

মানে—'খিঙা ফুল আর শশা ফুল আমাকে গেঁথে দে। আমি সকাল হ'লে তোকে বিয়ে করব।' আশা করি এখন বুঝতে পারছেন কেন প্রথমে তরুণটি গান দিতে আপত্তি করছিল। গানটি হয়ত ওর নিজের নায়িকার উদ্দেশ্যেই গাইছিল। কাজেই নিজের একান্ত জিনিষ, তা জানাতে প্রথমে ও লজ্জা পাচ্ছিল। নায়ক নায়িকার উদ্দেশ্যে এ ধরণের খোলাখুলি প্রাণের কথা প্রকাশ করছে এর আগে দেখেছেন কি? এরা যে কত সরল তার একটি উদাহরণ এই গানটি।

অপর একটি গান উপরোক্ত তরুণটির কাছেই শুনেছিলাম :

'ঝিঙা ফুল সারি সারি
আর দাহিন খোঁপায় গুঁজে
লেলো কারি
ওগো ঝিঙা ফুল সারি সারি ॥'

(ওলো কারি, ঝিঙা ফুল সারি সারি ফুটেছে। আর তা তোর খোঁপার ডানদিকে গুঁজে নে।) লক্ষ্যণীয় যে গীতিকারের বিশেষ সৌন্দর্যবোধ আছে। খোঁপার কোন্ দিকে ফুল গুঁজলে যে কারিকে মানাবে সে সম্বন্ধে তিনি direction দিয়ে দিয়েছেন। হাঁ, এই প্রসঙ্গে গায়কের সঙ্গে আমার যে কথোপকথন হ'য়েছিল তার কিছুটা উদ্ধৃত করছি। কেন যে উদ্ধৃত করছি তা কথোপকথনের মাধ্যমেই বুঝতে পারা যাবে।

আমার অনুরোধে গায়ক আবার গানটি গাইলেন। কুনুর তালের উপর। আমি গানটি লিখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—'আচ্ছা এই যে গানটি গাইলেন, এর মানে কি? কাকে এবং কি উদ্দেশ্যে এর ভাষা রচিত?'

উত্তর পেলাম,—'আমি বাবু মুখ্যু মানুষ। অত মানে তো জানি না। ফিরছিলাম ঘরে। আপনি বললে 'ঝিঙা ফুল' গাইতে। তা 'ঝিঙা ফুল'ই গাইছিলাম। মনও এটাই গাইতে চাইল, তাই গাইলম, তুমি লিখে নিতে চাইলেন, তো লিখলেক। মানে আমি কি করিই বুলব?' একটু থেমে বলেন, 'উয়ার যে কি রহস্য তা আর একদিন বইলব।' বলা বাহুল্য, সেই আর একদিন আর পাওয়া যায় নি। তবে এ খবর পেয়েছিলাম যে, আমার সঙ্গে যেদিন দেখা হ'য়েছিল তার কয়েক দিনের মধ্যেই তরুণটির বিয়ে হ'য়ে গেছল।

এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি যে, 'পাতা নাচের গান' বা 'ঝিঙা ফুলের গান' এগুলি এক সঙ্গে সমবেত ভাবে গাওয়া হয়—এর আগে আমি তা দেখিয়েছি। কিন্তু তা ছাড়াও একক ভাবে এই গানগুলি প্রায়ই শোনা যায়, যদি কিনা সেই বিশেষ গায়ক অথবা গায়িকার মন প্রফুল্ল থাকে। শুধু মন ভাল থাকলেই যে হবে তা নয়। এ ব্যাপারে পরিবেশের গুরুত্ব অনেকখানি। স্বভাবতঃই এরা একটু লাজুক। কাজেই ঐদিক দিয়েও একটু বাধা আছেন। আগেকার ঝাড়গ্রাম আর এখনকার ঝাড়গ্রামে পার্থক্য অনেক। এখন ঝাড়গ্রামের রাস্তায় বাস ছুটছে। ট্রাক ছুটছে। ব'য়ে চলেছে জনস্রোত। কোথাও বেগবান আবার কোথাও মন্থর। আগের ঝাড়গ্রামের কাছে এ ছিল স্বপ্ন। সে তখন ভাবতেও পারে নি যে, একদিন তার শান্ত পরিবেশ এমন অকস্মাৎ আবিল হ'য়ে উঠবে। কাজেই আগে যেমন প্রতিদিন দেখা যেত, আপন মনে গাইতে গাইতে প্রায় সবাই হয় বাড়ী ফিরছেন, না হয় কাজ করতে যাচ্ছেন, এখন আর তা শোনা যায় না। কারণ আগের সেই অনুকূল পরিবেশ কই। যাই হোক, এখনও যে একেবারে একক গানের রেওয়াজ লুপ্ত হয়নি তা এর আগেই একটি তরুণের কাছ থেকে দুটি গান সংগ্রহের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছি।

একবার গিয়েছিলাম গাইঘাটা বলে একটি গ্রামে। সেখানে আমার পরিচিত একজনের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। লোকটির বেশ বয়স হ'য়েছে। দেখলাম গেরুয়া পোষাক আর গলায় একটা তুলসীর মালা। অনুমানে বুঝলাম, নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন। আগে ওই ছিল এদিককার মূল গায়েন। এখনো গান-টান করেন কিনা ঠিক জিজ্ঞাসা করতে পারছিলাম না। নিজে থেকেই কথা আরম্ভ করলেন। দুটো একটা কথার পর বললেন, —'বাবু গৌড়ীয় মঠে দীক্ষা নিয়েছি। এখনও গান করি তবে আর অন্য গান গাইতে ইচ্ছা করে না। একটু ঠাকুর-দেবতার নামগন্ধ না থাকলে যেন কেমন কেমন লাগে।'

আমি বললাম,—'কেন, আপনাদের তো রাধা-কৃষ্ণের লীলা নিয়ে প্রচুর গান আছে। রামায়ণ মহাভারত থেকে কাহিনী নিয়েও তো আপনারা গান বেঁধেছেন। কাজেই ঐ সমস্ত গান করে আপনি গানের সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরকালের কাজও করতে পারবেন।'

আমার এই কথা শুনে একেবারে আনন্দে লোটা-খানা হ'য়ে গেলেন। আনন্দ যে হোল তা বুঝলাম যখন নিজের মাতৃভাষার কথা আরম্ভ করলেন, —'তা যা বলেছেন বাবু। গেরামের লোকরা বুঝবেক নাই। বলে, 'ঝিঙা ফুল' বল (ঝিঙা ফুলের গান কর), হাই কর সাই কর। কেনে রে বাপু, 'ঝিঙা ফুলে' কি ভাল গান নাই!'

আমি এই মওকা খুঁজছিলাম। চট করে বললাম,—'তা বেশ মুরুব্বি (মুরুব্বি বললে গ্রামের প্রবীণরা একটু খুশী হয়), আমায় বেশ ভাল একটা 'ঝিঙাফুলের গান' শোনাও তো।'

কাঁপা গলায় মুরুব্বি আরম্ভ করল :

'গোটা বন বুলি বুলি
ঝিঙা ফুল লিলম তুলি
শ্যাম আসিবেন বলি
গো শ্যাম আসিবেন বলি।'

মানে বোঝা বেশ সহজ। এখানে ব'লে রাখি, 'পাতা নাচের গানে' যেমন রাধা-কৃষ্ণকে নিয়ে প্রচুর গান আছে, এই 'ঝিঙাফুলের গানে'ও যে তার ব্যতিক্রম নেই তা তো উপরে ঐ গানটি দিয়েই বোঝা গেল। কিন্তু একেবারে হুবহু এক নয়। কিছু পার্থক্য আছে দুই ধরণের দুটি গানের অর্থে। যাক, যা বলছিলাম, মুরুব্বি আবার গাইলেন :

'আজ কুঞ্জে রহ বংশীধারী।
তব বিরহেতে বিরহিনী
আর বাঁচে না কমলিনী
বিরহ জ্বালাতে প্রাণ বাঁচে না গো ধনি
আজ কুঞ্জে রহ বংশীধারী॥'

এই দ্বিতীয় গানটিরও মানে বোঝা বেশ সহজ। তবে 'ঝিঙা ফুলের' অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী কিছু—এই ভাবটির সঙ্গে উপরের দুটি গানের কোন মিল আছে কিনা—এপ্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। প্রথম গানটিতে বেশ বোঝা যায় যে, রাধা গোটা বন খুঁজে খুঁজে কেবল ঝিঙা ফুলই কুড়োচ্ছেন। অত এত ফুল থাকতে কেবল ঝিঙা ফুলই নিচ্ছেন। তার কারণ শ্যাম আসবেন ঠিক। কিন্তু তিনি তো 'ঝিঙা ফুলে'র মালা পরতেই আজ আসবেন। একটুক্ষণের জন্য হলেও থাকবেন। কাজেই দ্বিতীয় গানটিতে প্রথম গানের জের টেনে গায়ক বংশীধারীকে অনুনয় করছেন—'বংশীধারী, আজ কুঞ্জে থাক। তোমার বিরহে বিরহিনী কমলিনীর প্রাণ আর বাঁচে না। ওগো যাদু, বিরহ জ্বালাতে প্রাণ বাঁচে না। বংশীধারী আজ কুঞ্জে থাক।' কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, শ্যাম আসবেন ব'লে তোড়জোড় হোল। শ্যাম এলেনও কিন্তু এলেই চলে যেতে চান। কাজেই গায়কের ঐ অনুনয়। যাই হোক, এর পরে মুরুব্বি গাইলেন :

'হরি গেলেন মধুপুরি
গেল মোরে ছাড়ি
ঝিঙা ফুলের মালা গাঁথি
শ্যামের গলে দিব ডারি
আজ কুঞ্জে রহ বংশীধারী॥'

মানে,—'হরি আমায় ছেড়ে মধুপুরি গেলেন।' (কত অনুরোধ করলাম) 'বংশীধারী আজ কুঞ্জে থাক। ঝিঙাফুলের মালা গেঁথে তোমার গলায় পরিয়ে দেব।'

কবি কবিতা লেখেন; গান বাঁধেন। কিন্তু প্রতিটি কবিতা বা গানের বিভিন্ন অর্থ ও ব্যাখ্যা শোনা যাবে বিভিন্ন পাঠক বা শ্রোতার কাছ হ'তে। স্বয়ং কবি স্বপ্নেও ভাবেন নি যে, তাঁর সৃষ্টির এত বিচিত্র রূপ আছে। যা হোক, আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য যে, আমিও একজন শ্রোতা। আর সেই জন্যেই আর পাঁচজন শ্রোতার মতই কতকগুলি

গানের অর্থ-সঙ্গতি নিজের মত করেছি। তবে যাঁরা এই সব গান করেন তাঁদের মূল গায়েনদের কাছে এই 'ভাঙ্গানি'গুলি (গানের কথার অন্তর্নিহিত যে অর্থটি আছে তার ব্যাখ্যানকে এখানে গানের ভাঙ্গানী বলে) শুনিয়েছি এবং তাঁরা কেউ আপত্তি করেন নি।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী-মূর্তি বিবেকানন্দ

পুরাঙ্গনা

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, ? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' জীবের মাঝেই শিব আছেন, তাঁহার সেবাই ঈশ্বরের পূজা,—হিন্দুধর্মের এই মূল কথাটি দেশবাসীকে শুনিয়ে গেছেন ঋষি বিবেকানন্দ। শুধু শোনানো নয় স্বীয় জীবনে অনুষ্ঠান করে দেখিয়ে গেছেন তার রূপ।

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" উপনিষদের এই অমর বাণী বিস্মৃত হয়ে শিক্ষিত বাঙালী যেদিন ঈশ্বরের অস্তিত্বে সংশয়িত, সন্দেহাকুলচিত্ত, ব্রাহ্মধর্ম ও খৃষ্টধর্মের দোটানায় পড়ে ব্যাকুল,বিভ্রান্ত ও দিশেহারা, যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ সেদিন সত্যের মহান দ্বারোদ্ঘাটন করে জাতির সম্মুখে তুলে ধরলেন অনন্ত ভাবময় শ্রীভগবানের সর্বব্যাপী বিশালমূর্তি। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে পার্থ সারথির কৃপায় অর্জুন যে বিশ্বরূপ দেখবার অধিকারী হয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় ও শিক্ষায় স্বামী বিবেকানন্দ দুষ্কর তপস্যা ও কঠোর সাধনাবলে উপনিষদের সেই মহান সত্য—সর্বভূতে সর্বরূপে প্রতিবিম্বিত ভগবানের সেই অখণ্ড সত্তাকে উপলব্ধি করেছিলেন। আর উপলব্ধি করেছিলেন আপন অন্তরে, নিজ আত্মায় তাঁর অনন্ত শক্তিময়ী প্রকৃতিকে।

ভারতের পুণ্যভূমিতে মহামানবের অভাব হয়নি কোন যুগে। মুক্তিকামী মানবকে তাঁরা দিয়েছিলেন জ্ঞান ও ভক্তির উপদেশ, শ্রেয়োলাভে ত্যাগের পথ-নির্দেশ। স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম এদিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাঁর ধর্ম মানুষকে অমরত্বের সন্ধানই দেয়নি কেবল, ঐহিক জীবনে বাঁচবার পথের নির্দেশও দিয়েছে। তাঁর বাণীতে জ্ঞান ভক্তি ও কর্মযোগের ত্রিবেণী ধারায় মানব-জীবনকে মহৎ লক্ষ্যের পথে প্রবাহিত করার ইঙ্গিত রয়েছে। "যে ধর্ম মানুষকে ক্ষুধার অন্ন দিতে পারে না, পরলোকে স্বর্গ দেবার ক্ষমতা তার নাই।" এ কথা দৃঢ় নির্ভীক অকুণ্ঠিত চিত্তে বলতে দ্বিধা করেননি তিনি সেদিনের ব্রাহ্মণ-পুরোহিতশাসিত রক্ষণশীল সমাজের ভ্রূকুটি কুটিল দৃষ্টির সম্মুখে। বৃত্ত সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেছিলেন "আমি এমন এক ধর্ম প্রচার করতে চাই, যাতে মানুষ গড়ে। ব'তে মানুষ অধ্যাত্ম সাধনায় আত্মস্থ হয়ে থাকবে না শুধু, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনির্ভরতার দ্বারা স্বাবলম্বী হয়ে জাতীয় জীবনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।"

মানুষ গড়বার আকাঙ্ক্ষা ছিল স্বামিজীর জীবনে মহৎ ব্রতস্বরূপ, এবং তাকে রূপ দেবার জন্য গভীর আগ্রহ ও সবল প্রয়াস ছিল তাঁর জীবন ব্যাপী।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল 'স্বামিজী, আপনি পাশ্চাত্যদেশে বক্তৃতাদি দ্বারা তুফান তুলে এখানে

নীরব রয়েছেন কেন?' উত্তরে তিনি বললেন: পাশ্চাত্যের মাটি উর্বর, সহজেই বীজ বপন করা চলে। আগে এখানে জমি তৈরী করি, কালে আমার মত বিবেকানন্দ অনেক আসবে বক্তৃতা দিতে।' মঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও শিষ্যদের শিক্ষার জন্য পরিপূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি। জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থী ও উপদেশপ্রার্থী জনসাধারণের জন্য তাঁর হৃদয় ও বাহির দুয়ার ছিল মুক্ত, অবারিত। শেষ জীবনে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও তিনি সাগ্রহে সানন্দে লোকশিক্ষা দিয়ে গেছেন। চিকিৎসক ও গুরু-ভ্রাতাদের নিষেধ ও অনুরোধ কিছুই তাঁকে ও-বিষয়ে নিবৃত্ত করতে পারেনি।

মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় মানুষ সন্ন্যাস-জীবন বরণ করে। সেই মহিমাময় জীবনের অধিকারী হয়েও তিনি কেবল মানবকল্যাণে স্বীয় মুক্তির বাসনা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে, আদর্শ ত্যাগ ও বিবেক বৈরাগ্যের চরম পরিচয় দিয়েছেন। সঙ্ঘের সন্ন্যাসিবৃন্দকে লক্ষ্য করে তীব্র ভাষায় বলেছেন, 'মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও স্বার্থপরতা। লোকশিক্ষা দে। মূঢ় অজ্ঞ মানুষের মনে জ্বেলে দে জ্ঞানের আলো। তারা যদি না আসে, তোরাও যাবে যাবে। সন্ন্যাসীর জীবন হবে আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।' এমন কত অমর উক্তি আছে তাঁর জীবনব্যাপী কর্ম সাধনার মধ্যে। উক্ত বাণী রূপায়িত করে দেখিয়ে গেছেন তিনি স্বীয় জীবনে।

স্বামিজীর মানবপ্রীতি ছিল কত গভীর! তিনি বলেছেন তাঁর এক গুরুভ্রাতাকে "আমি যদি আমার তমোক্লেদে নিমজ্জমান জাতিকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি তবে সহস্রবার জন্মগ্রহণ করতে রাজী আছি। যদি একজন লোককেও মনুষ্যত্ব লাভে সাহায্য করতে পারি, তবে কোন উৎকট পাপ করে খৃষ্টানদের অনন্ত নরক ভোগ করতেও রাজী আছি।" তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র ছিল ত্যাগ ও প্রেম, শিক্ষা ও সেবা।

মানুষ যাতে তার সমস্ত দীনতা হীনতা পরিত্যাগ করে আত্মপ্রত্যয় লাভ ও ভগবৎ সাধনার উপযোগী হয় যা সমাজ-সেবার মধ্য দিয়ে সে দিব্যজীবন লাভের পথে এগিয়ে যেতে পারে, ইহাই ছিল বিবেকানন্দের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ভারতের প্রনষ্ট গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার মহৎ সঙ্কল্প ছিল তাঁর চিত্তে। তিনি বুঝেছিলেন —ধর্মই ভারতের প্রাণস্বরূপ, জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড। সুতরাং ভারতকে যদি আবার বাঁচতে হয়, তবে ধর্মের মৃত-সঞ্জীবনী সুধায় তা সম্ভব হবে। তাঁর আদর্শ শুধু রাজযোগের বিবিধ সাধন অথবা ভক্তিযোগের জপতপ পূজার্চনা নয়; সে ধর্ম মানুষের প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনে কর্মের মাঝে ধর্মের নব রূপায়ন। মানুষের সাথে মানুষের নিষ্কাম প্রেমের আত্মীয়তা, ত্যাগ ও মৈত্রীর বন্ধন।

সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণের একত্র মিলনের সার্থক রূপ প্রতিফলিত হয়েছে এই মহাজীবনে। একদিকে জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, ত্যাগ, তিতিক্ষা, বৈরাগ্য, অপর দিকে বিপুল কর্মোদ্যম, শিক্ষাদান ও সেবাধর্মের প্রচার, মঠ মিশন সঙ্ঘ আশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা। প্রেম ও বৈরাগ্য, কর্ম ও ধর্ম দুর্বার দুটি ধারা যুগপৎ বেয়ে চলেছে স্বামিজীর বিশাল মর্মকেন্দ্র হ'তে। তাই ভারতীয় চিরাগত সাধনা ও ঐতিহ্যের উপর বিবেকানন্দের জীবনের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও, এ যুগের জীবন-সমস্যা ও মানুষের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করেননি তিনি। বরং ইহা, নিঃসংশয়িত সত্য যে, তাঁর বিস্ময়কর কর্মজীবনের উৎসভূমি সুগভীর মানবপ্রীতি ও জাতির দুঃখ দুর্দশায় অসহনীয় মর্মবেদনা। তাঁর জীবনের মহত্ত্ব ও গৌরব পাশ্চাত্যের অধ্যাত্ম-আকাশে প্রাচ্য জ্ঞান-সূর্যের দীপ্ত কিরণসম্পাতে ও জয়মাল্য লাভে নয়,— হিমগিরির তুঙ্গশৃঙ্গ হতে নির্গলিত প্রবহমান নিষ্কাম প্রেমের অমিয়ধারা তাঁর জীবনকে মহিমোজ্জ্বল করেছে।

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের বিরাট চরিত্রের ব্যাখ্যা করা ক্ষুদ্র এক নিবন্ধে সম্ভব নয়। তাঁর মধ্যে দেখি

একদিকে বিশ্বজয়ী পাণ্ডিত্য, ক্ষুরধার বুদ্ধি, বিপুল প্রতিভা, অখণ্ডনীয় যুক্তি নৈপুণ্য—অপরদিকে তীব্র জাতীয়তা-বোধ, সুগভীর দেশপ্রেম, অতলস্পর্শী মানবপ্রীতি ও জীবন্মৃত ভারতের দুর্দশায় দুঃসহ বেদনা-জর্জরিত হৃদয়। কর্মজীবন তাঁর বৈচিত্র্যময়, বিভিন্নমুখী তাঁর প্রতিভা। একাধারে তিনি জ্ঞানী ভক্ত ও কর্মী। জাতীয় জীবনে ধর্মগুরু, যুগপ্রবর্তক সমাজ-সংস্কারক দেশপ্রেমিক ও মানব-মিত্র।

প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি না করলেও মোহ-নিদ্রায় অভিভূত সুপ্তিমগ্ন জাতিকে জলদ ভাষায় দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেছেন তিনি। শঙ্খধ্বনি তুলি নিয়ে সেবক রূপে সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ও করুণা-স্নিগ্ধ বক্ষে টেনেনিয়েছেন পরম স্নেহভরে। অসহায় নিপীড়িত ম্লান মূক দুর্বল মানুষকে দিয়েছেন আশা, অভয়, সান্ত্বনা; মুছিয়ে দিয়েছেন যুগ-সঞ্চিত ক্লেদ, কেঁদেছেন তাদের দুঃখে, বেদনায়। তাই তিনি মর্ত্যমানবের পরম প্রিয় একান্ত আপন জন।

ভারত-জননীর বরপুত্র বুঝেছিলেন চিন্তা ও কর্মে স্বাধীনতা না থাকলে ব্যক্তি, সমাজ অথবা জাতি বাঁচতে পারে না। তাই জলদগম্ভীর স্বরে জাতিকে ডাক দিয়ে বললেন, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে স্বজন বধে ভীত মোহাচ্ছন্ন অর্জুনকে পার্থসারথি যেমন তীব্র ভাষায় বলেছিলেন,

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ। নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ॥"

উনবিংশ শতাব্দীতে শোনা গিয়াছিল ইহারই প্রতিধ্বনি—স্থান, কাল ও পাত্রভেদে যুগাচার্যের যুগবাণীতে। বার বার তিনি বলেছেন—কাপুরুষতা ত্যাগ কর, সাহসী হও। দুর্বলতা পরিহার কর। যদি কিছু পাপ থাকে তবে সে এই দুর্বলতা, কাপুরুষতা। গীতার অভয়বাণী যেন রূপ নিয়েছে স্বামিজীর জীবনে।

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

বাস্তবে দেখা যায় অধ্যাত্ম-জগতে যখন অবনতির কালো ছায়া ঘনীভূত হয়ে ওঠে, ক্লেদময় হয়ে ওঠে ধর্ম, যখন আর্ত, পীড়িত হাহাকারে ভরে ওঠে মানব-জীবন, ঐশ্বরিক শক্তির আবির্ভাব ঘটে তখনই এবং কালোপযোগী যুগধর্মের প্রবর্তন হয় সেইকালে। উনবিংশ শতাব্দীতে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সে দায় বহন করবার জন্য চিহ্নিত হয়ে এসেছিলেন স্বামিজী। ঐশী শক্তির বিচিত্র সৃষ্টি, শ্রীভগবানের পরম স্বীকৃতিরই নব রূপ যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ। ঈশ্বরীয় প্রেমের জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপ তাঁর চরিত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে অপার করুণা—জ্ঞান ও শক্তির মহিমময় প্রকাশ।

ধর্মবীর বিবেকানন্দের কথা বলতে গেলে তদীয় আচার্যদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। সর্বধর্মসমন্বয়কারী যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞান-সমুদ্র হতে উদ্ভূত এক বিশাল তরঙ্গ-সম আমাদের স্বামিজী। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদ, বিবেকানন্দ তার ব্যাখ্যা—জ্ঞান ও শক্তি, ভাব ও ভাষা, আধেয় ও আধার। একে অন্যের পরিপূরক। একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজনকে চিন্তা করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ অভেদাত্মা—দুয়ে এক।

উনবিংশ শতাব্দীর শ্বাসরুদ্ধ ধূম্রাচ্ছন্ন ভারতের জীবনাকাশে এই মহাপুরুষদ্বয়ের আবির্ভাব, কালের বুকে এক মহিমান্বিত স্বাক্ষর বহন করছে, একান্ত অপরিহার্য তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনারূপে জাতীয় জীবনে চিরস্মরণীয়, উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে, আগামীকালেও থাকবেও।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন এখনও পরম সার্থকতায় মূর্তি পরিগ্রহ করেনি বাস্তবে। তবু এ কথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, তাঁর কঠোর সাধনা ও সুবিপুল

কর্মপ্রচেষ্টা বিশ্বের দরবারে ভারতকে মর্যাদা দিয়েছে। আত্মবিস্মৃত দেশবাসীকে প্রভাবিত করেছে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে। তাঁর চিন্তাধারা ভারতের আকাশে বাতাসে ওতঃপ্রোতভাবে সঞ্চারিত হয়ে নিয়ন্ত্রিত করছে যুগ ও জাতিকে।

বিপুল সম্ভাবনাময় নব্য ভারতের জন্মদাতা এই বিরাট পুরুষের মহান্ কর্মজীবনের অনুধ্যান ও আলোচনা, তাঁহার ভারত-গঠনের স্বপ্ন ও সাধনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার কাজে অনুপ্রাণিত করুক আমাদের দেশবাসীকে।

গ্রন্থ-সমালোচনা

পুস্তক-সমালোচনার জন্য প্রত্যেক পুস্তকের দুইখানি করিয়া কপি পাঠাইয়া দেওয়াই সাধারণ নিয়ম। অতএব গ্রন্থকার অথবা পুস্তক-প্রকাশক যাঁহা দিগের প্রতি আমাদের নিবেদন—'বিশ্ববাণী'তে কোনও পুস্তক সমালোচনা করাইতে হইলে তাঁহারা আমাদের নিকটে প্রত্যেক সমালোচ্য পুস্তকের দুইখানি করিয়া কপি পাঠাইবেন। —ইতি সম্পাদক, 'বিশ্ববাণী'।

সনাতন ধর্ম : স্বামী বিনয়ানন্দ গিরি প্রণীত। শালবিহারী কুটীর, তারা বাবু লেন, রাঁচি হইতে প্রকাশিত। ৪৭ পৃষ্ঠা—মূল্য এক টাকা।

ধর্ম আমাদের দেশের লোকের কাছে বড় নীরস জিনিষ। ধর্ম সম্বন্ধে বই কেহই বড় পড়িতে চাহে না। তার পরিবর্তে নাটক নভেল তাদের কাছে ঢের বেশি আদরণীয়।" এমন অবস্থায় ধর্ম সম্বন্ধে বই যত বেশি প্রকাশ হয় ততই আমাদের দেশের পক্ষে মঙ্গল। কিন্তু ধর্মের বই লোকে কেন আগ্রহ সহকারে পড়িতে চাহে না, তার কারণ আমাদের খুঁজিতে হইবে। তার উত্তর হইল এই যে, ধর্মের বই আমাদের দেশে হৃদয়গ্রাহী করিয়া লেখা হয় না। যেমন তেমন করিয়া বলিলেই লোকে তাহা গ্রহণ করিবে, এ যুগে তাহা আর হয় না। হয়ত এই সত্য উপলব্ধি করিয়া আমাদের পূর্বাচার্যগণ গল্পের আকারে রামায়ণ, মহাভারত লিখিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থগুলি কৈ আজিও ত পুরাণো হয় নাই—লক্ষ লক্ষ লোক এখনো তাহা পড়ে এবং আধ্যাত্মিক জীবনের প্রেরণা সংগ্রহ করে।

বক্ষ্যমান পুস্তকখানি সেই ধরণের নহে। ধর্মের কথা সূত্রাকারে বলিলে কেহ তাহা গ্রহণ করে না—ইচ্ছা করিয়া গ্রহণ করে না তাহা নয়, সে কথার কোন আবেদন তাদের বুদ্ধির কাছে পৌঁছয় না বলিয়া। যেমন স্বামিজী লিখিয়াছেন, "ঐশ্বরিক বিধি—যার ত্রিগুণী শক্তিতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের দ্বারা জগৎ পরিচালিত তাকেই বলা হয় ধর্ম।" (৯ পৃঃ) বলা বাহুল্য, এই সংজ্ঞা পড়িয়া ধর্ম সম্বন্ধে কেহই জ্ঞান লাভ করিবেন না, যেখানে পূর্বে ছিলেন সেখানেই থাকিবেন। কে ঈশ্বর, কি তাঁর বিধি, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ই বা তিনি কেন করিতেছেন, এই সব প্রশ্নেরই যদি মীমাংসা না হইল তবে সেই বিধি দ্বারা পরিচালিত যে বস্তু তাহাই ধর্ম, এ কথা কেমন করিয়া বুঝিব?

স্বামিজী লিখিয়াছেন, "দান, তপস্যা এবং ত্যাগের কর্ম কারো পরিত্যাগ করা উচিত নয়।" (১৪ পৃঃ) প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবান গীতায় পাঁচটি কর্মের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা তাঁহাতে সমর্পণ করিতে হইবে :—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥"

হে কৌন্তেয়, যাহা কিছু কর, যাহা কিছু খাও, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎ সমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে মানুষ প্রতিদিন সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত যে সমস্ত কর্ম করে তাহা ঐ পাঁচ ভাগের মধ্যেই পড়িবে—হয় সে কিছু করে, নয় সে কিছু খায়, নয় সে কোন যজ্ঞ করে,

নয় সে কোন দান করে, নয় সে তপস্যা করে। এই পাঁচ ভাগের সমস্ত কর্মই শ্রীভগবানে কিংবা শ্রীগুরুতে সমর্পণ করিতে হইবে, ইহাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ। ইহার কোন অংশ বাদ দিলেই ফাঁক থাকিয়া যাইবে, সমস্ত তাঁহাতে সমর্পণ করা হইবে না। আমরা ছোট বড় যা কিছুই করি না কেন, যা কিছুই খাই না কেন, সেগুলোও যে কর্ম, এই কথা বুঝিতে হইবে। শুধু চোখ ধাঁধানো বড় কর্মগুলিই কর্ম, ছোটগুলি যেমন খাওয়া পরা ইত্যাদি কিছুই নয়, এমন বুঝিলে হইবে না।

স্বামীজী যদি আরো সহজ সরল করিয়া নিজের সাধন-জীবনের রহস্যের কথা ব্যক্ত করেন তবে তাহা দেশের লোকের বেশি কাজে লাগিবে, ইহাই আমার ধারণা।

—শ্রীঅবনীনাথ রায়

Song Sublime or 'Geeta' (In Rhyme) —Translated and published by Prafulla Kumar Labiri, 57, Monoharpukur Road, Calcutta—29, Price Re. 1/-.

গীতা হিন্দুর প্রস্থান-ত্রয়ের অন্তর্গত। ইহার শিক্ষা দেশ ও কালের সীমাকে অতিক্রম করে মানুষের জীবনকে যে সান্ত্বনা ও সার্থকতার আশ্বাস দেয় তাতে সংসারের রূপ তার রুক্ষতা হারিয়ে প্রীতি-স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। গীতার শিক্ষা মানুষের জীবনের উপলব্ধ রসধারাকে নূতন জীবনের ছন্দে উৎসারিত করে তোলে। মনীষী কার্লাইল গীতার এই পরিচয়ে মুগ্ধ হয়ে মার্কিণের তৎকালীন বিখ্যাত মনীষী ও সাহিত্যিক ইমার্সনকে গীতার এক খণ্ড পাঠিয়েছিলেন। অনুরোধ ছিল, যেন তিনি হিন্দুর এই ধর্মগ্রন্থ ভাল করে পাঠ করেন। এর উত্তরে ইমার্সন বলেছিলেন, এই গ্রন্থ শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর জীবনকে অনুপ্রাণিত করবে। পরবর্তী জীবনে ইমার্সনের বহু প্রবন্ধের মধ্যে গীতার সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে তাঁর অনবদ্য ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গীর অনন্যতায় বলেছেন—"এই মহাভারতে কেবল যে বিচিত্রে জনশ্রুতি সংকলন করা হইয়াছে তাহাও নয়। আতপ-কাঁচের এক পিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আর এক পিঠে কেবল তাহারই সংহত দাহিকরশ্মি, মহাভারতেও তেমন একদিকে ব্যাপক জনপ্রতিবাদি, আর একদিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতিঃ—এই জ্যোতিঃটিই ভগবদ্গীতা। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির যে সমন্বয়-যোগ তাহাই সমস্ত ভারত-ইতিহাসের চরম তত্ত্ব।"

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্যদেশে এই গীতার অসংখ্য অনুবাদ হয়েছে, এবং এখনও অনুবাদ ও ভাষ্যের কাজ চলছে। বর্তমান অনুবাদকার ইংরাজী ছন্দের মাধ্যমে গীতার অনুবাদ করেছেন, যতদূর মূলানুগ করা যায় তার প্রচেষ্টার পরিচয় তিনি দিয়েছেন। সংস্কৃত তথা অন্য প্রাদেশিক ভাষায় অনভিজ্ঞ ইংরাজী-জানা পাঠকের নিকট এই গ্রন্থের মূল্য আছে বলে আমরা মনে করি।

—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পুস্তক প্রচার বিভাগে সম্প্রতি কয়েকটি পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইল : শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত স্তোত্ররত্নাকর, আত্মজ্ঞান ও Memoirs of Ramkrishna এবং ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত Mystic Tales of Lama Taranatha এতদ্ব্যতীত একখানি নূতন পুস্তক—সাধনমণি, শ্রীজয়ন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—প্রকাশিত হইয়াছে।

বিশ্ববাণী

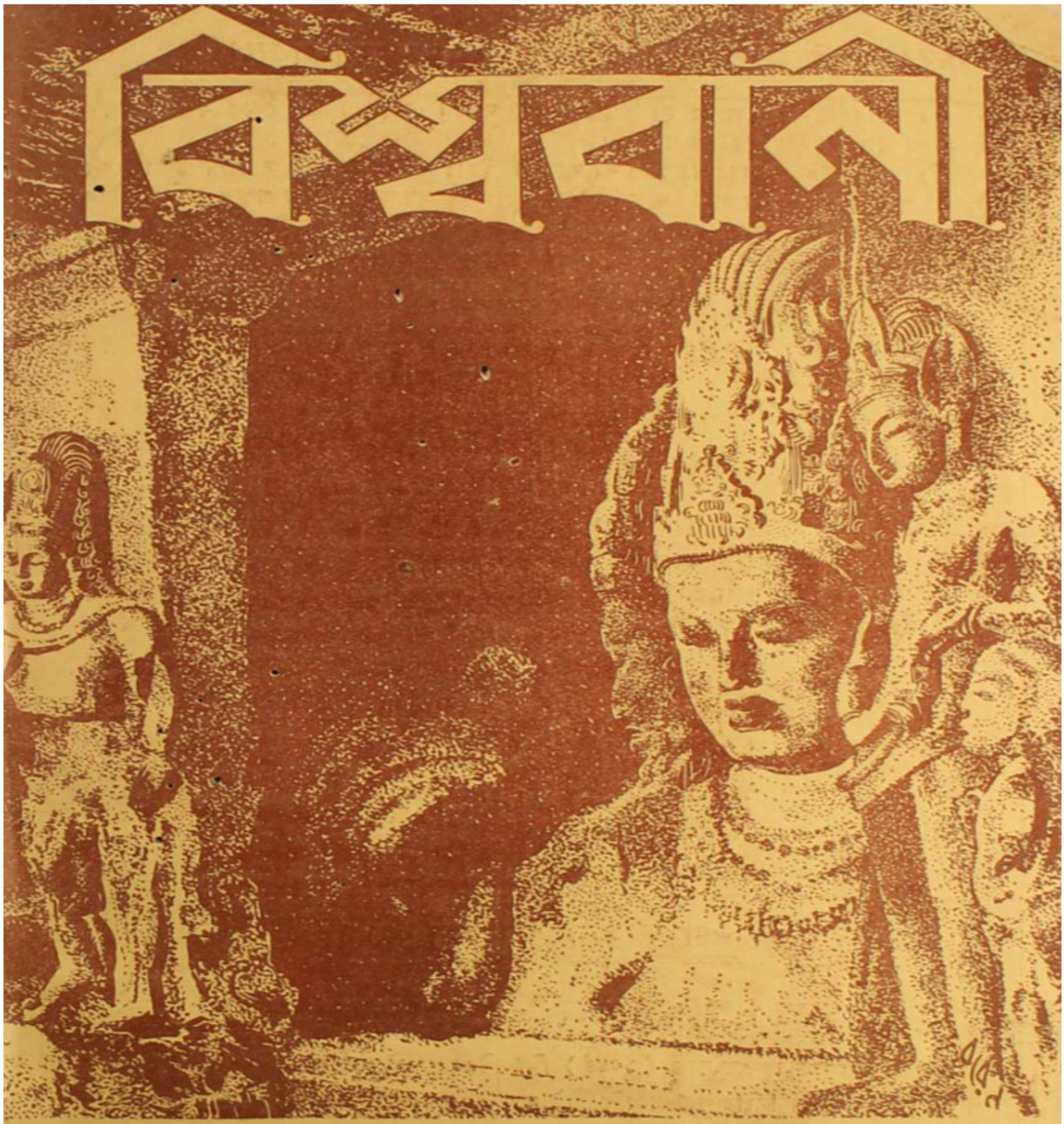

প্রতিষ্ঠাতাঃ স্বামী অভেদানন্দ

১৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
বার্ষিক মূল্য ৪।০ আনা

শ্রাবণ, ১৩৬৪
প্রতি সংখ্যা ।০ আনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট; কলিকাতা-৬
ফোন : ৫৫—১৮০৫

'বিশ্ববাণী'-র নিয়মাবলী

১। 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে। বৎসরের যে কোন সময়ে আপনি বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক গ্রাহক হইতে পারেন।

২। ফাল্গুন ১৩৮৫, বিশ্ববাণীর ১৯শ বর্ষ আরম্ভ। ইহার বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা চারি আনা, প্রতি সংখ্যা আট আনা। ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ—এই ছয় মাসেরই জন্য গ্রাহক হইতে হইলে সডাক দুই টাকা চারি আনা এবং ভাদ্র হইতে মাঘ—কেবল এই কয় মাসেরই জন্য গ্রাহক হইলে সডাকে তিন টাকা লাগিবে। গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া মূল্য অগ্রিম পাঠাইবেন।

৩। মনিঅর্ডার যোগে টাকা পাঠাইবার সময় কুপনে আপনার নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন এবং গ্রাহক নম্বর থাকিলে তাহা উল্লেখ করিবেন।

৪। কোন গ্রাহকের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্তিত হইলে তিনি স্থানীয় ডাকঘরে তাহা নির্দেশ দিবেন; বেশীদিনের জন্য হইলে পূর্ববর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে বিশ্ববাণী অফিসে উহা জানাইবেন।

৫। কোনও মাসের বিশ্ববাণী সেই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে না পাইলে সে সংবাদ সেই মাসের ২০ তারিখ হইতে পরের মাসের তিন তারিখের মধ্যে বিশ্ববাণী অফিসে আসা চাই। নচেৎ ঐ পত্রিকা সরবরাহ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে।

৬। 'বিশ্ববাণী'-র জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইবার কালে রচয়িতার নাম-ঠিকানা যেন তাহাতে বেশ স্পষ্টাক্ষরে সন্নিবেশিত থাকে। 'বিশ্ববাণী'তে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হয়। প্রবন্ধাদি হারাইয়া যাইলে বা কোন প্রকারে নষ্ট হইলে আমরা দায়ী থাকিব না। প্রবন্ধ ফুলস্কেপ চার পাতা এবং কবিতা আধ পাতার মধ্যে রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনও লেখা প্রকাশিত করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপেক্ষ। ইহার জন্য সম্পাদক কোনও কৈফিৎ দিতে বাধ্য নহেন।

৭। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৮। কাহারও কোন বিষয় জানিতে হইলে (গ্রাহক হইলে, গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া) সর্বদা **রিপ্লাই কার্ডে** অথবা ডাক-টিকিট সমেত পূর্ণ নাম-ঠিকানা পাঠাইতে হইবে। অন্যথায় উত্তর দেওয়া হয় না।

৯। বিশ্ববাণীতে প্রকাশের জন্য সর্বপ্রকার বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। পত্রদ্বারা অথবা বিজ্ঞাপন-দাতাকে স্বয়ং বিশ্ববাণীর কার্যাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত বিষয় জানিতে হয়।

শারদীয়া সংখ্যা

মহালয়ার পূর্বেই বাহির হইবে

গত বৎসরের ন্যায় এবৎসরও (১৩৬৪) বিশ্ববাণীর শারদীয়া (আশ্বিন) সংখ্যা বিশেষ পরিবর্ধিত আকারে মহালয়ার পূর্বে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে নানা বিষয়ক সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি এবং কবিতাবলী থাকিবে। বিশ্ববাণীর যে সব গ্রাহক ১৯শ বর্ষের বিশ্ববাণীর মূল্য বাকী রাখেন নাই, বিশ্ববাণীর এই আশ্বিন সংখ্যা তাঁহাদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হইবে।

যাঁহারা বিশ্ববাণীর গ্রাহক নন তাঁহারা শ্রাবণ মাসের মধ্যে দেড় টাকা বিশ্ববাণী আফিসে জমা দিলে ইহা পাইবেন।

সম্পাদক স্বামী সদাত্মানন্দ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে ব্রহ্মচারী বসন্তকুমার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৭৩, মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, মানসী প্রেস হইতে শ্রীসন্তুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

বিশ্ববাণী—শ্রাবণ, ১৩৬৪

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	জ্ঞান ও অজ্ঞান (শ্রীরামকৃষ্ণবাণী)		২৪১
২।	উপনিষদে সমাধিতত্ত্ব	শ্রীউমানন্দ মুখোপাধ্যায়	২৪২
৩।	জড় ভরত	স্বামী জগদীশ্বরানন্দ	২৪৪
৪।	অবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ বি. এল.	২৪৯
৫।	কৃপা	শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন বসু	২৫২
৬।	ঈশ্বর (কবিতা)	শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত	২৫৪
৭।	কবিগুরু স্মরণে ...	শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্তী	২৫৫
৮।	শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী (কবিতা)	শান্তশীল দাশ	২৫৮
৯।	লোকশিক্ষক পল্লীপটুয়া ...	অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী	২৫৯
১০।	ভারতের তীর্থ-দর্শনে ...	শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৬৪
১১।	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ...	শ্রীঅশোককুমার চট্টোপাধ্যায় ...	২৬৯

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১২।	রবীন্দ্র-স্মৃতি	শ্রীশিলাকারঞ্জন কর্মকার	২৭১
১৩।	কণারক	শ্রী অনিলকুমার হালদার	২৭৩
১৪।	চুঁচুড়ার সংগ্রহশিল্প	শ্রীবিপ্রদাস নন্দী, এম. এ.	২৭৬
১৫।	এই সুন্দর পৃথিবী (কবিতা)	শ্রীসুধাংশুচন্দ্র চৌধুরী	২৭৮
১৬।	চাহি না (কবিতা)	শ্রীপঞ্চানন পাল	২৭৯
১৭।	গ্রন্থসমালোচনা		২৮৯
১৮।	সংঘ-বার্তা		২৮০

বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রম

কলিকাতা অফিস ও আউটডোর : ২৯এ, বিবেকানন্দ রোড : ফোন : ৩৩-৫২২০

টেলিগ্রাম : "উন্মাদ আশ্রম" : হাসপাতাল—দত্তনগর, কলিকাতা-৩০ : ফোন : দমদম ১০৫

প্রতিষ্ঠাতা ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট : কবিরাজ, অতুলবিহারী দত্ত, বি-এস্‌সি, কবিরত্ন

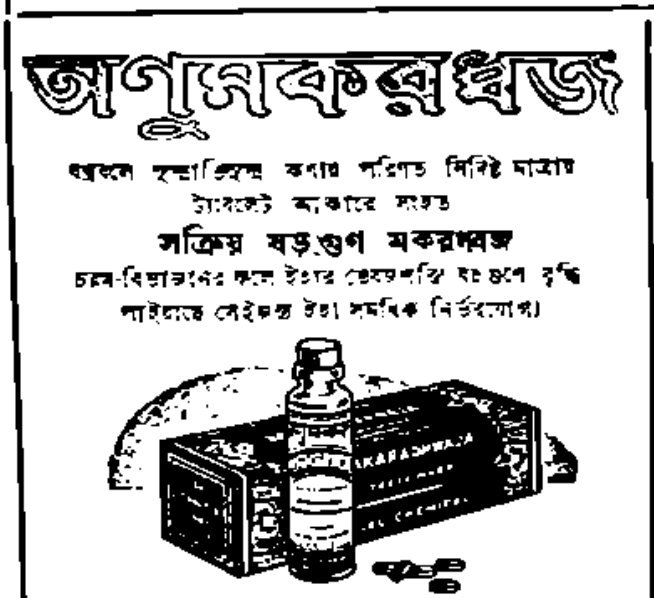

ধাতুদৌর্বল্য সুক্ষ্মাণ্ডিজনিত কারণে পরিণত বিশিষ্ট মাত্রায়
ট্যাবলেট আকারে সংহত

সক্রিয় ষড়্‌গুণ মকরধ্বজ

চরক-বিধানানুসারে ক্ষয়ে ইহার ক্ষেত্রবিশেষে যথাক্রমে বৃদ্ধি
পাইয়াছে বলিয়াই ইহা সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য।

প্রতি শিশিতে ১৪ ট্যাবলেট (৭ পূর্ণমাত্রা) থাকে

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

শুভবিবাহে কালের উপযোগী আধুনিক
রুচিসম্মত প্রাচ্যের অপূর্ব্ব
সুসম্পন্ন নবকল্পিত
সৌন্দর্য্যমণ্ডিত

বেনারসী
তসর . গরদ . মটকা
সিল্ক . টিস্‌ শাড়ী
জহরলাল পান্নালাল
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা
ও প্রাঃ বেনারস . অমৃতসহর

ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক, এম, এ, এম, ডি, বি, এল, আবিষ্কৃত

পেটেণ্ট

ইক্-মিক্ কুকার

ইহাতে এক ঘণ্টার ভিতরে বিভিন্ন আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য অতি সহজে এবং সুন্দররূপে রন্ধন করা যায়। যে কোন জ্বালানী দ্রব্যের দ্বারা বিনা তত্ত্বাবধানে অতি অল্প খরচে রান্না চলে। মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন। ম্যানেজার—ইক্-মিক্ কুকার প্রাইভেট লিমিটেড, ২১৭।১এ, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মোটর গাড়ীর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী

প্রাইভেট লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৮

হেড অফিস :—হাওড়া মোটর বিল্ডিংস্,
পি ৬, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা-১
ফোন—২৩-১৮০৫ (৫ লাইন)

শাখা :—
বম্বে, দিল্লী, পাটনা, ধানবাদ,
কটক, গৌহাটী ও শিলিগুড়ি।

বস্ত্র শিল্পে মোহিনীর অবদান অতুলনীয়

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

— ১নং মিল — — ২নং মিল —

কুষ্টিয়া (পাকিস্তান) ● বেলঘোরিয়া (ভারত)

এই মিলে প্রস্তুত ধুতি শাড়ী লংক্লথ প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে সমভাবে সমাদৃত

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস :—২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিবাহে বা যে কোন উৎসবে—মনের মতন ক'রে সাজাইবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বোস ডেকরেটরস্

২০৪ রাসবিহারী এভিনিউ,

কলিকাতা-২৯

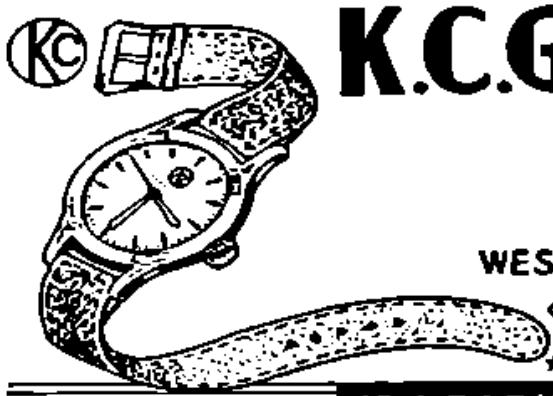

K.C.GANGULY & CO.

Dealers in:-

WEST END • FAVRE-LEUBA & ANGLO SWISS

★ REPAIRING OUR SPECIALITY

12-1 RADHA BAZAR ST. CAL-1

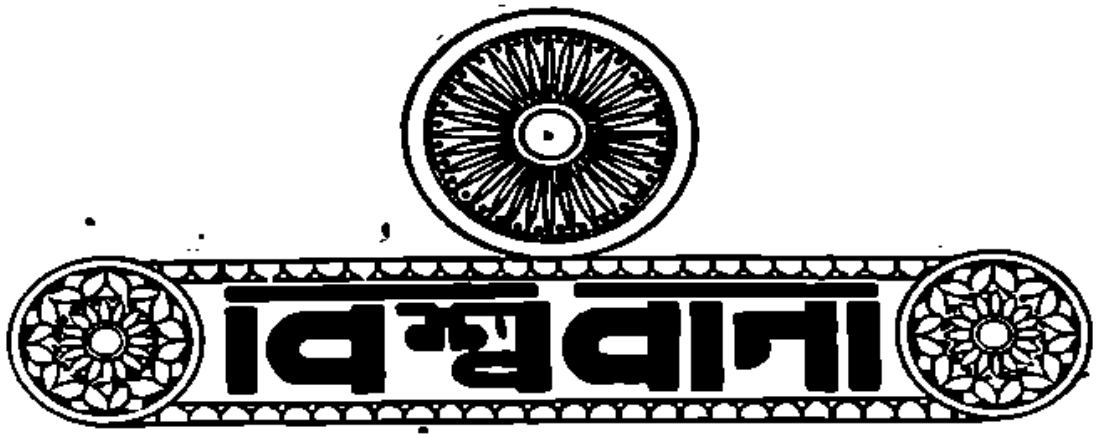

ঊনবিংশতি বর্ষ | শ্রাবণ—১৩৬৪ | ষষ্ঠ সংখ্যা

॥ জ্ঞান ও অজ্ঞান ॥

"পুরাণ মতে ভক্ত একটি, ভগবান একটি ; আমি একটি, তুমি একটি ; শরীর সরা ; এই শরীর মধ্যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাররূপ জল রয়েছে ; ব্রহ্ম সূর্যস্বরূপ। তিনি এই জলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন। ভক্ত তাই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে।

বেদান্ত মতে ব্রহ্মই বস্তু, আর সমস্ত মায়া, স্বপ্নবৎ, অবস্তু। অহংরূপ একটি লাঠি সচ্চিদানন্দ সাগরের মাঝখানে প'ড়ে আছে। অহং লাঠিটি তুলে নিলে এক সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। অহং লাঠিটি থাকলে দুটো দেখায়, এ একভাগ জল, ও একভাগ জল। ব্রহ্মজ্ঞান হলে সমাধিস্থ হয়। তখন এই অহং পুঁছে যায়।

তবে লোকশিক্ষার জন্য শঙ্করাচার্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন। কিন্তু জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। কেউ কেউ মনে করে আমি জ্ঞানী হয়েছি। জ্ঞানের লক্ষণ কি ? জ্ঞানী কারু অনিষ্ট করতে পারে না। বালকের মত হয়ে যায়। লোহার খড়্গে যদি পরশমণি ছোয়ান হয়, খড়্গ সোণা হয়ে যায়। সোণায় হিংসার কাজ হয় না। বাহিরে হয়ত দেখায় যে, রাগ আছে কি অহঙ্কার আছে, কি বস্তুতঃ জ্ঞানীর ওসব কিছু থাকে না।

বালকের আঁট থাকে না। এই খেলাঘর করলে, কেউ হাত দেয় ত খেই খেই করে নেচে কাঁদতে আরম্ভ করবে। আবার নিজেই ভেঙ্গে ফেলবে সব। এই, কাপড়ে এত আঁট, বল্‌ছে আমার বাবা দিয়েছে, আমি দেবো না। আবার একটা পুতুল দিলে পরে ভুলে যায়, কাপড়খানা ফেলে দিয়ে চলে যায়।

এই সব জ্ঞানীর লক্ষণ। হয়ত বাড়ীতে খুব ঐশ্বর্য ; কোচ, কেদারা, ছবি, গাড়ী-ঘোড়া ; আবার সব ফেলে কাশী চলে যাবে।" —শ্রীরামকৃষ্ণ

উপনিষদে সমাধিতত্ত্ব

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

সমাধি-অবস্থা জীবনে উপলব্ধ না হ'লেও সমাধিবান কোনো মহাপুরুষের দর্শন ও তাঁর কৃপালাভ করায় সমাধি সম্বন্ধে আলোচনা করতে সাহসী হচ্ছি। এই মহাপুরুষ বহু লোককে আশ্রয়দান ও তাদের পাপ-ভারগ্রহণ ক'রে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন ও যখন তাদের দুষ্কর্মের ফল স্বদেহে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে স্বয়ং রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন একদিন পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় তাঁকে বেলুড় মঠে দর্শন করতে এসেছিলেন। তাঁকে দর্শনের পর তর্কভূষণ মহাশয় বলেছিলেন, "শাস্ত্রে জীবন্মুক্ত পুরুষের অবস্থা পড়েছি মাত্র, আজ তা প্রত্যক্ষ করলাম। উনি ত সমাধিস্থ হ'য়ে আছেন। কখনও সামান্য বাহ্যদশা প্রাপ্ত হন মাত্র। এ যোগীবরকে দর্শন ক'রে আমার জীবন ধন্য হ'য়ে গেল। অনেক শাস্ত্র পড়েছি, সমাধি সম্বন্ধেও অনেক পড়েছি—আলোচনাদিও করেছি, কিন্তু জীবনে সমাধিবান পুরুষ দর্শন করবার সৌভাগ্য হয় নি, আজ আমার জীবন সার্থক।" এঁর রোগীর দেহ, এত রোগভোগ সত্ত্বেও দেহ যে কি ক'রে আছে তা সুবিজ্ঞ চিকিৎসক-গণও স্থির করতে পারতেন না। একবার ডাক্তার নীলরতন সরকার তাঁকে দেখে ব'লেছিলেন, "বলুন দেখি, এঁর মত মহাপুরুষ চ'লে গেলে পৃথিবীর কি অবস্থা হবে?" এই মহাযোগীর নাম মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ ছিলেন।

অষ্টাঙ্গ যোগের শেষ অঙ্গের নাম সমাধি। আমাদের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর চাঞ্চল্য জন্য আমাদের চিত্ত চঞ্চল হয় ও চিত্তে নানাপ্রকার বৃত্তির উদয় হ'য়ে থাকে। চিত্তবৃত্তির নিরোধের নামই যোগ। যোগের পরিপক্ক অবস্থায় সমাধিদশা উপস্থিত হয়। বায়ু স্থির করার জন্য চিত্তসংযম অভ্যাস করতে হয়। অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তিকে একটিমাত্র চিন্তায় বা ধ্যেয় বিষয়ে কেন্দ্রীভূত করতে হয়। প্রাণায়াম ইহার সহায়ক। রেচক, পূরক ও কুম্ভকাদির অভ্যাস যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠিত না হ'লে উহার প্রতিক্রিয়ায় শারীরিক ব্যাধি ও মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এই কারণে প্রাণায়াম পরিত্যাগ ক'রে কোন এক বিষয়ে চিত্তকে ধ'রে রেখে মনে অপর কোন চিন্তার উদয় হ'তে না দেওয়ার চেষ্টা করতে হয় এবং এইরূপ ধ্যানকালে মন কোন্ দিকে ধাবিত হয় তা লক্ষ্য করতে হয় ও মনকে সেই দিক হ'তে আকর্ষণ ক'রে পুনরায় অভীষ্ট বা ধ্যেয় বিষয়ে পুনঃস্থাপিত করতে হয়; তা হ'লেই ক্রমে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দজী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ রাজযোগে বলেছেন—"মনকে কোন স্থানে ১২ সেকেণ্ড স্থির করলে একটী ধারণা হয়। এই ধারণা ১২ গুণ হ'লে অর্থাৎ ২ মিঃ ২৪ সেঃ হ'লে একটী ধ্যান হয় এবং এই ধ্যান ১২ গুণ অর্থাৎ ২৮ মিঃ ৪৮ সেঃ হ'লে একটী সমাধি হয়।"

মানুষ যাই করুক না কেন, সকল কাজ ও লভ্য-বস্তু হ'তে সে চায় শান্তি ও আনন্দ। এই আনন্দ সমাধি-অবস্থা হ'তেই পূর্ণরূপে লাভ করা যায় ও চরম অবস্থায় আনন্দস্বরূপত্ব লাভ হয়। কেহ কেহ মনে করেন জাগ্রত অবস্থায় সংসার সুখভোগই যদি না করা গেল ত ধ্যানস্থ হ'য়ে থেকে আর কি সুখ। এর উত্তরে এই বলা যায় যে, আনন্দের মান সকলের নিকট সমান নয়। কেহ হয়ত ইন্দ্রিয়জ সুখকেই সুখের চরম মনে করেন, কিন্তু ইহার

প্রতিক্রিয়ায় দুঃখ ও কষ্টভোগ অনিবার্য। একজন জাগ্রত অবস্থায় সুখভোগ করেন ব'লে অপরকে যে ধ্যানাবস্থায় সুখভোগ না ক'রে তাঁর মত বিষয় হ'তে সুখভোগ করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। আর এক কথা—বিষয়-সুখভোগীসঙ্ঘের চরিত্রে ভাল ও মন্দ দুই প্রকার গুণ দেখা যায়। কিন্তু যিনি একবার সমাধির আনন্দ পেয়েছেন, তাঁর চরিত্রে দেবত্ব ব্যতীত কোন মানবীয় দোষ দেখা যাবে না। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে সংসার সুখকেই চরম সুখ জ্ঞান করেন, তার কারণ তাঁরা ধ্যানের আনন্দের গভীরতা কখন উপলব্ধি করেন নি। যেমন যে ব্যক্তি কখনও পোলাও, কালিয়ার আস্বাদ লাভ করে নি, সে যেমন মোটা চাউলের ভাতেই পরিতৃপ্ত থাকে, সেইরূপ সাধারণ লোক সমাধির অক্ষয় আনন্দের আস্বাদ কখন না পাওয়ায় বিষয় সুখভোগ ল'য়েই পরিতৃপ্ত থাকে। যিনি একবার ক্ষীর নামের উৎকৃষ্ট সন্দেশের আস্বাদ পেয়েছেন, তাঁর নিকট যেমন তামাক-মাখা গুড়ের মিষ্টতা 'ছ্যা' হ'য়ে যায়, সেইরূপ যিনি একবার ধ্যানানন্দের আস্বাদ পেয়েছেন, তাঁর নিকট ইন্দ্রিয়-সুখ অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে যায়।

উপনিষৎ এমনই মহান্ শাস্ত্র যে, ইহাতে সকল বিষয়ের আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। উপনিষদের এক একটী বিষয় অপরাপর শাস্ত্রগুলিতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। এই কারণ বলা হয় সকল শাস্ত্রেরই মূল উপনিষৎ, উপনিষদের উপরই অপর সকল শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। সমাধি সম্বন্ধে এই মহান উপনিষৎ শাস্ত্র কি বলেন তাহাই আমাদের এই প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়। সমাধি দুই প্রকার —সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। মুক্তিক উপনিষদে উক্ত হ'য়েছে—যখন অহঙ্কার থাকে না, ধ্যান গাঢ় হয়, ব্রহ্মাকারে চিত্তবৃত্তিসমূহ আকারিত হয়, তখন তাকে সবীজ বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। যখন চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বিরহিত হয় ও উহা কেবল আনন্দ দান করে, তখন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। অর্থাৎ তম ও রজপরিকৃত চিত্তে কোন বিক্ষেপ না থাকায় চিত্ত তখন একটিমাত্র বিষয়ে একাগ্র হয়। চিত্তের এই ভূমিতে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হ'য়ে থাকে। এই সমাধিতে ধ্যেয় বস্তু ও চিত্তের যোগাকারাবৃত্তি দুটিই বর্তমান থাকে। যখন চিত্তের এই যোগাকারা বৃত্তিরও নিরোধ হয় এবং কেবল আনন্দমাত্র অবশিষ্ট থাকে তখন হয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এই সমাধির আর এক নাম নির্বীজ সমাধি। যোগ সম্বন্ধে সর্ব-শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র পাতঞ্জল দর্শনে ধর্মমেঘ সমাধি নামে আর এক প্রকার সমাধির কথা আছে। যাহা কৈবল্য বা মোক্ষরূপ ধর্ম বর্ষণ করে তাহাই ধর্মমেঘ সমাধি।

অমৃতনাদ উপনিষৎ বলেন—যাহা লাভ করলে অন্য ইপ্সিত বস্তুতে অবজ্ঞার উদয় হয়—তার নাম সমাধি। শৈখল-উপনিষদে উক্ত হয়েছে যে সময় ধ্যেয়, ধ্যাতা ও ধ্যান এই তিনের কোন প্রভেদ থাকে না, কেবল পরমানন্দস্বরূপ শুদ্ধ চৈতন্য বর্তমান থাকেন, এইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যাবস্থাকে নির্বিকল্প সমাধি বলে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে যে, নির্বিকল্প সমাধিতে নির্গুণ সত্তাকে উপলব্ধি করা যায়। এই উপলব্ধি করা অর্থে বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে জানা নয়, চৈতন্যস্বরূপত্ব লাভ করা। জলের সহিত সৈন্ধব খণ্ডের সম্বন্ধ হ'লে যেমন আর কোন পার্থক্য থাকে না, সেইরূপ আত্মা ও মনের ঐক্য হ'লে সমাধি লাভ হয় (বরাহ উপনিষৎ)। যোগতত্ত্ব উপনিষদে উক্ত হ'য়েছে পরমাত্মা ও জীবাত্মার একত্ব বিষয়ে যে জ্ঞান তাহাই সমাধি। যোগতত্ত্ব ও অরুণপূর্বা উপনিষৎ বলেন যে, আত্মজ্ঞ ব্যক্তির চিত্ত চিত্তকার্যরহিত ব'লে চিত্ত নামে অভিহিত হয় না। ঐ চিত্ত চৈতন্যাত্মক ব্রহ্ম-স্বরূপ। মুক্তিক উপনিষৎ বলেন :

ঊর্দ্ধপূর্ণমধঃ পূর্ণং মধ্যে পূর্ণং শিবাত্মকম্।
সাক্ষাদ্বিধিমুখোহেষ সমাধিঃ পারমার্থিকঃ ॥

সমাধি সম্বন্ধে বিভিন্ন উপনিষদের প্রামাণ্য উক্তি-সকলের কিছু কিছু উদ্ধৃত করা হ'ল। বাস্তবিকই

যে ভাগ্যবান সাধক শ্রীগুরুর কৃপায় সমাধি অবস্থা লাভ করেছেন তিনিই ধন্য। তাই অন্নপূর্ণা উপনিষৎ বলেন—"সমাধিকালে সাধকের ব্রহ্মানন্দ অনুভব হয় ব'লে তাঁর মুখের কান্তি অতি মনোহর হয়।" এই সম্পর্কে পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজের উক্তিটী উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করা যায় না। উহা এই —"ধর্মপথে অগ্রসর হওয়ার ও সাধনের ফল এই যে, তুমি বেশ সন্তোষলাভ করছ। অতিশয় বিষাদাচ্ছন্ন হ'য়ে মুখভার ক'রে রাখা তমোগুণের একটা লক্ষণ। দ্বিতীয়তঃ তোমার মুখশ্রী পরিবর্তিত হ'য়ে যাচ্ছে। মুখের শুষ্কতা ও কঠোরতাব্যঞ্জক রেখাগুলি অন্তর্হিত হ'য়ে যাবে। মনের শান্তি মুখে ফুটে উঠ্‌বে, তারপর তোমার কণ্ঠস্বর অতি সুন্দর হবে।"

এই সমাধি-প্রবেশই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। যে সাধক সমাধির আস্বাদ পেয়েছেন তিনি বলেন—

অহো শান্তমহো শান্তমহো গুরুরহো গুরুঃ।
অহো জ্ঞানমহো জ্ঞানমহো সুখমহো সুখম্॥
(অবধূত উপনিষৎ)

তিনি উপনিষৎ বা বেদান্তশাস্ত্র ও সেই শাস্ত্রের উপদেষ্টা আচার্য ও তত্ত্বজ্ঞান ও জ্ঞানজনিত আনন্দ স্মরণ ক'রে প্রাণের উচ্ছ্বাস উক্ত শ্লোকে প্রকাশ করছেন। বাস্তবিকই উপনিষৎ এক বিস্ময়কর শাস্ত্র, উহা সমগ্র শাস্ত্রের চূড়ামণি। যিনি এই শাস্ত্রের উপদেশ দেন, তিনি কি বিস্ময়কর পুরুষ! সকল সাধনের ফলস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানই বা কি বিস্ময়কর এবং তৎফল আনন্দই বা কি বিস্ময়কর। সকল সুখের সেরা এই আনন্দ, ইহা অপেক্ষা সুখকর আর কিছু থাকতে পারে না। সমাধি হ'তেই এই আনন্দ লাভ করা যায়, অতএব সমাধি সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রত্যেক জ্ঞানবান ও বিচারশীল ব্যক্তিরই অবশ্য কর্তব্য। (এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সমাধি সম্বন্ধে একটি দিগ্‌দর্শন মাত্র দেওয়া গেল।)

জড় ভরত

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

পুরাকালে এই দেশ অজনাভ বা ইলাবৃত দেশ নামে অভিহিত হইত। রাজর্ষি ভরতের নামানুসারে ইহা ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ভরত-রাজবংশের ইতিবৃত্ত মহাভারতে গ্রথিত থাকায় উক্ত মহাকাব্যের নাম ভারত সংহিতা। পাণ্ডবের ভরত পরজন্মে আত্মজ্ঞ হইয়া আত্মস্বরূপের আশংকায় জড়বৎ বিচরণ করিতেন। মনুসংহিতায় আছে, জ্ঞানী জড়বৎ ইহলোকে বিচরণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায় হইতে পঞ্চদশ অধ্যায় পর্যন্ত আট অধ্যায়ে জড়ভরত ভরতের পুণ্য চরিত্র বিশদভাবে বিবৃত।

রাজা ভরত ভাগবত আদেশে বিশ্বরূপের দুহিতা পঞ্চজনীকে বিবাহ করিলেন। উক্ত পত্নীর গর্ভে তাঁহার পঞ্চপুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি মহাভাগবত ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং ভাবিতেন, "দেবতা-প্রকাশক মন্ত্রসমূহের অর্থ ইন্দ্রাদি দেবতা; কিন্তু বাসুদেব সর্বদেব-নিয়ামক পরম দেবতা।" ইহার ফলে তাঁহার সত্ত্বশুদ্ধি ও ভক্তিলাভ হইল। অনন্তর তিনি রাজগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গণ্ডকী নদী তীরে পুলহাশ্রমে হরিক্ষেত্রে যাইয়া সন্ন্যাস-ধর্ম অবলম্বন করিলেন। সেই পুলহাশ্রমের উপবনে মহাত্মা ভরত একাকী থাকিয়া বিবিধ কুসুম, কিশলয়,

তুলসী, জল এবং ফলমূলাদি উপচার দিয়া ভগবানের আরাধনায় নিমগ্ন হইলেন। যখন তিনি মৃগচর্ম পরিধান করিয়া ত্রিসন্ধ্যা অভিষেক করিতেন ও অকপটে ভাগবত পাদপদ্ম ধ্যানে সমাহিত হইতেন তখন অবিরল প্রেমাশ্রুবিগলিত হইয়া তাঁহার নয়ন-যুগের দৃষ্টি রুদ্ধ হইত এবং কুঞ্চিত ও কপিল জটাজাল সতত সিক্ত হওয়াতে তাঁহাকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাইত।

একদা ভরত মহানদী গণ্ডকীতে স্নান ও নিত্যকর্ম সমাপনান্তে নদীতটে মুহূর্তকাল প্রণব জপিতেছিলেন। এমন সময়ে একটী হরিণী জলপানার্থ একাকিনী সেই নদীর নিকটে আসিল। যখন সে তৃষ্ণাতুরা হইয়া জলপান করিতেছিল তখন অদূরে একটি সিংহ ভীষণ গর্জন করিল। ভয়ংকর সিংহনাদে ভীতা হইয়া সেই হরিণী নদীতে লাফাইয়া পড়িল। গর্ভবতী হরিণী নদীর পরপারে যাইবার সময় মহা ভয়ে মৃতপ্রায় হইল। ইহার ফলে তাহার গর্ভপাত হইল। সে মুমূর্ষু অবস্থায় একটি পর্বতের গুহায় উপস্থিত হইল এবং তথায় পড়িবামাত্র মরিয়া গেল। সদ্যোজাত হরিণশাবক নদী-স্রোতে পড়িয়া ভাসিতে লাগিল। তখন মমরূপে মায়া ভরতকে গ্রাস করিল। নদীতীরে অবস্থিত ভরত মৃতমাতৃক হরিণ-শিশুকে নদীজল হইতে তুলিয়া স্বীয় আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং উহাকে গাঢ় স্নেহে পালন করিতে লাগিলেন। তিনি অহরহ তৃণাদি দিয়া উহাকে পোষণ করিতেন, উহাকে বৃক, কুক্কুর ও শূকরাদি হিংস্র জন্তুর কবল হইতে রক্ষা করিতেন এবং কণ্ডূয়ন, চুম্বনাদি দ্বারা তাহাকে আদর করিতেন। সেই হরিণবালকের সহিত উপবেশন, শয়ন, ভ্রমণ, স্নান ও ভোজনাদি করিবার ফলে তিনি তৎপ্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইলেন। গভীর আসক্তি নিমিত্ত বনপথে ভ্রমণকালে তিনি মৃগশিশুকে স্কন্ধে তুলিয়া বহন করিতেন এবং কখন কোলে, কখনও বা বুকে রাখিয়া অপার আনন্দে পুলকিত হইতেন। সন্ধ্যাদি অনুষ্ঠানকালেও এক একবার তিনি গাত্রোত্থান করিয়া ঐ হরিণশিশুকে স্নেহভরে দেখিতেন। মহাত্মা ভরত যখন মুদ্রিত নয়নে সমাধিস্থ হইতেন তখন স্নেহবদ্ধ মৃগ-শিশু চকিতভাবে তাঁহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং স্বীয় কোমল শৃংগাগ্র দ্বারা ধীরে ধীরে তাঁহাকে স্পর্শ করিত। মাতৃহীন মৃগ-শাবক আশ্রমের বাহিরে যাইলে ভরত সতৃষ্ণ নয়নে ও উদ্বিগ্ন অন্তরে উহার প্রত্যাগমন অপেক্ষা করিতেন। মৃগশিশুতে অতিরিক্ত অনুরাগহেতু মহাযোগী যোগভ্রষ্ট হইলেন। যিনি পূর্বে ত্যক্তা ঔরস সন্তানগণকেও মুক্তিপথের প্রতিবন্ধক ভাবিয়া মলমূত্রবৎ পরিত্যাগ করিলেন তিনিই অন্য-জাতীয় মৃগশিশুতে আত্মজ্ঞানে আসক্ত হইলেন! মহামায়ার কি দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাব!! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে সত্যই বলিয়াছেন, "গুণময়ী দৈবীমায়া দুরতিক্রম্যা, ভগবচ্চরণে প্রপন্ন না হইলে এই মায়া-জাল অতিক্রম করা যায় না।" সর্প যেমন মূষিকের গর্তে প্রবেশ করে তদ্রূপ অনতিক্রম্য মৃত্যুকাল ইতোমধ্যে ভরতকে তীব্রবেগে অলক্ষ্যে আক্রমণ করিল। তৎকালেও তিনি ধ্যানযোগে দেখিতেছিলেন, সেই মৃগশিশু সন্তানবৎ পার্শ্বে বসিয়া শোক করিতেছে। অন্তকালে মৃগশিশুতে তচ্চিত্ত আবদ্ধ হওয়ায় তিনি পরজন্মে মৃগদেহ প্রাপ্ত হইলেন। মৃত্যুকালে যাহার মন যাহাতে আসক্ত থাকে পরজন্মে সে তাহাই প্রাপ্ত হয়। মৃগদেহে পূর্বজন্মের পুণ্যস্মৃতি প্রবল থাকায় জন্মস্থান কালঞ্জর পর্বতে মৃগীমাতাকে ছাড়িয়া সেই মৃগরূপী ভরত শালগ্রামাখ্য হরিক্ষেত্রে পুলস্ত্য-পুলহাশ্রমে আসিল এবং একাকী শুষ্ক পত্র, তৃণ, লতা প্রভৃতি ভোজনপূর্বক জীবন ধারণ করিতে লাগিল এবং মৃগদেহের নিমিত্ত অবসানের সময় প্রতীক্ষা করিল। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, মানুষও কর্মদোষে মানুষেতর নীচযোনি প্রাপ্ত হয়। অনন্তর মৃত্যুকাল সমাগত হইলে তত্রত্য তীর্থের অধোদেশে অবস্থিত স্বীয় মৃগদেহ ত্যাগপূর্বক আঙ্গিরস গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিলেন।

তাঁহার পিতা শম-দমাদি সদ্‌গুণে অলংকৃত ও আনন্দময় বিপ্র ছিলেন। তাঁহার দুই ভার্যা ছিল। জ্যেষ্ঠা ভার্যার গর্ভে নয় পুত্র এবং কনিষ্ঠা ভার্যার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল। কনিষ্ঠা পত্নীর পুত্রটি পরম ভাগবত ছিলেন। সকলে বলেন, সেই রাজর্ষি ভরত মৃগত্ব ত্যাগ করিয়া বিপ্রত্ব পাইয়াছেন। সদ্‌দোষহেতু পতনের আশংকায় ভরত বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভগবানের পাদপদ্ম মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন। পূর্ব পূর্ব জন্মের পুণ্যস্মৃতি মনে উদিত হওয়ায় তিনি জড়, অন্ধ বা বধিরতুল্য আচরণ করিতেন। তিনি চিরাচরিত প্রথানুসারে পিতার নিকট শিক্ষা বা দীক্ষা লইলেন না। হঠাৎ পিতার মৃত্যু হওয়ায় মাতা নিরুপায় হইয়া পুত্র ও কন্যাকে সপত্নীর হস্তে সমর্পণপূর্বক সহমরণে পতিলোক প্রাপ্ত হইলেন। পিতা স্বর্গত হইলে ভ্রাতৃবর্গ ভরতকে জড়মতি মনে করিয়া তাঁহাকে শিক্ষাদানে বিরত হইলেন। জড় ভরতকে যে ব্যক্তি যে কর্ম করাইত তিনি তাঁহারই ইচ্ছানুযায়ী সেই কর্ম করিতেন। প্রাকৃত বিপদ পশুগণ তাঁহাকে জড় বা মূক অথবা বধির ভাবিয়া তাঁহার সহিত যেরূপ বাক্যালাপ করিত তিনিও তাঁহাদের সহিত তদ্রূপই ব্যবহার করিতেন। শংকরাচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য তোটকাচার্যও আজন্ম জড় ভরতবৎ বিচরণ করিতেন। লোকে বিনামূল্যে কাজ করাইবার জন্য বলপূর্বক জড় ভরতকে ধরিয়া লইয়া যাইত। এইরূপে তিনি যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য পাইতেন তাহাতেই সানন্দে উদরপূর্তি করিতেন। যদৃচ্ছালব্ধ অন্নভোজনেই তিনি তৃপ্ত হইতেন, কদাপি জিহ্বার লালসা চরিতার্থ করিতেন না; কারণ তিনি উৎপাদকত্বরূপ অভিব্যঞ্জকরহিত বিশুদ্ধ অনুভব স্বরূপ আনন্দময় পরমাত্মাতেই সদা সন্তুষ্ট থাকিতেন। তিনি এইভাবেই আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মানাপমান রূপ দ্বন্দ্ব হইতে উৎপন্ন সুখে ও দুঃখে তাঁহার দেহাভিমান ছিল না। শীত গ্রীষ্ম ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতিতে তিনি অনাবৃত শরীরে বিচরণ করিতেন। তাঁহার দেহ বৃষবৎ পুষ্ট ও অবয়বসমূহ বলিষ্ঠ ছিল। ভূমি-শয়ন ও তৈল-অমর্দন এবং স্নান নিমিত্ত সর্বদা তাঁহার গাত্র ধূলায় ধূসরিত হইত, উহাতে ব্রহ্মতেজ মহামণিবৎ অল্পকাশিত থাকিত। তাঁহার কটিতটে কুৎসিত বসন এবং বক্ষঃস্থলে মলিন যজ্ঞোপবীত নিবদ্ধ থাকিত। যাহারা তাঁহার পরিচয় জানিত না তাহারা তাঁহাকে ব্রহ্মবন্ধু বা দরিদ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া অবজ্ঞা করিত। তাঁহার ভ্রাতৃবর্গও বেতন স্বরূপে কেবল আহার দিয়া তাঁহাকে শালিক্ষেত্রের কর্দম মর্দনাদি কর্মে নিযুক্ত করিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে ক্ষুদ, খইল, তুষ, কীটদষ্ট কলাই, উচ্ছিষ্ট অন্ন অন্নাদি যাহা কিছু দিতেন তাহাই তিনি অম্লানবদনে ভোজন করিতেন।

একদা কোন চৌররাজ অপত্য কামনায় মহাদেবী ভদ্রকালীর প্রীত্যর্থ নরপশু বলিদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহার নির্দিষ্ট নরপশু হঠাৎ বন্ধনমুক্ত হইয়া পলায়ন করে। তাহার অনুচরবৃন্দ পলায়িত নরপশুকে চারিদিকে খুঁজিয়া না পাইয়া রাত্রিকালে ক্ষেত্ররক্ষক বিপ্রতনয় 'রাজপুত্র' জড় ভরতকে রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া চণ্ডীমণ্ডপে লইয়া গেল। অনন্তর চৌররাজ বিধিমতে তাঁহাকে স্নান করাইয়া, নূতন কাপড় পরাইয়া এবং অলংকার, গন্ধমাল্য ও তিলকে সাজাইয়া দিল। তৎপরে তাঁহাকে ধূপদীপাদি দ্বারা পূজা করিয়া মৃদঙ্গাদি বাদ্য বাজাইয়া তাঁহাকে ভদ্রকালী দেবীর সম্মুখে আনয়ন করিল ও অধোমুখে বসাইল। যে চৌর পৌরোহিত্য কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিল সে পুরুষ-পশুর রক্তাসবে দেবীর অর্চনার্থ তাঁহাকে ভদ্রকালীর মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া ভীষণ শাণিত খড়্গ হাতে লইল। যখন সেই ঘাতক ব্রহ্মজ্ঞ ভরতকে বধ করিতে উদ্যত হইল তখন দেবী প্রতিমা পরিত্যাগপূর্বক বহির্গতা হইলেন। যিনি ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ ও স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ, কাহারো সহিত যাঁহার শত্রুতা নাই, যিনি সর্ব প্রাণীর সুহৃৎ, আপৎকালে

লৌকিক হিংসাতেও যাঁহার প্রাণবধ অনুমোদিত হইতে পারে না, তাঁহারই শিরশ্ছেদন উদ্দেশ্যে দেবীর সম্মুখে উদ্যোগ হইতেছিল। ইহাতে দেবীর দেহ দুর্বিসহ ব্রহ্মতেজে বহ্নিমান হইতে লাগিল। দেবীর গাত্রদাহহেতু অতিশয় রোষ ও অমর্ষের উদয় হইল। সেই রোষাবেশে তাঁহার ভ্রূকুটী ও কুটিল দংষ্ট্রা এবং আরক্ত নয়ন ও করাল বদন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তিনি জগৎ সংহারার্থ অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন। তিনি পাপাত্মা চৌরদের উপরে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাদের খড়্গেই তাহাদের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। তাহাতে সেই তস্করদের গলদেশ হইতে অত্যুষ্ণ আসবতুল্য যে রক্ত নির্গত হইল ভদ্রকালী পরিবারগণ সহ তাহাই সহাস্যে পান করিলেন। চামুণ্ডা দেবী রক্তপানে অত্যন্ত উন্মত্তা হইয়া পার্ষদগণ সহিত উচ্চকণ্ঠে গান ও তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি সেই দুষ্ট চৌরদের লম্বজ্জিহ্ব মস্তকগুলি কন্দুক তুল্য করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ও পরমহংস তাঁহাদের শত্রুগণ এইরূপে ভগবানের কালচক্রে নিহত হইয়া থাকে। ভদ্রকালীর আরাধনা ও আবির্ভাবে প্রমাণিত হয়, ভাগবতীয় যুগেও শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল। কাপালিক উগ্র ভৈরব কর্তৃক শংকরাচার্য, রাজগুরু ভৈরবানন্দ কর্তৃক জয়দেব বলিদানার্থ যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ হন। শ্রীরামচন্দ্রকেও বলিদানার্থ মহীরাবণ পাতালে লইয়া যান। এই চারি ঘটনার মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য বিদ্যমান।

জড় ভরত সম্বন্ধে আর একটী প্রবাদ প্রচলিত। একদা সিন্ধু ও সৌবীর রাজ্যদ্বয়ের অধিপতি রহূগণ শিবিকারোহণে যাইতেছিলেন। তাঁহার প্রধান বাহক ইক্ষুমতী নদীতীরে আসিয়া অন্য শিবিকাবাহকের সন্ধান করিতে করিতে যেন দৈবপ্রেরিত বিজবর জড় ভরতকে তথায় দেখিতে পাইল। ভরতকে দেখিয়া সে মনে মনে ভাবিল, "ইহার দেহ স্থূল এবং অঙ্গও দৃঢ়। এ নিশ্চয়ই বৃষভ বা গর্দভবৎ ভারবহনে সমর্থ। এইরূপ নিশ্চয়পূর্বক সে ভরতকে জোর করিয়া বাহকের কার্যে নিযুক্ত করিল। যদিও ভরত কখনও শিবিকা বহন করেন নাই তথাপি তিনি অন্য বাহকের সহিত বিনা বাক্যব্যয়ে শিবিকা বহন করিয়া চলিলেন। পাছে কোন জীবহিংসা হয় সেই জন্যই ভরত, বাম ত্যাগ করিলে যত দূরে পড়ে, সেই পরিমিত স্থান দেখিয়া পশ্চাৎ পদক্ষেপ করিতেন। এইরূপে যাইতে পূর্ব হইতেই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য বাহক এইরূপে যাইতে পারিল না। সুতরাং শিবিকা বিষম হইয়া পড়িল। ইহাতে রাজা রহূগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বাহকগণকে তিরস্কার করিলেন। তখন প্রধান বাহক রাজাকে জানাইলেন, নূতন বাহক শিবিকা বহন করিতে পারিতেছে না। তখন রহূগণ ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নিবৎ যাঁহার ব্রহ্মতেজ অবিস্পষ্ট ছিল সেই ভরতকে সক্লেষবাক্যে ভর্ৎসনা করিলেন। ভরত ব্রহ্মভূত হওয়াতে তাঁহা হইতে 'আমি', 'আমার' রূপ মিথ্যা জ্ঞান চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছিল। এইজন্য রাজা কর্তৃক বক্রবাক্যে ভর্ৎসিত হইয়াও তিনি মৌনী রহিলেন এবং পূর্ববৎ শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন। অনন্তর জড় ভরত ঈষৎ হাস্যে রাজাকে বলিলেন, "আমার দেহাভিমান নাই। সুতরাং আমি স্থূলত্ব, কৃশত্বাদিবোধ হইতে মুক্ত। আমার দেহই স্থূল: কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মস্বরূপ আমি স্থূল নহি। আমি বাহ্যতঃ জড়বৎ হইলেও বস্তুতঃ আমি ব্রহ্মভাবে আরূঢ় হইয়াছি। মান ও অপমানে আমার ইষ্টাপত্তি নাই। আমি আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া শুদ্ধ ও তুষ্ণী হইয়াছি। সুতরাং আমাকে দণ্ড বা শিক্ষাদান পিষ্টপেষণবৎ পণ্ডশ্রম।"

জড়ভরত স্বীয় প্রাক্তন কর্মের আরব্ধ ফল ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিবার জন্য পূর্ববৎ রাজযান বহন করিতে লাগিলেন। উক্ত কর্মে তিনি কোন ক্লেশ বা অপমান বোধ করিলেন না। ভরতের স্কন্ধদেশে যজ্ঞসূত্র দেখিয়া রাজা তাঁহাকে ছদ্মবেশী ব্রহ্মজ্ঞ বিপ্র অথবা

দত্তাত্রেয়াদি তুল্য অবধূত বুঝিলেন। সর্বত্র সমদর্শন হেতু স্বদেহেও তাঁহার আত্মবোধ না দেখিয়া রাজা ভরতকে আত্মজ্ঞ পুরুষ বলিয়া জানিলেন এবং তাঁহাকে অপমান করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন জড় ভরত রাজাকে সুনির্মল আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিলেন। তিনি সবিনয়ে বলিলেন, "হে রাজন্, তুমি প্রভু-ভৃত্যাদি লৌকিক ব্যবহারকে সত্য বলিতেছ; কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যবহার বস্তু মিথ্যা।" শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১১।৪-৬) শ্লোকত্রয়ে ভরতের কিঞ্চিৎ উপদেশ নিম্নোক্ত প্রকারে বিবৃত:

"যাবৎ মনো রজসা পুরুষস্য সত্ত্বেন বা তমসা
বানুরুদ্ধম্।
চেতোভিরাকূতিভির্যাতনোতি নিয়ংকুশং কুশলং
চেতরংবা॥"

অনুবাদ—যে পর্যন্ত মানুষের মন রজঃ, সত্ত্ব কিংবা তমোগুণে বশীকৃত থাকে, সেই পর্যন্তই তাহা নিরংকুশ হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা মানুষের ধর্ম বা অধর্ম বিস্তার করিয়া দেয়।

"স বাসনাত্মা বিষয়োপরক্তো গুণপ্রধানো বিকৃতঃ
ষোড়শাত্মা।
বিত্তং পুরক্তনামভি রূপভেদমবস্তুবিষ্টঞ্চ
পুরৈবনোতি॥"

অনুবাদ—মন কামনাপূর্ণ বলিয়াই সর্ব বিষয়ে অনুবিদ্ধ হইয়া থাকে এবং ত্রিগুণ দ্বারা চালিত ও বিকৃত হইয়া পড়ে। ঐ মন পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়রূপ ষোড়শকলার মধ্যে মুখ্য। ইহাই পুরক্ত পুরক্ত নামের সহিত দেব-পশু-পক্ষ্যাদি বিশেষ বিশেষ দেহ ধারণ করে এবং সেই সেই দেহের নিমিত্তই আত্মার উৎকৃষ্টত্ব ও নিকৃষ্টত্ব প্রকাশ পায়।

"দুঃখং সুখং ব্যতিরিক্তঞ্চ তীব্রং কালোপপন্নং
ফলমাদ্য নক্তি।
আলিঙ্গ্য মায়ারচিতান্তরাত্মা স্বদেহিনং সংসৃতি-
চক্রকূটঃ॥"

অনুবাদ—গ্রামকূটকবৎ এই মন সংসারচক্রস্থলে মায়াবলে জীবোপাধি রচনা করিয়া স্বীয় আত্মাকে আলিঙ্গনপূর্বক আত্মকৃত কর্মের পরিপক্ক হইবার ফল সুখ, দুঃখ বা মোহকে সর্বতোভাবে সৃষ্টি করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১১।৮) আছে:

"গুণানুরক্তং ব্যসনায় জন্তোঃ, ক্ষেমায় নৈর্গুণ্যম্
অথো মনো স্যাৎ।
যথা প্রদীপো ঘৃতবর্তিমশ্নন্ শিখাঃ সধূমা ভজতি
হ্যদা স্বম্॥
পদং তথা গুণকর্মানুবন্ধং বৃত্তীর্মনঃ প্রকৃতেরুক্ত
তত্ত্বম্॥"

অনুবাদ—মন গুণানুরক্ত হইলেই বিপদের কারণ হয়, আবার গুণাতীত হইলেই শ্রেয়োপ্রাপ্ত হয়। ঘৃতের বর্তি দগ্ধ হইবার কালে প্রদীপ্ত ধূমযুক্ত শিখাধারণ করে, কিন্তু ঘৃত নিঃশেষিত হইলেই তাহা স্বীয় পদ শুক্লতা প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ মন যখন গুণ ও কর্মে অনুবিদ্ধ হয় তখনই বহুবৃত্তি আশ্রয় করে; গুণাতীত হইলে আত্মতত্ত্বেই লীন হয়। জড় ভরত রাজা রহুগণকে আরও বলিলেন, "মন মায়ারচিত অবিশুদ্ধ-কর্তা ও প্রধান জীবোপাধি। বৃত্তিসমূহ উহার বিভূতি এবং প্রবাহরূপে অবিচ্ছিন্ন। দেহী আত্মজ্ঞান দ্বারা যে পর্যন্ত মায়াজাল সংচ্ছিন্ন না করে এবং নিঃসঙ্গ ও বিগুণত্ব হইয়া যে পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব অবগত না হয় তাবৎ সংসারপথে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। যাবৎ এই মনকে আত্মার উপাধি ও ত্রিতাপের ক্ষেত্র বলিয়া বোধ না হয় সে পর্যন্ত সংসার হইতে নিষ্কৃতি হয় না। যদিও ঐ মন স্বয়ং মিথ্যা স্বরূপ তথাপি উহা আত্মবোধের বিস্মৃতিসাধনে সমর্থ।"

রাজা রহুগণ শিবিকা হইতে নামিয়া জড় ভরতকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, "হে পরম-হংস, জ্বররোগে পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে সুস্বাদু ঔষধ এবং রৌদ্রতপ্ত ব্যক্তির পক্ষে শীতল পানীয় যেরূপ সুখকর হইয়া থাকে তদ্রূপ আমার পক্ষে আপনার জ্ঞানোপদেশ তৃপ্তিকর হইয়াছে।" জড়ভরত রাজার

সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া পুনরায় বলিলেন : "এই জগৎ-প্রপঞ্চ ভগবানের মায়াবিলসিত। আত্মাতে কখন হ্রস্ব, কখন দীর্ঘ, কখন সূক্ষ্ম, কখন কারণ এবং কখন জড়ধর্ম দেখিয়া যে দ্বৈত ভাণ জন্মে তাহাও মিথ্যা। নাম ও রূপ মায়াময়ই। বিশুদ্ধ, সম্পূর্ণ, অপরিচ্ছিন্ন নির্বিশেষ জ্ঞানই পরমার্থ সত্য। সেই জ্ঞানের নাম ভগবান বা ব্রহ্ম বা আত্মা। মনোনাশে আত্মজ্ঞান সমুদিত হয়।"

রাজা রহুগণ ভরতের উপদেশ শ্রবণে বুঝিলেন, এই আত্মত্ত অবধূত লোকসঙ্গ পরিহারার্থ প্রচ্ছন্ন-ভাবে পর্যটন করিতেছেন। ভরত রাজাকে আরও উপদেশ দিলেন এবং তাঁহার কাছে ভবাটবী বা সংসারারণ্য বর্ণনা করিলেন। তিনি রাজাকে আত্ম-তত্ত্ব উপদেশ দিয়া রাজ্যত্যাগপূর্বক ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন হইতে বলিলেন। সিন্ধু সৌবীরপতি রহুগণও জড়-ভরতের নিকট সতত্ত্ব আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ দেহে আত্মবুদ্ধি জলাঞ্জলি দিলেন।

অনন্তর জড় ভরত রূপকরূপে বর্ণিত ভবাটবীর প্রকৃত অর্থ রাজার নিকট ব্যাখ্যা করিলেন। জড় ভরত বলিলেন : "এই গৃহাশ্রম কর্মক্ষেত্রস্বরূপ। ইহাতে সর্বকর্ম কদাপি উন্মূলিত হয় না। যেমন কর্পূরপাত্রে কর্পূর না থাকিলেও তাহার গন্ধ যায় না তদ্রূপ কর্মসমূহ বিনষ্ট হইলেও কামনা ক্ষীণ হয় না। প্রতি বৎসর ক্ষেত্রকর্ষণ করিলেও যেমন ক্ষেত্রস্থ বীজ-সমূহ বিনষ্ট হয় না, আবার শস্য বপনকরা হইলে, তথায় তৃণগুল্মলতাদি অংকুরিত হয়, তদ্রূপ কাম্য কর্মের আধার গৃহাশ্রমে থাকিয়া কর্মত্যাগ অসম্ভব। কামনা-বর্জন অথবা সংকল্প-সন্ন্যাস ব্যতীত কর্মত্যাগ হয় না। যাহারা সংসারকে সত্য ভাবিয়া গ্রাম্য ধর্মাদি উপভোগার্থ মৃগতৃষ্ণার পশ্চাতে ধাবমান হয় তাহারা সংসারের দাবানলে দগ্ধীভূত হয়। ভগবদ্ভক্তগণের অনুগ্রহ বিনা কেহ সংসার সাগরের পরপারে যাইতে পারে না। সাধুসঙ্গ বা ভক্তসেবা না করিলে ভগবদ্ভক্তি লাভ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে ৫।১২।১২ শ্লোকে আছে :

রহুগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নি সূর্যৈর্বিনা মহৎ পাদরজো-
ভিষেকম্॥

অনুবাদ—জড় ভরত রাজা রহুগণকে বলিলেন, "পূর্বোক্ত আত্মজ্ঞান মহাপুরুষদিগের পদধূলির অভিষেক দ্বারাই অর্জিত হয়। নতুবা তপস্যা বা বৈদিক কর্ম কিংবা অন্নাদি দান অথবা গৃহস্থ ধর্মার্থ পরোপকার কিংবা বেদাভ্যাস অথবা জল, অগ্নি ও সূর্যের উপাসনার দ্বারা কিছুতেই পাওয়া যায় না।"

স্বামী বিবেকানন্দ কালিফোর্নিয়াতে জড় ভরত সম্বন্ধে ইংরাজিতে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন ইহা তাঁহার ইংরাজি গ্রন্থাবলীর চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত। স্বামিজীর এই রচনা কবিত্ব-রঞ্জিত ও মহত্ত্ব-মণ্ডিত। স্বামিজী বলেন, ভরত মৃগ-জন্মেও জাতিস্মর ছিলেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় পশুদেহেও জাতিস্মরত্ব বিদ্যমান থাকে।

গত ১লা জ্যৈষ্ঠ বুধবার, কলিকাতা আলোকঘর বিদ্যার্থিনী সভার প্রতি ভাষণের সারাংশ।

অবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ, বি. এল.

অবতারশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে গেলে মহাভারতের উক্তি মনে পড়িয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অবতার বলিলে অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। কিন্তু "অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চে ভুবতরণম্ অবতারঃ" অর্থাৎ অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণের নাম অবতার। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূতের বিকার নির্মিত প্রাকৃত জগৎকে প্রপঞ্চ বলে। পঞ্চভূতের অতীত যে পরব্যোম সেই অপ্রাকৃত ধামকে অপ্রপঞ্চ বলে। প্রাকৃত জগৎ ত্রিগুণত্রয় অর্থাৎ সত্ত্ব: রজঃ ও তমঃ দ্বারা গঠিত। সেইজন্য অপ্রপঞ্চকে শুদ্ধ সত্ত্ব নির্মিত বলা হয়। উক্ত পরব্যোমই ভগবানের আবাসভূমি বলিয়া কল্পিত হয়। জীবমাত্রেই সেই অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু যাহার মধ্যে সেই শুদ্ধ সত্ত্ব সর্বাধিক সদাসর্বদা প্রকাশ থাকে তাহাকেই অবতার আখ্যা প্রদান করা হয়। ভাগবতে শুকদেব বলিয়াছেন : "অবতারাঃহ্যসংখ্যেয়াঃ" অর্থাৎ অবতার সংখ্যাতীত। তিনি কপিল, ঋষভদেব, দত্তাত্রেয়, ব্যাস প্রভৃতি সকলকেই অবতার বলিয়াছেন। এই হিসাবে বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য-দেবাদি সকলেই অবতার। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, মুক্ত পুরুষ ও পুরুষোত্তমে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ভগবান নিজে গীতায় বলিয়াছেন :

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।"

—জ্ঞানের পারগামী মুক্ত পুরুষগণ ভগবানের সাধর্ম্য প্রাপ্ত হইয়া কল্পান্তভাবী জন্মমৃত্যুর অতীত হন। মুক্ত পুরুষ যখন ভগবানের সাধর্ম্য বা স্বরূপতা প্রাপ্ত হন তখন তাঁহাকে অবতার বলিতে বাধা নাই।

মহাভারতে উক্ত আছে যে, যক্ষরূপী ধর্মের "কঃ পন্থা" প্রশ্নের উত্তরে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে —মহাজন বলিতে কি বুঝায় এবং পন্থা বলিতেই বা কি বুঝায়? মহাজন অর্থে আমাদের সাধারণতঃ জ্ঞান হয় যে দায়গ্রস্ত হয়ে যাহার নিকট অর্থের জন্য হাত পাতিতে হয় সেই মহাজন। সেইরূপ আধ্যাত্মিক দায়ে যাঁহার নিকট হাত পাতিতে হয় তিনিও মহাজন। যাঁহারা সাধন বলে মহঃ লোক জয় করিয়াছেন ও ব্রহ্ম সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই মহাজন। সেই সান্নিধ্য লাভ করিতে তাঁহারা যে মার্গ ঠিক করিয়া দিয়াছেন তাহাই পন্থা। অর্থাৎ যে সমস্ত প্রক্রিয়া দ্বারা সেই সমস্ত লোক জয় করা যায় তাহাই পন্থা। পন্থা কথাটি পথ+ইন্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ। পথ অর্থে গমন করা। অর্থাৎ দৈহিক শক্তি আশ্রয়ে কোন গন্তব্য স্থানে যাইতে হইলে যে মার্গ অবলম্বন করা হয় তাহাই পথ। যেমন পদব্রজে কাশী যাওয়া। জীবের অভ্যন্তরেই পঞ্চকোশী কাশী বিরাজমান। যে উপায় দ্বারা এই বিক্ষিপ্ত মনকে গুটাইয়া সেই পঞ্চকোশীতে লইয়া যাওয়া যায় তাহাই পন্থা। অর্থাৎ যে মানসিক প্রক্রিয়া অবলম্বনে ঐ সমস্ত লোক জয় করা যায় বা ব্রহ্মসান্নিধ্য লাভ করা যায় তাহাই পন্থা। অদ্বৈতীয় নানা মহাপুরুষ নানাভাবে সেই সমস্ত লোক জয় করা হেতু নানা পথের প্রকাশ।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মহাভারতের এই উক্তি নিজ জীবনে সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন —"যত মত তত পথ"। শ্রীরামকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন মহাপুরুষই কোন কালেই এ উক্তি করেন নাই এবং সকল ধর্মের সত্যতা সম্বন্ধে এরূপ মতবাদ

প্রকাশ করেন নাই। এই কারণে তাঁহাকে অবতার-শ্রেষ্ঠতা অযৌক্তিক নহে। তিনি নিজ জীবনে সকল ধর্ম সাধনা করিয়া বলিয়াছিলেন সকল ধর্মই সেই এক দিকে লইয়া যায়। যেমন পর্বত হইতে নদী-সমূহ উত্থিত হইয়া নানা দেশে নানা নাম প্রাপ্ত হইয়া এক সমুদ্রে মিশিবার কালীন নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া এক হইয়া যায় সেইরূপ সকল ধর্মই সেইখানে পৌঁছিয়া এক হইয়া যায়।

অবতার পুরুষদিগের এই সকল উক্তির মধ্যে অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব নিহিত থাকে। যে পথ দিয়াই অগ্রসর হওয়া যাউক না কেন ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হইলে আর ভেদজ্ঞান থাকে না। কারণ ব্রহ্মস্বরূপ সচ্চিদানন্দময়ত্ব লাভ হইলে নিরবচ্ছিন্ন মহানন্দের বিকাশ হয়। তখন আর কোন ভেদজ্ঞান থাকে না। কারণ জগৎ চিন্ময় বোধ হয়। এই বিমল সত্তা ততকালই থাকে যতকাল ইহা জগদাকারে অপরিণত বলিয়া উপাধিশূন্য। যে মুহূর্তে তাহা হইতে বিচলিত হয় তখনই সংসার-বোধ ফিরিয়া আসে। যেমন প্রশান্ত সলিলরাশি হইতে বিবিধ বিচিত্র আবর্তলেখা সেই সলিলরাশির বিকার-বিশেষরূপে বিভিন্ন আকারে সমুত্থিত হয় সেইরূপ সেই অবিকৃত বিমল আনন্দময় অবস্থা হইতে সংসারোন্মেষক বিকৃত বিকার সমুত্থিত হয়। ইহারই মহিমায় আমাদের সংসারের সত্তাবোধ হয়। অতএব যাঁহার উপাধি আছে, যিনি কোন না কোন নামে বা গুণে অপর হইতে পৃথগ্‌ভূত তিনি সেই বিকাশ অবস্থার উন্মেষক সর্বভূতেশ্বরের কল্পনা মূলক। এই বিকৃত বিকাশময়ী অবস্থা তিন প্রকার অর্থাৎ সূক্ষ্ম, মধ্য ও স্থূল। মন হইল সূক্ষ্ম, সংসার কল্পনার আদি উপাদান, স্মৃতি তাহার দ্বিতীয় এবং বিপুল সংসার তাহার স্থূল দশা। এই সূক্ষ্মাদি তিন প্রকার অবস্থার ভেদ করিয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমের কল্পনা করা হইয়াছে। ইহাই প্রকৃতি। এই গুণত্রয়ময়ী প্রকৃতিই অবিদ্যা। এই অবিদ্যাই এই প্রাণীমণ্ডলীর প্রবাহের হেতু। এই মূলপ্রবাহিনীর অপর পারই সেই চৈতন্যময়ের পরম পদ। সেইজন্য ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে হইলে প্রকৃতির ঊর্ধ্বে যাইতে হয়। তাই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "মা যে আমার ব্রহ্মদার আগলে রেখেছেন। তাঁর কৃপা না হ'লে তাঁর দেখা কোথায় পাবে?"

এই প্রকৃতিই হইল ব্রহ্মের বিকৃতি বা শক্তি। প্র-শব্দে প্রকৃষ্টার্থ বুঝায় এবং কৃতি শব্দের অর্থ সৃষ্টি। অতএব সৃষ্টিকার্যে যিনি প্রকৃষ্টা তিনিই প্রকৃতি। শ্রুতিতে প্র শব্দে প্রকৃষ্ট সত্ত্বগুণ, কৃ শব্দে রজোগুণ এবং তি শব্দে তমোগুণ। অর্থাৎ যিনি ত্রিগুণাত্মিকা সর্বশক্তিসম্পন্না এবং সৃষ্টি ব্যাপারে প্রধানা তিনিই প্রকৃতি। আবার প্র শব্দের অর্থ প্রথম এবং কৃতি শব্দের অর্থ সৃষ্টি—অতএব যিনি সৃষ্টির আদিকর্ত্রী তিনিই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি ব্রহ্মকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। তাহাদের কখন ছাড়াছাড়ি নাই। যেমন অগ্নি ও তাঁহার দাহিকা শক্তি। প্রকৃতির উপাধিতে উপহিত চৈতন্যই জীব। জীব প্রকৃতি-পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য আরাধনায় রত হয় কারণ তাহার অন্তরে রাধামাধব বিরাজমান। এই প্রকৃতি পাশ হইতে মুক্ত হইতে হইলে প্রকৃতির অর্চনা অবশ্য প্রয়োজন। কারণ প্রকৃতির কৃপা না হইলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। যতক্ষণ অহং ও ইদং জ্ঞান আছে ততক্ষণ প্রকৃতিও আছে। এই অহং-ইদং জ্ঞানের ঊর্ধ্বে যাইতে হইলে মার কৃপা চাই। তাই পরমহংসদেব মহামায়ার উপাসক ছিলেন। অদ্বৈতের মহাপুরুষগণ সকলেই প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। রামপ্রসাদ, সাধক নীলকণ্ঠ, চৈতন্য মহাপ্রভু, এমন কি আচার্য শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত মঠের আভ্যন্তরিক তথ্য যাঁহারা অবগত, তাঁহারাও জানেন যে আচার্য শঙ্করও মাতৃ-উপাসক ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রকৃতি বিজড়িত হইয়াও প্রকৃতি পাশে বদ্ধ হন নাই। ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। তিনি বলিতেন—ব্রহ্ম সত্য, জগতও সত্য। জীব

জগৎ ছাড়া নহে। যদি জগৎ মিথ্যা হয়, তবে জগতে অবস্থিত জীবও মিথ্যা; এবং এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের পূর্ণত্ব বাধিত হয়। সেইজন্য তাঁহার মতবাদ ব্রহ্মও সত্য, জগতও সত্য। জগৎ ব্রহ্মের বিকাশ। এইখানেই তাঁহার সহিত আচার্য শঙ্করের মতানৈক্য। আমরাও জগৎকে মিথ্যা কল্পনা করি না এবং জীবভাবাপন্ন হইয়াও ব্রহ্মের কৃপা প্রয়াসী। আমরা জানি শিব থাকিলেই শক্তি আছে, তাই শিব শক্তির উপাসনা করিয়া অসীমতত্ত্বে পৌঁছাইতে চাহি। জগতে আরাধনার উপায় স্বরূপ এই ভাবধারা প্রচারের নিমিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল।

কৃপা

শ্রীগৌরেন্দ্রমোহন বসু

'তাঁর কৃপা না হ'লে কি কিছু হয়?' সুন্দর কথাটি উচ্চারিত হচ্ছে মুখে মুখে। অহেতুকী ভক্তির চরমতম নিদর্শন মিলেছে। কিন্তু হৃদয়-কবাট বন্ধ ক'রে বাহির দুয়ার খুলে রেখেছি, কর্তব্য ভুলে অকর্তব্য যা তাই করে চলেছি। কেবল কৃপা না হওয়ার অজুহাতে তামসিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছি দেহেমনে। অন্তরের পিপাসাকে জলিয়ে রেখে আপনাকে জলিয়েছি কতকাল। মাঝে মাঝে মনের কোণে উঁকি দিয়েছে ধর্মীয় শাস্ত্রের বাঁধা বুলি তখন নিশ্চয় হ'য়ে বলেছি 'ওসব তাঁর কৃপা না হ'লে হয় না। বিবেকানন্দের চোখ রামকৃষ্ণই ত' খুলে দিয়েছিলেন, সকল শক্তি অর্পণ করেছিলেন।' কিন্তু অলক্ষ্যে এক অস্বীকৃত বাণী কি মূর্ত হয়ে ওঠেনি? নরেন দত্ত যে নর ছিলেন, মনের হ'স ছিল তাঁর, ভিজে অসাড় কাঠ ছিলেন না তিনি। সবার অলক্ষ্যে ছোটবেলায় বাড়ীর ছাদে বসে মগ্ন হতেন ধ্যানে। হৃদয়দীপকে জ্বালাবার যে সাধনা তা কি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে? অন্তরের অনির্বাপিত অগ্নি কি প্রকাশিত হবে না, ফেটে পড়বে না হৃদয়ে জমা বারুদের মিশ্রণ? কেবল আপনার দুর্বলতাকে চাপা দিয়ে ভাবের ঘরে চুরি করবার প্রবৃত্তি জাগে কেন? কেন আপনাকে ক্ষুদ্র ঘরে বন্ধ রেখে অন্ধ হতে চায় মানুষ?

সহজ সুন্দর কথাটি কি আমাদের অন্তরে পাকা হয়ে ব'সবে না যে 'কৃ' মানে করো আর 'পা' মানে পাবে।' কিছুই না করে কৃপালাভের আশা কি দুরাশা নয়? দ্বারে আঘাত না হানলে যার যার, কেমন করে সে দ্বার উন্মুক্ত হবে। 'Knock the door' আঘাত দাও হৃদয়-দুয়ারে। তবেই ত' ঘুম ভাঙবে হৃদয়াসীন হৃদয়রঞ্জন সন্দেহভঞ্জনের! আপন হৃদয়-অঞ্জন না মুছে দিলে, প্রাণরঞ্জন কেমন করে প্রকাশিত হবেন। পথ চললে তবেই ত' হবে পথ চেনা। ঘরে বসে থাকলে পৃথিবী-চক্রমণ ব্যর্থ হবে না? ব্যর্থ হবে না সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণীর বর্ণাঢ্য দৃশ্যাবলোকন?

আপন ভূমি কর্ষণ না ক'রলে বর্ষণ হলেও যে কিছুই হবে না। আপন হৃদয় ভক্তিরসসিঞ্চিত করলেই নবাঙ্কুরের আবির্ভাব।

সুখ আসে, তখন যে প্রাণ ভরে বলি এ সব তাঁরই কৃপা। আর যখন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দিশাহীন অন্ধ-নিশায় আবির্ভাব হয় তখন তাঁর কৃপা বলে গ্রহণ করতে পারি কৈ? তিনি যে শুধুই 'শান্তম্ শিবম্' নন 'যদ্ভদ্রম্' বটেন এ কথা ভুলি কেন? কেন

আমার ক্ষুদ্র অঞ্জলি পাতা থাকে সুন্দরকে গ্রহণ করতে, অসুন্দরকে নয়? মলয়েই কেবল তোমার আগমন আর ঝড়ের রাতের তড়িৎচিকণে বাদলবর্ষণে তোমার পরশন নেই? ...

ঋতুর মিছিলে নিরন্তর উৎসব হয় তবু আমাদের সময় হয় না এ উৎসবকে আবাহন জানাতে। যখন আমরা উৎসব করি তখনই সার্থক হয় উৎসব। কেমন ভাবেই এ কৃপার বর্ষণ চলেছে অবিরাম। শুধু আমরাই অনুভব করতে পারি না বলে কি এ ধারা বন্ধ হবে? না, তা যে হয় না। আমাদের অভ্যাসেই এ মর্মোদ্ঘাটন প্রয়োজন। তখনই সার্থক হবে তাঁর অকৃপণ কৃপাঞ্জলি।

কৃপা-সাগর রয়েছে অদূরে। কেবল মুক্ত হতে হবে মুক্ত হয়ে। মুক্ত হতে গেলে খাল খনন করতে হবে। হৃদয়ে যে শক্তি অনুস্যূত হয়ে আছে তাকে অবহেলা করবে কেমন করে? সেই শক্তিদানই যে তাঁর কৃপা। তবে সে শক্তির অপব্যবহার করবে কেন অনাদরে? কেন মানব-শরীর ধারণ করে শক্তিকে বক্ষে রেখে প্রচণ্ডতম পুরুষকার নিয়ে এগিয়ে আসবে না? খাল খনন করতে গিয়ে কোদালী নেই বলে বসে পড়বে তুমি? তা খুঁজে নেবার শক্তিও রয়েছে অন্তরে। তুমি শ্রান্ত হলেই যে তাঁর আগমন। হৃদয়ের শক্তি নিঃশেষ হলেই ত' তাঁর কৃপা বরষণ। দ্রৌপদীর সকল বস্ত্রহরণের পরই ত' তাঁর উত্তরীয় উন্মোচন।

চরম পুরুষকারের মাঝেই যে কৃপাময়ীর দৃষ্টিপাত। শ্রান্তের সাধ মিটাতেই যে তিনি বেশ মুছাতে আসেন। সুন্দর দুটি গল্পের অবতারণা করে এ নিবন্ধের ইতি টানলে সার্থকতর হবে কৃপাময়ীর কৃপাদরশন।

পুরাণে আছে,—সমুদ্রের মাঝে ছিল এক মাথা উঁচু করা পাহাড়। ছোট্ট দুটি পাখী তাদের নীড় বেঁধেছিল ঐ পাহাড়ে। একদিন তারা খাদ্যের খোঁজে বাইরে গেছে বহু দূরে। ফিরে এসে দেখে তাদের নীড় ভেসে গেছে সমুদ্রের নীরে। কিন্তু তা'তে যে তাদের চারটি ডিম ছিল! তাও ঢেউএ ভেসে গেছে কোথায়। ভীষণ রাগ হ'লো তাদের। প্রতিজ্ঞা করলো এর প্রতিশোধ তা'রা নেবেই। সংকল্পও নিলে সমুদ্রকে শুষে ফেলার। যা কথা তাই কাজ। ছোট্ট ছোট্ট ঠোঁটে এক বিন্দু করে জল নিয়ে এসে তটের বালির ওপর ফেলে দেয়। প্রতিবেশীরা অনেক ঠাট্টা করলো তাদের। কিন্তু প্রতিজ্ঞা তাদের অটল। দু'দিন, তিনদিন কেটে গেল। শ্রান্ত ক্লান্ত দুর্বল হলো তারা। তবুও কাজ চলেছে তাদের। হঠাৎ একদিন বিষ্ণু গরুড়ে চড়ে যাচ্ছিলেন। দুটি ছোট ছোট পাখীর এ কাজ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। গরুড়কে জানতে পাঠালেন ব্যাপার কি? গরুড় এসে সব জানালে বিষ্ণু বললেন—'আচ্ছা তুমি ওদের গিয়ে সাহায্য করো।' গরুড়ও এসে সাহায্য সুরু করে দিলো। তখন সমুদ্রের দেবী 'রক্ষা করো' বলে এগিয়ে এলেন।

আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এক পা তবেই ত' তিনি দশ পা এগিয়ে আসবেন। আমাদের সঞ্চিত শক্তির সার্থক ব্যবহারই কৃপালাভের পথের পাথেয়।

The New Testament-এ 'The Parable of the Talents'-এ বক্তব্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিদেশে যাবেন এক ভদ্রলোক। যাবার আগে তাঁর তিন ভৃত্যকে ডাকলেন। প্রত্যেকের কার্যানুযায়ী প্রথমকে দশ, দ্বিতীয়কে দুই আর তৃতীয়কে একটি ক'রে মুদ্রা দিয়ে বিদায় নিলেন। ভৃত্যেরা দেশের বাড়ীতেই থাকে। ইতিমধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ভৃত্য তাদের দত্তমুদ্রা ব্যবসায় দ্বিগুণ করে ফেলে। তৃতীয় ভৃত্য সে মুদ্রাটি মাটির তলায় লুকিয়ে রাখলো। তাদের প্রভু একদিন ফিরে এলেন। এসেই প্রত্যেকের কাছে মুদ্রার খোঁজ করলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় ভৃত্য তাদের দেওয়া মুদ্রার দ্বিগুণ দেখাতেই প্রভু আনন্দে আশীর্বাদ জানিয়ে সকল মুদ্রা দান

করলেন তাদের। আর তৃতীয় তৃতোয় সেই মাটিতে লুকিয়ে রাখা অব্যবহার্য মুদ্রা দেখে মুদ্রাটি নিয়ে নিলেন আর তিরস্কৃত করে বহিষ্কৃত করে দিলেন।

তাইতো প্রভুর সাথে মিলনের যোগ্যতা অর্জন করা চাই। পূর্ণের সাথে মিলতে আপনাকে পূর্ণ করা চাই। আপন সেতার না বাঁধা থাকলে কেমন ক'রে মীড়ে মূর্ছনায়, গান্ধারে বৈবতে তাঁর ঝঙ্কারের ঝঙ্কারিত হবে? আমার চক্ষু উন্মীলিত করলেই যে আকাশে বাতাসে, প্রান্তরের শ্যামলিমায়, কলস্বনা নদীতে, চন্দ্রে-সূর্যে পত্রে-পুষ্পে যে রূপায়ণ, তা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

ঈশ্বর

শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত

মানুষের প্রীতিকণ্ঠে চিরদিন শুনি এক সুর,
বিশ্বসৃষ্টি-মূলে আছে—হে ঈশ্বর; তব শুভ নাম।
পৃথিবীর নৃত্যছন্দে তালভঙ্গ হয় না নূপুর
তোমার কৃপায় পূর্ণ মানুষের যত মনস্কাম!
জ্ঞানযোগী, দার্শনিক বলে থাকে, তব করুণায়—
লেশমাত্র পাওয়া যায় সর্বস্ব করিলে অর্পণ;
ভোগাসক্তি তুলসম দূরে রেখে ডাকিলে, তোমার
কল্যাণ আশীষ লভি শান্ত হবে সর্ব প্রাণ-মন।
সৃষ্টির সূচনা হ'তে সেই এক চিরন্তন বাণী—
তোমার কীর্তির কথা দিকে দিকে প্রচারিছে, জানি।
আমি মানুষের কবি, মাঝে মাঝে ভাবি মনে মনে
তোমার সৃষ্টির কথা। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি
অনন্ত ছন্দতালে এই বিশ্ব-রূপ দরশনে;
অনন্ত সৃষ্টির মূলে নাই কোথা একতিল ফাঁকি।
মানুষের পাপে-পুণ্যে দুঃখে-সুখে আর সর্বকাজে
তোমার ইঙ্গিতভরা লিপিকার ইশারাটি পাই;
নয়ন-নেপথ্য হ'তে রুদ্রবীণা এই বলে বাজে:
সম্পূর্ণ মানুষ ক'রে তোরে আমি গড়িতে যে চাই
মানুষ দেবতা নয়—এই সত্য কেন ভুলে যায়!
নিজেরে দেবতা ভেবে ভগবানে ধূলায় নামায়।

ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব এ মানুষ—মনে আমি জানি;
প্রতিবিম্বে কোথা আছে এতটুকু সে প্রাণ-কল্লোল?
তাঁহার চলার ছন্দে স্পন্দন তুলিবে ছায়াখানি,
মিথ্যা, পাপ পুণ্য নামে মানুষের বিচারের বোল।
তিনি বিশ্বপিতা, আর মোরা সব তাঁহার সন্তান,
পিতার কর্তব্যবোধ পুত্র-কাছে হয় না লিখিতে;
আমরা করিতে পারি শুধুই তাঁহার গুণগান,
পাপ পুণ্য নির্বিচারে চরণ-কমলে ফেলে দিতে।
সর্বত্র দেখিতে পাই বিধাতার রামধনু রঙ
জীবনের ঘাটে ঘাটে কান্না-হাসি যমুনা সঙ্গম।

কবিগুরু স্মরণে

শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্তী

উৎসব তখনই সার্থক হয় যখন আমরা দৈনন্দিন জীবনের লাভ ক্ষতি, ফলাফল ও ধারাবাহিকতার বাহিরে আসিয়া দিনটিকে স্বতন্ত্রভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারি। আমরা যদি মনের সমগ্রতা লইয়া এইদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারি, অনুভূতির মধ্যে একটা নব চেতনা আনিতে পারি, তবেই আমাদের উৎসবের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে। যেই মহাকবিকে উপলক্ষ্য করিয়া আজ এই উৎসব-প্রাঙ্গণে আমরা উপনীত হইয়াছি, তাঁহাকে সমগ্রভাবে অনুধ্যান করিতে পারিলেই আমাদের এই উৎসবের মাধুর্য বৃদ্ধি পাইবে। রবীন্দ্র-সাহিত্য যেন আমাদিগকে সত্যের পথে আনন্দের পথে নিতে পারে বিশ্ববিধাতা সেই শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠায় আমাদের অন্তর পূর্ণ করিয়া দিন।

রবীন্দ্র-জীবন বাঙ্গালীর প্রত্যাশিত আয়ুকে অতিক্রম করিয়াছে। তাঁহার দীর্ঘ জীবনে বিবিধ ভাব-সংঘাত আসিয়াছে। যুগ যুগান্তের তরঙ্গাঘাতেও তাঁহার জীবন বিচঞ্চল হইয়াছে। এইজন্য তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য ভাব-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। তিনি এক কালে জাতীয় কবি নামে পরিচিত ছিলেন। সেই স্বদেশী যুগের রবীন্দ্র-সাহিত্য দেশপ্রীতিতে পরিপূর্ণ। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, প্রবন্ধে, নাটক ও কথাসাহিত্যে বিশ্বমানবতার সুরই অধিক অনুরণিত হইয়াছে। এইজন্য তিনি বিশ্বসমাজে বিশ্বকবি নামে আখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যে এই বিবর্তনবাদ বুঝিতে না পারিলে রবীন্দ্র-সাহিত্য দুর্বোধ্য হইয়াই রহিবে। কাজেই রবীন্দ্র-সাহিত্যকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন। বাঙ্গালীকে জাগ্রত করিবার জন্য তিনি কেবল দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, কবিতা ও প্রবন্ধই রচনা করেন নাই, তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে আত্মশক্তির অনুধ্যানও করিয়াছেন। মোহাচ্ছন্ন বিভ্রান্ত জাতির মনে জাতীয় সম্মান ও আত্মমর্যাদা বোধ জাগাইবার জন্য তাঁহার সাহিত্যে বিচিত্র ভাবে সত্য-কঠোর বাণী অনেক প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার কবিতার দুইটি লাইন মোহগ্রস্ত নীতিভ্রষ্ট জাতিকে চিরদিন মনুষ্যত্ব অর্জনে মন্ত্রশক্তির মত কাজ করিবে :—

"অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।"

রবীন্দ্রসাহিত্য কোন বিশেষ যুগের সাহিত্য নহে, কোন সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে সেই সাহিত্য "অচলায়তন" সৃষ্টি করে নাই। কবির জীবন-প্রভাতে যে স্বপ্ন-ভঙ্গ হইয়াছিল তাহা নিরর্থক হয় নাই :—

আমি চালিব করুণা ধারা
আমি ভাঙ্গিব পাষাণ কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের ধারা বিশ্বের সাগর-সঙ্গমে সম্মিলিত হইয়াছে। কবির সঙ্কল্প সার্থক হইয়াছে :—

তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া
নব নব দেশে বারতা লইয়া,
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান।"

এই সঙ্কল্প তাঁহার ব্যক্তিগত হইলেও বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য যে মর্যাদা লাভ করিয়াছে তাহা স্মরণ করিলেও মন আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও যে বাংলা ভাষা অপরিণত ছিল—সর্বপ্রকার ভাব প্রকাশে অক্ষম ছিল, সেই বাংলা-সরস্বতীকে যৌবন রাগে রঞ্জিত করেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ তাহাকে জগৎসভায় মহিমা মণ্ডিত করিয়া উপস্থাপিত করেন। বাঙালী শুধুই গানের রাজা নহে, বাংলার সাহিত্য বিশ্ববিদ্বৎ সমাজে উন্নতশীর্ষ। রবীন্দ্রনাথের এই অবদানে ভারতবাসী বিশেষ করিয়া বাঙালী-জগৎসভায় সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যে একটা বিচিত্রতা ও অভিনবত্ব আনিয়াছেন ইহার ফল ভাগী শুধু আমরাই নহি, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তাহা অনুবাদিত ও সম্প্রসারিত হইয়া বিশ্বজনের সাহিত্যরস-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতেছে। এইজন্য আমাদের গর্ব করিবার কথা বটে, কিন্তু গর্বান্ধতা রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুশীলনে ও নব সৃষ্টির প্রেরণায় অন্তরায় সৃষ্টি করিলে তাহা জাতির দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে। রবীন্দ্র-সাহিত্য চির নূতন। উহার ভাব-ঐশ্বর্য এত অপরিমেয় যে, উহা শুধু গবেষণার বিষয়ীভূতই নয়, তাঁহার বাণী জীবনে প্রতিফলিত করিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হওয়ার অমূল্য পাথেয়। আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে করি না। আজ আমাদের উৎসবকে প্রাণবন্ত করিতে যাঁহারা অগ্রবর্তী—যাঁহাদের কলকণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিয়াছে উৎসবের মর্মবাণী, সেই শিশু-কিশোর-তরুণদিগকে কবিগুরু কিরূপ অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন—শিক্ষণের মাধুর্যে মনুষ্যত্ব অর্জনে কিরূপ আগাইয়া নিতেন তাহা শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠায়ই পর্যাপ্ত হয় নাই। তিনি শিশু ও তরুণদিগকে গল্পে কবিতায় ও শিক্ষণ-ব্যবস্থার নূতনত্বে ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনগঠনে কিরূপ আত্ম-সমাহিত ছিলেন তাহাও আজ স্মরণ করা প্রয়োজন। তাঁহার রচিত কাব্য "শিশু" ও "শিশু ভোলানাথ" মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের নিদর্শন। শিশু-চরিত্রকে এমন নিপুণতার সহিত পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন আর কে? এক রত্তি মেয়ে বাংলা রাণীর হাসির ফোয়ারা কিরূপে বিচ্ছুরিত হইয়াছে তাহার ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়া তাহা কয়েকটী লাইনেই জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে :—

"হাতটী তুলে চুড়ি ঘুরাছি
দেখায় যাকে তাকে
হাসির সঙ্গে নেচে নেচে
দোলক দোলে নাকে।
রাঙা দু'টি ঠোঁটের কাছে
মুক্তো আছে ফলে,
মায়ের চুমোখানি যেন
মুক্তো হয়ে দোলে।"

মাতৃহারা শিশুর মাতৃস্মৃতি প্রতিফলনের ক্ষেত্র কিরূপ স্বাভাবিক ও মর্মস্পর্শী :—

"মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু কখন খেলতে গিয়ে হঠাৎ অকারণে
একটা কী সুর গুণগুনিয়ে কানে আমার বাজে,
মায়ের কথা মিলায় যেন আমার খেলার মাঝে।
মা বুঝি গান গাইত, আমার দোলনা ঠেলে ঠেলে,
মা গিয়াছে, যেতে যেতে গানটী গেছে ফেলে।"

রবীন্দ্রনাথ তরুণদিগের উপর অনেক আশা পোষণ করিতেন। নূতন সমাজ ও সাহিত্য-সৃষ্টিতে তাহাদের যৌবন-শক্তির উপর তাঁহার বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিল অপরিসীম। প্রবীনের ধর্ম স্থিতি-শীলতা, আর যৌবনের ধর্ম গতিশীলতা ও সৃষ্টি-মুখীনতা। এইজন্য তারুণ্যের কবি তরুণকে উদ্দেশ করিয়া উদাত্ত স্বরে আহ্বান করিয়াছেন :—

"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
• • •
চির যুবা তুই যে চিরজীবী
জীর্ণরা যা ঝরিয়ে দিবে
প্রাণ অনুরাগ ছড়িয়ে দেবার দিবি।

যৌবনোদ্দীপিত জীবনের কর্তব্য কঠোরতা স্মরণ করাইয়া দিয়া কবি বলিয়াছেন :

"খড়্গ সম তোমার দীপ্তি শিখা
ছিন্ন করুক জরার কুজ্ঝটিকা,
জীর্ণতারি বক্ষ চুঁফাঁক করে
অমর পুষ্প তব
আলোক পানে লোকে লোকান্তরে
ফুটুক নিত্য নব।"

তরুণের জয়যাত্রার পথ যে দুর্গম, দুস্তর, ঘরের বাধা বিপত্তিও তাহার অপরিসীম, কবি তাহা মুক্ত কণ্ঠেই বলিয়াছেন :

"ঘরের মঙ্গল-শঙ্খ নহে তোর তরে
নহে যে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কাল-বৈশাখীর আশীর্বাদ,
শ্রাবণ-রাত্রির বজ্রনাদ
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে ভগ্নসর্প গুঢ়ফণা।
নিন্দা দিবে জয়-শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।"

রবীন্দ্রনাথ এই যৌবনমর্বিত জীবনই চাহিয়াছেন। অল্পে তুষ্ট, আয়েসী, মেরুদণ্ডহীন তরুণকে তিনি আহ্বান করেন নাই। সাধনার উগ্রতা, আদর্শ জীবন-যাপনের তীব্রতা যে তারুণ্যকে উন্মুখ করে না—সেই তারুণ্য কবির নিকট ছিল উপেক্ষণীয়। এইজন্য নববর্ষেও মনুষ্যত্ব-ব্যঞ্জক জীবনমন্ত্রেই জীবন-দেবতার সমীপে আত্মনিবেদন করিয়াছেন :

"দাও আমাদের অভয় মন্ত্র,
অশোক মন্ত্র তব।
দাও আমাদের অমৃত মন্ত্র
দাও গো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যু-তরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব।"

রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে প্রসঙ্গক্রমে আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন—"আমি কি শুধুই কবি?" ইহার উত্তরে তখন আমরা বলিয়াছিলাম—"বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের স্রষ্টাকে শুধু কবি বলিব কেন?" রবীন্দ্র-চরিত্রে জ্ঞান ও কর্মের এক অপূর্ব প্রকাশ—কবি ও কর্মীর মিলন-নিকেতন। স্বদেশী আন্দোলনে তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক, কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। পরে তিনি বিশ্বান্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইলেও দেশের অপমাননা ও রাজশক্তির অন্যায়-অত্যাচার কখনও তিনি উপেক্ষা করেন নাই। সেই জালিয়ান-ওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইতে স্বাধীনতার আন্দোলনে বৃটিশ আমলাতন্ত্রের ঔদ্ধত্য ও হৃদয়-হীনতার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। আজ রবীন্দ্রনাথের "সোনার বাংলা" বৃটিশ-কবলমুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু বাংলার সমস্যা জটিলতর হইয়াছে। দেশ-বিভাগ-উদ্ভূত বিবিধ সমস্যা বাংলাকে চরম দুর্দশায় উপনীত করিয়াছে। অব্যবস্থা, অপ্রাচুর্য, বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব দেশের সৃষ্টিপ্রবাহকে করিয়াছে ব্যাহত। বাঙালীর প্রতিভা যেন নিষ্প্রভ। চিন্তাশক্তির মধ্যেও আসিয়াছে জড়তা। প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে বাঙালী যেন ক্রমেই পশ্চাদপসরণেই কৃতিত্ব দেখাইতেছে। যুবক বাংলার সাধনা-মন্দির যেন পেলাঘরে পরিণত হইয়াছে। জাতির এই দুর্গতির দিনে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিবার দিন। আশাহত দিক্‌ভ্রান্ত বাঙালীর মনে জাগিয়া উঠুক নূতন উদ্দীপনা, তরুণের মনে ধ্বনিয়া উঠুক সমাজ-সাহিত্য-সৃষ্টির নব ছন্দ। নৈতিক

অধঃপতনের ভস্মস্তূপে গড়িয়া উঠুক চারিত্রিক দৃঢ়তার সৌধ। রামমোহন হইতে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ মহামনীষী, মহাপুরুষ, মহানুভবদের মাতৃভূমি এই বাংলা—জাতীয়তার পুণ্যপীঠ এই বাংলা—ইহার দুর্গতির মেঘ একদিন অপসৃত হইবেই। রবীন্দ্রনাথের সেই আশ্বাসবাণীই নৈরাশ্যের অন্ধকারে দীপশিখা হইয়া জ্বলিয়া উঠুক :

"নিশিদিন ভরসা রাখিস্
ওরে মন হবেই হবে"
যদি রে পণ করে থাকিস্
সে পণ তোমার রবেই রবে।
ওরে মন হবেই হবে।*

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী

শান্তশীল দাশ

('সৎ কর্মের ভানও ভাল')

অসাধু ধীবর রাতের অন্ধকারে
মৎস্যের লোভে এল বাবুদের বাগানের একধারে।
পুকুরের মাঝে জাল ছুঁড়ে দিল তার ;
শব্দ শুনেই যে ছিল যেখানে ছুটে এল, চারিধার
ঘিরে ফেলে দিল ; ভস্কর নিরুপায়—
তাড়াতাড়ি কিছু ছাই খুঁজে নিয়ে
মেখে নিল সারা গায়।

তারপর সাধুবেশে
বাগানের পাশে প্রকাণ্ড এক বৃক্ষের তলে এসে
ধ্যানে নিমগ্ন—এই ভান করে' রইল মৌন হয়ে।
খুঁজে চারিধার এধার ওধার, দেখে তারে বিস্ময়ে
লোকজন সব চরণে তাহার লুটাল ভক্তিভরে,
খুশি হ'ল ভারি সাধুরে প্রণাম করে।

সাধু মহারাজ এসেছে বাগানে—রটে গেল ধীরে ধীরে ;
আশিস্-প্রার্থী দলে দলে এল ঘিরি সে সন্ন্যাসীরে।
সাধু-সেবা লাগি আহার্য কত শত
নিত্য সেথায় জড়ো হতে থাকে, পরিচর্যায় রত
ভক্তেরা সব। ভস্কর ভাবে : সাধু নই, শুধু ছাই
মেখেছি অংগে, তবু অকাতরে এত সম্পদ পাই।
সত্যই যদি সাধু হতে পারি, তবে নিশ্চয় আমি
দেখা পাব তাঁর, যিনি বিশ্বের স্বামী।

এক নিমেষেই যা ছিল সকল ফেলে
চলে গেল অবহেলে।
সাধুবেশী ভস্কর
সত্য সাধুতে রূপান্তরিত হ'ল সে অতঃপর।

---

* রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ কিশোর সংঘ কর্তৃক উদ্যাপিত রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে সভাপতির ভাষণ।

লোকশিক্ষক পল্লীপটুয়া

অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী এম. এ.

বর্তমানকালে আমরা শিক্ষা বলিতে যে অর্থকরী আক্ষরিক বিদ্যাকে বুঝি তাহারই আলোকে ভারতের অগণিত জনগণকে অশিক্ষিত বলিয়া থাকি, কিন্তু ইহা যে আমাদের মধ্যে অলক্ষ্য পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল তাহা বুঝিতে পারি না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শের দিকে একটু দৃষ্টি দিলেই আমাদের এরূপ ধারণা যে কতখানি ভ্রান্তিমূলক তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পাশ্চাত্য দেশে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাজনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ।"

সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতের জীবন অধ্যাত্ম আলোকের অপরিসীম ঔজ্জ্বল্যে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও ভোগসুখহীন জীবনযাত্রাকে সে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছে, কারণ অধ্যাত্ম সাধনাই তাহার ধ্রুব লক্ষ্য, তাহার ব্রত। তাহার শিক্ষা, দীক্ষা, ধ্যান, ধারণা, কর্ম, মর্ম সব কিছুই সেই এক উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইয়াছে। ভারতের শিক্ষা তাহার বিরাট জীবনের অংশ মাত্র। আক্ষরিক শিক্ষার দ্বারা ভোগ অর্জন—তাহার কাছে তুলবৎ তুচ্ছ। এইজন্য ভারতে আক্ষরিক জ্ঞানে অজ্ঞ মানুষও মহামানব হইয়াছে। অধ্যাত্মশিক্ষাকে জীবনের পাথেয় রূপে গ্রহণ করিয়া ভারতের শিক্ষাকে 'Good of man and glory of God'-এর মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছে, পুঁথিগত আক্ষরিক বিদ্যা এবং অন্তরগত অধ্যাত্মবিদ্যা এক হইয়া গিয়াছে। তাই পূর্বে শিশুদের প্রথম পাঠেই গঙ্গার মাহাত্ম্য এবং দাতাকর্ণের মহত্ত্ব শেখানো হইত, বর্তমানে ইহার পরিবর্তে বাষ্পীয় পোতের জন্মকাহিনী শেখানো হয়। আধুনিক বলিবেন ইহা প্রগতির লক্ষণ। কিন্তু সব কিছুকে সতর্ক দৃষ্টিতে দেখা উচিত। যে প্রগতি বাষ্টির, যে প্রগতি ভোগের তাহা গ্রহণযোগ্য, না যে প্রগতি শান্ত শিব ও সুন্দরের বিকাশ ঘটায় তাহা গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে সম্যক চিন্তার প্রয়োজন। ভারতের এই অধ্যাত্ম বিদ্যা, 'যে মঙ্গল চহে,' 'যে তুলা পৌঁজে, যে কাটনা কাটে,যে ভাত না পায় সেও শিক্ষিত—শিক্ষিত যে, ধর্ম নিত্য, ধর্ম বৈর, আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, পরের জন্য জীবন ; ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছেন, পাপ পুণ্য আছে, পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার আছে, জন্ম আপনার জন্য নহে—পরের জন্য ; অহিংসা পরমার্থ, লোকহিত পরম কার্য্য।' এইরূপ ভারতবাসীকে লক্ষ্য করিয়া পাদ্রী লিঁফয় বলিয়াছিলেন : "The most illiterate Hindu peasant will engage in discussion in the deepest philosophical and ethical questions" এই কারণে পুঁথিগত বিদ্যার পণ্ডিতকে ভারতবাসী বলিয়াছে 'পণ্ডিত ও মশালচি, ইনকি গত্ কহা না যায়। পরকে দিয়া দেখায়কে, আপ্ আঁধারে যায়।'

বেদপুরাণের জটিল ক্রিয়ানুষ্ঠানকে বাদ দিয়া জনসাধারণ এমন এক লোকায়ত ধর্ম ও শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিল যাহা তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে রূপায়িত হইয়াছিল। চারিত্রিক ও মানসিক উন্নতির আদর্শকে তাহাদের দেবদেবীর সৃষ্টিও করিয়া লইয়াছিল এবং এই সমস্ত দেবদেবীর নিকটেই তাহারা মনের নিভৃততম কামনাটিকে নিবেদন করিয়াছে তাহাদের নিজস্ব রীতিতে। তাহাদের গ্রামদেবতার পূজার জন্য, তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য নিজেরাই কথার পর কথার মালা গাঁথিয়া গান গাহিয়াছে, নিজেদের দেহযন্ত্রকে অপরূপ মুক্তন্দে উৎসর্গ করিয়াছে, আবার আঙ্গিনায় আলিপনা আঁকিয়া দেবতার আহ্বান

করিয়াছে। এইভাবে তাহারা ভারতীয় সংস্কৃতির যে মর্মরূপ প্রকাশ করিয়াছে তাহা পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী ব্যক্তির নিকট অজ্ঞাত বলিয়া বহু ক্ষেত্রে কুসংস্কার রূপে উপহসিত হইয়াছে। ভারতে রাজার পর রাজার পরিবর্তন হইয়াছে, রাজ্যের পর রাজ্যের উত্থান ও পতন হইয়াছে কিন্তু পল্লীতে তাহার কোন প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যাইত না, তাহাদের চিরাচরিত প্রথা-অনুসারে ক্রিয়াকলাপগুলি শত দুঃখ দারিদ্র্যের মাঝে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় প্রবাহিত হইত এবং শতবর্ষের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে চতুর্দিক আলোকিত হইত। পল্লীর কথক, পল্লীর শিল্পী, পল্লীর ভাস্কর, পল্লীর পণ্ডিত নীরবে এই সাধনায় যোগ দিয়াছেন। কখনও বেদ পুরাণের ব্যাখ্যা করিয়া, কখনও লক্ষ্মীর সরায়, গৃহের দেওয়ালে বা মন্দিরগাত্রে রেখাচিত্র আঁকিয়া, পোড়ামাটিতে অথবা পাথরে মূর্তি উৎকীর্ণ করিয়া ভারতের পথে প্রান্তরে, ধূলিরেণুতে শত শত ধীতপাল ধীমান কলালক্ষ্মীর অনির্বাণ দীপশিখা জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা ঘরে ঘরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তক্ষশিলা নালান্দার সৃষ্টি করিয়াছেন। ভারতীয় সাধনা এইভাবে একমুখী আদর্শ লইয়া একনায়কত্বহীন হইয়া বহু ধারায় যুগ-যুগান্ত হইতে বহিয়া চলিয়াছে।

এই নীরব সাধকদিগের মধ্যে ভারতের যাযাবরী বা পটিদারদিগের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা যেন কথকঠাকুর এবং চিত্রশিল্পীর সংমিশ্রণ। নিজেরা নিজেদের ক্ষমতা অনুসারে ছবি আঁকে, গ্রামীন পরিবেশ হইতে ছবির উপকরণ সংগ্রহ করে এবং পাঁচ উজ্জ্বল রংএ ছবিগুলিকে পুরাণ হইতে কাহিনী লইয়া মূলকে অবিকৃত রাখিয়া গ্রামের মানুষগুলির মনোমত করিয়া প্রকাশ করে। কখনও স্থানীয় জনপ্রিয় কবির কাহিনীকে নিজের প্রয়োজনমত ছাঁটিয়া কাটিয়া উপযুক্ত করিয়া লয়। তবে রামায়ণ ও মহাভারত যাহা ভারতবর্ষের মনোজগতকে সুপ্রাচীন কাল হইতে উর্বর করিয়া রাখিয়াছে, অধিকাংশ কাহিনী তাহাদের মধ্য হইতে রূপ লাভ করিয়াছে, তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে লৌকিক ও বৈষ্ণব কাব্যের ধারা। পটুয়ার গানে এক এক স্থানে লৌকিক কাব্যের যে অতি সরল ও সংক্ষিপ্ত রূপ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বৈষ্ণব পদাবলীর স্বতঃস্ফূর্ত উজ্জ্বলতা না থাকিলেও পটুয়ার গানে মনসা মঙ্গল প্রভৃতি লৌকিক কাব্যের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবধারা গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের মত এমন অবলীলাক্রমে মিশিয়া গিয়াছে যাহা বিচ্ছিন্ন করা দুষ্কর। শঙ্করাচার্যের "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ"-এর সহিত বাঙালী পটুয়ার ছড়া সাধারণ মানুষের উপযোগী হইয়া প্রকাশ হইয়াছে :

'কেবা পুত্র কেবা পিতা কেবা কার মা।
মায়ায় পড়িলে মাগো সকল মনে হয়।
কেহ কারও পুত্র নয় মা পথের পরিচয়।'

মানুষের মাঝে যে কবি শিল্পী সর্বদাই সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং সুযোগ পাইলেই সে বাহিরে আত্মপ্রকাশ করে তাহার-ই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বাংলার পটুয়াগণ। একদিকে তাহারা কবি শিল্পী অন্যদিকে তাহারা ভক্ত-সাধক। জাতির অন্তরাত্মার যে বাণী, অধ্যাত্ম জীবনের যে মন্ত্র চিরকাল ধরিয়া স্মৃতিতে, শ্রুতিতে রহিয়াছে তাহাকেই পটুয়ারা চিত্রে এবং গানে একত্র প্রকাশ করে। চিত্রের ভাষা সার্বজনীন, সর্বস্তরের মানুষ অনায়াসে ঘটনা উপলব্ধি করে, সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আদর্শের দৃঢ় ভিত্তি জাতির অন্তরে সামাজের মধ্যে অনায়াস হইয়া প্রথিত হয়; ক্ষুদ্র ছবির মাধ্যমে 'ক্ষুদা' মানুষের নিকট আসে। জীবনান্তের পর দেহটা ছাই হইয়া কোথায় মিশিয়া যাইবে তাহার ঠিক নাই, তাই পরজীবনের চিন্তায় ইহজীবনকে দৈনন্দিন কার্যকলাপের মধ্যে পবিত্রতর করিয়া তুলে। খাদ্য সংগ্রহ না করিলে বাঁচিতে পারা যায় না তাই পটুয়ারা অন্নরাদর্শকে জীবন যুদ্ধের হাতিয়ার স্বরূপে গ্রহণ করিয়া নিজেকে এবং নিজের পরিবেশ ও পরিচিতের বিশুষ্ক মনোজগতকে বাঁচাইবার

চেষ্টা করে। তাই মনে হয় গ্রামের বুভুক্ষিত মানুষের প্রতিনিধি স্বরূপ পল্লীর বুভুক্ষিত পটিদারগুলি যেন এক অসাধারণ প্রতিভাবান পুরুষ, কারণ তাহারা নিছক আদর্শে না হইলেও জীবনের রূঢ় তাগিদে যাহা প্রচার করে তাহা আধুনিক সংজ্ঞায় শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের শিক্ষা না হইলেও জনসাধারণের নিকট অমূল্য।

নিম্নে পটিদারদিগের গীত 'নরমেধ যজ্ঞ' পালা সংক্ষিপ্ত আকারে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

নরমেধ যজ্ঞ পালা

শ্রীরাম কহেন শুন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
কহ মুনি পুণ্যকথা করিব শ্রবণ।
সগর সংগ্রাম কীর্ত্তি গঙ্গা ভগীরথ।
এই দুই পুণ্যকথা শুন রঘুনাথ।
এই দুই পুণ্যকথা শুনিতে তরাস।
তোমার বাপের কীর্ত্তি শ্রীরাম তোমার বনবাস।
শুনিয়া কাঁদেন রাম লোটায় ধরণী।
যযাতির যজ্ঞ কথা কহ দেখি শুনি।

যযাতির যজ্ঞ কথা নহুষ রাজন।
যযাতি নামেতে পুত্র হৈল তখন।
মহা গুণবান্ পুত্র তপেতে তৎপর।
পরম পণ্ডিত পুত্র যুদ্ধে ধনুর্দ্ধর।
যোগ্য পুত্রে দেখি রাজা রাজ্যভার দিল।
নহুষ বলেন আমি জীব কতকাল।
একদিনের মত বাপ কল্পতরু হব।
এই কথা শুনিয়া যত পাত্র মন্ত্রী কয়।
কল্পতরু হতে রাজা তব সাধ্য নয়।
দ্বিজ যদি রাজ্য চায় তাহা আমি দিব।
ব্রাহ্মণে সবস্ব দিয়া ভিক্ষা মেগে লব।

শুভলগ্ন করিয়া নহুষ পুণ্যবান্।
অকাতরে দিচ্ছে যত ব্রাহ্মণেরে দান।
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণ অন্তরে জানিয়া।
নহুষ নিকটে গেল দ্বিজরূপী হৈয়া।
প্রণাম করিয়া রাজা ব্রাহ্মণে জিজ্ঞাসে।
কিবা নাম তোমার প্রভু! বাড়ী কোন্ দেশে।
কহেন কৃষ্ণ কুতূহলে বাড়ী মধুপুর।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ নাম শ্রীহরি ঠাকুর।
আর যে জিজ্ঞাসে রাজা আর সমাচার।
তোমার বাটীতে রাজা কতই পরিবার।
সপ্ত মত পাতালে আমার অধিকার।
একলা জগাই আমি সংসারের আহার।
আমার নাম করে যেবা জলে ডুবে থাকে।
সর্ব্বত্যাগ করে পাওয়া দিতে হয় তাকে।

নহুষের ভাগ্যে দেখা দিয়েছেন গোঁসাই।
অত পরিচয়ে রাজা চিনে পারে নাই।
সন্ধ্যা হল গঙ্গাজল নারি পরশিতে।
আজ থাক কাল বিদাই করিব প্রভাতে।
ভুলিয়ে নহুষ রাজা করিলেন দান।
নয় ষষ্টি বলে দান নিলেন ভগবান।
দান দিয়া মহারাজা বসাল ভূপতি।
দক্ষিণে নিমিত্ত গেল যেখানে যযাতি।
যযাতি বলেন পিতা কিবা দিলে তুমি।
রাজা বলে যারে দিলাম এক হস্ত ভূমি।
যেইখানেতে ভূমি দান লয়েছে ব্রাহ্মণ।
সেইখানেতে বসে করে হস্ত সম্মার্জন।

বাহুপাশ দিয়ে রাজা চড়ে স্বর্গরথে।
হেনকালে যমদূত ধরে রাজার হাতে।
বিষ্ণুদূত বলে শুন যমদূত ভাই।
নহুষ রাজন ধার্ম্মিক পাপ জানে নাই।
বিষ্ণুদূত বলে তবে পড়েছে বিপাকে।
কিসের পাপে মুক্ত হবে যাবে স্বর্গবাসে।
যমদূত বলে যদি আর পুত্র থাকে ঘরে।
নরমেধ যজ্ঞ যদি পারে করিবারে।
উড়িতে উড়িতে রথ করিল গমন।
শূন্যমার্গে যযাতিরে দেখায় স্বপন।

স্বপন দেখে যযাতি করে নমস্কার।
ইঙ্গিতে করিব কার্য্য কি আজ্ঞা তোমার॥

সাশ্রুনয়নে দ্বিজবর দেখিতে দেখিতে,
নরমেধ যজ্ঞ লেখেন প্রথম পত্রেতে।
আশ্বলক্ষ মুনিরে করিবে সম্ভাষণ।
সোনার বস্ত্রশালা বাঁধিবেন বহুলিপ যোজন॥
স্বর্ণবালা স্বর্ণবটি আশ্বলক্ষ রাশি।
প্রত্যেকে প্রত্যেকে দিব মাণিক অঙ্গুরী।
পর্ব্বত সমান চাল চাই রাশি রাশি।
আশ্বলক্ষ চাই পূর্ণ ঘৃতের কলসী॥
ত্রিনলক্ষ যজ্ঞ হবে বেদ মহাধ্বনি।
প্রত্যহ খাবাতে হবে ষাটি হাজার মুনি॥
এ সকল রাজা তুমি পার করিবারে।
যজ্ঞের আহুতির কথা মুখে না বেরারে॥
অষ্টম বছরের শিশু আনিবে তুরিতে।
ধন পেয়ে মা বাপ বেচিবে হরষিতে॥
অন্য জাতি হবে না সে ব্রাহ্মণের ছেলে।
অগ্নিকুণ্ডে পড়িবেন রাধাকৃষ্ণ বলে॥

আর উড়িতে উড়িতে রথ করিল গমন।
আর বঙ্গদেশে গিয়া রথ দিল দরশন॥
শঙ্খধ্বনি বাজনা শুনে এলো মুনিগণ।
কথাকরার রাজা এত পাঠাইছে ধন॥
মুনিরা বলেন ধন দাহ জনে জনে।
শ্রীমন্ত বলেন এই ধন পাবে একজনে॥
অষ্টম বৎসরের শিশু যে দিবে আমারে।
ধন কড়ি অর্থ তার দিয়ে যাব তারে॥
তার মধ্যে একজন মুনি বুদ্ধে বড়তেজা।
কহ বাপু ছেলে লইবে কি করিবে রাজা॥
মুনিদের কাছে শ্রীমন্ত মিথ্যা না বলিল।
যজ্ঞের আহুতির কথা সব শুনাইল॥
বিষ্ণু বিষ্ণু করে তখন কর্ণে দিল হাত।
কেউ বলে রক্ষা কর দেব জগন্নাথ॥

কেউ বলে রথ ভেঙে দূর করে দাহ।
কেউ বলে ধন কড়ি সকল লুটে লাহ॥

ভয় পেয়ে রথ উঠে গগন উপরে,
গ্রামের বাঁহিরে এক পল্লবের কুঁড়ে।
বাতাসে দক্ষিণ কোণে চাল গেছে উড়ে॥
গাল দিয়া মুনি যত করিল গমন।
সেইখানে ছিল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥
বিদ্যাহীন অকুলীন কাঙাল দেখিয়া।
মুনিরা রেখেছে নাম সিদ্ধান্ত বলিয়া॥
ডেকে বলে দুঃখে কেন মরহ ব্রাহ্মণ।
পুত্র বিকে দাও না গিয়ে যযাতির ধন॥
কটি পুত্র বলে তারে জিজ্ঞাসে শ্রীমন্ত॥
দিলাম ধন বল তার বয়স কর্ম্ম কত॥

জ্যেষ্ঠ সে অর্জ্জুন রে মধ্যম দনাদ্দন।
অষ্টম বছরের শিশু কনিষ্ঠ নন্দন॥
আহ্লাদে রেখেছি নাম কুশধ্বজ বলে।
এত শুনি শ্রীমন্ত ভাসেন অশ্রুজলে॥
কুড়া ঘরে পূর্ণিত করিল যত ধন।
শ্রীমন্ত বলেন ডাক তোমার নন্দন॥
কোথায় বাছা কুশধ্বজরে ডাকে উচ্চরায়।
বেইরা বেই ধরে শিশু পিতার গলায়॥
বিদায় আকুল তনু কাঁদিতে কাঁদিতে।
পিতার নিকটে বলে কি এনেছ খেতে॥

ধনমত্ত হয়ে বাপুরে ছেলের প্রতি কয়।
ধন পেয়ে বাছা তোরে করেছি বিক্রয়॥
ভিক্ষা না মিলেরে বাপ বড়ই কষ্ট পাই।
কৃপা করে যদি যাও তবে ধন খাই॥
এই কথা বলিয়া সিদ্ধান্ত কাঁদিতে কাঁদিতে।
কুশধ্বজকে তুলে দিল শ্রীমন্তের হাতে॥

শ্রীমন্ত ধরিয়ে তার চরণ যুগলে।
কিবা খেতে সাধ যায় কুশধ্বজকে বলে॥

কুশধ্বজ বলে আমি তিন দিন উপবাসী।
আনন্দে করেছি আমি ব্রত একাদশী॥
তুমি আমারে আজি তবে যাবে গো বৈমা।
কিঞ্চিৎ আজ্ঞা কর মায়ের কাছে আসি,বিদাই বৈমা॥
দশমাস দশদিন আমায় রেখেছে উদরে।
বলে কয়ে আসি মাকে কেঁদে পাছে মরে॥
মাতা মাতা বলে তাকে কুঁড়ের দুয়ারে।
ভদ্রাবতী গিয়াছেন ভিক্ষা মাগিবারে॥
ভদ্রাবতী বলে বাপু কারে তোরে দিব।
তোরে সঙ্গে করে আমি ভিক্ষা মেগে খাব॥
কদাচ নগরে যখন ভিক্ষা নাই মিলে।
তোমারে বান্ধিয়া গলে ঝাঁপ দিব জলে॥
শিশু বলে মা তুমি গো সুখেতে রহিবে।
আর দুই পুত্র দেখে আমার পাসরিবে॥
পিতা যদি বিকিল মা আপন ছাওয়াল।
এতদিনে ফুরাল মোর খাবার জঞ্জাল॥
এত শুনি ভদ্রাবতী হৈল মূর্চ্ছা গতি।
হাতে ধরে তুলে নিল শ্রীমন্ত সারথি॥

উড়িতে উড়িতে রথ করিল গমন।
অযোধ্যাতে গিয়া রথ দিল দরশন॥
ত্বরিত চালে মুনিরা সব আশ্রমপক্ষ গড়ে।
অযোধ্যার যত নারী কুশধ্বজকে দেখে॥
কেউ বলে ওগো দিদি এনেছে চুরি করে।
কেউ বলে অল্পদিনে জননী গেছে ঘরে॥
কেউ বলে এর মাতা পিতা আছে ঘরে।
কাহনের দাগ আছে কেঁদেছে গলায় ঘরে॥

মুনিরা বলেন গোল কর কি লাগিয়া।
আহুতির সময় বয় আন চান করাইয়া॥
চান করাইয়া শিশুকে আনিল তখন।
পরিবারে বাচে রাজা পাটের বসন॥
শিশু বলেন পাট বসন রাখগো ভাণ্ডারে।
পুড়িয়া মরিতে যাই কৌপীন দাহ মোরে॥
মিনতি করিয়া বলে ধরে দূতের হাতে।
দণ্ড দুই রাখ একবার ডাকি রমানাথে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে শিশু ছুটে দিল ঝাঁপ।
লক্ষ্মীনারায়ণ এসে ধরিলেন হাত॥
অভিমানে বলছে শিশু কে তুমি ধরিলে।
পুড়িয়া মরিতে চাই ছেড়ে দাও মোরে॥
কৃষ্ণ বলেন বারে বাছা ডেকেছিলে তুমি।
চিনিতে না পার সেই বৈকুণ্ঠনাথ আমি॥
শিশু বলে দেখাও তবে লক্ষ্মীনারায়ণ।
অগ্নির মাঝে চতুর্ভুজ দেখান তখন॥
পড়িয়ে প্রভুর মূর্ত্তি পড়ে পদতলে।
ভক্তাধীন কৃষ্ণ তবে ভক্ত রাখিবারে॥
ডেকে বলে শুন তবে দেব গদাধর।
পুনর্ব্বার রেখে এস শিশুকে মায়ের গোচর॥
পুনর্ব্বার ধনকড়ি লইয়ে বিশেষ।
শিশুকে লইয়ে যায় সেই বঙ্গদেশ॥

শিশু যেয়ে ধরে তার পিতার চরণে।
না চায় জননী তখন না চায় নয়নে॥
শিশু বলেন বলে গেলাম অযোধ্যা নগর।
অগ্নিকুণ্ডে রক্ষা হৈল দেব গদাধর॥
ভদ্রাবতী বলে দেখি তোর লক্ষ্মীনারায়ণ।
তবে ত প্রত্যয় বাছা যাবে আমার মন॥
শিশু তখন কেঁদে বলে করে উচ্চধ্বনী।
তুমি না এলে প্রভু না লয় জননী॥
ভক্তাধীন হরি তখন ভক্ত রাখিবারে।
উপনীত হোল গিয়ে ভদ্রার গোচরে॥
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম বনমালাধারী।
কটিতে কিঙ্কিনী সাজে বিনন্দ-বিহারী॥
হেরিয়ে প্রভুর মূর্ত্তি পড়ে পদতলে।
দরশন দিয়ে কৃষ্ণ করিলেন কোলে॥
এই প্রভু তবে আর সভায় দিবে বর।
সবাকার মনোবাঞ্ছা প্রভু দিবেন বর॥

ভারতের তীর্থদর্শনে

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৪

অযোধ্যা : এলাহাবাদ থেকে যে রাস্তাতে চিত্রকূটে এসেছিলাম, সেই রাস্তাতেই আবার এলাহাবাদে ফিরতে হ'ল। চিত্রকূট থেকে অযোধ্যায় যাওয়ার অন্য কোন রাস্তা নেই, এলাহাবাদ থেকেই যেতে হয়। করোয়ী ও এলাহাবাদ থেকে অনেক সহযাত্রী আমাদের তীর্থযাত্রা-গাড়ীতে উঠল।

তারপর যাত্রীদের "দশকনৌজহীরতেরহ-চুলা"—আপন আপন রান্নার ব্যবস্থা হোল। তারা নিজেদের জাত ছাড়া অন্য কারোর হাতের রান্না খাবে না—জল পর্যন্ত নয়। এইসব ছোঁয়া-ছুঁতের উপদ্রব দেখে অবাক হ'তে হয়। পূর্বে নাকি, এক সম্প্রদায়ের মন্দিরের পিণ্ডারা অন্য সম্প্রদায়ের দেবতার অন্নভোগ প্রসাদ পর্যন্ত গ্রহণ করতনা। দাক্ষিণাত্যে অন্নভোগ প্রসাদ আগন্তুক যাত্রীদের মধ্যে বিলি করার রীতি আছে। সেই প্রসাদ তারা হাতে নিয়ে মন্দিরের বাইরে এসে অন্য কা'কেও দিয়ে দিত। ছোঁয়া-ছুঁতের এত বিচারের জন্য সব জাতের তীর্থযাত্রীদের একত্র রান্না করার ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব। যাত্রীদের সকলেরই সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন ছিল, কেবলমাত্র আমিই একেলা। কাজেই প্রত্যেক তীর্থস্থানেই কোনও মন্দিরের প্রসাদ বা কোনও হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা আমাকে করতে হয়েছিল।

হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী ভারতে অযোধ্যা, মথুরা, মায়াপুরী (হরিদ্বার), কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা (উজ্জয়িনী) ও দ্বারিকাপুরী—এই সাতটি মোক্ষদায়িনী পুরী। অযোধ্যাকে তীর্থরূপী শরীরের মস্তক ব'লে গণ্য করা হয়। এই সাতপুরীর মধ্যে কতকগুলি বিষ্ণুপুরী ও কতকগুলি শিবপুরী। অযোধ্যা হোল বিষ্ণুপুরী। মোক্ষদায়িনী সাতপুরীর প্রধানা ও যুগাবতার শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি এই অযোধ্যাপুরী উত্তর ভারতের প্রধান তীর্থস্থানগুলির মধ্যে অন্যতম। বহু প্রাচীনকাল থেকেই এই নগরী পবিত্র তীর্থস্থান ব'লে গণ্য হয়ে আসছে। মহর্ষি বাল্মিকী-রামায়ণে বর্ণনা আছে "মনুনা মানবেন্দ্রেণ সা পুরী নির্মিতা স্বয়ম্।" মনু এই পুরী প্রথম নির্মাণ করেন ও ব্রহ্মা এখানে প্রথম তীর্থযাত্রা করেন। ভগবানের বাম পাদাঙ্গুষ্ঠ হতে উদ্ভূতা পবিত্র সরযূ নদী এখানে প্রবাহিতা। এই নদী মানসনন্দিনী, বশিষ্ঠকন্যা, ঘর্ঘরা বা ঘাঘরা নামেও অভিহিত করা হয়।

ত্রেতাযুগের ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সেই অযোধ্যাপুরী লুপ্ত হলে তাঁর সুযোগ্য পুত্র কুশ উহা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। মথুরার মত অযোধ্যা নগরী ও বিধর্মীদের হাতে অনেকবার বিধ্বস্ত হয়েছে। সেই অতীতের নিদর্শনগুলির মধ্যে কেবলমাত্র পুণ্যতোয়া সরযূ আর পুরাতন অযোধ্যা নগরীর কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ এখন আছে।

এখন নগরীতে যাত্রীদের থাকবার জন্য সহরের মধ্যে ও সরযূতীরে অনেকগুলি ধর্মশালা আছে; সাধুদের আশ্রমেও অনেক যাত্রী থাকতে পারে। অযোধ্যার প্রধান করণীয়—সরযূতে স্নান ও পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে পিণ্ডদান। কার্তিক মাসে সরযূতে স্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য। রেলষ্টেশন থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে সরযূতে স্নানের জন্য নদীতীরে অনেকগুলি বাঁধান ঘাট আছে। সহরের মধ্য দিয়েই ঘোড়াগাড়ীতে বা হেঁটে ঘাটে যাওয়ার রাস্তা। সহরের দিকে নদীতে অনেকখানি চড়া পড়েছে;

এটা পার হোয়ে স্নান করতে যেতে হয়। প্রশস্ত চড়াতে পাণ্ডাদের তক্তা পাতা আছে ও চৌকী, টুপী, প্রভৃতি নানারূপ স্বাদেশিক জিনিষগুলি লম্বা বাঁশের উপর টাঙ্গান আছে; তাতে যাত্রীরা আপন পাণ্ডার ঘাট অনায়াসেই চিন্‌তে পারে। বহু যাত্রী সরযূতে স্নানের সময় নাকাড়াওয়ালা দিয়ে বাজনা বাজায়। দূর থেকেই সেই বাজনার আওয়াজ ও লোক-কোলাহল শুনতে পাওয়া যায়। এই নদীতীরে ছোট বড় অনেক ঘাট; তন্মধ্যে লক্ষ্মণঘাট প্রভৃতি কয়েকটী বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই লক্ষ্মণঘাট থেকেই দশরথ-পুত্র লক্ষ্মণজী স্বর্গে মহাপ্রয়াণ করেছিলেন। এর ওপর লক্ষ্মণজীর মন্দির, ও তার মধ্যে তাঁর পাঁচ ফিট উঁচু একটী মূর্তি আছে। মূর্তিটী সান্‌নের কুণ্ড থেকে পাওয়া গিয়েছিল। নাগপঞ্চমীতে এঁর বিশেষ পূজার্চনা ও দর্শন লাভ হয়।

এখান থেকে কিছুদূরে স্বর্গদ্বার। এই ঘাটটী অন্যান্য ঘাট থেকে দেখতে সুন্দর ও বিশেষ মাহাত্ম্য-পূর্ণ। তাই অধিকাংশ যাত্রীই এখানে স্নান করেন ও পিতৃপুরুষকে পিণ্ডদান করেন। রাজা দর্শন-সিংহ এই ঘাট নির্মাণ করান। পাণ্ডারা প্রতিদিন এই ঘাটেই সরযূর সন্ধ্যারতি করেন। ঘাটের ওপরেই নাগেশ্বরনাথ শিবের মন্দির। বর্তমানে অযোধ্যার মধ্যে এই মন্দিরটীই সব চেয়ে পুরান। প্রবাদ, শ্রীরাম-চন্দ্রের পুত্র কুশ এই মন্দির নির্মাণ করিয়ে তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। এজন্য এঁর মাহাত্ম্যও এখানে খুব বেশী। অনেক যাত্রী বহুদূর থেকে গঙ্গার জল এনে এই মহাদেবের পূজা করে।

শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অযোধ্যা নগরী ধ্বংস হলে কেবল এই মন্দিরটী অবশিষ্ট থাকে। এই মন্দির ও সরযূ নদী দেখে রাজা বিক্রমাদিত্য পুরাতন অযোধ্যা নগরীর স্থিতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন ও এই স্থানেই পুনরায় অযোধ্যা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটী বেশ বড় ও দেখতে সুন্দর। মন্দিরের সিঁড়ি, উঠান, বারাণ্ডা ও গর্ভগৃহ সাদা মর্মর পাথরের তৈরী। অনেক টাকা পোতা আছে ও বহু লোকের নাম লেখা রয়েছে। গর্ভগৃহের মধ্যে শ্বেত পাথরের উঁচু বেদীর উপর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। ওই মন্দিরের পাশেই গলিতে একটি মন্দিরে একখণ্ড পাথরে চার ভাই ও সীতাদেবীর মূর্তি আছে। এ'ও অতি প্রাচীন। যখন মোগল সম্রাট বাবর 'রামজন্মস্থান' মন্দির ধ্বংস করেন, পাণ্ডারা তখন সেখান থেকে মূর্তিটী এনে এই মন্দিরে স্থাপন করেন; তদবধি মূর্তিটী এখানেই আছে। 'স্বর্গদ্বার' ঘাটের পর 'অহল্যাবাঈ' ঘাট, তার অল্প দূরে ত্রেতানাথের মন্দির। এখানে সীতা-রামের সুন্দর মূর্তি আছে। অনেকে বলেন, শ্রীরামচন্দ্র এখানে এক বড় যজ্ঞ করেন ও নিজ হাতে নিজের ও সীতাদেবীর মূর্তি স্থাপন করেন। ধর্মপরায়ণা অহল্যাবাঈ এই মন্দিরের জীর্ণ-সংস্কার করেন। একাদশী তিথি ভিন্ন অন্যদিনে এই মূর্তি দেখতে যাত্রীকে 'দর্শনী' কর দিতে হয়। এখান থেকে কিছুদূরে নয়াঘাট; ঘাটের পাশেই গোস্বামী তুলসীদাসের মন্দির। প্রতিদিন সন্ধ্যাতে এখানে এক হাজার দীপের আরতি হয়। কিছুদূরে মহাত্মা মণিরামজীর আশ্রম। এখানেও শ্রীরামের মন্দির আছে। আশ্রমে রোজই ভগবৎ-ভজন ও কথকতা হয়। সরযূর সব ঘাটের কোলভাগে জলে কচ্ছপের দল যাত্রীদের কাছ থেকে খাবারের আশায় ঘোরাফেরা করে; যাত্রীরাও মুড়ি বা খইয়ের মোয়া খেতে দেয়। কচ্ছপের মধ্যে নদীতে নেমে স্নান করতে যাঁদের ভয় হয়, তাঁরা কিনারা থেকে একটু দূরের জলে স্নান করেন। সেখানে কচ্ছপ অনেক কম। সহরের মধ্যে বানরের উপদ্রবও বড় কম নয়। একটু ফাঁকা পেলেই জিনিষপত্র নিয়ে পালায়, খাদ্যদ্রব্যাদি হাত থেকে লুঠ করতেও ভয় পায় না। অন্যান্য তীর্থস্থানে সহযাত্রীদের কাছ থেকে বানরেরা খাবার জিনিষ কাড়ছে দেখলে খুবই

হাসতাম কিন্তু এখানে নিজেকে ত বেশ ঠকতে হয়েছে। একদিন দুপুরে খাওয়ার সময় আমার পাতা থেকে রুটিগুলি সব তুলে নিয়ে গেল।

অযোধ্যার মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গ "রামকোট" প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থান। লম্বা ও চওড়াতে বেশ অনেকটা বিস্তৃত; এর মধ্যস্থ কুড়িটি বড় বড় ফটকের কথা প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে 'হনুমান-গড়ী', 'সুগ্রীবটিলা', 'অঙ্গদটিলা' ও 'মত্তগজেন্দ্র' এই চারটি আছে। সরযূ নদী থেকে এক মাইল দূরে সহরের মধ্যে হনুমানগড়ী। এটি মহাবীর হনুমান-জীর দুর্গ। বাস্তবিক এটী হনুমানজীর দুর্গই বটে! অসংখ্য বানর সৈন্য নিয়ে সৈন্যাধ্যক্ষ মহাবীর এখানে বাস করেন! দুর্গমধ্যে ঐ সৈন্যদের উৎপাতে সবাই অস্থির। তারা তাদের সৈন্যাধ্যক্ষের পূজার উপকরণ ফল মিষ্টান্নাদি যাত্রীদের কাছ থেকে কেড়ে খেতেও বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে না! বোধ হয় সৈন্যেরা ভাল কোরেই জানে যে তাদের অধ্যক্ষ পরম দয়াল; তাঁর জিনিস কেড়ে খেলেও তিনি কিছু বলবেন না।

হনুমানজীর বড় মন্দিরটি উঁচু টিলার উপর; প্রায় ৬০টি সিঁড়ি উঠে মন্দিরের ভিতরে যেতে হয়। রূপার তৈরী বড় ছাতার নীচে বীরাসনে মহাবীরের বিশাল মূর্তি। এরূপ বীরাসনে মহাবীর-মূর্তি আর কোথাও দেখি নাই। এই মূর্তির নীচে আরও একটি ছোট্ট হনুমান মূর্তি আছে। ফুল দিয়ে সর্বদা ঢাকা থাকায় অন্য পূজক ছাড়া এ মূর্তি আর কেউ দেখতে পায় না। মন্দিরের চারধারের অন্যান্য কুঠরীতে অনেক বৈরাগী সাধু বাস করেন। এই টিলা ও মন্দির নবাব আসিফুদ্দৌলার মন্ত্রী টিকৈত রায় নির্মাণ করান ও তন্মধ্যে মহাবীরের বিশাল মূর্তি স্থাপন করেন। এখান থেকে কিছুদূর দক্ষিণে সুগ্রীব ও অঙ্গদটিলা। অনেকে বলেন, বর্ত-মান সুগ্রীবটিলাতেই প্রাচীনকালে বৌদ্ধ স্তূপ ছিল ও তার মধ্যে বুদ্ধদেবের নখ ও রক্ষিত ছিল চূড়া স্তূপের কাছে বৌদ্ধ মঠও ছিল। নিকটেই সীতা দেবীর অন্দর মহল 'কনক ভবন'। অযোধ্যার মধ্যে এই মন্দিরটিই সর্বাপেক্ষা বড় ও সুন্দর। প্রায় দুই বিঘা জমির মধ্যে এই মন্দির অবস্থিত। ভিতরে সুন্দর বাগান ও বড় ফোয়ারা। মন্দিরের উঠোন ও বারাণ্ডা শ্বেত মর্মর পাথরের তৈরী। এখানে প্রত্যহ ভগবৎ-ভজন ও কথকতা হয়। টিকমগড়ের মহারাজ এই মন্দির নির্মাণ করিয়েছেন। মন্দিরের দরজা, চৌকাঠ প্রভৃতি সব সোনার। ভেতরে সোনার সিংহাসনের ওপর শ্বেত মর্মর পাথরের সীতা-রামের দিব্য মূর্তি। সিংহাসনের একপাশে অপেক্ষা-কৃত ছোট আকারের অন্য আর একটি সীতারাম-মূর্তি। এই ছোট মূর্তিটিই প্রাচীন, বড়টি আধুনিক। এই মন্দিরের কাছেই আমওয়া রাজার নির্মিত বড় একটা সুন্দর মন্দির আছে। চারদিকের অনেক সাজান কুঠরীতে বহু দেবদেবীর শ্বেত পাথরের দিব্য মূর্তি সকল প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরের আশপাশে নানা জায়গায় রাজা ও জমিদারদের তৈরী আরো অনেকগুলি সুন্দর মন্দির আছে।

'কনক ভবন' থেকে প্রায় দুই ফার্লং দূরে অযোধ্যার প্রাচীন ও ঐতিহাসিক বিখ্যাত স্থান "রামজন্মভূমি"। এই পবিত্র স্থান দেখামাত্রেই অনেক পুরাতন স্মৃতি মনে পড়ে। এখানেই রাজা দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেছিলেন। আজও লোকে একে "যজ্ঞবেদী" বলে থাকে। এখানেই শ্রীরামচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। প্রাচীনকালে এখানে শ্রীরামচন্দ্রের বড় ও কাল মর্মর পাথরের মন্দির ছিল। মোগল সম্রাট বাবর ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটী ধ্বংস ক'রে তার উপরেই মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের স্তম্ভগুলি ও ওপরের গম্বুজ আজও পুরাতন মন্দিরের সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই পবিত্র স্থান নিয়ে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। বৈরাগী সাধুরা মসজিদের সামনে বেদী নির্মাণ করে তার

ওপর শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি স্থাপন করেন। সেই সময়ের শাসকবর্গ উভয় দলের বিবাদ মীমাংসার জন্য উঠানের মাঝে এক প্রাচীর গেঁথে মসজিদকে দু ভাগে ভাগ করেন। প্রাচীরের বাইরে বেদীর ওপর ছোট মন্দিরে জন্মস্থানের বালক-মূর্তির পূজা হোত; আর প্রাচীরের ভেতরে মসজিদে মুসলমানেরা নমাজ পড়তেন। সেই প্রাচীর আজও আছে। কয়েক বৎসর আগে পুনরায় বৈরাগী সাধুগণ মসজিদের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের ও মহাবীরের মূর্তি স্থাপন করেছেন। মসজিদের সদর ফটক তালাবন্ধ আছে। সেখানে সশস্ত্র পুলিশ সর্বদা পাহারারত। পূজারীরা ছাড়া অন্য কেউ ভেতরে যেতে পায় না। যাত্রীরা ফটকের বাইরে থেকেই দর্শন ও পূজা করেন। উভয় দলের বিবাদ এখনও পর্যন্ত মীমাংসা হয় নি—শাসকবর্গের বিচারাধীন আছে। 'রামজন্মভূমি'র পাশেই "রামজন্মস্থান"। শ্রীরামচন্দ্র এখানে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। মন্দিরের মধ্যেই চৌবিশ অবতার, কোপভবন, রত্নসিংহাসন, আনন্দভবন, রত্নমহল প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান আছে। মন্দিরের এক পাশে কয়েকটি সিঁড়ি নীচে নেমে সীতা দেবীর রান্না-ঘর। সেখানে শ্বেত পাথরের উনন, শিলনোড়া, থালা প্রভৃতি রাখা আছে।

হনুমানগড়ীর কাছেই সহরের মধ্যে অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের ভিতরে সাজান বাগানের মধ্যে পাঁচটা সুন্দর মন্দির আছে। অনেকে বলেন, এরূপ 'সুন্দর মন্দির অবধ রাজ্যের মধ্যে আর নেই।' মাঝের মন্দিরে দর্শনেশ্বর শিব ও সামনে শ্বেত পাথরের বৃষ। পাশের মন্দিরে পার্বতী ও তার পাশে সিদ্ধিদাতা গণেশের মন্দির। অন্য মন্দিরে সীতারামের মূর্তি। মূর্তিগুলি জয়পুরের ও শ্বেত মর্মর পাথরের তৈরী। মন্দিরের বৃহৎ ঘণ্টাটি নেপালের অনুকরণে তৈরী। প্রথম ঘণ্টাটি নেপাল থেকেই তৈরী হয়ে আনবার সময় রাস্তাতেই ভেঙে যায়। পরে এই ঘণ্টাটি তারই অনুকরণে এখানেই তৈরী। এই সব মন্দির অযোধ্যারাজ দর্শনসিংহ প্রতিষ্ঠা করেন। রাজপ্রাসাদের দক্ষিণ দিকে ফাঁকা মাঠের মধ্যে তুলসী-চৌরা। গোস্বামী তুলসীদাস এখানে থাকতেন এবং এখানেই তিনি শ্রীরামচরিতমানস রচনা করেন। তুলসীচৌরা থেকে প্রায় এক মাইল দূরে মণিপর্বত। স্থানীয় লোকেরা একে ভৌরাকার বা উড়াকার বলে। অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গ নির্মাণকালে কুলী মজুরেরা এখানে রোজ তাদের সব ঝুড়ি টুকরী ঝাড়তো; এর ফলেই এই উচ্চ টিলাটি হয়। এর কাছেই দুই শত ফিট উঁচু এক অশোক-স্তূপ রয়েছে।

অযোধ্যা ছোট সহর হলেও প্রাচীনকাল থেকেই এখানে বহু মন্দির। পুরাতন মন্দির-গুলির বেশীর ভাগই বিধর্মিদের হাতে বিধ্বস্ত হওয়ায় বর্তমান মন্দির সব প্রায়ই আধুনিক তৈরী। এই সব আধুনিক মন্দিরের মধ্যে সুরসরি রাণীর মন্দির, ভিন্দারাজ মন্দির, বেত্তিয়ারাজ মন্দির, টিকারীরাজ মন্দির প্রভৃতি দেখবার মত।

বৈষ্ণব ও শৈব মন্দির ছাড়া অনেক প্রাচীনকাল থেকেই জৈন-বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের বহু মন্দির ও স্তূপাদি থাকায়, অযোধ্যা তাঁদেরও প্রধান তীর্থ-স্থান। জৈনদের চব্বিশজন তীর্থঙ্করই ইক্ষ্বাকুবংশীয়; তন্মধ্যে পাঁচজনের জন্মভূমি এই অযোধ্যা নগরী। তাঁদের নামে আদিনাথ, অজিতনাথ, অভিনন্দন-নাথ, সুমতনাথ ও অনন্তনাথ নামে পাঁচটি মন্দির এখনও এখানে রয়েছে। এই সব মন্দিরে তীর্থঙ্করদের মূর্তি ও চরণ-চিহ্ন আছে। বহু দূর দূর থেকে অনেক জৈন সে সব দর্শন করতে আসেন।

ভগবান বুদ্ধদেবও সূর্যবংশীয়। তিনি বহুদিন অযোধ্যাতে বাস ক'রে নিজ সিদ্ধান্ত ও মত প্রকাশ করেন। বেশীর ভাগ বর্ষাকালেই তিনি এখানে থাকতেন আর সে সময় মণিপর্বতের কাছে দাতন কুড়ে প্রতিদিন দাতন করতেন। একদিন তাঁর দাতন এই পুকুরের একধারে পুঁতে দেন, পরে তা

থেকে বড় গাছ হয়ে দাঁড়ায়। কেউ কেউ বলেন, বুদ্ধদেব এখানে দাঁতনের জন্ত একটি চারাগাছ পুঁতেছিলেন ; পরে সেইটা একটা বড় গাছ হয়েছিল। অনেক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সেই বৃক্ষকে দর্শন করে গিয়েছেন। প্রসিদ্ধ তীর্থযাত্রী ফাহিয়ান তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে এই বৃক্ষের কথা উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে সেখানে কোনও বৃক্ষ নেই, কেবলমাত্র কুণ্ডটি রয়েছে। বৌদ্ধগ্রন্থে অযোধ্যাকে "সাকেত পুরী" বলে গৌরব প্রদান করা হয়েছে।

অযোধ্যার রামঘাট থেকে আট মাইল দূরে সরযূ নদীর তীরে রাজা দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্থান, বশিষ্ঠদেবের আশ্রম ও কুণ্ড দর্শনীয়।

অযোধ্যা থেকে ১৬ মাইল দূরে নন্দীগ্রাম। শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের সময় ভরত এখানেই বাস করতেন ও শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিনিধি হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। এখানে ভরত-মন্দির ও মন্দিরের কাছে ভরতকুণ্ড নামে একটি সরোবর আছে। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা রঘুর ধনাগার প্রসিদ্ধ "সোনধর" দর্শনীয় স্থান। প্রবাদ আছে : কোনও ব্রাহ্মণকে প্রচুর স্বর্ণ দান করতে হবে ; কিন্তু রাজকোষ শূন্য। তাই রাজা রঘু ধনাধ্যক্ষ কুবেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাঁরই কাছ থেকে স্বর্ণ নেওয়া স্থির করেন। তাতে কুবের ভীত হয়ে সেই রাত্রেই এখানে প্রচুর স্বর্ণ বর্ষণ করেন। সেজন্ত এর নাম 'সোনধর'।

অযোধ্যা থেকে ৭ মাইল দূরে জনৌরাগ্রাম ও ৯ মাইল দূরে গুপ্তারঘাট। মিথিলা থেকে রাজা জনক যখন অযোধ্যায় আসতেন, তখন এই গ্রামেই থাকতেন। 'জনকৌরা' থেকেই 'জনৌরা' অপভ্রংশ হয়েছে। গুপ্তারঘাটে সরযূ-স্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। ঘাটের পাশেই গুপ্তহরির মন্দির। অযোধ্যা থেকে এই সব দূরের তীর্থ স্থানে যাতায়াতের জন্ত মোটরবাস ও ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায় ; রাস্তাও ভাল।

প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে রামনবমীর সময় ও শ্রাবণ মাসে ঝুলনযাত্রার সময়, অযোধ্যাতে বড় মেলা হয় ও বহু লোকের সমাবেশ হয়। কার্তিক মাসেও সরযূতে স্নানের জন্ত অনেক যাত্রী আসেন। অনেক যাত্রী অযোধ্যা নগরীর চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করেন। 'বড়' ও 'ছোট' দু' রকমের প্রদক্ষিণ আছে। অযোধ্যা থেকে চার মাইল দূরে ফৈজাবাদ সহর। এখানেও সরযূ নদী আছে। সহরের মধ্যে সুন্দর ও বড় বড় সমাধিস্থান, মসজিদ ও ইমামবাড়া দেখবার মত জায়গা। নবাব সুজাউদ্দৌলা ও তাঁর পত্নী বহুবেগমের সমাধি অবধের মধ্যে বিখ্যাত। বহুবেগমের সমাধি বহু মূল্যবান্ প্রস্তরাদিতে সজ্জিত।

অযোধ্যাপুরী ও আশপাশের তীর্থ দর্শনাদি সমাধা করে, ভক্তিভরে করজোড়ে মোক্ষদায়িনী পুরীকে ও তীর্থ-দেবদেবীদিগকে প্রণাম করে নৈমিষারণ্য দর্শনে যাত্রা করলাম।*

(ক্রমশঃ)

* বিশ্ববাণীতে গত বৈশাখ হইতে 'ভারতের তীর্থদর্শনে' যেরূপ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে অনেক পাঠক বিশেষতঃ যাঁহারা তীর্থস্থানগুলি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা খুবই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আষাঢ় মাসে বিশ্ববাণীতে ঐ প্রবন্ধের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ভুলটা মনোজ্ঞ না হইতে পারে। কেননা প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত করিতে গিয়া অনবধানতাবশতঃ কয়েকটী পদের আবশ্যকীয় নির্দ্দেশ ও কয়েকটী দর্শনীয় মুখ্য স্থানের কথা বাদ পড়িয়াছে। আর, প্রবন্ধের একস্থানে কটকনিলাকে 'কটকনিলা' পর্বত বলা হইয়াছে। বেরাঙ্গনা তীর্থের কথা, সন্তর্পণ পর্বতের উপরে বর্ণিত বিষয়ের অন্তীভূত করা হয় নাই। অবশ্য, সেজন্ত লেখক মহাশয় দায়ী নহেন।—সঃ বিঃ

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নামটি শুনলেই মনে সেই সন্ন্যাসীর কথা জাগে যিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তাঁর জীবদ্দশাতেও যেমন, তাঁর নশ্বর দেহাবসানের পরও তেমন সেবা করে অমর হয়ে আছেন। সেবা সাধারণ লোক আমরাও করে থাকি। তার পেছনে উদ্দেশ্য থাকে। কেউ বা স্বাস্থ্যের জন্যে দেহের, স্ফূর্তির জন্যে মনের, অর্থের জন্যে বিত্তশালীর, স্বার্থের জন্যে অনর্থের সেবা করে। যে সেবা মানুষের সদুদ্দেশ্য লাভের অন্যতম সাধন, সেই সেবাই বিপরীত বুদ্ধিতে বাধনের কাজ করে। পক্ষান্তরে সেবার ক্ষেত্রে যখন দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্তন হয়, তখন শুধু আনন্দ বা জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যেই সেবার কাজ চলতে থাকে। তাই জ্ঞানই যখন সেবার লক্ষ্য হয় তখন মানুষ বাহিরের আর কি চাইবে? যদি জ্ঞান চাওয়া এক প্রকারের কামনা হয় তাহলে মিছিরি যেমন মিষ্টির মধ্যে নয়, কলমি শাক যেমন শাকের মধ্যে নয়, জ্ঞান কামনাও তেমন কামনার মধ্যে নয়। এই জ্ঞান কামনার ধারা লভ্য নয়—এটি স্বয়ংবেদ্য এবং অন্তরে প্রোথিত থাকে। অপরের সাহায্য বা বাহিরের কারণ কেবল জ্ঞানের উদ্বোধকমাত্র। এই জ্ঞানোদয়ের উদ্দেশ্যেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সেবা করে গেছেন।

হিন্দুরা গুরুবাদে বিশ্বাস করে। তাই তা'রা বলে সচ্চিদানন্দঘন শ্রীগুরুর কৃপা ব্যতীত জ্ঞানোদয় হওয়া অসম্ভব। গুরুকৃপা তো অবিরত বর্ষিত হচ্ছে। "কৃপা বাতাস তো বইছেই।" তবুও আমাদের জ্ঞানোদয় ব্যাপারে কার্পণ্য থাকে কেন? তার অন্যতম কারণ আমাদের সাধনা নেই—"পাল তুলে দেবার চেষ্টা নেই"; সাধনা না থাকলে কৃপাকে ধরে রাখা যায় না। স্বাতী নক্ষত্রের এক বিন্দু বারির আস্বাদ পেয়ে শুক্তি তাই সমুদ্রের অতল তলে তলিয়ে যায় সাধন মানসে। অহেতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অনাগত ভক্তদের উদ্দেশ্যে যখন ডাক দিলেন—'ওরে কে কোথায় আছিস, ছুটে আয়।' তখন সেই ডাকে যাঁরা সাড়া দিয়েছিলেন, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁদেরই একজন। গুরু কৃপা পেয়ে তিনি কেমন সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন তা জানার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। তিনি সাধনার যে পথ বেছে নিলেন তা হল গুরুসেবারূপ সাধনা এবং এই সাধনাই তাঁকে চরম জ্ঞানের অধিকারী করে তুলল।

শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজার প্রবর্তক এবং মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা। মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজা প্রবর্তনেও যেমন আবার মাদ্রাজে মঠ-প্রতিষ্ঠাকালেও তেমন তাঁকে বেশ বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শ্রীগুরুর মুখ চেয়ে সব বাধা তিনি সয়ে গিয়েছিলেন। তাই কারুর প্রতি কোন অভি-যোগই তাঁর ছিল না। বরং তিনি সবার কল্যাণ কামনাই করে গেছেন।

মঠের প্রথম কঠোর সাধন জীবনে সমস্ত গুরু-ভাইরা সাধনমগ্নাবস্থায় খাওয়ার কথা যখন ভুলে থাকতেন তখন রামকৃষ্ণানন্দজীই মায়ের মত স্নেহভরা বুকে তাদের মুখে খাবার তুলে দিতেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর পূজা প্রবর্তন করেছিলেন বলে তাঁরই দৌলতে তখন রোজ যা হোক কিছু মোটাঝুটি খেতে মিলত। ঠাকুর সেবার কোন ত্রুটি যাতে না হয় সেদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকত। নিজের যেটি ব্যথা ও অসুবিধা ঠাকুরেরও সেই ব্যথা ও অসুবিধা এবং নিজের যেভাবে তা প্রতিকার হয় ঠাকুরের বেলায়ও তাই প্রয়োগ, এটি তাঁর সেবার মধ্যে উজ্জ্বল। অধিকন্তু ঠাকুরকেই একমাত্র নির্ভর-যোগ্য বলে বোধ ও সেই বোধের প্রেরণায় তাঁকে

আদর করা ও তাঁর উপরই সম্পূর্ণ অভিমান করা ছিল তাঁর অভ্যাস। শরণাগতির দৃষ্টান্তে তিনি শ্রীশ্রীমহাবীরের সমতুল্য।

ভারতীয় সন্ন্যাসী-সমাজে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ সন্তানদের মধ্যে যে গুরুভ্রাতৃপ্রেমের নিদর্শন পাওয়া যায় তা বহুলাংশে বিরল। এই গুরু-ভ্রাতৃ-প্রেম বহু সন্ন্যাসীর ও অন্যান্য আশ্রমস্থ লোকেদের বিস্ময় উৎপাদন করেছে। প্রায় সমবয়সী গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দকে রামকৃষ্ণানন্দজী ঠিক গুরুর মতই শ্রদ্ধা করতেন ও তাঁর আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করতে সচেষ্ট হতেন। নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণশরীরধারী শশী মহারাজের (রামকৃষ্ণানন্দজীর অপর নাম) ওপর আদেশ হ'ল বাজার থেকে লোকসঙ্কে পাউরুটিকিনে আনার। গুরুভাইয়ের আদেশে তাই করতে তিনি উদ্যত। এখনকার কালে এ আর এমন কিকঠিন কাজ ; কিন্তু যখন এ ঘটনা ঘটেছিল, তখন এরূপ করা এত সহজসাধ্য ছিল না। গুরুভাইয়ের আদেশ পালন কালে নিজের বুদ্ধির প্রাধান্য দিতেন না তিনি কখনও এবং চাইতেন অপরেও নির্বিচারে গুরুর আদেশ পালন করুক।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবন আমাদের প্রেরণা দিয়ে বলে—কেমন করে গুরুসেবা করতে হবে, সাধন জীবনে অনুষ্ঠানের অনুসরণ করে মানুষ কতখানি সাফল্য লাভ করতে পারে।

একবার তিনি রেঙ্গুনে। তাঁর সঙ্গে প্রখ্যাত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেখা হয়। আলাপও হয় অনেক বিষয়ে। প্রসঙ্গতঃ শরৎবাবু জিজ্ঞেস করলেন শশীমহারাজকে—সাধনভজন, পূজা-জপ-ধ্যান এসব করার দরকার কি? আপনারা এসব করেন কেন? উত্তরে শশী মহারাজ বলেছিলেন —এসব করার কোনই দরকার নেই। তাই বলে—

'জপ তপ সাধন ভজন সবই ফাঁকি।
এই অবসরে মা কেবল তোকেই ডাকি।'

যখন যে ভাবে থাকি কেবল মাকে ডাকার জন্যেই যে সব কিছু করতে হয় সেটি তিনি জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন।

শ্রীশ্রীমা দক্ষিণ ভারতের তীর্থ দর্শনে গিয়েছেন। অক্লান্তকর্মী শশী মহারাজ তার সব বন্দোবস্ত নিজে করলেন। দাক্ষিণাত্যের ভক্তেরা এই সুযোগে যেমন শ্রীশ্রীমার কৃপালাভে ধন্য হল, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও তেমনি অন্তরের অন্তস্তলে চিরপোষিত মাতৃভক্তি নিবেদনের সুযোগ পেয়ে জগদম্বা-জ্ঞানে তাঁকে পূজা করে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করলেন। নিজ মুখে বল্লেন—আমার কাজ শেষ হল। যেন মা যে কাজের ভার দিয়ে দিয়েছিলেন, মাকেই আবার তা ফিরিয়ে দিয়ে, তিনি ছুটি নিলেন। কাজে তাঁর নিজস্ব বোধ কিছুই ছিল না—কেবল ঠাকুর, মা, স্বামিজী ও ব্রহ্মানন্দজীর প্রীতিলাভই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল এবং সেবা ও আজ্ঞানুবর্তিতাকে তাঁর সাধনপথের পাথেয় করে নিয়ে তিনি শরণাগত-বৎসলের অনুসরণ করে নিজে ধন্য হয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে নিজের ভগ্না মানবকুলকেও পবিত্র করে গেছেন।

'ছেলেরা ঘুঁটি ধরে বন্ বন্ করে ঘুরতে থাকে, কখনো ছেড়ে দেয় না, জানে ছাড়লেই পড়ে যেতে হবে। সংসারীও সেইরূপ ভগবানকে ধরে সব কাজ করবে, তাঁকে ছেড়ে যে কাজ, সে কাজে পড়ে যেতে হবে—সংসারে জড়িয়ে পড়বে।'

—শ্রীরামকৃষ্ণ

রবীন্দ্র-স্মৃতি

শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্ম্মকার

সন ১২৬৮ সালের পঁচিশে বোশেখ, ইংরেজী ১৮৬১ সালের ৭ই মে, সোমবার রাত্রি আড়াইটায় তিন পরে কোলকাতার জোড়াসাঁকোস্থ পৈত্রিক বাসভবনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও সারদাদেবীর চতুর্দশতম সন্তান। রবীন্দ্রনাথ কয়েক বৎসর বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করেন, কিন্তু তাঁর গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল চমৎকার। বিদ্যালয়ের পাঠ্য ব্যতীত, গান, কুস্তি ও জিমন্যাষ্টিক্স্ সবই তাঁকে শিখতে হোয়েছিলো। ছোটবেলা থেকেই তাঁর প্রাণ মন কবিপ্রতিভায় অনুপ্রাণিত।

"অভিলাষ" নামে তাঁর সর্বপ্রথম কবিতাটি মুদ্রিত হয়। পরে হিন্দুমেলায় "হিমাদ্রি শিখরে শিলাসন পরি" শীর্ষক একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি কোরে চতুর্দশ বর্ষ বয়স্ক কিশোর রবীন্দ্রনাথ সকলকে চমৎকৃত করেন।

রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ১৮৭৮ সাল থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত লণ্ডনে বিদ্যাভ্যাস করেন। ১৮৮৪ সাল থেকে তাঁর প্রতিভা ও কর্মশক্তি বহুদিকে প্রসারিত হয়। "বালক", "হিতবাদী" এবং নিজের সম্পাদিত "সাধনা", "ভারতী", "বঙ্গদর্শনের নব পর্যায়" ও "ভাণ্ডার" প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি অজস্র প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা প্রকাশিত কোরে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

ইংরেজী ১৯০২ সালে কবির পত্নীবিয়োগ হয় ও ১৯০৫ সালে মহর্ষি লোকান্তর গমন করেন।

১৯০৫ সালে ১৬ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন) বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হয় এবং ঐ সময় কবি অপূর্ব উদ্দীপনায় স্বদেশপ্রেমের স্রোতে গা' ভাসালেন। ৩০শে আশ্বিনকে স্মরণীয় কোরবার জন্য কবি রাখীবন্ধন ও অরন্ধন প্রথার প্রবর্তন করেন, রাখী-বন্ধনের দিন প্রাতে তিনি গঙ্গাস্নান করেন ও অনেকের হাতে রাখী বাঁধেন। অপরাহ্নে "ফেডারেশান হল" প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আনন্দমোহনের অভিভাষণ বাঙলা ভাষায় অনুবাদ কোরে পাঠ করেন এবং কয়েকটি স্বরচিত গান গেয়ে এক বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিলেন।

দু'দিন পরে বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে বাগবাজারের পশুপতি বসুর গৃহাঙ্গণে বহু সহস্র লোকের সমাবেশের মধ্যে কবি সমগ্র বাঙালী জাতিকে একসূত্রে গাঁথবার জন্য ওজস্বিনী ভাষায় আহ্বান করেন। কিছুদিন পরে জাতীয় আন্দোলনের হিংসাত্মক গতি দেখে কবিগুরু এর পুরোভাগ থেকে বিদায় চাইলেন, তবে তরুণ-তরুণীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৯০৭ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের প্রথম সভাপতি হ'ন রবীন্দ্রনাথ এবং ঐ বৎসরই পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত হোয়ে সর্বপ্রথম বাঙলা ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করেন।

১৯১১ সালে কবির জীবনের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় শান্তিনিকেতনে ও টাউন হলে বিরাট কবি-সম্বর্ধনা হয়। ১৯২২ সালে অর্শ রোগে আক্রান্ত হোয়ে অস্ত্রোপচারের জন্য কবিগুরু লণ্ডনে যান ও সেখানে চিত্রশিল্পী "রথেন্‌ষ্টাইনে"-র সঙ্গে কবির খুবই বন্ধুত্ব হয়। ক্রমে কবি লণ্ডনের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক-গণের সঙ্গে পরিচিত হ'ন। তাঁরা সকলেই ইংরেজী "গীতাঞ্জলী"র পাণ্ডুলিপি পাঠ কোরে বিস্মিত ও উৎফুল্ল হোয়ে কবিকে প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত করেন। ওই বৎসর "গীতাঞ্জলী" প্রকাশিত হোল এবং পর বৎসর, অর্থাৎ ১৯১৩ সালের ১৩ই নভেম্বর সুইডিস্ একাডেমী "গীতাঞ্জলী"র নিগূঢ় ও অভিনব ভাব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হোয়ে কবিকে দুর্লভ নোবেল পুরস্কার দানে সম্মানিত করেন।

কবি তখন ছিলেন শান্তিনিকেতনে—তাঁকে অভিনন্দিত কোরবার জন্য কোলকাতা থেকে প্রায় আনুমানিক পাঁচশত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কবির কাছে গিয়েছিলেন। ১৯১৪ সালে বাঁকুড়ায় দারুণ দুর্ভিক্ষ হয় ও পর বৎসর আর্ত্তত্রাণকল্পে অর্থসংগ্রহার্থ কবি "ফাল্গুনী" নামক নাটক অভিনয় করেন।

কবি স্বয়ং "অন্ধ বাউলের" ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'ন। "অন্ধ বাউল" মর্ত্তো চির সুন্দরের দূত। কবির অভিনয়-নৈপুণ্য ও রঙ্গমঞ্চ প্রযোজনা-কৌশল সবই ছিল অনবদ্য। কবি তখন থেকে জীবনে আর অবসর পাননি স্বদেশ ও বিদেশের সব স্থান থেকে নিত্য আমন্ত্রণ আসতে লাগলো। কবি যেরূপ বিপুল সম্মান ও অভিনন্দন লাভ কোরেছিলেন তা' কোন দিগ্বিজয়ী বীরের ভাগ্যে ঘটেছে কি না সন্দেহ। বহু স্থলে কবির নাটকের অভিনয় হোত ও তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী খোলা হোত। কিন্তু এতো কর্মকোলাহলের মধ্যেও কবি শান্তিনিকেতনকে একদিনের জন্য ভোলেন নি। অবসর পেলেই আশ্রমের নিভৃত নীড়ে এসে শান্তিলাভ কোরতেন।

এখানে কবির সব চেয়ে প্রিয় বাসভবন ছিল মাটির বাড়ী শ্যামলী।—পবিত্রীর স্নেহ ও পূর্ণতা লুকিয়ে থাকে মাটির শ্যামলিমায়।

১৯১৮ সালে বিশ্বভারতীর সূচনা হয়, তুলসীতলার দীপ হ'ল আকাশ প্রদীপ। দেশ-বিদেশ থেকে অধ্যাপক এলেন। কবি প্রথম অবস্থায় স্বয়ং অধ্যাপনা কোরতেন—তাঁর শিক্ষা-দান ভঙ্গীও ছিলো অপূর্ব। দেশের লুপ্ত শ্রী ও সম্পদ যা'তে ফিরে আসে সেই উদ্দেশ্যে—শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা কোরলেন। নব নব ঋতুতে প্রকৃতির নব নব ভঙ্গী আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীরা বরণ করে ভিন্ন ভিন্ন উৎসবের মাধ্যমে।

জলাশয় প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ-রোপণ, হাল চালন প্রভৃতি বহু উৎসবের অনুষ্ঠানেও আশ্রম-জীবন সুন্দর ও উৎসাহ চঞ্চল।

কবি স্বদেশকেও কখন ভোলেন নি। ১৯১৯ সালে পঞ্জাবের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে মর্ম্মাহত হোয়ে তিনি "নাইট" উপাধি বর্জ্জন করেন। ১৯৩১ সালে হিজলী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদকল্পে কোলকাতা ময়দানে যে জনসভা হয় কবি তাঁর পৌরোহিত্য করেন। কবি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইজিপ্ট ও সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ কোরেছেন।

প্রাচ্যেও জাপান, চীন, ইরাণ প্রভৃতি দেশে নিমন্ত্রিত হোয়ে গেছেন। ১৯২৭ সালে কবি যান জাভা প্রভৃতি পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। যবদ্বীপের প্রতি ধূলিকণায় ঘুমিয়ে আছে বৃহত্তর বাংলা ও বৃহত্তর ভারতের অতীত কীর্তির স্মৃতি।

১৯৩১ সালে কবির সপ্ততিতম বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় কোলকাতা ও ভারতের বহু স্থানে জয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। এই উপলক্ষ্যে দেশ-বিদেশের মনীষিগণ অভিনন্দন-বাণী প্রেরণ করেন। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বহুভাবে কবিকে সম্মানিত কোরেছেন।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তন সভায় কবি চিরাচরিত প্রথা ভেঙে বাংলা ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করেন। দেশের সনাতন প্রতিষ্ঠানগুলিও কবিকে সম্মানিত কোরেছে, তিনি ছিলেন সকলের নয়ন-মণি।

১৯৪০ সালে মহাত্মা গান্ধী সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসেন এবং এই এঁদের শেষ দেখা। মহাত্মা চিরদিনই কবির ভক্ত ছিলেন এবং বিশ্বভারতীর সাহায্যার্থে অনেক কিছু কোরেছেন। ১৯৪০ সালের ৭ই আগষ্ট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সমাবর্তন আহ্বান কোরে তার মরিস্ গ্যয়ার কবিকে অক্সফোর্ডের "ডি-লিট্" উপাধিতে ভূষিত করেন। এর জন্য তাঁরাও গর্বিত। ১৯৪১ সালের ৮ই আগষ্ট কবি মহাজাতি-সদনের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৪১ সালের বাঙলা নববর্ষ-বাসরে কবির অশীতিতম জন্মবার্ষিকী সর্বত্র অনুষ্ঠিত হয়—ঐ উপলক্ষ্যে কবি আশ্রমে এক তেজোময়ী বাণী প্রচার করেন।

অবশেষে ৭ই আগষ্ট ১৯৪১ এলো মহাপরিনির্বাণ। বিশ্বের ইতিহাসের সমস্ত প্রতিভাকে ম্লান কোরে যে ভাস্কর দীপ্তি জগৎকে মুগ্ধ ও দীপ্তি কোরেছিলো, সেই দীপ্তির হ'ল দৈহিক নির্বাণ। রাখী-পূর্ণিমার মিলন-সন্ধ্যায় মিলন-মন্ত্রের মহাশক্তিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে, অতীত বর্ত্তমান ও অনাগত মানবজাতিকে এক প্রীতি-রাগরক্ত রাখীর বন্ধনে বেঁধে জ্যোতির্লোকে চোলে গেলেন ; দুঃখ কি ? কবির সঙ্গে থাকবে আমাদের অনন্ত মিলন—যতদিন মানবজাতি থাকবে, কবিগুরুও থাকবেন ততদিন।

কণারক

শ্রীঅনিলকুমার হালদার

(১)

ভগ্নাবশিষ্ট কণারকের বিচিত্র সৌন্দর্য ধ্যানের গভীর লোকে যে স্পন্দন সৃষ্টি করে, এর আদি অকৃত সৌন্দর্য না জানি সেই প্রাচীনদের রসমানসে কোন্ ভাবের দোলা দিত। আমাদের কাছে এ বিস্ময়, আমাদের উত্তর বংশীয়ের কাছে বোধহয় সে বিস্ময়-বোধ আরো বেড়ে যাবে। কিন্তু ঐ আনুপাতিক হিসাব এর সমসাময়িকদের সম্বন্ধে খাটে কি না তা' জোর করে বলা অসম্ভব। আমি দেখেছি পরিত্যক্ত কণারককে—অতীতের বিরাট কীর্তির অনুদ্ধত সাক্ষী হিসেবে। নির্জন বালুকাতীরে কণারক আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, সূর্য-মন্দির সূর্যের বিজয়-মহিমার অনশ্বর প্রতীকরূপে। আজ কণারক মূক, ব্যথার্ত্ত এবং স্মৃতি-জর্জরিত ; স্মৃতিভারে ও' পড়ে আছে 'ভারমুক্ত সে এখানে নাই'। সামনের বিরাট আকৃতির পাথরের হাতী অথবা সিংহ (বিকৃত ও ভগ্ন) উল্টে পড়ে আছে, বোধ করি মুমূর্ষু ও পরাজিত। একটু এগিয়ে দেখলাম চত্বরের গায়ের বিরাট চক্র গেছে ভেঙে, কালচক্র চূর্ণ করেছে ওর দর্প। এদিককার ঝাউবনের ফাঁক দিয়ে দেখলে ওরও একটা মোহিনী মায়া আছে—আরো দূর থেকে ওটাকে বেশ দেখায় ; নির্বোধ পাথরের ঘোড়াগুলো ছুটে-চলার ভঙ্গীকে একটুও শিথিল করেনি। ওদের কি কষ্ট হয় না ! আর সবচেয়ে আশ্চর্য, আধিরসোন্মত্ত নরনারী নির্লজ্জ চিত্তে দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক রুচির সামনে—কি অদ্ভুত মানুষগুলো ! যাদের মনের রসের তুলিতে ওরা প্রাণ পেয়েছে তাদের নামকে বাঁচিয়ে রাখার দুরন্ত প্রয়াস দেখেছি ওদের মধ্যে ; অপূর্ব কৃতজ্ঞতা নয় কি ? ওপরে উঠলাম, স্তরে স্তরে পাথর সেঁধে এটা তৈরী হয়েছে। ভুবনেশ্বরের মন্দিরেও দেখেছি ঐ গাঁথার কৌশল। বিজ্ঞান তখন আসেনি যখন এগুলো তৈরী হয়েছে ; তা হলে কলাশিল্পেরও বিজ্ঞানের কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে এটাই বলতে হয়। কণারকের কঙ্কালে পাথর—এটাই হলো সাদা কথা ; এর ভিতরে পুরীর জগন্নাথ মূর্তির মত পুণ্যদর্শন কেউ নেই, অন্ততঃ আমি দেখিনি—সুতরাং পাথর অমিয়ে তোলার মানে কি ? এর সৃষ্টি সম্বন্ধে রবেন্দ্রনাথ বলেছেন : "ভুল করিয়া শাম্ব সেদিন সরসী তীরে আসিয়াছিলেন, জননী আদ্যবতী আসিলে নিষেধ করিতেন। জনক শ্রীকৃষ্ণ

সঙ্গে থাকিলে আসিতে দিতেন না—শাম্বের বিমাতৃগণ তখন পরিপূর্ণ যৌবনে জলক্রীড়ায় মত্ত। মৃণালভুজ আলোড়নে জল যেমন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, সুন্দরীদের যৌবনও তখন সেইরূপ আবেগভরে আন্দোলিত। এই পথে শাম্ব! পিতৃমুখ হইতে অভিশাপ বাহির হইল: 'কুষ্ঠ রোগে তোমার প্রায়শ্চিত্ত হউক।' অভিশপ্ত শাম্ব দ্বাদশ বৎসর কাল শান্ত দান্ত নিরাহার বায়ুভুক্ জিতেন্দ্রিয় হইয়া চন্দ্রভাগা নদীতীরে সূর্যকে তপে সন্তুষ্ট করিলেন। এবং সর্ব-পাপঘ্ন দিবাকরের বরে রোগমুক্ত হইয়া মুক্তিদাতা দেবতার নামে এই মন্দির উৎসর্গ করিলেন।" (রাজেন্দ্র-গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৫০৫ সাহিত্য-পরিষদ সংস্করণ)। ঐ কিংবদন্তীর সত্যাসত্য নির্ধারণ পণ্ডিতজনে করবেন। কিন্তু এর সৃষ্টি-মূলে ঈষৎ অলৌকিকতা বোধহয় চিরকালই থাকবে। মন্দিরের যদি কোন একটা বিশেষ আকর্ষণ থাকে, সেটা তার উচ্চতায় অথবা তার গাম্ভীর্যে। এই কণারকে তা আছে প্রচুর। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে ধর্মীয় ভাবের প্রবল দ্যোতনা আছে। তারই অন্তরাল দিয়ে কলালক্ষ্মী দৃষ্ট হয়ে থাকেন। কণারকেও দেবদেবীর মূর্তি যে নেই তা নয়। স্বয়ং সূর্যদেবও রয়েছেন। তবে সেটা খুঁটিয়ে না দেখলে ধরা যায় না অর্থাৎ শিল্প-সৃষ্টিই এখানকার মুখ্য কথা। সেই শিল্পের পটভূমি রচনা করে দিয়েছে বিরাট দেব-মহিমা। কণারক মন্দিরের মোটামুটি তিনটে বিভিন্ন অংশ। সামনে ও পিছনে ক্ষুদ্রাকার দুটি মন্দির; তন্মধ্যে সামনটার বিরাট শিল্প-কৃতি অবাক সৃষ্টির অমর স্বাক্ষর হয়ে আছে। পাথরের গায়ের রংটা কেমন খোলাটে মত। তার ওপর স্বল্প পরিসরে নৃত্যপরায়ণ গন্ধর্বদের ভঙ্গিময় মূর্তি; বাস্তবত মানুষও রয়েছে। মন্দিরের গায়ের নরনারীর কামনা-জর্জর রূপাভিব্যক্তি দেখে রাজেন্দ্রনাথ অনুমান করেছেন তৎকালীন বিলাস-ব্যসনের বাস্তব পঙ্কিলতা; এ' কথা যদি সত্য হয় তবে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের রূপকটা কি সমাজ-দেহের লাম্পট্য ও ব্যভিচারের ইঙ্গিতবহ? শিল্পকলায় মনের আকুতি ও কল্পনা মূর্ত হয়—আধুনিক পণ্ডিতেরা বলেন, সে মনটা যদি মানুষের মন হয় তবে তা রুচিহীন হবে কেমন করে; অর্থাৎ মোটা কথায় শিল্প হল বাস্তবেরই রকমফের। কণারকের গায়ে এই বিচিত্র কারুকার্যের মধ্যে মনের ও অনুভূতির, শিল্পের ও সংস্কৃতির একটা বিশেষ স্তর আত্মপ্রকাশ করেছে—এরই নাম হ'ল আর্ট। এক মনের চিন্তাকে আর এক মনে অনুপ্রবিষ্ট করার স্পৃহাও এর পেছনে আছে বটে। কিন্তু ঐ রূপকল্পের অন্তরালে অনেক কথাই অপ্রকাশিত, সেটা কথা হয়েই ওঠেনি। হয়েছে ইঙ্গিত; নৈলে পাথর কুঁদতে সময় এবং পরিশ্রম দুই-ই লেগেছে—সে মেহনত স্বীকার করার কি অর্থ হতে পারে? তাজমহল সৃষ্টির পেছনে শাজাহানের জৌলুষ প্রকাশের ইচ্ছা যতখানি আছে তার চেয়ে মানস-বেদনা ও প্রেমের নিঃসাড় দাহই বড় কথা। "এই একান্ত আকাঙ্ক্ষায় কত প্রাচীনকাল ধরিয়া কত ইঙ্গিত, কত ভাষা, কত শিশি। কত পাথরে খোদাই, ধাতুতে ঢালাই, চামড়ায় বাঁধাই, কত গাছের ছালে, পাতায়, কাগজে, কত তুলিতে, খোন্তায়, কলমে, কত আঁকজোঁক, কত প্রয়াস—বাঁ দিক হইতে ডাইনে, ডাহিন দিক হইতে বাঁয়ে, উপর হইতে নীচে, একসার হইতে অন্য সারে। কী? না, আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি, আমি যাহা অনুভব করিয়াছি তাহা মরিবে না, তাহা মন হইতে মনে, কাল হইতে কালে চিন্তিত হইয়া, অনুভূত হইয়া, প্রবাহিত হইয়া চলিবে। আমার বাস্তীঘর, আমার আসবাবপত্র, আমার শরীর-মন, আমার সুখদুঃখের সামগ্রী, সমস্তই যাইবে—কেবল আমি যাহা ভাবিয়াছি, যাহা বোধ করিয়াছি, তাহা চিরদিন মানুষের ভাবনা, মানুষের বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া সজীব সংসারের মাঝখানে বাঁচিয়া থাকিবে।

"আমরা যে মূর্তি গড়িতেছি, ছবি আঁকিতেছি, কবিতা লিখিতেছি, পাথরের মন্দির নির্মাণ করিতেছি, যুগে-বিদেশে চিরকাল ধরিয়া অবিশ্রাম এই যে একটা চেষ্টা চলিতেছে, ইহা আর কিছু নয়—মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে।" (সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ১২।১৬)। রবীন্দ্রনাথের এই দীর্ঘ উক্তিই আমার কথার শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য দেবে। রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, সম্রাট অশোক পাহাড়কে কথা কইবার ভার দিয়েছিলেন, কণারকের শিল্পীরা একে কি কথা কইবার ভার দিয়েছিল তা কে জানে। আর যদি ঐ ধরণের কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হয়ে এটা সৃষ্টি হয় তবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে প্রাচীন লোকগুলোর হাতে অবসর ছিল অঢেল, তাই আপন খেয়ালের চরিতার্থতা করতে গিয়ে এই দীর্ঘমেয়াদী কাজে তারা হাত দিয়েছিল। ঐ যে সম্মুখের মন্দিরের বিচিত্র ও বিস্ময়কর কারিগরি তাতে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি, নৃত্যগীতবাদ্যের চরম উৎকর্ষের একটা দিক পরিস্ফুট। সে লোক বাস্তবের রুঢ় মৃত্তিকায় গঠিত হয়েছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা প্রমাণ দিতে পারেন। সিংহের ঊর্দ্ধায়ত ভঙ্গিমা কি কথা প্রকাশ করে তা এখনও ভেবে পাইনে। দীর্ঘাকার সাপের, নারীকে বেষ্টনরত রূপ গূঢ় চেতনার দ্যোতক, তার ফণাটা বেশবিস্তৃত (ওটা কি শিব নাগ বংশের ইঙ্গিত?)। ঠিক এই-রূপটা উড়িষ্যার ছোটখাট অনেক মন্দিরে হামেসাই দেখা যায়; পৌরী-কুণ্ডের ঠিক পাশের মন্দিরটায় এরূপ অসংখ্য আছে। এ' সমস্তই দর্শক-মানসে সপ্রশংস ভাবের উদ্রেক করে; সে প্রশংসা পাবার জন্য আমাদের জাতীয় সরকার যে একে সংরক্ষণ করছেন অথবা জাতীয় ঐতিহ্যকে জীইয়ে রাখার আকাঙ্ক্ষায় অর্থব্যয়িত হচ্ছে তা জানিনে; তবে এ কথা জানি যে কণারকের শিল্পীরা আজকের মত কোন ইস্কুলের পাশকরা ছাত্র ছিল না, এই নৈপুণ্য ও দক্ষতা ছিল তাদের সহজাত এবং এখানে তারা মনের গভীর আকুতিকে রূপ দেবারই চেষ্টা করেছিল, গড়তে গড়তে ঐরূপ ধারণ করেছে।

(২)

কবি কীট্‌স্ গ্রীসদেশের ভস্মাধারের ওপর বিচিত্র কারুকার্য দেখে বললেন: 'এখানকার এই লতাপাতা ও নরনারীর মূর্তিগুলো কোনদিন মরবে না; যে বাঁশি বাজাচ্ছে ওর বাঁশীর সুর একভাবে থাকবে, ঐ লতাকুঞ্জের রং থাকবে চির-সবুজ এবং প্রেমিকযুগলের প্রাণোন্মাদনা থাকবে শাশ্বত হয়ে—বিচ্ছেদের বেদনা ওরা জানতেই পারবে না।' এ বলেই একটা সাংঘাতিক কথা উচ্চারণ করলেন—"Beauty is truth, truth beauty"—শিল্পের ঐ সৌন্দর্য ফুটেছে ওর সত্যের জন্য; আর ওতে সত্যের উদ্ভাস হয়েছে ওর সৌন্দর্যের জন্য। কারণ সত্য আর সুন্দর অভেদ্য। (Ode on a grecian urn). প্রত্যেক শিল্পীর কাছে সৌন্দর্য এভাবেই ফুটে ওঠে। আমাদের বৈষ্ণব কবিও 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল',—বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। কণারকের এই শিল্পসৃষ্টির চিরকালীন সৌন্দর্য যে রসতৃষ্ণার উন্মোচিত করে দেয় তা একহিসাবে অমূল্য। যতই কেন মহাকাল নশ্বরতার বাণী উচ্চারণ করুক এর ব্যঞ্জনা অমর। কণারকের প্রায় চক্র ভেঙে গেছে তবুও ঐ ভগ্নচক্র অনেক কথা কানে কানে বলে যায়। মন্দিরের চতুর্দিকে বালি আর বালি, ওরা অতীতের কথা ও কাহিনীর নিঃশব্দ সাক্ষী; হয়ত কণারকও একদিন অমনি করে বালিতে মিশে যাবে; তাহলে আমাদের সব প্রচেষ্টাই মাটী হয়ে যাবে। অবশ্য আসল কণারকের বালি থেকে মাটিতে পরিণত হতে আরো অনেক সময় লাগবে। সেই ধরণের গভীর গবেষণা করে আজকের সৌন্দর্যকে নষ্ট করে লাভ নেই, কারণ—"...beauty real beauty ends where an intellectual expression begins" (The picture of Dorian Gray: by Oscar Wilde. Page—3)

চুঁচুড়ার সংগীতশিল্পী

শ্রীবিপ্রদাস মন্সী, এম. এ.

শ্রীসিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

ইনি এম্-এ., বি.টি. পাশ করিয়াছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন কৃতী সন্তান। তাঁর পক্ষে সংগীতে জ্ঞানার্জন নিঃসন্দেহে গৌরবের বিষয়। ইনি লালবিহারী পাঠকের নিকট ধ্রুপদ, খেয়াল শিক্ষা করিয়াছিলেন। সিদ্ধেশ্বর হাজসাহী সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সংগীত ব্যতীত তাঁহার নাটক রচনা করিবারও ক্ষমতা ছিল। তিনি রাঘব-নির্বাসন, পঞ্চ পাণ্ডব, দক্ষযজ্ঞ ও পরিক্ষিতের ব্রহ্মশাপ প্রভৃতি নাটক লিখিয়াছিলেন। তিনি অপেরা, যাত্রা প্রভৃতিতে সুর দিতেন ও সংগীত পরিচালনা করিতেন। তিনি পুত্রকন্যাদের স্বরচিত এবং অন্যান্য গীত শিক্ষা দিয়াছিলেন।

ইহাও জানিবার বিষয় যে, তৎকালে মহিলাদের সংগীত-চর্চা নিষিদ্ধ ছিল ; তথাপি তিনি আপন কন্যাদের সংগীত চর্চায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন ও নিজে তাহাদিগকে সংগীত শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যাদের মধ্যে তবলা দেবীর নিকট প্রথমে হরি পাঠক, মীরা পাঠক, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চুঁচুড়ার কালীপদ পাঠক সংগীত শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনে শিক্ষালাভ করিয়া মীরা পাঠক ও কালীপদ পাঠক কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। অপর কন্যা গৌরীবালা দেবী চুঁচুড়া বালিকা বাণীমন্দির উচ্চ বিদ্যালয়ে সংগীত ও পাঠ্য শিক্ষয়িত্রীরূপে সর্বপ্রথম নিযুক্ত হন। তাঁহার এই-উদারতার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

ললিতমোহন প্রথমে লালবিহারী পাঠক ও পরে বেনারসের প্রসিদ্ধ গায়ক অযোধ্যা মিশ্রের নিকট খেয়াল ও ধ্রুপদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি উদাত্ত কণ্ঠে গান গাহিতেন। ইনি কলিকাতার সাগর দত্ত ও হ্যারিসন রোডের মল্লিক পরিবারে শিক্ষকতা করিতেন। কলিকাতার বিখ্যাত রেকর্ড গায়ক কাসিম মল্লিক (কে. মল্লিক) তাঁহার ছাত্র। উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার মুখোপাধ্যায় পরিবারে ললিতমোহনের খুব সমাদর ছিল।

মন্মথনাথ অধিকারী

মন্মথনাথের পিতা নবদ্বীপচন্দ্র অধিকারী সুকণ্ঠক ছিলেন। ধর্মসংগীত, শ্রীখোল ও তবলা বাদ্যে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। মন্মথ, পিতার নিকট শ্রীখোল ও তবলা শিক্ষা করেন এবং চোলকও ভাল বাজাইতে পারিতেন। তাঁহার সঙ্গত করিবার অসামান্য দক্ষতা থাকায় সহরের প্রতি অধিবেশনে তিনি সাদরে আমন্ত্রিত হইতেন। অপেরা ও যাত্রা আসরে সঙ্গত করিয়া যশ অর্জন করিয়াছিলেন। তবলা শিক্ষাদানের জন্য কলিকাতায় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কলিকাতার গুণীসমাজে তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি আপন ভ্রাতা মৃগাঙ্ক, পুত্র দুলাল ও ছাত্র প্রহ্লাদচন্দ্র বরকে সুশিক্ষা দান করিয়াছিলেন। শ্রীদুলাল দাস অধিকারী পিতার নিকট শিক্ষা প্রাপ্তির পর বর্তমানে কলিকাতার বিখ্যাত তবলিয়া নাটুবাবুর নিকট শিক্ষা করিতেছেন। বর্তমানে তিনি চুঁচুড়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলা-বাদক।

অবিনাশচন্দ্র কুণ্ডু

অবিনাশচন্দ্র প্রথমে চন্দননগরের প্রসিদ্ধ টপ্পা গায়ক মধুবাবুর নিকট টপ্পা শিক্ষা করেন ও পরে

লালবিহারী পাঠকের নিকট খেয়াল শিখিয়াছিলেন। ইনি স্থানীয় শিল্পীদিগের মধ্যে খুব জনপ্রিয় গায়ক ছিলেন। ইঁহার খাম্বাজ রাগে অসামান্য দখল ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অতুলচন্দ্র শেঠ তাঁহার নিকট টপ্পা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

গোবর্ধনচন্দ্র শীল

গোবর্ধনচন্দ্র লালবিহারী পাঠক ও গোলাপ আব্বাসের ভাগিনেয় তারাপ্রসাদ রায়ের নিকট মৃদঙ্গ ও তবলা শিক্ষা করিয়াছিলেন। মৃদঙ্গী হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল। ধনবান হওয়ায় ইনি প্রতি সপ্তাহে আপন আবাসে শনি ও রবিবার সঙ্গীতের আসর বসাইতেন। সেই আসরে স্থানীয় ও কলিকাতার বহু বিখ্যাত গুণী সমবেত হইতেন। ইহার মজলিসে গুণীদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ ওস্তাদ মোরাদ আলি খাঁ ও টপ্পা গায়ক রমজান আলির নাম উল্লেখযোগ্য।

ডাক্তার কৈলাস মুখোপাধ্যায় ও জগদীশ মুখোপাধ্যায়

মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয় লালবিহারী পাঠক মহাশয়ের সমসাময়িক। জগদীশ অধিকাংশ সময় কাশীধামে কাটাইতেন। তিনি ধ্রুপদ গাহিতেন ও তাঁহার ডাক্তার-ভ্রাতা মৃদঙ্গ বাজাইতেন। তিনি কাশীধাম হইতে চুঁচুড়ায় আসিলে ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া গীতবাদ্য করিতেন। কৈলাস খুব সংগীতপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার বৈঠকে সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ ভট্টাচার্য, চন্দন-নগরের মৃদঙ্গী চণ্ডী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি গুণীরা মিলিত হইয়া সংগীত চর্চা করিতেন।

প্রকৃতিমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও সুধীর চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকৃতি ও সুধীর প্রখ্যাত সুরশিল্পী ও নাট্যকার সিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র। প্রকৃতিমোহন পিতার সহিত রাজসাহীতে অবস্থানকালে বিখ্যাত ওস্তাদ আমীর খাঁর নিকট সেতার শিক্ষা করিয়াছিলেন। সেতার শিক্ষাদানই তাঁহার পেশা ছিল। চুঁচুড়ায় তিনি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর পুত্রকন্যাদের গান ও সেতার শিক্ষা দান করিতেন।

সুধীরচন্দ্র রবীন্দ্র-সংগীত ও বাংলা রাগ-প্রধান সংগীত অতি সুনিপুণ দক্ষতায় গাহিতেন। তাঁহার রচনাশক্তিও ছিল। আপন রচিত গীত সুর সহযোগে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে পরিবেষণ করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট অনেকেই সংগীত শিক্ষা করিত।

দুঃখের বিষয় যে, গঙ্গোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয় অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

শ্রীসাতকড়ি পাঠক

সাতকড়িবাবু প্রসিদ্ধ শিল্পী লালবিহারী পাঠকের ভ্রাতুষ্পুত্র ও বর্তমানে তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে সর্বশেষ গায়ক। ইনি ভগবদ্দত্ত সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের অধিকারী। ইহা গৌরবের বিষয় যে, তিনি জ্যেষ্ঠতাতের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত রামচন্দ্র শীলের সংগীতসমূহ এখনও চর্চা রাখিয়া সহরের সংগীতসেবিদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কণ্ঠ সংগীত ব্যতীত লালবিহারী পাঠকের নিকট তবলা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ছাত্রদিগকে এখন তবলা শিক্ষা দিয়া থাকেন। তিনি ব্রহ্মসংগীতেরও যথেষ্ট চর্চা করিয়াছিলেন। সাতকড়িবাবু হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগর ও কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ জলসায় সুযশের সহিত আপন কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

পশ্চিম বাংলার আইন-উপদেষ্টা শ্রীএস্. এম্. বসু মহোদয়ের পিতা স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসুর কটকের বাড়ীতে সংগীত অধ্যাপনার কার্য করিতেন। চুঁচুড়ার ভূতপূর্ব জজ মাননীয় সি. সি. ঘে ও মাননীয় কে. সি., নাগের পুত্রকন্যাদিগকে সংগীত শিক্ষা দিয়াছিলেন। সাতকড়িবাবু "লাল-

বিহারী-স্মৃতি-সংগীত-বিদ্যালয়" পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইহার রচনাশক্তিও আছে এবং কয়েকটি সংগীত "সংগীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহার পুত্রদিগের মধ্যে শ্রীসঞ্জয়কুমার পাঠক ও ছাত্রদিগের মধ্যে শ্রীনীলমাধব দে, নিবারণচন্দ্র দে, নারায়ণ দত্ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ফটিকবাবু)

জ্ঞানবাবু এলাহাবাদে কর্মোপলক্ষে কয়েক বৎসর ছিলেন এবং তথায় একবল হোসেনের নিকট তবলা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক স্বর্গীয় দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট মৃদঙ্গ শিক্ষা করেন। তিনি তদ্রূপকালীর বিখ্যাত গায়ক রাধু দত্ত প্রভৃতি গুণীদিগের সহিত সঙ্গত করিতেন। তাঁহার পুত্র দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার নিকট তবলা শিক্ষা করেন।

জনাব নান্নে সাহেব

নান্নে সাহেব প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল হুগলীর বড় ইমামবাড়ীর কোরাণ পাঠক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ইঁহার কণ্ঠস্বর অতি মার্জিত ও সুমিষ্ট। ইনি মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ গায়ক আশাপ আলী খাঁর শিষ্য ও জামাতা। নান্না সাহেব খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী ও গজল গাহিয়া থাকেন। কয়েকজন স্থানীয় শিল্পী ইহার নিকট হইতে ঐ সব বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এই সুন্দর পৃথিবী

শ্রীসুধীরচন্দ্র চৌধুরী

হে পৃথিবি, তুমি অবাক, মহৎ সুন্দর বিস্তৃত,
তোমা ঘিরি' মহা জলরাশি আছে সদা কুণ্ডলিত ;
মনোহর তৃণগুচ্ছে আবারিত বক্ষ আচ্ছাদিত,
অপরূপ বেশ-বাসে কি সুন্দর হয়েছে সজ্জিত।

সুন্দর বায়ু-মণ্ডল বয় আমার মাথার 'পরে,
সুন্দর হাওয়া নাড়া দিয়ে যেন বৃক্ষের শাখা ধরে'।
জলের উপরে বেড়ায় ও' ঘুরে', ঘুরায় নিজের কল,
গিরির শিখরে নিজের সাথেই কথা বলে অবিরল।

হে পৃথিবি, বান্ধবি ওগো, কতদূর তব সীমানা,
গম-ক্ষেতের প্রান্ত হ'তে কি প্লাবিত নদীর মোহানা ?
না কি বল, নগর, উদ্যান, দ্বীপ, পাহাড়ের সারি—
কিম্বা হাজারো ক্রোশ জুড়ি' যেথা মানুষের ঘর-বাড়ি ?

ওঃ, তুমি কি বিরাট পৃথিবী, আর আমি কি তুচ্ছ নর।
আমো তোমাকে ভাবিতে গেলেই ভয়ে কাঁপি থরথর।*

---

* W. B. Rands এর 'The wonderful world' অবলম্বনে।

চাহি না

শ্রীপঞ্চানন পাল

বাঁধিতে তোমারে হৃদয় মাঝারে
চাহে না আমার মন,
পলক পরশ অমিয় হরষ
দেয় অলোক শিহরণ।
গভীর আঁধারে মেঘের মাঝারে
চঞ্চলা-চপলা-খেলা,
নিমেষে মিলায় তবু রেখে যায়
মরমে মদির মেলা।

করুণাকণা করি প্রার্থনা
চাহিনাকো বারে বারে,
অগুরু চন্দন দহি' অনুক্ষণ
গন্ধ আর নাহি ছাড়ে।
তোমারি আশিস্ লভি' অহর্নিশ
উচুতে আসন পেতে,
থাকিতে চাহি না পাই যে বেদনা
নীচুদের পানে চেয়ে।

গ্রন্থ-সমালোচনা

নিউ দিল্লীর নেপথ্যে—অমিয়া সেন। প্রকাশক: প্রবর্তক পাবলিশার্স; ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২; মূল্য —১৷০ আনা।

শ্রীমতী অমিয়া সেনের রচনা নানা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হ'তে দেখা যায়। সেই রচনাগুলি সুপাঠ্য এবং মনোরম। লেখিকার পাকা হাতের পরিচয় সব রচনাতেই দেখতে পাই। ঝরঝরে দিয়ে লেখা পড়তে বেশ লাগে।

সাহিত্য ক্ষেত্রে শ্রীমতী সেন সুপরিচিতা না হ'লেও তাঁর আলোচ্য ছোট বইখানি তাঁকে যে অদূর ভবিষ্যতে সুপরিচিতা করবে, তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। 'নিউ দিল্লীর নেপথ্যে' আমি আগাগোড়া দু'বার পড়েছি। ভাষা লেখা। ভাষা মিষ্টি। ঝরঝরে দিয়ে লেখা। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে এ বিষয়ে বই লেখা সহজসাধ্য নয়। লেখিকা সেই দুরূহ কাজটি তাঁর একান্ত সাধনায় সুসম্পন্ন করেছেন। সাহিত্যের মূল কথা হল একনিষ্ঠ সাধনা। শ্রীমতী অমিয়া সেনের লেখার মধ্যে সেই জিনিষটির পরিচয় পাওয়া যায়।

সাহিত্যের আর একটি বড় জিনিষ হ'ল দৃষ্টিভঙ্গী। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাহিত্যিকের এইখানেই তফাৎ। একটা অতি সামান্য জিনিষ, যা সাধারণে অগ্রাহ্য করে যায়, সাহিত্যিকের এক স্বতন্ত্র দৃষ্টি-ভঙ্গীতে সেটাই আবার এক অভিনব রূপ নিয়ে পাঠকদের সামনে হাজির হয়। শ্রীমতী সেন এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীতে এই আলোচ্য বইখানি রচনা ক'রেছেন।

'নিউ দিল্লীর নেপথ্যে' বইখানির মধ্যে প্রায় সর্বত্রই নির্ভীকতার একটা সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। এমন নির্ভীকভাবে সমস্ত বক্তব্য বিষয়টি সরস ক'রে বলে যাওয়া সচরাচর দেখা যায় না। শ্রীমতী সেনকে তাঁর এই 'নিউ দিল্লীর নেপথ্যে' বই-খানির জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আশা এই যে, এই বইখানি যথার্থ সম্মানলাভ করতে কখনোই বঞ্চিত হবে না।

—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

সংঘ-বার্তা

গুরু-পূর্ণিমা উৎসব : ২৬শে আষাঢ়, ১৩৬৪ (ইং ১১ জুলাই, ১৯৫৭) পূর্ণিমা-দিবসে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে 'শ্রীগুরু-পূর্ণিমা' উৎসব নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই পুণ্যতিথি উপলক্ষে জগৎগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বিশেষ পূজা হইয়াছিল। পূর্বাহ্নে পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দজীর আবাস-কক্ষে মঠের সাধু-সন্ন্যাসীগণ ও ভক্তবৃন্দ সমবেত হইয়া গুরুবন্দনা ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে সংগীত-বিশারদ শ্রীধীরেশ্বর চক্রবর্তী, শ্রীহরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কুমারী আলো ঘোষ চৌধুরী, কুমারী চন্দ্রলেখা ঘোষ চৌধুরী ও কুমারী মিতা দত্ত প্রভৃতির ভজন-সংগীত ও কীর্তন হয়। শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শতবার্ষিকীতে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ রচিত "প্রকৃতিং পরমাং" স্তোত্রটী সেনোলা কোম্পানী যে রেকর্ড করিয়াছেন তাহা বাজান হইলে সবাই বিশেষ আনন্দিত হন।

ভাগবত-পাঠ : গত আষাঢ় মাসে সপ্তাহে ৪দিন—সোমবার হইতে শুক্রবার, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য বেদান্ততীর্থ মহাশয় কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে সন্ধ্যারাত্রিতে একঘণ্টা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রাবণ মাসে পণ্ডিত শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় উক্ত শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রত্যহ শ্রোতাদের সংখ্যা, নরনারী সমেত প্রায় দুই শত হয়।

কথকতা : গতমাস হইতে প্রতি রবিবার সন্ধ্যারাত্রিতে দেড়ঘণ্টাকাল সঙ্গীতাচার্য শ্রীযুত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কথক-শিরোমণি মহাশয় উক্ত মঠে তাঁহার স্বরচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত' হইতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী ধারাবাহিকভাবে কথকতা করিতেছেন। কথকতা হইয়া যাওয়ার পর জিজ্ঞাসুদিগের লইয়া কিছুক্ষণ ধর্ম বিষয়ক আলাপ আলোচনা হইয়া থাকে।

শ্রীরামনামসংকীর্তনাদি : আষাঢ় মাস হইতে প্রতি শনিবার সংগীত-বিশারদ শ্রীধীরেশ্বর চক্রবর্তী মহাশয়ের পরিচালনায় ভক্তবৃন্দ বেলা তিনটায় মঠে শ্রীরামনাম সংকীর্তন যথাবিধানে আরম্ভ করেন। কীর্তনের পর দু-একটী ভক্তিমূলক গানও হয়। এই সব শেষ হইতে সাড়ে চারিটা বাজিয়া যায়।

বিখ্যাত বংশীবাদক শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ শীল ও সম্প্রদায় কর্তৃক আষাঢ় মাসের কয়েক শনিবার সন্ধ্যারাত্রিতে মঠে গীতবাদ্য হয়। কুমারী পূরবী মুখোপাধ্যায় তার সিতার পরিচালনায় গত ২৮শে আষাঢ় শনিবার সুমধুর কণ্ঠে কয়েকটী ভজনগান ও কীর্তন গাহিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষ আনন্দ দিয়াছিলেন।

বিশেষপূজা : ৯ শ্রাবণ, ১৩৬৪ (ডাঃ ৩ শ্রাবণ), ইং ২৫ জুলাই, ১৯৫৭, বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর জন্মতিথি ; ২৫ শ্রাবণ, ১৩৬৪ (ডাঃ ১৯ শ্রাবণ), ইং ১০ আগষ্ট, ১৯৫৭, শনিবার পূর্ণিমা শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজীর জন্মতিথি ; আর, ৮ ভাদ্র, ১৩৬৪ (ডাঃ ২ ভাদ্র) ইং ২৪শে আগষ্ট, ১৯৫৭, শনিবার কৃষ্ণাচতুর্দশী শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর জন্মতিথি। এই তিন মহাপুরুষ, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের লীলাপার্ষদ ও অন্তরঙ্গ শিষ্য। তাঁহাদের জন্মতিথি-দিবসে মঠে বিশেষ পূজাদি হইবে।

ভুল সংশোধন :—গত আষাঢ় সংখ্যার ২১৮ পৃষ্ঠার ২য় কলমে 'লোকসমাজ-দেহ যতদিন ততদিন' স্থলে 'লোকসমাজ-দেহ যতদিন অক্ষত ছিল ততদিন' হইবে।

বিশ্ববাণী

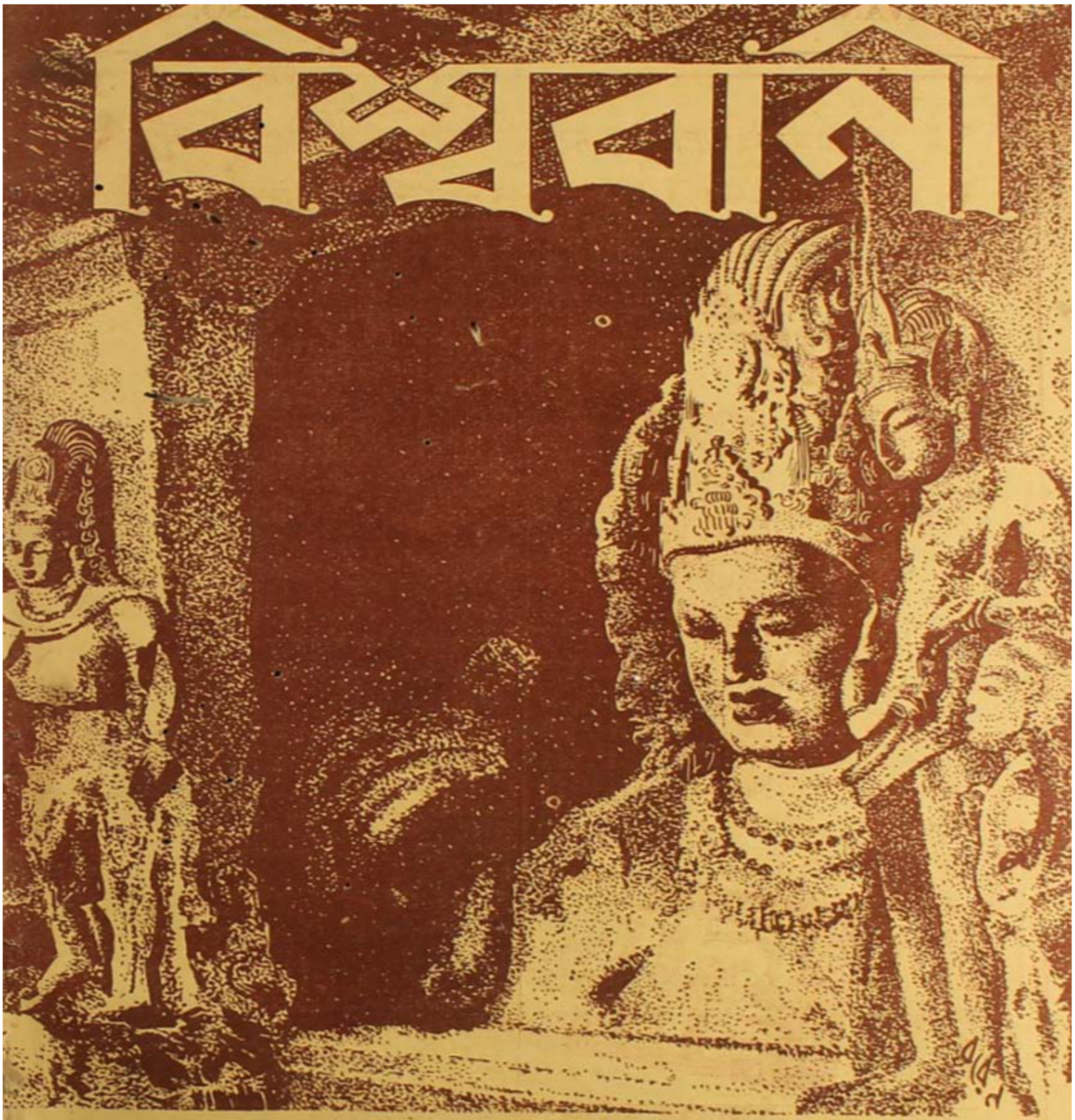

প্রতিষ্ঠাতাঃ স্বামী অভেদানন্দ

১৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৩৬৪

বার্ষিক মূল্য ৪।০ আনা

প্রতি সংখ্যা ।০ আনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট; কলিকাতা-৬

ফোন : ৫৫—১৮০৫

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ প্রকাশিত কয়েকটী গ্রন্থ

BY SWAMI ABHEDANANDA :

Mystery of Death	Rs. 8/8
Life Beyond Death	6/8
India and Her People	6/8
True Psychology	6/-
Science of Psychic Phenomena	4/-
Doctrine of Karma	3/-
Lectures in India	3/o
Songs Divine	2/-
Ideal of Education	1/-
Reincarnation	2/-
How to be a Yogi	4/-
Philosophy and Religion	6/8
Divine Heritage of Man	4/-
Sayings of Ramakrishna	3/-
Attitude of Vedanta Towards Religion	6/8
Vivekananda and His work	1/-
Human Affection & Divine Love	1/8
Spiritual Unfoldment	2/-
Path of Realization	4/
Self-knowledge	8/-
Philosophy of Panchadasi	1/-
Religion of the 20th Century	As. 12
Christian Science and Vedanta	,, 12
Woman's Place in Hindu Religion	,, 12
Memoirs of Ramakrishna	7/8
Great Saviours of the world Vols I & II	(In the Press)
Mystic Tales of Lama Taranatha	(2nd Edition)—Just Out

At Six Annas each

Why a Hindu accepts Christ and Rejects Churchianity : Why a Hindu is a Vegetarian : Unity and Harmony : Word and Cross in Ancient India.

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

মরণের পারে	৫/
কাশ্মীর ও তিব্বতে	৫/
ভারতীয় সংস্কৃতি	৪/
মনের বিচিত্র রূপ (২য় সংস্করণ)	২৷৷০
হিমালয়ে (৩য় সংস্করণ)	২৷৷০
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম	২৷৷০
যোগশিক্ষা (২য় সংস্করণ)	২/
আত্মজ্ঞান (৪র্থ সংস্করণ)	২/
পুনর্জন্মবাদ	২/
কর্মবিজ্ঞান	২/
স্তোত্ররত্নাকর (৪র্থ সংস্করণ)	২/
পত্র সংকলন	১/
স্বামী বিবেকানন্দ	৷৷০
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম (৪র্থ সংস্করণ)	১/
আত্মবিকাশ (৩য় সংস্করণ)	১/
অভিভাষণ	৷৷০
প্রতীক ও তাহার অর্থ	৷৷০
অর্চনা	৷৷০

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

তীর্থরেণু	৩৷৷০
শ্রীদুর্গা	৩৷৷০
রাগ ও রূপ	৮/
সঙ্গীত ও সংস্কৃতি—১ম ও ২য় খণ্ড প্রত্যেকটী	৭৷৷০
অদ্বৈতানন্দ দর্শন	৮/
রামকৃষ্ণ-চন্দ্রিকা	২/
বাঙ্গালা ধ্রুপদমালা	১৸০

স্বামী বেদানন্দ প্রণীত

বাঙ্গলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২/

নূতন বই

সারদামণি

জয়ন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

মায়ের অপূর্ব জীবনী, ভাব ও ভাষা চমৎকার !

"There is an ardour which cannot fail to touch."

—Hindusthan Standard.

বিশ্ববাণী—ভাদ্র, ১৩৬৪

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	রামের ইচ্ছা। (শ্রীরামকৃষ্ণবাণী)		২৮১
২।	শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা	স্বামী অভেদানন্দ	২৮২
৩।	ব্যাকুলতা ও প্রেম	বিদেহ	২৮৭
৪।	উৎকণ্ঠিত আত্মা দানবের (কবিতা)	শ্রীগৌরাঙ্গ দত্ত	২৮৯
৫।	ভাগ্য-দর্শন	শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ	২৯০
৬।	হে ঈশ্বর কথা কও (কবিতা) ...	শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়	২৯৫
৭।	গীতা-দর্শন ...	শ্রীসুদর্শন চক্রবর্তী	২৯৬
৮।	ভাবনার বিষে কারা উদাসীন ? (কবিতা)	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	২৯৭
৯।	সুখ ও দুঃখ ...	শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়	২৯৮
১০।	স্বামী বিবেকানন্দ (কবিতা)	শ্রীহৈমনাথ মুখোপাধ্যায়	৩০১
১১।	কালীপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রীমীরা মিত্র ...	৩০২

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১২।	বিত্তের উপর কর	শ্রীশ্যামাপ্রসাদ আচার্য	৩০৪
১৩।	সাধুসঙ্গ ও শান্তি	শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন চন্দ্র	৩০৭
১৪।	একটী ভাববার কথা	শ্রীবালকরাম ভট্টাচার্য	৩০৯
১৫।	সে যে চিরন্তনীর ছন্দরে (কবিতা) ...	অবধূত সত্যব্রত	৩১০
১৬।	দক্ষিণেশ্বর স্মরণে	শ্রীবিধুভূষণ শূর ...	৩১১
১৭।	সিদ্ধ মহাপুরুষ বালকরাম বাবাজী	শ্রীবিজয়গোপাল বসু ...	৩১৩
১৮।	ভারতের তীর্থদর্শনে	শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩১৬
১৯।	তেষ্টা (কবিতা)	অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর	৩১৮
২০।	গ্রন্থ-সমালোচনা		৩১৯
২১।	সংঘ-বার্তা ...	...	৩২০

অগস্ত্যকল্পধ্বজ

যকৃতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণায় পরিণত নির্দিষ্ট মাত্রায়
ট্যাবলেট আকারে সংহত

সক্রিয় ষড়্‌গুণ মকরধ্বজ

চরক-বিশ্লেষণের ফলে ইহার স্নেহশক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি
পাইয়াছে সেইজন্য ইহা সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য।

প্রতি শিশিতে ১৪ ট্যাবলেট (৭ পূর্ণমাত্রা) থাকে

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

শুভবিবাহে কালের উপযোগী আধুনিক
রুচিসম্মত প্রাচ্যের অপূর্ব
সুসম্পন্ন নবকল্পিত
সৌন্দর্য্যমণ্ডিত

বেনারসী
তসর, গরদ, মটকা,
সিল্ক, টিস্, শাড়ী

জহরলাল
পান্নালাল

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা
শাখা বেনারস, অমৃতসহর

বিশ্ববাণী

স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের মুখপত্র ॥

পৃথিবীর নানাদেশের ধর্মমত, দার্শনিক মতবাদ, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, জাতিবিজ্ঞান, সঙ্গীতকলা, চিত্রশিল্প, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনা ও আবিষ্কার, সাহিত্য-সমালোচনা, দেশবিদেশের ধর্মগুরু ও মহাপুরুষদের জীবনচরিত, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাময়িকপ্রসঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের সুলিখিত প্রবন্ধ প্রত্যেক মাসে ইহাতে প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া সুপাঠ্য কবিতা বা গান প্রতি সংখ্যায় থাকে।

শারদীয়া সংখ্যা

গত বৎসরের ন্যায় এবৎসরও (১৩৬৪) বিশ্ববাণীর শারদীয়া (আশ্বিন) সংখ্যা বিশেষ পরিবর্ধিত আকারে মহালয়ার পূর্বে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহাতে নানা বিষয়ক সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি এবং কবিতাবলী থাকিবে। বিশ্ববাণীর যে সব গ্রাহক ১৯শ বর্ষের বিশ্ববাণীর মূল্য বাকী রাখেন নাই, বিশ্ববাণীর এই আশ্বিন সংখ্যা তাঁহাদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হইবে।

যাঁহারা বিশ্ববাণীর গ্রাহক নন তাঁহারা ভাদ্র মাসের ১৫ দিনের মধ্যে দেড় টাকা বিশ্ববাণী আফিসে জমা দিলে ইহা পাইবেন। গ্রাহকগণকে এই সংখ্যার জন্য অতিরিক্ত কোন মূল্য দিতে হইবে না।

কার্যাধ্যক্ষ, বিশ্ববাণী

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মাসিক বিশ্ববাণী পত্রিকার নিয়মাবলী

১। 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে। বৎসরের যে কোন সময়ে আপনি বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক গ্রাহক হইতে পারেন।

২। ফাল্গুন ১৩৬৫, বিশ্ববাণীর ১৯শ বর্ষ আরম্ভ। ইহার বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা চারি আনা, প্রতি সংখ্যা আট আনা। ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ—এই ছয় মাসেরই জন্য গ্রাহক হইতে হইলে সডাক দুই টাকা চারি আনা এবং ভাদ্র হইতে মাঘ—কেবল এই কয় মাসেরই জন্য গ্রাহক হইলে সডাক তিন টাকা লাগিবে। গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া মূল্য অগ্রিম পাঠাইবেন।

৩। মনিঅর্ডার যোগে টাকা পাঠাইবার সময় কুপনে আপনার নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন এবং গ্রাহক নম্বর থাকিলে তাহা উল্লেখ করিবেন।

৪। কোন গ্রাহকের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্তিত হইলে তিনি স্থানীয় ডাকঘরে তাহা নির্দেশ দিবেন; বেশীদিনের জন্য হইলে পূর্ববর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে বিশ্ববাণী অফিসে উহা জানাইবেন।

৫। কোনও মাসের বিশ্ববাণী সেই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে না পাইলে সে সংবাদ সেই মাসের ২০ তারিখ হইতে পরের মাসের তিন তারিখের মধ্যে বিশ্ববাণী অফিসে আসা চাই। নচেৎ ঐ পত্রিকা সরবরাহ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে।

৬। 'বিশ্ববাণী'-র জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইবার কালে রচয়িতার নাম-ঠিকানা যেন তাহাতে বেশ স্পষ্টাক্ষরে সন্নিবেশিত থাকে। 'বিশ্ববাণী'তে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হয়। প্রবন্ধাদি হারাইয়া যাইলে বা কোন প্রকারে নষ্ট হইলে আমরা দায়ী থাকি না। প্রবন্ধ ফুলস্কেপ চার পাতা এবং কবিতা আধ পাতার মধ্যে রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনও লেখা প্রকাশিত করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপেক্ষ। ইহার জন্য সম্পাদক কোনও কৈফিৎ দিতে বাধ্য নহেন।

৭। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। সাধারণতঃ ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৮। কাহারও কোন বিষয় জানিতে হইলে (গ্রাহক হইলে, গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া) সর্বদা রিপ্লাই কার্ডে অথবা ডাক-টিকিট সমেত পূর্ণ নাম-ঠিকানা পাঠাইতে হইবে। অন্যথায় উত্তর দেওয়া হয় না।

৯। বিশ্ববাণীতে প্রকাশের জন্য সর্বপ্রকার বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। পত্রদ্বারা অথবা বিজ্ঞাপন-দাতাকে স্বয়ং বিশ্ববাণীর কার্যাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত বিষয় জানিতে হয়। প্রতি বাংলা মাসের ২০ তারিখের মধ্যেই পরবর্তী মাসে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয়। বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

১০। পাকিস্তান হইতে যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা নিবারণ চন্দ্র দত্ত, রূপ এণ্ড আম্‌ব্রেলা মার্চেন্ট, টেরিবাজার, চট্টগ্রাম, এই ঠিকানায় চার টাকা চার আনা পাঠাইয়া আমাদিগকে পত্রদ্বারা জানাইলে আমরা তাঁহাদিগের নিকট 'বিশ্ববাণী' পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব।

কার্যাধ্যক্ষ—'বিশ্ববাণী' ১৩বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ঊনবিংশতি বর্ষ | ভাদ্র—১৩৬৪ | সপ্তম সংখ্যা

॥ রামের ইচ্ছা ॥

"আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী। তিনি যেমন করান, তেমনি করি। যেমন বলান, তেমনি বলি।

"প্রসাদ বলে ভবসাগরে, বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা।
জোয়ার এলে উজিয়ে যাবো, ভাঁটিয়ে যাব ভাঁটার বেলা'॥

"ঝড়ের এঁটো পাতা কখনও উড়ে ভাল যায়গায় গিয়ে পড়ল,—কখনও বা ঝড়ে নর্দ্দমায় গিয়ে পড়ল—ঝড় যেদিকে লয়ে যায়!

"ডাকাতি বল্লে,—রামের ইচ্ছায় ডাকাতি হলো, রামের ইচ্ছায় আমাকে পুলিসে ধরলো—আবার রামের ইচ্ছায় ছেড়ে দিলে।

"হনুমান বলেছিল—হে রাম, শরণাগত, শরণাগত;—এই আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়। আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই!

"কোলা ব্যাঙ মুমূর্ষু অবস্থায় বল্লে,—রাম, যখন সাপে ধরে তখন 'রাম রক্ষা কর' বলে চীৎকার করি। কিন্তু এখন রামের ধনুক বিঁধে মরে যাচ্ছি, তাই চুপ করে আছি।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা

স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষের যিশু। ভারতবাসীর কাছে তিনি মানবজাতির অন্যতম পরিত্রাতা। তাঁর উপদেশাবলী বিশ্ববিশ্রুত ভগবদ্গীতা নামে প্রচারিত। যাঁরা এই দিব্য-ললিত কাব্যখানি পাঠ করেছেন তাঁরা এই মহান আচার্যের জ্ঞানের পরিধি দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছেন। স্বভাবতঃই তাঁরা জানতে অভিলাষী—কে এই শ্রীকৃষ্ণ? তিনি কোন্ যুগে ছিলেন? তাঁর কর্মজীবনই বা কিরূপ ছিল? প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ এবং খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক বা পাদ্রীগণ প্রায়শঃই তাঁর জীবন এবং শিক্ষাকে তুলনা করে থাকেন যিশুখৃষ্টের সঙ্গে। তাঁদের কেউ কেউ শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করেন। কেউ কেউ আবার এমনও প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন প্রাচীন ভারতের কল্পিত পৌরাণিক দেবতা। বাস্তবে তাঁর কোন অস্তিত্ব ছিল না। আবার, কৃষ্ণ ও যিশুর জীবনের মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখে অনেকে এমন সিদ্ধান্তেও পৌঁছেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও বাণী যিশুর অনুকরণে পরিকল্পিত। তাঁরা মনে করেন, খৃষ্টান পাদ্রীদের ভারতাভিযানের আগে পর্যন্ত হিন্দুদের 'কৃষ্ণ-ধর্মের' অস্তিত্বই ছিল না। খৃষ্টান ধর্মের সঙ্গে এমন নিকট সাদৃশ্যসম্পন্ন একটি ধর্ম ভারতবর্ষে দেখতে পেয়ে কোন কোন যিশু-শিষ্য এত বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁরা কল্পনা করলেন, তাঁদের প্রভুর আবির্ভাব সূচিত হচ্ছে এ কথা আগেই জানতে পেরে শয়তান তখনই তাঁর ধর্মের অনুরূপ একটি ধর্মের সূত্রপাত করে' রেখে গেছে।

কিন্তু ঈশ্বরের অবতার তথা মানবজাতির পরিত্রাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অতুলনীয় চরিত্র ও অলৌকিক শক্তি হিন্দুদের হৃদয়ের বেদীমূলে প্রেম, নিষ্ঠা ও ভক্তির পবিত্র হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করে' তুলেছিল। খৃষ্টান পণ্ডিত ও পাদ্রীদের এইসব আজগুবি ব্যাখ্যান তাকে বিন্দুমাত্র প্রশমিত করতে পারে নি।

পশ্চিম থেকে ধর্মোন্মত্ততার পাশব অভিযান বারবার ভারতবর্ষের উপর দিয়ে প্রবল বাত্যার বেগে প্রবাহিত হয়েছে। তার ফলে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে; দেশবাসী বহু যুগ ধরে' যে সব গৌরবোজ্জ্বল আধ্যাত্মিক মঠ-মন্দির কীর্তিস্তম্ভসমূহ সৃষ্টি করেছিল, সে সবও বিধ্বস্ত বা অবলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু অভিযাত্রীদের সমস্ত ক্ষমতা ও বিধ্বংসী শক্তিকে তুচ্ছ করে' আজও হিমালয়ের মত অটল-অনড় হ'য়ে যুগের পর যুগ দাঁড়িয়ে আছে—পাশ্চাত্য শ্রীকৃষ্ণের অভূতপূর্ব আদর্শ, তাঁর আধ্যাত্মিক রাজ্য। ধর্মোন্মাদ মুসলমানেরা এক হাতে তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান, অন্য হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে, হিন্দুদের অন্তরে তারা আতঙ্ক ও হাহাকার সৃষ্টি করেছে, শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরাদি ধ্বংস করেছে, সারা দেশে লুটেপুটে বেড়িয়েছে, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে নিরপরাধ পুরোহিত এবং সাধুসন্তদের হত্যা করেছে, শুধুমাত্র তাদের আসুরিক শক্তিবলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ধর্মান্তরিত করেছে; কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপরিসীম শক্তি কালের ভ্রূকুটি ব্যর্থ করে' আজও বেঁচে আছে। আজও হিন্দু জনসাধারণের হৃদয়ে তিনি অধিরাজ। অনন্ত অনাগত ভবিষ্যত কালেও তাঁর আসন অবিচল থেকে যাবে।

খৃষ্টধর্ম প্রচারকগণ ইংরেজী ভাষাভাষী জাতি-সমূহের সম্পদ-প্রাচুর্যের সুযোগ নিয়ে অর্থাৎ অজস্র অর্থ ব্যয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, শ্রীকৃষ্ণের বেদীতে তাদের আদর্শ যিশুকে প্রতিষ্ঠা করতে। শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগীদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতেও তাদের চেষ্টার

অন্ত নেই। কিন্তু আমরা জানি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে অবিনাশী ঐশী শক্তির মহাপ্রকাশ ছিলেন, তা এইসব মর-মানবের অযথা ও মিথ্যা প্রয়াসকে নিশ্চয়ই ব্যর্থ করবে।

সুবিশাল ভারত সাম্রাজ্যের সর্বত্র হিন্দু সমাজের প্রায় সবার মুখে শ্রীকৃষ্ণের নাম। হিন্দু জনসাধারণ সারাদিনমান—নিদ্রায়-জাগরণে, ঐশ্বর্যে-দৈন্যে, কর্মে-বিরামে, দুঃখদুর্দশার মুহূর্তে, উৎসবে, জাতীয় পর্বাদিতে পরম শ্রদ্ধায় তাঁর পবিত্র নামগান করে' থাকেন। ভারতের অশিক্ষিত জনসাধারণ যে সব জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত গেয়ে থাকেন, তার বিষয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, মথুরাবৃন্দের রাখাল রাজের অপরূপ অলৌকিক জীবন-কাহিনী। জয়ে কিম্বা পরাজয়ে, বিবাহোৎসবে কিম্বা শেষ কৃত্যে, জন্মদিনে কিম্বা মৃত্যুকালে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁদের অন্তরের গভীরতম ভক্তি, প্রেম ও শ্রদ্ধাসহকারে উচ্চারণ করে থাকেন শ্রীকৃষ্ণের নাম। এক কথায়, এ জগতে ভালমন্দ বা অন্য কিছু যা-ই সংঘটিত হোক না কেন, তাঁরা তার সঙ্গে যুক্ত করে থাকেন শ্রীকৃষ্ণের নাম। এর কারণ, বিগত তিন হাজার বৎসর ধরে প্রিয়তম প্রভু তথা সর্বমানবের মুক্তিদাতা রূপে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জাতির হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আছেন।

খৃষ্টানদের কাছে যিশুর যেমন, হিন্দুদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের জীবনও ঠিক তেমনই ঐতিহাসিক ঘটনা। এটা সর্বজনবিদিত যে, সংক্ষিপ্ত সুসমাচার কয়টিতে যিশুর জীবন সম্পর্কে যে সব কাহিনী আমরা পাঠ করে থাকি, আজ পর্যন্ত কেউ তার প্রতিটি ঘটনার সত্যতাকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। এমন কি,—অপর পক্ষে ইয়োরোপ-আমেরিকার অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত ও লেখা সমালোচক যিশুর ঐতিহাসিক অস্তিত্বকে অনেকবার সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে' দিয়েছেন। অবশ্য তাঁদের মতামতকে মোটেই আমল না দিয়ে অধিকাংশ খৃষ্টান বিশ্বাস করেন যে, যিশু ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন। তাঁরা ভক্তিসহকারে তাঁর ভজনা করেন এবং মৃত্যুর পর তাঁর মাধ্যমেই স্বর্গ লাভের প্রত্যাশা রাখেন। হিন্দুদের খৃষ্ট স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কেও অনুরূপ কথাই বলা চলে। ভারতবর্ষেও এমন অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন; কেউ কেউ তাঁকে কোন পৌরাণিক দেবতা বলে আখ্যা দিয়েছেন, আবার কেউ কেউ তাঁর বাল্যজীবন সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণাদিও উপস্থিত করেছেন। হিন্দু জনসাধারণ অবশ্য এ জাতীয় সমালোচনাকে মোটেই গ্রাহ্য করেন না। পরন্তু তাঁদের বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণ মহানায়করূপে কোন কালে নিশ্চিত ভাবে তাঁদের পূর্বপুরুষের মধ্যে জীবন কাটিয়ে গেছেন, এবং এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণের মহাবির্ভাবের সঠিক সময় নির্দেশ আমরা করতে পারি বা না পারি—এটা নিশ্চিত যে, খৃষ্টজন্মের শত শত বৎসর আগেও ভারতবর্ষে তাঁর নাম অজ্ঞাত ছিল না। দ্বিতীয় শত সহস্র বৎসর অতীতে শ্রীকৃষ্ণ ভারতীয় জনসাধারণের কাছে শুধু যে পরিচিত ছিলেন কিম্বা তাঁদের কাছে ভক্তি, ভালবাসা ও পূজা পেয়েছেন তাই নয়, বিশাল ভারতের অগণিত জনসাধারণের কাছে তিনি তখনই ঈশ্বরের অবতার তথা মানব জাতির পরিত্রাতারূপে গৃহীত হয়েছেন। এ সম্বন্ধে আমরা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পেতে পারি সেলুকাস প্রেরিত বিখ্যাত গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে। তিনি খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ভারতের বিখ্যাত বৌদ্ধ সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় ছিলেন।

মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন খৃষ্টপূর্ব ৩৩৩ থেকে ২২৭ অব্দের মধ্যে। তারপর তাঁর সেনাপতি সেলুকাস নিকাতোর তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে সিন্ধু ও ইউফ্রেতিস নদীর মধ্যবর্তী সমুদয় ভূভাগের শাসন অধিকার লাভ করেন। তিনিই তদানীন্তন ভারতসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায়

মেগাস্থিনিসকে তাঁর দূতরূপে প্রেরণ করেন। এ সমস্তই ইতিহাসের ঘটনা। মেগাস্থিনিস বেশ কয়েক বৎসর ভারতে ছিলেন এবং সে সময়কার অভিজ্ঞতার কথা তিনি কিছু কিছু লিখেও রেখে গেছেন। গ্রীক ঐতিহাসিক এরিয়ান সেগুলো সযত্নে রক্ষা করে' আমাদের দিয়ে গেছেন। তিনি অন্যান্য আরো বহু বিষয়ের মতো তাঁর বিবরণে লিখেছেন :

ভারতীয় হিরাকেল যিনি—তিনি বলবীর্যে, সব মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি বিশ্ব জগৎকে পাপরাশি থেকে মুক্ত করেছেন এবং বহু নগরের প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর তিরোভাবের পর নানা স্বর্গীয় সম্মানে তাঁকে বিভূষিত করা হয়।

ভারতীয় 'সুরসেনা' নামক একটি জাতি কর্তৃক এই হিরাকেল বিশেষভাবে পূজিত হ'য়ে থাকেন। তাদের রাজ্যে মথুরা এবং ক্লিসোবারা নামে দুইটি বিশাল নগরী আছে। এবং এ দুটির মধ্য দিয়েই জোহারেস (যমুনা) নামক একটি নাব্য নদী প্রবাহিত। (১)

কারও কারও মতে এই ক্লিসোবারা বা ক্রাইসোবারা হচ্ছে কালিশপুর।(২) কিন্তু ঐতিহাসিক মিনির মতে এটা হচ্ছে কৃষ্ণপুর বা কৃষ্ণের নগরী। সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত আধুনিক দ্বারকাই এই কৃষ্ণপুর। টলেমি মথুরাকে 'দেবগণের নগর' বলে' উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক লাসেন'এর মতে এই ভারতীয় হিরাকেলটি হচ্ছেন—শ্রীকৃষ্ণ। অপরপক্ষে অধ্যাপক উইলসন এবং অন্যান্য প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদগণ মনে করেন, গ্রীক লেখকেরা যে হিরাকেলের কথা উল্লেখ করেছেন, নিঃসন্দেহেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভাই বলরাম।

ভারতের হারকিউলিসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে' ক্যাপ্টেন্ উইলফোর্ড লিখেছেন :

সিসিরোর মতে ভারতীয় হারকিউলিসকে বলা হ'য়ে থাকে 'বিলাস্'। তিনি কৃষ্ণের ভাই 'বল'র অনুরূপ। মথুরায় উভয়েই যুগ্মভাবে পূজিত হ'য়ে থাকেন। বাস্তবিক তাঁরা উভয়েই বিষ্ণুর অবতার-রূপে গণ্য হ'য়ে থাকেন। 'বল'কে একজন লাঙলধারী অমিত শক্তিধররূপে কল্পনা করা হয়ে থাকে। তাঁকে বলরামও বলা হ'য়ে থাকে। যেহেতু 'বল' হরি (৩) বা বিষ্ণু থেকে উদ্ভূত, সেইহেতু তিনি নিশ্চয়ই হেরি-কুলা বা হেরিকুলাস্ তথা হারকিউলিস। (৪) এরিয়ান্ বলেন যে, মহাবীর আলেকজাণ্ডার সুরসেনা বা শ্রীকৃষ্ণের বংশধরদিগের দ্বারা শাসিত নগরাদি ও অন্যান্য রাজ্য দেখেছিলেন। এরিয়ান ও স্ট্রাবো উভয়েই জোর দিয়ে বলেছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অদ্যাপি যেখানে পূজিত হ'য়ে থাকেন, প্রাচীন কালেও সেই যমুনা তীরবর্তী মথুরায় পূজিত হতেন। তাঁরা আরও বলেছেন, এই দেবতার সম্পর্কিত প্রতীক ও গুণাবলী পাশ্চাত্য পৌরাণিক কাহিনীরও (Mythology) অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে গেছে।(৫)

এই সমস্ত ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে বোঝা যায়—বৈদেশ খৃষ্টধর্ম-প্রচারকের এই বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণের জীবনী ও শিক্ষা যিশুর জীবনকেই ভিত্তি করে' গড়ে' উঠেছে, তারা কত ভ্রান্ত! অধিকন্তু এই প্রমাণই পাওয়া যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যিশুর শত শত বৎসরের অগ্রবর্তী। মহামতি আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণ কালেও শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাবলী

(১) E. J. Chinnock লিখিত "Arrian's Anabasis of Alexander and Indica" গ্রন্থের অনুবাদ, পৃষ্ঠা—৪০৮

(২) Higgins' Anacalypsis-এর প্রথম খণ্ডের ৩২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) হেরি (Heri) সংস্কৃত হরি শব্দের অপভ্রংশ। এর অর্থ, পরিত্রাতা যুল (Cula) শব্দের অর্থ, পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা উভয় পুরুষ। সুতরাং হারকিউলিস্ অর্থ, যিনি পরিত্রাতা হরির সন্তান বা বংশধর। বিশিষ্টদের মতে এই শব্দটি গ্রীক কিংবা লাতিন নয়। ইহার মূল বর্বরীয়। Anacalypsis-এর প্রথম খণ্ডের ৩২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪) Asiatic Res., প্রথম খণ্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা।

(৫) Monumental christianityতে উদ্ধৃত।

পৃঃ ১৪১, ১৪২

লিখিত শাস্ত্রভুক্ত হয়েছিল। এ বিষয়ে প্রাচ্য সংস্কৃত ভাষার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পুরোধা স্যার উইলিয়ম জোন্স কয়েক বছর ভারতে বাস করার পর যা বলেছেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন :

কৃষ্ণের নাম ও তাঁর মোটামুটি জীবনেতিহাস আমাদের ত্রাণকর্তার বহু আগেও—সম্ভবতঃ হোমারের কালে (৯০০ খৃঃ পূর্বাব্দে) নিশ্চিতভাবে ভারতবর্ষে জ্ঞাত ছিল। (৬)

বিগত শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজ পণ্ডিত ও পুরাতত্ত্ববিদ্ স্যার গডফ্রে হিগিন্স্ যথাসাধ্য তত্ত্বানুসন্ধান ও গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাম্র+দস্তা (Brazon) যুগের শেষের দিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন : শ্রীকৃষ্ণ এক অনন্যসাধারণ এবং ধারণাতীত নিষ্ঠার জীবন যাপন করে গেছেন। অত্যাচারী কংসের কাছে তাঁর জন্মকে গোপন রাখা হয়েছিল। কারণ, পূর্বেই এক অশরীরী ভবিষ্যদ্বাণী কংসকে জানিয়েছিল যে, ঐ সময়ে এবং ঐ বংশে এমন একজন জন্ম-গ্রহণ করবেন, যিনি তাকে অর্থাৎ তার আসুরিক শক্তিকে ধ্বংস করবেন। (৭)

পণ্ডিতপ্রবর হিগিন্স্ আরো বলেছেন :

যে মন্দিরসমূহ খৃষ্টীয় যুগারম্ভের বহু পূর্বে নির্মিত বলে' সকলেই নিঃসন্দেহ, ভারতের তেমন সব সুপ্রাচীন মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ বা খোদাই করা মূর্তি বা কারুকার্যাদি আর ঐরূপ প্রাচীনকালে রচিত গ্রন্থাদি সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করে যে, শ্রীকৃষ্ণের ইতিহাস খৃষ্টের বহু বহু পূর্ববর্তী। (৮)

শ্রীকৃষ্ণের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিকে খণ্ডন করে, তিনি আরো লিখেছেন : যেখানে কদাপি কোন খৃষ্টান পদার্পণই করেন নি সেখানেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্তি, তৎসম্পর্কিত মন্দির ও শাস্ত্রগ্রন্থাদি দেখতে পাওয়া যায়। (ক) ব্রাহ্মণগণই কৃষ্ণের কাহিনী রচনা করে' তা' তাঁদের অন্যান্য কুসংস্কারের সঙ্গে লেজুড়ের মত জুড়ে দিয়েছেন, (খ) কৃষ্ণকে তাঁদের অদ্ভুত ত্রিত্বে (যা প্রাচীন পারস্য বা গ্রেটের প্রকৃত ত্রিত্ব, এক প্রধান স্থান দিয়েছেন, (গ) বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের প্রথম অধ্যায়ের তাৎপর্য বিষয়ে আধুনিক খৃষ্টানদের যে ধর্মমূলক সিদ্ধান্ত তার সঙ্গে তাঁকে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন, (ঘ) নিরপরাধীদের উপর গোঁড়ামি-প্রসূত ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর কাহিনীকে মিশিয়ে দিয়েছেন—এবং (ঙ) এই সমস্তকে এক প্রাচীন ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাসরূপে এমন লক্ষ লক্ষ লোকের দ্বারা গ্রহণ করিয়েছেন, যারা ভালভাবেই জানত যে এসব সম্পূর্ণ নূতন, যা' তা'রা আগে কস্মিনকালে শোনেনি,—ইত্যাদি অনুমান করা কি একান্তই অসম্ভব কথা নয়? (৯)

ক্যাপ্টেন উইলফোর্ড তাঁর 'ক্রনলজি অব দি হিন্দুস্' (Chronology of the Hindus) নামক গ্রন্থে সম্রাট যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক কৃষ্ণ ও পরাশরের সময় নির্ধারণ করেছেন—১২৮০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ। অপরপক্ষে জ্যোতির্বিদ ডেভিস এবং কোলব্রুকের মতে তাঁরা খৃঃ পূঃ ১৯০১ অব্দে বর্তমান ছিলেন। 'হিন্দু এষ্ট্রনমি'র (Hindu Astronomy) প্রণেতা মিঃ ভন্সিট্, ব্রেনার্ড বলেন :

ইতঃপূর্বে যেমন উক্ত হয়েছে, এটা সর্ববাদী-সম্মত যে যুধিষ্ঠির, গর্গ এবং পরাশর খৃঃ পূঃ দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ শতকের কোন সময়ে ছিলেন। (১০)

তদুপরি, বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী এলিফ্যান্টার গুহায় অতি প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য নিদর্শনে একটি মূর্তি রয়েছে—, খৃষ্টানদের বাইবেল-বর্ণিত

(৬) Asiatic Researches, প্রথম খণ্ড, ২৭৩ পৃষ্ঠা।

(৭) Asiatic Researches, প্রথম খণ্ড, ২৭৩ পৃষ্ঠা।

(৮) Anacalypsis, প্রথম খণ্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা।

(৯) Ibid, ৩৩৭ পৃষ্ঠা।

(১০) Hindu Astronomy, ১১৯ পৃষ্ঠা।

'হিরোডের' মত সেট, চতুর্দিকে নিহত শিশুর মধ্যে উন্মুক্ত তরবারী হস্তে দণ্ডায়মান কংসের এক ভয়ঙ্কর মূর্তি। খৃষ্টান পাদ্রীদের উর্বর বা উদ্ভাবনপটু বুদ্ধিতেও এর কোন সদুত্তর নেই।

এসব বিবরণ থেকে শুধু এ কথাই প্রমাণিত হয় না যে, শ্রীকৃষ্ণ যিশুখৃষ্টের শত শত বৎসর পূর্ববর্তী ছিলেন, অধিকন্তু তাঁর রহস্যময় জন্মকাহিনী, অত্যাচারী কংস রাজার কবল হইতে তাঁর পলায়ন, সেই দুর্বৃত্ত রাজা কর্তৃক বহু শিশুহত্যা এবং এই পরিত্রাতার দিব্য জীবনের অন্যান্য প্রধান ঘটনাগুলোরও সত্যতার সমর্থন পাওয়া যায়।

গোঁড়া হিন্দুদের বিশ্বাস, তিনি দ্বাপরযুগে বা তাম্রযুগের শেষভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং যেদিন তিনি স্বর্গারোহণ করেন, সেদিন থেকেই কলিযুগ বা লৌহযুগের সূচনা হয়। এই ধারণা তথা লোকপরম্পরালব্ধ বিশ্বাস অনুযায়ী মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই খৃষ্টপূর্ব ৩০৯১ অব্দে ছিলেন।

কিন্তু বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ হিন্দু পণ্ডিতগণ শ্রীকৃষ্ণ তথা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাল স্থির করেছেন খৃষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দ।(১১)

যদিও ঋগ্বেদের সূক্তসমূহে বারবার শ্রীকৃষ্ণের নামোল্লেখ পাওয়া যায়,—যেমন প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সংখ্যক সূক্তের ২৩তম শ্লোকে এবং ১১৭ সূক্তের ৭ম শ্লোকে, তবুও প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদগণ শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় এবং তিনি দেবকী ও বসুদেবের সন্তান কিনা তা নির্ণয় করতে সক্ষম হননি। ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি শ্লোকে আমরা দেবকীনন্দন কৃষ্ণের নাম পাই। আবার শ্রীকৃষ্ণ ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্তের ঋষি বা দ্রষ্টা;—যেমন ৪র্থ-৮ম মণ্ডল, ৮৫-৮৭ এবং ১০ম মণ্ডল, ৪২-৪৪ সূক্ত। ঐ থেকে আমরা জানতে পারি, মহর্ষি ব্যাস, যিনি বেদকে চার খণ্ডে ভাগ করেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সমসাময়িক ছিলেন।

পানিনি (খৃঃ পূঃ ১১ শতক) তাঁর বিশ্ববিশ্রুত সংস্কৃত ব্যাকরণে যুধিষ্ঠির, অর্জুন এবং বসুদেব পুত্র বাসুদেবের নাম উল্লেখ করেছেন। বাসুদেব — শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম।

পতঞ্জলীর মহাভাষ্য বা পানিনির ব্যাকরণের উপর তৎকৃত বিরাট টিকাপুস্তকটির রচনাকাল অন্ততঃ পক্ষে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক। তাতেও এমন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে, যা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, তাঁর জীবদ্দশায় কৃষ্ণ ও কংসের কাহিনী ভারতবর্ষে প্রচলিত ও জনপ্রিয় ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ তখন দেবতারূপে পূজিত হতেন।

বোম্বাইয়ের অধ্যাপক ভাণ্ডারকর পতঞ্জলীর মহাভাষ্যের শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহের কথা উল্লেখ করেছেন :

(১) প্রথমতঃ, কংসরাজের মৃত্যু এবং বলির বশ্যতা স্বীকারের কাহিনী পতঞ্জলীর সময়ে প্রচলিত ও লোকপ্রিয় ছিল।

(২) দ্বিতীয়তঃ, উক্ত কাহিনীতে শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেবকে কংসের নিধনকারীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) তৃতীয়তঃ, বর্তমানে যেমন হিন্দুদের রঙ্গমঞ্চে পৌরাণিক কাহিনী অভিনীত হয়ে থাকে, ঠিক তেমনই শ্রীকৃষ্ণের জীবন-কাহিনীও তখনকার দিনে নাটকের অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল।

(৪) চতুর্থতঃ পতঞ্জলীর সময়েও জনসাধারণের

---

(১১) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'কৃষ্ণচরিত্র' ২২, ও ৪৩—৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক সম্রাট যুধিষ্ঠির মহান বৌদ্ধসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের ১১১৫ বৎসরের পূর্ববর্তী। চন্দ্রগুপ্ত এক যুদ্ধে মহামতি আলেকজাণ্ডারের উত্তরাধিকারী সেলুকাস নিকাতোরকে পরাজিত করে' ও গ্রীকদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করে' খৃঃ পূঃ ৩১৫ অব্দে তিনি ভারতের রাজচক্রবর্তীর গৌরব লাভ করেন। তিনি সেলুকাসের কন্যার পাণিগ্রহণও করেছিলেন। সুতরাং হিসাবমতো বলা যেতে পারে —যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল ৩১৫+১১১৫=১৪৩০ খৃঃ পূর্বাব্দ।

ধারণা ছিল—কৃষ্ণের হাতে কংস রাজের মৃত্যু সুপ্রাচীন কালের ঘটনা।(১২)

ভারতে খৃষ্টান পাদ্রীদের উপস্থিত হবার বহু আগেই শ্রীকৃষ্ণ যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য দেবতা বলে গণ্য হতেন, সে-সম্বন্ধে আরো একটি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় ভিতারী স্তম্ভের উৎকীর্ণ লেখা থেকে। উক্ত স্তম্ভটি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে স্থাপিত। ডাঃ ভন্সিউ, এইচ, মিল পুনর্লিখনাকার এর পাঠোদ্ধার করে অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনুবাদে আছে :

যিনি তাঁর শত্রুদের বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত করার পর অদ্যাপি শ্রীকৃষ্ণের মত তাঁর মা দেবকীর অনুগত, সুবর্ণ রশ্মি উদ্ভাসিত তিনি আমার এই শিলকৃতি রক্ষা করুন।(১৩)

জার্মান পুরাতত্ত্ববিৎ লাসেন এইরূপে এর সংশোধন করেছেন : সুবর্ণরশ্মিমণ্ডিত, শত্রুহন্তা কৃষ্ণ যিনি দেবকীকে শ্রদ্ধা করেন, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক।(১৪)

শ্রীকৃষ্ণ যে একজন ঐতিহাসিক পুরুষ, আর তিনি যিশুর শত শত বৎসরের পূর্বতন—এ কথা পাঠকদের হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে উল্লিখিত প্রমাণ-সমূহই যথেষ্ট মনে করি।*

ব্যাকুলতা ও প্রেম

বিদেহ

ব্যাকুলতা যখন জাগে তখন এ জগতের কোন কিছুই ভাল লাগে না। মন কেবল গুমরে গুমরে কেঁদে বলে কেন এখানে এলাম? কি আমার উদ্দেশ্য; এমনি করেই কি দিনগুলি আমার বৃথা কেটে যাবে?

জাগতিক সব বিষয়ে মনে শান্তি হলে, বস্তুগত অভাব কতকটা মিটলে তবেই প্রকৃত ব্যাকুলতা জাগে। কোন অভাব নেই তবু মন অস্থির। তখন পুত্রশোকাতুরা মায়ের মত সব সময় মনটা ব্যথায় ভরে থাকে।

যে তাঁকে চায় সে কখনো মনের বাজে খরচ করে না। গল্প, রঙ্গরস করে সময় নষ্ট করে না। ব্যাধিতে যেমন শরীরের শক্তি ক্ষয় হয়, মনের শক্তি ক্ষয় হয় এই সব বিক্ষিপ্ততায়। ব্যাকুলতা জাগে না এই কারণেই। সর্বদা মৃত্যু স্মরণ থাকলে, যেতে হবে এইটে মনে থাকলে আর সময় নষ্ট করা যায় না, ব্যাকুলতা আপনি জাগে।

জীবনে কাঁদতে সবারই হয়, দুঃখ এক সময় না এক সময় আসবেই। কাঁদতেই যদি হয় তবে ভগবানের জন্য কাঁদাই ভাল। তাঁর দর্শন পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে পারলে জীবন ধন্য হয়ে যায়। ব্যথার ভিতর দিয়েই প্রকৃত শান্তি আসে।

এক অবস্থা আছে, হলে ভাল হয়, আর একটা আছে না হলেই চলে না। এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। সংসারে অনেকের পক্ষে এই অন্তর্জীবন

---

(১২) Indian Antiquary. বোম্বাই, তৃতীয় খণ্ড (১৮৭৪), ১৬ পৃষ্ঠা।

(১৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, জানুয়ারী—১৮৩৭, পৃষ্ঠা ১—১৭।

(১৪) Indische Alterthum kunde, II ১৮৫৪, পৃঃ ১১০৮।

*পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজের "Great Saviors of the World" পুস্তক হইতে অনূদিত।

বা সাধন-ভজন হলে ভাল হয়, কিন্তু না হলেই যখন চলে না তখনই জাগে ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতা জাগলে তাঁর স্পর্শ প্রাণে প্রাণে পাওয়া যায়। অবতার বা কোন ত্যাগী সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করলে কখনো কখনো চকিতের মতো এই দুঃখ মনে জাগবেই যে, দিনটা বৃথা গেল, কিছুই করা হল না। এই হল ব্যাকুলতা।

ধ্যান ধারণা করে সেই রাজ্যের আলো একটু পেলে তবেই চলা ঠিক হয়। একবার আস্বাদ পেলে আবার তা পাবার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ব্যাকুলতাই হল আসল, নতুবা জপতপের বিশেষ মূল্য নেই। হিংসা, দ্বেষ, অভিমান প্রভৃতি প্রবল থাকলে ব্যাকুলতা জাগে না। এ সব মনকে টেনে নীচে নামিয়ে রাখে। যখন বাহিরের এই বাস্তব খাওয়া পরার জীবনটা দুর্বিষহ হয় তখন কোন রকমে এ জীবনটা কাটিয়ে অন্তর্জীবনের দিকে মানুষ ব্যাকুল হয়ে ছোটে।

মহাপুরুষদের সাথে সাধারণের পার্থক্য এই যে, তাঁদের জীবনে থাকে একটা তীব্র পিপাসা, আমাদের তা থাকে না। এই ব্যাকুলতারূপ পিপাসায় তারা লক্ষ্যের দিকে উন্মাদ হয়ে ছোটে। অন্তরের পিপাসা যখন জাগে তখন দুঃখ হয় তার চিরসাথী। অন্তরের ভাবের সাথে বাইরের জগৎটা একেবারেই মেলে না, তাই পদে পদে দুঃখ। তখন 'নিজ ঘরে পরবাসী' অবস্থা হয়। অন্তরের আহ্বান, ভাবের বাঁশী যদি কাণে যায়, তবে আর স্থির হয়ে থাকা সম্ভব হয় না, এই ব্যাকুলতা জাগানোই হল গুরুর কাজ, পিপাসা যেন থেমে না যায় সেইটে লক্ষ্য রাখতে হয়।

ব্যাকুলতা জাগলে বিশ্বাস, ভক্তি লাভের জন্যই প্রাণ ব্যাকুল হয়—বিচার বুদ্ধি যুক্ত এ সব কিছুই তখন ভাল লাগে না। বিচারবুদ্ধি মানুষকে কিছুই দিতে পারে না। পথে চলতে বাধা কিছু এলে সেখিয়ে দিতে পারে, আলোর কাজ করে এই পর্যন্ত। বস্তু লাভ করতে হলে ব্যাকুলতা ও বিশ্বাস ভক্তিই আসল পাথেয়। এই পাথেয় সাহায্যেই সাধক পরম ইপ্সিত বস্তু ভগবৎপ্রেম লাভ করে। যম ত্যাগ তপস্যা সংযমের ফল হল এক বিন্দু প্রেম। প্রেম হলে আর কিছুর প্রয়োজন থাকে না। ভক্তিশাস্ত্রে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস প্রভৃতির সাধন আছে, প্রেম হলে কিন্তু শ্রদ্ধা আপনি হয়—তার জন্য চেষ্টা করতে হয় না। প্রকৃত প্রেম অগ্নিশিখার মত জ্বলতে থাকে, আর নেভে না।

ফুলের মধ্যে যেমন মধুটুকুই আসল জিনিষ, তেমনি মানুষের প্রেমটুকুই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যে একত্ব থেকে মানুষ এসেছে বিচ্ছিন্ন হয়ে, সেই একত্বে ফিরে যাবার জন্য যে ব্যাকুলতা, যে ব্যথা তাতেই প্রেমের প্রকাশ। প্রেম না হলে জীবনের সব দিক থাকে ঘুমন্ত, চলার গতিও বিধি-নিষেধের চাপে হয় গতানুগতিক। সংসারে এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও মানুষ সময় সময় আনন্দের আভাষ পায়, হৃদয়ে প্রেম আছে বোলে। প্রকৃত ভালবাসা হলে সমস্ত দুঃখ দৈন্য প্রশান্তি রূপান্তরিত হয়ে যায়। যেখানে ছিল কাঁটা, সেখানে ফোটে গোলাপ।

যে প্রকৃত প্রেমিক সে দুঃখ ব্যথা গ্রাহ্য করে না। তার কোন বাসনা কামনা থাকে না। যে অবস্থায় থাকে তাতেই আনন্দ। সর্বাবস্থায় পূর্ণ। প্রেমিক কখনো ভিখারী হয় না। সে নিজের আনন্দে নিজে ভরপুর থাকে। বীরত্ব না থাকলে ভালবাসা হয় না। প্রেমে মিলনেও আনন্দ, বিরহেও আনন্দ। যেখানে আনন্দ, যেখানে শান্তি সেখানেই প্রেম।

একজন রাজরাণীর যদি একমাত্র ছেলে মারা যায়, তখনও সে রাণীর সাজে মণিমুক্তায় সজ্জিত থাকে, উপাদেয় খাদ্যও তাকে দেওয়া হয় কিন্তু তার পক্ষে সে সব বিলাসদ্রব্যের তখন কিছুই মূল্য নেই। মণিমুক্তা ও ধূলামাটি তখন তার সেই গভীর ব্যথার কাছে সমান হয়ে যায়, প্রেমিকের মন যখন ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয় তখন বাহিরের সব জিনিষের দর তার কাছে সমান হয়ে যায়। তাঁর দিকে টান না হলে সামান্য জিনিষের আসক্তিতেই মানুষ আটকা পড়ে।

প্রেম চায় ভালবাসতে জ্ঞান চায় জানতে। প্রেম হলে জ্ঞান থাকবেই। এক সত্তাই সৎ চিৎ আনন্দরূপে প্রকাশিত, এই আনন্দই হল প্রেম।

প্রেমের পথে একমাত্র পণ হল স্বার্থপরতা। নিঃস্বার্থ প্রেম, শুষ্কজ্ঞান ও নিষ্কাম কর্ম—এই তিনটিতেই আমিত্বকে, স্বার্থকে ভুলতে হয়। ভালবাসলে তা ছড়িয়ে পড়ে, একস্থানে আবদ্ধ থাকে না। সীমাবন্ধন ভেঙে গেলেই প্রেমের পথে পূর্ণতা আসে। গোপীরা কৃষ্ণকে হারিয়ে জগন্ময় কৃষ্ণ-দর্শন করেছিল।

যেখানে প্রেম সেখানে কখনো ঘৃণা থাকতে পারে না। যে ভালবাসে সে কাউকে ঘৃণা করতে, কারো প্রতি নিষ্ঠুর হতে পারে না। এই দুটো একসাথে থাকলে সেখানে প্রেম নেই বুঝতে হবে। অন্যের সুখে সুখী হওয়া হল ভালবাসার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। দুঃখে দুঃখী হওয়া খুব বড় কথা নয়, কিন্তু সুখে আনন্দ অনুভব করতে খুব কম লোকই পারে।

সাধন ভজনের উদ্দেশ্য হল প্রেমলাভ করা। প্রেম না জাগলে পূজা ধ্যান সবই বৃথা। চিত্তের বৃত্তিগুলিকে একমুখী করবার উপায় কোন একটা আদর্শকে ভালবাসা। কঠোর তপস্যায় যা লাভ করা যায় না, কোন মহাপুরুষকে ঠিক ঠিক ভালবাসলে তা অনায়াসেই লাভ হয়। কারণ, সেই মহাপুরুষের ত্যাগ তপস্যার ফল সব তার জীবনে এসে পড়ে, ভালবাসার এমনি রহস্য।

প্রেমই হল সমস্ত সৃষ্টির মূলে। একটি গল্প আছে : এক সাহেব তার কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে, হঠাৎ তার সামনে একটা পাখীর বাচ্চা এসে পড়লো, কুকুরটা হা করে তাকে খেতে যাবামাত্র কোথা থেকে বাচ্চাটার মা এসে কুকুরটার মুখের ভিতর ঢুকে গেল। সন্তানকে বাঁচাবার জন্য মা নিজের প্রাণটা অকাতরে দিতে প্রস্তুত। সাহেব তখন লাঠি দিয়ে কুকুরকে মেরে বাচ্চার মাকেও রক্ষা করল, কিন্তু পক্ষীমাতার ভিতর ভালবাসার অদ্ভুত প্রকাশ দেখে চমৎকৃত হল।

ভালবাসাই ভগবান, তিনি যখন তাঁরে প্রেমরূপে আমাদের হৃদয়ে আসেন, তখনই আমরা তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হই।

শুদ্ধ হোক আত্মা দানবের

শ্রীগৌরাঙ্গ দত্ত

বিংশ শতাব্দীর সূর্য কেঁপে ওঠে কালের কারায়,
উপোসী ধরার বুকে নিপীড়িত সমাতন মন,
এখনো হয়নি ধ্বংস বলদর্পী সে ভস্মলোচন,
আজো মত্ত দুঃশাসন মন্ত্রণার অক্ষ চালনায়।

রাজা নেবে, মান নেবে, পঞ্চালীর নেবে গাত্রবাস
দুষ্কৃতকারীর দোষে বনে যাবে পাণ্ডবেরা সব
হস্তিনাপুরের বুকে ত্রিমি ত্রিমি মদন-উৎসব
চলিবে কি, ভীম মনে মর্মদাহ, বুকে দীর্ঘশ্বাস ?

এদেরি নিগ্রহে পড়ে' বারংবার লাঞ্ছিত জীবন ;
ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্ট, রক্ত দেছে প্রেমের ঠাকুর
করেছে নয়নে জল উদ্বেলিত হৃদয় সিন্ধুর
বিচার হয়নি তার, প্রাণে তাই উতলা ইমন।

বিংশ শতাব্দীর সূর্য প্রাণ চায় ভক্ত প্রহ্লাদের,
উদার আকাশ চায় জীবনের আশাবরী সুর,
পাঞ্চজন্য চায় না সে, চায় শুধু প্রীতির নূপুর,
পৃথিবীর বুকে আজ শুদ্ধ হোক আত্মা দানবের।

ন্যায়-দর্শন

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, বি. এল., বিদ্যা-বিনোদ

মহর্ষি গোতম প্রবর্তিত ন্যায়দর্শন বহুজনবিদিত। গোতম মুনি ন্যায়দর্শন বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যানে সূক্ষ্ম-দর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। বিচারবোধ ও তত্ত্বানুসন্ধানে তাঁহার কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। উত্তরকালে নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সুস্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বিচারে ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি অনুধাবনে ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা নহেন, নির্মাণ-কর্তা।

নৈয়ায়িক সুধীবৃন্দ বৈশেষিক পণ্ডিতদের মত পরমাণুবাদ স্বীকার করিতেন। বিশেষ পদার্থ ব্যতীত অপরাপর সমুদয় পদার্থ ইহারা গ্রহণ করিয়াছেন। মৃত্তিকাদি চারিটি জড় পদার্থের পরমাণু এবং অবশিষ্ট সমুদয় দ্রব্য-পদার্থই নিত্য-বস্তু বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস। এখানে বলা প্রয়োজন মহর্ষি গোতমের আর একটি নাম অক্ষপাদ ; এই হেতু এই দর্শনের ভিন্ন নাম অক্ষপাদ-দর্শন। গোতম-দর্শন নামে কিন্তু ইহা অধিকতর প্রচলিত এবং সমাদৃত।

যেমন স্থপতিগণ ইষ্টকাদি দ্বারা গৃহ-নির্মাণ করে, ঈশ্বর সেইরূপ মৃত্তিকাদি জড় পদার্থের পরমাণু লইয়া বিশ্বরচনা করিয়াছেন। "এই বিশ্ব মাঝে যেখানে যা সাজে, তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।" তবে তিনি শরীরাতীত, অতএব শারীরিক বোধ-বিরহিত, দেহাত্মিকা অনুভূতি তাঁহার নাই, মানব-দেহ তাঁহার নাই, মনুষ্যাদির ন্যায় শরীর নাই বলিয়া দৈহিক গুণও তিরোহিত, অতএব তিনি সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষের বোধশক্তি বিবর্জিত। প্রাণীসমূহের ন্যায় তাঁহার বাসনার উৎপত্তি ও লয় নাই, জীবের ন্যায় অনুক্ষণ বা ক্ষণে ক্ষণে বাসনার উদ্ভব তাঁহাতে থাকিতে পারে না। ইচ্ছার পরিতৃপ্তি এবং ভঙ্গ তাঁহার নিকট কল্পনাতীত অর্থাৎ তাঁহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। তবে তাঁহার জ্ঞান ও ইচ্ছা সকলই নিত্য, পরমেশ্বরের স্বরূপাদিও নিত্য বিষয়ীভূত। যাহা জানিবার ও ইচ্ছা করিবার, ঈশ্বর একেবারেই তাহা সমস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ঐগুলির সকলই নিত্য বলিয়া উহারা অপরিবর্তনীয় জ্ঞান করিতে হইবে, বুঝিতে হইবে।

ষোড়শ অঙ্গ

ন্যায়শাস্ত্র প্রকৃতপক্ষে তর্কশাস্ত্র। এই দর্শনে সর্বতোভাবে যুক্তি দ্বারা সমস্তই সমর্থিত হইয়াছে। যুক্তিতর্ক প্রভৃতি দ্বারা বিচারপ্রণালী বিশেষভাবে ইহাতে বিবেচিত দেখা যায়, ইহার লক্ষণ সূক্ষ্ম বুদ্ধি, গভীর বিশ্লেষণ-বোধ নিবিড় তর্কজাল। ইহার উদ্দেশ্য বিচারের সূক্ষ্মতা অবলম্বন করিয়া সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সেই হেতু বলা যায়, বিচার-প্রণালী প্রদর্শনই প্রকৃত উদ্দেশ্য ন্যায়-দর্শনের, তাহার অবলম্বন কূটাগ্রবুদ্ধি সন্দেহ নাই। বিচারের প্রমাণ, প্রমেয়, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ষোড়শ অঙ্গ প্রচলিত, এই-গুলির সাহায্যে সত্যে উপনীত হইতে হইবে, বিচার অভ্রান্ত, যুক্তি অকাট্য করিয়া তুলিতে হইবে। এই ষোড়শ অঙ্গ পূর্ণ বিচারের সহায়ক এবং ষোলটি পদার্থ নামে কথিত।

এইগুলি অঙ্গ বা অবয়ব, ইহাদের সাহায্যে বিচার-ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে, সত্য আবিষ্কার করিতে হইবে, উদ্দেশ্য মহৎ, সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা সত্য নির্ণয় অভ্রান্ত হইবে আশা করা যায়। নানা দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে ইহাতে কিঞ্চিৎ অটিলতার আভাস, আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হইলেও ইহাতে অপূর্ব বীর্যশক্তির বিকাশ ও তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় আজ্জ্বল্য-মান। নানা বিষয়ে ইহা উচ্চ-রুচি ও সূক্ষ্মধীর বুদ্ধির প্রকাশ প্রমাণ করিতেছে। যাহা দ্বারা কোন বিষয়

নির্ণীত হয়, তাহাকে প্রমাণ বলা যায়। যেমন, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রমাণের বিশিষ্ট উপকরণ—প্রত্যক্ষ ও অনুমান।

অনুমান

অনুমান-খণ্ড ন্যায়-দর্শনের বিশিষ্টাংশ বলিতে পারা যায়। কার্য দেখিয়া কারণ নিরূপণের নামই অনুমান; বিচার-প্রণালীতে ইহার প্রাধান্য যথেষ্ট। ইহা পূর্বে বুঝান হইয়াছে, বিচার-পদ্ধতি কেবল তর্ক-সমৃদ্ধ নহে, ইহা বোধ-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ। সূক্ষ্ম বিচারশক্তি অবলম্বনে ইহা পরিপুষ্ট, ইহা সত্য-নির্ণয়ের প্রশস্ত মার্গ। কুত্রাপি ধূম দৃষ্ট হইলে, তথায় অগ্নি বিদ্যমান আছে এই সত্যের আশ্রয় গ্রহণ স্বাভাবিক, সহজসিদ্ধ, ইহা অনুমানসাপেক্ষ। যাহা সত্য নিরূপণের প্রকৃষ্ট পন্থা। ধূমের কারণস্বরূপ অগ্নির অস্তিত্ব স্বীকার ন্যায়-দর্শনের বিজয়কেতু। ঐ ক্ষেত্রে অগ্নির বিদ্যমানতা স্বীকৃতি বা অস্তিত্বে নিশ্চয়তা সিদ্ধান্ত যে সমীচীন, তাহা সহজবোধ্য ও সত্যালোকে উদ্ভাসিত।

অনুমান ন্যায়দর্শনে পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত। এই পঞ্চ শ্রেণী বা পঞ্চাঙ্গের নাম পঞ্চ অবয়ব। যেমন—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। এই অবয়ব কয়টির সাহায্যে বিচারকার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রতিজ্ঞা—সূচিত করে ইহা দ্বারা—পর্বতে অগ্নি আছে।

হেতু—ইহার কারণ—পর্বত হইতে ধূম নির্গত হইতেছে। যেহেতু ধূম দেখা যাইতেছে তখনই বুঝিতে হইবে অগ্নির উপস্থিতি বিদ্যমান। অপরভাবে সিদ্ধান্ত করা যায় এইমত—পর্বতে অগ্নি আছে ইহা স্থির—কেননা, ধূম নির্গত হইতেছে।

উদাহরণ—যেখানে ধূম থাকে, তাহা অগ্নি-বিশিষ্ট, দৃষ্টান্তস্বরূপ রন্ধনশালা ধরা যায়। অগ্নি বিনা ধূম আসিবে কোথা হইতে? যেথা অগ্নি, সেথায়ই ধূম দেখা যায়।

উপনয়—এই পর্বত হইতে ধূম নির্গত হইতেছে।

নিগমন—অতএব এই পর্বতে অগ্নি আছে।

এইভাবে অনুমান-প্রণালী দ্বারা সত্যে প্রতিষ্ঠিত স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ন্যায়-দর্শনের আদর্শ।

গ্রীসদেশে ন্যায়-দর্শন প্রবর্তক কিন্তু মহামতি আরিষ্টটল। তাঁহার বিচার-পদ্ধতি বা তর্কপ্রণালীতে গৌতম মুনির বিধান সদৃশ প্রথম অবয়ব দুইটি অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা ও হেতুর অবিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হয়। অপরগুলি সমতুল্য।

ইহাও বিবেচ্য, ন্যায়-দর্শনে কার্য-কারণের বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন—ধূম ব্যাপ্য, অগ্নি ব্যাপক। অগ্নি ধূমের ব্যাপক। কোনও স্থলে ধূম থাকিলেই অগ্নি থাকিবে, কোথাও ইহার ব্যভিচার নাই। ইহাতে অগ্নির ব্যাপকতা গুণ প্রতিপন্ন হইতেছে। ধূম কিন্তু ব্যাপ্য নামে অভিহিত। ইহা ভিন্ন আরও দুইটি পারিভাষিক শব্দ ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে; যেমন উল্লিখিত দৃষ্টান্তে অগ্নি 'সাধ্য' ও ধূম 'সাধনে'র আখ্যায় বিবেচিত।

মুমুক্ষু বা মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিবৃন্দের এবং জন-সাধারণের পূর্বোক্ত ষোড়শ পদার্থের বিষয় সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য। কারণ, শরীর যে আত্মা নহে, তাহা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে জানিতে পারা তখন সহজ হইয়া উঠিবে, এবং মুক্তিলাভও ঘটিবে। ন্যায়-দর্শনও বৈশেষিক-দর্শনের ন্যায় বলিয়াছেন "তত্ত্ব-জ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইলে নিঃশ্রেয়স বা পরম কল্যাণ লাভ হয়, মুক্তিলাভ ঘটে।

ন্যায়-সূত্র

ন্যায়বিচারে ও তত্ত্বানুসন্ধানে যে তর্কজাল বিস্তার করা প্রয়োজন, তাহা বুঝা যায়। সত্য-নিরূপণ ও ধর্ম সংস্থাপন দর্শনশাস্ত্র মাত্রেরই উদ্দেশ্য, ন্যায়-দর্শনে যে ন্যায়সূত্রগুলি গঠিত হইয়াছে তাহাও সুবিবেচনার ফল। ন্যায়সূত্রের প্রথম অধ্যায়ে সূচিত হইয়াছে। "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ" (১।৭) অর্থাৎ বেদাদি আপ্ত ব্যক্তির উপদেশকে শব্দ বলে। প্রমাণ দ্বারা আমরা জ্ঞান সঞ্চয়ের সময়ে নিশ্চিত সত্য বা সম্যক এবং

প্রকৃত জ্ঞান আহরণ করিয়া থাকি। প্রমাণ দ্বারা এই প্রকার অর্জিত জ্ঞান প্রমেয় নামে কথিত। আত্মা, দুঃখ, মুক্তি প্রভৃতি এই পর্যায়ভুক্ত। ন্যায়-শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার প্রমেয়ের বিচার আছে। ন্যায়-সূত্রের প্রারম্ভিক আলোচনায় নবম সূত্রে উল্লিখিত আছে দ্বাদশটি প্রমেয়ের কথা। এইগুলি বিবিধ প্রকার। যেমন—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-বিষয়, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ, অপবর্গ। যার যার মরণোৎপত্তি প্রেত্যভাব নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

আরও একটি বিষয় ন্যায়দর্শনে বিবেচনাযোগ্য। সিদ্ধান্ত নিরূপণ ন্যায়শাস্ত্রের গন্তব্য স্থান; এই কাম্য স্থানে উপস্থিত হইতে গেলে প্রয়োজন সূক্ষ্ম-মেধা। ইহা ভিন্ন অনিশ্চিত বিষয় বা বস্তুকে নিশ্চয় করাকে সিদ্ধান্ত বলা হয় এবং অপর তেরটি বিচারের অঙ্গ আখ্যাত হইয়াছে। সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, বাদ-বিতণ্ডা, ছল প্রভৃতি বিচার পদ্ধতির অংশীভূত। প্রশ্নাবলী সাহায্যে যে নিহিত রহস্য উদ্ঘাটিত হয় তাহা সহজেই দৃষ্ট হয়, ইহা দ্বারা গোপন করিবার চেষ্টা ব্যাহত হইয়া থাকে।

ন্যায়শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ বুঝাইয়াছেন, আত্মা শব্দটি জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয় প্রতিপাদক। ঈশ্বর সর্ববিধ কারণ উক্ত হইলেও একটি সূত্রে মনুষ্যকৃত কর্মকেও কারণ বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে, ইহা হইতে বোধ হয় কৃতকর্মের ফল নির্দিষ্ট হইতেছে। কর্মফল হিন্দুশাস্ত্রের বহুস্থানে লক্ষিত হইবে। কর্মফল আখ্যান মহাভারত এবং পুরাণাদিতে বিবৃত হইয়াছে। কর্মফলে জন্মগ্রহণ, সুকৃতি প্রভৃতি ব্যক্ত হইতে দেখা যায়। হিন্দুশাস্ত্র বিবিধ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন কর্মফলহেতু বিবিধ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। বৌদ্ধ-শাস্ত্রের সহিত হিন্দুশাস্ত্রের বিবিধ মিলন পরিদৃষ্ট হইবে। বৈশেষিক ন্যায়দর্শনাদির সহিত বৌদ্ধ-দর্শনের সৌসাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। উভয় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী অনেক ক্ষেত্রে সমতুল্য, যেমন উভয় মতে জন্মগ্রহণ-নিবৃত্তি মুক্তির উপায়। কর্মফলে জন্মগ্রহণ ও নানাবিধ যোনি ভ্রমণ অবশ্যম্ভাবী; জন্মগ্রহণ দুঃখ-ভোগের অনিবার্য হেতু বা দুঃখভোগ জন্মগ্রহণের অনিবার্য ফল। জীবমাত্রেই নিজ নিজ কর্ম অনুসারে নানা প্রকার নরক ভোগ করে' পশু পায়, কিংবা সুখ-সমৃদ্ধ জীবলোকে গিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ন্যায়সূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে পরিলক্ষিত হয় যে, তত্ত্বজ্ঞানের উদ্ভবে মুক্তিলাভ, তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ। শরীর যে আত্মা নহে, এইরূপ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞানরূপে ন্যায়দর্শনে বিদিত। এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে পূর্বপক্ষ বলেন, ঈশ্বর কারণ, কেননা মনুষ্যকৃত কর্ম সর্বদা সফল হইতে দেখা যায় না। সিদ্ধান্ত হইয়াছে এইরূপ: না, তা নহে, মনুষ্যকৃত কর্ম ব্যতিরেকে ফল উৎপত্তি সম্ভব হয় না। আরও উক্ত হইয়াছে একটি বিশেষ মত যে শরীর দোষের আকর, দেহ ধারণ করিলে মানব পাপ কার্যে লিপ্ত হয়, দোষাকর দেহাদির তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ দেহাদি যে আত্মা নয় এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞান দ্বারা অহঙ্কার নিবৃত্ত হয়। "দোষনিমিত্তানাম্ তত্ত্বজ্ঞানাৎ অহঙ্কার নিবৃত্তিঃ" (৪।৬৮) এস্থলে বলা প্রয়োজন, তত্ত্বজ্ঞানই যে মুক্তির কারণ তাহা ন্যায়দর্শনের অভিমত। বৌদ্ধমত অনুসারে মুক্তিলাভই নির্বাণ প্রাপ্তি, হিন্দুশাস্ত্র এ বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন মুক্তি, মোক্ষ, অপবর্গ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা। এ সম্পর্কে নিঃশ্রেয়স্ ও নির্বাণ শব্দও হিন্দুশাস্ত্রে নিহিত আছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আরও দৃষ্ট হইবে "দেহাদি হইতে ভিন্ন জীবাত্মার সাক্ষাৎকারই বিবেক"। সমাধিবিশেষ অভ্যাস দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উদ্ভব হয়, সমাধি সাধনার্থ যম-নিয়মাদি যোগানুষ্ঠান কর্তব্য, যোগসাধন ও আত্মসাক্ষাৎকার ঘটনার্থক বাক্য দ্বারা মুক্তিলাভের ক্ষমতা জন্মায় তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে।

ন্যায়দর্শন একপক্ষে বেদ স্বীকার করেন, ঈশ্বর মানিয়াছেন, অপর পক্ষে মুক্তি-প্রবাহ প্রবাহিত

করিয়াছেন, তর্কজাল সৃষ্টি করিয়াছেন। তত্ত্বানুসন্ধানের রীতি, যুক্তি বা তর্কপ্রণালী শিক্ষা দেওয়াই প্রকৃত পক্ষে ইহার মূল উদ্দেশ্য—এ কারণ মনে হয় পূর্ব-কথিত "ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্মফলদর্শনাৎ" (ন্যায়সূত্র ৪।১৯) শাস্ত্র বুঝাইবার কালে পূর্বপক্ষ কথিত ঈদৃশ উক্তির পর যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে—"ন, পুরুষকর্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ" (ন্যায়সূত্র ৪ অধ্যায় ২০ সূত্র) না, তা নয়। মনুষ্যকৃত কর্ম ব্যতিরেকে ফলোৎপত্তি হয় না।—এই সকলগুলি দৃষ্টান্তস্বরূপ পদ্ধতি বুঝাইতে রচিত। বেদ ও বেদান্ত ঈশ্বর-কেন্দ্রিক তত্ত্ব ও দর্শন আলোচনা করিয়াছেন বৌদ্ধ ও চার্বাক দর্শন অপরদিকে চরমপন্থী নিরীশ্বরবাদ প্রকাশ করেন। কণাদ ঋষি ও গোতম মুনিকে সেজন্য অনেকে তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যপন্থী বলিয়াছেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়াছেন বাঙলায় "ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডীদাস গাহিল গান।" ন্যায়দর্শন আলোচনায় বঙ্গদেশ গভীর পাণ্ডিত্য ও নিবিড় মনীষার পরিচয় দিয়াছে। একসময়ে গৌতমদর্শন ও সহোদরপ্রতিম বৈশেষিক দর্শন বঙ্গদেশে সুবিশেষ আলোচিত হইয়াছিল। এই দুই শাস্ত্রের অনুশীলন ও ক্রমিক উন্নতি দেখা গিয়াছিল শিক্ষা-সংস্কৃতি-কেন্দ্র নবদ্বীপে। সুপণ্ডিত মথুরানাথ তর্কবাগীশ তাঁহার চিন্তামণি টীকা রচনা দ্বারা স্বনামধন্য রঘুনাথ শিরোমণি চিন্তামণি-দীধিতি এবং তাহার সহযোগি-স্বরূপ গদাধর জগদীশ, কৃষ্ণদাস, ভবানন্দ প্রভৃতি প্রণীত দীধিতি টীকা ইত্যাদি নানাবিধ মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা নবদ্বীপের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। প্রজ্ঞাভাজন গঙ্গেশ উপাধ্যায়কৃত চিন্তামণি বহুজন সমাদৃত, ইহার ভাষ্য প্রণয়ন করেন পূর্ব-কথিত মথুরানাথ তর্কবাগীশ তাঁহার চিন্তামণি টীকায়, ইহা প্রজ্ঞামুখর। জয়দেব মিশ্র ঐ চিন্তামণির আলোক নামক টীকা করেন। আরও কয়েকটি ন্যায়দর্শনের ভাষ্য দেখা যায়, যাহা জ্ঞানোদ্দীপ্ত, যেমন সারগ্রাহী ও ফল সংগ্রাহী সুপণ্ডিত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য-কৃত ভাষা-পরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী এবং ন্যায়সূত্র-বৃত্তি।

নবদ্বীপ যে জ্ঞান-সাধনার প্রসিদ্ধ তীর্থ ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নানাদিক হইতে। কাশ্মীর, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, পঞ্জাব হইতে নবদ্বীপের অনন্য-সাধারণ পণ্ডিতগণের নিকট বিদ্যার্থিগণ ও বিদ্বৎজন ন্যায় প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র ও অন্যবিধ জ্ঞান-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপন জন্য নবদ্বীপ সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ন্যায়শাস্ত্রের বহুবিধ মূল্যবান গ্রন্থ প্রণিধানযোগ্য, যেমন কেশব মিশ্রের তর্ক-ভাষা, গোবর্ধন মিশ্রের তর্ক-ভাষা-প্রকাশ, কোণ্ড ভট্ট কৃত পদার্থ-দীপিকা, গোতম-সূত্র ও কণাদ সূত্র ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মূল গ্রন্থ। জ্ঞানগর্ভ এই পুস্তকগুলি দর্শনশাস্ত্র, ব্যাখ্যা, বিচার ও বিবেচনা দ্বারা পরিপুষ্ট ও সমলঙ্কৃত হইয়াছে।

দৃষ্টান্ত-মুক্তাবলী

ন্যায়শাস্ত্রে বহুবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা দর্শননীতি সরল করা হইয়াছে। ইহার বৈশিষ্ট্য জ্ঞানের সাধনা, এইগুলি প্রায়ই অভিজ্ঞতা মূল হইতে চয়ন করা হইয়াছে। উপমা সাহায্যে বক্তব্য বিষয় যে সরল ও উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে তাহা সর্ববাদীসম্মত। এ কারণ সাহায্য লওয়া হইয়াছে বিভিন্ন প্রকার ন্যায়-নীতির। ন্যায়দর্শনের এই সকল প্রসিদ্ধ সুভাষিত যুক্তি এবং দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে প্রধান : অন্ধ গো-লাঙ্গুল ন্যায়, অন্ধ-হস্তীন্যায়, অন্ধ-পঙ্গু ন্যায়, অন্ধ-পরম্পরা ন্যায় প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য প্রযোজ্য। অজ্ঞানতা দূর দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, তাই ন্যায়-দর্শন গ্রহণ করিয়াছে অন্ধলোকের সাদৃশ্য। অন্ধ ব্যক্তির ন্যায় অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত হৃদয়ে কিরূপ ভাবোপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহারই বিচার করা হইয়াছে এই চারিটি দৃষ্টান্ত দ্বারা।

অন্ধ গো-লাঙ্গুল ন্যায় : অন্ধের ন্যায় বিবেচনা না করিয়া দুর্জনগণের কথা শুনিলে পরিশেষে দুরবস্থাপন্ন হইতে হয় এই যুক্তিমূলক দৃষ্টান্ত। দুই বালকের প্রভাবে ভীষণ অরণ্য মধ্যে হতভাগ্য পথহারা অন্ধ

পার্শ্বিক গো-লাঙ্গুল ধারণপূর্বক বিপদবরণ জনিত দুঃখ প্রাপ্তির অবস্থা। কোন বিপদসঙ্কুল অরণ্যে অন্ধ প্রবেশ করিয়া পথহারা হইলে কোন দুষ্ট বালক তাহাকে বিমর্ষ দেখিয়া উদ্ধারের উপায় বলিবার ছলে এক বৃহল্লাঙ্গুল বন্য আনয়নপূর্বক 'সজোরে ধরিয়া থাকিলে গন্তব্য পথ ধরিতে পারিবে' বলিয়া গেলে যদ্রূপ অন্ধ তাহাই করিল। অবিমৃষ্যকারিতার ফলে কষ্ট যন্ত্রের পদাঘাতে, সে কিছুকাল পরে, ক্ষত-বিক্ষত হইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল। অবিবেচনার ফলে নূতন বিপদে পড়িতে হয় এই শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ইহার মর্ম উদ্ভূত। বৈয়াধিক মধুরানাথের ভাষ্যে, "হেত্বাভাবে" ইহার সবিস্তার বর্ণনা দেখা যাইবে।

অন্ধ-হস্তী ন্যায়: একদা কয়েকজন অন্ধ রাজ-প্রাসাদের পশুশালায় আগমনপূর্বক হস্তী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে চাহিল। রাজকর্মচারী তাহাদিগকে হস্তীশালায় আনয়ন করিয়া স্পর্শ দ্বারা জ্ঞান-সঞ্চয় করিতে বলিলেন। তাহার ফলে কেহ পদস্পর্শ করিয়া হস্তী স্তম্ভের মত এই জ্ঞান অর্জন করিল, কেহ কর্ণ স্পর্শ করিয়া উহা কুলার ন্যায় এই জ্ঞান লাভ করিল, কেহ পুচ্ছ স্পর্শ দ্বারা হস্তী রজ্জুর ন্যায় এই মর্ম অনুধাবন করিল। কেহ শুণ্ড স্পর্শ করিলে হস্তী সর্পবৎ এই প্রতীতি জন্মাইল। প্রকাণ্ড শরীরের বিভিন্ন প্রদেশ স্পর্শ দ্বারা অন্ধগণ এককালীন বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন করিয়াছে। বৈয়াধিক ব্যাখ্যা অনুসারে জগতের কারণ সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসক প্রভৃতি নিষ্ণাতগণ এইভাবে বিভিন্নরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। জগতের আদি কারণ দার্শনিকগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্দেশ করিলেও, বাস্তবিক সেই কারণ-গুলির প্রত্যেকটি জগৎ-কারণ বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের অবয়ব সমষ্টির অংশবিশেষ।

অন্ধ-পঙ্গু ন্যায়: যে কার্য দুইজনে পৃথকভাবে নিষ্পন্ন করিয়া সফলকাম হওয়া যায় না, তাহা মিলিত সংযোগে অনায়াসে ও অক্লেশে সম্পন্ন করা যাইতে পারে। এই আদর্শ বুঝাইবার নিমিত্ত অন্ধ-পঙ্গু ন্যায়ের উদ্ভব হইয়াছে। গতিশক্তিহীন খঞ্জকে স্কন্ধে করিয়া দৃষ্টিশক্তিহীন অন্ধ লইয়া যাইতেছিল। গন্তব্য পথের নির্দেশ দিতেছিল চর্মচক্ষু দ্বারা খঞ্জটি অন্ধের স্কন্ধোপরি বসিয়া। ইহা দ্বারা সমবায় শক্তি দেখান হইয়াছে, অক্ষমতাও দূরীভূত হইয়াছে।

অভিজ্ঞতামূলক দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে দেখা যায়, —গড্ডলিকা প্রবাহ ন্যায়, গতানুগতিক ন্যায়, দশম ন্যায়, দণ্ডা পূপ ন্যায় (দুরূহ কার্যের সিদ্ধি দেখিলে সুকর কার্যের সমাধান স্বতঃই অনুমেয়) চালনী ন্যায় (উৎকৃষ্ট-অপকৃষ্ট বিশ্লেষণ) দগ্ধপত্র ন্যায় (দগ্ধ হইলে ভস্মময় পূর্বাকার দ্বারা জ্ঞানমাত্র উৎপাদন করে প্রকৃত পক্ষে যেমন পত্রত্ব থাকে না সেইরূপ।

প্রাকৃতিক গুণমূলক বিবিধ দৃষ্টান্ত হইতে উৎকলিত ন্যায়-গুচ্ছ মধ্যে বীজাঙ্কুর ন্যায়ে দৃষ্ট হইবে বীজ অঙ্কুর সাপেক্ষ, অঙ্কুরও বীজ সাপেক্ষ। অতএব অগ্রে বীজ, না অগ্রে অঙ্কুর তাহা সমাধান করা সুকঠিন। ইহারই অনুরূপ হংস-ডিম্ব ন্যায়। মণ্ডূক-প্লুত ন্যায়, সিংহাবলোকন ন্যায় (সন্নিহিত বস্তু অবলোকন না করিয়া সিংহসম দূরস্থিত বস্তু দর্শন করার ন্যায় অভ্যাস) উষ্ট্র-কণ্টক ভোজন ন্যায় (শমী বৃক্ষের সুকোমল পত্র ভক্ষণ আশায় কণ্টক দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হইলেও দৃক্‌পাত যাহার নাই তদ্রূপ) অর্থাৎ পূর্বে দুঃখভোগ না করিলে, মুহূর্তের জন্যও সুখ লাভ হইবে না, ইহা বেদান্ত ভাষ্যের টীকা।

বকাণ্ড প্রত্যাশা ন্যায়: নদীতীরের মৎস্যাকাঙ্ক্ষী বকগুলি লম্বমান অণ্ডকোষ দুইটি খসিয়া পড়িলে সফরী মৎস্য পাইবে এই প্রত্যাশায় বৃষভের পশ্চাদনুসরণ করে। অনভ্যস্ত দুরূহতর দুরাশায় বশবর্তী হইয়া বৃষ পদাঘাতে বরং নষ্ট হয় তথাপি প্রলুব্ধ হইতে ছাড়ে না। প্রাণীগণ পরমেশ্বরের আরাধনা ত্যাগ করিয়া এতাদৃশ বকাণ্ড-প্রত্যাশারূপ বিষয় প্রলোভনে নষ্ট হইতেছে।

বীচি-তরঙ্গ ন্যায় এবং গঙ্গাস্রোতো ন্যায় প্রভৃতি

প্রাকৃতিক গুণ অবলম্বনে পল্লবিত। বায়ু-সঞ্চালিত জলাভিঘাতে ভিন্ন ভিন্ন সূক্ষ্ম ক্ষণে পর পর উত্তোলিত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অল্প সমুদয় একেক তরঙ্গরূপে দেখা দেয়। সেই প্রকার কোষ্ঠস্থিত বায়ু কণ্ঠ-তালু আদি স্থানাভিঘাতে পৃথক পৃথক ক্ষণে বর্ণসমূদয় উত্তরোত্তর যখন উচ্চারিত হয়, তখন তাহারা একেক নাদরূপে প্রকাশ পায়। একমুখী অবিচ্ছিন্ন স্রোত একটানা চলিলে তাহা গঙ্গা-স্রোতো-ন্যায় নামে অভিহিত। ন্যায়শাস্ত্রকার বীচি-তরঙ্গ ন্যায়ে শব্দোৎপত্তি করিয়াছেন।

খলে কপোত ন্যায়, কাকাক্ষি গোলক ন্যায়, কাকতালীয় ন্যায়, কূর্মাঙ্গ ন্যায় প্রভৃতি প্রকৃতি-পুঞ্জ হইতে সংগৃহীত। কদম্ব-গোলক ন্যায় এই পর্যায়-ভুক্ত সন্দেহ নাই। "ভাষা পরিচ্ছেদ" প্রভৃতিতে ইহার উল্লেখ আছে। কোরক অবস্থায় যেরূপ গোলাকার, সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলেও বর্তুলত্ব অক্ষত থাকে। পুষ্পের আকৃতির সহিত কেশরশ্রেণিও বর্তুলাকারে বর্ধিত হয়।

"কাব্যপ্রকাশ" টীকাদিতে কথিত কর-কঙ্কণ ন্যায় প্রণিধানযোগ্য। শুদ্ধ কঙ্কণ শব্দ দ্বারা হস্তস্থিত আভরণ বিশেষ বুঝাইলেও করস্থ পূর্বে আছে বলিয়া কর সংযুক্ত কঙ্কণের উপলব্ধি হয়।

এই প্রকার নানাবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা জ্ঞানলাভের পদ্ধতি নির্ণয় করা হইয়াছে, স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পন্থা বিবৃত হইয়াছে, স্বল্পাঙ্গ প্রবন্ধে সে হৃদয়গ্রাহী দৃষ্টান্তগুলির পূর্ণ পরিচয় দান সম্ভব নহে, সেজন্য এই স্থলে নিরস্ত হইলাম। নিগমন বা inferenceএ ভারতীয় দর্শন যে বুদ্ধির ঐশ্বর্য দেখাইয়াছেন, তাহা মানবিক চিন্তাক্ষেত্রে এক অমূল্য সম্পদ।

'হে ঈশ্বর, কথা কও'

শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়

হে ঈশ্বর, কথা কও !
পৃথিবীর বুকে চলে উদ্দাম নর্তন,
মহাকাল আদি হেথা যোগায় ইন্ধন
দিকে দিকে আর্তের উঠিছে ক্রন্দন,—তবু কেন,
হ'য়ে আছ তুমি জড় অচেতন হেন ?
কথা কও ! সাড়া দাও !
পুঞ্জীভূত পাপের পৈশাচিক উৎপীড়নে,
হে অচিন্ত্য, তুমিও কি হয়েছ বধির ?
কহ, কতদিন রবে তুমি বাক্যহারা হ'য়ে
শত শত সৎ-সতী ফেলে অশ্রুনীর।
গভীর নিশায়, তন্দ্রাহারা বসুমাতা ডাকে
ধরণীরে—পাপ আজি পৈশাচিক প্রমত্ত উল্লাসে
নৃত্য করে অন্ধকার নিশার গভীরে।
দুর্গতের অশ্রুজলে, বুভুক্ষুর তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে,
আজি বুঝি অনিবার্য বিপর্যয় আসে।
মানুষের ভগবানে অবহেলা করি—সভ্যতার মৃত্যুবক্ষে
মহাকাল অট্ট অট্ট হাসে।
ধ্বংসের প্রলয় নৃত্যে, হিংসায় লোলুপ অভিযানে,
তোমার সৃজিত ধরা, আজি কম্পমান,
ডাকে তোমা অসহায় সন্তানের দল—
কোথা তুমি ! সাড়া দাও ওহে ভগবান।

গীতা-দর্শন

শ্রীসুদর্শন চক্রবর্তী

ভালমন্দ সবই আমাদের ভিতরের জিনিষ। যা-কিছু বাহ্য ভাব বা কাজ তা অন্তরের সূক্ষ্ম সংস্কার বা প্রবৃত্তির স্থূল অভিব্যক্তি। কিন্তু এই বাহ্য প্রকাশ-টুকুই আবার সব নয়, মানুষের অন্তরের যে অংশ বাহিরে প্রতিফলিত হয় না, তাহা লইয়াই মানুষের যথার্থ পরিচয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "যেমন ভাব, তেমনি লাভ।" উপমা দিয়াছেন তিনি: দুই বন্ধুর একজন ভাগবত পাঠ শুনিতে গিয়া ভাবিল, 'আমি কি বোকা! কি ব্যাড়্-ব্যাড়্ বকছে, আর আমি এখানে বসে আছি। বন্ধু আমার কেমন আমোদ-আহ্লাদ করছে।' অপর বন্ধুটি পণ্ডিতালয়ে গিয়া কিছুক্ষণ থাকিবার পর বিরক্তিতে ভাবিল, 'ধিক্ আমাকে, বন্ধু হরি কথা শুনিতেছে, আর আমি কোথায় পড়ে আছি।' এরপর দু'জনে যখন মরিয়া গেল, তখন যে ভাগবত শুনিতেছিল তাহাকে যমদূত লইয়া গেল, আর যে বেদালয়ে ছিল তাহাকে বিষ্ণুদূত বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল। ভগবান মন দেখিয়া বিচার করেন, কে কি কাজে আছে, কোথায় পড়িয়া আছে তাহা দেখেন না। তিনি ভাবগ্রাহী। এইরূপ অনেক উপমা ঠাকুরের কথামৃতে আছে। এমনও দেখা যায়, ব্যাধ বা কসাই বহু প্রাণীবধ করিয়াও কখনও কোনও পাপে লিপ্ত হয় না এবং সে ভগবানকে লাভ করিতে পারে।

হত্যা করিবার জন্য প্রকারান্তরে অর্জুনকে উপদেশ দিবার উপলক্ষে বিশ্বমানবের উদ্দেশে জীবনের চরম সত্য এবং তদভিমুখে চলিবার পরম উপায়ের ইঙ্গিত গীতার পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। অষ্টাদশ অধ্যায়বিশিষ্ট এই গীতার সোপানের পর সোপান অনুসরণ করিলে দেখা যায়, প্রথমেই স্বজন বা ভোগ্য বস্তুর ত্যাগ ও বিচ্ছেদজনিত বেদনা বা বিষাদ বিচার দ্বারা ক্রমান্বয়ে কাটাইয়া উঠিবার উপদেশ আছে। দ্বিতীয় সোপানে সাংখ্য যোগ বিচার বিবেকই স্বরূপে জ্ঞান দান করেন। এখানে "আত্মিকে" ইহা বা আত্মোপলব্ধির ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তারপর তৃতীয় সোপানে দেখা যায়, 'কর্ম'ই জ্ঞানের উপায় স্বরূপ। মোক্ষলাভে কর্মযোগ মূল্যবান সাধন। কর্মজনিত অভিজ্ঞতা দ্বারা মানুষ যখন সমস্ত সন্দেহ-সংশয় কাটাইয়া ওঠে তখনই চতুর্থ সোপানে সুরু হয় 'জ্ঞান'। পঞ্চমে দেখা যায়, সমস্ত কর্মের ফলাফল ত্যাগ না করিলে বা কর্মজনিত বর্তমান ও প্রাক্তন সমস্ত বন্ধন কাটাইয়া সমদর্শনে না পৌঁছিলে বা বহু জ্ঞানের সংস্কার থাকিলে প্রকৃত শান্তি আসে না। ষষ্ঠ সোপানে বর্ণিত যোগ অভ্যাসের দ্বারা প্রকৃত ত্যাগের স্বরূপ জানা যায়। এ ত্যাগ আসলে গ্রহণেরই নামান্তর। পার্থিব ভোগের স্থানে অপার্থিব শাশ্বত আনন্দকে গ্রহণ; 'অংশ'কে তুলিয়া 'পূর্ণ'কে বরণ। মানুষ যখন সপ্তমে আরোহণ করে, তখন তার জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জন্ম-মৃত্যু ও ভাকে সে আসলে ভ্রম বলিয়া বুঝিতে পারে। তারপর সুরু হয় অষ্টম সোপান। এখানেই সাধকের চিত্তে অক্ষুণ্ণ শান্তিময় চিরানন্দের যে প্রকাশ ঘটে তারই বর্ণনায় অনুরঞ্জিত গীতার এই অষ্টম সোপান। শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভের গুপ্ত সাধন-প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত নবম সোপানে আছে। দশম সোপানে আছে অনন্ত মহিম-আত্মার বিভিন্ন রূপায়ণের বর্ণনা। একাদশ সোপানে—অবাঙ্মনসোগোচর আত্মার ব্যষ্টি ও সমষ্টি-রূপের এবং ভক্তের আবেগ ও অনুরাগের অনির্বচনীয়তাকে ভাষায় প্রকাশের সার্থক প্রয়াস। তারপর ভক্তের স্বতঃস্ফূর্ত শরণাগতির আকুলতা

দ্বাদশ অধ্যায়ের উপজীব্য। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আত্মার নিরবচ্ছিন্ন সর্বব্যাপীত্ব ও সর্বত্রাবস্থিতির বর্ণনা। চতুর্দশে তিনগুণে রূপায়িত বিভিন্ন অবস্থা; পঞ্চদশে এই সমস্তের আধার বা আত্মার উপলব্ধির সহায়তা। ষোড়শ সোপানে দৈবাসুর, ভাল-মন্দ, শ্রৈত সংসার সমন্বয়। সপ্তদশে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ত্রিগুণের বা ভাবের পরিচয়, প্রকৃতি-বিকৃতি, হ্রাস-বৃদ্ধি ও ক্রিয়ার তত্ত্ব নিরূপণ।

তারপরে শেষ সোপান—অষ্টাদশ সোপান। এইখানে মানুষ লাভ করিতে পারে আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসমীক্ষার অভ্রান্ত যোগ্যতা। তার সমস্ত মোহ সন্দেহ ও বিভ্রম এইখানেই বিলীন হইয়া যায়। থাকে একটা একটানা অব্যক্ত আনন্দানুভূতি, আসে একটা জ্যোতির্ময় আপ্লুত অবস্থা,—অনন্ত শক্তির একটা তৃপ্তি, জীবনে একটা সুষম সাবলীল ছন্দ।

গীতার সাধনার সারভূত প্রণিধান বস্তুর ধ্যানে, গীতার সূক্ষ্ম বিচারসম্মত বৈজ্ঞানিক প্রাণবন্ত রূপের উপলব্ধিতে থাকে না ব্যাকুলতা, ভয়, ফললাভের লিপ্সা, কিম্বা কর্মে বিফলতার কোন উদ্বেগ। সাধক নিজেকে নিমিত্তমাত্র দেখে, সুখ-দুঃখ, লাভক্ষতির কোন অনুভূতি তাকে আন্দোলিত করিতে পারে না। সে তখন চিদানন্দময়, আত্মপ্রতিষ্ঠ, স্থিতপ্রজ্ঞ।

শ্রান্ত, বিভ্রান্ত, মোহজর্জরিত মানুষের পক্ষে ধর্মসার গীতাই নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক এবং চরমে পরম শান্তিদায়ক দুর্লভ বিশ্রাম-আশ্রম।

ভাবনার বিষে কারা উদাসীন ?

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

অন্তরে তব অজ্ঞেয়বাদ, বাহিরে জড়তা রহে
জীবন মরণ আবর্তনেতে কেন এ বিড়ম্বনা ?
কাম-কাঞ্চন যশের লাগিয়া স্বার্থের অর্চনা,
পৃথিবীর পথে মন-অরণ্যে কামনা-বহ্নি বহে।
দেখেছ কি কেহ আপাতীত হয়ে রয়েছে অন্তমনা!
বাস্তবতার ইন্দ্রজালের কুহকে বদ্ধ সদা,
মিথ্যার সাথে মিতালি করিয়া কেন তব মত্ততা !
বাসনা-মদির পান করে করে চটুল দৃষ্টিপাতে
প্রাণের আকাশে মেঘ আলিপন
দিয়েছে কি দোলা মনে ?

কত অতীতের ইতিহাস আজো সমাহিত নির্জনে,
মায়ার কাননে ছন্দি-মহীরুহ ভেঙেছে ঝঞ্ঝাঘাতে,
ভাবনার বিষে কারা উদাসীন ভেবেছ সঙ্গোপনে ?

বিহগের মত চলেছে আত্মা নীড় বেঁধে আর উড়ে,
সীমা হোতে তার সীমাহীন নভে
যাওয়া আসা অনিবার।
জ্ঞান ভক্তির পক্ষ মেলিয়া যোগাযোগ হোলো তার,
তুমার ভিতরে জাগে সঙ্গীত প্রণবের সুরে সুরে
তুমি কি শুনেছ ধ্যানাতীত হয়ে সে সুরের ঝঙ্কার।

সাম্যের সাথে অনন্ত যেথায় ব্রহ্ম বিহারে মেশে,
সেথায় বোধির বোধাতীত জ্যোতিঃ
তুমি কি দেখেছ শেষে ?

সুখ ও দুঃখ

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

জগৎ শব্দটী গম্ ধাতু হ'তে নিষ্পন্ন হ'য়েছে। নিয়তই যাহা যায় বা চলে তাহাই জগৎ। ইহা যেন একখানি ছিচক্র যান। ইহার চক্র দুটীর নাম সুখ ও দুঃখ। এই চক্রদ্বয় সাহায্যে জগৎ অনাদি কাল হ'তে চল্‌তে আরম্ভ করেছে ও অনন্তকাল ধ'রে চ'ল্‌বে। সুখ ও দুঃখ এ দুটী আপেক্ষিক শব্দ। একটীকে অপরটীর সহায়তা ভিন্ন বুঝ্‌বার উপায় নেই। যেহেতু দুঃখ আছে এইজন্যে সুখও আছে। একটীকে পরিত্যাগ ক'রে কেবলমাত্র অপরটীকে গ্রহণ অসম্ভব। দুঃখের ভাঁজও থাকবে না, কেবলমাত্র সুখের সংসারে আমি বাস কর্‌ব এরূপ একটী কল্পনা আকাশকুসুম মাত্র। সুখ ও দুঃখ এ দুটী নিত্য সংযুক্ত। মানুষ সর্বদাই হয় সুখ না হয় দুঃখ কর্তৃক আক্রান্ত হচ্ছে। সংসার সুখ ও দুঃখের সংমিশ্রণ স্বরূপ। সকল লোকই সুখ চায়। দুঃখ না হ'ক—ইহাই সকলের আন্তরিক প্রার্থনা। কিন্তু সুখ থাক্‌লে বা সুখকে গ্রহণ কর্‌লে দুঃখের গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। সুখ যদি আমাদের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'তে থাকে ত' সেই সঙ্গে দুঃখও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'তে থাক্‌বে। কেবলমাত্র সুখপ্রার্থী হ'লেও দুঃখ আমাদিগের সঙ্গ কোনমতেই ত্যাগ কর্‌বে না। সুখের প্রতিক্রিয়ায় দুঃখ আসবেই আস্‌বে।

আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সুখ ভোগ করি। ইন্দ্রিয়সমূহ ক্ষীণবল হ'লে সুখী হ'বার ক্ষমতা ক্রমশঃ লুপ্ত হয়। তখন ঐ সুখই দুঃখজনক ব'লে বোধ হয়। একটানা সুখভোগও অপ্রীতিকর। সুখ ভোগ ক'র্‌তে ক'র্‌তে ঐ সুখেই একটা অতৃপ্তি আসে, ইন্দ্রিয়সকলও অবসাদগ্রস্ত হয়। অতএব, সুখই দুঃখে রূপান্তরিত হ'য়ে থাকে। অথচ দুঃখ ও আমরা চাই না। এই কারণে, সুখ হ'ক এই কথা না ব'লে আমাদের বলা উচিত—দুঃখ যেন আমাদের না হ'ক। এইরূপ বলাই অধিকতর সঙ্গত। আমার দুঃখ চিরতরে দূর হ'ক—একেই পরম পুরুষার্থ বলে। মনুষ্যেতর প্রাণীসমূহ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সুখ ভোগ করে। মানুষ কিন্তু কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-সুখেই লিপ্ত হ'য়ে থাকে না। সে বুদ্ধিবৃত্তিতে, বুদ্ধির আলোচনায় বেশী সুখ পায়। একটী কুকুর বা গরু আহারে যেরূপ তৃপ্তি পায়, একটী মানুষ জ্ঞানের আলোচনায় তদপেক্ষা বেশী সুখ পায়; এই কারণ, পশু অপেক্ষা মানুষ বড়। আবার যাঁরা সত্ত্বগুণবিশিষ্ট দেবমানব তাঁরা পরমাত্মার ধ্যানে অধিকতর সুখ লাভ করেন। অতএব যে সকল মানুষ ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতাকেই সুখের একমাত্র মাপ-কাঠি মনে করেন, তাঁরা পশুর স্তর হ'তে বিশেষ উন্নত নন। ভ্রান্তিবশতঃ আমরা মনে করি বিষয় হ'তেই সুখ পাওয়া যায় এবং এইজন্যে আমরা বিষয়ের পশ্চাতে ধাবমান হই। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়ে সুখ নেই। সুখকর কোন বিষয় লাভ হ'লে আমাদের বুদ্ধি ক্ষণকালের জন্য স্থিরত্ব লাভ করে, তখন ঐ স্থির ও শান্ত বুদ্ধিতে আমাদের সুখস্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব পড়ে, তারপর যখনই বুদ্ধি নিজ চঞ্চল স্বভাবে প্রত্যাবর্তন করে, তখন ভ্রান্তিবশতঃ আমরা মনে করি ঐ বিষয়ই বুঝি আমাদিগকে সুখ দান কর্‌ছে। যদি বিষয় হ'তেই সুখ পাওয়া যেত ত আমরা একটী সুখকর বিষয় লাভ করার পর দ্বিতীয় বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হতাম না। মনে করি বহুকাল পরে আমার এক বন্ধুদর্শন হ'ল, প্রথম দর্শনে যেরূপ আমার আনন্দ হ'য়েছিল, তারপর হ'তে বন্ধুর পুনঃ পুনঃ দর্শনে আর তো সেরূপ আনন্দ হয় না। বিষয়ই যদি সুখের একমাত্র কারণ হয় তো

একই বিষয় সকলের নিকট তুল্যরূপে সুখের হেতু হ'ক। একই ব্যাঘ্রী তা'র শাবকের নিকট ও আমার নিকট তুল্যরূপে সুখের কারণ হ'ক, কিন্তু তা যখন হয় না তখন সিদ্ধান্ত এই যে সুখ বিষয়ে নেই। আবার আমরা যখন সুষুপ্তিমগ্ন থাকি, তখন ত কোন বিষয় থাকে না; কিন্তু নিদ্রাভঙ্গের পর তো আমরা বলি বড়ো সুখেই ঘুমুচ্ছিলাম। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মার স্বরূপ যে আনন্দ তা'র দ্বারাই সকল বস্তুই প্রিয় হ'য়ে থাকে। আনন্দ সৎস্বরূপও বটে, চিৎস্বরূপও বটে, কিন্তু বিষয়কে যদি আনন্দ-স্বরূপ বলা যায় তো বিষয় যাহা জড়, তাহাই সৎ ও চিৎস্বরূপ হয়ে পড়ে; অর্থাৎ সচ্চিদানন্দটী জড় বস্তু হ'য়ে পড়ে।

অনেক সময় আমরা মনে করি পার্থিব সম্পদ দ্বারা আমাদের দুঃখ দূর হবে। কিন্তু পার্থিব সুখের দ্বারা আমাদের দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হয় না। যতই পার্থিব সুখ সম্পদ বৃদ্ধি হ'ক রোগ, শোক, জরা, মরণ হ'তে উদ্ধার নাই। যতই পার্থিব সুখ হ'ক, পুনরায় দুঃখের শত শত কারণ উপস্থিত হবে। আজ আমি ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করলাম, পরদিনই আবার ক্ষুধার তাড়নায় আমাকে ব্যতিব্যস্ত হ'তে হবে। নিদ্রাতুর আমি নিদ্রাসুখ ভোগ ক'রলাম, পুনরায় নিদ্রার তাড়না এসে উপস্থিত হবে। এইরূপে চক্রের ন্যায় সুখ ও দুঃখের আবর্তনের হস্ত হ'তে কারও উদ্ধার নেই। দুঃখ তিন প্রকার। মানসিক ও শারীরিক ব্যাধিজনিত দুঃখকে বলে আধ্যাত্মিক দুঃখ; হিংস্র প্রাণী আদির দংশন ও আক্রমণজনিত দুঃখকে বলে আধিভৌতিক এবং অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবদুর্ঘটনাজাত দুঃখকে বলে আধিদৈবিক। আমাদের যাবতীয় দুঃখকে ঐ তিন শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায়। পাপবদ্ধ জীবাত্মা শরীরকে আশ্রয় ক'রে সুখ ও দুঃখ ভোগ করেন, আমাদের কৃত পুণ্য ও পাপজনক কর্মের ফলে সুখ-দুঃখময় এই শরীর উৎপন্ন হয়েছে। পরমাত্মা যিনি মায়াবদ্ধ হ'য়ে জীবরূপে সুখ দুঃখ ভোগ করেন, তিনি আনন্দস্বরূপ। যতকাল দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অহঙ্কার জীবকে বেঁধে রাখবে ততকাল সুখ ও দুঃখের ভোগ হ'তে নিস্তার নেই। এই সুখ ও দুঃখ অন্তঃকরণের ধর্ম। জীবাত্মা অন্তঃকরণের সহিত যুক্ত হ'য়েই সুখ ও দুঃখ ভোগ করেন। অনেকে কল্পনা করেন যে, স্বর্গ এমন একটী স্থান, যেখানে কেবল সুখ, সেখানে দুঃখ আদৌ নেই। অতএব পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠানের ফলে স্বর্গ-লাভ হ'লে আর দুঃখ থাকবে না। সুখ বা বিষয়-ভোগ সম্বন্ধে যার যেরূপ ধারণা সে সেইরূপ স্বর্গেরই কল্পনা ক'রে থাকে। কিন্তু স্বর্গও দুঃখকে আত্যন্তিক-ভাবে দূর করতে পারে না। কারণ স্বর্গসুখও অস্থায়ী। সসীম কর্মের ফলে অনন্তকাল ধ'রে স্বর্গে স্থানলাভ সম্ভব হ'তে পারে না। পুণ্যক্ষয় হ'লেই পুনরায় মর্ত্যে আগমন অনিবার্য। কেহ কেহ বলেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি ক'রেছেন, অতএব কেন তিনি আমাকে অনন্ত স্বর্গ-সুখ দান ক'রবেন না? এর উত্তরে বলা যায় ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হ'তে পারেন, কিন্তু তাই ব'লে তিনি ত আর তোমার আমার কল্পনা মত কাজ ক'রবেন না। তুমি যদি ঈশ্বর সৃষ্ট হও ত সৃষ্ট পদার্থ কখনও অনন্ত সত্তা লাভ ক'রতে পারে না। কারণ সৃষ্ট পদার্থের ধ্বংস অনিবার্য—অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, সৃষ্টির স্বভাবই দুঃখ। সুখস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু মাত্রই দুঃখের সাধন। যতদিন বুদ্ধি প্রভৃতি থাকবে ততদিন দুঃখ অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের জীবনে অতীত যে দুঃখ তাহা তো ভোগ হ'য়েই গিয়েছে, এখন অনাগত দুঃখ হ'তে কি উপায়ে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় তাহাই আলোচ্য। বিবেক জ্ঞান দুঃখ নিবৃত্তির অন্যতম হেতু এবং কৈবল্য অবস্থাই দুঃখত্রয়ের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তির হেতু। মানুষ স্বরূপতঃ পূর্ণাবস্থরূপ, উহা হ'তে বিচ্যুত হয়েছে ব'লেই সে উহাকে পূর্ণলাভ ক'রবার জন্যই সুখান্বেষণ করে। যখন সংসারে দুঃখের হাত থেকে

নিষ্কৃতি নেই, তখন দুঃখের অবস্থায় মনকে অক্ষুব্ধ রাখতে হ'বে। দুঃখের ভিতরও নিজেকে পরম সুখী মনে ক'রতে হবে। সুখ ও দুঃখ উভয়ের অতীত অবস্থায় পৌঁছাতে পারলেই অনাবিল আনন্দ লাভ করা যায়। আমাদের স্বরূপ যে আত্মা তাঁতে সুখও নেই দুঃখও নেই। স্বরূপ জ্ঞানলাভ ক'রলে দুঃখের হাত হ'তে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। যারা যত সত্বর তাদের কর্মের অবশ্যম্ভাবী ফল-স্বরূপ দুঃখাদি ভোগ ক'রে লয় তারাই ভাগ্যবান। কারণ তাদের হিসাব শীঘ্র শীঘ্র মিটে গেল। যাদের কৃত পাপের ফল দেরীতে আসে, তাদের মহা দুর্দৈব, অনেক সময় আমরা সাত্ত্বিক প্রকৃতির কোন ব্যক্তির জীবনে দুঃখাতিশয্য দেখে আশ্চর্যান্বিত হই ও বলি যে সৎভাবে জীবনযাপন করে খুবই ত লাভ! ঐ যে "গোলক চাটুয্যে" মশাই আজীবন কত পাপই ক'রছেন, কিন্তু ওঁকে ত কোন দুঃখ ভোগ করতে হয় না, অবস্থাও বেশ ভাল, খান-দানও ভাল, ছেলেগুলিও বেশ মানুষ হয়ে উঠেছে, টাকার জোরে মানসম্ভ্রমও আছে, আর কখনও কি মাথাটা পর্যন্ত ধরে! কি সুন্দরই না স্বাস্থ্য!—কিন্তু কর্মের গতি বড় গহন। জন্মার্জিত সুকৃতির ফলে গোলক চাটুয্যে মশাই এখন যতই সুখ ভোগ করুন না কেন তাঁর কৃত পাপের ফলে একজন্মে তাঁকে নিশ্চয়ই দুঃখ কষ্ট ভোগ ক'রতে হবে। কারণ অবশ্যই তার ফল প্রসব ক'রবে। এমন কোন কারণ থাকবে না যা কখনও কার্য অর্থাৎ ফল উৎপন্ন ক'রবে না এবং এমন কার্য কখন উৎপন্ন হ'তে পারে না যার কারণ নেই। কার্য ও কারণের ওপর প্রত্যেক জীবন প্রতিষ্ঠিত। অতএব আমি যে ভাল ও মন্দ কাজ ক'রেছিলাম, তার ফল প্রারব্ধ কর্মরূপে ভোগ করছি এবং বর্তমানে যে কর্ম করছি তার ফল আমাকে অবশ্যই ভোগ ক'রতে হ'বে। তবে ঐ কর্ম জন্যই যে জন্মে মানুষের স্বরূপের জ্ঞান হয় সেই জন্মে তিনি কৃতকর্মের জন্য আর আবদ্ধ হবেন না। সেইবিষয়ে তিনি অর্থাৎ ঐ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি বিদেহ কৈবল্য লাভ করবেন।

দুঃখ ঘৃণ্য হ'লেও ত্যাজ্য নয়! দুঃখ আমাদের মহানিষ্কর্ষ। দুষ্কর্মের ফলেই দুঃখ ভোগ হয় বটে অর্থাৎ দুষ্কৃতি বা পাপই দুঃখের জনক।—কিন্তু যাহা হ'তে যাহা জন্মায় তার সহিত তার ঐক্য বা একান্ত স্বরূপতা থাকে না। অসৎ কুলে জন্মগ্রহণ ক'রলেই যে সেই ব্যক্তিকেও অসৎ হ'তে হ'বে এমন কোন নিয়ম নেই। পঙ্ক হ'তে ত পঙ্কজের উৎপত্তি হ'য়ে থাকে। সুখ মানুষকে সংসারাসক্ত করে, দুঃখ ঐ আসক্তি দূর ক'রে দেয়। দুঃখ মানুষের বৈরাগ্য বৃদ্ধির সহায়ক। উহা মানুষের প্রাণে ভগবদ্ভক্তির উদয় করিয়ে দেয়, দুঃখ মানুষের হৃদয়কে দৃঢ়তা দান করে ও তার প্রাণের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত ক'রে দেয়। এইজন্যে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ দুঃখকে তাচ্ছিল্য করেন না বা উহার আগমনে ভীত হন-না। অতএব সুখ দুঃখ উভয় অবস্থাতেই যিনি অবিচলিত থাকতে সক্ষম তিনিই প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য। শাস্ত্রবাক্য গীতায় উক্ত হ'য়েছে :

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥২।৫৬
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥১৪।২৪
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥১৪।২৫

পুরুষকার সহায়ে যিনি ঐরূপ সুখ দুঃখের অতীত অবস্থায় উপনীত হ'তে পারেন তিনিই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। এই জীবন্মুক্তি সুখ ভোগ করাই মানুষের দেহধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। ইত্যোম্।

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

"হে ভারত ভুলিওনা দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী তোমার রক্ত, তোমার ভাই... ।"

—বিবেকানন্দ

বিলাসের বুভুক্ষায় নিষ্প্রাণ, নিস্তেজ হিয়া
ভিক্ষাপাত্র লয়ে দুই করে,
ভারত দাঁড়াল যবে বিসর্জিয়া আপন সম্ভারে
পাশ্চাত্যের দ্বারে—
হে বীর, হে নবীন সন্ন্যাসী,
হৃদয় মথিলে তুমি কুমারিকা পরপ্রান্তে বসি'
"হে মোর রহস্যময় আত্মারাম গুরো!
সেবকেরে দিলে না নিষ্কৃতি,
দিলে গুরুভার, রুদ্র বজ্ররবে
জাগাইতে লক্ষকোটি শবে,
শুনাইতে জনে জনে অভিনব ছন্দে ও ভঙ্গীতে
ভারতের শাশ্বত সঙ্গীত।"
তারপর
শিরে নিয়ে-মাতৃ আশীর্বাদ,
সিকাগোর মহতী সভায় দাঁড়াইলে বীরবেশে
খ্যাতিহীন ভারত-সন্ন্যাসী
নব বেদমন্ত্র কণ্ঠে হইল ধ্বনিত,
উচ্চকিল আমেরিকাবাসী।
"হে আমার ভাইবোন" বলি' মনুষ্যত্বে দিলে তুমি
শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দান— ;
পশ্চিমের প্রান্তিপথে মর্মে পশে
প্রেমগুরু উদার আহ্বান।
হে বরেণ্য, হে বিশ্বপ্রেমিক,
ত্যজি লাজ, বিলাস-ভীরুতা,
নোয়াইয়া গর্বোদ্ধত শির
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মিলি
তব পদপ্রান্তে বসি শিখিয়াছে আত্মার সন্ধান।
বিজয়ের জয়মাল্যখানি—
সবারে বাঁধিয়াছিলে সেই দিন, হানি
হীন, দরিদ্রেরে স্মরি' শত মমতায়,
ব্যথাতুর অন্তরের পরম নিষ্ঠায়।
গৃহ হ'তে গৃহ কোণে পঁহুছিল তেজঃবল উদাত্ত আহ্বান,
বৈদিক ধর্মের সেই সর্বংসহা পরমব্যাখ্যানে—
"ভুলে' যাও হিংসাদ্বেষ, জাতি, ধর্ম, কুল অভিমান,
ভুলে' যাও মনগড়া পাপ পুণ্য, মান অপমান,
ভুলে' যাও অস্পৃশ্যতা, হীনতা, দীনতা,
মানুষে মানুষ নহে পর —
আত্মায় আত্মায় জড়ায়ে রয়েছে সদা চির আত্মীয়তা।
জীবে দয়া ভাবিওনা, ভাবো—শিব জ্ঞানে সেবা
ভোগ ও বিলাস নয়, এস ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষা নেবে
কেবা"।
পূর্বাচল অন্ধকারে অতি তীব্র কশাঘাত হানি'
আহ্বানিলে সুদিনের উষর আলোকে
অত্যাচার, প্রবঞ্চনা, অনাচার-জর্জরিত ভারতের বুকে।
ভারতের প্রাণমন্ত্র সঁপে দিলে
লোকমাতা উত্তরসাধিকা নিবেদিতা কাণে।
আর্য্য তপোবন দেশে দেশে মঠে মঠে
মুখরিত হলো সামগানে।
ভীরুতাকে কর নাই ক্ষমা —
পশুত্বের অবসান চেয়েছিলে সিংহের বিক্রমে ;
শুনায়েছ বরাভয়,—
দেখায়েছ মুক্তিপথ হীনতম পশুর অধমে।

সকলেরে দিয়ে গেছ আপনার সমগ্র সাধনা
পবিত্র সার্থক হোক সেই প্রেরণায়
ভারতের প্রতি ধূলিকণা।

কালীপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

(পূর্বানুবৃত্তি—১৩৯৩, অগ্রহায়ণের পর)

শ্রীমীরা মিত্র

বিদ্যা-অবিদ্যা, মায়া ও ব্রহ্ম নিয়ে আলোচনা চলে দিনের পর দিন। মেতে উঠেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সময় এসেছে, তাঁর জ্ঞানের সঞ্চয় বিলিয়ে দেবার পাত্র ও গ্রহণ করার উপযুক্ত হ'য়ে উঠেছে এ তিনি জেনেছিলেন। বেদান্তে নির্মল-সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতিকে মায়া ও মলিন-সত্ত্ববিশিষ্ট প্রকৃতিকে অবিদ্যা বলা হ'য়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "মায়ার মধ্যে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইই আছে। অবিদ্যা মুগ্ধ করে, এই অবিদ্যা হ'তে কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি জন্মায়, জীব সংসারে বদ্ধ হয়। আর বিদ্যা শক্তি থেকে বিবেক, বৈরাগ্য, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ, বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান, প্রেম এই সব হ'য়, যেগুলো ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। এই বিদ্যা-শক্তির উপাসনা করলে—পূজো করলে অবিদ্যা কেটে যায়। এই জন্যেই তন্ত্রে শক্তিপূজার বিধি আছে। মহামায়াকে প্রসন্ন করার জন্য নানা-ভাবে শক্তিপূজার বিধি রয়েছে—দাসীভাব, বীরভাব, সখীভাব, সন্তানভাব। আমি দাসীভাবে আর সখীভাবেও দু' বছর সাধনা করেছি। বীরভাবে করিনি। স্ত্রীলোকের সঙ্গে রমণ করিনি। আমার সদা সন্তানভাব। আমি স্ত্রীলোকের স্তন মাতৃস্তন মনে করি। শক্তি-সাধনায় সব ভারি উৎকট সাধনা ছিল। বাবা, চালাকি নয়।"

কালীপ্রসাদ অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন মনের মধ্যে জমিয়ে যেতে,—বোধ বিচার পরের কথা। একটি প্রশ্নও করেন না পাছে ভোর ছিঁড়ে যায়। পাছে ভাব ভেঙে যায়। একের পর এক প্রসঙ্গ তুলে বলে চলেন শ্রীরামকৃষ্ণ "গৌরী পণ্ডিত বলেছিল—'কালী আর গৌরাঙ্গ এক বোধ হ'লে তবে ঠিক জ্ঞান হয়।' যিনি ব্রহ্ম তিনি শক্তি, তিনিই জীব জগৎ শ্রীগৌরাঙ্গ।" "আদ্যাশক্তির সাহায্যে অবতারলীলা। তাঁরই শক্তিতে অবতার। অবতার যে কাজ করেন তা সবই মায়ের শক্তিতে।" "বাজীকর আর বাজীকরের খেলা। বাজীকরই সত্য তার খেলা স্বপ্নের মত। যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে তিনি সবটা দেখেন। ঈশ্বর বাজীকর আর মায়া, জীব, জগৎ সবই তাঁর বাজী খেলা। এগুলো আছে অথচ নেই। যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ ওরাও আছে। জ্ঞান-অসি যারা কাটলে আর কিছুই থাকে না। তখন নিজের আমি পর্যন্ত বাজীকরের বাজী হ'য়ে পড়ে। যতক্ষণ এতটুকু আমি থাকে, ততক্ষণ আদ্যাশক্তির এলাকা। মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি। আবার মায়ার মধ্যে দুটি শক্তি আছে। "আবরণ" শক্তিতে মায়া অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মকে ঢেকে (আচ্ছাদিত করে) রাখে আর তার বিক্ষেপ-শক্তির মধ্য দিয়ে সেই অদ্বিতীয় সত্তা বহুরূপে প্রতিফলিত (প্রতীয়মান) হন।"

কালীপ্রসাদের মনে পড়ে কোন সাধকের গানে যেন শুনেছেন :

"স্বমেকা প্রকৃতি ব্রহ্ম আদ্যাধিনী।
মহামায়া রূপে ত্রিজগত মনমোহিনী
সৃজন পালন নিধনকারিণী।"

কালীপ্রসাদের কাণে কথাগুলো ফিরে ফিরে বাজতে থাকে, আর তার সাথে মনের পটে জেগে ওঠে কত টুকরো টুকরো স্মৃতি, শাস্ত্রবিচার আর সাধু সঙ্গের বাণী। "ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ জানবি।" শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলতে শুরু করেন। "শক্তি না মানলে জগৎ মিথ্যা হ'য়ে যায়। আমি, তুমি, ঘর, বাড়ী, পরিবার স—ব মিথ্যা? ঐ আদ্যাশক্তি

আছেন বলে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে। তিনিই জীব-জগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হ'য়েছেন। জীব-জগৎকে বাদ দেবে কেমন করে, তাহলে যে ওজনে কম পড়ে। বেলের বিচি গোলা বাদ দিলে কি সমস্ত বেলের ওজন পাওয়া যায়? ন্যাংটো 'নেতি' 'নেতি' বিচার করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিল।' কিন্তু ব্রহ্মের শক্তি মানতো না। ব্রহ্মের শক্তি মায়াকে মিথ্যা জড় বলে উপেক্ষা কোরত। কিন্তু এখানে এগারো মাস থাকাতে মা তাকে ব্রহ্ম আর মায়াশক্তি অভিন্ন এই অদ্বৈত জ্ঞান বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। অগ্নি আর তার দাহিকা-শক্তির মতন ব্রহ্ম আর তার মায়াশক্তিও অভিন্ন।"

কালীপ্রসাদ বোঝেন, আচার্য শঙ্কর তাঁর 'বিবেকচূড়ামণি'তে এই তত্ত্বই বর্ণনা করেছেন:

"অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তি-
রবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা।
কার্যানুমেয়া সুধিয়ৈব মায়য়া,
যয়া জগৎ সর্বমিদং প্রসূয়তে॥
সন্ত্বাপ্যসন্ত্বাপ্যুভয়াত্মিকা নো,
ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো।
সাঙ্গাপ্যনঙ্গা হ্যুভয়াত্মিকা নো,
মহাদ্ভুতানির্বচনীয়রূপা।" বিঃ চূঃ

অর্থাৎ মায়া কি? অব্যক্ত নামধেয়া পরমেশ্বরের শক্তি অনাদি অবিদ্যারূপিণী সত্ত্বরজস্তমো গুণময়ী 'মায়া' সমস্ত জগৎ প্রসব করেন। সুধী কার্য দেখে এই মায়াশক্তির অনুমান করেন। এই মায়া সৎও নহেন অসৎ বা অলীকও নহেন, সদসৎও নহেন। ভিন্ন নহেন অভিন্নও নহেন আবার ভিন্নাভিন্নও নহেন, সঙ্গ নহেন অসঙ্গ নহেন, সঙ্গাসঙ্গওনহেন। ইনি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং অনির্বচনীয়া। মহা আচার্যের সেই তথ্যই আজ তাঁর গুরুর সরল কথার মধ্য দিয়ে নূতন রূপ নিয়ে প্রকাশিত হ'য়েছে। যুগে যুগে আচার্য তাঁর শিষ্যকে শিক্ষা দিয়েছেন। ভারতের এ এক অতি প্রাচীন চির-উজ্জ্বল ছবি। কালীপ্রসাদের মনে হয় সবাই এক। যুগে যুগে একই আচার্য একই তাঁর শিষ্য; এমনি করেই তিনি শিক্ষা দিয়ে এসেছেন, আজও তিনি অলঙ্কৃত করে আছেন ঐ গুরুর আসন। সেই নিষ্ঠা, সেই সত্যদর্শিতার তেজ, সেই অটল দৃঢ়তা, সেই অপরিমেয় ধৈর্য, সেই ত্যাগোজ্জ্বল দীপ্তি খাশত আচার্য। তৃষ্ণাতুর ছাত্র-হৃদয় তাঁর এমনি করেই বুঝি যুগে যুগে পান করে এসেছে এই জ্ঞানের অমৃতরাশি। চির যুগের ছাত্র তিনি অনন্ত তাঁর ছাত্রজীবন—এর কি কোনদিনও সমাপ্তি আছে? সমাপ্তির অভিলাষই বা কোথায়? শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ফিরে আসেন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসঙ্গে "ভক্তি পাকলে ভাব, তারপর মহাভাব; তারপর প্রেম তারপর ঈশ্বরলাভ। শ্রীগৌরাঙ্গের এই মহাভাব আর প্রেম হ'য়েছিল। এই প্রেমে জগৎ ভুল হ'য়ে যায় এমন কি নিজের দেহ যা এত প্রিয় তাও ভুল হয়ে যায়। শ্রীগৌরাঙ্গের সেই প্রেম হ'য়েছিল বলেই সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। সাধারণ জীবের মহাভাব বা প্রেম হয় না তাদের ভাব পর্যন্ত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা ও বাহ্যদশা হোত। তিনি অন্তর্দশায় সমাধিস্থ থাকতেন। অর্ধবাহ্যদশায় নৃত্য করতেন এবং বাহ্যদশায় নামসংকীর্তন করতেন।" মহা-প্রেমিকের পুণ্যস্মৃতি আর এক প্রেমিককে মাতিয়ে তোলে ভরাপ্রেমের বেদনে ভারি হ'য়ে ওঠে তাঁর কণ্ঠস্বর। অন্তরের নিবিড় অনুভূতির মাঝে যেন ডুবে যান তিনি। একটু পরে আবার বলেন "কলির শেষে কল্কি-অবতার হবে। ব্রাহ্মণের ছেলে, সে কিছু জানবেনা। হঠাৎ ঘোড়া আর তরবার আসবে।" আবার চুপ করে যান শ্রীরামকৃষ্ণ, গভীর নিস্তব্ধতার মাঝে মিলিয়ে যায় তাঁর স্বর। গাম্ভীর্যের নিহরণে শুমরে ওঠে কালীপ্রসাদের অন্তর।

———

বিত্তের উপর কর

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ আচার্য এম. এ.

অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং সিদ্ধি প্রচেষ্টার মধ্যে একটা আপাত বৈপরীত্য আছে। কোন দেশের আর্থিক পরিকল্পনা ঐ দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রয়াস মাত্র। কিন্তু পরিকল্পনাকে সার্থক করতে হ'লে এই জনসাধারণের কাছ থেকেই কর আদায় করার প্রয়োজন হয়। করভার নিঃসন্দেহে জনসাধারণের আর্থিক সচ্ছলতা ও উন্নত জীবনযাত্রার প্রতিবন্ধক।

আমাদের দেশে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়েছে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনা সুরু হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনা ছিল ৩৬০০ কোটি টাকার, দ্বিতীয় পরিকল্পনা হ'ল ৮৫০০ কোটি টাকার। প্রথম পরিকল্পনায় জাতীয় আয় শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পাবে আশা করা গিয়েছিল, এবার জাতীয় আয় শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করার চেষ্টা হচ্ছে। প্রথম পরিকল্পনায় কর্ম সংস্থানের দিকে খুব বেশী নজর দেওয়া সম্ভব হয়নি, দ্বিতীয় পরিকল্পনার বিভিন্ন দিকের সম্ভাব্য কর্ম সংস্থানের হিসাব করে দেখা গেছে মোটামুটি ৫ বছরে ১ কোটি ২৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে। এই সব দিক বিবেচনা করলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থ সংগ্রহের জন্য নতুন কর ধার্য করার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অস্বীকার করবেন না। এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার বর্তমান বছরের আয়-ব্যয়ের খতিয়ান (বাজেট)-এ একটি নতুন কর ধার্য করার সুপারিশ করেছেন এবং শীঘ্রই এ সম্পর্কে আইন প্রণয়নের চেষ্টা চলছে। এই নতুন সুপারিশটি হ'ল বিত্তের উপর কর সম্পর্কে। সমাজে বিত্তবান যারা তাদের ২ লক্ষ টাকা (হিন্দু যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে ৩ লক্ষ টাকা) বা তদূর্ধ্ব বিত্তের উপর কর ধার্য করা হবে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই কর-সীমা ৫ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে। এই নতুন করটি আয়করের ন্যায় একটি প্রত্যক্ষ কর হলেও আয়কর থেকে পৃথক। ইউরোপীয় অর্থনীতিবিদেরা অনেকে, বিশেষ করে ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক ক্যালডর ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এইরূপ একটি করের আবশ্যকতা স্বীকার করেছেন। অধ্যাপক ক্যালডর হিসাব দেখিয়েছেন যে বিত্তের উপর কর ধার্য করলে ভারত-সরকারের বার্ষিক আয় ১০ থেকে ২৫ কোটি টাকা বেড়ে যাবে। তত্ত্ব ও বাস্তব বুদ্ধির দিক থেকে এই করের সার্থকতা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব।

জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরোনো ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বেকার সমাজসংস্কারক ও অর্থনীতিবিদ্দের ধারণা ছিল—সরকার জাতির অর্থনৈতিক ব্যাপারে যত কম হস্তক্ষেপ করবে ততই ভাল। এতে নাকি সব থেকে বেশী সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু সমাজ-কল্যাণের এই পুরোনো আদর্শ এ যুগে অচল। কীন্‌সীয় ধনবিজ্ঞানের মতে সমাজ-কল্যাণে সরকারী হস্তক্ষেপের বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাছাড়া, ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর দেশ। এখানে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের অংশ গ্রহণ অপরিহার্য। কিন্তু এ প্রশ্নের মীমাংসা হলে আর একটি প্রশ্ন এসে পড়ে। সরকার যখন জনসাধারণের উন্নতির জন্য তাদেরই উপর কর ধার্য করতে বাধ্য হচ্ছেন, তখন কোন্ প্রকারের কর ধার্য করলে সমাজ-কল্যাণের আদর্শটি পুরোপুরি বজায় থাকে? সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে আমরা বুঝি যে, সমাজে যাদের আয় বেশী তারা করও দেবে বেশী। সমাজ-কল্যাণের এটাই আদর্শ হওয়া উচিত। এই

কারণে পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ করের উপর অনেকসময় বেশী জোর দেওয়া হ'য়ে থাকে। কেননা, পরোক্ষ কর সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের উপরই সমানভাবে চেপে বসে। কিন্তু প্রত্যক্ষ কর যাদের সামর্থ্য বেশী তাদের উপরই বেশী চাপ দেয়। সমাজে যাদের বিত্ত যত বেশী জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাদের তত বেশী ক'রে কর দিতে হবে—এই হ'ল বিত্তের উপর করের মূল কথা। এদিক থেকে আমাদের দেশে এই করের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য, বিশেষ করে যখন ভারতের জাতীয় সরকার 'সমাজবাদী সমাজব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে একটু কথা ভাববার আছে। সামর্থ্য অনুযায়ী করভার বণ্টনের যে আদর্শ প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে তা'কি সব সময় সত্য? ভারতবর্ষের মত অনগ্রসর দেশে প্রায়ই যে কোন প্রকার করের বোঝা কি শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের ঘাড়ে চেপে বসে না? এর কারণ কি? একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব যে, এখনও সমগ্র দেশের অর্থনীতি টাকা-কড়ির আওতার মধ্যে আসে নি। অর্থাৎ এখনও এ দেশের বিভিন্ন স্তরের লেন-দেন টাকা-কড়ি বাদ দিয়েই চলে। এটা অর্থনৈতিক অনগ্রসরতারই লক্ষণ। এই অনগ্রসরতার সুযোগে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ধনী এবং মধ্যবিত্তেরা প্রত্যক্ষ করের বোঝা আংশিকভাবেই হো'ক আর পুরো-পুরিই হো'ক শ্রমিক-কৃষক এবং স্বল্প আয়ের জন-সাধারণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে সমর্থ হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। উন্নত দেশে এ রকম ব্যাপার সম্ভব নয়। এ ছাড়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আকস্মিক চাহিদা বৃদ্ধির কুফল এ দেশের অর্থনৈতিক আবহাওয়াকে বিষিয়ে দিয়েছে। যে কোন প্রকারে কর ফাঁকি দেওয়ার উৎসাহ, করভার জনসাধারণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের ভোগপণ্যের মূল্য বাড়ানোর কৌশল—এগুলি অনগ্রসর দেশের উপর যুদ্ধকালীন দালালী বা ঠিকাদারী মনোবৃত্তির সুপ্রসারী কুফল ছাড়া আর কি? এর ফলে জনসাধারণের দুর্গতি বেড়ে যায়। যদিও এই সকল ফাঁক দিয়ে প্রত্যক্ষ করের কত অংশ স্বল্প আয়ের জনসাধারণের উপর চাপছে তার সঠিক পরিমাণ করা কঠিন।

এ তো গেল তত্ত্বের দিকের কথা। বাস্তববুদ্ধির দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে—বিত্তের উপর কর ধার্য করার ফলে নানা সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে।

প্রথম সমস্যা হ'ল বিত্তের ব্যাখ্যা এবং বিত্তমূল্য পরিমাপের সমস্যা। ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির মধ্যে কোন্ কোন্ জিনিসকে বিত্তের আওতায় ফেলা যাবে তা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। যেমন, ধরা যাক্ ব্যক্তিগত আসবাবপত্র, অলঙ্কারাদি ইত্যাদির কথা। এগুলিকে যদি বিত্তের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে মোট বিত্ত-মূল্যের পরিমাণ নির্ধারণের নানা সমস্যা দেখা দেবে। আর যদি এগুলি বিত্তের আওতার বাইরে ফেলা হয় কর দেবার যোগ্য লোকের সংখ্যা অনেক কমে যাবে এবং আদায়ীকৃত করের পরিমাণ কম হবে।

আমাদের দেশে আয়করের হার অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় উঁচু। এখানে সমস্ত আয়ের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ আয়কর ধার্য করা হয়। কাজেই সুউচ্চ আয়কর থাকা সত্ত্বেও বিত্তের উপর কর ধার্য করা জনসাধারণের বিরক্তির কারণ হতে পারে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রতি একটা বিরুদ্ধ ভাব সৃষ্টি করাও মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এ ছাড়া, এই নতুন করভার কর ফাঁকি দেওয়া লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে।

এ সম্পর্কে আর এক সমস্যা হ'ল শাসনগত সমস্যা। বর্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে করধার্য এবং আদায়ের ব্যাপারে যে সকল অভিজ্ঞ কর্মচারীর প্রয়োজন তার যথেষ্ট অভাব আছে। এই নতুন কর আরও অভিজ্ঞ কর্মচারীর প্রয়োজন ঘটাবে।

এর ফলে শাসন সংক্রান্ত নানা জটিলতা সৃষ্টি হ'তে পারে।

বিত্তের উপর কর সম্পর্কে সব থেকে বড় সমস্যা হ'ল এই নতুন কর ব্যক্তিগত শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা কি ভাবে গ্রহণ করবেন। কারণ এই করের একটা বড় অংশ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদেরই দিতে হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন ব্যাপারে ব্যক্তিগত শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের একটা বিরাট অংশ দেওয়া হয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনার রাষ্ট্রায়ত্ত অংশের লগ্নির পরিমাণ হ'ল ৪৮০০ কোটি টাকা। কিন্তু এইটুকুই পরিকল্পনার সব নয়। ব্যক্তিগত শিল্পপতিদের লগ্নির উপর কল্পনার অনেকখানি নির্ভর করছে। ভারতবর্ষের মত অনগ্রসর দেশের সমস্যা শুধুমাত্র উৎপাদনের সমস্যা নয়। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থানের প্রয়োজন। এদেশে বেকার এবং অর্ধবেকার লোকের সংখ্যা অনেক। এই সব লোকের কর্মসংস্থানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হ'লে ব্যক্তিগত শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন আছে। উন্নয়ন পরিকল্পনার রাষ্ট্রায়ত্ত অংশে বৃহৎ এবং উৎপাদক পণ্যের শিল্পের জন্য লগ্নি করা হবে। উৎপাদক পণ্যের শিল্পে সাধারণতঃ শ্রমিকের তুলনায় উন্নত এবং দামী যন্ত্রপাতির বেশী দরকার। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, শুধুমাত্র পরিকল্পনার রাষ্ট্রায়ত্ত অংশ, অর্থাৎ ৪৮০০ কোটি টাকার সরকারী পরিকল্পনা এ দেশের বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। এই গুরুতর সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের অনেকখানি নির্ভর করতে হবে বেসরকারী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের শিল্পপ্রয়াস ও মোট লগ্নির পরিমাণের উপর। বিত্তের উপর কর বেসরকারী লগ্নির পরিমাণ কমিয়ে দিতে পারে। এরূপ আশঙ্কাও অমূলক নয় যে, এই কর ব্যক্তিগত শিল্পপতিদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন করে তুলবে।

এ দেশের বেসরকারী লগ্নি সম্পর্কে একটা কথা ভাববার আছে। সরকারী মহল থেকে শিল্পপতিদের হয়ে এবং ব্যক্তিগত শিল্পপতিদের অনেকের কাছ থেকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে সার্থক করার একটা মৌখিক উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে এ কথা ঠিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় বেসরকারী মহল থেকে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যতটা লগ্নি আশা করা গিয়েছিল তা' হয়নি। ব্রহ্ম কমিটির রিপোর্ট আলোচনা করলে এ বিষয়ের সত্যতা প্রমাণিত হবে। মোটামুটি প্রথম পরিকল্পনায় আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা খুব সুখের নয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায়ও বেসরকারী লগ্নি যতটা আশা করা যাচ্ছে ততটা হবে না—এ কথা বলে কি ভুল বলা হবে? এর উপর আবার যখন বিত্ত, ব্যক্তিগত আয় প্রভৃতির উপর করধার্য হচ্ছে তখন ব্যাপার হয়ত আরও খারাপ হয়ে দাঁড়াবে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, শুধু বিত্তের উপর কর বসালেই যে পরিকল্পনার অর্থ সংগ্রহের সমস্যা মিটে যাবে এ কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। এই নতুন কর ধার্যের ফলে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হবে তাদের সুষ্ঠু সমাধানের উপরই নির্ভর করছে এই কর এবং অনেকাংশে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য।

"দেশের ইতর সাধারণ লোককে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির একটী কারণ। যতদিন না ভারতের সর্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে খাইতে পাইতেছে, অভিজাত ব্যক্তিরা যতদিন না তাহাদের উত্তমরূপে যত্ন লইতেছে ততদিন···কিছুতেই কিছু ফল হবে না।"

—বিবেকানন্দ

সাধুসঙ্গ ও শান্তি

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন বসু

অতীন্দ্রিয় অনেক কিছুই মানুষ অস্বীকার করে কিন্তু এই জগৎ যে এক শক্তির দ্বারা পরিচালিত সেটা অনুভব করে বিদ্যুতে-বাতাসে চলমান যা-কিছুর মাঝে। বিজ্ঞানের প্রসারতায় মানুষ জেনেছে যে, জগৎটা গতিশীল, অণুপরমাণু হ'তে সকল পদার্থেরই পরিবর্তন হচ্ছে নিত্য। পদার্থ যখন সূক্ষ্মতর তখন দর্শনে দৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। তাই সবশেষে এক শক্তিকে সবাই মানতে প্রস্তুত। সেই শক্তিকেই আমরা বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছি। সোনার কাঁকন আর কুণ্ডলে যেমন কেবল নামের তফাৎ আসলে সোনা উপাদানটি এক, তেমনি ক'রেই আমরা নাম দিয়েছি 'শক্তি' 'আত্মা' 'ব্রহ্ম' 'ভগবান' বা 'গড্' 'আল্লা' 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' এমনি সব কত কি। আসলে কিন্তু একের মাঝেই বহুর প্রকাশ।

এমনি একের মাঝে যার প্রাণমন কেন্দ্রীভূত তিনি হচ্ছেন সাধু। যিনি আপনার সত্তাকে একের সত্তায় অনুভব করেন, কথায়-কাজে-চলনে-বলনে নিরন্তর তুষ্টির কড়ি নিয়ে সাক্ষীগোপাল হ'য়ে থেমে যান, অহংতা ও মমতা হ'তে সরে গিয়ে শান্তি-সরোবরে নিমগ্ন এমনি সাধুর সঙ্গেই যে শান্তি আসে এ কথা বলা বাহুল্য।

আমরা অনেকেই বলি ভগবান সব জিনিস দিয়েছেন কেবল শান্তি দেননি। সুখে-দুঃখে, আঘাতে-অপমানে, চলার পথে অনেক কিছুই পেয়েছি, শান্তিই শুধু পাইনি। অমি-অর্থ-টাকা পেয়েছি, শ্রান্তির মাঝেও ক্লান্তি নামেনি, আসেনি শুধু শান্তি।

কিন্তু শ্রান্তির মাঝেও যে শান্তি আসে এটা অনুভব করিনি। শান্তি-নদে আমরা আকণ্ঠ নিমগ্ন তবুও রসাস্বাদ হয়নি কণ্ঠে-জিহ্বায়। তাইতো শান্তি পেতে শান্তির প্রতীকের কাছে যেতে হবে। যিনি অচল-অটল-অমল তাঁর সাথে থেকে নির্মল হ'তে হবে। যিনি দর্পণ হ'য়ে আছেন সকল কিছু অর্পণ ক'রে তাঁর দর্পণে আমাদের স্বীয় রূপের দর্শন প্রয়োজন।

মনের দাস হয়ে আছি আমরা। মনের পশুকে শিকার করেছি তবু মনের পশুকে হত্যা করা হয়নি। শাখামৃগের মতো চঞ্চল মনের অনুসরণ ক'রে ক্ষণে ক্ষণে বিচরণ ক'রেছি অরণ্যে প্রান্তরে। শ্রান্ত হয়েছি, ক্লান্ত হয়েছি, একটি ছায়াসুশীতল আশ্রয় চেয়েছি বিশ্রাম মানসে। ক্ষণিক বিশ্রামের পরই আবার ছুটেছি অবসাদগ্রস্ত, বিব্রত হয়ে। সুব্রতচারী নই তাই ক্লান্ত পথচারীর মতো তৃষ্ণার্ত হয়ে কাতর হয়েছি।

তাইতো, যিনি সুকোমল স্পর্শে সুমিষ্ট ভাষায় আশার প্রদীপ জ্বালেন তাঁর কাছে যাওয়া চাই। যিনি সুস্থির হ'য়ে আনন্দ-অমৃতের নীর বিতরণ করেন, যিনি বক্ষে সাহসের মশাল জ্বালিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দেন, তাঁর কাছে এসে সবাই যে শান্তি পাবে। যিনি তিরস্কার ক'রেই পুরস্কার দেন, অভিযুক্তকেও একান্ত আত্মীয় বলে বুকের কাছে টেনে নেন, আপন সৌম্যমূর্তির মাধুর্যেই যে তিনি অকৃপণ সুগন্ধি শান্তিবারি বিতরণ করেন।

যাঁর মনের ঘড়ি ষড়ো সঠিক তাঁর কাছে এসেই তো আমাদের লো-ফাই'-যাওয়া মন-ঘড়িটাকে মিলিয়ে নিতে হবে। সংসারে যে আমরা সং সেজে রয়েছি এ কথা তিনি ভালো জানেন ও জানিয়ে দেন। তাই যিনি সাধে মাতে আছেন তাঁর কাছে বসলেই মধু পান করা যায়।

'কাঁচা আমি'র অহংকারেই আমরা কষ্ট পাই। তাই 'পাকা আমি'র সংস্পর্শে এলে আমাদের মন রঙীন হ'য়ে যায়। যিনি রসেবশে আছেন তিনিই আমাদের হৃদয়মন রসসিক্ত করেন। রসবতীতে যেমন কালি লাগে অজান্তে, তেমনি সবার অলক্ষ্যেই তিনি দেহে মনে ভক্তি-জ্ঞান আর নির্ভরতার কালি লাগিয়ে দেন। তাঁর ক্ষণিক সঙ্গলাভেই যেন কত আনন্দ, ব্যর্থতার মাঝেও সার্থকতার ধ্বনি, সকল অবসাদের মাঝেও মিষ্ট পরসাদের আস্বাদ।

রঙ তুলি দিয়ে শান্তির কান্তি যে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে না, তাই সাথে থেকে অনুভব করতে হবে, আবিষ্কার করতে হবে শান্তি-স্রোতস্বিনী—তবেই তো জানা হবে মনমাতানো মন্দাকিনীতে।

আক্ষরিক জ্ঞান দিয়ে অক্ষরকে অনুভব করা যায় না। নূপুর-নিক্কণে আর হাঁসুলী পরণেই মনের বর্ণ স্বর্ণ হয়ে ওঠে না। কবি যেমন কাব্যে, গায়ক যেমন গানে, চিত্রকর তাঁর আপন-আঁকা চিত্রে মন মজিয়ে বসে থাকেন, তেমনি ক'রে মন মজালেই শান্তি আসে। তাই যিনি ছন্দে-কাব্যে-চিত্রে বিশ্বের বিচিত্রতায় একের ক্রীড়ায় সকল পীড়াকে ভুলে গিয়ে নিভৃতে শান্তির বারি পান করেন তাঁর কাছে গেলেই একটু শান্তি অমৃত পাওয়া যায়।

আমরা কেবল জ্ঞানবিচারের অহংকারে অন্ধ হয়ে আছি তাই জ্ঞানবিচারের পারে-যাওয়া পাগলের কাছেই মাদল-ধ্বনি শুনতে পাবো। কেবল কতক-গুলি বর্ণ ও বাক্যের জ্ঞানেই আমরা 'রবী পাকরসং মধা' হ'য়ে রসাস্বাদ ক'রতে পারিনে। কেবল এই রসাস্বাদনের জন্যেই সাধুসঙ্গ প্রয়োজন।

আমাদের মাঝেই দেবতা লুকিয়ে আছেন। অজ্ঞতার অর্গল দিয়ে তাঁকে যে দেখতে পাইনা। সেই অর্গল মুক্ত ক'রতে গিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছি। সকল আশা হারিয়ে ফেলে দীন হ'য়ে যাচ্ছি। তখনই তো সাধুসঙ্গ ঝড়ের রাতের প্রবল বাত্যার মতো এসে রুদ্ধ অর্গলকে মুক্ত ক'রে দেয়—কাছের সাথী হয়ে অন্তরের বাতিকে প্রজ্বলিত করেন।

মস্তকরী হ'য়েও স্রোতের মাঝে আমরা ভেসে যাই। কিন্তু সাধু যিনি মৌন হ'য়ে স্রোতের শরণাগত হ'য়ে আছেন তিনি তো হীন হ'য়ে পড়েন না। চক্রের মতোই ঘুরছেন কিন্তু এক দণ্ডের উপরে তাঁর বসতি। তিনি খুঁটি ধ'রে বসে আছেন তাই দিগ্বিদিক্ হারা পাক্ষা ফেলে খুঁটি সরিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আমরা দিকহীন দিগন্তের কোলে ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাই যিনি খুঁটি ধরে আছেন তাঁর হস্তটি ধরলেও সুস্থির হওয়া যায়। বড়ো জাহাজের সাথে গাবাবোট হ'য়ে জুড়ে থাকলেও যে ডুবতে হয় না, উত্তাল তরঙ্গ পেরিয়ে শান্তির মোহনায় উপনীত হয়ে সকল শ্রান্তি মুছে ফেলতে পারা যায়। তাই সাধুসঙ্গে মনে হয়:

'তোমার কোলে লইবা তুইলে
জুড়াইমু গিয়া,
তোমার কোলে নিমু সুখে
জুড়াইমু হিয়া।'

"এত বড় বিরাট বিচিত্র সৃষ্টি—চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, জীবজগৎ সবেরই কিন্তু একদিন ধ্বংস আছে। প্রতিমুহূর্তে সব জিনিসই কিছু কিছু বদলাচ্ছে—বায়স্কোপের ছবির মতন। কিন্তু এই পরিবর্তনের ভেতর একটা জিনিস আছে যার কোনকালেই পরিবর্তন নেই, তা হচ্ছে আমাদের আত্মা।"

স্বামী অভেদানন্দ

একটি ভাববার কথা

শ্রীবালকরাম ভট্টাচার্য

শুধু বর্তমান যুগ-মানসে নয়, সত্যকার ভারতের যে বিশেষত্ব অন্যান্য দেশ হ'তে লক্ষ্য করা যায় তার মূলে একটা সত্য তথ্য আছে। এ সম্বন্ধে একটু স্পষ্ট ক'রে বলা যাক। ভারতবর্ষ প্রাচীনকালেই বিদ্যাকে দুই ভাগে ভাগ ক'রেছে। একটা হ'চ্ছে পরা এবং আর একটা হ'চ্ছে অপরা। পরা বিদ্যা হ'চ্ছে সেই সমস্ত বিদ্যা যার দ্বারা পরম তত্ত্বকে জানা যায় এবং অপরা বিদ্যার দ্বারা সাংসারিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করা যায়।

ঐ পারমার্থিক বা পরা বিদ্যার আরও বেশী সংহত ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় শাস্ত্রের প্রস্থান-ভেদে। প্রস্থানভেদে শাস্ত্রকে তিন ভাগে ভাগ করা হ'য়েছে। তা হ'চ্ছে শ্রুতিপ্রস্থান, স্মৃতিপ্রস্থান ও ন্যায়প্রস্থান। এই তিন প্রস্থান পরা বিদ্যাকেই বিভাগ করেছে। অপরোক্ষ ও আগম-প্রধান অনুভূতিকে একেবারে একান্ত ভ স্পষ্ট ক'রে দেখান হ'য়েছে শ্রুতিপ্রস্থানের মধ্যে যা হ'চ্ছে বেদ। এ ছাড়া বেদান্তদর্শনে 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' সূত্রটির মধ্যে এবং আচার্য শঙ্করের প্রমাণাবলীর মধ্যে আপ্ত বাক্য বা আগম প্রমাণে পরাবিদ্যার নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রায় স্বীকার করা হয়েছে। সমস্ত বিদ্যাকে পরা ও অপরা বিদ্যায় ভাগ ক'রে পরাবিদ্যার মধ্যে যতখানি পরিমাণ অবীক্ষার ক্ষেত্র আছে ততখানি পরিমাণ তাকে স্বীকার ক'রে পরে অবীক্ষার অতীত বা ইন্দ্রিয়বোধের বাহিরের ক্ষেত্রে পরম তত্ত্বকে জানিবা না ব'লে শ্রুতিবাক্য বা আপ্ত বাক্য ব'লে একটা শাস্ত্রীয় মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

'ইন্দ্রিয়াতীতের ক্ষেত্রকে শুধু বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় না'—এই বাক্যটির মধ্যে আস্তিক-নাস্তিক, সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনা প্রভৃতির যে নানাবিধ জটিল প্রতিক্রিয়া এক প্রকারের কৌতূহলকে নিজের মধ্যে পোষণ করে, সেই প্রকারের কোন জটিল প্রতিক্রিয়া-মূলক কৌতূহল ভারতীয় চিত্তকে প্রধানতঃ ভারাক্রান্ত করে রাখে না। তার মূল কারণই হ'চ্ছে ঐ আপ্ত বাক্যের প্রভাব। এই আপ্ত বাক্যের প্রভাবে ভারতীয় চিত্ত প্রধানতঃ গঠিত ব'লে তার মধ্যে ঐ জটিল প্রতিক্রিয়াটা সাধারণতঃ একেবারে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র-ভাবে অবলম্বনহীন হ'য়ে কোন কৌতূহল পোষণ করে না। এমন কি নাস্তিকতাও ভেতরে ভেতরে পোষণ করলে বিশ্বাসের প্রলেপ তখনও থাকে। এখানে ভারতীয় মন ইউরোপীয় মনের মত একেবারে নিঃশেষে নৈরাজ্যবাদী হয় না।

ইউরোপীয় মন জীব ও জগতের আলোচনায় যে চিন্তা ও অবীক্ষা বৃত্তির অনুশীলন ক'রেছে ঈশ্বরের আলোচনায় সেই চিন্তা ও অবীক্ষার দৃষ্টিভঙ্গীটাকেই প্রধান ক'রে অগ্রসর হ'য়ে বাধা পেয়েছে। বিশ্লেষণী চিন্তা ও অবীক্ষার দৃষ্টিভঙ্গীটা প্রধান থাকায় সেই চিন্তা ও অবীক্ষার সামগ্রিক মূল্যে ঐ বাধা বা ব্যর্থতাকে ঈশ্বরত্বের সত্যতার দিক থেকে বিচার করেছে। এই বিচার করবার ফলেই তাদের সাধারণ মন ঐ রকম নৈরাজ্যবাদী হ'য়েছে।

আপ্ত বাক্যের বা শ্রুতিবাক্যের স্থান শুধু যে ধর্মশাস্ত্রে আছে তা' নয়, ভারতীয় দর্শন ও প্রমাণ শাস্ত্রেও আমরা তার পরিচয় পাই। ফলে ভারতীয় মনে নৈরাজ্যবাদের ভাবটা মাঝে মাঝে দেখা গেলেও তাদের মনে একটা বিশ্বাসপ্রবণতা নিগূঢ়ভাবে বর্তমান থাকে। ইউরোপীয় মন এ ক্ষেত্রে শুধু কারণ তাদের ওবশাস্ত্রে আপ্ত বাক্যের কোন স্থান

নেই। জ্ঞানসাধনপ্রণালীর দিক দিয়ে চিন্তা ও অভীক্ষার প্রামাণিকতা এবং মূল্য নিঃশেষে মেনে নেওয়া হয়েছে, ফলে বাস্তিকের আস্তিকতার ভাবটা তার কাছে নিছক ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশীর ব্যাপার হ'য়ে পড়ে। কোনও ঘটনা বা পরিবেশই তার মতকে পরিবর্তন করতে পারে, না হ'লে নয়।

বিশ্বাস করবার বা মানবার কোনও দার্শনিক বা তাত্ত্বিক নজীর তাদের সংস্কৃতিতে নেই ব'লে এ সম্বন্ধে কোন সুস্থ দায় ও ঔচিত্যও তারা অনুভব করে না। বিশ্বব্যাপারের ওপর নির্ভর করবার জন্য ঐ অজ্ঞ ও অন্ধ'কামূলক বুদ্ধিকেই তারা নিঃশেষ মূল্য দেওয়াতে তাদের চিত্ত যেমন কার্য-কারণ ছাঁচে গড়ে' উঠেছে সেই রকম ঐ কার্য-কারণ। পরিধির বাইরের দিক থেকে কোনও কিছু আসবার সম্ভাবনা না থাকাতে তাদের চিত্ত হয়েছে কঠিন, নমনীয় নয়।

ভারতীয় চিত্তও কিছু অলৌকিক পদার্থে গঠিত নয়। তাও কার্য-কারণশীল কিন্তু 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' ব'লে তাদের চিত্তে যে ফাঁকটা রাখা হ'য়েছে ঐ ফাঁকটার ভেতর দিয়ে কার্য-কারণ পরিধির বাইরের অজানা অদৃষ্টের অপূর্ব আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য তাদের তৈরী করবার চেষ্টা হ'য়েছে। চিত্তের ঐ উন্মুখী ভাবটা, অজ্ঞতাকে তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাধা ব'লে অনেক সময় মনে করে, সেই জন্যই তার চিত্ত সেখানে হ'য়েছে শান্ত ও নমনীয়।

ভারতীয় চিত্তের এই বৈশিষ্ট্য শুধু তার আচার ব্যবহারে পরিস্ফুট নয়, উপরন্তু তার জ্ঞানসাধন-প্রণালীতেও এই চিত্ত ঐ আপ্ত বাক্যের প্রভাবকে মেনে নিয়েছে। ভারতীয় চিত্ত থেকে ঐ আপ্ত বাক্য ও তার নানামুখী নমনীয় প্রভাব তুলে নিলে ভারতীয় চিত্ত হয়ত ইউরোপীয় হ'তে পারত।

সে যে চিরন্তনীর ছন্দ রে

অবধূত সত্যব্রত

আনন্দ যার রূপের ধারা
তুমি নও তো তাঁরে ছাড়া,
চিদানন্দময়ী তারা
হৃদি মাঝে বিরাজ করে।

আনন্দময়ীর আনন্দ ছাড়া
ভবের জীবন সকল হারা
দেখ্‌না খুলে নয়ন তারা
যা রয়েছেন জগৎ জুড়ে।

মায়ের দেওয়া এ ছার জীবন
তাঁরে ছাড়া হয় কি পূরণ ?
দেখনা খুঁজে ভবের জীবন
নাইকো হেথা আনন্দ রে।

যাঁর খেলার যন্ত্র তুমি
তাঁরে ভুলে বল না আমি
বিশ্বমায়ের লীলাভূমি
সে যে চিরন্তনীর ছন্দ রে।

দক্ষিণেশ্বর স্মরণে

শ্রীবিভূতিভূষণ শূর

মৃত্যু জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কিন্তু যাঁরা কীর্তিমান মহাপুরুষ বা অবতার তাঁদের কল্যাণবাণী যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ ভক্তিপ্লুত চিত্তে স্মরণ করিয়া এবং তাঁদের আদর্শকে অনুসরণ করিয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া রাখে। দশ হাজার বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ কি বলিয়া গিয়াছেন কিংবা শ্রীরামচন্দ্র কি করিয়াছিলেন আজও আমরা তাহা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে গৌতম বুদ্ধ কি বলিয়া গিয়াছেন—আজও অর্ধ জগৎ তাহা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। যীশুখৃষ্ট হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত মহামানবগণ এইরূপে যুগে যুগে সংসারে আসিয়া আমাদিগকে ধর্মের গ্লানি হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন—তাঁদের উপদেশসূত্র দিয়া এবং তাঁদের ত্যাগপূত আদর্শ দিয়া। মানব-সমাজ এঁদের অমর-বাণী ও আদর্শকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করিয়া ইহাদিগকে অমর করিয়া রাখে। এই কথাটা বিশেষ করিয়া মনে পড়িল সেইদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়া। এর আগেও দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল বারকয়েক, কিন্তু এবার যেন ওখানকার সবকিছু নূতন করিয়া মনে পড়িল। দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণকে বাদ দিয়া দক্ষিণেশ্বরকে ভাবা যায় না, যেমন শ্রীরামচন্দ্রকে বাদ দিয়া অযোধ্যাকে, শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়া বৃন্দাবনকে এবং শ্রীগৌরাঙ্গকে বাদ নবদ্বীপকে ভাবা যায় না। এখানে আসিয়াই প্রথমে মনে পড়িল ৭০।৭২ বৎসর পূর্বের কথা। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসেও ঠাকুর এখানেই ছিলেন, তখন দক্ষিণেশ্বরে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। নাই শুধু সেই পরম পূজারী পরম সাধক পরম পুরুষ, যাঁর পদধূলি বক্ষে ধারণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর মহিমান্বিত,—সেই অবতারশ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

ফটক দিয়া ভিতরের দিকে যাইতেই প্রথম দৃষ্টি পড়িল রাধাকান্তের মন্দিরের দিকে, মনে পড়িল এখানেই সেই বিগ্রহ মূর্তির ভাঙ্গা-পা ঠাকুর অতি নিখুঁতভাবে সারিয়াছিলেন। এখনও সেই মূর্তির পূজা হয় কিনা জানি না। ভবতারিণীর মন্দিরে যাইতেই মনে হইল এই সেই জগজ্জননীর মৃন্ময়ী মূর্তি—যাঁর মধ্যে সেই পরম সাধক চিন্ময়ী মূর্তি দেখিয়াছিলেন। আরও মনে হইল "মা, আর কি তোমার মধ্যে চিন্ময়ী মূর্তি দেখিবার মত কোনও মহাসাধকের আবির্ভাবে হইয়া ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে না?" মন্দির হইতে বাহির হইতেই মনে হইল এইখানেই বিরহ-চিন্তায় মগ্না উপবিষ্টা রাণী রাসমণির কোমল অঙ্গে ঠাকুর তাঁর কোমল হাতে চপেটাঘাত করিয়া একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইখানেই বেদান্তবাদী শ্রীমৎ তোতাপুরী মহারাজ জগজ্জননীর নিকট নতিস্বীকার করিয়া তাঁহার শিষ্য ও গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট বিদায় লইয়াছিলেন। সেখান হইতে নাট-মন্দিরের দিকে যাইতেই মনে পড়িল এখানে উপবিষ্ট বৈষ্ণবচরণকে ঠাকুর কৃপা করিয়াছিলেন। এখানেই প্রাতঃস্মরণীয় ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া অনেক তত্ত্বকথা শুনাইয়াছিলেন। সেই সকল কথামৃত স্মরণ করিতে করিতে অগ্রসর হইলাম বাদল শিবের মন্দিরের দিকে। মনে পড়িল এখানেই ঠাকুর "শিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং তদপি তব গুণানাং ঈশ পারং ন যাতি" স্মরণ করিয়া অজস্র রোদন করিয়াছিলেন। সংবাদ পাইয়া মথুরানাথ আসেন ও রোদনের কারণ উপলব্ধি করেন। চলিলাম এখন ঠাকুরের সেই বহু পরিচিত ঘরখানির দিকে—যেখান হইতে বেদ বেদান্ত ও গীতার বাণী বাহির হইয়া সংসার-সন্তপ্ত লোকদের প্রাণে পরম শান্তি সিঞ্চন করিয়া আসিতেছে।

আধুনিক সাজে সজ্জিত ঘরখানি যদিও তার মৌলিকত্ব হারাইয়াছে, তথাপি ঠাকুরের, শ্রীমায়ের এবং তাঁদের বিশ্ববিশ্রুত সন্তানদের পরশে ঢাকা পড়িয়াছে ঐ আধুনিকতার অন্তরালে—তবু তাঁদের মহান্ স্মৃতিকে সে গ্রাস করিতে পারে নাই। মনে পড়িল ঠাকুর তাঁর প্রিয়তম সন্তানদের হাতেখড়ি এখানেই দেন, এখানেই শ্রীমাকে "যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন" মন্ত্রে দীক্ষা দেন, এখানেই ঠাকুর শ্রীমাকে ষোড়শীপূজা করিয়া তাঁর পায়ে অঞ্জলি-দান পূর্বক সকল পূজার ইতি করিয়াছিলেন। এই সেই মহাতীর্থ, যেখানে সাধু নাগ মহাশয়, ভক্তপ্রবর গিরীশ ঘোষ, শ্রুতিধর ও স্মৃতিধর শ্রীম প্রভৃতির বহুবার শুভাগমন হইয়াছিল। যেখান দেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির এখানে বহুবার আগমন হইয়াছিল। উত্তর দিকের দরজা দিয়া বাহির হইতেই মনে পড়িল এই বারান্দায় ঠাকুরের পদচারণের সময় ভাগ্যবান মথুরানাথের নানা প্রকার দিব্য দর্শন ঘটিয়াছিল। একটু অগ্রসর হইতেই দৃষ্টি পড়িল নহবত ঘরের দিকে, এই সেই ছোট্ট মন্দির। এখানে শ্রীমা লোকলোচনের অন্তরালে নিঃশব্দে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর বাস করিয়া ঠাকুরের সেবা করিয়া গিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল গৌরীমা, গোলাপমা, যোগেনমা, লক্ষ্মীদিদি প্রভৃতির কথা—যাঁরা ছিলেন ঠাকুর-মায়ের লীলার সহচরী, এবং এখানেই থাকিতেন। মনে পড়িতেই মন্দিরের পাদমূলে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হইল। যখন পঞ্চবটীতে যাইলাম প্রথমেই মনে পড়িল শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গ। তাঁহার ঘর শুদ্ধাদি করিয়া তৎকালীন পুলিশের বড়কর্তারা একটা জিনিষ পান, উহা ছিল দক্ষিণেশ্বরের মাটি। অরবিন্দ উহা শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজ ঘরে রাখিয়াছিলেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ ভাবিয়াছিল উহা একটা ভয়ঙ্কর রকমের বিস্ফোরক পদার্থ। এক হিসাবে তাঁদের এই ধারণা নেহাৎ মিথ্যা ছিল না, ইহা জগতের পাপ-তাপ, দুঃখ-দুর্দশা ভস্ম করিবার মত ক্ষমতা ঐ মাটির মধ্যে নিহিত ছিল। যাক্‌সে প্রসঙ্গ, এই সেই পঞ্চবটী—যেখানে ঠাকুর "টাকা ও মাটির" অভেদ বিচার করিয়াছিলেন, এইখানেই ভগবান প্রাপ্তির জন্য ঠাকুরের কী কঠোর সাধনা—কী কঠোর ব্যাকুলতা। এইখানেই ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নিকট ঠাকুরের ৬৪খানা তন্ত্রের সাধন ও কঠোর পরীক্ষায় উত্তরণ, এখানেই শ্রীমৎ তোতাপুরী মহারাজের নিকট ঠাকুরের সন্ন্যাস গ্রহণ, যেখান সাধনা ও মাত্র তিনদিনে নির্বিকল্প সমাধিলাভ, যে সমাধি লাভ করিতে শুকদেব ৪০ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। সবই অপূর্ব।

এখানে কত মতের কত পথের কত সাধু-মহাত্মার শুভাগমন হইয়াছিল। সকল মত ও সকল পথকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়া ঠাকুর জগদ্বাসী সকল সম্প্রদায়কে তাঁহার অপূর্ব বাণী শুনাইয়াছেন "যত মত তত পথ।" দেখিতে দেখিতে মনে হইল সবই ঠিক আছে শুধু একজনের অভাবে সবই যেন প্রাণহীন। অবতারশ্রেষ্ঠ তাঁহার প্রথম লীলা এখান হইতেই শুরু করিয়াছিলেন। তাই—

"নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।"

স্মরণ করিয়া বিদায় নিলাম এই পবিত্র স্থান হইতে।

"সর্বদা সাধুসঙ্গ করলে মনে সাধুপথে যাবার প্রবৃত্তি ও প্রেরণা ওঠে – মনে পবিত্রতা, ব্যাকুলতা আর দৃঢ়তা আসে।"

—স্বামী অভেদানন্দ

সিদ্ধ মহাপুরুষ বালকদাস বাবাজী

শ্রীবিজয়গোপাল বসু

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে বালকদাস খুলনা-বাগেরহাট মহকুমা শহর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরবর্তী চরকাঠি নামক পল্লীতে মাহিষ্যকুলে জন্ম পরিগ্রহ করেন। "বালক"—তাঁহার পিতৃদত্ত নাম, "দাস"—কৌলিক উপাধি।

তখনও ভারত হইতে মোগল-প্রতাপ সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয় নাই। দিল্লীশ্বরের নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন ছিল। শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা বাদশাহকে বাৎসরিক করপ্রদানে রাজ্যশাসন করিতেন। বস্তুতঃ সম্রাটের কোন ক্ষমতাই ছিল না। তাঁহার রাজসভাগৃহ ছিল, অমাত্য ছিল না; কোষাগার ছিল, ধন-রত্ন ছিল না; সেনা-নিবাস ছিল, সৈন্য ছিল না; অস্ত্রাগার ছিল, অস্ত্রশস্ত্র ছিল না; রাজপুরী ছিল, তাহা জনকোলাহলমুখর ছিল না।

বিদেশী সভ্যতা সে যুগে ভারত সীমানায় অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই। সমাজ প্রাচীন ধারারই অনুসরণ করিত। ভারতের কৃষিজ, খনিজ এবং শিল্পজ দ্রব্যাদিতেই ভারতীয়দের সর্ববিধ অভাব অভিযোগ বিদূরিত হইত। বর্ণাশ্রম ধর্মের রীত্যনুসারে ব্রাহ্মণ-সন্তান যজন-যাজনাদি ক্রিয়া শিক্ষা করিতেন, বৈদ্য-সন্তান চিকিৎসা বিদ্যায় জ্ঞানার্জন করিতেন, তন্তুবায়-সন্তান বয়ন কার্য শিক্ষা করিতেন, কৃষক-সন্তান কৃষি-কার্য শিক্ষা করিতেন। এ নিমিত্ত তখনকার দিনে বেকার সমস্যা দেশে আদৌ ছিল না।

বালকদাসের পূর্বপুরুষগণ কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করিতেন। পিতামাতার ইচ্ছা—পুত্র অল্পবয়সে করিয়া কৃষিকার্য শিক্ষা করে। তাঁহার মাতা থালায় করিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি পুত্রের হস্তে দিয়া ক্ষেত্রে স্বামীর আহারের জন্য প্রেরণ করিতেন। পিতা বালকদাসকে তাম্রকূট প্রস্তুত করিতে বলিতেন। হুঁকায় তাম্রকূট সেবন অবসাদ-বিদূরক। পুত্রকেও সেই তরুণ বয়সেই তিনি ধূমপানাসক্ত করিয়া তোলেন। কিন্তু কৃষিকার্যে তাঁহার উৎসাহ একটুও দেখা যায় নাই। ক্ষেত্র-পার্শ্বে সুবিস্তৃত বটবৃক্ষছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া নিঃসঙ্গ শোভা উপভোগই তাঁহার পক্ষে পরম তৃপ্তিদায়ক হইল।

"যে গাছটা বড় হয়,
দু-পাতায় পরিচয়।"

বয়োবৃদ্ধি সহকারে হরিসঙ্কীর্তন, যাত্রাগান, ভাগবৎ পাঠ, গাজীর গান, মনসার বয়ানি, কবিগান শ্রবণে বালকদাসের বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশিত হইত।

"গুণী গুণং বেত্তি"

গ্রামস্থ শশধর জ্যোতির্ভূষণ বালকদাসের কার্যাবলী লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে শাপভ্রষ্ট যোগী বলিয়া বিশেষ হর্ষ প্রকাশ করেন।

যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়া বালকদাস সংসার ধর্মে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়েন। গো-পশ্বাদি শস্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে তিনি কদাচ চঞ্চল হইতেন না। এমন কি গৃহপ্রবিষ্ট তস্করকেও তিনি কিছু বলিতেন না। ইহাতে পিতামাতার ব্যাকুলতায় তিনি সময় সময় উক্তি করিতেন:

"পুতুল বাজির পুতুল আমি
যেমনি নাচায় তেমনি নাচি।"

পুত্রের এবম্বিধ ভাবদর্শনে পিতা-মাতা তাঁহাকে বিবাহ দিয়া সংসারী করিতে প্রয়াসী হন।

"সকলি তোমারি ইচ্ছা
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি;
তোমার কর্ম তুমি কর মা
লোকে ব'লে করি আমি।"

কয়েকটি সম্বন্ধ উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু কোন কন্যার

পিতাই তাঁহাকে বস্ত্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। কারণ বাল্যকাল হইতে আত্মভোলা পুরুষ তদুপরি কৃষিকার্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এরূপ লোকের বিবাহ না করাই ভাল—এরূপ উক্তিও কেহ কেহ করেন।

বাল্যকাল তখন হইতে সংসার ত্যাগের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"

চরকাঠি গ্রাম হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্তী লাউপালা গ্রামে বাল্যকালের পিতামাতার গুরুবংশীয়দের নিবাস-স্থল। গুরুদেবের পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া সপুত্র পিতা বিবিধ উপচার সহ লাউপালা গ্রামে গমন করেন।

গ্রামখানি গণ্ড না হইলেও নিসর্গ শোভায় সমৃদ্ধ। তিনদিকে ভৈরব নদ কলনাদে প্রবাহিত হইত। বট অশ্বত্থাদি বৃক্ষরাজি স্থানে স্থানে বর্ধিত হইয়া মুনিঋষিদের তপোবনের কথা স্মরণ করাইয়া দিত।

গুরুদেবের ষাটীর শুভকার্য শেষান্তে পিতা স্বগ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন কিন্তু পুত্র স্বভাবের শোভায় আকৃষ্ট হইয়া আরও কতিপয় দিবসের জন্য লাউপালা পল্লীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

বাল্যকাল নদী তীরস্থ বৃক্ষমূলে সায়ংসন্ধ্যা উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহার সৌন্দর্যপিপাসু মনের শান্তি বিধান করিতেন। নিয়ত সচ্চিন্তা ও ভক্তি ভাবের ফলে তাঁহার শরীরে এক অনুপম তেজঃ প্রতিভাত হইতে থাকে। তাঁহাকে দর্শন করিবা মাত্রই হৃদয়ে শ্রদ্ধার উন্মেষ হয়।

একদিন অপরাহ্নে তিনি পশ্চিমগগনের অস্তগামী সূর্যের মনোহর কিরণচ্ছটা অবলোকন করিতেছেন এমন সময় কোন ধীবর নদীগর্ভে প্রাপ্ত ৺গোপালের এক মর্মর মূর্তি তাঁহাকে প্রদান করে।

বিগ্রহ প্রাপ্তিতে বাল্যকালের ধমনীতে বিজলী চমক্ হইতে লাগিল। ভাবোন্মাদ হইয়া বাল্যকাল আহার, নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া যান। বৈকুণ্ঠের ৺গোপাল কৃপাবশে তাঁহারই অঙ্কশায়ী।

"ভাবেন লভ্যতে সর্বং ভাবেন দেবদর্শনম্।
ভাবেন পরমং স্থানং তস্মাদ্ভাবাবলম্বনম্।"

তিনি ৺গোপালগত প্রাণ হইলেন। ৺গোপালের ক্ষুধার শান্তিতে, পিপাসার নিবৃত্তিতে, সুখশয্যায় এবং অন্যবিধ সুখ-সুবিধা বিধানেই তিনি পরম তৃপ্তি বোধ করিতেন। ভাবাবেশে সময় সময় ৺গোপালের সঙ্গে বাক্যালাপও করিতেন।

বাল্যকাল ৺গোপালের ভোগের জন্য ঘরে ঘরে ভিক্ষা আরম্ভ করেন; শয়নঘর নির্মাণের জন্য সাধারণের সাহায্যার্থী হন; তাঁহার শয্যাও যাচ্ঞা করিয়া সংগ্রহ করেন।

"ভক্তের অধীনই ভগবান্"

যাঁহাতে ভগবদ্ভাব বিদ্যমান্ তিনি ভক্ত। ভক্তই ভগবানের পরিচয় করাইয়া দেন।

"ধর্মের চাক আপনিই বাজে"

ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে যে বাল্যকালের ৺গোপাল জাগ্রত। ভক্ত নরনারী ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে ৺গোপালের দ্বার সম্মুখে অভীষ্ট কামনায় ধর্ণা দিতে লাগিলেন।

"দেবতা-নৃপ-ভিষক ঘরে
দেখতে নাইক শূন্য করে।"

কাজেই প্রতিদিন প্রচুর ভোগের দ্রব্যাদি আসিতে থাকে। চাউল, ডাউল, ঘৃত, সব্জি, দধি, দুগ্ধ এবং বিবিধ মিষ্ট সামগ্রী। বাল্যকাল ব্রাহ্মণ দ্বারা ভোগ প্রস্তুত করাইয়া ঠাকুরকে নিবেদিত করিতেন। সমবেত ভক্তবৃন্দ পরিতোষ সহকারে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইতেন।

ক্রমশঃ ৺গোপালের মাহাত্ম্য চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল।

"উপার্জিতানাং বিত্তানাং ত্যাগ এব সংরক্ষণম্।"

—এই নীতির অনুসরণে সাধ্যানুসারে প্রায় প্রত্যেক ধনাঢ্য ব্যক্তিই ৺গোপালের সেবায় নানাপ্রকার সাহায্য দানে মুক্তহস্ত হন।

৺গোপালবাড়ীর জন্য স্থানীয় ভূম্যধিকারী

গোবরডাঙ্গার বিখ্যাত মুখোপাধ্যায় বংশীয়েরা ভূমিদান করেন এবং সেবার জন্য প্রচুর সম্পত্তিও দান করেন। ৺গোপালের ইষ্টক নির্মিত মন্দির, ভোগমণ্ডপ, নাট্যশালা, অতিথিশালা, গোশালা প্রভৃতি সাধারণের অর্থে ও সামর্থ্যে নির্মিত হয়। আটদশটি দুগ্ধবতী গাভী গোপালের দুগ্ধের জন্য প্রদত্ত হইল। ৺গোপালের পূজা-ভোগের জন্য সোপানাবলী শোভিত একটি পুষ্করিণী খনিত হয়। কেহ কেহ ফলকর বৃক্ষের চারা রোপণে ৺গোপালের উদ্যানবাটিকা রচনা করেন। লাউপালা ধীরে ধীরে একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। সংসারতাপক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ মধ্যে মধ্যে জ্বালা নিবৃত্তির জন্য এখানে সমবেত হইতে থাকেন। বাল্লকদাস সকলকেই ৺গোপালের প্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করিতেন। ভক্তের সংখ্যা যত অধিকই হউক ৺গোপালের ভাণ্ডারে কখনই অসঙ্কুলান ঘটিত না।

৺গোপালবাড়ীতে বিশেষ বিশেষ পর্বাহে সসমারোহে উৎসব হইতে থাকে। দোলের সময় দোল, ঝুলনের সময় ঝুলন, রাসের সময় রাস, স্নানযাত্রার সময় স্নানযাত্রা, জন্মাষ্টমীর সময় জন্মাষ্টমী, রথযাত্রার সময় রথযাত্রা হইতে আরম্ভ করে। বাঙ্গালাদেশে মাহেশের পরই লাউপালার রথের স্থান। রথোৎসবের কালে প্রায় পক্ষকাল অবধি মেলা হয়। নানাস্থান হইতে ব্যবসায়ী ও ক্রেতা এবং যাত্রীদের সমাগমে স্থানটি অহোরাত্র মুখর থাকে।

এক সময় ষ্টীমার কোম্পানী ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য গোপালবাড়ীর সম্মুখভাগে কৃত্রিম খাল সৃষ্টি দ্বারা ভৈরব নদের দুই ধার সংযুক্ত করেন। অদূরে ষ্টেশনও করেন। তখন দূরদেশ হইতে ভক্তগণ ষ্টীমারে যাতায়াত করিতেন। পারাপারের জন্য খেয়া নৌকাও ছিল।

কালবশে নদী মজিয়া যাওয়াতে ষ্টীমার লাইন উঠিয়া গিয়াছে। বর্তমানে খুলনা-বাগেরহাট রেলপথ হইয়াছে। লাউপালায় আসিতে হইলে যাত্রাপুর ষ্টেশনে নামিয়া দশ পনর মিনিট পদব্রজে গমন করিলেই লাউপালায় আসা যায়। সম্প্রতি রেলবোর্ড খেয়া তুলিয়া দিয়া একটি সেতু নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

প্রাচীন বয়সে বাল্লকদাস বাবাজী দেহরক্ষা করেন। গোপাল মন্দির প্রাঙ্গণে তাঁহার দেহ সমাহিত করা হয়। প্রতিদিন তাঁহার সমাধির পূজা হইয়া থাকে। সন্ধ্যাবেলায় আরত্রিক ক্রিয়ার পর কলিকায় অগ্নি সিদ্ধিতে বাল্লকদাসের ভোগ দেওয়ার বিধি আছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রাতঃকালে দেখা যায় সিদ্ধি ভস্মে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের মতে বাল্লকদাস কায়া পরিবর্তন করিয়া সূক্ষ্মদেহে তাঁহার প্রিয় ৺গোপালবাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছেন।

এখন ৺গোপালবাড়ীর সম্পূর্ণ ভার একটি ট্রাষ্টির উপর ন্যস্ত। এক সময় এখানে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য একটি চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয় এবং একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি আয়ুর্বেদ ভবন স্থাপনার পরিকল্পনা চলিতেছিল কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই।

খুলনা জিলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইলেও বাল্লকদাস প্রতিষ্ঠিত ৺গোপালবাড়ীর মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

বাল্লকদাস বাবাজী সম্বন্ধে বলিতে গেলে এই মহাজন উক্তিই যথেষ্ট মনে করি ঃ

"সংসার ভ্রমিতে কোন্ ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যথা কাষ্ঠ লাগে তীরে॥"

ভারতের তীর্থদর্শনে

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(৫)

লক্ষ্ণৌ : অযোধ্যা হ'তে নৈমিষারণ্যে যাওয়ার রাস্তাতে লক্ষ্ণৌ পড়ে। যদিও লক্ষ্ণৌ সহর তীর্থস্থান নয়, কিন্তু প্রাচীন নবাবী সময়ের ঐতিহাসিক ও প্রসিদ্ধ সহর এবং বর্তমান উত্তর প্রদেশের রাজধানী এই লক্ষ্ণৌ দেখে যাওয়ার ইচ্ছা হওয়া অনেকেরই পক্ষে স্বাভাবিক। আমাদের তীর্থযাত্রীদের মধ্যে অনেকে এখানে গোমতী নদীতে স্নানাদি করে তীরবর্তী দেব-মন্দির সকল ও প্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রতিষ্ঠিত কালী-মন্দির দর্শন করেছিলেন।

লক্ষ্ণৌ সহরের অতি প্রাচীন নাম লক্ষ্মণপুর। শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভাই লক্ষ্মণ এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মোহম্মদ গজনীর বিজয়ের পর তাঁর সৈন্যসামন্তদের মধ্যে অনেকে ও অন্যান্য বহু মুসলমান এখানে বসবাস করেন, এবং সেই সময় হ'তেই সহরের নূতন নামকরণ লক্ষ্ণৌ হয়েছে। তারপর অযোধ্যের নবাবেরা এই সহরকে তাঁদের রাজধানী করেন, এবং প্রাচীন ঐতিহাসিক ভবনগুলি নির্মাণ করান। সেগুলির মধ্যে শাহ নজাফের ইমামবাড়া বিখ্যাত। একে ছোট ইমামবাড়া বলা হয়। অযোধ্যের প্রথম নবাব গাজীউদ্দিন হাইদর এর নির্মাণ কার্য আরম্ভ করান; কিন্তু শেষ করাতে পারেন নি। তাঁর সুযোগ্য পুত্র পিতার ঐ আরব্ধ কার্য সুসম্পন্ন করান। সাদা রংয়ের প্রকাণ্ড গম্বুজের নীচে সাদা ও সবুজ রংয়ের কাঁচের তৈরী বেদীর-মধ্যে নবাব সাহেবের কবর আছে। নিকটেই ছত্তর-মঞ্জিল বা ছাতার মত আকারের তৈরী প্রকাণ্ড প্রাসাদে সে সময়ে বেগমদের অন্দরমহল ছিল। তারপর বড় ইমামবাড়া। এর মধ্যে অযোধ্যের নবাব আসফ-উদ্দৌলার সমাধি আছে। একটি সাজান দালানের মধ্য দিয়ে সমাধি স্থানে যাওয়ার রাস্তা। দালানের চারদিকের কারুকার্যযুক্ত স্তম্ভগুলি ও প্রকাণ্ড ঝিলান ছাত (Arch) দেখে আশ্চর্য হতে হয়। শুনলাম এত বড় ঝিলান ছাত ভারতে আর কোথাও নেই। দালান পেরিয়ে প্রকাণ্ড হলঘর (Hall)। হলঘরটি ১৬২ ফিট্ লম্বা ও ৫৩ ফিট্ চওড়া। শতাধিক বড় বড় ও নানা রংয়ের কাঁচের ঝাড় ছাতে টাঙ্গান আছে। সমাধি স্থানটী রূপোর রেলিং দিয়ে ঘেরা। নিকটেই নবাব সাহেবের পাগড়ী ও মুকুট সযত্নে রাখা আছে। বাইরের উঠোনের মধ্যে সাদা রংয়ের প্রকাণ্ড মসজিদ। মসজিদের দু'পাশে উচ্চ মীনার ও মাঝখানে তিনটী বড় বড় গম্বুজ। ইমামবাড়ার ভিতরে রূপার অনেকগুলি ছোট বড় তাজিয়া রাখা আছে। মহরমের শোভা-যাত্রার সময় এইগুলো বার করা হয়। ইমামবাড়া মানে তাজিয়া রাখবার জায়গা। বাজারের মধ্য দিয়ে কিছু দূর গেলে হাসিনাবাদের ইমামবাড়া পাওয়া যায়। এই ইমামবাড়ার গম্বুজের রং সোনালী। প্রধান ফটকের দিকে নহবৎখানায় ইমামবাড়ায় রক্ষিত মৃতদের সম্মানের জন্য প্রত্যহ তিনবার নহবৎ বাজান হয়। একটি কৃত্রিম জলস্রোত উঠোনের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে। জলস্রোতের ওপরে লোহার সেতুটী দেখবার মত জিনিস। ইমামবাড়ার ভিতরে অপূর্ব কারুকার্যসম্পন্ন নবাবের সমাধি আছে। মহরমের সময়ে তিন দিন সম্পূর্ণ ইমামবাড়া প্রদীপ-মালায় সাজান হয়। সুন্দর আলোকমালায় সজ্জিত এই স্থানটী দেখলে মনে হয়, যেন কোনও পরীর রাজত্বে এসে পড়েছি। এই সুন্দর সুসজ্জিত

দীপাবলী দেখ্‌বার জন্ত বহু লোকের সমাগম হয়। কাছেই লক্ষ্ণৌ সহরের সবচেয়ে বড় ও নামজাদা জুম্মা মস্‌জিদ। শুনলাম সহরের মধ্যে এটী সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর ভবন। এ ছাড়া এখানে ছিলখুস্ প্রাসাদ, মচ্ছীভবন প্রাসাদ এবং কৈসরবাগ প্রভৃতি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান আছে।

তারপর অযবের শেষ নবাব ওয়াজিদ আলিশাহের কীর্তি সৌধ। নবাব সাহেব অসামান্ত সুপুরুষ ও অদ্ভুত বিলাসপ্রিয় ছিলেন। তাঁর মত বিলাসপ্রিয় পুরুষ ভারতে এমন কি পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত জন্মেছেন কিনা সন্দেহ। কেবলমাত্র নানাবিধ বিলাসিতার জন্তই ভগবান যেন তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন। নবাব সাহেবের অদ্ভুত বিলাস-প্রিয়তার কথা বয়োবৃদ্ধ অনেকের কাছে যা শুনেছি, সে সব কারো কাছে গল্প করলে, তিনি মনে করবেন "বোধ হয় কোনও মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া এসব আজগুবি গল্প করিতেছে।" নবাব ওয়াজিদ আলি সাহেবের নির্মিত বেগমদের থাকবার বড় বড় সুন্দর মহল প্রথমেই চোখে পড়ে। সেগুলি সব একই গঠনের, একই রকম রংয়ের ও একই স্থানে নির্মিত হয়েছে। চারদিকের ফটক সকল বন্ধ করলে ভেতরে কোনও পশুপক্ষী পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারবে না। এখন এই সব ভবন উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিবিধ কার্যালয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা'হক, উক্ত মহলগুলির কাছেই ছিল বেগমদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলবার স্থান "ভুলভুলৈয়া"। এর মধ্যে নানাদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বহু গলি। নবাব সাহেব বেগমদের সঙ্গে এখানে লুকোচুরি খেলতেন। কোনও নূতন দর্শক পথ ভুলে এর মধ্যে এধারে ওধারে ঘুরতে ঘুরতে অশেষ কষ্ট পেতে পারেন, সেজন্ত পথপ্রদর্শক ছাড়া কাউকে ভিতরে যেতে দেওয়া হয় না। তা ছাড়া, নবাবের বাসস্থান ও তাঁর তৈরী অনেক মস্‌জিদ প্রভৃতি রয়েছে। এখন সেগুলির বেশীর ভাগই অব্যবহার্য ও জীর্ণাবস্থায় পড়ে আছে।

লক্ষ্ণৌয়ের আদব কায়দা ভারত-প্রসিদ্ধ। শুনেছি রেল ষ্টেশনে ট্রেণে প্রথমে কে উঠবে, তা নিয়ে "আপ্ চড়িয়ে, আপ্ চড়িয়ে" বলতে বলতে ট্রেণ ছেড়েই দিল। "আপ পিজীয়ে, আপ পিজীয়ে" বলতে বলতে কলকের তামাক পুড়ে খতম হয়ে গেল।

আজকালকার লক্ষ্ণৌ বেশ সাজান গোছান সহর। সহরের মধ্যে অনেক সুন্দর বাগান থাকায় একে 'City of gardens' বলা হয়। উত্তর প্রদেশের আর কোনও সহরের মধ্যে এত বেশী বাগান নেই। নানা পাড়ায় বহুবিধ পণ্যদ্রব্যের সাজান দোকানও অনেক আছে। আধুনিকের মধ্যে পশুশালা, যাদুঘর, বিধানসভা ও মেডিকেল কলেজ প্রভৃতিও দেখ্‌বার মত জায়গা। রেল ষ্টেশনের প্রকাণ্ড ও সুন্দর ভবনের মত ভবন, উত্তর ভারতের আর কোনও ষ্টেশনে নেই। সহরের মধ্যে অধুনা-নির্মিত আমিনাবাদ পার্ক দেখ্‌বার মত স্থান। লক্ষ্ণৌয়ের উৎপন্ন সফেদা, দশেরী আম এবং সুগন্ধী সুস্বাদু সাদা খরমুজা ভারত-বিখ্যাত। এখানকার তৈরী সুগন্ধিত কিমাম, সুরতি জরদা ও তামাকও বিশেষ প্রসিদ্ধ। সহরের মধ্যে প্রাচীন ও নূতন দর্শনীয় স্থানসকল দেখ্‌বার পর ষ্টেশনে ফিরলাম। এখানে বাঙ্গালাদেশের কুডুবাবুর পরিচালিত "তীর্থযাত্রা গাড়ী"র সঙ্গে দেখা হোল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গাড়ী ও সকল যাত্রীর একত্র রান্নার সুন্দর ব্যবস্থা ও সুবিধা আমার সহযাত্রীদের দেখালাম। কিন্তু এত সহজে "ছোঁয়া ছুতের ভূত" ভাগ্‌লে ত সুখের কথাই হোত। আমাদের "তীর্থ-যাত্রা গাড়ী"র কাষরাগুলো এমন কি গাড়ীর পায়খানাগুলো পরিষ্কার করবার জন্ত কোনও ষ্টেশনে কোনও মেথরকে গাড়ীর মধ্যে আসতে দেওয়া হয়নি। যাক্, এইবার লক্ষ্ণৌ হ'তে নৈমিষারণ্যে রওনা হলাম।

(ক্রমশঃ)

তেষ্টা

শ্রীধীরানন্দ ঠাকুর

একটি গ্রীষ্মের সকাল
দুপুরের নাগাল নোবো-নোবো করছে।
ভোর থেকেই মেঘলা-মেঘলা ভাব,
তবু আলোর আভাটা আছে শাদার কাছ-ঘেঁষেই;
রোদের তাত যদিও হয়েছে কিছু নরম
তবু, গুমোট আছে জমে।

অনেকক্ষণ পরে পরে বইছে ঝিরঝিরে হাওয়া,
শাদাটে সবুজ শোজনে আর বেলপাতাগুলো
দুর্লভ আরামের ছোঁয়া পেয়ে খুশিতে উঠছে নেচে।
আইঢাই করছে দেহ, আনচান করছে মন,
তেষ্টায় ছাতি ফাটে-ফাটে,
শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে গলা,
কলের জলে, কুয়োর জলে মিটছে না তিয়াস,
ফ্রিজিডেয়ারে-রাখা জলেও না;
পদ্মপাতা আর ফুলে সুরভিত
পুরোনো কোন-এক পুকুরের কুসুম শীতল জল
খেতে লোভ জেগেছে কণ্ঠ পুরে।
এই ছোট শহরের সীমানা ছাড়িয়ে
কতকটা মাঠ পেরিয়ে
বুনোপাড়ায় ঝোপে-ঘেরা সেই শেওলা-ঘাসা পুকুর:
গেলুম সেখানে স্নানপানের লোভে
শহুরে সমাজের কড়া নিয়মের পাহারা এড়িয়ে।
অবগাহন করলুম তার গভীর-কালো-স্বচ্ছ জলে:
জুড়িয়ে গেল অঙ্গ,
মনে হল, ও-জল তো শুধু জল নয়,
ও যে স্নিগ্ধলসিত প্রাণ-বিগলিত তরলিমা।

আঁজলা-ভরে পান করতে যাব ঐ প্রাণরস,
অমনি কোথা হতে মনে লাগল ভয়,
আমার রোগাতঙ্কী শহুরে মনে—
রোগের বীজাণু থাকে যদি ওতে?
প্রাণের ভয়ে
বঞ্চিত হলুম প্রাণের রস থেকে।
তেষ্টা-না-মেটার কষ্ট
মরণ-যাতনা চেয়ে কম নয় বুঝি।

গ্রন্থ-সমালোচনা

[পুস্তক সমালোচনার জন্য প্রত্যেক পুস্তকের দুইখানি করিয়া কপি পাঠাইয়া দেওয়াই সাধারণ নিয়ম। গ্রন্থকার অথবা পুস্তক প্রকাশক মহাশয়দিগের প্রতি আমাদের নিবেদন—'বিষবাণী'তে কোনও পুস্তক সমালোচনা করাইতে হইলে তাঁহারা আমাদের নিকট প্রত্যেক সমালোচ্য পুস্তকের দুইখানি করিয়া কপি পাঠাইবেন। —সম্পাদক, বিষবাণী]

প্রজ্ঞার আলো : লেখক ডাঃ মহেন্দ্র সরকার, প্রকাশক—প্রবর্তক পাবলিশার্স ৬১ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, মূল্য : পাঁচ সিকা, পৃষ্ঠা ৭২

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে দর্শনশাস্ত্রের সারতত্ত্ব লেখক সংগ্রহ করেছেন,—যে সংগ্রহে যে পরিপাট্য ও শৃঙ্খলা আছে তা' স্বকীয় অনুভূতির রসে উজ্জ্বল এবং লেখকের গভীর পাণ্ডিত্যের ও মনঃসমীক্ষার নিশ্চিত পরিচায়ক। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্রাবয়ব (পকেট সাইজ), পৃষ্ঠা সংখ্যাও স্বল্প তবু সেই স্বল্পতার মধ্যে এই বাণী-শক্তির স্বচ্ছতা পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। প্রবর্তকে ইহা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল —সুতরাং প্রবর্তকের পাঠক-পাঠিকা পূর্বেই সে রস আস্বাদন করেছেন,এখন একত্রে পরিবেশিত হওয়ায় তাঁরা নিশ্চয়ই খুব খুশী হবেন, এবং যাঁরা ইতিপূর্বে ডাঃ সরকারের গ্রন্থ পাঠ করেননি তাঁরাও অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হবেন নিঃসন্দেহ। গ্রন্থের প্রথমে আছে "বেদান্ত দর্শনের বিষয় হচ্ছে প্রজ্ঞা" এবং প্রায় শেষা-শেষি আছে "প্রজ্ঞা রুদ্ধ জীবন পদ্ধতিতে প্রকাশ পায় না"—(পৃঃ ৬৩)। প্রথমটির মধ্যে প্রজ্ঞাকে লেখক বেদান্তের নির্যাস বা quintiessence হিসেবে এবং শেষ বাক্যটিকে প্রজ্ঞার অনুশীলন ও উপলব্ধি এ' জীবনে একান্ত আবশ্যক এই সত্যের আভাস দিয়েছেন। সেই প্রজ্ঞাকে লাভ করা যায় কি ভাবে? প্রাণে ও মনে মানুষের পূর্ণ অভিব্যক্তি, সুপ্ত কুল-কুণ্ডলিনীর জাগরণে দেহের মধ্যে দেহাতীতের অনুভূতি, এক কথায় দিব্য-জীবন-লাভ এবং পরাশান্তি প্রাপ্তিই জীবনের উদ্দেশ্য—প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থখানিতে এ সবের বিবৃতি আছে। ডাঃ সরকারের ইহা শেষতম গ্রন্থ—তৎপ্রণীত "হৃদয়ের আলো" ও "উপনিষদের আলো"র মত সুধীসমাজে এ'গ্রন্থও সমাদর লাভ করবে।

অ. ক. হ.

সাহিত্যিকী : ধীরানন্দ ঠাকুর। প্রবর্তক পাব্লিশার্স। ৬১, বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১২ মূল্য দুই টাকা।

আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক যুগে সাহিত্য তার সংজ্ঞা হারিয়েছে। যান্ত্রিক সভ্যতার অন্তর্দেশে আজ আমরা বিস্মৃত হই, কল্পনা অবাস্তব হলেও, বাস্তবের সূত্র। সভ্যতার পুরোভাগে দাঁড়িয়ে সাহিত্য, যা মানুষের মনের, তার কল্পনা, দর্শন, জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের প্রতিনিধি। মানুষ যেদিন ভাষা সৃষ্টি করল, সেদিনেই এই বাণীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন। উত্তর-কালে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এর পদ-পরিক্রমা—সংকীর্ণ থেকে ব্যাপকে। অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুরের "সাহিত্যিকী"—এই ব্যাপকতারই এক পরিচিতি। লেখক প্রাঞ্জল ভাষায়, সংক্ষিপ্ত পরিসরে সাহিত্যের উদ্দেশ্য, ক্রমবিকাশ, রূপ এবং প্রচলিত সাহিত্য প্রভৃতি অবলম্বনে এই গ্রন্থে যে ২০টি প্রবন্ধ সংকলিত করেছেন, উৎসুক এবং জিজ্ঞাসু সাহিত্যামোদীদের কাছে তা অবশ্যই সুখপাঠ্য হবে। ভাষা ও সাহিত্যের উপযোগিতা, উপাদান প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে লেখক যে স্বচ্ছ আলোচনা ও বিশ্লেষণ-রীতির পরিচয় দিয়েছেন, দৃষ্টিকোণের বিচারে তার মূল্য অনস্বীকার্য, এবং এই পরিচয় প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকাই পাবেন এর প্রতিটি পৃষ্ঠায়। 'সিনেমা সাহিত্য', 'সাহিত্যে-প্রচার' এবং 'শিল্প ও সমকালীন'—এই তিনটি প্রবন্ধে লেখক মৌলিক প্রতিভার পরিচয়ই দিয়েছেন। এত স্বল্প পরিসরে এমন একটি informative পুস্তক বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। সর্বোপরি অধ্যাপক ঠাকুরের ভাষা-রীতির লালিত্য ও সারল্য বইটির মূল্য আরো বৃদ্ধি করেছে যা প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টিই আকর্ষণ করে।

শ্রীসমরজিৎ কর

সংঘ-বার্তা

স্বামী অভেদানন্দের জন্মোৎসব : (বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকামতে) আগামী ২রা আশ্বিন, ১৩৬৪ ভারত সরকার কর্তৃক-প্রকাশিত পঞ্জিকা মতে (২৭ ভাদ্র), ইং ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ বুধবার কৃষ্ণা-নবমী শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ৯২তম শুভ জন্মতিথি। তদুপলক্ষে কলিকাতায় তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে উক্ত দিবসব্যাপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ও তাঁহার বিশেষ পূজাদি হইবে। কথকতা ও বক্তৃতা করিয়া ঐ দিন তাঁহার পূত জীবনকথা আলোচিত হইবে। কীর্তনাদিরও ব্যবস্থা থাকিবে। উৎসবের কর্মসূচী ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ তারিখের ইংরাজী ও বাংলা দৈনিক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হইবার ব্যবস্থা হইবে।

দার্জিলিং শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমেও ঐ দিন বিশেষ পূজাদি হইবে।

শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা : (বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকামতে) আগামী ১৪ই আশ্বিন, ১৩৬৪ (ভাঃ ৮ই আশ্বিন), ইং ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ সোমবার হইতে ২রা অক্টোবর বুধবার এই তিন দিন শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে জগজ্জননী শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর প্রতিমায় যথাবিধানে পূজার্চনাদি হইবে।

ভাগবত-পাঠ : সপ্তাহে ৫দিন—সোমবার হইতে শুক্রবার, পণ্ডিত শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় মঠে সন্ধ্যা সাতটা হইতে এক ঘণ্টা শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রত্যহ শ্রোতাদের সংখ্যা, নরনারী সমেত প্রায় দুই শত হয়।

কথকতা : প্রতি রবিবার সন্ধ্যারাত্রিতে দেড়ঘণ্টাকাল সঙ্গীতাচার্য শ্রীযুত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কথকশিরোমণি মহাশয় উক্ত মঠে তাঁহার স্বরচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত' হইতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী ধারাবাহিকভাবে কথকতা করিতেছেন। কথকতা হইয়া যাইবার পর জিজ্ঞাসুদিগের লইয়া কিছুক্ষণ ধর্মবিষয়ক আলাপ আলোচনাও হইয়া থাকে।

শ্রীরামনামসংকীর্তনাদি : প্রতি শনিবার সংগীতবিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী মহাশয়ের পরিচালনায় ভক্তবৃন্দ বেলা তিনটায় মঠে শ্রীরামনাম সংকীর্তন যথাবিধানে আরম্ভ করেন। কীর্তনের পর দু-একটী ভক্তিমূলক গানও হয়। বেলা সাড়ে চারিটা পর্যন্ত এই সব হয়।

বিখ্যাত বংশীবাদক শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ শীল ও সম্প্রদায় কর্তৃক গত শ্রাবণ মাসে দুই শনিবার সন্ধ্যারাত্রিতে মঠে গীতবাদ্য হয়।

বিশেষ পূজা : (বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকামতে) আগামী ৭ই আশ্বিন, ১৩৬৪ (ভাঃ ১ আশ্বিন) ইং ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ সোমবার শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের শুভ জন্মতিথি দিবস। ঐ দিবস শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও তাঁহার বিশেষ পূজা হইবে।

ভুলসংশোধন

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
২১৬, ২য় কলমে,	পল্লী		পল্লী
২১৭, ১ম কলমে,	মুখে মুখে	—	মুখে মুখে
২৮২, ২য় কলমে,	অধিরাতা		অধিষ্ঠাতা
২৮৩, ১ম কলমে,	আনসাধারণ		জনসাধারণ
২৮৬, ২য় কলমে,	পানিবি		পাণিনি
২৮৭, ১ম কলমে,	ভাগ		ভাল

বেদান্ত কেশরী

—শারদীয়া সংখ্যা—

১৯শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা
বার্ষিক মূল্য ৪।০ আনা

আশ্বিন, ১৩৬৪
এই সংখ্যার মূল্য ১।০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ৬
ফোন : ৫৫ - ১৮০৪

লক্ষ্মী ঘি'য়ে
লক্ষ্মীশ্রী

॥ লক্ষ্মীদাস প্রেমজী · কলিকাতা ॥

বিশ্বশান্তি ও কল্যাণ কামনায়

আপনাদের জীবন উৎসর্গীকৃত হউক !!!

ওঁ তৎ সৎ ওঁ !!! ওঁ শান্তি !!!

শ্রীশ্রীকরুণাময়ী আশ্রম কর্তৃক প্রচারিত

শারদোৎসবে

আমাদের আন্তরিক

শুভেচ্ছা ও অভিবাদন

গ্রহণ করুন।

হাওড়া মোটর কোম্পানী

প্রাইভেট লিমিটেড

•• কলিকাতা ••

এক বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ

গুপ্ত রাজাদের সহায়তায় স্থাপিত নালন্দা অল্পদিনেই এশিয়ার বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অন্যতম হয়ে উঠেছিল। এই বিদ্যালয়ের ১০,০০০ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকেই আসতেন সুদূর বিদেশ থেকে এবং বিদেশী রাজাদের সৌজন্যে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ ছাত্রাবাসে এঁদের থাকবার ব্যবস্থা ছিল।

সাতটি বিভিন্ন শিক্ষায়তন ও একটি বিশাল পাঠাগারে এঁরা শিক্ষালাভ করতেন; এই বিশাল পাঠাগারের বিরাট গ্রন্থসম্ভার রাখবার জন্য তিনটি সম্পূর্ণ অট্টালিকা প্রয়োজন হত। খাদ্য, পরিধেয় ও চিকিৎসা সকলেই বিনামূল্যে পেতেন। সমসাময়িক একজন ঐতিহাসিকের মতে এই কারণেই নালন্দার শিক্ষাব্যবস্থা এমন চরম উৎকর্ষ লাভ করতে পেরেছিল। ঐই মৃত্যুর পর ১২ শতাব্দীতে বিদেশী শত্রুর হাতে ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত ৭০০ বছর ধরে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভের মত মধ্যযুগের ভারত জুড়ে ছিল।

ডামলপ

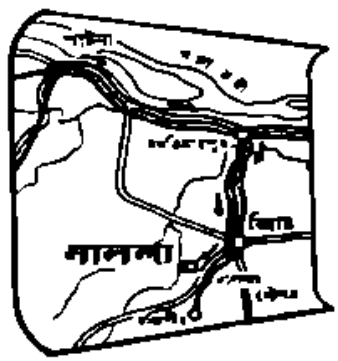

পাটনা থেকে পূর্বদিকে যে রাস্তা গেছে সেটা ধরে ১৯ মাইল গেলে বখতিয়ারপুর। এখান থেকে রাস্তাটা ভাগ হয়ে একে গেছে দক্ষিণে বিহার শরীফের দিকে (১৯ মাইল); সেখান থেকে আরও একটা ছোট রাস্তা গেছে নালন্দা স্টেশন পর্যন্ত (৩ মাইল)। স্টেশন থেকে নালন্দার ভগ্নাবশেষ ১ মাইল দূরে। পাটনা থেকে ৫৬ মাইল দূর পর্যন্ত সব জায়গাতেই বছরের সব সময়েই ছোট্ট ভ্রমণের উপযোগী আছে।

রাজগীরের আবিষ্কারের ফলেই ছোট্ট ভ্রমণের আরেক সম্ভার হল; আর তীর আবাসিক ব্যবস্থাগুলো এখানে যে কোনো ঋতুতেই সবচেয়ে আরামে ও বিলাসে।

* "ছোট্ট-ভ্রমণের আনন্দ" - এই পর্যায়ের তৃতীয়-বিজ্ঞাপন

বিশ্ববাণী—আশ্বিন, ১৩৬৪

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। জগজ্জননী শ্রীদুর্গা		৩২১
২। শ্রীশ্রীদুর্গাদেবী	স্বামী দুর্গানন্দ	৩২২
৩। শক্তিপূজা	শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২৫
৪। দুর্গাপূজায় সার্থকতা ...	ব্রহ্মচারী অসীম চৈতন্য ...	৩২৮

শারদোৎসবে

আমাদের আন্তরিক

শুভেচ্ছা গ্রহণ

করুন

• বার্মা-শেল •

Railways Serve Nation ● ● We Serve Railways

D. C. DHIMAN & BROS, (Private Limited)

8, ESPLANADE EAST, CALCUTTA-1

A pioneer firm of mechanical and structural engineers, ship builders, Railway coach and wagon builders, M.E.S. and P. W. D. contractors; Machinery and Stores suppliers with several years experience and service to the Indian and Burma Railways.

Centres :—

Paharpur (Cal-23), Vizag (Andhra), Pandu (Assam), Izatnagar (U.P.) Dibrugarh (Assam).

৫।	এলে কি ধরায় তুমি ...	শ্রীঅমিতাভ আচার্য ...	৩৩২
৬।	পার্বতীর প্রতি	শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য	৩৩২
৭।	অঞ্জলি	শ্রীকালিদাস রায়	৩৩৩
৮।	শারদায়া	শ্রীসত্যেন্দ্র ভট্টাচার্য	৩৩৪
৯।	পূজি রাঙা চরণে	শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন বসু	৩৩৪
১০।	আয় মা আবার তেমনি করে	শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়	৩৩৫
১১।	মাতৃবন্দনা	শ্রীনলিনীবালা বসু	৩৩৫
১২।	করুণাধারায় কে যেন সেথায় ডাকে	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৩৩৬
১৩।	শ্রীকৃষ্ণের জন্মপ্রসঙ্গ	স্বামী অভেদানন্দ ...	৩৩৭
১৪।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণনাম-তত্ত্ব ...	শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ...	৩৪৫

শারদ অর্ঘ্য

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
ও বন্ধু, এই বকুলকরা শ্রাবণ রাতে
জীবনের নদীতটে
(আধুনিক) GE 24860

মান্না দে
এই ক্ষণটুকু কেন
আমি আজ আকাশের মতো
(আধুনিক) N 82756

শ্রীমতী লতা মঙ্গেশকর
মনে রেখো, মনে রেখো
রঙিলা বাঁশীতে কে ডাকে
(আধুনিক ও পল্লী) GE 24861

কুমারী আলপনা বন্দ্যোঃ
তারাদের চুমকি জ্বলে
আমি আলপনা এঁকে যাই
(আধুনিক) N 82761

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য
দুলগো তোমারে ছুঁয়ে
কুসুম যেমন ক'রে
(আধুনিক) GE 24868

গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোঃ
প্রজাপতি মন আমার
আজ কেন ও চোখে লাজ
(আধুনিক) GE 24863

"হিজ মাস্টার্স ভয়েস"
কলম্বিয়া

সম্পূর্ণ তালিকা ডীলারের কাছে দেখুন।

ধবল বা শ্বেত

(Leucoderma)

ছরারোগ্য নহে, স্বল্পব্যয়ে ও অল্পদিনে নিশ্চিহ্ন হয়। পুরাতন ও হতাশ রোগীর বিশ্বস্ত চিকিৎসা কেন্দ্র। সাক্ষাৎ বা পত্রালাপ করুন :— ডাঃ কুণ্ডু, (Dermotologist), ৬৪।৯ নরসিং এভিনিউ, কলিকাতা-২৮, (Leucoderma Research and Cure Centre).

১৫।	বৈশেষিক দর্শন	শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ	৩৫৩
১৬।	অভিযাত্রী ভারতবর্ষ	ডক্টর মতিলাল দাশ	৩৬১
১৭।	অভেদানন্দ স্মৃতি-তীর্থে	শ্রীপ্রফুল্লকুমার লাহিড়ী	৩৬৫
১৮।	স্বামী অভেদানন্দের প্রথম লণ্ডনযাত্রা ...	শ্রীকুমুদবন্ধু সেন	৩৬৬
১৯।	প্রার্থনা ...	শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য	৩৭০
২০।	'রাবণস্য বধার্থায়'	শ্রীযতীশচন্দ্র মিত্র	৩৭১
২১।	বিজয়া-দশমী	শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত	৩৭৯
২২।	কথকতা	শ্রীজয়দেব রায়	৩৮১
২৩।	অমরকাব্য 'মহানাটকম্'	শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবর্তী	৩৮৪
২৪।	প্রহসনের আলোকে মধুপ্রতিভা ...	শ্রীঅনিলকুমার হালদার	৩৯০
২৫।	ভিতরে-বাহিরে ...	শ্রীপ্রমথনাথ কুমার	৩৯৫
২৬।	বেদচর্চায় বাংলাদেশ	শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য	৩৯৬
২৭।	ঋক্ প্রার্থনা	শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত	৪০০
২৮।	সিমাচলম্ : বরাহলক্ষ্মী নরসিংহ অবতার ...	শ্রীসমরজিৎ কর	৪০১

গুণের আদর

বিভিন্ন রঙ্গের চিত্রশোভিত পুস্তিকা "কেশবতী" পত্র লিখিলে বিনামূল্যে পাঠান হয়।

ক্যালকোমিকোর

ভৃঙ্গল

আয়ুর্বেদীয় মতে সুগন্ধি মহা-ভৃঙ্গরাজ কেশতৈল যাঁরা গুণের আদর জানেন তাঁরাই বলেন যে, নিয়মিত "ভৃঙ্গল" ব্যবহারে কেশের সৌষ্ঠব বাড়ে, মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং শরীর স্নিগ্ধ হয়।

দি ক্যালকাটা কেমিকাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২৯

২৯।	ভারত-আত্মার বাণীমূর্তি	শ্রীরণজিৎকুমার সেন ...	৪০৫
৩০।	শ্রীমদ্ আভেদানন্দ-বন্দনা পঞ্চকম্	স্বামী চিন্ময়ানন্দ ...	৪১০
৩১।	শিক্ষা-প্রসঙ্গ	শ্রীশ্রীনিবাস ভট্টাচার্য	৪১০
৩২।	জ্ঞান ও অজ্ঞান	শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	৪১৩
৩৩।	ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গান	শ্রীধীরেশ্বর মিত্র	৪১৫
৩৪।	স্বামী অভেদানন্দের বাণী		৪১৭
৩৫।	বর্ষা-বিদায়ে	শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য	৪১৮
৩৬।	তোমাকে	শ্রীসুন্দর গুপ্ত	৪১৯
৩৭।	আলো-ছায়া	শ্রীশান্তশীল দাশ	৪২১
৩৮।	সংঘ-বার্তা ...	...	৪২০

ভোলানাথ পেপার হাউস লিঃ

৩২-এ ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-১

পোঃ বক্স ঃ ৯৯৫ ফোন ঃ ব্যাঙ্ক ২২-১৭৩১ গ্রাম ঃ বিদ্যাসেবা

সর্বপ্রকার কাগজ, ছাপার কালী এবং
বোর্ড ইত্যাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ব্রাঞ্চ ঃ ৬৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ফোন ঃ ৩৪-৭৯৮৯

১৩৪।১৩৫ ও ১৬৭ নং ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা।

অফঃস্বল ব্রাঞ্চ ঃ এলাহাবাদ, কটক, পাটনা, রাঁচি।

শর্মা এণ্ড কোং

৬৬ মছুয়া কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

আধুনিক রুচিসম্মত ও সস্তায়
জুতা সরবরাহ করা হয়

বোম্বাই. মেসার্স জে, জে, এণ্ড সন্স
চপ্পল সকল সময়েই পাওয়া যায়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

সর্বপণ্য-শোভিত

ভারতের সর্ববৃহত বিপনি

কমলালয় ষ্টোর্স

প্রাইভেট লিমিটেড

ধর্মতলা ষ্ট্রীট : : কলিকাতা-১৩

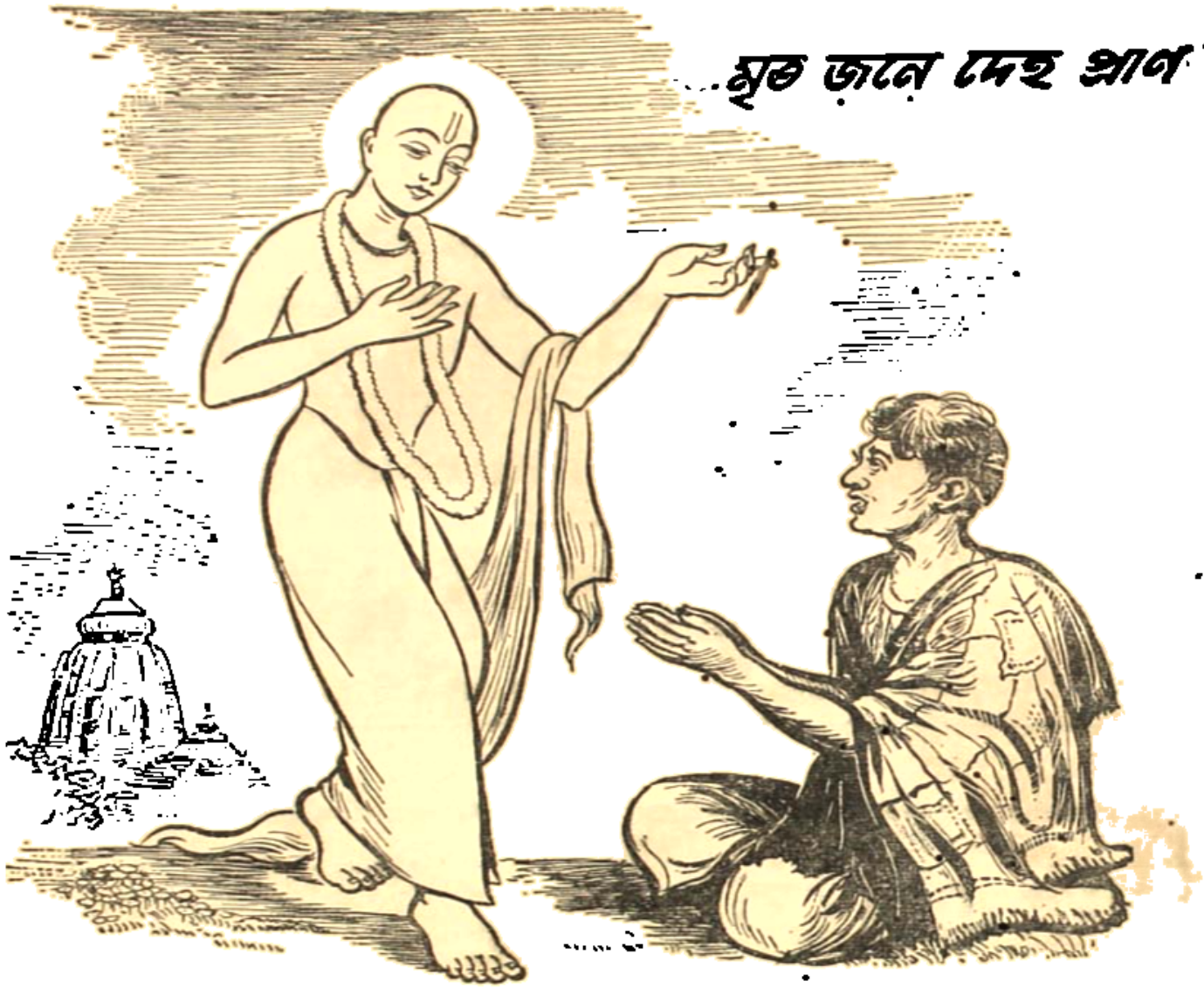

যেদিন সমগ্র জাতির জীবনে এক মহাক্ষণের দিন, যেদিন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, প্রেমময় চৈতন্যদেব আবির্ভূত হলেন এই পৃথিবীতে, করুণার অমৃত ভাণ্ড হাতে নিয়ে। চৈতন্যদেব দুইহাতে বিলিয়ে গেলেন অমায় করুণা—তাঁর যাত্রা পথের দুই ধারে। যারা বঞ্চিত তাঁর পদে পড়ল, তারা সকল নিয়ে ফিরে গেল; যারা দুর্ভাগা তারা সৌভাগ্য ফিরে পেল; মৃত লোকের দেহ পড়েছিল তাঁর চলার পথে, সে মহাপ্রভুর করুণার স্পর্শে পুনর্জীবন লাভ করল :

• প্রাচীন ঐতিহ্য—ভারতের যে চিকিৎসা বিজ্ঞান তারও নির্দেশ ছিল—কুষ্ঠ ও আর্তকে পুনর্জীবন দান করা। সেই নির্দেশই অনুসরণ করে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি গত ৯০ বর্ষাধিক কাল ধরে—কুষ্ঠ ও নানা প্রকার কঠিন চর্মরোগগ্রস্ত রোগিদলকে রোগ মুক্ত করে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে তাদের সুস্থ, সবল ও সুন্দর জীবন।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা, কবিরাজ।
১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। (ফোন শিবপুর : ২৩৫৯)
শাখা—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৯ (পুরবী সিনেমার পাশে)।

স্বামী অভেদানন্দ

ঊনবিংশতি বর্ষ | আশ্বিন—১৩৬৪ | অষ্টম সংখ্যা

॥ জগজ্জননী শ্রীদুর্গা ॥

"বিদ্যুদ্দামসমপ্রভাং মৃগপতি স্কন্ধস্থিতাং ভীষণাং
কন্যাভিঃ করবাল-খেট-বিলসদ্ধস্তাভিরাসেবিতাম্।
হস্তৈশ্চক্রধরালি-খেট-বিশিখাংশ্চাপং গুণং তর্জ্জনীং
বিভ্রাণামনলাত্মিকা শশিধরাং দুর্গাং ত্রিনেত্রাং ভজে।"

—'বিদ্যুদ্দামতুল্য প্রভাময়ী, সিংহারূঢ়া, ভীষণা, করবাল ও খেটধৃত হস্তযুক্তা কন্যাগণ কর্তৃক সেবিতা, হস্তে চক্র, ধনুরাশি, খেট, বিশিখসমূহ, চাপ, গুণ ও তর্জনীমুদ্রাধারিণী, শশিধরা, অনলস্বরূপা ত্রিনেত্রা দুর্গার ভজনা করি।'

দেবীদুর্গার সঙ্গে বাংলাদেশের যে নাড়ীর যোগ তা' ঠিক দেবীদুর্লভ নয় মর্ত্যসুলভ; তিনি আমাদের আত্মীয়—ঐ আত্মীয়তার চরম পরাকাষ্ঠা বাংলাদেশের আগমনী গানের মধ্যে নিহিত। "আগমনী-গান বাঙালীর নিজস্ব; এ গান ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে নাই আর কোন জাতি অমন গান করে নাই,—করতেও জানে না।" এই ধারাই শাক্তপদাবলীর রামপ্রসাদের গানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে; প্রাণের ও প্রেমের নিঃশেষ নিবেদন এবং ভাবভাগীরথীর উপকূলে বাণীবিনিময়ের যে মর্মস্পর্শী চিত্র এ গানগুলিতে পাই তার সন্ধান অন্যত্র দুর্লভ। ঐ রসগঙ্গার স্রোতে পড়ে একূল ওকূল সব একাকার হয়ে গেছে, প্রিয় আর দেবতায় ক্ষণে ক্ষণে ভুল হয়ে যায়:

"আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা!'

শরতের আকাশে বাতাসে মাতৃবোধনের চাঞ্চল্য; এশ্বর্যার্ত সন্তানের চিত্তে মাতৃদর্শনের ব্যাকুলতা—মা এসেছেন, বরাভয়দায়িনী, কল্যাণময়ীরূপে। দৈন্য আর দুর্বিপাকের জ্বালায় অতিষ্ঠ ধরিত্রীর আবাহনে দশপ্রহরণধারিণী দেবী দুর্গার আগমন—মা তাই দুর্গতিনাশিনী, অসুরমর্দিনী, ক্ষেমঙ্করী। সন্তানের আর্তক্রন্দন যখন এপার ছাড়িয়ে পরপারে গিয়ে পৌঁছেছে

তখনই মায়ের আর থাকার জো'টি নেই,—কারণ তিনি যে মা। "ধৈর্যক্ষণ ছেলে, চুবি নিয়ে ভুলে থাকে, মা রান্নাবান্না বাড়ীর কাজ সব করে। ছেলের যখন চুষি আর ভাল লাগে না—চুষি ফেলে চীৎকার করে কাঁদে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে দুড় দুড় করে এসে ছেলেকে কোলে নেয়। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকলে তিনি দেখা দেন।" আজ মা ভূতলে অবতীর্ণা। আমরা তাঁকে প্রণাম করি।

"জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে।"

শ্রীশ্রীদুর্গাদেবী

স্বামী দুর্গানন্দ

মহিষমর্দিনী সিংহবাহিনী দেবী দুর্গার স্বরূপ ও তাঁহার আবির্ভাব সম্বন্ধে ঐতিহ্য, বৈজ্ঞানিক তথ্য, দার্শনিক তত্ত্ব এবং সাধকগণের বিভিন্ন ধারণা ও মতবাদ থাকায় এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলিতে যাওয়া সমস্যাজনক ব্যাপার। পৌরাণিকগণ কিন্তু বিভিন্ন মতবাদ সত্ত্বেও রূপকের সাহায্যে নানা আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া এই মহাশক্তি দুর্গার মহিমা-প্রকাশচ্ছলে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই মহাশক্তি মহামায়া অমররহিত নিত্যা এবং তিনিই জগন্মূর্তিরূপা। "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্যা সর্বমিদং ততম্।" সুতরাং যে শক্তির প্রভাবে সৃষ্টির লীলাবিলাস চলিতেছে তিনিই আমাদের আলোচ্য দেবী দুর্গা।

অবোধ্য সৃষ্টিরহস্য সাধারণ বুদ্ধির অগোচর; কিন্তু পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি সহজবোধ্য। যে অনাদি অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে সৃষ্টি সম্ভাবিত হইতেছে, যে শক্তি জগৎকে ধারণ ও পোষণ করিতেছেন ও পরিণামে এই জগৎ যাঁহাতে বিলীন হইয়া থাকে, তিনিই আমাদের এই চিন্ময়ী দুর্গা। বিজ্ঞানের জড়াশক্তি নহেন, ইনি চৈতন্যময়ী। পরমাত্মা বা সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের ইনি অভিন্ন স্বরূপশক্তি—চৈতন্যসত্তার ঘনবিগ্রহ। ইনিই মহামায়া দুর্গারূপে পূজিতা হইয়া থাকেন। যিনি গুণাতীত, নিরাকার ও অসীম সেই পরব্রহ্ম ধারণাতীত এবং সেই নির্গুণতত্ত্বের স্বরূপমাত্র অবলম্বন করিয়া জাগতিক ব্যাপারের মীমাংসা সম্ভব নয়; তাই সগুণ শক্তিতত্ত্ব। এখানে নির্গুণকে সগুণে, নিরাকারকে সাকারে ও অসীমকে সসীমে রূপান্তরিত করিয়া আমরা যাবতীয় সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণপূর্বক বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। কারণ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই বিশ্বাসেই মহাশক্তির লীলাবৈচিত্র্য এবং তিনিই বিশ্বরূপে বিরাজিতা। দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীতে দেখা যায় অসুরগণের অত্যাচারে ধরণী ভারাক্রান্তা হইলে দেবতাগণের স্তবে তুষ্টা হইয়া দেবী রণচণ্ডিকা মূর্তি ধারণপূর্বক অসুর নিধন করিয়া ধরার ভার মোচন করিয়াছিলেন এবং দেবতাগণকে বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়া আপনার অলৌকিক মহিমা বর্ণনা করিতে করিতে ভবিষ্যতে যে তিনি 'দুর্গম' নামক মহাসুরকে সংহার করিয়া দুর্গানামে বিখ্যাতা বা পূজিতা হইবেন এই ভবিষ্যদ্বাণীও করিয়াছিলেন:

"তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥"

এই শ্লোক হইতে আমরা 'দুর্গা' নামের উৎপত্তির কথা প্রাপ্ত হইলাম। ইহা ছাড়া দুর্গম্ নামের ভাবার্থ—অজ্ঞানান্ধকার, যাহা দুরতিক্রমনীয় তাহাই দুর্গমাখ্য মহাসুর। জ্ঞানস্বরূপিণী দুর্গার আবির্ভাবেই অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হইয়া থাকে। আমরা মায়া সম্বন্ধে উপনিষদেও দেখিতে পাই যে, ইনি সামান্যা নহেন। ইনিই মহেশ্বরের প্রকৃতি এবং এই চৈতন্যময়ী প্রকৃতিই সর্বব্যাপিণী হইয়া আছেন এবং তিনিই কারণরূপে ভূতগণের অবয়বে বিরাজিতা আছেন:

"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ॥ শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৪।১০

বিভিন্ন উপনিষদে সৃষ্টি-রহস্য ব্যাখ্যায় এই মায়া বা পরাপ্রকৃতিকে কোথাও জড় বলা হয় নাই। ইনি মহেশ্বরের অভিন্ন স্বরূপশক্তি সুতরাং চৈতন্যময়ী। প্রকৃতি বা শক্তির কথা উঠিলেই আমরা ভাবিয়া থাকি উহারা জড়—অচেতন, কিন্তু আগমোক্ত প্রকৃতি বা শক্তি অচেতন নহেন, চৈতন্যময়ী। গীতায় সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীভগবান তাঁহার এই স্বরূপশক্তিকে পরাপ্রকৃতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ভূমি, অপঃ, অনল, বায়ু, খং বা আকাশ এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার তাঁহার এই অষ্টবিধ অপরা বা নিকৃষ্টা হইতে শ্রেষ্ঠা এই পরাপ্রকৃতিই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন:

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥" গীতা ৭।৫

শ্রুতি ও উপনিষদ হইতে সৃষ্টি বর্ণনায় বহুস্থলেই আগমবর্ণিত চৈতন্যময়ী প্রকৃতির সমর্থন পাওয়া যায়। বরং বলা যায় এই পরাপ্রকৃতিই অপরাপ্রকৃতির উপাদান কারণ। প্রাকৃত জগৎ এমন কি সমষ্টি শরীররূপী হিরণ্যগর্ভ বা মহত্তত্ত্ব পর্যন্ত এই পরাপ্রকৃতিরূপা মহাশক্তির কার্য। দিব্যজ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া যাহা ঈশ্বরের শক্তি, এই পরাপ্রকৃতি তাহারই সমষ্টি বা সমন্বয়রূপ। সুতরাং ইনি কখনই চেতনহীনা বা জড়া হইতে পারেন না। এমন কি, এই প্রকৃতিসম্ভূত পরমাণু পর্যন্ত জড় নহে, ইহাও বলা যাইতে পারে। তবে তথায় চৈতন্যসত্তা সুপ্ত থাকায় আমরা ঐগুলিকে জড় বলিয়া ধারণা করিয়া থাকি।

এই মহাশক্তিকেই ভগবান তাঁহার মায়া বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই মায়া বা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়াই তাঁহার সৃষ্টি কার্য চলিয়া থাকে। সাক্ষীস্বরূপ শ্রীভগবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতিই চরাচর বিশ্বসূজন করেন।

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।" গীতা ৯।১০

মহাপ্রলয়ের পরে এবং পুনরায় সৃষ্টির প্রারম্ভে এই পরাশক্তি মায়া যখন আবার কার্যোন্মুখ হন তখনই ঈশ্বর তাহা জ্ঞানে ঈক্ষণ বা দর্শন করেন, এই ঈক্ষণ তাঁহার সৃষ্টির সংকল্প। "একোঽহং বহু স্যাং প্রজায়েয়" তিনি একা ছিলেন বহু হইবার সংকল্প করিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।২।৩) এই সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত আছে। এই যে কার্যোন্মুখ মায়াযুক্ত ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, ইনি সগুণ। ইনি এক হইলেও এখানে যেন আপনাকে দ্বিধাবিভক্ত করিলেন। এক অংশ

তাঁহার পরাশক্তি বা পরাপ্রকৃতি ইনি পরমা মাতা হইয়া এই সৃষ্টিতে অধিষ্ঠিতা থাকেন এবং অপরার্ধ পরমপুরুষ পরমপিতা হন। পরমপিতাই সমগ্র জগতের এক এবং অবিভক্ত পুংশক্তি, আর যিনি পরমা মাতা, তিনিই সমগ্র জগতের এক অবিভক্ত স্ত্রীশক্তি। এই বিশ্বজগতে সর্বত্রই সেই এক পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তি অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের ন্যায় অনন্তভাবে অনন্তরূপে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। কীটানুকীট হইতে আব্রহ্মস্তম্ব এই পুরুষ-প্রকৃতির লীলা। অণুপরমাণুতেও এ লীলার অন্ত নাই। সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বর জগতের পিতৃস্থানীয় এবং তাঁহার সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি মাতৃস্বরূপিণী। চণ্ডীতে আছে "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা" সমস্ত স্ত্রী জাতিতে তাঁহারই প্রকাশ, তাঁহারই অংশ। এবং পুরুষগণের মধ্যেও ঐরূপ পুংশক্তির অংশ বিদ্যমান আছে। যাহা হউক এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখন আমরা আগম শাস্ত্রানুসারে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করিয়া বক্তব্য শেষ করিব।

আগম শাস্ত্রেও এই শক্তিতত্ত্বকে কোথাও পুরুষ এবং কোথাও বা নারীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। বৈষ্ণবাগমে এই শক্তিই বিষ্ণু, আবার শাক্তাগমে নারী মহামায়া। শৈবাগমে কিন্তু ইনিই পরমশিব। ভক্তগণের ভাবানুসারে তাই ইনি কোথাও পিতৃজ্ঞানে কোথাও বা মাতৃভাবে আরাধিতা হইয়া থাকেন। 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা' ব্রহ্মের কল্পনাপ্রসূত জগতে যাবতীয় বস্তু যেমন কল্পিত, দেবাদি জীবনিচয়ও তদনুযায়ী কল্পিত, কিন্তু ভক্তের ভাবানুযায়ী ভগবানের রূপ পরিগ্রহের কথা আলাদা। সেখানে ভক্তের ভাবেরও যেমন অবধি নাই ভগবানের রূপেরও তেমনি অন্ত নাই।

শৈবাগমের অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে হরের বামে যেমন অর্ধাঙ্গিনী রূপে গৌরীর অবস্থান, আবার হরিহর মূর্তিতেও তেমনি হরের বামে অর্ধ অঙ্গস্বরূপ শ্রীহরি অবস্থিত। তাই হরমোহিনীকে বৈষ্ণবীশক্তি বা বিষ্ণুস্বরূপিনী মহাশক্তি বলিয়াই শ্রীদুর্গাশতীতে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে শক্তি ও শক্তিমান্ এবং এতদুভয়ের সম্মেলনাত্মক পরতত্ত্ব—এই তত্ত্বত্রয়কে আগমবিদ্‌গণ 'বস্তুত্রয়' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'শক্তি ও শক্তিমান' প্রবন্ধে 'বস্তুত্রয়ের' যে রহস্য উল্লেখ করিয়াছেন এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। "অপ্পয়দীক্ষিত তাঁহার 'বস্তুত্রয়' পরীক্ষায় যে রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন শ্রীভাস্কর রায় সপ্তশতীর 'গুপ্তবতী' টীকায় তাহা উদ্ধৃত করিয়া সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীদুর্গাপ্রতিমা এই 'বস্তুত্রয়ের' প্রতীক। দেবীর বাহন মহাসিংহ, বিষ্ণুর অবতার। আর মহিষাসুর, শিবের অংশাবতার; সিংহ শক্তি, অসুর শক্তিমান। এই শক্তি ও শক্তিমানের উপর উভয় পদস্থাপনে যিনি শক্তি-শক্তিমানের সমন্বয় ঘটাইয়াছেন তিনিই পরতত্ত্বের মূর্তি—শ্রীশ্রীদুর্গা। তাই 'দুর্গা' শুধুই মহাশক্তি বা মহামায়া নহেন—তত্ত্বতঃ তিনিই পরব্রহ্মময়ী। যিনি এ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না সে অল্পবুদ্ধির নিকট—তিনি শুধুই মহামায়া-মহাশক্তি-বিশ্বজননী। কিন্তু যিনি তাঁহার পরতত্ত্বেরই উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি করিবেন:

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী"

সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইলে এই তত্ত্বস্বরূপের বা পরতত্ত্বের উপাসনাই সাধককুলের লক্ষ্য।"

শক্তিপূজা

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

সাংখ্য বেদান্ত তন্ত্র শাস্ত্রাদি শক্তি সম্বন্ধে স্ব স্ব মত অবলম্বন ক'রে দেখিয়েছেন আদ্যাশক্তিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্রী। শাস্ত্রকারদের পরস্পরের মতভেদ থাকলেও তাঁর প্রাধান্য সকলেই স্বীকার ক'রেছেন। সাংখ্য যা প্রকৃতি, বেদান্তে তা মায়া এবং তন্ত্রে আবার তা'ই শক্তি ব'লে প্রসিদ্ধা। সাংখ্যের প্রকৃতি নিত্যা বটে, কিন্তু জড়া, বেদান্তের যে মায়া তা অনির্ব্বচনীয়া ও তুচ্ছা অর্থাৎ অনিত্যা কিন্তু তন্ত্রের শক্তি নিত্যা। সাংখ্যের সহিত বেদান্তের অনেকটা মিল থাকলেও সাংখ্যের পুরুষ আবার বহু। নিত্যার সম্বন্ধে সাংখ্যের প্রকৃতির সঙ্গে তন্ত্রের শক্তির মিল থাকলেও সাংখ্যের প্রকৃতি জড়া ইতিপূর্ব্বেই বলা হ'য়েছে. কিন্তু তন্ত্রোক্ত শক্তি চিন্ময়ী। সকল শাস্ত্রের সার কথা,—শক্তি সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী ও সৃষ্টির জননী। শ্রীচণ্ডীতে শক্তিকে উচ্চ স্থান দিয়ে বলা হ'য়েছে "আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা",—অর্থাৎ মা! তুমিই জগতের আধার। তন্ত্রকে বেদান্তের practical side বা ব্যবহারিক শাখা বলা যায়।

তন্ত্রে আমরা পাই শিব শব হ'য়ে প'ড়ে আছেন, এবং দিগম্বরী কালী শিবের বুকে নৃত্য ক'রছেন। এটি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের একটি চিত্র। এখানে দিগম্বরী বলার অর্থ, মা আমার আলোকময়ী, তাই তিনি নিরাবরণা। শিব শব, কিনা নিষ্ক্রিয়, এবং তাঁর বুকে নৃত্যচঞ্চলা মা কালীর নৃত্য অর্থে পরিবর্ত্তনশীলা শক্তি বা প্রকৃতির খেলা। বেদান্তের ব্রহ্ম ও শক্তি যেমন অভেদ, তন্ত্রের শিব-শক্তিও তদ্রূপ অভেদ; যেহেতু কারণ-ব্রহ্মের কার্য্য হচ্ছে প্রকৃতি বা শক্তি। বেদান্তের ব্রহ্ম ও তন্ত্রের শিব, এই দুয়ের মধ্যে ভেদ হ'চ্ছে—বেদান্তের ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ; নির্গুণ ব্রহ্মে মায়ার লেশমাত্র নাই, সুতরাং ইহাতে সৃষ্টির বীজও নাই। কিন্তু তন্ত্রের শিব, সগুণ, সুতরাং সৃষ্টির বীজ ইহার মধ্যে বর্ত্তমান। বেদান্তে ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা, কিনা যার সত্তা নাই, কিন্তু তন্ত্রে জীব-জগৎ সত্য।

এখন সৃষ্টি ও প্রলয় ব'লতে আমরা কি বুঝি? সৃষ্টি অর্থে 'অধিষ্ঠান ব্রহ্মের উপরে মায়া বা শক্তির খেলা, আবার প্রলয়ে শক্তির ব্রহ্মে লয়' এরূপ কল্পনা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ সম্বন্ধে বেশ একটি উপমা দিয়েছেন, যেমন সর্প। যখন সর্পটি স্থির হ'য়ে প'ড়ে থাকে, তখন তার কোন ক্রিয়া নাই, কিন্তু যখন আবার সে চ'লতে আরম্ভ করে, তখন তার ক্রিয়া আরম্ভ হয়। তাহ'লে একই সর্প কখন স্থির, কখনও বা গতিশীল; সুতরাং এখানে প্রমাণ হ'ল, ব্রহ্মেরই শক্তি এবং শক্তি ও ব্রহ্ম অভিন্ন। পূর্ব্বেই বলা হ'য়েছে, বেদান্তের সহিত তন্ত্রের প্রভেদ হচ্ছে বেদান্তের মায়া তুচ্ছা, কিন্তু তন্ত্রের শক্তি চিন্ময়ী, নিত্যা—ইনি আদ্যাশক্তি। তন্ত্রে তাই অর্দ্ধনারীশ্বর দেখান হয়েছে, অর্থাৎ সৃষ্টি বা প্রলয়ে আদ্যাশক্তি শিবের চিরসঙ্গিনী।

জগতের যে সৃষ্টি ও লয় তা কার্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত। এখানে সগুণ ব্রহ্ম হ'চ্ছে 'কারণ' যাকে অব্যক্ত বলা হয়, এবং ব্যক্ত জগৎ হচ্ছে 'কার্য'। কার্য-কারণ যেমন অভেদ, বেদান্তের ব্রহ্ম-শক্তি বা তন্ত্রের শিব-শক্তি তদ্রূপ অভিন্ন।

বাস্তবিকই শক্তির মহিমা সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। শ্রীচণ্ডীতে আমরা পাই, প্রলয়-কালে জগৎ এক বিরাট কারণার্ণবে পরিণত হলে ভগবান প্রভু শ্রীবিষ্ণু অনন্ত-শয্যায় শায়িত হ'লেন। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ছিলেন বিষ্ণুর নাভিদেশে অবস্থিত। এবারে বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুই দুর্ধর্ষ অসুর উৎপন্ন হ'য়ে ব্রহ্মাকে হত্যা করবার জন্য উদ্যত হ'ল। ব্রহ্মা তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গের নিমিত্ত তাঁর নয়নাশ্রিতা অতুলনীয়া তামসীশক্তি জগৎপালিনী ভগবতী যোগনিদ্রার স্তব ক'রতে লাগ্‌লেন :

"ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারস্বরাত্মিকা। ১।৭৩
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা॥
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ। ১।৭৪
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা॥
ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ। ১।৭৫
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমত্স্যন্তে চ সর্ব্বদা॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে। ১।৭৬
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ি॥

পরমেশ্বরের একমাত্র শক্তিই, ভোগে ভবানী, পৌরুষে বিষ্ণু, কোপে কালী, সমরে দুর্গা—কার্যকালে এই চারিরূপে বিভক্ত হন ইত্যাদি বচনানুসারে বিষ্ণু ও কালিকায় প্রভেদ নাই; অতএব এই দুর্ধর্ষ অসুরদ্বয় মধুকৈটভের নিধন বিষ্ণুরূপা কালিকা শক্তিরই কার্য, এইরূপে ঘৃঢ়নিশ্চয় হ'য়ে ব্রহ্মা আদ্যাশক্তি মহাকালীর স্তব ক'রছেন,—হে নিত্যে অক্ষরে; অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে, তুমি হবির্দানমন্ত্ররূপা, পিতৃলোকহবির্দানমন্ত্ররূপা, তুমি যজ্ঞরূপা এবং উদাত্তাদি স্বররূপা; তুমি অমৃতরূপিণী; তুমি প্রণবরূপিণী, সত্ত্বরজস্তমোময়ী হ'য়ে অবস্থান ক'রছ। যাহা নির্গুণা, মোক্ষপ্রকাশিকা, অব্যক্তরূপা তাহাও তুমি। তুমি সেই প্রসিদ্ধা গায়ত্রী, জ্যোতির্ময়ী পরমা জননী অর্থাৎ আদিমাতা। হে দেবী, তুমি ব্রাহ্মীরূপে এই জগৎ সৃজন ক'রছ, বৈষ্ণবীরূপে জগৎ পালন করছ, এবং রৌদ্রীরূপে জগৎ আত্মসাৎ ক'রছ; তাই বলি, হে বিশ্বরূপে! তুমি আপনাকে আপনি সৃষ্টি ক'রে থাক, আবার আপনি সৃষ্ট হ'য়ে যতকাল প্রয়োজন আপনাকে পালন ক'রে থাক, এবং প্রলয়কালে আপনিই আপনাতে লয় প্রাপ্ত হও, ইত্যাদি। তামসী-শক্তিস্বরূপা দেবী ব্রহ্মার স্তবে তুষ্টা হয়ে মধুকৈটভের বিনাশার্থ বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গের জন্য তদীয় চক্ষু, মুখ, নাসিকা, বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল হ'তে নির্গত হ'য়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচর হ'লেন। যোগনিদ্রা-মুক্ত জগন্নাথ জনার্দন একার্ণবে অনন্ত শয্যা থেকে উত্থিত হ'য়ে হেলে-বলে অসুরদ্বয়কে হত্যা করেন। তা'হলেই দেখা যায়, মহাশক্তির কৃপা ব্যতীত জগতে কোন কার্য সম্ভব নয়।

দেবাসুর সংগ্রামে আমরা দেখতে পাই যখনই দেবতারা অসুরগণ কর্তৃক আক্রান্ত

হয়েছেন, তখনই তাঁরা আত্মাশক্তি মহামায়ার আরাধনা করে মায়ের অসীম কৃপায় যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। দেবতাগণ দেখেছিলেন মহাশক্তি জগজ্জননী সর্বভূতে অধিষ্ঠিতা, তাই তাঁরা স্তব করেছিলেন :

"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

অর্থাৎ চিন্ময়ী মা আমার শক্তিরূপে সর্বত্র বিরাজিতা, তাই তিনি সকলের প্রণম্যা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "সত্য বটে, বিচারে সমস্তই উড়ে যায়, জীব-জগৎ সব অবস্তু, একমাত্র ব্রহ্মই সার, কিন্তু শক্তির রাজ্যে তুমি কর্মী, এবং ধ্যান, চিন্তা, কর্মাদি শক্তির ভিতর। শক্তি বিনা কেহ কোন কর্ম করতে পারে না।"

বস্তুতঃ, শক্তি একমাত্র তত্ত্ব, শক্তিই একমাত্র সাধ্য, শক্তিই একমাত্র সর্বকারণকারণ অবাঙ্মনসোগোচর পরমাত্মা। তাঁর ইচ্ছা বিনা অসুর-নিধন অসম্ভব, দেবতারা তাই মহামায়ার স্তুতি আরাধনা করেছেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "কালী-মূর্তিই শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ বিকাশ (Perfect manifestation)। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সবার কর্ত্রীই তিনি। একদিকে মা, অসির দ্বারা ধ্বংস করছেন এবং আর একদিকে বর ও অভয় দিচ্ছেন। এই হল শ্রীভগবানের লীলা। এজন্য অন্যাবধি ভারতে শক্তিপূজা মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়।"

শক্তিপূজার অন্তরালে রয়েছে অসীম শক্তির উপাসনা ও ধ্যান-ধারণা। আর্ষঋষিগণ এই মহাশক্তিকে সকল শক্তির আধাররূপে কল্পনা করেছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আমরা প্রমাণ পেয়েছি, দেবতাদের আকুল আহ্বানে শ্রীদুর্গামূর্তিতে মহাশক্তির আবির্ভাব। অন্যাবধি হিন্দুরা তাই শ্রীদুর্গাকে বিশ্বজননীরূপে পূজা করে থাকেন; কেননা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে মহীয়সী শক্তির খেলা চলেছে, তারই একমাত্র প্রতীক হলেন জগদ্ব্যাপিনী পরাপ্রকৃতি শ্রীদুর্গা। শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কথায় বলি, "একমাত্র হিন্দুধর্মই এই জগন্মাতার পূজা প্রচার ক'রে আসছে। ঈশ্বরে এরূপ মাতৃভাবের পরিচয় পৃথিবীর অন্য কোন দেশের ধর্মশাস্ত্রে নাই। এই বিশ্বপ্রসবিনী মহামায়া নানাবিধ মূর্তিতে হিন্দুভক্তগণের গৃহে গৃহে এবং ভারতের ও অন্যান্য দেশের সমস্ত তীর্থস্থানে আজও পর্যন্ত পূজা পেয়ে থাকেন। ইনি একা হইয়াও দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি বহু নামে ও মূর্তিতে ভক্তদিগের মনস্কামনা পূর্ণ করছেন।"

পরিশেষে বক্তব্য, ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও কেনোপনিষদের "যক্ষের আবির্ভাব ও দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি উমা হৈমবতীর উক্তি" থেকে মহাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু কেনোপনিষদ নয়, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও পরাশক্তির উল্লেখ পাই, সুতরাং বৈদিক যুগ থেকেই যে 'শক্তিপূজা' প্রচলিত ইহা অনস্বীকার্য।

দুর্গাপূজার সার্থকতা

ব্রহ্মচারী অসীম চৈতন্য

আজ ভারতের সর্বত্র ৺শ্রীশ্রীজগদম্বার শারদীয়া পূজার আনন্দে আবাল-বৃদ্ধ নরনারী, চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। শিশির-সিঞ্চিত রৌপ্য-ঝলমল, শস্য-শ্যামলা ধরণীর শারদীয় পুণ্যপ্রভাতে পূজা-বাসরে বিল্বদলের গম্ভীরভাব ব্যঞ্জক গন্ধে, শেফালি পুষ্পের অমৃতময় সৌরভে ও ধূপধুনার প্রাণমাতানো মধুময় দিব্যগন্ধের সহিত সমবেত পুরনারীগণের মোহনকণ্ঠে ধ্বনিত মাতৃসঙ্গীতের কলরোলে আকাশ বাতাস যেন ঝমঝম করিতেছে। আবার মহিষমর্দিনী, বরাভয়দায়িনী, সর্বসিদ্ধিদায়িনী মা ত্রিনয়নীর পূজামণ্ডপপ্রাঙ্গনে নহবৎ ঘণ্টা কাঁসরের তালতরঙ্গের সহিত—ঢাক, পনব এবং ভেরীর রুদ্র ঝঙ্কারে মাতৃসাধকের হৃদয়স্থ শক্তিরুদ্র যেন আনন্দে নাচিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা এক আনন্দের ও শুভের দিন। এই বিশেষ দিনে হিন্দুচিত্তে যেন এক অভাবনীয় ভাবের মূর্চ্ছনা হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে; মায়ের পূজাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহাদের অস্তিত্বকে যেন স্মরণ করাইয়া দিতেছে। যাহা না হইলে মানুষের বাঁচামরা সমান হইয়া যায়, যাহার অভাবে জীবন মরুভূমির মত শুষ্ক হইয়া যায়; তাহারই অনির্বচনীয় আভাস অন্তরে যেন প্রতিভাসিত হইতে চায়।

ধ্যাননিমীলিত নেত্রে পূজকের মাতৃচিন্তন, গম্ভীর পরিবেশে তন্ত্রধারকের-মন্ত্রোচ্চারণ, বহুবিধ ফলমূল এবং মিষ্টান্নাদির দ্বারা নৈবেদ্য সাজাইবার মাঝে সেবকের সেই উদাস,-তৃপ্ত ও পবিত্র মুখমণ্ডল, প্রচুর রক্তজবা ও পদ্মফুলের মালায় সুশোভিত মাতৃচরণ প্রভৃতির দৃশ্য সমস্ত জাতির হৃদয়ে যে আনন্দের বান বহাইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহারই মাঝে প্রতি মানুষের প্রকৃত ছবিটি যেন কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ বা মায়ের দিকে তাকাইয়া ভাবাবেগে নিঃশব্দে অশ্রু বিসর্জন করিতেছে। কি এক অব্যক্ত ব্যথা যেন ভিতরে ভিতরে গুমরিয়া উঠিতেছে! তাহার কারণ হয়ত সে নিজেও জানেনা বা বলিতে পারিতেছে না। তবে কেন এই ভাব হয়? ইহা কি তাহাদের প্রাত্যহিক জীবনের বহুবিধ চাওয়া ও পাওয়ার মাঝে যে ভ্রান্তি, যে বিরোধ, যে অতৃপ্তি তাহারই প্রতিক্রিয়া? নাকি, সমস্ত দুঃখদৈন্য, অভাব অভিযোগের দুঃসহ ব্যথাকে ছাপিয়া, অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের নিষ্কলুষ চিরন্তন বিশুদ্ধ স্বভাবটি আত্মপ্রকাশের নিমিত্ত মুহূর্তের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, ইহা তাহারই লক্ষণ? বস্তুতঃ সেই সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ যাঁহাদের পূত হৃদয়ের অপূর্ব সৃজনী-প্রতিভা সংসার দাবানলে দগ্ধ, বেদনাক্লিষ্ট নরনারীর মনের আত্মমুখী হইবার এমন পথ নির্মাণ করিয়াছে। তাঁহাদের এবম্বিধ নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতায় শির পুনঃপুনঃ নত হইয়া পড়ে।

মাতৃপূজার প্রকৃত কথাই হইতেছে আত্মনিবেদন, নিজের বলিয়া, আমার বলিয়া কিছুই থাকিবেনা। সংসার জীবনে ধন জন মান, পুত্র কলত্র, নারীর পক্ষে স্বামী, স্বামীর পক্ষে পত্নী, এমন কি নিজের দেহমনপ্রাণের উপরও নিজের কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব থাকিবেনা। সমস্তই মাতৃ-

কর্তৃত্বে বা প্রভুত্বে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে হইবে। মানুষের অন্তরে ও বাহিরে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে যে সমস্ত দুর্বলতা সংকীর্ণতা থাকিতে পারে, অনুক্ষণ মাতৃচিন্তা দ্বারা ঐসকল দুর্বলতার অপসারণই শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার মোড়ার কথা। ইহা সম্ভব হয় মায়ের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও অটুট বিশ্বাসের দ্বারা। উক্ত বিশ্বাস এবং ভক্তি যে-জীবনে বাস্তবরূপ ধারণ করে, সেই জীবনেই ৺শ্রীশ্রীমায়ের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব ঘটে। সার্থক পূজা করিয়াছিলেন মাতৃভক্ত রামপ্রসাদ, বামাক্ষেপা, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ ও মেহারের সর্বানন্দ ঠাকুর। তাঁহারা প্রকৃতই বিশ্বজননীর শ্রীপাদপদ্মে ঐকান্তিক ভক্তির সহিত স্বীয় সত্তাকে পূজার উপচার রূপে নিবেদন করিয়া মাতৃপূজার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহারা মাতৃপ্রেমসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে সমগ্র জাতি, দেশ তথা বিশ্বকে অমৃতপথের সন্ধান দিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।"

দুর্গতির যিনি নাশ করেন তিনিই মা ৺শ্রীশ্রীদুর্গা। জীবের জীবত্বই তাহার সমস্ত দুঃখের কারণ। জীবের স্বরূপ উপলব্ধিতে ও দর্শনেই তাহার জীবত্বের অর্থাৎ সর্ববিধ অজ্ঞানতা, দুর্বলতা, বিক্ষিপ্ত চিত্তের সংশয়াবস্থা দূরীভূত হয়। এবম্বিধ অবস্থা প্রাপ্তির জন্য অর্থাৎ পূর্বে যাহা ছিল সেই অবস্থা পুনরায় প্রাপ্তির জন্য যখন জীবহৃদয়ে বাসনা বলবতী হয়, তখনই ৺চণ্ডীতে বর্ণিত মেধাসুর সংগ্রাম আরম্ভ হয়। কারণ তাহার এই বাসনা চরিতার্থ করিবার বিরুদ্ধে প্রবল বাধা মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। বহুজন্ম-জন্মান্তরের বিপরীত চিন্তা (আত্ম-বিমুখী), বিপরীত কর্ম, বিপরীত ভাবনা ও বিপরীত রুচি-বৈচিত্র্যের সংস্কাররাশিই জীবহৃদয়ে (অন্তঃকরণে) লুক্কায়িত থাকিয়া বাহিরে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি প্রবৃত্তিরূপে অসুরের ন্যায় আচরণ করিতে থাকে। বিপরীত কর্ম কাহাকে বলা হয়? যে কর্ম জীবকে ঊর্ধ্বমুখী করে না, চৈতন্যমুখী করে না, এক কথায় মাতৃমুখী করে না। ইহা রজঃগুণের কর্ম। গীতায় এই জন্যই উক্ত হইয়াছে,—"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।" গীতোক্ত রজোগুণেরই বহির্বিকাশ ৺চণ্ডীর মহিষাসুর। সমূলে অজ্ঞানতা, দুর্বলতার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া আত্মভাবে সমাহিত হইবার ইচ্ছাকে কার্যকরী করিবার জন্য যে প্রচেষ্টা বা বৃত্তি তাহাই সুর অর্থাৎ দেবতা। অসুর ও দেবতা মনেরই দুই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। গীতোক্ত ষোড়শ অধ্যায়ে এক হইতে তিন শ্লোকে যে সাত্ত্বিকী সম্পদের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহা অর্থাৎ ভয়শূন্যতা, চিত্তপ্রসন্নতা, জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা, ইন্দ্রিয়সংযম, আত্মধ্যান, দান, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা সত্য ইত্যাদি বৃত্তিই ৺চণ্ডীতে বর্ণিত দেবতা বা সুর। তদ্বিপরীত দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানতাই অসুর পদবাচ্য। এইভাবে প্রবৃত্তির দারুণ কশাঘাতে নিবৃত্তি অর্থাৎ মাতৃমুখী চেতনা ক্ষীণ হইয়া যাওয়াই দেবতার স্বাধিকার অবলোপ বা অসুরের সাম্রাজ্য প্রাপ্তি। যাহা হউক, অসুর নিচয়ের প্রবল আক্রমণে দেবতাগণ স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া নররূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্থাৎ, যেন অন্তরস্থ পূর্বোক্ত সংবৃত্তি নিচয় কুপ্রবৃত্তির দারুণ প্রাবল্যে একেবারেই নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে। যেন সংবৃত্তিগুলি আর কিছুতেই মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে পারিতেছে না; যেন—তাহার সকল শক্তিই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, বুক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; যেন আর উঠিয়া দাঁড়ানোই

সম্ভব নয়। এক কথায় শক্তির গতি বা প্রবাহ অন্তর্মুখী না হইয়া প্রবল সংস্কাররূপ অসুরের পরাক্রমে বহির্মুখী হইয়া পড়িয়াছে। শক্তির এবম্বিধ নিম্নমুখী অবস্থায় অনুশোচনায় জর্জরিত হইয়া জীব বিষ্ণু ও শঙ্করের শরণাগত হইল, এবং শোকাকুলিত চিত্তে অসুরের বেদনারাশি জ্ঞাপন করিল। জীব তথা সাধকের সুস্থ বা স্বস্থ হইবার বাসনাই প্রাণ ও জ্ঞানের আশ্রিত হওয়া। অরুণোদয়ে যেমন রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত হয় তদ্রূপ জ্ঞানের (বিবেকের) আবির্ভাবেও অন্তরস্থ অন্ধকারের বিনাশ হয়। প্রাণের সংযোগেই মানুষের জীবন। প্রাণের জন্যই জীব দেহের সৌন্দর্য ও মোহনতা। কিন্তু কেবলমাত্র প্রাণের সমাবেশেই চলার পথ সহজ বা নির্বিঘ্ন হয় না, যদি না ঐ মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানের বিকাশ হয়। অথবা ঐ মানুষ যদি তাহার জীবনক্ষেত্রে জ্ঞানের বিচারে সর্ববিধ কার্য করিতে সমর্থ না হয়, কিংবা চলিতে না চাহে, তবে তাহার সকল সৌন্দর্যই ইহলোকে বা পরলোকে বিলুপ্ত হইয়া থাকে। প্রাণের ও জ্ঞানের সমবায়ে চলাই বিষ্ণু ও শঙ্করের শরণাগত হওয়া। বিষ্ণু ও শঙ্কর সেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী বা মহামায়ার দুই বিভিন্ন শক্তি।

শরণাগতি কাহাকে বলে, কি তার অবস্থা এবং ব্যাকুল হইয়া ডাকাই বা কিরূপ মানসিক অবস্থার পরিচায়ক, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই বিশ্বের প্রাণপুরুষ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে।

ব্যাকুল হইয়া মাকে ডাকিতে না পারিলে, মায়ের প্রতি ষোল আনা বিশ্বাস না করিতে পারিলে এই দেবাসুর সংগ্রামে জীব তথা সাধকের জয়ী হওয়া অসম্ভব। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "মানুষ ছেলেমেয়ের জন্য ঘটিবাটি কাঁদে, মায়ের জন্য কে কতটুকু কেঁদেছে।" মায়ামুগ্ধ জীব শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাতেই পূর্ব সংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া চিরতরে ধন্য হইতে পারে। রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন, "কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম, ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।" শ্রীশ্রীঠাকুরও ঐ কথাই বলিয়াছেন, "যিনি ব্রহ্মতে তিনিই কালী।" জীব এইভাবে মাকে জীবনের যথাসর্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলে তবেই সেই অসীম-অনন্ত-অখণ্ড-অব্যক্ত বিশ্ববিমোহিনী মা আমার বিজ্ঞানময় শ্রীশ্রীগুরুরূপে দেহধারণ করেন। দয়াময়ী মায়ের গুরুরূপ ধারণের একমাত্র কারণ হইতেছে—শক্তিহীন, বীর্যহীন, শ্রী ও মেধাহীন জীব মায়ের সেই 'বিপুলাং' অবস্থা যে প্রথমেই ধারণা করিতে পারে না, তাহা তিনি জানেন। এই কারণেই দয়াময়ী মা জীবের কাছে তাহারই মত সাধারণ ভাবে আহার-নিদ্রা-শয়ন এবং কর্মরত ধ্যানরত মূর্তিতে ধরা দেন। ৮চণ্ডীতে বর্ণিত শ্রীশ্রীমেধস মুনিই বিজ্ঞানময় গুরুরূপী এবং সাম্রাজ্যচ্যুত পথের ভিখারী রাজা সুরথই প্রবৃত্তির নির্মম আঘাতে আচ্ছন্ন জীব। গুরুরূপী মেধসের প্রতিনিয়ত সঙ্গ ও সেবাই জীবের পক্ষে অবিসংবাদিত মাতৃসঙ্গ এবং সেবা। শ্রীশ্রীগুরুর সেবা করিতে করিতে জীব মায়ের সেই অচিন্ত্যরূপ দর্শন করেন বা স্ব-স্বরূপানন্দে প্রতিষ্ঠিত হন। অর্থাৎ এতদিন যিনি জীব ছিলেন তিনি শিবত্বে সমাসীন হন। তখন জীবভাবের বিনানুহেতু সমস্ত সংশয় দূর হয়, সকল কর্ম সংস্কারের মূল উৎপাটিত হয়। অর্থাৎ দেবাসুর সংগ্রামে দেবতার বিজয় পতাকা আকাশে উড্ডীন হইয়া সংগ্রামের চির সমাধি ঘটায়। গুরুরূপী মায়ের কৃপায় এই সময়ে এই ফলশ্রুতি হইল যে, জীবের প্রবৃত্তিকে পোষণ ও তোষণ করিবার জন্য

যে দশ ইন্দ্রিয় জীবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তাহারাই পুনরায় জীবের তথা সাধকের পক্ষে নিবৃত্তিকে সঙ্গে লইয়া প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে তুমুলভাবে অস্ত্রধারণ করিল ও তাহার বিনাশ করিল। উক্ত দশ-ইন্দ্রিয় ও নিবৃত্তি ৺চণ্ডীতে বর্ণিত ৺শ্রীশ্রীদুর্গার দশহস্ত ও সিংহরূপে পরিকল্পিত। শুধু তাহাই নহে, সাধক এক্ষণে সর্বসিদ্ধি, বিজয়, বিদ্যা, সমৃদ্ধি ও দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তিতে ধন্য হইল। অর্থাৎ গণেশ সিদ্ধিরূপে, কার্তিক বিজয় রূপে, সরস্বতী বিদ্যারূপে, লক্ষ্মী সমৃদ্ধি রূপে ও তৃতীয় নয়ন দিব্যজ্ঞানরূপে সাধকের করায়ত্ত হইল। মায়ের পূজা সার্থক হইল, অবশ্য কেবলমাত্র শরৎকালে নির্দিষ্ট তিন দিন প্রতীকের সম্মুখে পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেই পূজার কাজ সমাপ্ত হইল না। যতদিন আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে মহাশক্তির স্মরণ মনন অর্থাৎ কার্যতঃ শক্তির সংরক্ষণ, ধারণ ও পোষণ করিয়া জীবনকে সুবিন্যস্ত করিতে না পারিতেছি ততদিন পূজা অসম্পূর্ণ। পূজার সফলতা নিষ্ফলতা নির্ভর করে উদ্দেশ্যের প্রতি সচেতন থাকিয়া পূজকের নিজ আচরণের মধ্যে। আচরণের সহিত সঙ্গতিহীন পূজা কেবল সাময়িক উন্মাদনা সৃষ্টিতে ও বিলাসিতায় পর্যবসিত হয় মাত্র। মহামায়ার সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারিণী শক্তিত্রয়ীর একই সঙ্গে মূর্ত প্রকাশ নারীতে। নিম্নবয়স্কা, সমবয়স্কা ও বৃদ্ধা নারীতে মাতৃবুদ্ধি অন্তরে অন্তরে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তিবিনম্র চিত্তে তাঁহাদের পূর্ণমর্যাদা উপলব্ধি ও স্বীকৃতির মাঝেই শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার চূড়ান্ত সার্থকতা। সেই জন্যই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায় কলিকাতা মেছুয়াবাজারের রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে বারবণিতাকে দেখিয়াও "মা! তুই এমনিভাবে এইখানে?" এই বলিয়া আত্মভোলা মাতৃসন্তান করজোড়ে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি, তাঁহার সহধর্মিনীকে মাতৃপূজার সিংহাসনে বসাইয়া আন্তরিক ও আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রত্যক্ষ পূজা করিয়া শ্রীশ্রীমাতৃপূজার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। সে এক অভাবনীয় অভূতপূর্ব ব্যাপার। সেইদিন তিনি এমনভাবে কাজে ও কথায় পূজা ব্যপদেশে নারীকে চরমতম সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলেন, যাহাতে বিশ্বের সমগ্র নারী ধন্য হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর সকল সভ্যজাতির ইতিহাসে নারীকে এই উচ্চতম আসনে প্রতিষ্ঠা একমাত্র তিনিই করিয়াছেন। আসুন আজ এই পুণ্যমুহূর্তে জগজ্জননীর শ্রীপাদপদ্মে আমরাও এই প্রার্থনা জানাই :

"অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময়··· ॥"

এলে কি ধরায় তুমি

শ্রীঅমিতাভ আচার্য

সিংহবাহিনী দশভুজা মাগো,
এলে কি ধরায় তুমি।
কাঁদিতেছে আজ দ্বিধাবিভক্ত
শ্যামল বঙ্গভূমি॥
বাঙলার পথে একতারা হাতে
বাউল গাহে না গান।
ক্ষুধার জ্বালায় পুড়িয়া হেথায়
মানুষ হারায় প্রাণ॥
যোদনের মাঝে বোধন তোমার
সাঙ্গ জননী হবে যে এবার
শরতের প্রাতে বাঙলার বুকে
এলে তুমি দশভুজা।
গৃহহারা ছেলে আজি মা তোমার
কি দিয়ে করিবে পূজা॥
দুঃখ, দৈন্য ছড়িয়ে যে আছে
বাঙলার চারিধারে।
স্বার্থান্ধে সলিলে ডুবিছে বাঙলা,
কে আজ বাঁচাবে তারে?
শরতের প্রাতে সিংহবাহিনী
দুর্গতি কর দূর।
শৌর্যে বীর্যে বাঙলারে তুমি
করে তোল ভরপুর॥
দ্বিধা বিভক্ত মরা বাঙলায়
এস শরতের রাণী।
আশাহীন নয়ে জননী তোমায়
শোনাও অভয় বাণী॥
তোমার হাসিতে বিকশিত কর
শিউলী-কমলদল,
তোমার চরণে অর্ঘ দেবো, মা
মিশায়ে নয়নজল।

পার্বতীর প্রতি

(অনুষ্টুপ্ ছন্দ)

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য

১

পন্থা মুক্তির দেখাও, দুর্গা!
ভোগে লিপ্সায় জগৎ আঁধার!
বিশ্বে নিঃস্বের সহায় হও গো!
পালা আজ তার ঘুচাও কাঁদার!!

২

চিত্তে মদন কেবল চলছে,
শ্রদ্ধা নেই তার—শুধুই গরল!
অন্ন বস্ত্র আজ ক্ষুধার নিত্য,
আছে বিত্তের গরব তরল!!

৩

উড়ছে মিথ্যার নিশান ঊর্ধ্বে,
ঘোষে ডঙ্কায় আপন বাহার!
শক্তি—মিথ্যার সেবায় মত্ত,
সদা গায় যশ সবাই তাহার!!

৪

সত্য আজ তাই মুষিক তুল্য,
আছে গর্তের সীমার ভিতর!
আজকে নেই তার আদর একটু,
হোলো আজ সে-ই নেহাৎ ইতর!!

৫

ধর্ম আজকাল আচার-নিষ্ঠা!
নানা মারপ্যাঁচ কথায় কথায়!
ঈর্ষা-দ্বেষের বিষয় আজ তা,
শুধু মারপিট্ ধর্মার তথায়!!

৬

শঙ্খ-হুংকার শোনাও, গৌরী!
ধরা অম্বর কাঁপাও ভীষণ!
দুষ্টী চোরদের শুদ্ধাও গর্ব।
নাশো উৎপাত, জোগাও অশন॥

অঞ্জলি

শ্রীকালিদাস রায়

১

যারে দিলে তুমি স্বর্ণ কণিকাগুলি,
সোনা পেয়ে সে ত মাতিয়া রহিল
তোমারেই গেল ভুলি।
আমারে দিয়েছ তোমার মালার
একটি প্রসাদী ফুল,
দিবানিশি শুধু তোমারে স্মরায়
সৌরভে সমাকুল।

২

হাজার বছর যদি জল-তলে চকমকি থাকে পড়ি'
আগুন তাহার নষ্ট হয়না, ঠুকিলে ফিন্‌কি ছুটে।
ভক্ত ভাবুক যতই থাকুক মগ্ন বিষয়-ঘোরে
ভগবৎ কথা শুনিবা মাত্র নিমিষে তাতিয়া উঠে।
সারাদিন করে কৃষ্ণের নাম টিয়াপাখী বসি' দাঁড়ে
বিড়ালে ধরিলে কৃষ্ণ ভুলিয়া টাঁ্যা টাঁ্যা করি' ডাক ছাড়ে।

৩

বাসনার স্রোতে ভাসা, তাই মর্ত্যলোক,
বাসনায় ডুবে মরা, তাহাই নরক।
বাসনা যেখানে শুষ্ক, পায় সেথা ক্ষয়—
সেইখানে স্মরণের সূত্রপাত হয়।

৪

তোমারে হারাই পূজার আড়ম্বরে
উপচার খুঁজে মন মোর ঘুরে' মরে।
ধূপের ধোঁয়ায় ঢেকে যায় পাঁ-দুখানি,
ঘণ্টা কাঁসর ডুবায় তোমার বাণী।
তোমার ভোগ্য তোমার সজ্জার বাস
আমার পূজা হ'য়ে ওঠে বারো মাস;
মন্দিরও তব যেটুকু অর্ঘ্য পায়
তার শতাংশ তব পদে নাহি যায়।
দিনদিন হায় করি' তোমা অবহেলা
করিতেছি আমি শুধু পূজা পূজা খেলা।

শারদীয়া

(পঞ্চচামর ছন্দে)

সত্যেন্দ্র ভট্টাচার্য

পাষাণ মেয়ের হাতের কাঁকন
পায়ের নূপুর রুনুর ঝুনুর ;
বাজায় কেবল বাজায় শরৎ
শুনেই আমার হৃদয় বিভোর।

বিবাদ-বিষাদ আপন পরের
এমন সময় বিচার করার ;
এখন কেবল মিলন-গাথায়
জীবন মহান মহৎ করার।

অতীত মোহের কলঙ্ক-এক
বিভেদ বিষের দুর্গতি ভোগ
এ সেই অবাহিতের সাহস
দু'পায় দলার মাহেন্দ্রযোগ।

ধনীর-দীনের, বিদেশ-দেশের
কি কার পরশ, কি কার বরণ
সে তর্কে আজ কি কাজ, মাতার
জাগাও বোধন—মধুর স্মরণ।

পূজি রাঙা চরণে

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন বসু

এলো আজ এলোকেশে এলো কে সে জানি রে
কেশরীর কেশ ধরি' বরাভয় দানি রে—
শাণিত কৃপাণ হাতে
তেজোময়ী আঁখিপাতে
অসুর-বিনাশ তরে মনোত্রাসনাশিনী
শারদা বরদা আসে কৈলাসবাসিনী।
গিরি-দরী-সরোবরে এসেছেন জননী
তাই দেখি শ্যামলিছে এ ধরণী অমনি।
কমলে কমলে শোভে পদরেখা অতুলন
দশদিশি উজ্জ্বল প্রতিকরে প্রহরণ,
মঙ্গলময়ী আসে
লক্ষ্মী সারদা পাশে
গণবাণী বহি' আনে গণপতি মরতে
ময়ূরবিহারী বীর আসে এই শরতে।
সিদ্ধি ও ঋদ্ধি সে পূজি' রাঙা চরণে
ভক্ত ভক্তি লভে শক্তি ও স্মরণে।

আয় মা আবার তেমনি করে

শ্রীব্রত মুখোপাধ্যায়

আয় মা আবার তেমনি করে'
দশভুজা মূর্তি ধরে'
যেমনি ভাবে এসেছিলি
বিনাশিতে দানবেরে।

চলছে যে তোর এমনি খেলা
জানি যুগে যুগান্তরে,
স্নেহময়ী মূর্তি মা তোর,
প্রলয়রূপী ত্রিশূল করে।

ধরার বুকে সয়না তো আর—
অসুর-নাচন তাথৈ-থৈ,
দেখিয়ে দে মা, দেখিয়ে দে তুই
মাতৃহারা আমরা নই।

দশ হাতে তোর দশ প্রহরণ,
তেমনি করে' আবার ধর,
অনাচারের বুকের 'পরে
প্রলয়-করা নৃত্য কর্।

নয়নে তোর জ্বলে উঠুক—
ধ্বংস আগুন পুনর্বার,
ঝল্‌সে উঠুক সেই আলোতে
তরাল অসি তীক্ষ্ণধার।

দিকে দিকে ওই ওঠে মা
অসহায়ের কণ্ঠরোল
মাভৈঃ বলে অভয় দিয়ে
ধর্মে আবার জাগিয়ে তোল্।

সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ে মা তুই
শুভঙ্করী, ভয়ঙ্করী—
দুদিনে আর দুর্গতিতে
দুর্গাকৃপা তোরেই স্মরি।

মাতৃ-বন্দনা

শ্রীললিতবালা বসু

হে বিশ্ব জননী—
—পদরেণু স্পর্শে ধন্য করি এ ধরণী
এসেছো মা বৎসরান্তে ; দিয়ে দরশন
স্নেহ-ক্ষীরে-নীরে আজি জুড়াইতে মন
অসংখ্য সন্তানগণে। আশা পথ চাহি
কেটেছে বৎসর কাল—আশা-তরী বাহি
এসেছো কল্যাণময়ী। অচিরারে তব
নবপত্রিকার সজ্জা—কল্পারম্ভে শুভ
তোমার বোধন শঙ্খ উঠেছে বাজিয়া
অগণন চিত্ত-লোক হর্ষে উদ্ভাসিয়া!

অয়ি জীব-ধাত্রী দেবি! হের আঁখি পাতে
তোমার সন্তান কাঁদে দুদিনের রাতে।
খণ্ডিত জননী বঙ্গ—পূর্ব ভাগে তার
ছিল ধন-ধান্যে পূর্ণ কমলা ভাণ্ডার
সুজলা সুফলা ভূমি! স্নিগ্ধ সুনিবিড়
শান্তিপূর্ণ রমণীর স্নেহময় নীড়।
সেই পিতৃ পুরুষের পদধূলি পূত
পুণ্য গৃহাঙ্গন হতে হইয়া বিচ্যুত
দূর প্রান্তরের মাঝে রচি গৃহবাস
রহিয়াছি—মাগো! তাই চিত্তে জাগে আশ।

পূজিতে চরণ যুগ মহেন্দ্র-বন্দিত
অমল কমলদল—নিখিল-নন্দিত।
সর্ব শুভঙ্করী তুমি অয়ি! জিষ্ণুসুতে।
অয়ি বিষ্ণু-বিনোদিনী। মাতঃ শৈলসুতে
সর্বাশ্রয়ে! সর্বারাধ্যে! মহিষমর্দিনি,
জগৎপালিনী তারা হিমাদ্রিনন্দিনি!
দেবেন্দ্র অনল সূর্য শশাঙ্ক সুন্দর
পূজিছে তোমারে নিত্য বিশ্বচরাচর
স্তুতি-রত পাদপদ্মে;—স্বয়ম্ভুমোহিনী
প্রণতে প্রসন্না হও নমস্তে জননি!

বৎসরান্তে বিশ্ব-মাতা! তব আগমন
ঘুচিতে ধরার তাপ; জীব অগণন
পীড়িত আশ্রয়হীরা সর্বহারা হায়।
মানবতা যায় ভেসে স্বার্থপরতায়।
অয়ি শক্তিরূপা মাতা! শক্তি করো দান
আবার আসুক ফিরে মহৎ কল্যাণ
ধন্য করি ধরা যদি এসেছো জননি
শুভ বুদ্ধি দাও সবে—
হে ব্রহ্মবাদিনি!

করুণাধারায় কে যেন সেথায় ডাকে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

কি যেন বাঁশীর ঢেউ ওঠে দিকে দিকে,
পার্থিব লোকে কারা করে সন্ধান?
দিব্যভাবের পেলো কেউ পথটিকে,
চির যাত্রার হোলো কিগো অবসান।
সংসার নিতি চলিতেছে ঘুরে ঘুরে,
ঋতুদের সাথে অনাদি চক্র সম।
সকলি ইন্দ্রজালেতে রয়েছে পূরে
মর্ত্যলোকের যা কিছু মধুরতম।

প্রতি দিবসের পথ চলিবার ক্ষণে
কারা গেয়ে যায় সংসারীদের গান!
মহামিলনের যজ্ঞের প্রাঙ্গণে
কোন্ দেবতার হয়েছে অধিষ্ঠান?
মোদের ভিতরে যে জন রয়েছে সদা,
জনম-মৃত্যু স্পর্শ করে কি তারে?
কান পেতে কেউ শুনেছে কি তার কথা?
তার তরী দোলে অন্তর-পারাবারে।

গ্রহতারকায় জাগিছে কত না ভাষা?
ঘুমার ভিতরে পুলকে বিশ্ব কাঁপে।
দেহ হোতে দেহে বারে বারে যাওয়া আসা,
ভাবনায় যাতে ভাবে আর অনুভাবে।
ভেদ-দর্শন তিরোহিত হবে কবে,
আত্মার সাথে পরমাত্মার যোগে!
অনুভূতজ্ঞান জ্যোতির ভিতরে রবে
আনন্দ-ঘন প্রেমরস সম্ভোগে।
বজ্রবেদন যেথায় নিত্য জাগে
করুণাধারায় কে যেন সেথায় ডাকে।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-প্রসঙ্গ

স্বামী অভেদানন্দ

যদি আমরা প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রকারদের অতুলকীর্তিস্বরূপ সংস্কৃত গ্রন্থরাজি পাঠ করি এবং সেগুলোতে বর্ণিত আমাদের মহানায়কের জীবনকাহিনীর অনুধ্যান করি, তাহলে আমরা দেখতে পাব—তাঁর আবির্ভাবের বহু পূর্বেই সত্যদ্রষ্টা হিন্দু ঋষিগণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তাম্রযুগের শেষ-অঙ্কে এবং কলিযুগ বা বর্তমান যুগের সূচনার পূর্বাহ্নে—এই বিশ্ব যখন পাপ ও পাপীতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে তখন যদুরাজ বংশে এক স্বর্গীয় ত্রাণকর্তার আবির্ভাব ঘটবে। তিনি পূত চরিত্রা দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে' এই প্রপীড়িত বিশ্বকে পাপ ও দুঃখভার থেকে মুক্তি দেবেন। ইংরেজ পুরাতত্ত্ববিদ্ ক্যাপ্টেন উইলফোর্ড এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে লিখেছেন: হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণীটি পুরোপুরি সফল করে' সত্যই তাদের পরিত্রাতা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটেছিল।

তাম্রযুগ শেষ হ'য়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সর্বত্র অনাচার, প্রবঞ্চনা, হত্যা, স্ত্রীজাতি ও শিশুদের প্রতি দুর্ব্যবহার, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবনতি প্রভৃতি পাপাচারের লক্ষণ প্রকট হ'য়ে ওঠে।' রাজা-প্রজা সকলেই পাপাচারে মগ্ন হন। পূজারী এবং পূজারিণীগণ নিষ্ঠাহীন এবং কপট হয়ে উঠেন। জগতের একমাত্র অধিপতিরূপে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের আরাধনা তখন অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়। তৎপরিবর্তে জনসাধারণ তখন ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি নিম্ন পর্যায়ের দেবাদির পূজায় মগ্ন হন। তাঁরা এই সব দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁদের উদ্দেশ্যে নানা রক্তাপ্লুত অর্ঘাদি নিবেদন করতেন। রাজন্যবর্গ অতিমাত্রায় অত্যাচারী হ'য়ে উঠেন। তাঁদের নিগ্রহ, অতিরিক্ত করভার এবং নিয়ত ভীতি প্রদর্শনে অত্যাচারিত হ'য়ে সাধু সন্ন্যাসী ও সৎলোকেরা অন্তরের শান্তি হারালেন। ধর্ম ও ন্যায়ের এই পতন মুহূর্তে যদুবংশের এক শঠ ও নিষ্ঠুর রাজকুমার তাঁর ধর্মভীরু পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করে' তখনকার হিন্দুস্থানের রাজধানী পুণ্য নগরী মথুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর নাম—কংস। তিনি এমন অত্যাচারী ছিলেন যে, তাঁর নামটি মাত্র উল্লেখেই সকলের মধ্যে' বিভীষিকা জাগতো, সৎ ও শান্তিপ্রিয় মানুষদের অন্তর আতঙ্ক ও হতাশায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো শিউরে উঠতো। তাঁর দৌরাত্ম্য ও নিষ্ঠুরতার কাছে ন্যায় নীতি ও বিচার বলে' কিছু ছিল না। যে কোন মানুষকে তিনি বিনা দ্বিধায় হত্যা করতে পারতেন।

কংস ছিলেন ঘোর অনাচারী ও পাপাত্মা, কিন্তু তাঁর যে ভগ্নী দেবকী (দেবী-স্বরূপা), তিনি ছিলেন অতি ধর্মশীলা, শুদ্ধ-অপাপবিদ্ধ-স্বভাবা। হিন্দু শাস্ত্রাদিতে বলা হয়েছে—ঈশ্বর তাঁর মাধ্যমেই নিজ অভিপ্রায়কে পূর্ণ করেছিলেন। অধিকাংশ সময় তিনি নির্জনে ভগবৎ চিন্তায় অতিবাহিত করতেন। ভাইএর নিষ্ঠুরতা দেখে তিনি কাঁদতেন, দিনরাত মানুষের জন্য শান্তি, ন্যায় এবং শুভবুদ্ধি প্রার্থনা করতেন। কখনও কোন আমিষ খাদ্য স্পর্শ করেন নি

তিনি। তাঁর এই জীবন-কাহিনী শুনে' স্বভাবতঃই আমাদের মনে পড়ে মেরী কথিত সুসমাচার (Gospel of Mary) বর্ণিত নিষ্কলুষতা মেরীর চরিত্র-কথা। তিনিও নাকি কোনদিন আমিষ স্পর্শ করেন নি। এক রাজকুলোদ্ভব বসুদেব (বসু = অষ্টতম স্বর্গীয় পুরুষঃ, বসুদেব অর্থাৎ দেবস্বরূপ বসু) নামক এক সুপাত্রের সঙ্গে যথাসময়ে দেবকীর বিয়ে দেওয়া হ'লো। বিবাহ অনুষ্ঠান তখনও শেষ হয়নি, সহসা কংসরাজের কাণে এলো এক দৈববাণী : 'এই বিবাহজাত সন্তান তোমার মৃত্যুর কারণ হবে এবং তোমার রাজত্বের উচ্ছেদ সাধন করবে।'—কংসরাজ এই কথা শুনে চম্‌কে উঠলেন ; ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে খোলা তলোয়ার হাতে বোনকে হত্যা করবার জন্য তখনই বিবাহ বাসরের দিকে ছুটলেন তিনি। নূতনবর বসুদেব তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি নিরপরাধা পত্নীর প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন কংসের কাছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় কংস সহসা স্থির করে' উঠতে পারলেন না—কি তাঁর করা উচিৎ। যা হোক, তিনি নিবৃত্ত হলেন কিন্তু বললেন, একটি মাত্র সর্তে তিনি দেবকীর প্রাণরক্ষা করতে রাজী আছেন। সেটি হচ্ছে : বসুদেবকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, দেবকীর গর্ভে তাঁদের যত সন্তান হবে তাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণনাশ করবেন তিনি। উপায়ান্তরহীন বসুদেবকে বাধ্য হ'য়ে নিষ্ঠুর কংসের এই অমানুষিক প্রস্তাবে সম্মত হ'তে হল। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন—তাঁদের যত সন্তান হবে, তাদের প্রত্যেককে তিনি উপস্থিত করবেন তাঁর কাঁছে। ক্রোধে এবং আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর শত্রু এবং নিধনকারীর ভবিষ্যজ্জননী, নিজের বোনকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তখনকার মতো রেহাই দিয়ে কংস ফিরে গেলেন।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় নবদম্পতির হৃদয়ে অপরিসীম দুঃখের সঞ্চার হ'লো। হতভাগ্য বসুদেব এবং দেবকী রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করলেন ; তাঁদের পেছনে পেছনে চললেন আত্মীয়-বন্ধুদের এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা। নৌকাযোগে পুণ্যতোয়া যমুনা নদী পার হ'য়ে এঁরা এসে পৌঁছালেন গোকুলে। সেখানে নগরাধিপতি নন্দের নেতৃত্বে বসুদেবের আত্মীয় বন্ধুরা বরযাত্রীদের সম্মানার্থ এক বিরাট সম্বর্ধনার আয়োজন করেছেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা বুঝতে পারলেন, বসুদেব এবং তাঁর স্ত্রী বেদনাবিদ্ধ অন্তরের উচ্ছ্বাসকে দমন করে' রাখতে চাইছেন ; তাঁরা যেন বড় দুঃখী, বড় দুর্দশাগ্রস্ত, বুঝি কোনো দুরদৃষ্টের পীড়নে অন্তরে গুমরাচ্ছেন। পরে যখন বসুদেব কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের বিষাদের কারণ বর্ণনা করলেন, তখন বজ্রাঘাতের মত এই সংবাদ নন্দ ও তাঁর বন্ধু-অনুচরদের হৃদয় বিদীর্ণ করে' দিল ; যে আনন্দানুষ্ঠানের আশায় তাঁরা সমবেত হয়েছিলেন, তা' মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। সমবেত জনতা হৃদয়হীন কংসরাজার সেই শয়তানি থেকে দম্পতিকে বাঁচাবার জন্য অধীর হয়ে ক্রন্দনরোল তুললো। কিন্তু নন্দ ছিলেন বিজ্ঞ ও ধর্মপরায়ণ পুরুষ। তিনি বুঝতে পেলেন যে, এ সমস্তই ঘটেছে ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুযায়ী। শোকাতুর দম্পতিকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি তাঁদের ঈশ্বরের কৃপার কাছে আত্মসমর্পণ করতে পরামর্শ দিলেন। ভগবৎ-বিধানের কাছে নিজেদের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে' বসুদেব-দেবকী যেন মনের প্রশান্তি ফিরে পেলেন।

অতঃপর তাঁরা গোকুলে ধর্মশীল পারিবারিক জীবন সুখে-শান্তিতেই অতিবাহিত করতে লাগলেন। কালক্রমে দেবকীর গর্ভে একটি অনিন্দ্যসুন্দর পুত্রসন্তানের জন্ম হ'লো। পূর্ব

প্রতিজ্ঞানুযায়ী বসুদেব সেই সংবাদ পাঠালেন কংসের কাছে। কংস তখনই তাঁর দৈত্য-সদৃশ অনুচরদের আদেশ দিলেন সন্তানটিকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে। আদেশ পালিত হ'লো, নিষ্ঠুর রাজা সেই দুধের শিশুকে নিধন করলেন নিজ হাতে।

বসুদেবকে এমনই করে' বিসর্জন দিতে হ'লো পর-পর সাতটি সন্তানকে। পৃথিবীর পাপ ও গ্লানির মোচনের জন্য ঈশ্বরতনয় যিশুর আবির্ভাবের আগে ম্যাকাবিয়ান ভ্রাতৃগণকেরও এই দশা হয়েছিল।

অষ্টম সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হবার আগে বসুদেব সস্ত্রীক মথুরায় এসেছেন—রাজকর মিটিয়ে দিতে।[১] হৃদয়হীন রাজা যখন শুনলেন দেবকী অন্তঃসত্ত্বা তখন তিনি উভয়কেই রাজপ্রাসাদের এক অন্ধকার পাতালকক্ষে বন্দী করে' রাখলেন। সেখানে এই নিরপরাধ দম্পতি খাদ্যপানীয় এবং সর্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্য-আরাম ত্যাগ করে' অসহ্য মনঃপীড়ায় এই অত্যাচারীর পৈশাচিক নির্যাতনের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে সময় কাটিয়েছেন। তাঁদের হাত-পা মোটা লোহার শিকলে বেঁধে রাখা হ'য়েছিল এবং সশস্ত্র প্রহরীরা কড়া নজর রাখতো তাঁদের উপর।

অবশেষে, হিন্দু পঞ্জিকার ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ অষ্টমীতে (ইংরেজী আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি) মধ্যরাত্রির পরে প্রাণীকুল যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, তখন এই পৃথিবীতে সেই কারাগারের এক অন্ধকার কক্ষে অবতীর্ণ হলেন দেবশিশু। জন্মের পরমুহূর্তেই এই নবজাত পরিত্রাতার দেহ থেকে দিব্যজ্যোতিঃ বিকীরিত হ'য়ে সমস্ত কক্ষ আলোকিত করে তুললো। দেবগণ স্বর্গ থেকে নেমে এলেন সেই কক্ষে। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রসূতির স্তব গান সুরু করলেন। হিন্দুদের ত্রি-মূর্তির দ্বিতীয় 'বিষ্ণু'র অবতার বলে' সম্বোধন করে তাঁরা তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়লেন, স্থলপদ্ম দিয়ে তাঁর পূজা করলেন। সারা কক্ষ এক অপার্থিব সুর-সুষমায় ভরে' উঠলো।

এই সব অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার দেখে বসুদেব এবং দেবকীর অন্তরে রীতিমত ত্রাসের সঞ্চার হ'লো। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না—কি ঘটতে চলেছে। পূর্ববর্তী সাত-সাতটি সন্তানের পরিণতির কথা স্মরণ করে' তাঁদের অশ্রু উথলে উঠলো। দারুণ নৈরাশ্যে মাটিতে উপুড় হ'য়ে পড়ে' আর্তনাদ করে তাঁরা বলছিলেন: হায় ভগবান, কেন তুমি তোমার তনয়কে এই কারাগারে আমাদের কাছে পাঠিয়েছ? কি করে' আমরা এর জীবন রক্ষা করবো? ওগো, দয়া কর, ওই নিষ্ঠুর অমানুষ রাজা কংসের হাত থেকে আপন সন্তানকে তুমি রক্ষা কর।

যখন তাঁরা কেঁদেকেটে এমনিভাবে ব্যাকুল হ'য়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, তখন নবজাত শিশুটি সহসা সান্ত্বনার সুরে বলে' উঠলো—"মা, বাবা, আর কেঁদো না; তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা এইবার শেষ হবে। আমি তোমাদের রক্ষার জন্য, আর সকল মানুষের পরিত্রাণের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছি। তোমরা এই দেখ আমার ঐশী শক্তি"—এই বলে শিশু তাঁদের কাছে নিজ বিভূতি তথা বিশ্বরূপ প্রদর্শন করে পুনরায় বললো, "বাবা, তুমি আমায় কোলে করে' যমুনা পার হ'য়ে তোমার বন্ধু নন্দের আলয়ে নিয়ে চল। তারপর, তাঁর নবজাত শিশুর

---

১ যোসেফ এবং মেরীও কর দানের উদ্দেশ্যে বেথেলহামে গিয়েছিলেন। (লুক ২।৩-৫)

সঙ্গে আমার বিনিময় করে এখানে ফিরে এসো।" এই কথা বলেই শ্রীকৃষ্ণ আবার শিশুরূপ ধারণ করলেন। এইবার ঈশ্বরের অত্যাশ্চর্য অলৌকিক লীলা সুরু হলো। লৌহ শৃঙ্খল শিথিল হ'য়ে গেল; সেই নিশীথকালে নিজে নিজে খুলে' গেল রাজপ্রাসাদের সাতটি দরোজা; যে সব শান্ত্রী প্রহরায় ছিল, তারা ঘুমে মৃতপ্রায় হ'য়ে পড়ে' রইল,—কেউ জানতেও পারলো না—কি ঘটছে। বসুদেব শিশুটিকে কাপড়ে জড়িয়ে কোলে করে যমুনার তীরে এসে পৌছালেন। বেগবতী বিশাল নদী পথ করে' দিল, তিনি অক্লেশে তা' পার হলেন। গভীর যমুনার জল কোথাও এক হাঁটুর বেশী হ'লো না। এমনি করে গভীর রাত্রে যমুনা পার হয়ে বসুদেব তাঁর বন্ধু নন্দের বাড়ী এসে পৌছালেন। অলৌকিক ব্যাপার,—নিজে নিজে খুলে গেল দরোজা, সূতিকা গৃহে প্রবেশ করে' তিনি দেখলেন—সেখানে একটি ঝুড়ির মধ্যে (আজকালও গবাদি পশুকে খাবার দেবার জন্ত এরূপ ঝুড়ি ব্যবহৃত হয়) এক শিশু খেলা করছে। সকলের অজ্ঞাতে বসুদেব নিজ শিশুকে সেখানে রেখে অপরটিকে কোলে তুলে নিলেন এবং নিশাবসানের পূর্বেই আগেকার পথ ধরে' আবার ফিরে এলেন মথুরায়।

ইতিমধ্যে সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে নারদ জ্ঞানী, গুণী, সাধু-সন্ত ও সরল রাখালদের কাছে প্রভাতী তারার মত আবির্ভূত হ'য়ে এক মহিমোজ্জ্বল দিব্য সূর্যোদয়ের অর্থাৎ মানবত্রাতার মহাবির্ভাবের বার্তা ঘোষণা করলেন। হিন্দুদের পুরাণ কাহিনীতে নারদকে বলা হয়েছে—ঈশ্বরের বার্তাবহ; তিনি ক্ষণমধ্যে যত্র তত্র গমনে সমর্থ।

দেবশিশুকে দর্শনের জন্ত প্রত্যূষেই চারিদিক থেকে জ্ঞানী, গুণী সাধু-সন্তরা এসে সমবেত হলেন। তাঁরা তাঁকে দধি, দুগ্ধ, ফল-ফুলের ও সুবর্ণময় নানা উপহারের অর্ঘ নিবেদন করলেন, তাঁর পুণ্য পদতলে সুগন্ধি ধূপ-দীপ জেলে আরতি করলেন। এই ক্ষুদ্র শিশুমূর্তির মধ্যেই তত্ত্বদর্শিদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ল অবতারের অর্থাৎ অবতীর্ণ পরম পুরুষের লক্ষণসমূহ। তাঁরা তাঁর নাম দিলেন—"কৃষ্ণ"—জগতের পরিত্রাতা।

এদিকে, রাজপ্রাসাদে নিষ্ঠুর রাজা কংসকে তাঁর অনুচরেরা গিয়ে সংবাদ দিল যে, রাত্রিতে কারাকক্ষে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে। শিশুটি তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে আনীত হলো; কংস তাকিয়ে দেখেন—সেটি কন্যা সন্তান। তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'এই শয়তান শিশু আমার প্রভাবিত করতে চায়, এই আমি নিষ্কৃতি দিচ্ছি এর হাত থেকে।' এই বলে' কংস শিশুটিকে সবলে টেনে নিয়ে একটা পাথরের উপর আছাড় মারবার জন্ত একটু এগুতেই দারুণ হোঁচট খেলেন আর তাঁর হাত থেকে সে ফস্কে গেল, কিন্তু নীচে না পড়ে' খিল খিল করে' হাসতে হাসতে উঁচুদিকে উঠে গেল। তারপর, বজ্রনির্ঘোষে "তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে" বলতে বলতে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল সেই দেবশিশু। হিন্দু শাস্ত্রমতে সর্বাধিপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমনই করে তাঁর ভূর্জের ঐশী ক্ষমতাকে প্রকাশ করেছিলেন। যাহোক, কংসরাজ তখনই গোকুলের সব নবজাত পুত্রসন্তানদের হত্যার আদেশ দিলেন। জল্লাদের মত অনুচরেরা তখনই চারদিকে ধাবিত হলো। শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই বলরাম ঐ অঞ্চলেই বর্ধিত হচ্ছেন। তাঁদের নিধন করার জন্তই এই উদ্যোগ।

এই বিবরণটি বাইবেল (New Testament) বর্ণিত হিরোডের শিশুহত্যার বিবরণের

চেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য। অবশ্য কংসরাজের মত হিরোডও ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু কোন কোন খৃষ্টান পণ্ডিত এবং বাইবেলের প্রথম শ্রেণীর সমালোচক মনে করেন—যিশুর জন্মগ্রহণের অন্ততঃপক্ষে দশ বছর আগে রাজা হিরোডের মৃত্যু হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণের শরীরে যে ঐশী শক্তি অভিব্যক্ত হ'তো, তা' অত্যাচারীর সমস্ত কুপ্রভাব ও ধ্বংসশক্তিকেই ধ্বংস করে দিতে পারত। তিনি কংস প্রেরিত সব শয়তান লোক এবং দৈত্য দানবদের যমালয়ে পাঠিয়েছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের জীবন সম্পর্কিত আরও নানা অলৌকিক ঘটনার বিবরণ আছে। পশ্চিমী পাঠকদের কাছে তা উপাদেয় মনে না হতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন কোন ঘটনার সঙ্গে যিশুর শৈশব সম্পর্কিত পৌরাণিক জীবনকাহিনীতে (Apocriphal Gospel of I, Infancy) বর্ণিত কয়টি ঘটনার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। গোকুলেই কৃষ্ণ দিনে দিনে বড় হ'য়ে উঠেছেন আর বৃন্দাবনের মনোরম ছায়া-ঘেরা বন-বনান্তরে খেলে বেড়িয়েছেন। সেখানে তাঁর খেলার সাথী ছিল—ভাই বলরাম এবং গোপ বালক-বালিকারা। তাঁরাও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দৈবশক্তির প্রকাশ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাঁরা বনফুলের মালা গেঁথে, বৃক্ষপাদপালার নবপল্লবে মুকুট তৈরি করে' তাঁকে পরিয়ে দিতেন। তাঁদের কাছে তাঁর আখ্যা ছিল—'রাখালরাজ'।

শ্রীকৃষ্ণ এইসব গোপ বালক-বালিকাদের সঙ্গে একত্রে নৃত্যগীত করতেন ও বাঁশী বাজাতেন। তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বরে সবাই বিমুগ্ধ হয়ে যেতো। এই বালক বয়সেই (আট থেকে বার বৎসর) শ্রীকৃষ্ণ আপন দিব্যশক্তির খেলা দেখিয়ে অনুরাগী জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করেন ও নরদেহধারী পরম পুরুষের সান্নিধ্য তাঁদের দিয়ে উপলব্ধি করান। তাঁকে তাঁরা আপনাদের প্রভু, ঈশ্বর, নিয়ন্তা বা সর্বাধ্যক্ষ জেনে শ্রেষ্ঠ সম্মান এবং শ্রদ্ধা জানাতেন।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ দেখেন যে, তাঁর সকল ক্রীড়াসঙ্গীসহ তাঁদের সমস্ত গবাদি ও মেষ প্রভৃতি পশু কালীয়দহের (হ্রদ) জল পান করে' বিষক্রিয়ার ফলে মরে' পড়ে' রয়েছে। ঐ হ্রদটি ছিল এক বিষাটকায় সর্প-দৈত্যের বাসস্থান। কৃষ্ণের সব সাথী সঙ্গীদের বিনাশ সাধন করাই ছিল তার অভিপ্রেত। শ্রীকৃষ্ণ তখনই ঝাঁপিয়ে পড়লেন হ্রদের জলে, তারপর যেন ত্রিভুবনের সমস্ত ভার নিজের দেহকে ভারী করে' সেই সাপের ফণার উপর দাঁড়িয়ে তাকে খেংরে গুঁড়িয়ে দৈত্যের বিনাশ সাধন করলেন। অতঃপর তিনি মৃত গোপ বালক-বালিকাগণের ও তাঁদের গো-মেষাদির জীবন ফিরিয়ে আনলেন। ভারতের সর্বত্র, বিষাটকায় সর্পের মস্তকোপরি পবিত্র চরণ যুগল সংস্থাপিত করে' দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণের অনেক চিত্র ও প্রতিমূর্তি দেখা যায়।

এমনি করে' নানা অলৌকিক ঘটনা অনুষ্ঠান করে' শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শৈশব ও প্রথম যৌবন অতিবাহিত করেছেন। তিনি মৃতকে প্রাণ দিয়েছেন, কুব্জাকে নিরাময় করেছেন, অন্ধকে দৃষ্টি-শক্তি ও বধিরকে শ্রবণশক্তি দিয়েছেন। বলবানের হাত থেকে দুর্বলকে এবং অত্যাচারীর হাত থেকে অত্যাচারিতকে তিনি রক্ষা করেন। এই বয়সেই তিনি ইন্দ্র প্রমুখ অপ্রধান দেবতাদের কাছে বলিদানের প্রচলিত প্রথাকে রহিত করে' অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনায় প্রবর্তন করেন। এক সময়ে বৃন্দাবনের সমস্ত অধিবাসীরা বজ্র ও বৃষ্টির বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের

আরাধনা করতেন। শ্রীকৃষ্ণ তা দেখে বললেন, "সামান্য বজ্রের দেবতা ইন্দ্রের আরাধনা করে' কি লাভ? সেই এক পরমেশ্বরে ভক্তি পরায়ণ হও, সর্বজীবে তাঁর অস্তিত্বকে উপলব্ধি কর। দরিদ্রদের অন্ন দাও, দুঃস্থদের সাহায্য কর।" কথিত আছে, ইন্দ্র অত্যন্ত কুপিত হ'য়ে আপন শত্রুদের ধ্বংস করার জন্য প্রবল বারি বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে প্লাবিত করে ফেলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অলৌকিক ক্ষমতাবলে তাঁর সমস্ত অনুরাগীদের গিরি গোবর্ধনের গুহায় স্থানান্তরিত করে' তাঁদের রক্ষা করেন। সেখানে তিনি দিব্য দেহ ধারণ করে' সকলের কাছে তাঁর অতিমানবী শক্তির পরিচয় প্রদান করেন।

শুনা যায়, শ্রীকৃষ্ণ কোন বিধবার একমাত্র পুত্রকে পুনর্জীবিত করে দিয়েছিলেন। তাঁর রাখাল-জীবনে এসব অলৌকিক ক্রিয়া সাধন করে' তিনি যখন যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন সঙ্কল্প করলেন যে, আবার কংসশাসিত মথুরা নগরীতে ফিরে যাবেন। সেই পাপিষ্ঠ রাজার অত্যাচারকে ঠাণ্ডা করে' দিয়ে অতীতের দৈববাণীকে সফল করবার জন্য তাঁর এই উদ্যোগ।

অগণিত গোপ নরনারী যাত্রাপথে তাঁর অনুগামী হলেন, রাখাল-বালকের বেশে তিনি নগরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু নগরবাসীরা তাঁদের রাজারূপে তাঁর সম্বর্ধনা করলেন। জনতার ভীড়ের মধ্য থেকে কুব্জা নামে এক কুব্জপৃষ্ঠা রমণী এগিয়ে এসে শ্রীকৃষ্ণের ললাটে তৈল-চন্দনাদি লেপন করে' তাঁর অভিষেক করলেন। প্রতিদানে তিনি রমণীর পাপ খণ্ডন করে' তাঁকে সরলদেহা সুন্দরী নারীতে রূপান্তরিত করে' দিলেন। আর বললেন,—তার প্রতি তাঁর প্রীতি অক্ষয় হ'য়ে থাকবে। আজও পর্যন্ত, মথুরায় গেলে সেই বিকৃতদেহা নারীর সৌভাগ্যের কথা লোকের মুখে মুখে শুনা যায়। লুক্ লিখিত সুসমাচারের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত সেই বিকৃতদেহা নারীটির সঙ্গে আমরা এর তুলনা করতে পারি।

যে ধনি কৃষ্ণকে রাজবেশে ভূষিত করেছিল তিনি তাকেও পাপমুক্ত করেছিলেন। এমনি করে নগরবাসীদের হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত বিপুল আনন্দ ধ্বনির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মহাবীর বলরাম সমভিব্যাহারে কংসের প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। তারপর সেই দুরাত্মা এবং তার অনুচরদের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে তাদের দুষ্কৃতির সমাধির উপর ন্যায় ধর্মের জয় পতাকা ওড়ালেন। অতীতের দৈববাণীকে এইভাবে পূর্ণ করে' শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করলেন—পাতালপুরীর অন্ধকার কারাকক্ষে; নিজ হাতে তিনি মুক্ত করলেন পিতা বসুদেব, মাতা দেবকী এবং ভূতপূর্ব বৃদ্ধ রাজা উগ্রসেনকে। পাপাচারী পুত্র কংস বিশ্বাসঘাতকতা করে' এঁকে মথুরার সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন। হিন্দু-ন্যায় অনুসারে কংসের বিজেতা হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ মথুরার একচ্ছত্র অধিপতি হবার অধিকারী। কিন্তু জাগতিক ক্ষমতার প্রতি বিন্দুমাত্র আসক্তি না থাকায় তিনি স্বীয় মহত্বে উগ্রসেনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে' তাঁকে তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন, এমনি করে' আমাদের স্বর্গীয় নায়ক সেই বিশাল রাজ্যের অগণিত প্রজাসাধারণের মধ্যে ন্যায় ও শান্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করলেন। দেশবাসী এই পরিবর্তনে অত্যন্ত আনন্দিত হলো। বিশেষ করে, শ্রীকৃষ্ণের মাতা পিতা যখন বুঝতে পেলেন —তাঁদেরই সন্তান জনসাধারণের দুঃখদুর্দশার অবসান ঘটিয়ে দৈব প্রতিশ্রুতিকে পূর্ণ করেছে, তখন তাঁদের আনন্দের আর সীমা রইল না।

এরপর শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে তাঁর পালক পিতামাতা—গোকুলাধিপতি নন্দ ও তৎপত্নী যশোদার কাছে ফিরে না গিয়ে মথুরাতেই মাতাপিতা ও বন্ধুদের সঙ্গে কয়মাস পরমানন্দে অতিবাহিত করলেন।

এতকাল পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের কোন বিদ্যালাভেরই সুযোগ হয়নি। এবার পিতামাতা তাঁকে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই বলরামের সঙ্গে কাশীতে পাঠালেন। (কাশী ভারতের এথেন্স, বিজ্ঞান, দর্শন ও বৈদিক জ্ঞানচর্চার শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্র)। সেখানে তিনি বিখ্যাত আধ্যাত্ম আচার্য সন্দীপনীর ছাত্ররূপে বিদ্যাভ্যাস সুরু করেন। মহাভারতে বলা হয়েছে যে, সেখানে তিনি মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই যাবতীয় বিজ্ঞান এবং বৈদিক বিদ্যা আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। তাঁর এই অলৌকিক প্রতিভা দেখে ঋষি বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সামান্য মানব নন ; তিনি মনুষ্যরূপী স্বয়ং জ্ঞানের দেবতা। যাহোক, হিন্দু বিদ্যার্থিদের মতই শ্রীকৃষ্ণ কিছুকাল গুরুগৃহে কাটালেন। এই সময়ে তিনি হিন্দুযোগবিজ্ঞান অনুযায়ী—উপবাস, প্রাণায়াম, কৃচ্ছ্রসাধনা ইত্যাদি অধ্যাত্ম ক্রিয়াসমূহের অনুশীলন করেন। মহাভারতে কথিত আছে : একদিন পুত্রের মৃত্যুতে শোকাতুর সন্দীপনীকে রোদন করতে দেখে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন—গুরুমহাশয়ের এই শোক অপনোদনের জন্য তিনি কি করতে পারেন। সন্দীপনী জানতেন, শ্রীকৃষ্ণ সামান্য মানব নন। তাই তিনি তাঁর কাছে পুত্রের পুনর্জীবন প্রার্থনা করলেন।

কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই বালকের আত্মার সন্ধানে ডুব দিয়ে সুগভীর সমুদ্রের তলদেশে উপনীত হ'য়ে সেখানে এক ভয়াল দৈত্যের সম্মুখীন হন। তিনি তার সঙ্গে লড়াই করে' তাকে হত্যা করেন এবং তার প্রকাণ্ড খোলসটি (শঙ্খ ?) সহ যমপুরীতে (Hades) উপস্থিত হন। সেখানে পৌঁছে তিনি দৈত্যের শঙ্খে এমন প্রচণ্ড ধ্বনি তুললেন যে, সেই ভয়ঙ্কর শব্দে পাতালবাসীরা আতঙ্কিত হ'য়ে উঠলো। তাদের দুর্দশা দেখে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ অত্যন্ত ব্যথিত হলো। প্রসন্নচিত্তে সমস্ত পাপ মোচন করে তিনি তাদের স্বর্গলোকে উত্তীর্ণ করে' দিলেন। অবশেষে সন্দীপনীর পুত্রের আত্মাকে খুঁজে বের করে' অলৌকিক উপায়ে আবার তাকে মর্ত্যে ফিরিয়ে এনে নিজ আচার্যের পুত্ররূপে অর্পণ করলেন। নিকোডিমাসের Apocryphal Gospel-এর ষোড়শ অধ্যায়ে ঠিক এমনি যিশুখৃষ্টেরও পাতাল গমনের একটা বর্ণনা আছে। উভয় বিবরণে পার্থক্য শুধু এই, যিশু যখন পাতালের দ্বারে উপনীত হন তখন সেখানকার অধিবাসীরা বজ্র এবং ঝড়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিল। অন্য এক কাহিনীতে শোনা যায়,—শ্রীকৃষ্ণ উত্তরার মৃত পুত্রকেও পুনর্জীবন দিয়েছিলেন।

কাশী থেকে মথুরায় প্রত্যাবর্তন করে' শ্রীকৃষ্ণ দেখেন—মগধের (আধুনিক বিহার) প্রবল পরাক্রান্ত রাজা জরাসন্ধের বিশালবাহিনী নগরী অবরোধ করে' আছে। জরাসন্ধ ছিলেন মথুরার মৃত রাজা কংসের শ্বশুর। যাহোক, শ্রীকৃষ্ণ নিজ সামরিক দক্ষতাবলে আততায়ী সৈন্যদলকে পরাভূত করে' নগরী অবরোধমুক্ত করতে সমর্থ হলেন। জরাসন্ধ আপন জামাতার হত্যাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণার্থ বারবার (মোট সতের বার) মথুরা আক্রমণ করতে থাকেন।

এই রকম উপর্যুপরি আক্রমণকে এড়াবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা দ্বীপে উগ্রসেনের

রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন, সেখানে সমুদ্র ও পর্বত বেষ্টিত সুরক্ষিত স্থানে তিনি এক বিশাল নগরী গড়ে' তোলেন। নিরস্ত না হয়ে জরাসন্ধ সেখানেও আক্রমণ চালালেন। অবশেষে অর্জুনের মহাপরাক্রমশালী ভাই ভীমের হাতে তিনি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ও নিহত হন।

ক্ষত্রকুলজাত শ্রীকৃষ্ণ শৌর্য-বীর্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের পরম রূপবতী কন্যা রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ কালেও তিনি বীর্যবলে তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ও ঘোর শত্রু জরাসন্ধ ও শিশুপালকে হতবুদ্ধি করে' আপন বীর্যবত্তার পরিচয় দেন।

জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে ভারতের রাজচক্রবর্তীরূপে তিনিই হস্তিনাপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপে, রাজানির্মাতা রূপে তিনি শুধু শাসক রাজকুলেরই নয়, পরন্তু তদানীন্তন ভারতের সমগ্র হিন্দুজাতির অধিতীয় ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ এত ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তথাপি তিনি এমন নম্র, বিনয়ী ও ভদ্র ছিলেন যে, সম্রাট যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেককালে স্বেচ্ছায় নিমন্ত্রিত অতিথি অভ্যাগতদের পাদচর্যার ভার নিয়েছিলেন।

কথিত আছে, দ্রৌপদীর আকুল প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ সামান্য খাদ্যে বিপুল সংখ্যক লোককে পরিতৃপ্তিসহকারে ভোজন করিয়েছিলেন আর কৌরবকৃত অপমান ও অমানুষিক লাঞ্ছনার হাত থেকে দ্রৌপদীকে রক্ষাও করেছিলেন।

কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে গৃহযুদ্ধকে বন্ধ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শান্তিদূত নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই ব্যাপারে, ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় তিনি যে দীর্ঘ ভাষণ দান করেন, তা থেকে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণ সে-যুগের শ্রেষ্ঠতম রাজনীতিবিদ্ ছিলেন। তাঁর সেই স্মরণীয় ভাষণে তিনি কৌরবপক্ষের প্রধান দুর্যোধনকে বলেছিলেন,—"হে ভরত কুলোদ্ভব কুমার! বিজ্ঞ, সাহসী, বিদ্বান ও আত্মবলে বলীয়ান পাণ্ডবগণের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কর। এই শান্তিপ্রদ সন্ধি থেকেই আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে তথা, হে বৎস, সমগ্র বিশ্বে সুখ আসবে।...যে ব্যক্তি তার শুভাকাঙ্ক্ষীদের সৎপরামর্শ শ্রবণ করেও তা অনুসরণ করে না, পরিণামে তার বিনাশ অনিবার্য।" —ইত্যাদি।

যাঁরা প্রাচীন ভারতের ইতিকথা, যাকে বিশ্বের বৃহত্তম পুস্তক বলা হয় সেই মহাভারত পাঠ করেছেন, তাঁরা জানেন—কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ যোদ্ধৃরূপে অবতীর্ণ হন নি। তিনি শুধু অন্তরঙ্গ বান্ধব এবং শিষ্যপ্রতিম অর্জুনকে পরামর্শাদি দিয়ে সাহায্য করতে তাঁর রথের সারথি সেজেছিলেন। এই অষ্টাদশ দিবসব্যাপী মহাসমরে তিনি কারো বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নি; ধর্মসাক্ষীস্বরূপ উপস্থিত ছিলেন মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ নিজের এই আচরণ দিয়ে বিশ্বের সম্মুখে এই সত্যকেই প্রমাণ করেছেন যে, যুদ্ধে তাঁর কোন আস্থা ছিল না। শাসক কিম্বা শাসিত যেই হোক, তিনি কখনও কোন শ্রেণীর মধ্যে কলহ-বিবাদ কিম্বা লড়াইয়ে উৎসাহ দানের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ছিলেন শান্তির দূত, ন্যায় ও সত্যতার সমর্থক। কিন্তু তাই বলে' অত্যাচারীর হাত থেকে অত্যাচারিতকে রক্ষা করা তাঁর নীতি ছিল না—তা নয়। তিনি যে কখনও কখনও বাধ্য হয়েছেন অস্ত্রধারণ করতে—তা এই ন্যায়ের পোষণ ও দুর্বলের রক্ষণের জন্যই।*

---

*পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজের 'Great Saviors of the World' হইতে অনূদিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণনাম-তত্ত্ব

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম. এ., বি. টি., ডি. এস্. ই.

ইংরাজ-কবি বলিয়াছেন, "গোলাপকে যে কোনও নামেই ডাকা যাক না কেন, ইহা সর্বদাই সুগন্ধ দান করবে।" এই কথাটির অর্থ হইতেছে এই যে, কোনও জিনিসের ভাল মন্দের অনুভূতির সহিত তাহার নামের কোনও সম্পর্ক নাই।

স্থূল ভোগের জগতে যাহাই হউক না কেন, সূক্ষ্ম ভোগের জগতে, প্রেম-প্রীতি-রসান্বিত হৃদয়-জগতে নামের শক্তি উপেক্ষণীয় নহে। যাহাকে আমরা ভালবাসি, তাহাকে প্রাত্যহিক জগতের হাট-বাজারের নাম ছাড়া অন্য একটি আদরের নাম দিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করে। তাহার নামটি স্মরণ করিলে আমাদের বুক আনন্দে নাচিয়া উঠে, তাহার নামটি কেহ যদি বিকৃতভাবে উচ্চারণ করে, তাহা হইলে আমরা ক্রুদ্ধ হই। প্রেমাস্পদের নাম আমাদের "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করে, নামের মধ্য দিয়া নামধারীর স্মৃতি বুকে জাগিয়া উঠে, তাহার সহিত মিলন-কামনায় চিত্ত আলোড়িত হয়, "নাম পরতাপে" আমাদের হৃদয় আকুল হইয়া উঠে, সে নাম জপ করিতে করিতে দেহ অবশ হইয়া পড়ে, মন বিগলিত হইয়া পড়ে; যে "মহাভাব" ভক্তের জীবনে শ্রেষ্ঠ অবস্থা, নামের মধ্য দিয়াই তাহার কার্য আরম্ভ হয়।

হিন্দী কবি বলিয়াছেন :

"পণ্ডিত যাহি বদে সে ঝুঠা
রাম কহে জগৎ গৎ পাবে ত খাড় কহে-মুখ মিঠা।"

অর্থাৎ পণ্ডিতেরা মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, রাম নাম উচ্চারণ করিলে যদি মোক্ষলাভ হয়, তাহা হইলে গুড় নামটি উচ্চারণ করিলে মুখে মিষ্ট স্বাদ অনুভূত হইবে—"

আমরা বলিব "এ কথা আমরা মানি না। আমরা বলি 'যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি',—কাজেই নাম যে আমরা অবহেলা করিতে পারি না।"

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামটি যে রামকৃষ্ণ হইয়াছে, ইহা একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে; ইহার মধ্যে বিধাতৃ-বিধানের অনুল্লঙ্ঘনীয় নির্দেশ আছে, সুচিন্তিত পরিকল্পনা আছে, গভীর তাৎপর্য আছে। অবতার হিসাবে ত্রেতার রামচন্দ্র এবং দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণদেবের জীবনাদর্শের অপূর্ব সমন্বয় যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে ঘটিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণের জীবনের আদর্শ কি ছিল, রামকৃষ্ণের মধ্যেই বা তাহাদের সমন্বয় কি হিসাবে হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে ভূমিকা হিসাবে ধর্ম সম্বন্ধে দুই একটি মতবাদের কথা আলোচনা করা প্রয়োজন।

বিভিন্ন বেদ এবং বিভিন্ন স্মৃতির বিভিন্ন নির্দেশের মধ্যে বিভ্রান্ত হইয়া আমরা বুঝিতে

পারি না কোন্‌টা কর্ম এবং কোন্‌টা অকর্ম। সেইজন্য মহাজন-সেবিত পথটিকেই অনেকে গ্রহণ করিতে বলেন। কিন্তু এইখানেই ত প্রশ্নের সমাধান হইল না, কারণ মহাজন ত সংসারে একটিমাত্র নয়; কাজেই তাঁহাদের সেবিত পথও অনেক। এই বহু পথের মধ্যে কোন্ পথটিকে আমরা বাছিয়া লইব, তাহাই হইতেছে সমস্যা।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য শাস্ত্রকারগণ "বিবেক" জাতীয় একটা জিনিসের নির্দেশের কথা বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—"বিদ্বান লোকেরা যাহা করেন, সৎ লোকেরা যাহা করেন, "অদ্বেষরাগী" লোকেরা যাহা করেন এবং যাহাতে তোমার অন্তরের সায় আছে, তাহাই হইতেছে ধর্ম।"

কিন্তু এই "অন্তরের সায়" বা বিবেকের কথা জানিয়াই কি আমরা ধর্মের সম্বন্ধে একটা অভ্রান্ত নির্দেশ পাইলাম? চোরের বিবেক, জুয়াচোরের বিবেক আর সৎ লোকের বিবেক কি এক জাতীয় নির্দেশ দেয়? অথবা সৎ লোকেরা যাহা আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, জুয়াচোরদের বিবেক কি তাহার অনুমোদন করে?

ব্যক্তিগত বিবেককে অনেকে অধিশাস্তার (super ego) নির্দেশ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত বিবেকটা নিছক অধিশাস্তার নির্দেশ নহে। তাহা হইতেছে "অহম্" (ego)-এর নির্দেশ। "ইদ্" (id)-এর অন্ধ ও নিরঙ্কুশ ভোগেচ্ছা এবং অধিশাস্তার কঠোর শাসনের মাঝামাঝি একটা আপোষের চেষ্টাই হইতেছে মানুষের ব্যক্তিগত বিবেক। নিজের অন্যায় কাম কর্মকে যুক্তির সাহায্যে ন্যায্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে একটা কৌশল (rationalization) আছে, মানুষের ব্যক্তিগত বিবেকের মধ্যে সেই কৌশলের কারসাজি আছে। তাই চোরের বিবেক চুরি করিতে প্রশ্রয় দেয়, জুয়াচোরের বিবেক জুয়াচুরি করিতে প্রযুক্ত করে।

কাজেই ব্যক্তিগত জীবনের "বিবেক" দিয়া ধর্মকে যাচাই করা চলে না, "সমাজগত বিবেক", সমাজগত আদর্শ দিয়া তাহাকে যাচাই করিতে হয়। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই একটা সমাজগত বিবেক আছে। সেই সমাজের শাস্ত্রের বাণীর মধ্য দিয়া বিধি নিষেধের মধ্য দিয়া তাহা রূপায়িত হয়। ব্যক্তিগত মানুষের কাজ হইতেছে সেই শাস্ত্রের শাসনগুলি মানিয়া চলা, শাস্ত্র-নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানগুলি পালন করিয়া যাওয়া, তাহা না করিলে প্রত্যবায় হয়; সাধারণ মানুষের রুচি অরুচির প্রশ্নের অবকাশ নাই, স্বাধীনতার অধিকার নাই, কারণ এই স্বাধীনতার মধ্য দিয়া স্বেচ্ছাচার প্রবেশ করিতে পারে, উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিতে পারে।

"অনুষ্ঠান নিত্যত্বং স্বাতন্ত্র্যাপকর্ষতি" (উত্তররামচরিত ১।৮)

ধর্মানুষ্ঠানের এই যে অবশ্য প্রতিপাল্যতা ইহাই পাশ্চাত্য Ethics শাস্ত্রের categorical imperative-এর আদর্শ। Kant এই মতবাদের পোষক। তিনি বলেন, সব শাস্ত্রের মধ্যেই কতকগুলি অনুজ্ঞা বা আদেশ আছে, তর্কশাস্ত্রের অনুজ্ঞা আছে, স্থাপত্য বিদ্যার অনুজ্ঞা আছে, অর্থশাস্ত্রের অনুজ্ঞা আছে, বহু শাস্ত্রেরই অনুজ্ঞা আছে। সেগুলি মানিয়া চলিলে ভাল হয়; কিন্তু না মানিয়া চলিলেও খুব ক্ষতি হয় না। স্থাপত্য বিদ্যার হয়ত বলিল এই ভাবে কাজ করা উচিত, আমি হয়ত অন্যভাবে করিলাম ও অন্য আদর্শের সৃষ্টি করিলাম।

কাজেই এই সমস্ত শাস্ত্রের অনুজ্ঞাগুলি নির্বিকল্প নহে। কিন্তু Kant-এর মতে নীতিধর্মের অনুজ্ঞাগুলি নির্বিকল্প। যাহা করা উচিত তাহা করিতেই হইবে, বিকল্প ব্যবস্থা নাই, আপোষ নাই। যাহা ধর্মানুষ্ঠান, তাহা করিবার সময় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবিলে চলিবে না, ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার কথা, লাভ-ক্ষতির কথা ভাবিলে চলিবে না, প্রয়োজন হইলে কর্তব্যের বেদীমূলে নিজেকে বলি দিতে হইবে।

এই categorical imperative-এর মূলে আছে একটা নিষ্ঠার দিক ও বস্তুতার দিক। হিসাবী বুদ্ধি বা স্বাধীন চিন্তার অধিকার ইহার মধ্যে ততটা নাই।

ধর্ম জগতে এবং ভক্তির জগতে এই নিষ্ঠা, অকপটতা প্রভৃতির একটা বিরাট মূল্য আছে। এই জন্যই মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিষ্ঠার গৌরব ঘোষণা করিয়া বহু আখ্যায়িকার সৃষ্টি হইয়াছে। তাই আমরা দেখিয়াছি যে, শ্রদ্ধার দানের তুলসী পাতাটির ভার নারায়ণের কাছে দম্ভের দান স্বর্ণের পাহাড়ের চেয়েও বেশী হইয়াছে। মহাভারতে শক্তুদাতা ব্রাহ্মণ এবং নকুলরূপী ধর্মের কাহিনীতেও এই নিষ্ঠার গৌরবই দেখানো হইয়াছে। এই কাহিনীতে দেখানো হইয়াছে যে, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের দানের চেয়ে উঞ্ছবৃত্তি দরিদ্র ব্রাহ্মণের শক্তুমুষ্টি দানের গৌরব অনেক বেশী ছিল।

কিন্তু ভাবের জগতে নিষ্ঠার মূল্য যতই থাকুক না কেন, বাস্তব জগতে কর্মের মূল্য এবং বস্তুর মূল্যটাও কম নহে। Mathew Arnold-এর "Saint Brandon" নামক কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায় Judas Iscariot-এর নিষ্ঠাহীন দানের জন্যও তাহার কিছুটা পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছিল। বাস্তব জগতে দেখিতে পাওয়া যায় অন্ধ নিষ্ঠা ব্যর্থ হয়, আবার নিষ্ঠাহীন অথচ নির্ভুল কাজ হইতেও তাতে ভাল ফল পাওয়া যায়। নিষ্ঠা থাকুক বা নাই থাকুক ভাল জমিতে সময় মত বীজ ছড়াইলে তাহা হইতে গাছ জন্মাইবেই, আবার শুধু নিষ্ঠা দিয়া ভুলভাবে কাজ করিলে তাহা ব্যর্থ হইবে।

আমরা জানি নিষ্ঠার আতিশয্য, অনেক সময় গোঁড়ামির সৃষ্টি করে। এই গোঁড়ামির ফল প্রায়ই বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলজনক হয় না। পৃথিবীর ইতিহাস এই গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার কলঙ্কে কলঙ্কিত। ধর্মান্ধতার জন্য এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বহু অত্যাচার করিয়াছে, এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের রক্তপাত করিয়াছে, জীবনের ন্যায্য অধিকার হরণ করিয়াছে। Crusade-এর রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, জেহাদের অভিযান, inquision প্রভৃতি এই গোঁড়ামির প্রত্যক্ষ ফল।

নিষ্ঠা যদি বুদ্ধি-পরিচালিত না হয়, তাহা হইলে তাহা প্রায়ই মঙ্গল প্রসব করিতে পারে না। অন্ধ রমণীর স্বীয় সন্তানের প্রতি অপত্য নিষ্ঠা কম নহে, কিন্তু নিছক অপত্য নিষ্ঠায় সে সন্তানের মঙ্গল করিতে পারে না। আমরা দেখিতে পাই মূর্খ মায়ের অবৈজ্ঞানিক পালনের দোষে বহু শিশু সন্তানেরই অকাল মৃত্যু হয়। আবার শিশু-সদন প্রভৃতিতে মাতৃসুলভ অপত্য-বৃত্তির অভাব থাকিলেও বৈজ্ঞানিক পালনের গুণে শিশুরা সেখানে ভালভাবেই বৃদ্ধি পায়।

গল্পে দেখিতে পাওয়া যায় ঘুমন্ত রাজাকে মাছির দল যখন উত্যক্ত করিতেছিল, তখন রাজার পোষা বানরটি মাছিগুলিকে হত্যা করিবার জন্য হানিয়াছিল তরবারির আঘাত।

তাহাতে মাছির কিছুই ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু রাজার মৃত্যু হয়। এ ক্ষেত্রে বানরটির প্রভুর প্রতি ভক্তির নিষ্ঠা কম ছিল না, কিন্তু বুদ্ধির অভাবে সে রাজার মঙ্গল করিতে গিয়া চরম অমঙ্গল করিয়া বসিল।

কাজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, নিষ্ঠা যদি সুবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত না হয়, তাহা হইলে তাহা মঙ্গল প্রসব করিতে পারে না। এ কথা বাস্তব জগতেও সত্য আর ধর্ম জগতেও সত্য।

তাই ধর্মের বিচারেও স্বাধীন চিন্তা ও সুবুদ্ধি-পরিচালিত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন স্বীকৃত হয়। যাঁহারা এই পথের পথিক, তাঁহারা প্রত্যেক কাজকে বুদ্ধি দিয়া যাচাই করিয়া দেখেন, শাস্ত্রাচার, দেশাচার প্রভৃতির চেয়ে স্বাধীন চিন্তা ও সিদ্ধান্ত তাঁহাদের কাজকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে।

এই মতবাদেরই এক দল লোক ধর্মের বিচারে "হিতবাদ"এর (utilitarianism) সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে কাজে জনকল্যাণ হয়, সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক উপকার হয়, তাহাই ধর্ম। সাধারণভাবে এই তত্ত্বটির যুক্তি অনস্বীকার্য।

কিন্তু হিতবাদ কখন কখনও সুবিধাবাদে নামিয়া আসে। তাহা ছাড়া ইহার মধ্যে আদর্শের কথা বা ঈশ্বর তত্ত্বের কথা নাই বলিয়া ইহার মধ্যে প্রায়ই একটা পাটোয়ারী ভাব আসিয়া পড়ে।

সেই জন্যই তত্ত্বের গহনতা ও জটিলতার মধ্য দিয়া না যাইয়া কয়েকটি অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়মকেই ধর্ম হিসাবে মানিয়া চলা ভাল। বাইবেলে এই ধর্ম পথের জন্য দশটি মৌলিক আদেশের (Ten Commandments) কথা আছে।

আমাদের দেশেও সাধারণ ধর্মের জন্য দশটি লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন ধৃতি (ধৈর্য), ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ— এই দশটি হইতেছে ধর্মের লক্ষণ।

ধৃতি ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ
ধী বিদ্যা সত্যমক্রোধঃ দশকং ধর্মলক্ষণং॥ মনু ৬।৯২

ধর্মের লক্ষণ হিসাবে এখানে যে দশটি গুণের কথা বলা হইল, এই গুণগুলিই অবশ্য সর্বশাস্ত্র-স্বীকৃত নহে। কোন কোন শাস্ত্রে অন্যভাবেও ধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে :

"শ্রাদ্ধ তপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এব চ
স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচ বিদ্যা অনসূয়তা
আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম সাধারণো নৃপ॥"

যথা—শ্রাদ্ধ, তপ, সত্য, অক্রোধ, নিজ পত্নীর প্রতি সন্তোষ, শৌচ, বিদ্যা, অনসূয়া (অসূয়া=পরগুণে দোষারোপ), আত্মজ্ঞান ও তিতিক্ষা (সহিষ্ণুতা) এইগুলি হইতেছে সাধারণ মানুষের ধর্ম।

বলা বাহুল্য, এই সমস্ত শ্লোকে ধর্মের যে সমস্ত লক্ষণগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাইবেলের ten commandment-এর স্বগোত্রীয় জিনিস। ধর্মের জন্য এই জাতীয় একটা

সংজ্ঞা বাঁধিয়া দেওয়ার একটু সুবিধা আছে। ইহার ফলে সাধারণ মানুষকে পদে পদে বিচার করিবার প্রয়োজন হয় না, বিবেচনা করিবার প্রয়োজন হয় না, চোখ বুঁজিয়া অবশ্য করণীয় কাজগুলি করিয়া যাইলেই হইল। ফলে আমরা আবার Categorical Imperative বা নির্বিকল্প আদেশের আদর্শে ফিরিয়া আসিলাম। এই আদর্শ হইতেছে কতকগুলি আচারের আদর্শ, কৃত্যের আদর্শ, Commandment-এর আদর্শ।

এই যে কৃত্য, এই যে Commandment, এগুলি ব্যক্তিগত জীবনে পালনীয় হইলেও ইহার ব্যঞ্জনাটা হইতেছে সমাজমুখী। বস্তুতঃ সমাজ পরিবেশ ব্যতীত ধর্মের কোনও সার্থকতা নাই। আমার কাজের জন্য সমাজের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে, আমি যাহা করিব তাহাতে সমাজের লোকের ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, এই বিচার দিয়াই আমার কাজের বিচার করিতে হইবে। ব্যক্তিগত আমি আর সমাজগত আমি-র স্বার্থ সব সময় একমুখী হয় না। ব্যক্তি চায় নিজের তৃপ্তি, নিজের মঙ্গল, আর সমাজ দাবী করে সংঘের কল্যাণ; তার ফলে অনেক সময় ব্যক্তির কামনাকে সে বাধাই দেয়, প্রশ্রয় দেয় না। আমার প্রতিবেশীর জমিটি খুব ভাল, ব্যক্তি হিসাবে আমি হয়ত চাই ঐ জমিটি দখল করিতে, কিন্তু আমার সমাজ-নীতি এই চিন্তায় প্রশ্রয় দিবে না, সে বলিবে সব লোকই যদি প্রতিবেশীর জমি কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে কাহারও শান্তি থাকিবে না। এই ভাবে সমাজ-চিন্তা আমাদের ব্যক্তিগত কামনার মুখে লাগাম পরাইয়া তাহাকে সংযত করে। ব্যক্তি যতটা স্বাধীনতা চায়, যতটা সুখভোগের অধিকার চায়, সমাজ ততটা দিতে স্বীকার করে না। সমাজ প্রতিনিয়তই বিধি-নিষেধের বন্ধন দিয়া ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারকে সংযত করিতে চায়।

সমাজ-বুদ্ধি ব্যক্তির কামনার মুখে লাগাম দিয়া তাহাকে সংযত করিয়াছে সত্য। কিন্তু এই লাগামটি বেশী শক্ত হইলে আবার ফল ভাল হয় না। তাহাতে ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশ প্রতিহত হয়, প্রাণ-শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। সেইজন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আর সমাজগত বন্ধনের দাবী ও মাত্রা লইয়া বিভিন্ন কিলসফির সৃষ্টি হইয়াছে, বিভিন্ন ধর্মমতের সৃষ্টি হইয়াছে, আবার যখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে তখন বিভিন্ন যুগাবতারের আবির্ভাব হইয়াছে। ত্রেতার শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ একজন যুগাবতার, আবার দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ আর একজন যুগাবতার। রামচন্দ্র হইতেছেন নিষ্ঠার প্রতীক, সমাজ-বুদ্ধির প্রতীক, Categorical imperative-এর প্রতীক, আর শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক, শাস্ত্র-সংস্কারমুক্ত স্বাধীন চিন্তার প্রতীক, যুক্তিবাদের প্রতীক। রামচন্দ্রের জীবনের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই দেশের প্রচলিত আদর্শের প্রতি, সমাজের বিধি-নিষেধের প্রতি বিকল্পহীন নিষ্ঠা। ধর্মকে Categorical Imperative-এর চক্ষে দেখিয়া অবশ্যকরণীয় ভাবিয়া তিনি কাজ করিয়া গিয়াছেন। কোনটা কর্ম আর কোনটাই বা অকর্ম এই কর্তব্যদ্বন্দ্ব যখন উপস্থিত হইয়াছে, তখন তিনি ব্যক্তিগত বুদ্ধি বা ব্যক্তিগত বিবেক দিয়া তাহার বিচার করেন নাই। তিনি হয়ত বুঝিয়াছিলেন যে, ব্যক্তিগত বিবেকের আলো সব সময়েই অভ্রান্ত আলো দেখায় না, চোরের বিবেক চোরকে চুরি করিতেই প্রশ্রয় দেয়, সৎপথে চলিবার সাহস দেয় না। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনীয় বলিয়াই পালন করিয়াছেন, বিচার করিয়া দেখিতে চাহেন নাই যৈন পিতার অন্যায় আজ্ঞা

পালনীয় কি না। আমরা জানি সীতাকে তিনি কি চক্ষে দেখিতেন। সীতার "অগ্নিশুদ্ধি" কথাটা পর্যন্ত তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। আলেখ্য-দর্শন প্রসঙ্গে লক্ষ্মণ ঐ কথাটা উচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে সস্নেহ তিরস্কারে বলিয়াছিলেন "শাম্যম্ তীর্থোদকঞ্চ বহ্নিশ্চ নাস্ততঃ শুদ্ধিমর্হতঃ" (থামো, তীর্থের জল আর অগ্নিকে অন্ত কোনও জিনিস দিয়ে শুদ্ধ করতে হয় না)। রামচন্দ্রের মতে সীতা ছিলেন ইহাদেরই মত স্বয়ংশুদ্ধা। এই যে সীতা, যিনি গৃহের লক্ষ্মী, নয়নের অমৃতবর্তিকা, যাঁহার বাহু "শিশির মসৃণ মৌক্তিক সরঃ", যাঁহার স্পর্শ পরিমৃঢ় ইন্দ্রিয়গণকে অভিভূত করিয়া স্বপ্নাবেশে অবশ করিয়া দেয়, আবার যাহা সুধাতিশয্যে বিবশ মনকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলে, সেই সীতাকেও তিনি নির্মমভাবে পরিত্যাগ করিয়া আজীবন অন্তর্দাহের পুটপাকে দগ্ধ হইয়াছেন। রাজা হিসাবে প্রজা-রঞ্জনের কর্তব্যের বেদীমূলে তিনি সীতাকে বলি দিয়াছেন, নিজেকে বলি দিয়াছেন, ব্যক্তিগত ন্যায্য অধিকারকেও অকুণ্ঠ-চিত্তে বলি দিয়াছেন। ধর্মের আদর্শ ভ্রষ্ট হইলে পাছে সমাজে অকল্যাণ হয়, পাছে ব্যক্তিগত বিবেকের স্বাধীন চিন্তার নামে গোপন চরণে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করে, পাছে "হিতবাদ"-এর ভ্রান্ত বিচারে সুবিধাবাদ ও স্বার্থবাদ সমাজধর্মকে কলুষিত করে, পাছে জনসেবার ব্রত আত্ম-সেবার দাসীতে শক্তিহীন হইয়া পড়ে, পাছে "লোক সংগ্রহ" ব্যাহত হয়, সেইজন্ত নির্বিচারে তিনি বিশুদ্ধ কর্তব্যের বেদীতে আত্মাহুতি দিয়াছেন।

দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে আমরা আর একটি মহা আদর্শের সন্ধান পাই। এ আদর্শ শাস্ত্র-নিষ্ঠা বা সমাজ-নিষ্ঠার আদর্শ ততটা নহে, যতটা হইতেছে একটা বিবেক-পরিশুদ্ধ স্বাধীন চিন্তার বৈপ্লবিক আদর্শ। চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে তিনি ইতস্ততঃ করেন নাই, বুদ্ধির সংস্কারমুক্ত বিচারে তিনি বুঝিতে সাহস করিয়াছেন প্রাচীন রীতি-মাত্রই অভ্রান্ত নহে। তাই দেখিতে পাওয়া যায় যুগ-পালিত প্রথা ইন্দ্র পূজার বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়াইয়া-ছিলেন। রুষ্ট দেবরাজ যখন বজ্র বিদ্যুৎ বারিপাতের দ্বারা দ্বিগুণ বিদ্রোহীকে শাস্তি দিতে চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি গোবর্ধন ধারণ করিয়া তাহাদের রক্ষা করিয়াছিলেন। আমরা জানি বেদকে হিন্দুরা কি চক্ষে দেখে। হিন্দুধর্মের মতে বেদের প্রমাণের চেয়ে অভ্রান্ত আর কিছুই নহে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়াও হিন্দু থাকা যায়, কিন্তু বেদের প্রমাণকে অস্বীকার করিলে হিন্দু থাকা যায় না। বস্তুতঃ এমন কয়েকটি হিন্দু-দর্শন আছে, যাহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব তেমনভাবে স্বীকৃত হয় নাই। বৌদ্ধদর্শনের সহিত হিন্দুদর্শনের বিরোধের কারণই হইতেছে বৌদ্ধদর্শন বেদের প্রমাণকে স্বীকার করে নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই সুপ্রাচীন যুগেও বেদের সব কথাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করেন নাই। "অন্যকর্মফলপ্রদা" বেদাচারকে তিনি নিন্দা করিয়াছেন, "ত্রৈগুণ্য বিষয়াবেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন" বলিয়া তিনি অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন, ক্ষুরধার প্রতিভা ও বিশ্লেষণী বুদ্ধির দ্বারা মীমাংসকের কর্মবাদ ও সাংখ্যের নৈষ্কর্ম্যের সমন্বয় সাধন করিয়া নিষ্কাম কর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, আজীবন সংগ্রাম করিয়াছেন, ন্যায়ের জন্ত বৈপ্লবিক কার্য করিয়াছেন, দুর্বলের বল হইয়া ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের রথ-সারথী হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, বীরের যখন ক্লৈব্য আসিয়াছে, তখন তাহাকে অভয় দিয়াছেন, কঠোর কর্তব্যের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে উৎসাহ দিয়াছেন, অভিমন্যুর আর্ত চীৎকার

পাঞ্চজন্যের নিনাদে নিমজ্জিত করিয়া ডাগিনেয়কে বলি দিয়াছেন। যাহাদের সকলে ভয় করিয়াছে তাহাদের লইয়া তিনি মাথায় করিয়া নাচেন নাই। এই বৈপ্লবিক বীর কংসকে হত্যা করিয়াছেন, শিশুপালকে শাস্তি দিয়াছেন, জরাসন্ধের অত্যাচার নিরোধ করিয়াছেন। নিজের প্রতিও তাঁহার কোমলতা ছিল না; ভৃগুপদচিহ্ন তিনি বক্ষে ধারণ করিয়াছেন, সত্যভামার দর্পচূর্ণ করিয়াছিলেন, যদুকুলের ধ্বংসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কলির শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে ত্রেতার শ্রীরামচন্দ্র এবং দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণের আদর্শের সমন্বয় ঘটিয়াছে। তাঁহার মধ্যে একাধারে শ্রীরামচন্দ্রের নিষ্ঠার দিক, চিরাচরিত অনুষ্ঠান প্রভৃতির প্রতি আনুগত্যের দিক এবং শ্রীকৃষ্ণের বৈপ্লবিক যুক্তিবাদের দিক, সংস্কারমুক্ত বিচারের দিক এই দুইটি আদর্শই অপূর্ব সমন্বয়ে মিলিত হইয়াছে। তাই এক দিক দিয়া দেখিতে পাওয়া যায় তিনি চিরাচরিত মূর্তি পূজাকে অস্বীকার করেন নাই, অপর দিক দিয়া দেখিতে পাওয়া যায় পৌরোহিত্যের স্মৃতিশাস্ত্রাদির গোঁড়ামিকেও স্বীকার করেন নাই। একদিক দিয়া দেখিতে পাওয়া যায় সংস্কারমুক্ত বিচার দিয়া সম্পূর্ণভাবে গোঁড়ামি বর্জন করিয়া তিনি "যত মত তত পথ"কে স্বীকার করিতেছেন তন্ত্রমন্ত্রের জটিলতা পরিহার করিয়া বালকের মত সরলতা ও ইহা, মুঠা মুঠা ফুল দেবীর পায়ে নিক্ষেপ করিতেছেন, ভাবোন্মত্ততায় তাঁহার সহিত মান-অভিমান কলহ-বিবাদ করিতেছেন, অন্যদিক দিয়া দেখিতে পাই সাধারণভাবে জীবনযাপনের দিক দিয়া সাধারণ আচারনিষ্ঠ হিন্দুর সহিত তাঁহার কোনও পার্থক্য নাই। একদিক দিয়া দেখিতে পাওয়া যায় "বেদ-বাদ-রত"-বুদ্ধি সাধারণ আচার-সর্বস্ব হিন্দুর দলে তিনি ছিলেন না, অপর দিক দিয়া দেখিতে পাওয়া যায় সেযুগে যাঁহারা বুদ্ধির উদ্ধত অহঙ্কারে দেশের রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠানের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়া বিজাতীয় জীবনযাত্রা প্রণালী অবলম্বন করিতেন, তাঁহাদের দলেও তিনি ছিলেন না। দেশের প্রাচীন দেশাচারের প্রতি গোঁড়ামী ত্যাগ করিবার আগ্রহে যাঁহারা দোলকের (pendulum) দোলনের বিপরীত প্রান্তে ছুটিয়া যাইয়া বিদেশী আচার অনুষ্ঠানের গোঁড়ামিকে বরণ করিয়াছিলেন, তাহাদের দলেও তিনি ছিলেন না, আবার যাঁহারা স্বজাতীয় কলা-কৃষ্টিকেই পরম পদার্থ মনে করিয়া দুনিয়ার বাকী সব জিনিসকেই ঘৃণ্য ঘাবনিক পদার্থ মনে করিয়া তাহাদের স্পর্শ বাঁচাইয়া সাবধানে চলিতেন, তাঁহাদের দলেও তিনি ছিলেন না। তাঁহার মধ্যে নিষ্ঠা ছিল কিন্তু গোঁড়ামি ছিল না, চিন্তা ও বিচারের স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না;—এত বড় সমন্বয়ের দেবতা আমরা খুব কমই দেখিয়াছি। অল্পশিক্ষিত অথবা অর্ধ শিক্ষিত পূজারী ব্রাহ্মণের মধ্যে হয়ত অন্ধ ভক্তির দৃষ্টান্ত বিরল নহে, কিন্তু যখন সেই পূজারী ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রের জটিলতম তর্ককে অকাতরে মীমাংসা করিয়া দিতে দেখি, অতি সাধারণ উপমা রূপক প্রভৃতির সাহায্যে কূটতম সমস্যার সমাধান করিতে দেখি, তখন বিস্ময়ের সীমা থাকে না। ভক্তির সহিত জ্ঞানের, কর্মের সহিত সন্ন্যাসের, নিষ্ঠা সংযমের সহিত যুক্তিবাদের, মুক্তির সহিত বন্ধনের, "সন্ন্যাস-কৃত্যের" সহিত "সংসার-কৃত্যের", গৃহধর্মের সহিত যাগপ্রস্থের, ব্যক্তিগত সাধনার সহিত সমাজগত সেবানুরক্তির এত বড় সমন্বয়ের দেবতা আমরা আর কখনও দেখি নাই। সমুদ্রের মধ্যে যেমন জগতের সমস্ত নদনদী মিলিত হয়, তাঁহার মধ্যেও তেমনই সর্ব যুগের সমস্ত মতবাদের মিলন

হইয়াছে। যুক্তিবাদের নাস্তিকতার যুগে অন্ধ ভক্তির পথ দিয়াই তাঁহার সাধনা আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু ঐ অন্ধ ভক্তিই তাঁহাকে সেই পরম জ্ঞানের আলোক দান করিয়াছিল যে জ্ঞানের মাঝে সংসার-বন্ধনের শেষ হয়। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন :

"যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্,
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।" ১০।৩

এই জ্ঞান শাস্ত্র-চর্চার দ্বারা তিনি লাভ করেন নাই, তদ্গতপ্রাণ ভক্তকে ভগবান যে "বুদ্ধিযোগ" দান করিয়া থাকেন—সেই "বুদ্ধিযোগ"কে ভক্তির পথ দিয়াই তিনি পাইয়াছিলেন। ভক্তের প্রসঙ্গে ভগবান গীতায় বলিয়াছেন :

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" ১০।১০

তাঁহার উক্তিটি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সার্থকভাবে সফল হইয়াছিল।

প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় "লোক সংগ্রহের" জন্য তিনি "কর্মযোগ"-এর আচরণ করিতেন, সাধনার পথে "ভক্তিযোগ"-এর পথিক হইয়াছিলেন এবং পূত-চরিত্র সংশিক্ষাব্রত জ্ঞান-তাপসগণ যেভাবে ভগবৎ-ভাবিত হইয়া পরমেশ্বরের সহিত একাত্মতা লাভ করে, সেই পরাজ্ঞানেরও সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের নিষ্ঠা ও শ্রীকৃষ্ণের বৈপ্লবিক যুক্তিবাদ তাঁহার মধ্যে মিলিত হইয়াছিল। মিলিত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি হিন্দু থাকিয়াও অহিন্দু ধর্মগুলির চরম সত্য ও সিদ্ধিকে নিজের সাধনার মধ্য দিয়াই লাভ করিয়াছিলেন। সেগুলিকে উপলব্ধি করিবার জন্য হিন্দুধর্মকে ঘৃণা করিয়া বা অস্বীকার করিয়া তাঁহাকে খৃষ্টান হইতে হয় নাই, মুসলমান হইতে হয় নাই, ব্রাহ্ম হইতে হয় নাই। শ্রীরামচন্দ্রের নিষ্ঠাবোধ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে অতীতের tradition-এর পথে, আর শ্রীকৃষ্ণের যুক্তিবাদ তাঁহাকে দিয়াছে উদার মতবাদ ও অভ্রান্ত দৃষ্টি। শুধু রাম ও কৃষ্ণ কেন, যত মতে ও যত পথে সত্যের সন্ধান হইয়াছে, সেই সব মত সব পথ দিয়াই তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাই এমন কোনও ব্যাপক নাম নাই যাহা দ্বারা তাঁহাকে বিশেষিত করা যাইতে পারে। তাই সর্ব মতের সমন্বয়ের দেবতা হিসাবে বোধহয় ভবিষ্যতের অদৃষ্ট দেবতা তাঁহার নামকরণের সময় "রামকৃষ্ণ" নামটি সমন্বয়ের প্রতীক হিসাবে স্থির করিয়াছিলেন। মানুষের মনের স্থিতি ধর্মের সহিত গতি ধর্মের, নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতার সহিত বৈপ্লবিক যুক্তিবাদের, শ্রীরামচন্দ্রের জীবনাদর্শের সহিত শ্রীকৃষ্ণের জীবনাদর্শের সমন্বয় তাঁহার জীবনে দেখিতে পাওয়া যাইবে বলিয়াই তাঁহার নাম রামকৃষ্ণ হইয়াছিল। ইহা একটা আকস্মিক ব্যাপার মাত্র নহে, ইহার মধ্যে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত আছে।

বৈশেষিক দর্শন

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, বি. এল., বিদ্যাবিনোদ

বৈশেষিক দর্শন নাম হইল কেন? হিন্দুদর্শনশাস্ত্রের ছয়টি বিভাগ। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আরও কয়টি উপবিভাগ থাকিতে পারে। প্রত্যেক দর্শনের বিশেষ বিশেষ গুণ বা দৃষ্টিভঙ্গী আছে। বিভাগীয় গুণ অনুসারে দর্শনের তারতম্য, সকলগুলিই প্রধানতঃ দর্শন শক্তি ও দর্শন বিচারের এলাকাধীন। সাংসারিক বা আত্মিক যাবতীয় বিষয় দর্শন আয়ত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলা যাইতে পারে। জাগতিক দ্রব্যনিচয় অথবা মানসিক বৃত্তি, বিষয় বা ধারণা দর্শন শক্তির উপর নির্ভর করে। ধারণাগুলি বা বস্তুজ্ঞান সকলই দর্শন ভঙ্গীর দ্বারা কতকাংশে নিয়ন্ত্রিত।

সাংখ্যকার বঙ্গগৌরব কপিল মুনি যেমন প্রকৃতি-পুরুষকে নিত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার শিষ্যগণ যেমন প্রকৃতি, পুরুষ প্রভৃতি পঁচিশটি মৌলিক তত্ত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং পতঞ্জলি মুনি যেমন ঐগুলি স্বীকার করিয়াও ঈশ্বরকে ষড়বিংশতি তত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, বৈশেষিক দর্শনের প্রবর্তক মহামতি কণাদও সেইরূপ নয় প্রকার পদার্থ নিত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সেই নয়টির নাম দ্রব্য-পদার্থ, কারণ দ্রব্যই প্রথম পদার্থ, যেমন দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব—এই সাতটির নাম বৈশেষিক পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ পদার্থ রাখিয়াছেন। কণাদ ঋষি কর্তৃক স্বীকৃত জল, বায়ু, মৃত্তিকাদি নয়টি দ্রব্য পদার্থ। জড় পদার্থ হইতে-প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। জড়ের বিচার প্রথম স্তরে প্রয়োজন, বাস্তব জ্ঞান হইতে পরে আধ্যাত্মিক বা মানসিক জ্ঞান সঞ্চারিত হইতে থাকে। দেহ হইতে যেমন মনের প্রসার, স্থূল হইতে যেমন সূক্ষ্ম উদ্ভূত হয়, সেইরূপ দ্রব্য-পদার্থের আলোচনা প্রারম্ভে সূচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সকল দর্শনের মূল উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ। এইজন্য ঐদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সকল আলোচনা, বিশ্লেষনা উচিত হয়। অলোচনার সূত্রপাত ঐ প্রবাহ গতিতে। বিবেচনা, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি স্থিরীকৃত হয় ঐ জ্ঞান বা তত্ত্বানুসন্ধানের মূল সূত্র ধরিয়া পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক এবং আত্মা ও মন—এই নয়টি দ্রব্য পদার্থ।

বিভিন্ন বিভাগ

কণাদ মুনির প্রবর্তিত বৈশেষিক দর্শনে "বিশেষ" নামে একটি অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকৃত হওয়ায়, এই দর্শনের নাম বৈশেষিক দর্শন বলিয়া পরিচিত ও বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত।

প্রথমে দ্রব্য সম্বন্ধে বিবৃত হইয়াছে। তাহার পর গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অভাব—এই সাতটিকে বৈশেষিকগণ পদার্থ বলিয়াছেন। আত্মা ও মন লইয়া নব পদার্থ হইল।

এই দর্শনমতে গুণ পদার্থ চব্বিশটি। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিয়োগ এই তালিকাভুক্ত। ইহা ভিন্ন সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, বুদ্ধি, দ্বেষ, প্রযত্ন, পরত্ব, অপরত্ব ইহার অন্তর্বর্তী। এই সতেরটি, মহাতপা কণাদের গভীর চিন্তাপ্রসূত জ্ঞানরাশির সংস্পর্শে

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চব্বিশটী হয়। এখানে অতিরিক্ত সাতটী হইতেছে—শব্দ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, পাপ এবং পুণ্য। তাঁহার বিচারশক্তির তীব্রতা ও দর্শনশক্তির সূক্ষ্মতা এই প্রকার বিভাগ-কল্পনায় উপনীত হইয়াছে। সংস্কার—তিনটি উপ-বিভাগে ব্যক্ত হইয়াছে: স্মরণশক্তি, স্থিতি-স্থাপকতা ও বেগ। গতির কারণ স্বরূপ এই বেগ উপেক্ষণীয় নহে, ইহা ক্রিয়াদি দ্বারা এবং সক্রিয় আচরণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এইবার **কর্মের** কথা বলা আবশ্যক। বৈশেষিক পণ্ডিতগণ এবং কণাদ-শিষ্য প্রভৃতি এই কর্মকে পাঁচটি পর্যায়ে দর্শন করিয়াছেন—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, গমন। বিভিন্ন অবস্থার রূপ এই বিবিধ ভঙ্গীতে দৃষ্ট হইয়াছে। এই সকলগুলিই বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর বিবৃতিকৃত।

বস্তুর জাতি বা ধর্ম হিসাবে দৃষ্টিভঙ্গী **সামান্য** নামে পরিচিত। বস্তুর সাধারণ ধর্মই—সামান্য পদার্থ ঘট জাতির থাকিবে ঘটত্ব, পশুর পশুত্ব। গুণাবলী হিসাবে পদার্থ-পরিচয় বা বস্তু-বিভেদ সমীচীন, বস্তু বিচারও সঙ্গত। পশু জাতির নাম পশুত্ব, মানবের মানবত্ব, দেবতার দেবত্ব—এই প্রকার নামকরণে আলোচনা-পথ সুগম করে, বস্তুর পার্থক্যজনিত সত্তা উপলব্ধি করা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

বৈশেষিক দর্শন মতে 'যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি স ধর্মঃ।' যাহাতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধ হয়, তাহার নাম ধর্ম। অভ্যুদয়ের অর্থ কল্যাণ, নিঃশ্রেয়স এ স্থলে সর্বোত্তম কল্যাণরূপে ব্যবহৃত। ইহা আরও বলিয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইলে নিঃশ্রেয়স লাভ হইয়া থাকে—পরম কল্যাণ বা মুক্তিলাভ ঘটে।

সম্বন্ধ বিশেষকে এই জাতীয় দার্শনিক **সমবায়** বলিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—গুণের সহিত গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের সম্বন্ধ। ইহা উৎপত্তিঘটিত সম্বন্ধও বুঝাইয়া থাকে, যথা—মৃত্তিকা হইতে জাত বা উৎপন্ন ঘট। কর্তার সহিত কর্মের সম্বন্ধে আমরা যে সমবায় বা সম্পর্ক দেখিতে পাই, তাহার উল্লেখ হইয়াছে। নিহিত দ্রব্যের সমষ্টি বা সমবায়ে গঠিত দ্রব্যের ধারণা বেশ স্বচ্ছ রূপ ধারণ করে, যেমন কোন জাগতিক পদার্থের সহিত তদীয় অংশের সম্বন্ধ; জড় দ্রব্যের সহিত তন্নিহিত পরমাণুর সম্বন্ধ এবং বস্ত্রের সহিত তদীয় সূত্রের সম্পর্ক—সকলই সমবায়ে গঠিত বলিতে হইবে, সূত্রগুলির সমবায়ে বস্ত্রবয়ন করা হয়, মৃত্তিকার সাহায্যে বা সমবায়ে ঘট নির্মিত হয়। পরমাণুর পরস্পর সাহচর্য, সহযোগিতা ও সমবায় ব্যতিরেকে কোন পদার্থের রূপ কল্পনা অসম্ভব। অণু-পরমাণুর সহযোগিতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পারস্পর্য রূপ পরিগ্রহণের মূল্যবান উপকরণ, অপরিহার্য উপাদান, ইহা সহজেই অনুমেয়। ব্যষ্টির সমবায়ে সমষ্টি গঠিত, ব্যক্তিগণকে লইয়া জাতি যে সমুন্নত, সংগঠিত তাহা আমরা নিত্য চতুর্দিকে প্রত্যক্ষ করি।

অভাব পর্যায়ে নির্দিষ্ট অর্থ বুঝিতে হইবে। বৈশেষিক দর্শনে ইহার ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা নির্ধারিত আছে। অভাবের অর্থ নিষেধ, কেহ বলেন শূন্যতা অর্থাৎ না থাকা। ইহার চারিটি প্রকারভেদ দৃষ্ট হয়; প্রথমাবস্থায় ঘট বা পাত্রাদি কোন বস্তু উৎপাদিত হইবার পূর্বে তাহার যে অভাব থাকে তাহার নাম প্রাগভাব (প্রাক্+অভাব)। দ্বিতীয় অবস্থা ধ্বংসাভাব।

পাত্রাদি দ্রব্য নষ্ট হইলে, তাহার অভাবই ধ্বংসাবস্থা। ঘট, পট প্রভৃতি জাগতিক দ্রব্য-নিচয় সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গেলে বা ধ্বংসাবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহার যে অভাব উপলব্ধ হয়, তাহার নামই ধ্বংসাভাব। তৃতীয় অবস্থা—ভেদাভাব। অর্থাৎ গৃহ যে ঘটাদি বস্তু নহে, এই কথায় দুই বস্তুর যে পরস্পর প্রভেদ প্রতীয়মান হয় তাহা বৈশেষিক দর্শনে ভেদাভাব নামে উক্ত হইয়াছে। গৃহ ও ঘটের মধ্যে পরস্পর যে প্রভেদ-বোধ বা পার্থক্য-জ্ঞান তাহা ভেদাভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। চতুর্থতঃ—অনুপস্থিত বা অবিদ্যমান বুঝাইলে যে অভাব-বোধ আমরা অনুভব করি তাহা অত্যন্তাভাব নামে দর্শনশাস্ত্রে কীর্তিত। গৃহে কাষ্ঠ নাই—এইরূপ উক্তি দ্বারা যে অভাব অনুভূত হয়, তাহাই এ স্থলের প্রতিপাদ্য বিষয়।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু কণাদের বৈশেষিক শাস্ত্রে পূর্বে অভাব পদার্থ যে পরিগণিত ছিল না তাহা সকলেই অবগত আছেন। তত্ত্বনির্ণয়কারী মহামুনি কণাদ প্রথমে ছয়টি পদার্থ গণনা করিয়াছিলেন। কণাদ ঋষির সূত্র মধ্যে তাহার উল্লেখ প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার রচিত দর্শনে এই সতেরটি গুণ পদার্থ লক্ষিত হয়: রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিয়োগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ৬ সূত্রে কণাদ ঋষি এই সতেরটি গণনা করিয়া যান। পরে তাহার সহিত আরও সাতটি সংযুক্ত হইয়াছে যেমন—শব্দ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম এবং অধর্ম। এই প্রকারে বৈশেষিক-দর্শনশাস্ত্রে দ্রব্য নির্ণয় সমস্যা আলোচিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য দর্শনে দৃষ্ট হয়, প্রাচীন যুগে ডেমক্রিটাস, এপিকিউরাস, লুক্রেশিয়াস প্রভৃতি-পরমাণুবাদে আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া উহাদের অণুতাত্ত্বিক বলা হইত (Atomists)। অণুপরমাণু দ্বারা সর্ব দ্রব্য গঠিত,—ইহা ছিল তাঁহাদের মতবাদ। পরবর্তী যুগে লাইবনিজ (Leibnitz) বলিয়াছেন দ্রব্য মনাদ (Monad) বা এ্যাটমের সমষ্টিমাত্র, প্রতিটির স্বাধীন সত্তা আছে, সকলগুলি স্বয়ংসিদ্ধ স্বাবলম্বী (self-contained)। ঈশ্বর চরম মনাদ, মানবাত্মা স্বতন্ত্র মনাদ অর্থাৎ নিরবয়ব জীবৎ পদার্থ।

তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ পার্থিব জগতের দ্রব্যনিচয়ে সন্দিহান ছিলেন না; কণাদ-প্রদর্শিত পরমাণুবাদে তাঁহারা পাইয়াছিলেন পদার্থের সন্ধান, নিত্যবস্তুর বিদ্যমানতায় নিঃসংশয় হইয়া তত্ত্বান্বেষী বিজ্ঞগুণী লাভ করিয়াছিলেন বস্তু-সত্তার উপলব্ধি—অণু-পরমাণুর মিলন-রহস্য। সে রহস্য ভেদ করিয়াছিল তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি। অণু-পরমাণু যে দ্রব্যসমূহের প্রধান উপাদান, জিজ্ঞাসু মন সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছিল; অণুর সম্মিলন, পরমাণুর সমবায় যে দ্রব্য সৃষ্টি করে, রূপ দেয়—সে চিরন্তন সত্যসকল হৃদয়ঙ্গম করিলে সমস্যা সমাধানের ও রহস্য পূরণের আলোকে চিন্তাজগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; যুক্তি ও মননশীলতা ক্ষিপ্রগতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমবায় পরস্পরের ঐক্যানুভূতি-পরিপুষ্ট ও সুদৃঢ় হইয়া বস্তু-সত্তার নিবিড়তায় ডুবিয়া গেল। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এক শাশ্বতিময় শৃঙ্খলে নিবদ্ধ হইয়া পরিবর্তনশীল জগতের শাশ্বত রূপ প্রকট করিল এবং আণবিক তত্ত্বের প্রভাবে জাগতিক পদার্থ যে অবিনশ্বর তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিল। রূপ পরিবর্তনে দ্রব্যের ধ্বংস হয় না এবং অণু-পরমাণুর পরস্পর স্থান-সংকোচনে বা বিভিন্ন পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে আকার-ভেদের অস্তিত্ব স্বীকৃত

হইল। পারস্পরিক স্থান-বিনিময় ধ্বংস-কারণ না হইয়া নব কলেবর ধারণ করিয়া থাকে, ইহা সবিস্তারে প্রতিপন্ন হইয়াছে। অন্তর্নিহিত অণু-বিনিময় দ্রব্যের রূপান্তরের আদিম কারণ; উপাদানগুলির নির্দিষ্ট স্থান পরিবর্তন ইহার জন্য দায়ী, ইহা আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন। বরফ—জল ও বাষ্প প্রায় একই মৌলিক উপাদানে সংগঠিত, রূপের ও গুণের পার্থক্য থাকিলেও। ইহাতে বিলোপ-সাধনের প্রশ্ন আসিতে পারে না। চর্মচক্ষে পরিদৃষ্ট না হইলেও অস্তিত্ব লোপ সম্ভাবনা এস্থানে অবিদ্যমান। ঐক্যানুভূতির ঐশ্বর্য দ্রব্যাস্তিত্বের মূলীভূত কারণ, ইহা হৃদয়ঙ্গম করা সুস্পষ্ট ও সুকর হইয়া উঠিল।

সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যে দৃষ্ট হইবে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিনটি পদার্থ দ্রব্য নামে অভিহিত। কিন্তু বৈশেষিক দর্শন অনুসারে গুণ নয়; কেননা তাহারা সংযোগ, বিয়োগ, লঘুত্ব, চলত্ব, গুরুত্বাদি গুণবিশিষ্ট। সত্ত্বাদি তিন দ্রব্যে প্রস্তুত মহত্তাদি ত্রিগুণ রজ্জুদ্বারা জীবাত্মারূপ পশু বা প্রাণী আবদ্ধ হইয়া আছে। সাংখ্য ও বেদান্তি শাস্ত্রে সেই তিন দ্রব্য গুণ বলিয়া বিবেচিত ও ব্যবহৃত হইয়াছে।

কারণ

চাক্ষুষ কারণ যে উৎপত্তি মূল সে ধারণা বর্তমানে তিরোহিত। দৃষ্টির বহির্ভূত ক্ষেত্রেও কারণ থাকিতে পারে, তাহা অধুনা প্রতিপন্ন হইয়াছে। নয়ন-অগোচরে কত ঘটনা ঘটিতেছে, পারস্পর্য বিধানে কত বিষয় সংঘটিত হইতেছে তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন; দ্রব্য-পরিবর্তন বা অবস্থান্তর সাধনের কারণ বা হেতু অন্বেষণ করা বিধেয়। ইহা স্থির হইয়াছে যে, কার্য-কারণ ব্যতিরেকে জগৎ চলে না। ধারাবাহিক ঘটনা-স্রোতের একটি মূলীভূত কারণ আছে, কর্ম-প্রবাহেরও কারণ বা তত্ত্বরূপ নিহিত, কোনটি প্রত্যক্ষ কোনটিবা অপ্রত্যক্ষভাবে প্রতীয়মান হয়। কোন কারণ বা হেতু ব্যতিরেকে কোন বিষয় ঘটে না, কোন দ্রব্য উদ্ভূত হয় না, কোন ঘটনা-সমাবেশও কারণাধীন।

কারণ বিভিন্ন শ্রেণীর উপলব্ধ হয়, ইহাই দার্শনিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কোন ক্ষেত্রে উহা বীজরূপে প্রচ্ছন্ন, যেমন ফল বা ফুলের মধ্যে। কোন দ্রব্যে মৌলিক উপাদান রূপে নিহিত। যেমন বায়ুর উপাদান অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি, সলিলের উপাদান অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি। ছানার কারণ দুগ্ধ, ঘৃতের কারণ মাখন, ইত্যাদি।

যাহা হইতে কার্য উৎপন্ন হয়, কার্য উৎপাদনের তাহাই কারণ,—হাঁড়ির কারণ এজন্য মৃত্তিকা। মৃৎপাত্র নির্মাণ কার্যের হেতু বা কারণ মৃত্তিকা। যাহার যত্নে কোন কার্য নির্বাহ হইয়া থাকে, তাহাও কারণ। যেমন, হাঁড়ির কারণ কুম্ভকার। ঘটের কারণ যে কুম্ভকার দার্শনিক সে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। ঘটনির্মাতা যে এক প্রকার কারণ-বিশেষ তাহাও স্বীকৃত, কেননা তিনি নির্মাণকার্যে সাহায্য করেন, তাঁহারই প্রযত্নে নির্মাণ-কার্য নির্বাহ হইয়া থাকে। যাহার দ্বারা বা সহযোগে কোন কার্য নিষ্পন্ন হয় তাহাও এক প্রকার কারণ। মূলীভূত কারণ অন্বেষণে অনেকগুলি বিষয় চিন্তনীয়। কত দ্রব্য, বিষয় প্রকৃতির সহযোগিতায় ঘটনার উদ্ভব হয়, তাহা সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা অনুভূত। এই হেতু দার্শনিক

তত্ত্বানুশীলনে পরিব্যক্ত হইয়াছে ঘটের কারণ চক্রবিশেষ, কুম্ভকারের চক্রও একপ্রকার কারণ ইহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। কেবলমাত্র চক্র নহে; চক্র, দণ্ড, সূত্র প্রভৃতি সকলগুলিই কারণ মধ্যে একীভূত। সমবায় সাধন দ্বারা মৃত্তিকা-ঘট নির্মিত হইয়া থাকে; অতএব ঐগুলি মিলিতভাবে কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ঐ সকলগুলির সহযোগ ভিন্ন নির্মাণকার্য নিষ্পন্ন হইতে পারে না। সকল কার্যনির্বাহের সমবায় কারণ আছে।

ধর্ম-বিশেষ হইতে তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি। তত্ত্বজ্ঞান সুখ শান্তির নিদান, ইহা সত্যের সন্ধান দেয়। ইহা হইতে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহা ধারণা করা অসম্ভব নহে যে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়—এই কয়েকটি পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য হইতে ঐ প্রকার তত্ত্বজ্ঞান উদ্ভব হয়। বৈশেষিক দর্শনের ১ম অধ্যায় প্রথম আহ্নিকের চতুর্থ সূত্রে ইহা দৃষ্ট হইবে। মাত্র প্রাকৃতিক নিয়মাবলী অনুধাবন করিয়া যে ঐ সকল বিভাগ নির্ধারিত হইয়াছে, তাহা নহে; জগতের যথার্থ স্বরূপ ও প্রাকৃতিক নিয়ম দৃষ্টে এইগুলি নির্ধারিত হয় নাই,—ইহাতে মননশীলতার পরিচয় আছে, কার্য-কারণ সম্পর্ক, পারম্পর্য বোধ, তত্ত্বজ্ঞান, সঙ্কলন, সিদ্ধান্ত, অনুমান, অনুমান সাপেক্ষ পরোক্ষ জ্ঞান প্রভৃতি অন্তর্দৃষ্টি নিহিত আছে। এই প্রকার দার্শনিক শাস্ত্রের সত্য তর্ক-প্রসূত ও বিচারলব্ধ অবধারণ ও নিগমন (Inference) অনেকে বিবৃত করিয়াছেন অলক্ষ্য কারণ বিশেষ দ্বারা জড় পরমাণু সমুদয়ের সংযোগ হইয়াছে।

বৈশেষিক দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের প্রথম সূত্রেই উক্ত হইয়াছে: পরমাণু সৎ-স্বরূপ নিত্য পদার্থ, তাহার আর কারণ হইতে পারে না, কারণ থাকিতে পারে না। ইহা যেন মৌলিক পদার্থ বিশেষ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর মতে, বায়ুর পরমাণু নিত্য, আর ঐ পরমাণুর সমষ্টি সমুদয় অনিত্য।

পূর্ব বর্ণিত যুক্তি অনুসারে বলা যায়, পরমাণুর বিভিন্নতা, স্থান বিনিময় প্রভৃতি দ্রব্যগুণ নির্ণয় করে, পদার্থের বিদ্যমানতা অস্তিত্ব প্রমাণ করে ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলী প্রকাশ করে। মেঘ, ইন্দ্রধনু, বাষ্প, তুষারপাত প্রভৃতি রূপ সৃষ্টি ইহার মূলে, আবার বন্যা, বায়ু প্রবাহ, অশনিপাত, শিলাবৃষ্টি, কুয়াশা, করকাপাত প্রভৃতি পরমাণু পরিবর্তনের ফল। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিলে প্রতীয়মান হইবে আণবিক পরিবর্তন জাগতিক পার্থক্যের অবধারিত কারণ। প্রাকৃতিক দৃশ্যমান জগতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান লাভ করিয়াছেন দার্শনিক, তাই তাঁহার জ্ঞান সুনিবিড় অভ্রান্ত। তিনি তত্ত্বদর্শী সুমহান্, সাধক-চিন্তাশীল, ঋষিপদবাচ্য। বহুর মধ্যে তিনি এক দেখিয়াছেন, তিনি সত্য দর্শন করিয়াছেন। তিনি শ্রবণ করিয়াছেন বিদ্যমানতার ঘোষণা, নিরন্তর রূপ পরিবর্তনের সহস্র-ইঙ্গিত। নিত্য-চঞ্চল প্রকৃতির বুকে তিনি পাইয়াছেন মহান ঐক্য, শুনিয়াছেন জীবনের মধুর সুর। জলপ্রপাতে, নদী-মোহনায়, প্রকৃতির কুঞ্জবনে তাঁহার নিকট প্রতিভাত এক আদি, অকৃত্রিম পরমাণু তত্ত্বের অপরিবর্তনীয় রূপমধুর বাণী, জীবন রহস্যের সুবিমল সমাধান।

ধর্ম

মহর্ষি কণাদ গ্রন্থারম্ভে ব্যক্ত করিয়াছেন 'অথাতো ধর্ম্মম্ ব্যাখ্যাস্যামঃ'—অতঃপর ধর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিব (১।১।১ সূত্র)। ইহা দেখা গিয়াছে তত্ত্বকথা বিশ্লেষণ দর্শন-শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য, ধর্মজ্ঞানলাভ সকল শাস্ত্রের চরম লক্ষ্য, ধর্ম-নিরূপণ ও মুক্তি সাধনের উপায়-নির্ধারণও বৈশেষিক দর্শন শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দর্শনে ইহা ভিন্ন বিশ্লেষিত হইয়াছে, অচেতন সচেতন নানাবিধ পদার্থের বিষয়। প্রাকৃতিক বস্তু ও আগন্তিক দ্রব্যনিচয়ের সমধিক বর্ণনা ও গুণবিচারে ইহা পরিপূর্ণ। তাঁহার মতে পরমাণু-পুঞ্জের সংযোগে জড়ময় জগতের উদ্ভব হয়, অদৃষ্ট কারণ বিশেষ সেই সংযোগের প্রবর্তক। বিশেষ-কারণ জগতের উৎপত্তির মূল—এই জ্ঞান নিরোধার্থ করিয়া শাস্ত্রকার কণাদ মুনি স্বকীয় দর্শন প্রণয়ন করেন। এইজন্য তাঁহার প্রবর্তিত দর্শনের নাম বৈশেষিক দর্শন।

প্রকারভেদে ধর্ম দুই শ্রেণীর—অভ্যুদয় হেতু ও নিঃশ্রেয়স্ হেতু। দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে, যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ অর্থাৎ স্বর্গ ও অপবর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম ধর্ম। পরবর্তী সূত্রে 'তদ্বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্' (প্রথম অধ্যায় প্রথম আহ্নিক তৃতীয় সূত্র)—বেদে তদ্বচন আছে বলিয়া বেদ প্রামাণিক। কিন্তু শঙ্কর মিশ্রের টীকা অন্য অর্থ বিবৃত করে। তিনি বলেন, তৎ শব্দের অর্থ ঈশ্বর ইহা প্রসিদ্ধই আছে। সুতরাং পূর্বে সূচনা না থাকিলেও, এস্থলে উহা ঈশ্বরবাচক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। তাঁহার ভাষ্য—'তদিতি অনুপ্রক্রান্তমপি প্রসিদ্ধিং নিশ্চয়েশ্বরম্ পরামৃশতি।'

পূর্ব-কথিত দুই প্রকার ধর্ম মধ্যে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তির নাম মুক্তি। মুক্তিলাভ হইলে মানব জাতি দুঃখলেশ-বিবর্জিত হয়। মুক্তির ফলে, কোন কালে কিছু মাত্র দুঃখ থাকে না। শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ বিচ্ছেদহেতু মুক্তিলাভ করা যায়, ইহা হইতে মুক্তির উৎপত্তি। শরীর ও মনের সম্পর্ক বিলোপ বা বিচ্ছেদসাধনই মোক্ষ নামে অভিহিত। কণাদ মুনির একটি সূত্রে আছে: আত্মকর্মসম্পন্ন হইলে মুক্তি হইয়া থাকে, এই প্রকার উক্ত হইয়াছে—আত্মকর্ম্ম মোক্ষো ব্যাখ্যাতঃ (বেদে পরিব্যক্ত হইয়াছে—আগমেঽভিহিতঃ)। বৈশেষিক দর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের ষোড়শ সূত্রে ইহা বিবৃত হইয়াছে।

আত্মকর্ম সম্পর্কে ভাষ্যকার বলেন, ইহা দ্বারা শ্রবণ, মনন, যোগ-অভ্যাস, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। আসন, প্রাণায়াম, শম, দম, আত্ম-সাক্ষাৎকার, পূর্ব হইতে জ্ঞাত ধর্মাধর্মজ্ঞান প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। শ্রবণ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। কোন নির্দিষ্ট বিষয় শ্রবণ বলিতে বুঝা যায়, শ্রুতি অর্থাৎ বেদ হইতে প্রতিপন্ন আত্মার গুণ এবং স্বরূপ বিষয় শ্রবণকে এস্থলে শ্রবণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মহামুনি কণাদ-প্রোক্ত বৈশেষিক দর্শনে বিবৃত দ্রব্য গুণ কর্মাদি পদার্থচিন্তনই মননের কার্য। আত্মকর্ম সাধন করিতে এই-গুলি নিষ্পন্ন করা প্রয়োজন। আত্মা যে দেহাতিরিক্ত এই জ্ঞান আত্মকর্ম দ্বারা সঞ্জাত হইবে। দেহ যে আত্মা নহে, এই সম্যক্ ও নিশ্চিত জ্ঞান তখন আসিবে। ইহার ফলে, রাগ-দ্বেষ অন্তর্হিত হইবে। দার্শনিকগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, রাগ-দ্বেষ বিনষ্ট হইলে ধর্মাধর্মে

ভেদ জ্ঞান বিরহিত জন মুক্ত পুরুষ তিনি আর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিবেন না, তাঁহার কোন প্রকার দুঃখ লেশমাত্র থাকিবে না। এইরূপ আত্যন্তিক দুঃখের হস্ত হইতে অব্যাহতি বা পরিত্রাণ প্রাপ্তিই মোক্ষলাভ। পণ্ডিতগণ ও ঋষি-মুনি, ধার্মিকপ্রবর মহামানবৃন্দ এইজন্যই বলিয়া থাকেন আত্যন্তিক দুঃখ-বিনাশই মোক্ষ। উদ্ধারপ্রার্থী পুণ্যাত্মাগণ মুমুক্ষু হইয়া, এই কারণে, সারাজীবন ধর্মাচরণ ও ধ্যান ধারণাদি করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করেন।

বৌদ্ধমত

ধ্যান-চিন্তা, মোক্ষ বা নির্বাণ প্রাপ্তির পদ্ধতিরূপে বৌদ্ধ দর্শনেও ইহার অনুসরণ করিতে দেখা যায়। বৌদ্ধগ্রন্থ বলিয়াছেন: চিন্তা বা ধ্যান, ধৈর্য ও উপবাস—এই তিনটি পন্থা অবলম্বনে নির্বাণ লাভ করা যায়। নিত্য অনুধ্যান বা বস্তুচিন্তার ফলে মনের মধ্যে উদ্দীপিত হয় শক্তি। এই শক্তি কাম্যবস্তু লাভের পথে মনকে ধাবিত করে। বস্তু-চিন্তা বা বিষয়-চিন্তা বা একাগ্রমনে ধ্যান করিলে উহা অনায়াসলভ্য হইয়া উঠে; মানসিক শক্তি ভবিষ্যতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে বলিয়া, অনুরূপ চিন্তা সাধনের সম্ভাবনা করিয়া দেয় মানবজীবনকে। ধৈর্য বা তিতিক্ষা মনকে সুদৃঢ় করিয়া তোলে, গভীর বিশ্বাস ধ্যানভঙ্গ হইতে দেয় না, বরং পিপাসিত অন্তর ধ্যানগর্ভে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে সাহায্য করে। দৃঢ় প্রত্যয় ধৈর্য প্রসব করে বলিয়া ইহার মূল্য ও ধ্যানের বা ধৈর্যের ক্ষেত্রে নিতান্ত স্বল্প নহে। তৃতীয়টি, প্রক্রিয়াবিশেষ অর্থাৎ উপবাস করিলে দেহ ক্ষীণ হইতে পারে কিন্তু মানসিক শক্তি ইহা দ্বারা বিবর্ধিত হইয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্রেও উপবাস-পদ্ধতি বিদ্যমান; ব্রত-ব্রত, পূজা-পার্বণ, ধ্যান-ধারণায়ও প্রয়োজন উপবাসের। ইহা মনঃ-সংযোগ আনয়ন করে, সংযম-তিতিক্ষা পরিপুষ্ট হয়। ভক্তি ও একাগ্রতা পরিপোষণে ইহার মূল্য অনির্বচনীয়।

বৌদ্ধ দর্শন বা ধর্মানুষ্ঠানে কৃচ্ছ্রসাধন বা আত্মনিগ্রহ প্রথম সোপান। ইহা ধর্মসাধনার প্রধান অঙ্গ; মানসিক শক্তি বৃদ্ধি, আত্মকেন্দ্রিক ধ্যান, মনোনিবেশ অভ্যাস ও চিন্ময় হইবার কার্যে সাফল্য প্রাপ্তি বিষয়ে ইহার অবদান অভাবনীয়।

উপনিষদের একটি শ্লোকেও পরিদৃষ্ট হয়: শুচি-শুভ্র মন একবার আত্মায় ডুবিয়া যাইলে মহামৌনতার মধ্যে যে অপূর্ব আনন্দ পাওয়া যায় তাহা অতুলস্পর্শ, অপরিসীম। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন জীবন কেবল বেদনা, সংসার-দুঃখে পরিপূর্ণ। তবে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার পথ পাওয়া গিয়াছে, মুক্তির উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনার পথ, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। তাঁহার মতে এই জগৎ কার্যকারণের অনন্ত শৃঙ্খলাবিশেষ, ইহার ধারা-বাহিকতায় কোথাও যেন বিচ্ছেদ নাই। সংসারের প্রত্যেকটি বিষয়, জগতের প্রতি ঘটনা পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত। জীবন ও মৃত্যু, ছোট-বড় ঘটনা-সন্নিবেশ প্রবহমান নদীস্রোতের মত একটানা গতির প্রতিম, কাহারও পৃথক সত্তা নাই, সকলই যেন অবিচ্ছিন্ন, অবিরাম গতির চিত্র। বুদ্ধদেব স্বয়ং অন্তরবাসী আত্মার আজ্ঞাপালন করিয়াছিলেন, অনুসরণ করিয়াছিলেন বিবেকের নির্দেশ। স্বকীয় আত্মা-উদ্ভূত জ্ঞান ও বাণী সকলের

পথ নির্দেশ করিবে। ইহা হইবে সত্য, শাশ্বত, ভাস্বর; ইহার ওধু সে কারণ, প্রয়োজন কঠোর তপস্যা, নিবিড় সাধনা, অকুণ্ঠ অধ্যবসায় বা ধৈর্য। সহনশীলতা ইহার যেন বীজমন্ত্র।

হিন্দু দর্শনে আছে, পরম ব্রহ্মের অভিপ্রায় অনুসারেই সৃষ্টির বিচিত্র রূপ প্রতিফলিত। হিন্দু দর্শনশাস্ত্র মতে, পরম শিল্পী সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছানুসারে জন্মিয়াছে সবুজ, পীত প্রভৃতি বর্ণ, এবং মৌলিক পদার্থগুলির উদ্ভব হইয়াছে। বাহ্য বৈচিত্র্য মাঝে নিহিত অভিন্ন যোগসূত্র; এই বৈচিত্র্য সমাবেশের মধ্যে আছে একমাত্র সৃষ্টিকর্তার শাশ্বত অভিপ্রায়, তাঁহার অবিরল করুণা ও প্রেমময় অভিব্যক্তি।

পাশ্চাত্য দর্শনে খ্যাতনামা দেকার্ট (Descartes) সর্ব জিনিস বস্তুবাদ দ্বারা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সকল প্রকার দ্রব্যে নিহিত সংহত দ্রব্যসমষ্টি (homogeneous substance) ; সকল প্রকার মনের বিকশিত রূপেও নিহিত, সংহত ঐ প্রকার দ্রব্য-সমষ্টি homogeneous substance). তিনি বলিয়াছেন : Given an initial push by God and the rest of astronomicycologic and all non-mental processes and developments can be explained. জগৎ চালাইবার প্রাথমিক শক্তি ঈশ্বর প্রদান করিলেও বস্তুগত শক্তি প্রভাবে ইহা চলিতে থাকে। All the world and everybody is a machine ; but outside the world is God, and within the body is the spiritual soul—জগতের বাহিরে ঈশ্বর, শরীরের মধ্যে আত্মা।

নিত্য ও অনিত্য

পরমাণুপুঞ্জের সত্তা আছে, উহারা সৎস্বরূপ এবং নিত্য মৌলিক পদার্থ : উহাদের আর আদি কারণ নাই। বৈশেষিক শাস্ত্র অনুসারে পূর্বলিখিত নয়টি পদার্থ নিত্য, কিন্তু আধার তন্মধ্যে জল, বায়ু, মৃত্তিকা, তেজ এই চার প্রকার জড় পদার্থের পরমাণু কেবল নিত্য গুণাত্মক ; এবং পরমাণুর সমষ্টি স্বরূপ ঘট, তৈজসপত্র, পটাদি সাবয়ব দ্রব্যনিচয় সকলই অনিত্য। বৈশেষিক দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; তৃতীয়, চতুর্থ ও সপ্তম অধ্যায়ে ইহার বিশদ বিবৃতিই দেখা যায়।

পৃথিবী ও জাগতিক পদার্থসমূহ যে দুই প্রকার, নিত্য ও অনিত্য তাহা এই দর্শনে সুস্পষ্টরূপে কথিত। পৃথিবীর পরমাণু নিত্য এবং সেই পরমাণুর সমষ্টি স্বরূপ সাংসারিক যাবতীয় জিনিসপত্র অর্থাৎ সাবয়ব পার্থিব দ্রব্যসমূহ অনিত্য। জলও দুই প্রকার : নিত্য ও অনিত্য ; সেই প্রকার জলের পরমাণু নিত্য এবং তদীয় পরমাণুর সমষ্টিগত দ্ব্যণুকাদি সমস্ত সাবয়ব বস্তু অনিত্য। দুই পরমাণু একত্র সম্মিলিত হইলে তাহা দ্ব্যণুক নামে খ্যাত (দ্বি-অণু-সংবলিত)।

এই চিন্তাধারা অনুসরণ করিলে বলিতে হইবে তেজও দ্বিবিধ : নিত্য ও অনিত্য। তাহার পরমাণু নিত্য এবং ঐ পরমাণুর সমষ্টিগত সাবয়ব তেজগুলি সকলই অনিত্য। এই প্রকারে অনুধাবন করিতে হইবে, বায়ুও দুই শ্রেণীর : নিত্য এবং অনিত্য। তন্মধ্যে পবনের পরমাণুর নিত্য এবং ঐ পরমাণুর সমষ্টিগত জড়পদার্থনিচয়—সমুদয়ই অনিত্য। এই

সকল দৃষ্টান্ত ও চিন্তাপ্রসূত ধারণা বা যুক্তি এবং প্রতিপাদক বিষয়গুলি সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীর ভাষা পরিচ্ছেদ হইতে সঙ্কলিত।

কণাদ মুনি মনকেও সূক্ষ্ম পরমাণু বিশেষ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। মহর্ষির মতে সমুদয় জগৎ ও জাগতিক পদার্থ পরমাণুপুঞ্জে সংগঠিত। পরমাণু-পরিচয় পূর্বে দেওয়া হইয়াছে, ইহা নিত্য ও মৌলিক পদার্থ, সর্বদাই নিত্য, ইহাকে কেহ সৃষ্টি করে নাই। ইহা মূল পদার্থ বলিয়া কোন কিছু কর্তৃক সৃষ্ট নহে, ইহার মূল উপাদান নাই, আদি কারণও নাই।

পরমাণু সংযোগে সমবেত শক্তিতে যাবতীয় জড়পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, প্রত্যক্ষ-গোচর সকল দ্রব্য বিষয়ে ইহা প্রযোজ্য। বৃক্ষ-লতা, পর্বত-তটিনী, মেঘ-বৃষ্টি, ঘট-পট, কুণ্ডল-কটাহ প্রভৃতি বস্তু সমুচ্চয়ের আকার দৃষ্টে পরস্পরের পার্থক্য বোধগম্য হয়, পরস্পর ভেদ ভিন্ন তাহার প্রতীতি জন্মায়। শক্তির প্রকাশ অনেক প্রকারে ঘটিয়া থাকে, সংহতি শক্তির গুণ অপরূপ, ইহা প্রভেদ বা পার্থক্য-বোধের হেতু, ইহা আকার-গত পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া থাকে। পরমাণু-বিন্যাস বা সংহতির বিভিন্নতা রূপভেদের কারণ।

তবে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, পরমাণুর আকার চর্মচক্ষুর গোচরীভূত নহে বলিয়া মহর্ষি কণাদ ভিন্ন উপায়ে বুঝাইয়াছেন,—কিরূপে জল, বায়ু, মৃত্তিকাদি বিভিন্ন বস্তুর পরমাণু বিভিন্ন প্রকার বলিয়া নিশ্চয়তা লাভ করিয়াছে। তাঁহার সূচ্যগ্র বুদ্ধিতে আগত হইল এই নীতি—বিশেষ বিশেষ প্রকার পরমাণুতে "বিশেষ" নামে একটি পদার্থ আছে, তাহারই শক্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরমাণু বিভিন্ন বলিয়া নিশ্চয় হয়। কণাদ ঋষির এই কল্পনা বা অনুমান সকল প্রশ্নের সমাধান করিল, সৃষ্টি-রহস্যের মীমাংসা করিয়া পদার্থ সৃষ্টির বিচারে বা জ্ঞান-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিল।

অভিযাত্রী ভারতবর্ষ

কবিশেখর ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ এম. এ., বি. এল., পিএইচ. ডি.

বর্তমানে গৃহসুখপ্রিয়তাই আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম বলিলেই চলে। আমরা বাহির বিশ্বে জয়োল্লাস বাহির হইতে পরাঙ্মুখ; কিন্তু এই জড় মনোভাব—এই কূর্ম মনোবৃত্তি আমাদের আর্য পিতামহদের ছিল না।

তাঁহারা নিজেদের আর্য বলিতেন। তাঁহারাই আর্য যাঁহারা চলিষ্ণু। ঋ ধাতুর উপর ণ্যৎ প্রত্যয় করিয়া আর্য শব্দ ব্যুৎপন্ন, ইহার ধাতুগত অর্থ সর্বত্র গমনকারী। আমাদিগকে পুনরায় আর্য হইতে হইবে, আর্য সংস্কার মানিতে হইবে, আর্য আচার গ্রহণ করিতে হইবে।

আমাদের দেবতা ও নেতা ইন্দ্রদেব বলিয়াছেন :

অহং ভূমিমদদামার্য্যায়
অহং বৃষ্টিং দাশুষে মর্ত্যায়।

আমি আর্যগণকে দিয়াছি এই বিশাল পৃথিবী—মর্ত্য তারা যখন শ্রদ্ধায় ও ভক্তির অঞ্জলি আনে, তখন তাদের আমি দেই করুণার অমৃতধারা, দেই শস্যদায়িনী বৃষ্টি, দেই

জ্ঞানের ও আলোকের অপূর্ব কৃষ্টি। আমরা ঈশ্বরপুত্র, আমরা অমৃতের সন্তান। সেই পরম-প্রিয় বিধাতা আমাদের দিয়াছেন উর্বী ধরণী—আমরা কি ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন নীড়ে রহিব? না, না আমরা অভিযাত্রী সৈনিক—আমরা বাহির হইব—ধরিত্রীর সুষমা ভাণ্ডার পরিপূর্ণ আনন্দে সম্ভোগ করিবার জন্য আমরা চিরযাত্রী।

আমাদের পিতামহেরা পরমানন্দে এই বিশ্বজগৎকে উপলব্ধি করিতে চাহিতেন। তাই তাঁহারা প্রার্থনা করিতেন :

চক্ষুর্নো দেবঃ সবিতা চক্ষুর্ন উত পর্বতঃ। চক্ষুর্ধাতা দধাতু নঃ॥ ১০।১৫৮।৩
চক্ষুর্নো ধেহি চক্ষুষে চক্ষুবিখ্যৈ তনূভ্যঃ। সং চেদং বি চ পশ্যেম॥ ৭
সুসংদৃশং ত্বা বয়ং প্রতি পশ্যেম সূর্য। বি পশ্যেম নৃচক্ষসঃ॥ ৫

"দেবচক্ষু জ্যোতির্ময় আলোর দেবতা সবিতা, তিনি আমাদের দৃষ্টি উন্মোচিত করুন—বনরাজি নীল সুন্দর পর্বতও আমাদিগকে অভিরাম দৃষ্টি প্রদান করুন। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এই চমৎকার বিশ্ব—তিনি আমাদের বিশ্বসম্ভোগের জন্য দৃষ্টি দিন।"

আমাদের যে মানুষী চক্ষু সেই চক্ষুতে তারা চোখের মত চোখ দিল—কিন্তু দুটি চোখ ত যথেষ্ট নয়—অসীম বিশ্বজগৎ—তাকে জানিতে ও চিনিতে হইলে অঙ্গে অঙ্গে চক্ষু চাই—হে দেবতা আমার সর্বাঙ্গে তুমি চোখ দাও—আমি এই পৃথিবীকে পরম তৃপ্তিতে দেখব—দেখব সমন্বয় করে, দেখব বিশ্লেষণ করে। হে আদিত্য, আলোক ও প্রজ্ঞার হে দেবতা! তুমি নয়ন-মনোহর—তোমার বহু বিচিত্র রূপ আমরা দেখব; আমাদের এই যে মানুষের চোখ, এই চোখেই তোমার বিকৃতি ও মাধুর্য দেখব।

পৃথিবীর এই অনন্ত প্রীতি, চিনিবার ও জানিবার জন্য এই অদম্য আগ্রহ, এই সদাজাগ্রত কৌতূহল, এই অনিবার্য ঔৎসুক্য, বৃহতের প্রতি এই তীব্র পিপাসা আমাদের শোণিতে আবার জাগুক। নবীন উদ্দীপনায় আমরা কেবল দেখিতে শিখি—দুই চোখ খুলিয়া, দুটি নয়ন মেলিয়া এই মহাসুন্দর জগৎকে যেন মহিমাময় করিয়া দেখিতে শিখি।

বশিষ্ঠ ঋষির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আজ আবার প্রার্থনা করি :

অস্মে ইন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্যমা
দ্যুম্নং যচ্ছন্তু মহি শর্ম সপ্রথঃ।
অবন্ত্রং জ্যোতিরদিতের্ন তাবৃধো
দেবস্য শ্লোকং সবিতুর্মনামহে॥ ৬-৭৮২-১০

ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অর্যমা—দেবদেব তাঁরা আমাদের দিন বিপুল কীর্তি, বহুধাবিস্তৃত নির্ভর আশ্রয় দিন—আমরা দিক-দিগন্তরে নির্ভর বিশ্বাসে আত্মপ্রতিষ্ঠা যেন লাভ করি। পরমা প্রকৃতি অদিতি যিনি তাঁহার জ্যোতি আমাদিগকে জ্যোতির্ময় করুক, সেই নির্মল জ্যোতির প্রসাদে আমরা যেন প্রসন্ন হই। যিনি পরম জগতকে বর্ধন করেন সেই দেব সবিতার পুণ্য শ্লোক যেন আমরা প্রতিদিন মনন করি।

বৈরাগ্যের ভস্মাবি নয়—আমাদের আসুক কর্মে অবিচল প্রীতি—আমরা যেন উদ্যত রহি, নিরলস রহি এবং অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায়ে যেন জীবনকে পুষ্পিত ও ফলবন্ত করিয়া তুলি।

ইচ্ছন্তি দেবাঃ সুন্বন্তং
ন স্বপ্নায় স্পৃহয়ন্তি।
যন্তি প্রমাদমতন্দ্রাঃ॥

দেবতারা কর্মীকে ভালবাসেন। যে যজ্ঞের আলোকে জীবনকে প্রসারিত করে, সেই ব্যক্তিই দেবগণের প্রিয়। দেবতারা স্বপ্নালুকে পছন্দ করেন না—যাহারা প্রমাদে জীবন যাপন করে দেবতারা তাহাদের শাস্তি দেন।

দেবতারা ঘুমান না—রাত্রিদিন তাঁহারা কাজ করিয়াই চলিয়াছেন—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ইহা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া মানুষকে কেবলই চলিতে বলিয়াছেন।

"সূর্য্যস্য পশ্য শ্রমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরংশ্চরৈবেতি।"

আকাশে সূর্যের কর্ম ও শ্রম দেখ, সূর্য কখনও নিমেষের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করেন না—তাঁহারই মত শুধু চল, চল। চলাই জীবনের সার—গতি-প্রগতিই আয়ু।

পৃথিবীর প্রগতিতে বহু বর্ষ আমরা কিছুই দান করি নাই—আমরা কেবল জড়ভরত হইয়া সুখস্বপ্ন দেখিয়াছি—সমৃদ্ধি আসে নাই জীবনে—আসে নাই প্রবৃদ্ধি। আজ সেই সুপ্তির অবসান হোক। আমরা অগ্রসর হইব—নব নবোন্মেষশালিনী প্রতিভায় প্রদীপ্ত হইয়া জীবনকে সার্থক ও পরিপূর্ণ করিয়া তুলিব।

ত্বাং হি সত্যমদ্রিবো
বিপ্র দাতার মিষাম্।
বিপ্র দাতারং রয়ীনাম্॥

বন্ধুর দুর্গম পথে হে পরমাত্মা! আমরা জানিব তুমিই বজ্রধর—তুমি অন্যায় ও পাপকে শাসন কর—আমরা বুঝিব তুমি সত্য—তুমি আমাদের সমস্ত ইষ্টদাতা—তুমি পার্থিব এবং অপার্থিব সকল সম্পদই আমাদের জন্য বহন কর।

প্রেহ্যভীহি ধৃষ্ণুহি
ন তে বজ্র নি যংসতে।
ইন্দ্র নৃম্নং হি তে শবো
হনো বৃত্রং জয়া অপো।
যচ্ছ্রুধি স্বরাজ্যম্॥

অগ্রসর হও, বীরবিক্রমে অভীঃ হও এবং যুদ্ধ কর। হে বীর, তোমার কল্যাণের ও ন্যায়ের বজ্র কখনও পরাভূত হয় না, হে অপরাজেয়! বীর্যই তোমার শক্তি, পাপকে জয় কর, সৌভাগ্য অর্জন কর এবং আপন স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা কর। মন্ত্রটি ইন্দ্রের স্তুতি, কিন্তু তাহা ইন্দ্রোপাসক বীরের প্রতিও প্রযোজ্য, ভারত আবার বেদপন্থী হউক। পৌরুষের প্রভায় স্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করুক। ঋত ও সত্যের যে বীর্য তাহাই বীরের কাম্য। এই স্বরাজ্য স্থাপনের অভিলাষ আজ আমাদের যাত্রাপথের পাথেয় হউক।

গতি ও বীর্য কেন্দ্রীভূত হয় চরিত্রে। চরিত্র না থাকিলে বল ও বৃদ্ধি বন্ধ্যা হয়। ভারতবর্ষ আজ দশ বৎসর স্বাধীন হইয়াছে, কিন্তু আস্ফালন ছাড়া আমাদের অভ্যুদয় সামান্যই

হইয়াছে। শত শতাব্দীর পরাধীনতায় যাহাদের মূক ও মূঢ় করিয়া রাখিয়াছিল, আজিও তাহারা মূঢ় ও মূক। প্রাচুর্য্যের কথা স্বপ্নই—চারিদিকে কেবল দুর্নীতি ও কলঙ্ক। আমাদের এই পরাজয়ের কারণ আমাদের চারিত্রিক দুর্বলতা। সকল পরিকল্পনাই হীন চরিত্রের স্পর্শে কলুষিত ও বিকল হইয়া যাইতেছে। তাই আজ সেদিনের মত প্রার্থনা-প্রয়োজন :

পরি মামে দুশ্চরিতাদ্ বাধস্বা
মা সুচরিতে ভজ।
উদ্ আয়ুষা স্বায়ুষোদস্থাম্
অমৃতা অনু॥

হে পরমেশ! দুশ্চরিত্রের কাজ করিতে আমায় বাধা দাও। সুচরিত যাহা, তাহাই যেন নিয়ত ভজনা করি। আয়ুর সহিত আমার বিবর্দ্ধন হউক, আমি সত্যজীবনে ও পবিত্র-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি—অমৃতময় দেবজীবনের অনুকরণ করিয়া আমি ক্ষেম ও আনন্দে উল্লসিত ও উদ্ভিত্তিত হইয়াছি।

দেশে ফিরুক এই চরিত্র-দীপ্তি। যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহাদের আচরণই মানুষকে উন্নত করে। আমাদের দেশনায়কগণের আচরণে চরিত্রের এই বজ্রকাঠিন্য প্রায়ই দেখা যাইতেছে না। আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়। এইখানেই আমরা দুর্বল হইয়া পড়িতেছি। স্বজনতোষণবুদ্ধি অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতেছে—লোভ হীন করিতেছে—সেবার নামে আধিপত্য প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। গণকে আজ জাগাইতে হইবে; তাহারা অধিকাংশই অন্ধ সেই অন্ধজনে আলো দিতে হইবে। গণ-জাগরণের এই প্রচেষ্টায় আমাদের প্রত্যেককে প্রেমের প্রসার করিতে হইবে—আত্মিকের বিস্তার করিতে হইবে—আত্মীয়তার বৃদ্ধি করিতে হইবে। ঋজু পন্থার অনুসরণ করিতে হইবে—সূর্য ও চন্দ্র যেমন দুর্বার গতিতে আপন কক্ষ-পথে বিচরণ করে, তেমনভাবে আমাদিগকে সত্য ও সাম্যের পথে যাত্রা করিতে হইবে।

আজ তাই তপস্বী হইয়া আমাদের চিরন্তন সংস্কৃতির পটভূমিকায় নবব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। সেই ব্রত অনলস কর্মের—সেই যজ্ঞ সর্বোদয়ের—সকলের পরিপূর্ণ বিকাশের—বিশ্বতো-মুখী পরিপুষ্টি ও বিবর্দ্ধনের অনুষ্ঠান। সেই মহাভারতের অভিযাত্রী সৈনিকদল! তোমাদিগকে আহ্বান করি—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত—প্রাপ্য বরান্নিবোধত। ওঠো—জাগো—তোমাদের প্রত্যেকের প্রাপ্য যে প্রাচুর্য ও পরিপূর্ণতা তাহা গ্রহণ করো।

বিশ্বজগতের বিচিত্র মানুষের মিলন-লগ্ন আজ সমুপস্থিত। সেই মহোৎসবে আমরা অগ্রসর হইয়া চলিব—এস হে বন্ধু, দীক্ষিত হও। সত্যের জ্যোতিতে ঋতের প্রভায়—প্রজ্ঞার জৌলুসে আজ আমরা সবাই অভিষিক্ত হবো। আজ আসিবে পরমা শান্তি।

নিঃসীম নক্ষত্রলোকের অসীম পারাবার হইতে নামিবে শান্তির সুরধুনী, পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজিবে শান্তির মধুর সঙ্গীত—ওষধি ও বনস্পতি আনিবে সুধাধারা—কর্ম হইবে পুণ্যের প্রতিষ্ঠা—প্রচেষ্টা হইবে আনন্দের উদয়ন—খণ্ড জীবন হইবে অখণ্ড অমৃতের ধ্রুব আস্বাদন।

ঐ মহৎ পরিণতির কামনাই আজ আমাদের লক্ষ্য হউক—ইহার সাধনাই আমাদের ব্রত হউক।

অভেদানন্দ-স্মৃতিতীর্থে

শ্রীপ্রফুল্লকুমার লাহিড়ী

অধ্যাত্ম-জীবন তব অভিরাম, অভিনব
ব্রহ্মেতে বিহার তব শাশ্বত, সতত।
ব্রহ্মলীন তব স্থিতি, ব্রহ্ম-উপাসনা নিতি
ব্রহ্মভাবে তুমি দেব নিয়ত নিরত।
সুশান্ত তোমার দৃষ্টি, বিধির বিশেষ সৃষ্টি,
জগৎ গুরুর যোগ্য আধিকার জানি।
সুন্দর মূরতি মাঝে ধ্যান-মৌন ভাব রাজে
আত্মারামময় ছন্দে অধ্যাত্মের বাণী।
জীবন বেদের তত্ত্ব, সনাতন, মহাসত্য
জানি' জানাইলে দেশে দেশে জনে জনে।
বেদান্তের মর্মবাণী ভারত হইতে আনি'
বিদেশীরে বুঝাইলে আগ্রহে, যতনে।
বিশ্বের মানব ধর্ম, কিবা সে, কি তার মর্ম
যতনে করিলে তা'র তথ্য আহরণ।
তোমার প্রতিভাভায় পূর্ণ আধ্যাত্মিকতায়
বেদান্তের হল যেন নব জাগরণ।
মানুষের মন-দেহ ব্যাধিময় হেরি সেহ
সমাজ দেহেও হেরি ব্যাধির সঞ্চার।
সুবিজ্ঞ ভিষক্ মত, কারণ নির্ণিলে যত
ব্যাধির ঔষধি তথা করিলে বিচার।
জগতের মাঝখানে নরনারী নানা স্থানে
চেয়ে আছে তোমা পানে অবাক্ বিস্ময়ে।
মানবের তরে তব অবদান নব নব
অগণ্য মানব লভে শ্রদ্ধা বিনিময়ে।
বিংশ শতাব্দের মাঝে সংঘাতের শঙ্খ বাজে
বিষাক্ত বাতাস ভরা শিথিল গগনে।
তবু মানি মনে প্রাণে, তব বাণী শুনি কাণে
মাভৈঃ মাভৈঃ জানি হিয়ার গহনে।

স্বামী অভেদানন্দের প্রথম লণ্ডন যাত্রা

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ মিঃ ই. টি. ষ্টার্ডিকে লিখিয়াছিলেন ১৮ই আগষ্ট ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে—"যখন মদীয় আচার্যদেব দেহত্যাগ করিলেন তখন আমরা বারজন অজ্ঞাত অখ্যাত সম্পর্কহীন যুবক ছিলাম। আর বহুসংখ্যক শক্তিশালী সঙ্ঘ আমাদিগকে পিষিয়া মারিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের নিকট হইতে আমরা এক অদ্ভুত ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছিলাম—কেবল বাক্‌সর্বস্ব না হইয়া স্বার্থ জীবন যাপনের জন্য একটা ঐকান্তিক ইচ্ছা ও বিরামহীন সাধনার অনুপ্রেরণা তাঁহার নিকট আমরা লাভ করিয়াছিলাম। আর আজ সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহাকে জানে এবং শ্রদ্ধার সহিত মাথা নত করে। তৎপ্রচারিত সত্যসমূহ আজ দাবানলের মত দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। দশ বৎসর পূর্বে তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে একশত ব্যক্তি আমি একত্র করিতে পারি নাই আর গত বৎসর পঞ্চাশ হাজার লোক তাঁহার জন্মতিথিতে সমবেত হইয়াছিল।" এই বারজনের মধ্যে পূজ্যপাদ অভেদানন্দ স্বামী ছিলেন অন্যতম।

স্বামী বিবেকানন্দ ষ্টার্ডি সাহেবকে উক্ত পত্রে আরও লিখিয়াছিলেন—"কেবল সংখ্যাধিক্যেই কোন মহৎকার্য সম্পন্ন হয় না—অর্থ, ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য কিংবা বাক্‌চাতুরী ইহাদের কোনটিরই বিশেষ কোন মূল্য নাই। পবিত্রতা, খাঁটি জীবন এবং প্রত্যক্ষানুভূতি-সম্পন্ন মহাপ্রাণ ব্যক্তিরাই জগতে সমুদয় কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যদি প্রত্যেক দেশে এইরূপ দশ বারটি মাত্র সিংহবীর্যসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন—যাঁহারা নিজেদের সমুদয় মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন, যাঁহারা অসীমের স্পর্শ লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের সমগ্র চিত্ত ব্রহ্মানুধ্যানে নিমগ্ন; অর্থ, যশঃ ও ক্ষমতার স্পৃহামাত্র হীন—তবে এই কয়েক ব্যক্তি সমগ্র জগৎ তোলপাড় করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট।"

স্বামিজী যে আদর্শ জীবনের কথা বলিয়াছিলেন—তাহার সজীব বিগ্রহ ছিলেন—তিনি এবং তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ—শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বত্যাগী পার্ষদ সন্তানেরা। স্বামী অভেদানন্দ একটি খাঁটি পবিত্র জীবন প্রত্যক্ষানুভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ, ত্যাগ ও তপস্যার সমুজ্জ্বল মূর্তি। তাঁহার স্বভাবে ছিল সিংহবীর্য অসীম তেজ, অপূর্ব তেজস্বিতা, অদম্য উদ্যম, অসাধারণ অধ্যবসায়, স্থিরবুদ্ধি চরিত্রের দৃঢ়তা আর হৃদয়ের উদারতা আর প্রেমের উৎস।

ষ্টার্ডি সাহেব পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দকে দেখিয়া আকৃষ্ট হন। ইনি তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। বিবেকানন্দ ষ্টার্ডির বাড়ী ইংলণ্ড হইতে অভেদানন্দকে লিখিয়াছিলেন "মিঃ ষ্টার্ডি তারক দাদার (শিবানন্দের) পরিচিত। তিনিই আমাকে এখানে আনাইয়াছেন এবং আমরা উভয়ে ইংলণ্ডে হাজার করিবার চেষ্টায় আছি। এবার আমি নভেম্বর মাসে পুনরায় আমেরিকায় যাত্রা করিব। অতএব এখানে একজন উত্তম সংস্কৃত ও ইংরেজী, বিশেষতঃ ইংরেজী-জানা লোকের আবশ্যক—শশী বা তুমি বা সারদা। তাহার মধ্যে তোমার শরীর

যদি একদম আরোগ্য হইয়া থাকে ত বড়ই ভাল। তুমি আসিবে, নতুবা শরৎকে পাঠাইবে। কাজ এই যে, আমি যে সকল চেলা-পত্র এখানে রাখিয়া যাইব, তাহাদের শিক্ষা দেওয়া ও বেদান্তাদি পড়ান এবং একটু আধটু ইংরেজীতে তর্জমা করা, মধ্যে মধ্যে লেক্‌চার-পত্র দেওয়া।"

উক্ত পত্রে স্বামিজী আরও লিখিয়াছিলেন যে, "এই পত্রে এক চেক পাঠাইলাম, তাহাতে কাপড়-চোপড় কিনিবে (অর্থাৎ যে আসিবে)। চেক মহেন্দ্রবাবু মাষ্টার মহাশয়ের নামে পাঠাইলাম। গঙ্গাধরের টিবেটি চোগা মঠে আছে; ঐ চংয়ের এক চোগা গেরুয়া রংয়ের করাইয়া লইবে। কলারটা যেন কিছু উপরে হয়, অর্থাৎ গলা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে।...সকলের আগে একটা খুব গরম ওভারকোট; শীত বড়ই প্রবল। আরামের উপর ওভারকোট গায়ে না হইলে বড় কষ্ট হইবে।...সেকেণ্ড ক্লাসের টিকেট পাঠাইতেছি অর্থাৎ ফার্ষ্ট ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাসে বড় বিশেষ নাই।...যদি শশীর আসা স্থির হয়, তাহা হইলে পূর্ব হইতে পার্সারকে বলিয়া নিরামিষ খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া লইবে।"

বাস্তবিকই স্বামিজী একজনকে যাইতে বলিয়াছেন। পূর্বে পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দেরই যাওয়া স্থির হইয়াছিল কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহার শরীরে চর্মরোগের প্রকোপ হয়। তাই ডাক্তারেরা শীতপ্রধান দেশে তাঁহার যাওয়া নিষেধ করেন। আমি জানি, শশী মহারাজ রাধাবাজারে পোষাকের মাপ দিয়া আসিয়াছিলেন, পরে ডাক্তার নিষেধ করায় তাহা বাতিল করা হইল।

এদিকে স্বামী সারদানন্দ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে স্বামী বিবেকানন্দের পত্র পাইয়া লণ্ডন যাত্রা করেন এবং তিনি স্বামিজীর নির্দেশমত মিঃ হ্যাডির বাড়ীতেই উঠিয়াছিলেন। তিনি ১লা এপ্রেল ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে পৌঁছিলেন। ইহার অনতিকাল পরেই স্বামিজী লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামিজী হ্যাডি সাহেবের ঘরে স্বামী সারদানন্দের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া নিজে মিস মুলারের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামিজী ইংলণ্ড হইতে লিখিতেছেন—"শরতের (স্বামী সারদানন্দ) মুখে সব শুনিলাম।" জুন মাসের শেষভাগে স্বামী সারদানন্দ বেদান্ত সমিতির কার্যভার লইতে মার্কিন যাত্রা করেন।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ ২৪শে জুন স্বামিজী পূজ্যপাদ রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিতেছেন—"শরৎ কাল আমেরিকায় চল্লো।...সম্প্রতি কালীকে (স্বামী অভেদানন্দকে) আনাব, তাকে তৈয়ার থাকতে বলো। পত্রপাঠ যেন চলে আসে। দুই চারি দিনের মধ্যে তার জন্য টাকা পাঠাব ও কাপড়-চোপড় প্রভৃতি যা যা দরকার সমস্ত লিখে দিব। সেই মত সমস্ত ঠিক করা হয় যেন।" ইহার কয়েকদিন পরেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে স্বামিজী ৩রা জুলাই ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিতেছেন "প্রিয় শশী, এই পত্রপাঠ কালীকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিবে। পূর্বের পত্রে সংবাদ পাইয়াছ। কলিকাতার মেসার্স গ্রিণ্ডলে কোং এর নিকট তাহার 2nd class passage (দ্বিতীয় শ্রেণীর পথের খরচ) গিয়াছে ও কাপড়-চোপড় কিনিতে যাহা কিছু লাগে তাহাও গিয়াছে। কাপড়-চোপড় অধিক কিছু আবশ্যক নাই।...

"কালীকে কতকগুলি বই আনিতে হবে। আমার কাছে কেবল ঋগ্বেদ সংহিতা

আছে। কালীকে যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্বন সংহিতা আর শতপথাদি যতগুলি ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় ও কতকগুলো সূত্র ও যাস্কের নিরুক্ত যদি পায় সঙ্গেই করে যেন আনে। অর্থাৎ ঐ বইগুলি আমার চাই।...ঐ বই একটা কাঠের বাক্সয় পুরে আনলেই হবে।

গড়িমসি যেমন শরতের (স্বামী সারদানন্দ) বেলায় হয়েছিল—তা না হয়। পত্রপাঠ চলে আসবে। শরৎ আমেরিকায় চলে গেছে। তার এখানে কোন কাজ ছিল না—অর্থাৎ ছমাস বাদে এল, তখন আমি এখানে। সে প্রকার না হয় যেন। চিঠি হারিয়ে যেন না যায়—শরতের বেলার মত। তৎপর পাঠিয়ে দিবে।"

স্বামিজী ইংলণ্ডে স্বামী অভেদানন্দকে কাজের ভার দিবার জন্য এই তারিখ-পত্র দিয়াছিলেন। ষ্টার্ডির বাড়ী হইতে স্বামিজী অভেদানন্দজীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পূর্বে কিছু উদ্ধৃত করা হইয়াছে। স্বামিজী তাঁহার প্রেমাস্পদ গুরুভাই অভেদানন্দকে লিখিয়াছিলেন যে, বোম্বে যাইয়া মেসার্স বিং কিং এণ্ড কোং ফোর্ট বোম্বে অফিসে গিয়া বলিবে যে, আমি ষ্টার্ডি সাহেবের লোক, তাহা হইলে তাহারা তোমাকে এক টিকিট দিবে ইংলণ্ড পর্যন্ত। এখান হইতে এক চিঠি উক্ত কোম্পানীর উপর যাইতেছে। খেতড়ির রাজাকে এক চিঠি লিখিতেছি যে, তাঁহার বোম্বের এজেন্ট যেন তোমাকে দেখিয়া শুনিয়া রুক্ত করিয়া দেয়। যদি এই ১৫০৲ টাকায় কাপড়-চোপড় না হয়, রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) যেন তোমায় বাকী টাকা দেয়। আমি পরে তাহাকে পাঠাইয়া দিব। তাহা ছাড়া হাত খরচের জন্য ৫০৲ টাকা রাখিবে—রাখালকে দিতে বলিবে। চুনীবাবুর জন্য যে টাকা পাঠাইয়াছি, তাহার খবর আজও পাই নাই। পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। মহেন্দ্রবাবুকে বলিবে তিনি আমার কলিকাতার এজেন্ট। তিনি যেন পত্রপাঠ মিঃ ষ্টার্ডিকে এক চিঠি লেখেন যে, যা কিছু কলিকাতা সম্বন্ধে লেখাপড়া business ইত্যাদি আমাদের করিতে হইবে, তাহা তিনি করিতে রাজী আছেন। অর্থাৎ মিঃ ষ্টার্ডি আমার ইংলণ্ডের সেক্রেটারী, মহেন্দ্রবাবু কলিকাতার, আলাসিঙ্গা মাদ্রাজের ইত্যাদি ইত্যাদি। মাদ্রাজে এ খবর পাঠাইবে। সকলে উঠিয়া পড়িয়া না লাগিলে কি কাজ হয়? 'উত্তোলিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ' ইত্যাদি। পেছু দেখতে হবে না—forward (এগিয়ে চল)। অনন্তবীর্য, অনন্ত উৎসাহ, অনন্ত সাহস ও অনন্ত ধৈর্য চাই, তবেই মহাকার্য সাধন হবে। দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দিতে হবে।

আর যেদিন ষ্টীমার ঠিক হবে, তৎক্ষণাৎ মিঃ ষ্টার্ডিকে এক পত্র লিখিবে যে, "অমুক ষ্টীমারে আমি আসিতেছি।" নতুবা লণ্ডনে পৌঁছিয়া গোলমাল হইয়া না যাও। যে ষ্টীমার একদম লণ্ডনে আসে তাহাই লইবে; কারণ তাহাতে যদিও দু'চার দিন অধিক লাগে, পরন্তু ভাড়া কম লাগে। এখন আমাদের অধিক পয়সাও নাই। কালে দলে দলে চতুর্দিকে পাঠাইব।" পুনশ্চ দিয়া স্বামিজী উক্ত পত্রে লিখিতেছেন "পত্রপাঠ খেতড়ির রাজাকে লিখিবে যে তুমি বোম্বে যাইতেছ ইত্যাদি এবং তাঁহার লোক যেন তোমাকে জাহাজে চড়াইয়া দেয়। এই ঠিকানা একটা পকেট বুকে লিখিয়া সঙ্গে রাখিবে—গোল না হয়।" চিঠির উপর স্বামিজী Mr Sturdyর ঠিকানা দিয়াছেন—C/o. E. T. Sturdy, High View, Keversham. Reading, England. স্বামিজী শুধু অভেদানন্দজীকে বিস্তারিত চিঠি লিখিয়া ক্ষান্ত হন নাই।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে পত্রে লিখিলেন—"প্রিয় শশী, পূর্ব পত্রে যদি ভুল হইয়া থাকে, তবে এই পত্রে লিখি যে, কালী যে দিবস start (যাত্রা) করিবে সেদিন যেন কিংবা তার আগে E. T. Sturdy-কে চিঠি লিখে—যাহাতে সে যাইয়া তাহাকে জাহাজ হইতে লইয়া আইসে। এ লণ্ডন সহর মনুষ্যের জঙ্গল—দশ-পনরটি কলিকাতা একত্রে। অতএব ঐ প্রকার না করিলে গোলমাল হয়ে যাবে। আসতে দেরী যেন না হয়, পত্রপাঠ চলে আসতে বলবে। শরতের বেলার মত যেন না হয়। বাকী বুঝেসুঝে ঠিক করে নেবে।.....কালীকে যাহোক সত্বর পাঠাইবে। শরতের বেলার মত দেরী হয় ত কাহাকেও আসতে হবে না—ও রকম গড়িমসির বিকর্মার কাজ নয়: মহা রজোগুণের কাজ।"

এইরকম কড়া তাগিদে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ ও স্বামী অভেদানন্দ ইংলণ্ড-যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আগষ্টের মধ্যভাগেই তিনি S. S. Golkunda জাহাজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে লণ্ডনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রার পূর্বে তিনি গুরুভ্রাতাগণ সহ 'বলরাম মন্দির'-এ অবস্থান করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের যাত্রার কিছুক্ষণ পরে গিয়া শুনিলাম তাঁহারা আউটরামঘাটে চলিয়া গিয়াছেন। গুরুভ্রাতাদের লইয়া একটী গ্রুপ ফটো তোলা হইয়াছিল যাত্রার পূর্বে এবং সকলে সমবেত স্বরে 'জয় গুরুমহারাজজীকি জয়' ধ্বনি দিয়া অভেদানন্দ স্বামিজীকে জাহাজে তুলিয়া দিতে গেলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী নির্মলানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ ও অন্যান্য দুই একটী বাগবাজারের গৃহী ভক্ত তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া দিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন।

উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রবক্ষে স্বামী অভেদানন্দ শান্ত সহাস্যবদনে বিচিত্র সৌন্দর্য ও নানা দৃশ্য দেখিতে দেখিতে লণ্ডনাভিমুখে একাকী যাত্রা করিলেন। জাহাজে sea sickness-এ কয়েকদিন তিনি ভুগিয়াছিলেন—তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন স্বর্গত ব্যারিষ্টার W. C. Bannerji-র আত্মীয় কোন যুবক সন্ন্যাসী। জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া স্বামিজী কিম্বা ষ্টার্ডি কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। সঙ্গী যুবকটী তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন: "আপনি কোথায় যাবেন? তাড়াতাড়ি এখন গাড়ী ঠিক না করলে আপনাকে মুস্কিলে পড়তে হবে।" অভেদানন্দ বলিলেন, "স্বামী বিবেকানন্দের কাছে।" যুবকটী বলিলেন, "আপনি আমার সঙ্গে Mr. W. C. Bannerji-র বাড়ীতে চলুন। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই এসে থাকেন। তাঁদের বাড়ীতে স্বামী বিবেকানন্দের ঠিকানা পাওয়া যাবে।" অগত্যা স্বামী অভেদানন্দ সর্বপ্রথমে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে যুবকের সঙ্গে গেলেন। ব্যানার্জী সাহেব বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁহার স্ত্রী অভেদানন্দকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া স্বামিজীর ঠিকানা বলিয়া দিলেন—মিস মুলারের বাড়ী লণ্ডনের প্রান্তভাগে উইম্বলডনে। তিনি স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করিতে এত ব্যগ্র হইলেন যে, ব্যানার্জী-গৃহিণী জলযোগ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেও তাহা গ্রহণ না করিয়া চলিয়া গেলেন। মিস মুলারের বাড়ীতে পৌঁছিলে বৃদ্ধা তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সাদরে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া চলিলেন। জাহাজঘাটে ষ্টার্ডি ও স্বামিজীর সঙ্গে অভেদানন্দের দেখা হয় নাই শুনিয়া মিস মুলার আশ্চর্য হইলেন। যাহা হউক তাঁহার

ঘরের ভিতরে তিনি অভেদানন্দজীকে আহার করিতে দিলেন। আহারান্তে স্বামী অভেদানন্দ শীতে কাঁপিতেছিলেন বলিয়া মিস মূলার অগ্নিকুণ্ডের নিকট তাঁহাকে বসিতে বলিলেন।

এদিকে স্বামিজী ও জাস্টি সাহেব অভেদানন্দ স্বামীকে জাহাজঘাটে দেখিতে না পাইয়া প্রায় সন্ধ্যাকালে মিস মূলারের বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু এ কি! যাঁহাকে খোঁজ করিয়া তাঁহারা ঘুরিয়া হয়রান হইয়াছেন তিনি মিস মূলারের বাড়ীর অগ্নি-কুণ্ডের নিকট হইতে উঠিয়া স্বামিজীকে প্রণাম ও প্রেমালিঙ্গন করিতেছেন! অভেদানন্দ ভীড়ের চাপে কোথায় হারাইয়া গিয়াছেন—এই সংবাদ স্বামিজী মিস মূলারকে দিতে যাইতেছেন—এমন সময় মিস মূলার অভেদানন্দের সকল সংবাদ জানাইলেন। আজ বিশ্ব-বিজয়ী গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দকে পাইয়া অভেদানন্দের অপরিসীম আনন্দ—ভাষায় তাহার বর্ণনা হয় না। এই লণ্ডনে স্বামী অভেদানন্দ স্বামিজীর নির্দেশে বক্তৃতা করেন বেদান্ত সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায়; ইতিপূর্বে তিনি জীবনে মাতৃভাষাতেও বক্তৃতা করেন নাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অপার মহিমা তিনি উপলব্ধি করিলেন—মূকং করোতি বাচালং।

প্রার্থনা

শ্রীসুশীলকুমার ভট্টাচার্য

সংকটঘন পথে তোমার সংশয়ত্রাণ শংখ
বাজাও প্রভু, বাজাও হে,
দুষ্কর যত ব্রতে তোমার নির্ভয় মন্ত্রমন্ত্রক
বাজাও প্রভু, বাজাও হে।
শংকিত প্রাণে অংকিত করো সুন্দর তব মূর্তি,
নন্দিত কর ছন্দিত তানে চিত্তের পরিপূর্তি,
সন্তাপক্ষীণ তরে তোমার শান্তিশীতল অংক
সাজাও প্রভু, সাজাও হে।

বন্ধনভোর খণ্ডন কর মোক্ষদুয়ার খোলো
মহান্ প্রভু, মহান্ হে,
সত্যের বাণী বিশ্বের মাঝে বজ্রবীণায় বলো
মহান্ প্রভু, মহান্ হে।
নিদ্রিত আঁখি জাগ্রত কর গভীর জ্ঞানতূর্যে,
বিদ্বেষ-অমা সংহার কর উজ্জ্বল প্রেমসূর্যে,
অন্তর হ'তে আজি সকলের মিথ্যাকলুষপংক
ঘুচাও প্রভু, ঘুচাও হে।

"রাবণস্য বধার্থায়"

শ্রীযতীশচন্দ্র মিত্র

প্রথম দৃশ্য

[মনোরম শারদ-পরিবেশে—নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে দেববালিকা 'কল্পনা'র মর্ত্যে আবির্ভাব]

—গান—

দুর্গতি-হরা দুর্গা আসিবে, মাতরমহং বন্দে।
শুনি আবাহন আগমনী গান, দিকে দিকে মধুছন্দে।
শিউলী বকুল ছোঁয়ের বায়, ধরিবে লুটিবে মায়ের পা'য়,
পরিচয় পাই গন্ধে।
পুলকে চিত্ত দোলে দোলায়, বিশ্বজগত ভুল হ'য়ে যায়
ওগমগ মহানন্দে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[লঙ্কার সমুদ্রতীরে স্বহস্তনির্মিত দুর্গা-প্রতিমার সম্মুখে পূজার আয়োজনে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ]

রাম। শোন লক্ষ্মণ, রাবণের স্তুতিতে প্রসন্না হয়ে মহামায়া—কালী মূর্তিতে যুদ্ধরথে তাকে কোলে নিয়ে বসন্তে—দুরাচারের বধের বিষয়ে আমি বড় হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। দেবগণের অসীম করুণা! তাঁদের প্রতিনিধিরূপে পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং আমাদের এই দেবী-পূজার উপদেশ দিয়ে গেলেন।

লক্ষ্মণ। হাঁ দাদা, বৃদ্ধ পিতামহ কত কষ্ট করে, স্বর্গ থেকে এসে আমাদের সঙ্কট মোচনের উপায় জানিয়ে গেলেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠ্‌ছে। এবার সত্যই আমাদের কাজ উদ্ধার হবে, বিশ্বাস হয়।

রাম। আমি প্রাণে নূতন বল পেয়েছি।—কিন্তু ভাই, সব কিছু নির্ভর করে এই পূজার ওপর। আমরা ত পূজার ব্যাপারে,—বিশেষ, এই অকালের পূজায় একেবারে অনভিজ্ঞ। পিতামহর নির্দেশ ঠিক ঠিক পালিত হওয়া চাই।

লক্ষ্মণ। সে ত' নিশ্চয়।

রাম। তুমি আছ, হনুমান আছে—তোমরা লক্ষ্য রেখো,—আমি যেন কোন ভুল না করি। তোমরা আমায় সাহায্য করো'—

লক্ষ্মণ। তুমি নিশ্চিন্ত মনে পূজায় মনোযোগ রেখো; বাইরের সব আমরা দেখ্‌বো।

রাম। সে আমি জানি,—তবু বলছি। বড় কঠিন কাজ ত। গৌয়ার গোবিন্দ হনুমানকেও তুমি সাম্‌লিও। আমাদের ভাল করতে চেয়ে ও' একটা কিছু অনর্থ না ঘটিয়ে বসে।

লক্ষ্মণ। না, না, হনুমান পৌঁয়ার বটে, কিন্তু নির্বোধ নয়। এই যে নামি করতে করতেই এসে গেছে।

[প্রকাণ্ড এক কাঁদি কলা বহিয়া হনুমানের প্রবেশ]

বাপরে! অতবড় কলার কাঁদি কোথায় পেলে?

হনুমান। গাছে পেয়েছি, ঠাকুর! গাছ সুদ্ধ উপড়ে এনেছি,—ঐ দেখুন। (নেপথ্য প্রদর্শন)।

লক্ষ্মণ। বল কি! গাছ সুদ্ধ বয়ে আনলে?

হনুমান। কি আর করি! সঙ্গে কাটারী ছিল না, তাই গাছ ওপড়াতে হলো। ভেবেছিলাম, একটা রাক্ষস-টাক্ষস পেলে কাঁধে চাপিয়ে তাকে লেজে জড়িয়ে টেনে নিয়ে আসবো। তা রাক্ষস একটাও পেলাম না। লঙ্কায় আর ক'টা রাক্ষস আছে—ওরাই জানে। কলাগাছ আমিই বয়ে এনেছি। আর কি চাই? বলুন প্রভু।

রাম। না, হনুমান—আর কিছুর অভাব এখন দেখছিনে। তোমার যত্নে, পরিশ্রমে সবই ত' পেয়েছি। এবার তুমি বিশ্রাম কর।

হনুমান। আচ্ছা, আমি এখানেই আছি। আর যখন কিছু করতে হয়, বলবেন। লজ্জা করবেন না প্রভু।

তৃতীয় দৃশ্য

[ফুল তুলিয়া সাজিটি এক ফুলগাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখিয়া হনুমান একরাশ নারিকেলের পাতা লইয়া একটি ভেঁপু-বাঁশী নির্মাণে রত; মুখে গুণ গুণ করিয়া গাহিতেছিল]

—গান—

আমার প্রভু শ্রীরাম, আমার সীতা মাতা। ঠাকুর লছমণ আমার ভাওনা নাহিঁ॥

[ভেঁপু গড়ার পর উহা বাজাইয়া পরীক্ষা করা হইল,—বেশ বাজে। এবার হনুমান আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া তাহার প্রিয় গানটি জোরেই গাহিতে লাগিল]

চতুর্থ দৃশ্য

[৺দুর্গাপূজা-রত শ্রীরাম। ধূপ-দীপ, নৈবেদ্যাদি উপকরণ সজ্জিত আছে, একান্তে হনুমান—তাহার হাতে ভেঁপু। সম্মুখ-আঙিনায় নাচিতে নাচিতে গাহিতে 'কল্পনা'র আবির্ভাব]

—গান—

জানেরে,—
মহামায়া মা কত জাদু জানে রে!
শঙ্খের মঙ্গলস্বরে সকল শঙ্কা হরে,
ধূপের গন্ধে মন্দিরামোদিত, পদ্ম প্রদীপে দিগ্বিভাসিত;
আ মরি রে,—
করুণাময়ী মা যে কল্যাণী বেশে
হেসে হেসে অসুরেরে শূল হানে রে॥

[বালিকার অন্তর্ধান]

রাম। "জাগো মা জাগো,—রূপের ছটায় আমার পাতার কুটির আলো করে', আমার নিজের হাতে-গড়া এই মাটির মূর্তিতে তুমি জাগো! আমার পূজা গ্রহণ কর, আমায় দেখা দাও; আমি প্রাণের দুঃখ তোমার কাছে বল্‌বো।—কই মা, সাড়া কি দেবে না? অভাগা সন্তানকে দেখা কি দেবে না? আমি কি অপরাধ করেছি, মা।]

[লক্ষ্মণ প্রবেশ করিলেন]

লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ—তিন দিনের পূজা প্রায় শেষ হ'য়ে এলো; আমার প্রাণের ডাক—পাষাণী মায়ের কাণে পৌঁছল না, মা এলো না! বল ভাই, এখন আমি কি করবো? মায়ের—এই মাটির মূর্তির পায়ের কাছে মাথা খুঁড়ে' মরি?

লক্ষ্মণ। দাদা, মিত্র বিভীষণ বল্‌লেন, ভগবতী নীল পদ্ম বড় ভালবাসেন। সেই ফুলে পূজা কর্‌তে পার্‌লে হয়ত মা তুষ্ট হতেন।

রাম। নীল পদ্ম! কোথায় তা পাব?

লক্ষ্মণ। মিত্র বলেছেন—দেবীদহে সে ফুল আছে।

রাম। তবে ভাই, সে ফুল থাকা, না-থাকা সমান কথা। কোথায় বা দেবীদহ, কে বা ফুল আন্‌বে।

হনুমান। বাঃ রে, আমি তবে রয়েছি কেন?—আমার বড় দুঃখ হয় প্রভু, যে আপনি আমায় অকর্মা ভাবেন।

রাম। না না; তোমার মত কর্মবীর কে আছে! তুমি দেবীদহ চিন্‌বে না, এই ভেবেই বলিনি।

হনুমান। কোন্ জায়গা আমি না চিনি? আপনি একটু বসুন; আমি যাচ্ছি, দেবীদহের নীলপদ্ম নিয়ে আসছি। জয় রাম— [গমনোদ্যোগ]

লক্ষ্মণ। শোন হনুমান, ঐ ফুল কিন্তু ১০৮টি চাই—

হনুমান। বেশ, গণে গণে তা' আন্‌বো। জয় রাম, জয় রাম— [প্রস্থান]

লক্ষ্মণ। হনুমানের ঋণ আমরা জীবনে শোধ কর্‌তে পারবো না, দাদা—

রাম। ঠিক কথাই বলেছ। আমার সঙ্গে ও'ও উপোসে থাকে, তবু কোন কাজে আলস্য নেই। ফলমূল চাল কলা এত ভালবাসে, অথচ এই সব প্রসাদগুলো পর্যন্ত অপরকে দিয়ে দেয়; নিজে এককণা মাত্র মাথায় ঠেকায়। এত বড় ভক্ত আর হয় না। বিধাতা ও'র মঙ্গল করুন।

[শ্রীরাম মায়ের স্তব করিতে লাগিলেন]

পঞ্চম দৃশ্য

[লঙ্কার প্রাসাদ। একাকী রাবণ]

রাবণ। দলবল নিয়ে রাম-লক্ষ্মণ নাকি সমুদ্রের দিকে চলে গেছে। হয়ত সাগর পার হ'য়ে নিজেদের দেশে ফিরে যাবে; আর নয়ত', গলায় হাড়ি বেঁধে জলে ডুবে মরবে। তা না করে' উপায় কি? মা-কালী আমার সহায়, আর আমার মারে কে? হাঃ হাঃ

হাঃ হাঃ·····ভ্রাতার দর্প এবার চূর্ণ হবে। যাই, একবার অশোক বনে যাই, দেখি—একি! হঠাৎ কালো ছায়ায় চারদিক ছেয়ে গেল কেন? ব্যাপার কি?

[ব্যস্তভাবে ভগ্নদূতের প্রবেশ]

কে, ভগ্নদূত! কি?

ভগ্নদূত। মহারাজ, সংবাদ ভাল নয়—

রাবণ। মন্দ সংবাদের বেত মেরে মেরে আমার শান্তির ঘুম ভাঙবার জন্যইত তুমি জন্মেছ ভগ্নদূত! কি মন্দ সংবাদ বল্‌বে,—বল। শীগ্‌গির বল—

ভগ্নদূত। রাম ব্যাটারা কি করছে, জানেন? এ ক'দিন যুদ্ধ করছে না কেন, জানেন?

রাবণ। এই কি তোমার মন্দ সংবাদ বলা হচ্ছে?

ভগ্নদূত। সমুদ্দুরের ধারে খুব ঘটা করে' ওরা দুর্গার পূজা করছে—

রাবণ। আঃ, মন্দ সংবাদ কোথায়?

ভগ্নদূত। কেন এ পূজা,—জানেন? মা-কে আপনার কাছ থেকে ভাগিয়ে নেবার জন্য।

রাবণ। কুঃ! আমার মা কচি খুকী নয় যে, চালকলা নৈবিদ্যের লোভে আমায় ছেড়ে যাবে। তার ওপর, এখন অকাল। অকালের পূজা! ও' পূজা নয়,—ঘোড়ার ডিম।

ভগ্নদূত। নীলপদ্ম দিয়ে পূজা করলে নাকি—দুর্গা তুষ্ট হন—

রাবণ। নীলপদ্ম রাম কোথায় পাবে?

ভগ্নদূত। দেবীদহ থেকে হনুমান তা' নিয়ে আস্‌ছে।

রাবণ। এ্যা! ও' তাই বুঝি চারদিক আঁধার হ'য়ে উঠেছে? লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়বার পর—এমনি আঁধার হ'য়েছিল: হনুমান বুঝি আকাশ পথে আস্‌ছে? তাই-সূর্য আড়াল হয়েছে?

ভগ্নদূত। হ্যাঁ, মহারাজ! তাড়াতাড়ি ও' পূজা নষ্ট করতে হবে।

রাবণ। হ্যাঁ, মন্দ সংবাদ বটে; ভাবনার কথা বটে। যেমন করে' হোক হনুমানকে আট্‌কাও। ও' যেন পূজার স্থানে পৌঁছতে না পারে, যাও—

ভগ্নদূত। আচ্ছা, যদি—

রাবণ। (ধমক দিয়া) আবার 'যদি'! যাও, বলছি—

ভগ্নদূত। (অস্পষ্ট স্বরে) একি আমার কর্ম?

[বক্‌ বক্‌ করিতে করিতে ভয়ে ভয়ে প্রস্থান]

রাবণ। অধম হনুমান! দুরন্ত, দারুণ ভানপিটে! রাম-লক্ষ্মণের বল-বুদ্ধি-ভরসা! নাগপাশে আর শক্তিশেলে রাম-লক্ষ্মণ নির্ঘাৎ মরে' যেত; তা হয় নি ঐ দুরাচারের জন্য। ও' আমার অনেক অস্ত্রের শত্রু। কুম্ভকর্ণ-মেঘনাদদের আমি বার বার বলেছি, আগে ওটাকে নিপাত করতে; কেউ তা করে নি, করতে পারেই নি—

[ভগ্নদূতের প্রবেশ]

কি হলো?

ভগ্নদূত। আমার দোষ নেই মহারাজ! ওর ঐ লেজটা না থাকলে আমি ঠিক ধরে আন্‌তাম। দু'হাত ত ফুলে ভর্তি, কিন্তু লেজটা যে আমার দিকে এগিয়ে এগিয়ে দেয়—

রাবণ। ভাগ্‌ (ভগ্নদূত সভয়ে প্রস্থানোদ্যত) শোন, একটা লোহার মোটা শেকল নিয়ে যদি আটকাতে পার—আমার মাথার মুকুট তোমায় পুরস্কার দেবো। আমার যাও, দেখ (দূতের প্রস্থান)। জানি, এর কর্ম নয়। আমি নিজে আর এখন যাবো না : লাভ নেই। রামের দুর্গাপূজা তবে ঠিকই হবে। ওরা দেবীর বর পাবে। তারপর? তারপর কি হবে? দেখা যাক—। কালীমূর্তিতে দেবী আমারও সহায়—। বৃহস্পতির চণ্ডীপাঠ ত চল্‌ছেই—দেখা যাক্—(ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান)।

ষষ্ঠ দৃশ্য

[পূজা-স্থানে পূজকের আসনে উপবিষ্ট শ্রীরাম চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন। নিকটে লক্ষ্মণ। "জয় রাম" বলিয়া হাসিমুখে হনুমানের প্রবেশ ; হাতে ১০৮টি নীলপদ্ম, লেজে বাঁধা 'ভগ্নদূত']

হনুমান। এই নিন্ পূজার ফুল—

রাম। (পরম আগ্রহে) দাও, দাও ; হনুমান, তুমি বেঁচে থাক।

লক্ষ্মণ। ও আবার কে?

হনুমান। যে কথা, সেই কাজ। আকাশ থেকে মাটিতে নেমে দেখি, আমার পথে দাঁড়িয়ে আছেন ; হাতে একটা শেকল। আমায় আটকাবার সখ আর কি। আবার ভয়ও পান। আমি লেজ দিয়ে একটা প্যাঁচ লাগাতেই—চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—"আমি দূত, আমি দূত,"—আর কি ভক্তি! হেসে হেসে আমার পিলে ফাটে আর কি। "জয় রাম" বল্‌তে বল্‌তে পিল্লেটা বাঁচলো। আমার ত তাড়াতাড়ি, কিন্তু একটু রঙ্গরস না করেই বা ছাড়ি কি করে,—তাই নিয়েই এলাম—

ভগ্নদূত। হাঁউ, মাঁউ—হাঁউ, মাঁউ—

রাম। হতভাগাকে ছেড়ে দাও—

হনুমান। রাক্ষস যে, অমনি ছেড়ে দেবো। রাক্ষস দেখ্‌লে আমার গা ইস্-পিস্ করে—

ভগ্নদূত। হাঁউ-মাঁউ, খাঁউ-খাঁউ

হনুমান। খাবি? তবে আছাড় খা', কেমন!

রাম। পূজার এখানে গোলমাল করতে নেই—

হনুমান। (ভগ্নদূতকে গলাধাক্কা দিয়া) যা—বেটা, তোর বাপের গুণে বেঁচে গেলি।

[হাঁউ-মাঁউ করিতে করিতে রাক্ষসের প্রস্থান]

রাম। পুনরাচমন করে' আমি আবার পূজায় বস্‌ছি। ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু।

[দেবীর পায়ে একটি একটি করিয়া নীলপদ্ম দান]

১০৭টি দেখ্‌ছি। হনুমান! পদ্ম যে একটি কম!

হনু। না তো। আমি তো ১০৮টা-ই এনেছি—

লক্ষ্মণ। তোমার গুণতে ভুল হয় নি তো?

হনু। না, ভুল হবে কেন? দেবীদহে ঐ ১০৮টি পদ্মফুল ছিল; আমি সব ক'টিই যে এনেছি।

রাম। (দীর্ঘশ্বাস সহ) হুঁ, বুঝেছি, আমি বুঝেছি। হায়, দেবী আমায় কৃপা করবে না,—নইলে এমন কাণ্ড হবে কেন? (এদিক-ওদিক খুঁজিয়া) না, কোথাও আর পদ্ম নেই। লক্ষ্মণ,—এবার কি করতে বল? আর কেন বেঁচে থাকি। পাষাণী মা, তোর পাষাণের চোখ দিয়ে চেয়ে দেখ,—মায়ের সম্মুখে ছেলে কেমন করে' মরে—(অস্থিরতা)

লক্ষ্মণ। দাদা, দাদা তোমার পায়ে ধরি, এমন অধীর হ'য়ো না—

রাম। এ্যা, অধীর হবো না? কিন্তু আর একটি পদ্ম?

হনু। ওঃ, আর আমি সহ্য করতে পারিনে। আপনি শান্ত হোন্। আমি আবার যাই, দেখি—আর কোথাও নীলপদ্ম আছে কিনা,—পাই কিনা—

রাম। এ্যা, হাঁ আছে; হনুমান, আছে—আরো নীলপদ্ম আছে। আমার চোখ নাকি পদ্মের মত—লোকে তাই আমায় পদ্ম-আঁখি বলে।

হনু। তা ত' বল্‌বেই। মিথ্যে কথা নয়, আপনার চোখ পদ্মের পাঁপড়ির চেয়েও সুন্দর।

রাম। আর আমার গায়ের রং নীলাভ। নীল পদ্মের অনুকল্পে তবে আমার চোখ আমি পূজায় দেবো। মা—মহামায়া, আমার একটি চোখ উপড়ে' তোমার পূজার শেষ ফুলটি পূরণ করে দিচ্ছি। এবার তুমি আমার পূজা নিও? তুষ্ট হ'য়ো? দেখা দিও? কথা ক'য়ো?

(তীর দ্বারা চক্ষু উৎপাটনে উদ্যত)

হনুমান। হায়,—হায়, সর্বনাশ! ঠাকুর লক্ষ্মণ,—ধরুন, আপনি ধরুন—পূজার আসনে প্রভুকে আমি ছুঁতে পারিনে—

রাম। (তীর নামাইয়া) শেষে তোমরাই আমার পূজার বিঘ্ন হবে?

হনুমান। নাঃ, আর কিছু বল্‌বো না। আপনার যা'ইচ্ছা, তাই করুন। আপনি মানুষ নন্; মানুষ হ'লে—এমন কাজ করতে পারতেন না। আপনার কাজ আমি দেখ্‌তে পারবো না, দেখ্‌তে পারবো না—

[দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া রামের সামনে পতন। রাম পুনরায় চোখের উপর তীর ধরিলেন। অমনি ভগবতী আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া থামাইলেন]

দেবী। (গানে) রাখ আঁখি, রাখ আঁখি
এই আমি এসেছি, রাখ আঁখি।
নয়ন তোমার উপাড়িবে যে,
আমারে চাহিয়া তুমি দেখিবে নাকি?
পদ্ম-পলাশ আঁখি!

রাম। কে তুমি, কে তুমি?

দেবী। (গান) আমি ঘুমিয়েছিলাম, জাগালে তুমি—
অকালে আকুল স্বরে "মা—মা" ডাকি।

রাম। আমি ১০৮টী নীল পদ্মে মায়ের পূজা করবো বলে সঙ্কল্প করেছি। তার একটি হারিয়েছে। হারানো পদ্মের অনুকল্পে আমার একটি চোখ দিতে চেয়েছি। মা, তা না নিলে যে আমি মিথ্যাচারী হ'বো!

দেবী। (গানে) তোমার হারানো সে ফুল
আমি হরিনু ছলে
এ যে খেলা আমার মায়ার ফাঁকি।
পদ্ম-পলাশ আঁখি!

(১০৮তম নীল পদ্মটি কাপড়ের আড়াল হইতে বাহির করিয়া দেবী রামের মাথায় পরাইয়া দিলেন)

রাম। এ কি স্বপন, অথবা আমার দেখার ভুল? বিশ্বরাজ-রাজেশ্বরী মহামায়া আমার এই পাতার কুটিরে, জীবন্ত শরীরে!

হনুমান। (উঠিয়া) দেখুন আমি প্রভুকে বলেছিলাম 'চোখ ওপড়াবেন না।'

রাম। আঃ, হনুমান! (হনুমান একান্তে যাইয়া অভিমানে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল)

দেবী। শোন বৎস, তোমার বোধনে আমি জেগেছিলাম। পূজায় তুষ্ট হ'য়ে অনেক আগেই আমি তোমার কাছে এসেছি। তোমার ভক্তি পরীক্ষার জন্য একটি পদ্ম নিয়ে আমি মায়ায় লুকিয়েছিলাম।

রাম। মা, মা,—তবে অযোগ্য সন্তানকে তুমি কৃপা করেছ! সত্যই তবে এসেছ—?

(মাথার ফুল খুলিয়া দেবীর পায়ে দিলেন)

দেবী। না এসে থাকি সাধ্য কি? সৃষ্টির গোড়া থেকে লোকে আমার পূজা করে আসছে; হয়ত চিরকাল করবে। কিন্তু এমন পূজা কে করেছে, এমন পূজা কে করবে? তোমার আকুল ডাকের বন্যায় আমার আসার কাল-অকালের বাঁধ পর্যন্ত ভেসে গেল। এবার বল, তুমি কি চাও? তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করে' আমি মায়ের কাজ করি।

রাম। আমি কি চাই? তা কি তুমি জানো না? সন্তানের মুখে শুনতে চাও? লজ্জা পাবে না? আমার প্রাণের প্রাণ, নয়নের মণি, জীবনের আনন্দ আমার, সমস্ত চেতনার সার—তিলে তিলে পলে পলে এই লঙ্কার অশোকবনের ধূলিতে মিশে যাচ্ছে। (ক্ষণপরে) সীতাকে হারিয়ে আমার বুকে যে জ্বালানল জ্বলছে, সে কথা থাকুক। সূর্যবংশে জন্ম আমার—মহাঋষি বিশ্বামিত্র অস্ত্রগুরু। আমি নাকি বড় বীর; আমি নাকি একদিন হেলায় হরধনু ভেঙেছিলাম।—সেই আমি আজ চোরের হাত থেকে নিজের স্ত্রীকে উদ্ধার করতে পারিনে। এই দারুণ অপযশের ডালি মাথায় করে, তোমার করুণায় আমি একটা ভিখারীর মত লঙ্কার পথে পথে ঘুরে' বেড়াই,—আর, যার অত্যাচারে ত্রিভুবনময় হাহাকার, সেই রাক্ষসকে তুমি শক্তি যোগাও, তাকে বাঁচিয়ে রাখ,—তবেই তোমার মায়ের কাজ করা হবে!

দেবী। রাবণ যে আমার বড় ভক্ত, আমায় ছেড়ে দেয় না—

রাম। ও, বেশ, তুমি যাও, যেখানে ইচ্ছা নিরাপদে বসে' রাবণের ভক্তি-অমৃত পান করগে।

দেবী। আর আমায় লজ্জা দিওনা, রাম! তোমার কষ্ট আর আমি দেখতে পারিনে। এবার আমি রাবণকে ছেড়ে যাবো। কিন্তু একটু কথা আছে—

লক্ষ্মণ। কি কথা ?

দেবী। একটা খুঁত না পেলে, কি করে আমি রাবণকে ছাড়ি ? দেবতাদের গুরু বৃহস্পতিকে দিয়ে রাবণ প্রতিদিন চণ্ডীপাঠ করায়। সেই পাঠে একটু ভুল করিয়ে দিতে পারলে আমি রাবণকে তখনই ছাড়তে পারি।

লক্ষ্মণ। কি করে' এ কাজ হবে ?

দেবী। তোমাদের হনুমান ইচ্ছা করলে পারে।

হনুমান। (সোৎসাহে উঠিয়া) আমার কথা বল্‌ছেন ? হাঁ আমি খুব পারি। প্রভুর কাজের জন্য চণ্ডীর ভুলত' ভাল, আছাড় মেরে একজনের বাপের নাম পর্যন্ত ভুলিয়ে দিতে পারি। এই যাচ্ছি—"জয় রাম"—

দেবী। (হাসিয়া) আরে শোন,—আছাড় মারা নয়। বৃহস্পতি নিখুঁতভাবে চণ্ডীর পুঁথি পড়েন। কোন উপায়ে সেই পড়ায় অন্ততঃ একটি কথাতেও ভুল ঘটাতে হবে। চণ্ডী-পাঠে ভুল যেখানে—সেখানে আমি থাকিবে। বুঝলে ত' ?

হনুমান। হাঁ হাঁ ; খোসা ছাড়ানো পাকা কলার মত পরিষ্কার বুঝেছি।

[দেবী ও রাম-লক্ষ্মণকে প্রণাম]

"জয় রাম—জয় রাম" [প্রস্থান]

দেবী। এবার আমি যাই : তুমি নিয়ম-মত পূজা শেষ কর।

রাম। আমার অপরাধ নিওনা, মা ! সন্তানকে ভুলোনা।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥

[রাম-লক্ষ্মণের দেবীকে প্রণাম ; দেবীর আশীর্বাদ দান ও প্রস্থান]

লক্ষ্মণ। দাদা, ধন্য তোমার পূজা—যে পূজায় মা না এসে থাকতে পারলো না আর আমাদের দেবী দর্শনের সৌভাগ্য হলো। আকাশে যতদিন চন্দ্রসূর্য থাকবে, প্রতি বৎসর লোকে যেন তোমার মতই, ভগবতীর এমনি শারদীয়া পূজা করে' তাঁর আশীর্বাদ লাভ করে। তোমার এই পূজার কথা লোকে যখন জানবে, তখন তারা তা কর্‌বে ঠিকই।

রাম। আমার সন্দেহ নেই—একান্ত ভক্তি বিশ্বাস নিয়ে এ পূজা যে করবে—আনন্দময়ী মা তাকে আনন্দ দেবেন ; তার দুর্গতি বিনাশ করবেন। এবার পূজা সমাপন করি। ওঁ বিষ্ণু...ইত্যাদি [আচমন]

সপ্তম দৃশ্য

দেববালিকা 'কল্পনা'

—গান—

আর—নাহি ভয়, নাহি ভয়।
হউক রাবণ নির্ভীক যত, দুর্বার দুর্জয়॥
রাম জয় রোলে ভরিবে লঙ্কা, প্রাসাদ শিখরে বাজিবে ডঙ্কা,
রাক্ষস রাজা রাবণের কুল, নিঃশেষে হবে ক্ষয়।
রাঘব রাবণে শেষ মহারণে শ্রীরামের হবে জয়॥

বিজয়া-দশমী

শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত

আশ্বিনের শুক্লা ষষ্ঠীতে মহামায়ার অধিবাস, তারপর দিবসত্রয় অর্চনা, স্তুতি—পুরোহিতের উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর—"ওং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া", আর দশমীতে বিসর্জন দিয়ে শূন্য পূজামণ্ডপের দিকে চেয়ে মনে হয়, সত্যিই কি দেবীর আবির্ভাব হয়েছিল! সত্যিই কি পড়েছিল অসুরবিমর্দিনীর পদক্ষেপ! সপ্তমীর উদয়াচল যেখানে আলোকের আনন্দবার্তা নিয়ে আসে, দশমীর অস্তদিগন্ত সেখানে অন্ধকারের ইশারা জানায় কেন! প্রতিটি বছর এই শারদীয়া সপ্তমী আসে কত আনন্দ-সম্ভার নিয়ে আবার দশমীতে পরিবেশন করে যায় বিজয়ার বিষাদ-সন্দেশ। কিন্তু একবারও কি মনে হয় না, যে এলো আর যে গেলো—তার এই আসা-যাওয়ার মাঝখানে সে দিয়ে গেলো কি, আর রেখে গেলো কা'কে? সমস্ত পূজাভোর যার কাছে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও বলে প্রার্থনা করেছি, বিদায় বেলায় তাকেই আবার 'পুনরাগমনায়চ' বলে অশ্রু ফেলতে থাকি। কৈ, তখন যেন মনে পড়ে না আমাদের কোন স্বার্থের কথা, কেবল সে ফিরে আসুক আমাদের মাঝখানে। সেদিন আমরা তার হাতের কোন দান নিতে চাই না, আমরা ফিরে পেতে চাই শুধু তাকে। মৃত্যু এসে যখন জীবনের দ্বারে হানা দিয়ে মানুষকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তখন প্রিয়জনেরা তার ফিরে আসার কামনা করেই কাঁদে। সেই মৃতব্যক্তির দোষ-গুণ, পাপ-পুণ্য নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না—কেননা, এগুলো নিতান্তই গৌণ। চোখের সামনে থেকে যে সরে গিয়েছে—সেই-ই তখন বড় হয়ে দেখা দেয়।

বিজয়াদশমীর মধ্যে মৃত্যুর মত একটা মর্মান্তিক বিচ্ছেদের আভাষ পাওয়া যায়। জগতের ছোট ছোট কত ঘটনার মধ্যে তার ইঙ্গিত। নদীর এপার থেকে দূর ওপারের পথে ভাসলো এক তরণী, তার মধ্যে ক্রন্দনরতা গ্রাম্য বালিকাবধূ; তার বাপের বাড়ী থেকে শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার যে বিচ্ছেদ-বেদনা, চারটি মাত্র দিনের জন্য আগতা হাস্যময়ী মহামায়ার দশমীতে যাত্রা করাও তাই। সেও তো এই পিতৃগৃহ থেকে স্বামীর ঘরে যাবার বেদনাবোধ।

উমা, সে বাপের বাড়ী আসবার জন্যে কত ব্যাকুল, কত অধীর, তার মা আক্ষেপ করে তার বাপকে বলছে:

> যাও যাও গিরি উমারে আনিতে, কত সে কেঁদেছে তা যদি জানিতে!
> মা হয়ে সে ব্যথা সহিব কেমনে, যাও—যাও তুমি যাওগো।

আরও বলছে স্বামীকে উদ্দেশ করে ভিখারী জামাইয়ের কথা:

> গৌরী আমার সোনার ললনা, তার কাছে শিব কোথায় বলনা।
> ভাগ্যের একি নিঠুর ছলনা, (আমার) গৌরীকে এনে দাও গো!

সেই সোনার বরণী গৌরী পিতৃগৃহে মায়ের কোলে এলো। আনন্দে কাটলো কয়েকটা

দিন—সপ্তমী থেকে নবমী। চললো কত হাসি-উৎসব, কত আনন্দ-বার্তা বিনিময়। কিন্তু জগতে আনন্দের ক্ষণটী বুঝি তাড়াতাড়িই শেষ হয়! কেমন করে কোথা দিয়ে তিনদিন কেটে গেলো; একটি একটি করে নিভে এলো উৎসবের বাতি, দেখা দিল বিদায়ের লগ্ন-বিজয়া দশমী। সোনার সকাল আনন্দ নিয়ে এসেছিল, ম্লান গোধূলি তা' মুছে দিয়ে গেলো; রইলো শুধু হর্ষ-বিষাদের একটা তীব্র বেদনাবোধ। উমা অশ্রুচোখে তার মাকে বলছে:

আমায় মাগো দুলিস্‌নে গো অবোধ মেয়ে ব'লে;
আসছে বারে আসবো আবার তোমার অভয় কোলে।
আসবো সিঁথের সিঁদুর নিয়ে আলতা-পরা পায়;
আজকে তোকে ছাড়তে আমার বুক যে ফেটে যায়।

উমা যত কাঁদে তত অশ্রু ফেলতে থাকে তার মা। মেয়ের চিবুক ধরে বলে:

রাগ করিসনে মাগো আমার; রাগ করিসনে যেন।
বেশাখোরের হাতে আমি মেয়ে দিলুম কেন!
পারবে কি তোর মান রাখতে ছাই মাখা অই ভোলা!
তোর দুঃখ রইলো বুকে চিরদিনের তোলা।

মাকে প্রণাম করে চোখ মুছতে মুছতে উমা চললো শ্বশুরবাড়ী। একটু করে যায় আবার পিছন ফিরে চায়। দেখে, মা দুয়ারে দাঁড়িয়ে আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে। বুক ফেটে যায় উমার।

একদিকে স্বামী, অন্যদিকে শিতামাতা। একদিকে পুত্র-কন্যা, অপরদিকে বাপের বাড়ীর সখীর দল। দুইদিকের এই যে আকর্ষণ, মাঝখানে উমা—এ হলো বাংলার বধূ-কন্যাদের চিরন্তন বেদনার ছবি। বাপের বাড়ী থেকে বিদায়, কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে আগমন। প্রিয়জন পরিত্যাগ, কিন্তু প্রিয়তমের দর্শন। ঘরখানি ছেড়ে দিয়ে এই যে ঘরখানি পাওয়া, এর একদিকে যেমন তীব্রতম বেদনা, অপরদিকে তেমনি নিবিড়তম আনন্দ।

তাইতো শারদীয়া উৎসব বাঙালীর এত প্রিয়। কত মিলন-বিরহ, দুঃখ-আনন্দ, হাসি-অশ্রুর আলিঙ্গন! কত দেওয়া-নেওয়া, যাওয়া-আসা, ভাববিনিময়ের আলিম্পন! তাই শারদীয়া উৎসবকে বাঙালী হাসি-আনন্দের পঞ্চপ্রদীপে আরতি ক'রে অশ্রুসলিলে বিসর্জন দেয়। দুঃখ জেনেও স্বল্প সুখাবেশ, বিচ্ছেদ জেনেও ক্ষণিক মিলনানন্দ,—মানবমনের এই যে ট্রাজেডী,—বোধন থেকে বিসর্জন পর্যন্ত শারদীয়া পূজার এই-ই ভিত্তিভূমি।

কথকতা

শ্রীজয়দেব রায়

আমাদের ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্য আপামর নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে কথকতার মাধ্যমেই সুপ্রচারিত হইত। কথিত আছে কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস প্রমুখ কবিরা কথকতা হইতেই তাঁহাদের গ্রন্থরচনার শুধু প্রেরণা নয়, উপাদানও পান।

কথকতার মধ্যে মঙ্গল কাব্যের ন্যায় দেবদেবীর বন্দনা, সৃষ্টি বর্ণনা প্রভৃতির কতকগুলি নির্দিষ্ট গৎ ছিল। মঙ্গল কাব্য ছিল পদ্যে বাঁধা, কথকতা গদ্যে গাঁথা। ঐ গদ্য ভাষা সুর সহযোগে আবৃত্তি করা হইত। কথার নিজস্ব সুরলালিত্যেই শ্রোতারা মুগ্ধ হইয়া পড়িত। যেমন, ঘোর তমসায় আচ্ছন্না রজনীর বর্ণনা :

"ঘোরা যামিনী, নিবিড়গাঢ়তমস্বিনী, শান্তানলিনী, কুমুদগন্ধামোদিনী, পৃথ্বীঝিল্লি-রবোন্মাদিনী বিহগরব-ক্ষণবিধ্বংসিনী, নক্ষত্রনিকরজালমালব্যাপ্তা যামিনী সভয়চকিতনয়না কামিনী, মনোনায়ক নিকটাভিসারিকা নায়িকাগণ ক্ষণ ক্ষণ দিগভ্রান্ত্যাদিজন্য স্খলিত চকিতগতি কষ্টেসৃষ্টে গমন করিতেছেন।"

মেঘমন্ত্রিত দিবসের বর্ণনা :

"পূর্বদিগন্তর দেদীপ্যমান শক্রধনুশোভিত নভোমণ্ডল, কাদম্বিনী সৌদামিনীচকল, ঔদর্দুনোদ্বেজিতান্তঃকরণ মত্তকরিবরারোহণকৃত দেবেন্দ্র নিষাদ্বয় বজ্রনিক্ষেপশঙ্কিত ইরম্মদস্খলিত পতিতকণা সমুদ্রগর্জিত বজ্রপতন ভয়ানক ধ্বনি প্রতিধ্বনি শ্রবণ সভয় চকিত নয়নোদ্বেজিত পান্থজন, পক্ষিগণ গণিত প্রমাদ সঙ্কটত্রাসিত এককালীন কুহুকুহু কলরব করিতেছে।"

কথকঠাকুরদের মধ্যে এককালে গঙ্গাধর, কৃষ্ণহরি, রামধন শিরোমণি, উদ্ধব ঠাকুর, লালচাঁদ বিদ্যাভূষণ, ধরণীধর ঠাকুর প্রভৃতির সুনাম ছিল। কৃষ্ণহরি শিরোমণি ও গোবরডাঙ্গার রামধন শিরোমণি কথকতাকে একটি পরিপূর্ণ কলাবিজ্ঞানে পরিণত করেন।

গঙ্গাধর শিরোমণি ছিলেন রাঢ়দেশের অধিবাসী। রামধনের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন ধরণীধর। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই কথকতা শিল্পে শিষ্যগোষ্ঠি ছিল। কথকদের সংক্ষিপ্ত বাচনভঙ্গীকে 'সাট' বা 'চূর্ণী' বলে। এই সাট বা চূর্ণীগুলিই হইল কথকদের code language. এইগুলিকে অবলম্বন করিয়াই তাহারা নিজ নিজ সুরলাল বিস্তার করে।

কথকতা যে লোকশিক্ষা ও নীতিপ্রচারের কতটা সহায়ক, খৃষ্টধর্ম-প্রচারক পাদ্রীরা তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় কথকতার ভঙ্গীতে যীশুর সুসমাচার প্রচার করা হইত।

ইতিপূর্বে মুসলমান-শাসনে দেশে যখন ইসলামধর্ম প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, তখন ইসলামী নীতি প্রচারেরও জন্য পীর পয়গম্বরের চরিতকথা বর্ণনার একটি ভিন্ন শ্রেণীর প্রথা প্রচলিত হইল। 'নবী-কাহিনী' নামক একটি বিশিষ্ট ঢঙের কথকতা এইভাবে মুসলমান

সমাজে প্রচলিত হয়। মুসলমানী কথকতা বা 'নবীকাহিনী'র সামান্য নিদর্শন নীচে দেওয়া হইল :

"আমীর বলন্তঃ আমি আরব নন্দন।
হামজা আমার নাম বিদিত ভুবন।
আমীরের নাম শুনি লস্কুরে খোলল।
আমাকে বান্ধিতে তুমি যাইলে মহাশয়।
আমীরেও বলিলেক : আমি সেই জান।
তা শুনি লস্কুরে গদা লয় তোরমান।
আমীরে ছিফর ধরি রহিলেক আগে।
লস্কুরে গুরজ হানিলেক মহাবেগে।"

হিন্দু কথক ঠাকুরদের মতো মুসলমান কথকদের অতটা বিদ্যাবুদ্ধি না থাকায় তাঁহারা পদ্যেই কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেন।

কথকতা ও পাঁচালী জনগণের সাহিত্য। কথকসাহিত্য বা গান কেবল কথক ঠাকুরের মুখেই আবৃত্ত হয় না, সমবেত শ্রোতারা তাহা যুগপৎ শোনে ও কথকের মাধ্যমে তাহার রসরূপ দান করে। রবীন্দ্রনাথ দাশু রায়ের পাঁচালীকে বলিয়াছিলেন 'জনসাহিত্য,' কথকতার সম্বন্ধে সেই একই কথাই প্রযোজ্য—

"দাশুরায়ের পাঁচালী দাশরথির ঠিক একলার নহে, যে সমাজ সেই পাঁচালী শুনিতেছে, তাহার সঙ্গে যোগে এই পাঁচালী রচিত। এইজন্য এই পাঁচালীতে কেবল দাশরথির একলার মনের কথা পাওয়া যায় না,—ইহাতে একটি বিশেষ কালের বিশেষ মণ্ডলীর অনুরাগ-বিরাগ, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস রুচি আপনি প্রকাশ পাইয়াছে।"

কথক ঠাকুরের বলিবার ভঙ্গিমা বা বর্ণনাশক্তির উপরই তাহার কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিত। অতি নীরস তত্ত্বও তাহাদের কথনভঙ্গীর গুণে সুরুচি গীতিরস পরিবেশন করিত। গায়কদের গীতিরীতি বা 'গায়কী'র (style) সঙ্গে কথকের বলিবার ভঙ্গীর তুলনা হইতে পারে।

কিন্তু কথকের কেবল সুরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেই চলিত না, সেদিনের লোক-মনোরঞ্জনের সকল কৌশলই কথক ঠাকুরের কণ্ঠে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। তাই, সরসগল্প, উপদেশ, নীতিশ্লোকের সঙ্গে নানাপ্রকার প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়েরও অবতারণা করা হইত। কথকতার মধ্যেও পালাভাগ ছিল, এক একদিন এক একটি পালার ব্যাখ্যা হইত।

সেকালের জন-শিক্ষার প্রধান বাহনই ছিল কথকতা ও পাঁচালী। কথকতা যে লোক-শিক্ষার কতবড় সহায় বাংলা দেশের মনীষীরা তাহা বহুদিন হইতে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন :

"লোক-শিক্ষার একটা উপায়ের কথা বলি, সেদিনও ছিল, আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বেদী বা পিঁড়ির উপর বসিয়া, ছেঁড়া তুলোট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকা মালা শিরের উপরে বেষ্টিত করিয়া নাড়ুস নুড়ুস

কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জুনের বীরধর্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয় জয়, দধীচির আত্মসমর্পণ বিষয়ক সংস্কৃত পুরাণ-কথার সত্যার্থ। সুকণ্ঠে সঙ্গীতের সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায়, যে না পায়, সেও শিখিত; শিখিত যে ধর্ম নিত্য, ধর্মদেব, আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, পরের জন্য জীবন, ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছেন, পালন করিতেছেন, ধ্বংস করিতেছেন, পাপ-পুণ্য আছে, পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার আছে, জন্ম আপনার জন্য নহে—পরের জন্য; অহিংসা পরমার্থ, লোকহিত পরম কার্য্য।

সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্য যুবকের কুরুচির দোষে। ইংরাজী শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত হইতেছে বই বর্দ্ধিত হইতেছে না।"

কথক ঠাকুরের লোক মনোরঞ্জনের সবচেয়ে বড় সহায় ছিল 'নাটকীয়তা'। কথক পাঁচালী গায়কের ন্যায় একাই নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হইত; বিষয়-বস্তুর রসাবেদন অনুযায়ী কথকের কণ্ঠ, অঙ্গভঙ্গী সমস্তের পরিবর্তন ঘটিত। কোন করুণ কথা বলিতে গেলে তাহার কণ্ঠ বাষ্প-গদ্‌গদ হইয়া উঠিত, আবার শৌর্য-বীর্যের উপাখ্যানে তাহার কণ্ঠ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল উদ্দীপনার সতেজ হইয়া প্রকাশিত হইত।

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কথক ঠাকুরের এই ভাব-বিগলিত রূপের একটি চিত্র অঙ্কণ করিয়াছেন তাঁহার 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে—

"কথক ঠাকুর রাজা ভরতের উপখ্যান কহিতেছিলেন। করুণ কণ্ঠে গাহিতেছিলেন, কেমন করিয়া বনবাসী মহাপুরুষের ক্রোড়ের নিকট হরিণ শিশু ভাসিয়া আসিয়াছিল।... তাহার পর কবি নিজে কাঁদিলেন, সকলকে কাঁদাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিলেন, কেমন করিয়া একদিন সে তাহার আজন্ম-জড়িত মায়াবন্ধন নিমেষে ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেল। বনের শিশু বনে চলিয়া গেল মানুষের ব্যথা বুঝিলনা। বৃদ্ধ ভরত উচ্চৈস্বরে ডাকিলেন 'আয়, আয়, আয়'। কেহ আসিলনা, কেহ সে ব্যাকুল আহ্বানের উত্তর দিল না। তখন সমস্ত অরণ্য অন্বেষণ করিলেন, প্রতি কন্দরে, প্রতি বৃক্ষতলে প্রতি লতাবিতানে কাঁদিয়া ডাকিলেন, 'আয়, আয়, আয়'। কেহ আসিল না।"

অমর কাব্য "মহানাটকম্"

শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী. এম্-এ, কাব্যতীর্থ

সংস্কৃত কাব্যে "মহানাটকম্" নামক কাব্যের স্থান অদ্যাবধি সুনির্দিষ্ট হয় নাই। "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্" এই ব্যাখ্যা স্বীকার করিয়া লইলে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যত বিচার বিতর্ক চলিতেছে, তাহার সহজ মীমাংসা হইয়া যায়। কারণ এই পরম উপাদেয় কাব্য রসসমৃদ্ধ এবং এই বিষয়ে সকলেই একমত। কিন্তু তর্ক এই জন্য যে, "মহানাটকম্" নাটক হিসাবে প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রকারদের সমস্ত নির্দেশ মানিয়া চলে নাই। নাটকের লক্ষণ কি এবং "মহানাটকম্" তাহার কি কি বিধান অনুযায়ী সমর্থনযোগ্য নহে—তাহা এই প্রবন্ধের বিচার্য নহে। প্রবন্ধের কলেবর সংক্ষিপ্ত ও সুসংহত করিবার প্রচেষ্টায় কাব্যবিচারের অনেক মূলসূত্রই অকথিত থাকিয়া যাইতেছে।

সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন :

"এতদেব যদা সর্বৈঃ পতাকাস্থানকৈর্যুতম্।
অঙ্কৈশ্চ দশভির্যুক্তং মহানাটকমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ এই নাটক যখন এই সকল (চার প্রকার) পতাকাস্থানক এবং দশটি অঙ্ক-সমন্বিত হইবে, তখন পণ্ডিতগণ ইহাকে মহানাটক বলেন। আলোচ্য কাব্যে উপরোক্ত লক্ষণসমূহের অভাব। "পতাকাস্থানক" লক্ষণ নাটকে পতাকার মত সুখ্যাতিজনক। নাট্যকার বিশেষ বিচার ও কৌশল সহকারে নাটকে এই সকল নাট্যরসসঞ্চারী পরিস্থিতি বা রচনাবিন্যাস নাটকের গৌরবৈজয়ন্তীর মত নিবদ্ধ করেন। আলোচ্য কাব্যে পতাকাস্থানক পাওয়া যায় না। ইহা ছাড়া এই গ্রন্থ চৌদ্দ ও নয় অঙ্ক এই দুই প্রকারে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণের মত। এই সকল কারণে ইহাকে পণ্ডিতগণ মহানাটক আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত রহিয়াছেন।

"মহানাটকম্" কাব্য কাব্যবিচারে মহানাটক বলিয়া স্বীকৃত না হইলেও ইহা নিঃসন্দেহ যে, এই কাব্য দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্যের এক মনোরম সমন্বয়। দৃশ্য কাব্য অপেক্ষা এখানে শ্রব্য কাব্যের প্রাধান্য হওয়াতে ইহার নাটকত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য তথা বিশ্ব-সাহিত্য যে সমৃদ্ধতর হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

প্রসঙ্গতঃ বলিতে হয় মহানাটকের যে লক্ষণ তাহা এই কাব্যে নাই, আবার মহাকাব্যের —"সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ। * * *" ইত্যাদি লক্ষণগুলিও এখানে দেখিতে পাই না।

মহানাটক ও মহাকাব্যের লক্ষণ না থাকিলেও এই কাব্যের "মহানাটকম্" নামকরণের যৌক্তিকতা দেখাইবার জন্য কেহ কেহ বলেন যে, মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্বের জন্য যেই প্রকার "মহাভারত" আখ্যা হইয়াছে, মহত্ত্ব, কাব্যোৎকর্ষও নানা প্রকার নাটকীয় লক্ষণের জন্যই এই কাব্যের নাম হইয়াছে "মহানাটকম্"।

এই কাব্য অতি প্রাচীনকালে রচিত হইয়াছিল। প্রথম অঙ্কের পরিশেষে বলা হইয়াছে যে, এই কাব্য শ্রীমান্ হনুমানের রচিত, বিক্রমধারা বা রাজা বিক্রমাদিত্য কর্তৃক (সমুদ্র হইতে) প্রত্যুদ্ধৃত এবং মিশ্র উপাধিধারী শ্রীমধুসূদন কবি দ্বারা সন্দর্ভরূপে সঙ্কলিত। "প্রত্যুদ্ধৃতে বিক্রমৈঃ" এই শব্দদ্বয়ের অনেকপ্রকার ব্যাখ্যাই করা চলে। বিক্রমাদিত্য নরপতি স্থলে পরাক্রম অর্থ গ্রহণ করিলে কাহার পরাক্রম সে বিষয়েও মতভেদ আছে। তবে কাব্য শ্রীমান্ হনুমানের রচিত ইহাতে কোনও মতভেদ নাই। মহর্ষি বাল্মীকি এই কাব্যের উৎকর্ষে নিজের রচিত রামায়ণের গৌরবহানির আশঙ্কা করিয়া নাকি হনুমানকে তাঁহার এই কাব্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, রাক্ষসগণ নাকি আপন গৌরবহানির আশঙ্কায় এই কাব্য অপহরণ করিয়াছিল। এই প্রকার নানা মত বিদ্যমান। ইহাতে কাব্যের প্রাচীনত্বই প্রতিপন্ন করিতেছে।

এই কাব্য প্রাচীন কিন্তু প্রাচীনত্বই ইহার খ্যাতির কারণ নহে। মনে হয় এই কাব্য সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজাবেদীমূলে অর্পিত এক অনুপম অর্ঘ্য। যে কাব্য মানবহৃদয়ের মহান ভাবসমূহকে জাগ্রত ও উদ্দীপ্ত করে, যাহা পাঠে মানবের নিগূঢ় সৌন্দর্যবোধ ও রসানুভূতি প্রখরতর হয়, যাহা একাধারে নীতি ও অনুভূতি, সমষ্টি ও ব্যষ্টিমানসের পরিতুষ্টি ও পরিপুষ্টি সাধন করে যাহাতে একাধারে মর্ত্যমায়া ও অমর্ত্যমাধুরী উভয়েরই অপরূপ প্রকাশ দেখিতে পাই—সেই কাব্যের অমরত্ব নিঃসন্দেহে সঙ্কীর্ণ কাব্যবিচারের অপেক্ষা রাখে না, "মহানাটকম্" সেই কাব্য।

আমি আজ শুধু এই কাব্যের পঞ্চমাঙ্ক পর্যন্ত বিষয়বস্তুর যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পঙ্কজলেই গঙ্গাপূজা—এই কাব্যের পরিচয় শুধু ইহারই ভাবগম্ভীর ও কাব্যসুষমাসমৃদ্ধ শ্লোকসমূহের মাধ্যমেই সম্ভব বলিয়া মনে করি।

প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই যে, সংস্কৃত নাটকের চিরাচরিত প্রথানুযায়ী ইহার নান্দী-বাক্য পরমেশ্বরের সর্বব্যাপী মহিমাকীর্তনে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে।

তারপর সুললিত উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দে রঘুবংশতিলক দশবদননিধনকারী পুণ্ডরীকাক্ষ দাশরথি শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা বাজিয়া উঠিয়াছে :

"নমামি দেবং সুরকল্পবৃক্ষং ধনুর্ধরং নীরদনীলগাত্রম্।
গুণাভিরামং কমলাননং তং যদাশ্রয়ং ন ক্ষণমুজ্ঝতি শ্রীঃ॥"

শ্রীরামচন্দ্র যখন হরধনুর্ভঙ্গে প্রবৃত্ত হইতেছেন তখন সখীজনের সহিত আমরাও উৎকণ্ঠিত চিত্তে বলিতে থাকি :

"রামো দূর্বাদলশ্যামো জানকী কনকী লতা।
অনয়োর্যোগ্য উদ্বাহো ধনুরৈশং পণো মহান্॥"

প্রথম অঙ্কে হরধনুর্ভঙ্গের পর শ্রীরামচন্দ্র সীতার পাণিগ্রহণ করিলেন, তারপর তাঁহার অন্যান্য অনুজদের বিবাহ হইল। এই অঙ্কের নাম বিদেহভবনলাভ। দ্বিতীয় অঙ্কে অযোধ্যার পথে জামদগ্ন্য পরশুরামের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইতেছে। হরধনুর্ভঙ্গে কুপিত পরশুরামের

বর্ণনা ছন্দ ও ভাবগৌরবে সমৃদ্ধ। এই প্রসঙ্গে "যত্রাক্রান্তি সঙ্গরাঙ্গনমুখং" প্রভৃতি শ্লোক উল্লেখযোগ্য। এই সব শ্লোকে কোথাও কোথাও বীর, ভয়ানক অথবা বীভৎসরসের মাত্রাধিক্য পীড়াদায়ক মনে হইলেও সামগ্রিকভাবে ইহারা কাব্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। পরশুরামের প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের সবিনয় নিবেদন শুনিতে পাই :

"স্পৃষ্টং বাপি ন বা স্পৃষ্টং কার্মুকং পুরবৈরিণঃ।
ভগবন্! আত্মনৈবেদমভজ্যত করোমি কিম্?"

অথবা—

"ভো ব্রহ্মণ্! ভবতা সমং ন ঘটতে সংগ্রামবার্ত্তাপি নঃ,
সর্বে হীনবলা বয়ং, বলবতাং যুয়ং স্থিতা মূর্দ্ধনি।"

জামদগ্ন্য পরশুরামের দর্প চূর্ণ হইল। তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। রাজা দশরথও পুত্রগণের সহিত অযোধ্যায় প্রস্থান করিলেন।

এই সময় হইতে নাটকের রসস্রোত অন্য খাত বহিয়া চলিতেছে। শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর মিলন বর্ণনা প্রসঙ্গে কয়েকটি অপূর্ব কাব্যসুষমামণ্ডিত শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে :

"যাতে ভাস্বমনন্তরং দিনকৃতো বেশেন রাগাত্মিতঃ
স্বৈরং শীতকরঃ করং কমলিনীমালিঙ্গিতুং যোজয়ন্।
শীতস্পর্শময়াপ্য সম্প্রতি তয়া ত্যক্তে মুখাভোরুহে,
হাসেনৈব কুমুদ্বতীর্বনিতয়া বৈলক্ষ্যপাণ্ডুকৃতঃ॥"

—অন্তগত সূর্যের বেশধারী চন্দ্রের শীতকর স্পর্শরূপ বিসদৃশ আচরণে সূর্যপ্রিয়া কমলিনী লজ্জায় মুখপদ্ম লুকায়িত করিলে আপন বনিতা কুমুদ্বতীর হাস্য চন্দ্রকে লজ্জায় পাণ্ডুবর্ণ করিল।

এখানে, সূর্যাস্তের পর চন্দ্রের প্রথম রক্তরাগের ধীরে ধীরে পাণ্ডুবর্ণে পরিবর্তন অপরূপ মাধুর্যের সহিত কবি বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বলিতেছেন :

"দৃষ্ট্বা সুবর্ণং দহনে স্বদেহং চিক্ষেপ বর্ণং তব দন্তপঙ্‌ক্তিম্।
বিলোক্য তূর্ণং মণিবীজপূর্ণং ফলং বিদীর্ণং কিল দাড়িমস্য॥"

অথবা—"বদনমমৃতরশ্মিং পদ্ম কান্তে।" এই শ্লোকটিতে বিধাতার বায়ুরূপ তুলাদণ্ডে ধরণীস্থিত প্রিয়ামুখের সহিত চন্দ্রের তুলনায় চন্দ্রের লঘুত্ব এবং সেই লঘুত্ব ঘুচাইবার জন্য বিধাতা কর্তৃক আকাশে তারকারূপিমোজনার কল্পনা রহিয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর বাসরঘর স্বর্গ ও মর্ত্যের এক অলৌকিক সোপান রচনা করিয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কের এই মধুর পরিসমাপ্তি।

কিন্তু হায়,—নবদম্পতির বাসরঘরের নন্দনকুসুমসুরভি তাহাদের নবোদ্ভিন্ন যৌবনাকাশে সম্পূর্ণভাবে বিকীর্ণ হইতে না হইতেই তৃতীয় অঙ্কের প্রারম্ভেই দেখিতেছি :

"উল্কাপাতঃ প্রচণ্ডঃ প্রপততি নভসঃ কম্পতে ক্ষুব্ধধাত্রী।"

পিতৃসত্যপালনার্থে শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাসে যাইতে হইতেছে। সঙ্গে নবপরিণীতা তরুণী

ভার্যা সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণ। এই সময় সীতার প্রতি কৌশল্যার ও লক্ষ্মণের প্রতি সুমিত্রার যেই অনুধাবনযোগ্য।

কৌশল্যা সীতাকে বলিতেছেন :

"অয়ি জানকি পুত্রি! শৈশবে প্রতিপন্নাসি বধূজনক্রিয়াম্।
অথ গচ্ছসি যৌবনে বনং পরিণামে ভবিতাসি কীদৃশী?"

এই উক্তিতে কবি যেন ধরিত্রীদুহিতার অন্তিমক্ষণটিকে সেই হৃদয়বিদারী করুণ দৃশ্যেরই ক্ষণ-সৌদামিনীদীপ্তিতে আমাদের হৃদয়পটে মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত করিতেছেন—প্রাণ যেন অকারণে আকুল হইয়া উঠিতেছে।

অতঃপর জননী সুমিত্রা লক্ষ্মণকে বলিতেছেন :

"রামং দশরথং বিদ্ধি, বিদ্ধি মাং জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি, গচ্ছ পুত্র! যথাসুখম্।"

জননী সুমিত্রার আদর্শ ত্যাগ, লক্ষ্মণের আদর্শ ভ্রাতৃপ্রেমই শুধু নহে, এই উক্তিতে ধরণিকার অন্তরালে আসন্ন ধরিত্রিবিরহে বিদীর্ণহৃদয়া ছিন্নলতার ন্যায় ভূলুণ্ঠিতা নবপরিণীতা বধূ উর্মিলার ছল ছল নয়নযুগলও যেন আমরা স্মরণ করিতে থাকি।

তৃতীয় অঙ্কে অতঃপর ভরতের ভ্রাতৃভক্তি, সূর্পনখার নাসিকাছেদন, খর ও দূষণ বধ, স্বর্ণমৃগরূপী মারীচবধ, রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, জটায়ুবধ প্রভৃতি কাহিনী সুললিত পদ্যে গ্রথিত হইয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে উপদেশ দিতেছেন :

"পরস্ত্রী মাতেব, ক্বচিদপি ন লোভঃ পরধনে,
ন মর্য্যাদাভঙ্গঃ, ক্ষণমপি ন নীচেষ্বভিরুচিঃ।
বিপৌ শৌর্য্যং, ধৈর্য্যং বিপদি, বিনয়ঃ সম্পদি সতাম্
ইদং বর্ত্ম ভ্রাতর্ভরত! নিহতং যাতসি সদা।"

মারীচের স্বগতোক্তি এই :

"রামবাদপি মর্ত্তব্যং মর্ত্তব্যং রাবণাদপি।
উভাভ্যামপি মর্ত্তব্যে বরং রামান্ন রাবণাৎ।"

চতুর্থ অঙ্কে পর্ণশালাতে সীতাকে না দেখিতে পাইয়া শ্রীরামচন্দ্রের শোক, সীতান্বেষণ, সুগ্রীবের সহিত সখ্য ও বালীবধ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে খুঁজিয়া না পাইয়া সখেদে বলিতেছেন :

"কান্তায়ে সকলৈর্বিলাসপটুভির্নীতাসি কিং মৈথিলি?"

এই শ্লোকে প্রিয়ার সৌন্দর্য বর্ণনায় মনোরম উপমাসমূহ প্রযুক্ত হইয়াছে—স্থানসঙ্কুলান-সৌকর্যে তাহা পুনরুদ্ধৃত হইল না।

দুই ভাই আর্ত হৃদয়ে সীতাকে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছেন। পথে সীতার নূপুর প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে তাহা সীতার নূপুর কিনা অবধারণ করিতে বলিতেছেন। তখন লক্ষ্মণ বলিতেছেন :

"নাহং জানামি কেয়ূরে নাহং জানামি কুণ্ডলে।
নূপুরে ত্বভিজানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ।"

সুমিত্রার "রিপ্তি মাং জনকাত্মজাম্" এই উপদেশ-বাণী এ লক্ষ্মণের জীবনে কী ভাস্বর দীপ্তিমধুরিমায় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহারি স্বাক্ষর রহিয়াছে এই উক্তিতে।

প্রিয়ার বিরহে শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। মাঝে মাঝে স্মৃতিভ্রংশ ও আত্মবিস্মরণ হইতেছে। প্রিয়ার কথা ভাবিতে ভাবিতে গভীর বেদনায় তিনি আত্মস্থ হইবামাত্র বলিতেছেন :

"হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভীরুণা।
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ।"

কুসুমিত অশোকতরুতলে বিশ্রাম করিয়া তিনি অশোকতরুর সহিত নিজের তুলনা করিতেছেন :

"সর্বং তুল্যমশোক। কেবলমহং ধাত্রা সশোকঃ কৃতঃ।"

জটায়ুর নিকট সীতাহরণ-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি স্বগতোক্তি করিতেছেন :

"একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তং গচ্ছাম্যহং পারমিবার্ণবস্য।
তাবদ্দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি।"

কোথাও আত্মধিক্কারে বলিতেছেন :

"ভ্রষ্টং কৃতং হি তাতেন যেনাহং বনবাসিতঃ।
এষাপি হি ন মে বুদ্ধিঃ ক স্বর্গঃ ক হিরণ্ময়ঃ।"

কোথাও বা দৈবের কথা ভাবিতেছেন :

"লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যো দেবোঽপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ।
অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে যদাটলেখো ন পুনঃ প্রযাতি।"

অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিতেছেন। বালীর সহিত যুদ্ধও বর্ণিত হইয়াছে। মৃত্যুকালে বালী শ্রীরামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—হে রঘুবংশবীর, অকারণ অরাগ্রস্ত বানরের প্রতি শরনিক্ষেপ এ তোমার কেমন নীতি ?

"মুক্তাফলায় করিণং হরিণং পলায়
সিংহং নিহন্তি ক্ষুদ্রদ্বিরদস্যচর্মণে।
কা নীতিরীতিরিয়তী রঘুবংশবীর!
শাখামৃগে জয়তি বস্তব বাণমোক্ষঃ?"

ইহার উত্তরে শ্রীরামচন্দ্র বালীকে নিজ পিতা দেবেন্দ্রের পরাজয়ের জন্য রাবণের প্রতি প্রতিশোধ লইয়াছিল এই কারণে প্রথমে বালীকে তাহার প্রাপ্য প্রশংসা প্রদান করিয়াই—"বিনয়করণী জাগর্তি সৎপুত্রতা।"—পুনরায় অতিক্রান্তধর্ম কামযুক্ত তাহার পাপের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :

"ন চ তে মর্ষয়ে পাপং ক্ষত্রিয়োঽহং কুলোদ্গতঃ।"

পঞ্চম অঙ্কও ঘটনাবহুল।

মাল্যবান্ পর্বতে বর্ষাকালে বিরহী শ্রীরামচন্দ্রকে প্রথম দেখিতে পাইতেছি শত্রুর প্রতি অভিযানের জন্য শরৎকালের প্রতীক্ষা করিতেছেন। সুগ্রীবের ঔদাসীন্যে লক্ষ্মণের তিরস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন, সীতান্বেষণ, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়, লঙ্কাদহন প্রভৃতি বিবরণ সমস্তই সংক্ষেপতঃ রহিয়াছে, অবশেষে—

"তথাঽশোকবনে বায়ুপুত্রঃ সীতামিক্ষেঽত্রবীৎ।
লঙ্কা দগ্ধা ময়া দেবি বিদায়ো দীয়তামিতি।"

সীতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া হনুমান পুনরায় সমুদ্রলঙ্ঘন করিলেন ও মধুবনে অন্যান্য কপিদের সহিত মিলিত হইলেন।

এই অঙ্কের উল্লেখযোগ্য শ্লোকসমূহের মধ্যে প্রথমেই শ্রীরামচন্দ্রের বর্ষাকালীন বিরহার্ত উক্তিটি মনে জাগে :

"স্নিগ্ধশ্যামলকান্তিলিপ্তবিয়তো বেল্লদ্বলাকা ঘনাঃ,
বাতাঃ শীকরিণঃ পয়োদসুহৃদামানন্দকেকাঃ কলাঃ।
কামং সন্তু দৃঢ়ং কঠোরহৃদয়ো রামোঽস্মি সর্বং সহে,
বৈদেহী তু কথং ভবিষ্যতি হহা হা দেবি! ধীরা ভব।"

—"আকাশে শ্যামলকান্তি মেঘ ও বলাকাশ্রেণী, বায়ু জলকণাবাহী, ময়ূর কেকাভাষী—মন চঞ্চল হইবার কথা। আমি কঠোরহৃদয় রাম সমস্ত অবস্থা সহ্য করিতে পারি, কিন্তু সীতার কী অবস্থা হইবে। হে দেবি, তুমি ধৈর্য ধারণ কর।" লক্ষ্মণের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া সুগ্রীবের আত্মদোষস্বীকৃতিও উল্লেখযোগ্য :

"দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং কান্তবর্ণং
ছিন্নং ছিন্নং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতামিক্ষুদণ্ডম্।
দৃষ্টং দৃষ্টং ত্যজতি ন পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধং
প্রাণান্তেঽপি প্রকৃতিবিকৃতির্জায়তে নোত্তমানাম্।"

স্বগতোক্তি, অভিনয়পরিপন্থী দীর্ঘ সমাসবহুল শ্লোকসমূহদ্বারা এই কাব্য অনেক স্থলে ভারাক্রান্ত হইয়া থাকিলেও বহুলাংশে সুললিত ও বেগবান ছন্দে ভাব ও প্রাণময় কবিতা এই কাব্যকে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে।

"ব্রহ্মাস্বাদসহোদর" রসের অনুভূতি এই কাব্যে—আবার শুনিতে পাই রামগুণগান মধুর বীণাধ্বনির মত ছন্দে ছন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। ক্ষুদ্র কাব্যবিচারের বহু উর্ধ্বে পাঠকের হৃদয় ধীরে ধীরে উত্তোলিত হইতে থাকে এবং এক অলৌকিক অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে আপ্লুত হয়—তখন আমার আমিত্ব বিস্মৃত হইয়া যাই,—রামময় এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনায় গাহিয়া উঠি :

"মনোঽভিরামং নয়নাভিরামং, বচোঽভিরামং শ্রবণাভিরামম্।
সদাভিরামং সততাভিরামং, বন্দে সদা দাশরথিং রামম্।"

প্রহসনের আলোকে মধুপ্রতিভা

শ্রীঅনিলকুমার হালদার

যে গভীর হাস্যরস বা হিউমার প্রহসন-জাতীয় রচনাকে কালোত্তীর্ণ করে মধুসূদনের দু'অঙ্ক বিশিষ্ট দু'খানি প্রহসনে তা আছে প্রচুর। জগৎ ও জীবনের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ অথচ ঘৃণা নয়, বিশুদ্ধ কৌতুক ও কিঞ্চিৎ করুণা-মিশ্রিত মনোভাব, প্রচলিত সামাজিকতাকে নীতি-হীন বলে গালি দেওয়া নয় বরঞ্চ একটা ভিন্নদৃষ্টিতে তাকে তুলে ধরা—মধুসূদনের প্রহসনের একটা বিশিষ্টগুণ। নাটকে বিদ্রূপশক্তি বাঞ্ছনীয়, নৈলে তা নাটকই হয় না, কিন্তু মধুসূদন যে সমাজ-জীবনের কথা বলেছেন সেখানে লেখকের যে ধরনের আত্মীয়তা আছে তাতে নির্লিপ্ত থাকা অসম্ভব, অথচ তাও সম্ভব হয়েছে : বাংলা-সাহিত্যে অসম্ভবকে সম্ভব করার দুর্লভ সাধনাই মধুসূদনের সারা জীবনের সাধনা। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' রচিত হয়; বাঙালীর যে চিরন্তন ধর্মপ্রবণতা মধুসূদন তাকে অস্বীকার না করেও উৎকৃষ্ট হিউমার সৃষ্টি করেছেন, যা সমগ্র মধুসাহিত্যেও আর নেই। মধুর মানস-চেতনায় যে তীক্ষ্ণ আদর্শবোধ ছিল চরিত্রভ্রষ্টতা তার পক্ষে অসহনীয়—কিন্তু আশ্চর্য এই যে প্রহসনের আন্তরে এতটুকু উষ্মা নেই, পাত্রপাত্রীর সংলাপে ও আচরণে চমৎকার কৌতুক আছে* এবং, ঐ কৌতুক পাঠকের সঙ্গে একভাবে লেখক নিজেও উপভোগ করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে প্রহসন

বাংলা সাহিত্যে প্রাক্‌মধুসূদনপর্বে প্রহসনের যে সূচনা হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ সে বিষয়ে একমত হলেও, কোন প্রহসন পূর্ববর্তী সে বিষয়ে আদৌ একমত নন, অথচ নাট্যসাহিত্য-আলোচনায় সেগুলির একটা পৃথক মূল্য আছে। ১৮৫৪ খৃঃ লিখিত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে প্রহসনের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকলেও ইহা সর্বৈব নাটক, প্রহসন নয়; পরন্তু বাংলা নাটক ও প্রহসন ঈষৎ ভিন্নভাবে উৎসারিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি বিকৃতরুচি নাগরিক সভ্যতায় চপ্‌কীর্তন, তরজা, খেউড়, আখড়াই ইত্যাদি যে সমস্ত আদিরসাত্মক অমার্জিত কাহিনী-গান দেখা দিয়েছিল—সেগুলিই পরিবর্তিত হয়ে ব্যঙ্গরসাত্মক প্রহসনে স্ফূর্ত হয়ে উঠল, সংস্কার-প্রচেষ্টার সন্ধানও এই জাতীয় নক্‌সা রচনায় দেখা যায়।[১] সার্থক প্রহসন হিসাবে প্রাক্‌মধুসূদনপর্বে একটি প্রহসনের নাম করা যায়—মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা' (১৮৫৮)[২]; ভিন্ন মতও আছে—'বঙ্গভাষার প্রহসন আগেই রচিত হইয়াছিল। রামনারায়ণের "উভয় সঙ্কট", "যেমন কর্ম তেমন ফল" "চক্ষুদান"—এই তিনখানি বঙ্গসাহিত্যের প্রথম প্রহসন।' (বঙ্গসাহিত্য পরিচয়—৩য়, শ্রী কালিদাস

---

* অর্থাৎ—'purely secular nature, without any very obvious ethical moral, and usually farcical in tone' (The World Drama—Nicoll, Page-167)

১ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, (২য়) ডাঃ সুকুমার সেন পৃঃ ১১

২ Ibid—পৃঃ ৩৩

রায়, পৃঃ ৬১)। 'বতমুরস্কানা বাবু' 'উভয় সঙ্কট'—১৮৬৯, 'যেমনকর্ম তেমনফল'—১২৭৯, 'চক্ষুদান' —১৮৬৯-এ রচিত। মধুসূদনের দুখানি প্রহসনই ১৮৬০ বা ১২৬৬-তে প্রকাশিত, সুতরাং এরা কালের ব্যবধানে পূর্ববর্তী মনের ব্যবধানেও। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা' মধুসূদনের দু'বছর আগের লেখা; এখানে 'নেশাখোর যুবকদের দুরবস্থা'র চিত্র আছে, ছোটলোকের বিদ্যানুরাগ ও ভদ্রব্যবহারে ভদ্রলোকের গাত্রদাহের চিত্রও আছে।[৩] মধুসূদনের প্রহসনে—'একেই কি বলে সভ্যতা'-র নেশাখোর যুবকদের দুরবস্থার কথা থাকলেও সেটা মুখ্যকথা নয়, আর দুবছরের মধ্যে সামাজিক অবস্থার আকস্মিক আসমান-জমিন ফারাকের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না, সুতরাং বিষয়বস্তু নির্দ্ধারণে মধুসূদনের মৌলিকতার দাবী অবিসংবাদিত এবং তাঁকে আমরা 'an advanced dramatist' বা 'a man of new ideas' হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি; সে পরিচয় তিনি এর পূর্বেই দিয়েছেন; তবে এটা আদৌ প্রহসন কিনা এ প্রশ্নও জনৈক সমালোচক তুলেছেন।[৪] তাঁর মতে Ben Jonson আদির comody of humour এর আদর্শেই একধরণের কমেডি তিনি রচনা করেছেন, এটা Satireএর সমগোত্রীয় farceএর কিছু কিছু গন্ধও আছে।[৫] সবকিছু বাদ দিলেও মধুসূদনের ঐ দুখানি গ্রন্থ যে 'surest symptom of intellectual vitality' তা অস্বীকার করার ক্ষমতা কাহর নেই।

কাহিনী ও নামকরণ

ভক্তপ্রসাদবাবু অতিমাত্রায় বকধার্মিক, বাহিরে সাধু অন্তরে লম্পট—তাঁর লাম্পট্য অধীনস্থ মুসলমান দরিদ্র প্রজা হালিকশাহীর পত্নীর উপর পতিত হলে ভগ্ন শিবমন্দিরে সন্ধ্যায় তাঁর অসৎ কর্মের সঙ্গী পুঁটী ইত্যাদির চেষ্টায় তা ঠিক ঠিক প্রতিপালিত হবার মুখে হঠাৎ পঞ্চানন বাচস্পতির চক্রান্তে তিনি কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম পেয়ে সে কর্ম থেকে একেবারে ক্ষান্ত হন—'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনখানিতে দু'অঙ্কে এ' কাহিনীই বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, 'একেই কি বলে সভ্যতা'-র নায়ক হলো নবকুমার, উদ্‌ভ্রান্ত, শিক্ষিত, মদ্যপ, ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিভূ, জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার পুরোধা ও প্রতিষ্ঠাতা, রাত্রে মাতাল অবস্থায় বহুদা ভগিনীকে নির্বিকার চিত্তে চুম্বন করেন, প্রলাপ বকেন, উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করেন; তাঁর মা অস্থির হয়ে উঠলে পিতৃদেব সমস্ত উপলব্ধি করে 'হায়! আমার বংশেও এমন কুলাঙ্গার জন্মেছিল!' বলে আক্ষেপ করেন। 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ'-র পূর্বেকার নাম 'ভগ্নশিবমন্দির'; তার চেয়ে পূর্বোক্ত নামটী গভীর ব্যঞ্জনাবহ; প্রচলিত প্রবাদ-বচনকে গ্রহণ করে মধুসূদন একটা সহজ সত্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু 'একেই কি বলে সভ্যতা'র সে নিহিতার্থ গভীর নয়—

---

৩ বাংলা সাহিত্য,—ডাঃ মদনমোহন ঘোষ পৃঃ ৩১৯
৪ Ibid ঐ পৃঃ ৩৪২
৫ বার্ণাড শ'র ভাষায়—From Moliere to Oscar Wilde we had a line of comedic play —wrights who, if they had nothing fundamentally positive to say, were at best in revolt against falsehood and imposture, and were not only, as they claimed, chastening morals by ridicule', but in Johnson's phrase, clearing our minds of cant, and thereby showing an uneasiness in the presence of error which is the surest symptom of intellectual vitality.

উদ্দেশ্যকে নিরাবরণভাবে এটা প্রকাশিত করে দিয়েছে, নাটকারের মনোভাব এখানে পরিহাস-মুখরতার উজ্জ্বল হয়ে না উঠে প্রশ্নবোধক বাক্যে নিঃশেষিত হয়েছে। অলঙ্কারশাস্ত্রে এটাকে এক ধরণের অলঙ্কার বলে, অর্থ হলো এটাকে সত্যতা বলে না—অর্থাৎ প্রশ্নের দ্বারা নঞর্থের সূচনা। কাহিনী হিসাবে 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ' 'সার্থক, কিন্তু 'একেই কি বলে সভ্যতা'র কাহিনী নেই বললেই চলে। বুড়োশালিকের ইংরাজী নাম The Silvered Bake (মধুস্মৃতি পৃঃ ১০২)।

প্রহসনের নরনারী ও সমাজচিত্র

'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-র পুরুষ চরিত্র—ভক্ত প্রসাদবাবু, পঞ্চানন বাচস্পতি, আনন্দ বাবু, গদাধর, হানিফ গাজী ও রাম; নারী চরিত্র—পুঁটি, ফতেমা, ভণ্ডী ও পঞ্চীর প্রতিটি চরিত্রই আপন মহিমায় আলোকিত; সে চিত্র এত স্বাভাবিক ও উজ্জ্বল যে লেখকের নামোল্লেখ না করে দিলে এটা যে আদৌ মধুসূদনের রচনা সে সন্দেহও কারও মনে জাগে না। আপন ব্যক্তিত্বের এমন নির্লোপ ও নিরন্তিত্ব মধুসূদনের অন্য কোন রচনায় নেই, বিশেষতঃ কবি হিসাবেও মাইকেল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পুরোধা। সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার এই যে স্বাতন্ত্র্য বা নৈর্ব্যক্তিকতা নাটক হিসাবে (কারণ প্রহসন নাটকই) একে উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেছে। বাংলাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-কাহিনীর মধ্যে যে ধরণের আন্তরিকতা ও অভিজ্ঞতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে মধুসূদনের এই নাটকে যে সমাজচিত্র অঙ্কিত হয়েছে এবং কুশীলবের সংলাপে ও আচরণে যে স্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয় তাও ওরই সমগোত্র; কিন্তু কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তাতে মুসলমান-সমাজ ও অন্যান্যজাতীয় নরনারীর জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কোন হদিশ মেলে না। ছেলেবেলায় ১৩ বছর বয়সের সময় তাঁকে গ্রাম ছেড়ে আসতে হয়, অবশ্য উত্তীয়মান কবির মুখে এরপরে আমরা শুনেছি—'It is the language of fishermen',—fishermen কি ভাষায় কথা বলে মাইকেল জানতেন? মেঘনাদ-বধ কাব্যে মাইকেল তূর্যধ্বনি করেছেন এবং সে মূর্তি এত গম্ভীর যে সময় সময় মনে হয় লোকটা বজ্রকঠিন, প্রায় পাথরে গড়া—এমন গম্ভীর সাহেব-মানুষটা সহসা এত পরিহাস-কুশলী, কৌতুকপরায়ণ, রসিকতা-উজ্জ্বল হয়ে উঠল কি করে? আশ্চর্য্য নয় কি? হানিফের বাড়িতে ঢুকে পুঁটি বলছে:

'থু, থু! পাতিনেড়ে বেটাদের বাড়ীতে আসতেও গা বমি বমি করে। থু, থু কুঁকড়োর পাখা, প্যাজের খোসা। থু, থু। তা করি কি?'

চোখের সম্মুখে একটা পরিষ্কার চিত্র ও মানুষটার মুখের আদলটা এখানে যেভাবে ফুটে উঠেছে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে তার অভিস্ফুরণ বোধ হয় অসম্ভব, বোধ হয় বললাম এইজন্য যে মধুসূদনের প্রত্যক্ষ দর্শনের ইতিহাস অজ্ঞাত। তাঁর জীবনী-কারদের মতে নারীঘটিত কোন কলঙ্ক তাঁর চরিত্রে স্পর্শ করেনি—অথচ 'একেই কি বলে সভ্যতা'র—বারবিলাসিনীদ্বয়ের যে চিত্র আছে মধুসূদন তা জানলেন কি করে? —'যাঁড়া না, বাড়ী যাই আগে। আজ বুড়ো খেজরা যে বিষ ঝাড়বো।' —এ কথার যে বাস্তব রস তা বলে বুঝোবার নয় এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-র একজন অশিক্ষিত পল্লী

বধূ ফতেমা তখন বলে—"তা' ভাই, যার যেমন নসিব্। তুই মোকে জওয়ানখসম ছেড়ে একটা বুড়োর কাছে যাতি বলিস্, তা সে বুড়ো মলি ভাই আমার কি হবে?'—এই একটা কথায় মাইকেল মন-জানার যে যাদুবিদ্যার নিদর্শন দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধুর গুরু হিসাবে তাঁর আসন অটল। আরো আছে: নব্যশিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের অধঃপতন এবং প্রাচীন হিন্দুসমাজের অন্তঃসারশূন্যতা, ভণ্ডামি ও কপটাচার—এই হলো তাঁর দু'খানি প্রহসনের আলম্বন। এর মধ্যে ইয়ংবেঙ্গলের সমগোষ্ঠী মধুসূদন স্বয়ং; কিন্তু হিন্দু সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ তাঁর অনুভবের বিষয়, দর্শনের নয়; উপরন্তু এটাও লক্ষণীয় যে, আত্মবীক্ষণক্ষমতা এবং নিরপেক্ষ সহৃদয়তা তাঁর মধ্যে এত উগ্র ছিল যে, ভালমন্দের বিচারে তাঁর এতটুকুও ভুল হয়নি। 'একেই কি বলে সভ্যতা'-য়—ঈষৎ আত্মপ্রতিফলন আছে, সেটাই দীনবন্ধুর সধবার একাদশীতে স্ফুটনোন্মুখ, সুতরাং সধবার একাদশী পূর্বোক্ত প্রহসনের অনুবৃত্তি মাত্র।

'একেই কি বলে সভ্যতা'-র পুরুষ চরিত্র: কর্তামহাশয়, নবকুমার, কালীবাবু, বাবাজী, বৈদ্যনাথ, বাবুগণ, সারজন, চৌকীদার, যাত্রীগণ, খানসামা, বেহারা, দরওয়ান, মালী, বরফওয়ালা, মুটিমাঝি, মাতাল। নারীচরিত্র: গৃহিণী, প্রসন্নময়ী, হরকামিনী, নৃত্যকালী, কমলা, সরোবরী, নিতম্বিনী ও বারবিলাসিনীদ্বয়। প্রতিটি চরিত্রের—কি পুরুষ, কি নারী—একটা বিশিষ্ট ভঙ্গিমা ও স্থান অর্থাৎ স্বকীয়তা আছে: তারা প্রাণরসে সমুজ্জ্বল, বাস্তবতার পাদপ্রদীপে প্রখরভাবে আলোকিত। নবকুমার ইয়ংবেঙ্গলের প্রতিনিধি; তৎকালীন সমালোচকগণ, এর তীক্ষ্ণতা ও সজীবতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বঙ্কিমের মত খিটখিটে রুচিবাগীশ লেখকও লিখছেন: "Is this civilization?' is the best in the language." বৈষ্ণবদের প্রতি যে কারণেই হোক মধুসূদনের এক ধরণের আকর্ষণ ছিল—বাবাজীর চরিত্রে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। চৌকিদার-সারজন-বাবাজী অংশে রসিকতার চূড়ান্ত স্বাক্ষর এবং প্রসন্নময়ী প্রমুখের ছোট ভাণখেলার দৃশ্যে মধুসূদন পাঠক-দর্শকের মনোরঞ্জন করেছেন। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-র মধ্যেও গদা ও রামের তামাক ও তাকিয়া ব্যবহারের চটুলতার মধ্যেও ঐ হাস্যরসের ঝলক মাইকেল দেখিয়েছেন।

মূল্যায়ন

কিন্তু সবকিছুই এক সংলাপের মধ্যে স্ফটিকের মত সংহত ও স্বচ্ছ আকারে দানা বেঁধে রয়েছে। মধুসূদনের মধ্যে যখন দানবীয় শক্তি বহিঃপ্রকাশের জন্য মাথা খুঁড়ে মরছিল, জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষায় এবং ঐ শক্তির প্রেরণায় পাগলের মত নিষ্ফল ছুটাছুটি করে যখন তিনি দেশে বিদেশে ফিরছেন, ঠিক তখনই গভীর বিস্ময়ে দেখলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই সমাজেই তাঁর স্থান নেই। তাই সত্যশিবসুন্দরের একনিষ্ঠ উপাসক শৃঙ্খলিত প্রমিথিউসের মতই দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। তাঁর ঊর্জস্বলতা ও অনন্যতা যথার্থরূপে আলোচ্য প্রহসন দু'খানিতে শতধারে বিকীর্ণ হয়েছে—দৃঢ় নির্ভীকতার সঙ্গে তিনি সমাজের স্বরূপটা গোচরীভূত করেছেন, অথচ শিল্পের দিক দিয়ে তা অক্ষুণ্ণই আছে অর্থাৎ কাহিনীকে চাপা দিয়ে উদ্দেশ্য কোথাও প্রধান স্থান অধিকার করেনি। সংলাপ সংযোজনায়, এই প্রহসনে মাইকেল অপ্রতিরথ—

এখানে স্মরণীয় এই যে, মাইকেল এর পূর্বে বাংলা জানতেন না, প্রায় বলতেনও না ; বাংলা-ভাষার শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশের অভীপ্সাও তাঁর ছিল না—ছিল ইংরেজী ভাষায় মহাকবি হবার অসম্ভব আশা। হানিফ থেকে আরম্ভ করে বাচস্পতি ও নবকুমার ও চৌকিদার পর্যন্ত যে ভাষায় কথা বলে মাইকেল তা অবিকল নকল করেছেন। উৎকর্ষের প্রমাণ হিসেবে বলতে পারি প্রহসন দু'খানি দুটো সমাজকেই অতিমাত্রায় প্রভাবিত করেছিল এবং এর অভিনয় বন্ধ করতে রাজারা বাধ্যও হয়েছিলেন। মধুসূদন ভাঙা গলায় রাগত স্বরে বলছেন :

'I half regret having published those two things'

আবার—'You broke my wings once about the farce ; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew or Chinese !'

অন্যত্র অন্য লেখক প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন—'বহুকাল এই প্রহসনের [বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।] অভিনয় বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। শুনিয়াছি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে হিন্দী ভাষায় ইহা অনুদিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল।' (মধুস্মৃতি, পৃঃ ১০২)

প্রতি ভাষার একটা বিশিষ্ট ছন্দ ও ধ্বনিসৌষম্য থাকে। সুতরাং বাংলা ও ইংরাজী মিশিয়ে বললে উভয় ভাষারই ছন্দপতন ঘটে। ইংরাজী ও বাংলা মিশিয়ে যে কথা বলত, মাইকেল তার উপর ভয়ঙ্কর চটে যেতেন। কারণটা ঐ একই,—'you sacrifice the rhythm of it.' এত সতর্ক কান ছিল বলেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্র কথাবার্তায় এতটুকুও বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। কারো কারো মতে মলিয়ের লিখিত তারতুফ (Tartuffe) নাটকের প্রভাব— 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র উপর আছে ; কি অন্যায়। একেই কি বলে সভ্যতা ? কোন্ নাটকের প্রভাব আছে ? গবেষণা করা প্রয়োজন !

অপর একজনের মতে 'মেঘনাদবধ'-এ মাইকেল পিতৃভাষা, এবং এই প্রহসনদ্বয়ে 'নিজস্ব মাতৃভাষা' ব্যবহার করেছেন। কথাটা অনুধাবনযোগ্য, কারণ সংলাপের সমগ্র কৃতিত্ব ছোট করে এখানে বলা হয়েছে। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-তে ভক্তপ্রসাদ ভারতচন্দ্র থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছে—এটা মাইকেলের পূর্ববর্তী শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের জনপ্রিয়তার প্রমাণ এবং শিল্প-কৌশলের দিক দিয়ে কাহিনীর আদিরসাত্মকতাকে দ্রুতভালে এগিয়ে দিয়েছে।

প্রহসন দু'খানির নায়কচরিত্রে যে লাম্পট্য ও ব্যভিচারের কলঙ্ক আছে তার পিছনে ধনৈশ্বর্যের সহায়তাও সঙ্কেতিত হয়েছে, ভক্তপ্রসাদ টাকা দিয়ে বাচস্পতি ও হানিফের মুখ বন্ধ করেছে, টাকা দিয়ে অসৎকর্মের ওপর সুধাবরণ দিতে চেষ্টা করেছে। এ' হলো সর্বকালের নীতি, অর্থাৎ 'Beautiful sins, like beautiful things, are the privilege of the rich.' রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের অব্যবহিত পরেই কালীনাথ বলেছে—'যখন আমাদের সাবস্ক্রিপ্‌সন লিষ্ট অতি পুরোর ছিল, তখন আমরা নিজে থেকে টাকা দিয়ে সভাটি সেভ্ করেছিলাম,—।'

'কর্ত্তাবাবু, আমি ঘরে আসে কর্ত্তার তল্লাস্ কল্লাম, তা সকলে বল্যে যে, সে এই ভাঙ্গা মন্দিরির দিকে পুঁটির সাতে আস্তেছে, তাই তারে ঢুঁড়তি ঢুঁড়তি আস্তে পড়িছি। আপনার

যে মোচনমান-হর্তি সাধ্ গেছে, তা জান্তি পারি ভাবনা কি ছিল ? ফতি তো ফতি, ওর দ্বারেও সোনার চাঁদ আপনারে আগে দিতি পাত্তাম ; তা এর জন্ত আপনি এত তড়্পি যেলেন কেন ? তোবা ! তোবা !'

ঠিক এর পাশে—'শুনেছি রাক্ষসপতি ! মেঘের গর্জনে,
সিংহনাদে, জলধির কল্লোলে, দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন পথে
কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর ঘোষন্ত-টঙ্কার।'

এ' দুটোই একই লেখকের লেখা, সুতরাং মিলিয়ে দেখলে মাইকেলের সংলাপ-সাধনার কঠোরতা সহজেই উপলব্ধ হবে। নাট্যিক ক্রিয়া ও ফলশ্রুতি হিসাবে কাহিনীর ঘনীভবনের কথা উল্লেখ করতে হয়। মূলকথা শুধু নয়, আরম্ভ থেকে উপান্ত পর্যন্ত রুদ্ধশ্বাসে, একমুখে ত্বরিৎগতিতে ঘটনা এগিয়ে চলেছে এবং ঐ কাহিনী শুধুমাত্র কল্পনার ক্ষণবিলাস নয় জীবন-সমীক্ষা—"an illuminating commentary on life"—এরও স্বীকৃতি আছে। কিন্তু 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র শেষ কবিতাটী ভক্তপ্রসাদের মুখে বসানর ফলে সমস্ত হাস্তমুখর পরিবেশটা অকস্মাৎ ছিন্নমূল হয়ে গেছে ; নিঃসন্দেহে এটা মধুসূদনের অপ্রমনস্কতার ফল, অর্থাৎ ত্রুটি। তথাপি একটা প্রহসন নগরকেন্দ্রিক অন্তটা পল্লীকেন্দ্রিক—নগর ও পল্লীর দুই কেন্দ্রে কাহিনী সংঘটিত হলেও মধুসূদন সদকেন্দ্রেই অবস্থিত। তাঁর চিৎপ্রকর্ষের উর্ণায়ণ ও সমুন্নতি কালানুক্রমিক হিসাবে সর্বপ্রথম পূর্ণায়তভাবে এখানে প্রকাশিত হয়েছে ; এবং এ কথা বলার পূর্ণ অধিকার তাঁর আছে যে—"I altered the mind of men and the colours of things ; there was nothing I said or did that did not make people wonder !"

লোককে আশ্চর্যান্বিত করবার বাজী রেখেই ত' মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে হাত দিয়েছিলেন।

ভিতরে-বাহিরে

শ্রীপ্রমথনাথ কুমার

সবখানে ভাই,—হেথায় হোথায়
বিশেষ সীমায় নয়,
আলোকে-আঁধারে ভিতরে-বাহিরে
নিখিল বিশ্বময়।

দেবতা-দেউলে, পতিতার গেহে,
খাতকের ঘরে,—তাও ;
আকাশে-বাতাসে মরু-প্রান্তরে
যেখানে যে-ভাবে চাও !

সবারে ল'য়ে সে—তারে ল'য়ে সব
ভিন্ন নাহিক হায়,
সে যে অতুলন অমৃতের হ্রদ,
সৃষ্টি করেছে তায় !...

বেদচর্চায় বাংলা দেশ

অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য

সেকালের বাংলাদেশে নানা শাস্ত্রে নানা বিদ্যায় বিশিষ্ট প্রতিভা প্রকাশ পেয়েছিল, এবিষয়ে মতভেদ নেই। কিন্তু প্রাচীন বঙ্গের পণ্ডিতেরা বেদবিদ্যার অনুশীলনেও যে যথোচিত আগ্রহ দেখিয়েছিলেন এমন কথা অনেকে মানেন না। বাঙ্গালীর প্রতিভার সাক্ষ্যস্বরূপ যে সব গ্রন্থ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, তার মধ্যে বৈদিক গ্রন্থের সংখ্যা কম।

প্রত্নবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করেছেন বাংলা দেশ সুদীর্ঘকাল বৈদিক সভ্যতার গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সুদূর অতীতে পঞ্চনদের আশেপাশে গঙ্গার, কেকয়, মদ্রজাতির মধ্যে আর মধ্যদেশের কুরুপঞ্চালদের মধ্যেই বেদের প্রভাব নিবদ্ধ ছিল। উত্তরকালে ধীরে ধীরে বৈদিক ধর্ম এবং বৈদিক সংস্কৃতি ভারতবর্ষের পূর্বদিকে প্রসারলাভ করে। এ সিদ্ধান্ত সত্য হ'লে প্রাচ্যদেশে—অঙ্গে বঙ্গে পরে বেদাচার প্রবর্তিত হয়েছিল একথা মানতে হয়। অথর্ববেদে একজন ঋষি প্রার্থনা করেছেন—অরোগ (তক্মন্) এদেশ ছেড়ে সুদূর অঙ্গ ও মগধ আক্রমণ করুক। অনুমান করা হয় যে, বিধর্মীর দেশ বলেই অঙ্গ আর মগধের উপর বৈদিক কবির বিদ্বেষভাব ফুটে উঠেছিল। বঙ্গদেশের অবস্থান অঙ্গ-মগধ অপেক্ষা আরও পূর্বদিকে। কাজেই সেখানে বৈদিক ধর্ম প্রবেশ করতে সময় লেগেছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে একটি আখ্যান পাওয়া যায় যে, বিদেঘ মাথব নামে এক ব্যক্তি বৈদিক সভ্যতার কেন্দ্রভূমি-সরস্বতী তীর থেকে যাত্রা করে সদানীরা নদীর অপর পারে বিহারের তিরহুত প্রদেশে অগ্নিকে নিয়ে আসেন। এই কাহিনীটির মধ্যে ভারতের পূর্বাংশে বাগযজ্ঞ প্রবর্তনের ইতিহাস সূচিত আছে বলে অনেকে মনে করেন। ঐতরেয় আরণ্যকে আছে—বঙ্গ, মগধ আর চেরপাদেরা নিয়ম লঙ্ঘন করত। এই উক্তি বেদধর্মগঙ্ঘনের ইঙ্গিত বলে সন্দেহ করা হয়।

বৌধায়ন ধর্মসূত্রের বিধানে পুণ্ড্র আর বঙ্গদেশ শিষ্টজনের অগম্য ছিল। উত্তর বঙ্গের এক অংশের প্রাচীন নাম পুণ্ড্র আর পূর্ববঙ্গই প্রাচীন বঙ্গভূমি। কোন কোন পুরাণের বচন অনুসারেও তীর্থযাত্রা ব্যতীত বাংলাদেশে আগমনে প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ত।

"অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র-মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃসংস্কারমর্হতি॥"

এসব উক্তির মধ্যে বঙ্গদেশের উপর অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। বাঙ্গালীর বেদবিদ্যায় বিমুখতাই এই অবজ্ঞার কারণ কিনা ঠিক বলা যায় না।

খ্রীষ্টজন্মের বহুপূর্বে সুহ্মে ও পুণ্ড্রে, অর্থাৎ পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে জৈনধর্মের প্রাধান্য ছিল, তারি প্রমাণ আছে। প্রতিবেশী মগধ রাজ্যে প্রচারিত বৌদ্ধধর্মের স্রোত গৌড়েও প্রবল ভাবেই প্রবেশ করেছিল এতেও সংশয় নেই। সেইজন্যই হয়ত বেদপন্থী আর্যেরা বঙ্গের অধিবাসীদের অপাঙ্‌ক্তেয় মনে করতেন। কিন্তু এদেশের শিষ্ট সমাজে প্রাচীনকালেই যে বৈদিক ধর্মও সম্মানের আসন লাভ করেছিল—তার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। মহাভারতে কুরু-পঞ্চালদের সঙ্গে পূর্বদেশীয় কলিঙ্গ, মগধ ও পুণ্ড্রের অধিবাসীরাও শাশ্বত ধর্মের অধিকারী বলে বর্ণিত হয়েছেন।

কুরবঃ সহপাঞ্চালাঃ সাল্বা মৎস্যাঃ সনৈমিষাঃ।
কোশলাঃ কাশশৌড্রাশ্চ কলিঙ্গা মাগধাস্তথা।
ক্ষেত্রঞ্চ মহাভাগা ধর্মং জানন্তি শাশ্বতম্॥

কিন্তু বাংলাদেশে যে বারংবার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমদানি করতে হয়েছিল, সে কথাও না মেনে উপায় নেই। একবার অষ্টম শতকে আদিশূর, আর একবার একাদশ শতকে শ্যামলবর্মা অন্যদেশ থেকে বাংলায় ব্রাহ্মণ এনেছিলেন।—সে কাহিনী সুপরিচিত। তার অনেকপূর্বে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি একটি উদাহরণ প্রসঙ্গে লিখে গেছেন :

'লোকেশ্বর আজ্ঞাপয়তি—প্রাগুদক্ প্রাম্যেভ্যো ব্রাহ্মণা আনীয়ন্তামিতি।' অর্থাৎ, নরপতি আদেশ করেছেন—অঙ্গদেশের পূর্ব পর্যন্ত গ্রাম থেকে ব্রাহ্মণ নিয়ে এস।

মনে হয়—পতঞ্জলির সময়ে গুপ্তরাজ পূর্বদেশে ব্রাহ্মণ বসিয়েছিলেন।

অতি প্রাচীন যুগে যেমনই হোক, পরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল। বাংলাদেশের কোন কোন গ্রাম নগর বৈদিক যাগযজ্ঞের জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। এ দেশের ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ্য আর বেদজ্ঞানে এতই বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন যে, অন্য দেশের রাজারা পরম সম্মানের সঙ্গে বাংলার ব্রাহ্মণদের আপন দেশে নিয়ে যেতেন।

দিনাজপুর জেলায় ধামোইরপুর গ্রামের পাঁচখানি তাম্রশাসনের উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, খ্রীষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে গুপ্তরাজগণের শাসনকালে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন। সপ্তম শতকের ঘাতশাসনে দেখা যায় যে, সমতটের রাজার মহাসান্ধিবিগ্রহিক বৌদ্ধ জয়নাথ যথার্থ দানের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণর্ষিগণের পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রবর্তনের জন্যও ভূমি দান করেন। শ্রীচন্দ্রদেব 'কোটিহোমসম্পাদনকারী' পীতবাসকে ভূমি দিয়েছিলেন।

একাদশ শতকের শিলিমপুর প্রশস্তিতে তর্কারি নামে এক গ্রামের উল্লেখ আছে। সেখানে বেদশ্রুতির অনুমোদিত স্মৌত এবং গৃহ্য যজ্ঞে আহুতি নিক্ষেপের ফলে আকাশে হোমধূম উত্থিত হত।

পালরাজ দেবপালের মন্ত্রী দর্ভপাণির মুখে চার বেদ শোভা পেত। দর্ভপাণির পৌত্র কেদারমিশ্র চারটি বেদসমূহ গান করে আবার উদ্গিরণ করতেন। গুরব মিশ্র ছিলেন 'সমগ্র ও সাঙ্গবেদের অধীতী' এবং 'মহাদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা'।

উত্তর রাঢ়ের অধিবাসী বেদজ্ঞ নারায়ণ তাঁর 'ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশে'র আরম্ভে নিজের পরিচয়ে বলেছেন যে, তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে পরিতোষ ছিলেন 'সোমপীথী' এবং 'বেদের দেহবন্ধ'। এতে প্রমাণিত হয় যে একসময়ে বাংলা দেশে সোমযজ্ঞের প্রচলন ছিল।

একাদশ শতকেরও পূর্ববর্তী কর্কাচার্য তাঁর স্মৌতসূত্রভাষ্যে বলেছেন যে, কেবল কুরুপঞ্চালেই নয়, অঙ্গ, বঙ্গ এবং সুহ্মাদি দেশেও রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়।

নহি শাস্ত্রে দেশব্যবস্থা কুরুপঞ্চালজাতীয়স্যৈব রাজসূয়ঃ কর্তব্য ইতি সর্বস্য বিহিতত্বাৎ। অঙ্গা বঙ্গাঃ সুহ্মা ইতি চৈবমাদীনাম্।

বিশ্বেশ্বর শম্ভু নামে একজন মহাবেদবিৎ পণ্ডিত দক্ষিণ রাঢ়ার পূর্বগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কাকতীয়বংশীয়া রুদ্রাম্বার শিলাস্তম্ভলিপি থেকে জানা যায় যে, এই বিশ্বেশ্বর ত্রয়োদশ

শতকের মধ্যভাগে কাকতীয় এবং কলচুরি রাজপরিবারে মহাসম্মান লাভ করেন। তিনি কাকতীয়গণের প্রদত্তভূমিতে জব্বলপুরের কাছে 'বিশ্বেশ্বর গোলকী' নামে এক বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেন। গোলকীর শিক্ষাব্যবস্থায় বিশ্বেশ্বরের কৃতি-নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মহাবিদ্যালয়ে নানা শাস্ত্রের পঠন-পাঠন হত। ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ অধ্যাপনের জন্য তিনজন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন।

বাঙ্গালীর বেদজ্ঞতার বহুপ্রমাণ সত্ত্বেও বরদরাজমিশ্র তাঁর 'কুসুমাঞ্জলি-বোধিনী' টীকায় গৌড়বাসীদের বেদজ্ঞান সম্পর্কে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। ভট্টোজী দীক্ষিতের শিষ্য আর একজন বরদরাজও তাঁর 'স্মৃত্যর্থসারমঞ্জরী' গ্রন্থে বেদত্যাগ গৌড়দেশের দুরাচার বলে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু তাম্রশাসন শিলালিপির প্রমাণ অগ্রাহ্য করা চলে না। নানা শাসনে নানা লিপিতে দেখা যায় যে, প্রাচীন বঙ্গে ঋক্ সাম যজু অথর্ব এই চার বেদের ব্রাহ্মণ বর্তমান ছিলেন। তাঁরা কেউ ছিলেন বেদাধ্যায়ী, কেউ ছিলেন 'বেদৈকদেশাধ্যায়ী'। বর্ণনায় এই পার্থক্য দেখে মনে হয় যে প্রকৃত পক্ষে যিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করতেন, তাঁকে বলা হয়েছে বেদাধ্যায়ী। আর যিনি স্বশাখার অংশমাত্র পাঠ করতেন তাঁকে বলা হয়েছে 'একদেশাধ্যায়ী।'

বল্লালসেনের গুরু অনিরুদ্ধভট্ট বরেন্দ্রভূমিতে 'বেদার্থ' ও 'স্মৃতি' ব্যাখ্যায় শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন। অনিরুদ্ধের 'পিতৃদয়িতা' থেকে জানা যায় যে, তাঁর সময়ে (একাদশ শতকে) বাংলা দেশে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পাওয়া যেত। শ্রাদ্ধে 'অগ্নিহোত্রী' ব্রাহ্মণ সশরীরে উপস্থিত থাকতেন। বর্তমানকালের মত প্রতিনিধি কুশময় ব্রাহ্মণ আবশ্যক হত না। এসব প্রাচীন বাংলার বৈদিক সংস্কৃতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

বাঙ্গালীর বেদজ্ঞতার প্রত্যক্ষ এবং প্রবল সাক্ষী কয়েকখানা বৈদিক ব্যাখ্যা। চতুর্দশ শতকে রচিত সায়ণাচার্যের বেদভাষ্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কিন্তু সায়ণের বহু পূর্বে বাঙ্গালী বিদ্বান গুণবিষ্ণু এবং হলায়ুধ বেদমন্ত্রের অপূর্ব ভাষ্য রচনা করেছিলেন। সায়ণের পরে রামনাথ এবং রামকৃষ্ণ নামে আরও দুজন বাঙ্গালী বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। এঁদের ভাষ্য বা ব্যাখ্যার হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যায়। এখনও সব ছাপানো হয়নি।

বাঙ্গালী রচিত বেদব্যাখ্যার মধ্যে গুণবিষ্ণুর 'ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য' সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ভাষ্যকারের তেমন কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। ভাষ্যের কোন কোন পুঁথিতে তাঁর পিতার নাম আছে 'ধামুক'। ছন্দোগ অর্থাৎ সামবেদীয়গণের জাতকর্ম থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত নানারূপ ধর্মানুষ্ঠানে যে সব বৈদিক মন্ত্র পাঠ করতে হয়, গুণবিষ্ণু সেগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। সামবেদের 'মন্ত্রব্রাহ্মণ' ও বেদমন্ত্রের সঙ্কলন গ্রন্থ। গুণবিষ্ণু এই মন্ত্রব্রাহ্মণের উপরও ভাষ্য রচনা করেছিলেন। সায়ণরচিত মন্ত্রব্রাহ্মণ-ভাষ্যে গুণবিষ্ণুভাষ্যের বহু উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। গুণবিষ্ণু কিংবা সায়ণের মন্ত্রব্রাহ্মণ-ভাষ্য কোনটিই আজও সম্পূর্ণ ছাপা হয়নি। ছাপা হলে দুই ভাষ্যের তুলনা সহজ হবে এবং বাঙ্গালীর বেদজ্ঞতার প্রমাণ আরও স্পষ্ট হবে।

প্রসিদ্ধ স্মার্ত রঘুনন্দন তাঁর নানাগ্রন্থে বারংবার গুণবিষ্ণুর নাম করেছেন, রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থে গুণবিষ্ণু-ভাষ্যের অনুসরণ করেছেন। 'ষট্‌কর্মব্যাখ্যান-

চিন্তামণি' প্রণেতা নিত্যানন্দ এবং 'মন্ত্রার্থদীপিকা' প্রণেতা শত্রুঘ্নও গ্রন্থারম্ভে গুণবিষ্ণুর ঋণ স্বীকার করেছেন। এঁদের সকলের কাছেই গুণবিষ্ণু অতি প্রাচীন ও প্রামাণিক বেদব্যাখ্যাতা-রূপে সমাদর পেয়েছেন। দ্বাদশ শতকের গ্রন্থে তাঁর নাম পাওয়া যায়, সুতরাং তিনি তার পূর্ববর্তী।

বাংলার আর একজন বৈদিক গ্রন্থকার হলায়ুধ। তিনি তাঁর ব্রাহ্মণ-সর্বস্বে নিত্যোপযোগী বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। ইনি গ্রন্থের ভূমিকায় যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাতে তৎকালীন বাংলাদেশের বেদচর্চা সম্পর্কে সুন্দর একখানা চিত্র পাওয়া যায়। হলায়ুধ বাৎস্যগোত্রীয় ধারেন্দ্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ধনঞ্জয় অগ্নিতে আহুতি দিতেন, জ্যেষ্ঠ পশুপতি 'শ্রাদ্ধকৃত্যপদ্ধতি' আর 'পাকযজ্ঞ-পদ্ধতি' নামে দুখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, আর এক ভাই ঈশানও 'দ্বিজাহ্নিক-পদ্ধতি' রচনা করেন। হলায়ুধ নিজে 'ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব' ছাড়া মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব, পণ্ডিতসর্বস্ব এবং 'সংবৎসরপ্রদীপ' নামে একখানা স্মৃতি-গ্রন্থ লিখে-ছিলেন। তিনি পরিষ্কার গৃহ্যসূত্রের উপর ও ভাষ্য রচনা করেছিলেন। হলায়ুধ প্রথম বয়সে লক্ষ্মণসেনের সভা পণ্ডিত ছিলেন, পরে ধর্মাধ্যক্ষের পদলাভ করেন। হলায়ুধের সময়ে বাংলাদেশে প্রচলিত বেদাধ্যয়ন প্রথায় ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। তিনি বলেছেন—বাংলার দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য বৈদিকেরা বেদ মুখস্থ করেন, কিন্তু অর্থবোধের চেষ্টা করেন না। অপরদিকে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ বেদ মুখস্থ করেন না, কোন রকমে মীমাংসা-শাস্ত্রের সাহায্যে যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযোগী মন্ত্রগুলির অর্থ মাত্র শিক্ষা করেন। হলায়ুধ উভয় প্রথারই নিন্দা করেছেন, এবং বেদাধ্যয়নকালে মন্ত্রের আবৃত্তি ও অর্থবোধ উভয়ের আবশ্যকতার পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। হলায়ুধের কথায় বোঝা যায় যে, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে বাংলাদেশে বেদবিদ্যার যথাবিধি অনুশীলন মন্দীভূত হয়ে আসছিল।

মিথিলার প্রাচীন স্মার্ত শ্রীদত্ত উপাধ্যায় এবং বিখ্যাত নিবন্ধকার রুদ্রধর বাচস্পতি, চণ্ডেশ্বর ও বর্ধমান তাঁদের গ্রন্থে হলায়ুধের উল্লেখ করেছেন। এবং তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। পরবর্তীকালে মিত্রমিশ্র প্রভৃতি গ্রন্থকারগণও শ্রদ্ধার সঙ্গে হলায়ুধের নাম করেছেন। পঞ্জাব নিবাসী শত্রুঘ্নমিশ্র তাঁর বেদব্যাখ্যার শেষে বলেছেন :

হলায়ুধেহমী উবটেঽপি চার্থান্ততো বিধেয়ো ময়ি নাবলেপঃ।
রত্নাকরে কিং মণয়ো ন সন্তি তস্মাৎ সমুদ্ধরতি যঃ স ধন্যঃ।

আমি হলায়ুধ আর উবটের কাছ থেকে বেদার্থ আহরণ করেছি, এতে কেউ রুষ্ট হবেন না। রত্নাকরে থাকে রত্ন, যে ব্যক্তি সে রত্ন সংগ্রহ করতে পারে সে ধন্য হয়।

শত্রুঘ্ন তাঁর মন্ত্রার্থদীপিকার প্রায় সমস্ত অংশই হলায়ুধের ব্যাখ্যা থেকে সংগ্রহ করেছেন। তিনি গুণবিষ্ণুরও নাম করেছেন। দুজন বাঙালীর বেদব্যাখ্যা সুদূর পঞ্জাবে রচিত শত্রুঘ্নের গ্রন্থে সম্মান পেয়েছে—এটা প্রাচীন বঙ্গে বেদচর্চার উৎকৃষ্ট স্বীকৃতি।

হলায়ুধের পর রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি আর রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য যথাক্রমে 'সামগমন্ত্র-ব্যাখ্যান' ও 'মন্ত্রকৌমুদী' গ্রন্থে সামবেদীয় গৃহ্যমন্ত্রের ব্যাখ্যা করেছিলেন।

রামনাথের ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে গ্রন্থকার পূর্বগামী বেদভাষ্যগুলির সমালোচনা

প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি গুণবিষ্ণু, হলায়ুধ, সায়ণ প্রভৃতি ভাষ্যকারদের কোন কোন মত খণ্ডন করেছেন এবং নানাদেশে প্রচলিত মন্ত্রপাঠের দোষ গুণ বিচার করেছেন। রামনাথ সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন। তিনি 'ধার্মিক-কর্মরহস্যে'র প্রারম্ভে বলেছেন—গন্ধর্বরায় নামে খ্যাত কুলীন রাজা নারায়ণদেবশর্মার অনুরোধে তিনি বইখানা লিখেছিলেন। রামনাথ নিজে বাইশখানি স্বরচিত গ্রন্থের নাম করেছেন, কিন্তু তাঁর গ্রন্থপুঞ্জের মধ্যে একখানাও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। এসব গ্রন্থ আলোচিত হলে গ্রন্থকারের অতুলনীয় জ্ঞানগৌরব পণ্ডিত-সমাজে বিস্ময় উৎপাদন করবে।

রামকৃষ্ণ 'মন্ত্রকৌমুদী'তে স্বল্পসংখ্যক বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যায় বহুস্থলে স্মৃতিশাস্ত্রোচিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। রামকৃষ্ণ 'অধিকরণকৌমুদী', 'ব্রত-কৌমুদী', 'সত্রকৌমুদী' প্রভৃতি বহু 'কৌমুদী' গ্রন্থের লেখক। এঁর 'অধিকরণকৌমুদী' প্রকাশিত হয়েছে।

সুদূরস্থ বেদভাষ্য ছাড়াও বাঙালীর রচিত ছোট ছোট মন্ত্রব্যাখ্যার বহু পুঁথি বিভিন্ন পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে। বাংলাদেশেও একদিন বেদচর্চার একটা গৌরবময় যুগ এসেছিল, এসব তার প্রমাণ।

কিন্তু আজ অবস্থা অন্যরূপ। আজও বৈদিক আচার পালনে বাঙালীর নিষ্ঠা কম নয়। বাংলার ঘরে ঘরে এখনও বিবাহাদি সংস্কার এবং শ্রাদ্ধতর্পণ গৃহ্যসূত্রের বিধানেই অনুষ্ঠিত হয়, তা'তে বেদমন্ত্রও পঠিত হয়। কিন্তু ত্রুটি হয় মন্ত্রোচ্চারণে। এ ত্রুটি অমার্জনীয়। অর্থবোধ ছাড়া এর প্রতিকার সম্ভবপর নয়।

ঋক্ প্রার্থনা

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

শক্তিযুক্ত হে দেব নেষ্টা*
তুমি যে শুভ কর্মসাধক
মোদের যজ্ঞখ্যাতির বার্তা
তোমারি কণ্ঠে ঘোষিত হ'ক।
ঋতুর সহিত মিলি একত্র
সোমসুধা রস কর হে পান
তুমিই যেহেতু যজ্ঞপ্রধাতা
আমাদের সবে কর তা দান।

* নেষ্টা—সৎকর্মসাধক দেবতা।

সিমাচলম্ঃ বরাহলক্ষ্মী নরসিংহ অবতার

শ্রীসমরজিৎ কর

বঙ্গোপসাগরের প্রান্তভাগ বেয়ে এগিয়ে গেছে পূর্বঘাট পর্বতমালা। তার একপাশে চঞ্চলা ঊর্মিমালার মুখরতা, আর এক পাশে অরণ্য-পরিবেষ্টিত শত শত প্রান্তর। এরই এক কোঁকে মানুষের বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা, ইতিহাসের স্বাক্ষর এবং বিগত দিনের সত্য, আর তীর্থঙ্করদের অমিত শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গিরিশৃঙ্গ সিমাচলম্ এবং দেবেশ্বর বরাহ-নৃসিংহ অবতার।

কলকাতা থেকে সিমাচলমের দূরত্ব প্রায় ৫৪০ মাইল; বঙ্গোপসাগর-তীরবর্তী স্বাভাবিক পোতাশ্রয় ভিশাখাপট্টম থেকে প্রায় সাত মাইল। কিছুদিন পূর্বেও সহর হিসেবে এর অস্তিত্ব ভৌগলিক তথ্যের মধ্যে ছিল না; কিন্তু পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সম্প্রতি এখানে বহু সরকারী এবং বেসরকারী বসতি তৈরী হয়েছে, আর তাদেরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান, ফলে স্থান হিসেবে এর গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে।

বিজয়রূপ : বরাহলক্ষ্মী নরসিংহ অবতার

চন্দনাবৃত বরাহলক্ষ্মী নরসিংহ অবতার

ভিশাখাপট্টম থেকে এখানে বাস বা ট্রেণ, উভয়েই যাওয়া যায়। তবে তীর্থযাত্রীদের পক্ষে বাস-পথই সুবিধের। কারণ রেল স্টেশন থেকে মূল মন্দিরের দূরত্ব প্রায় আড়াই মাইল, আর বাস নৃসিংহ পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে দেয়। বিগ্রহদর্শনের প্রশস্ত সময় সকালে অথবা অপরাহ্ণে। এ ছাড়া দিবাভাগের অন্য সময়, বিশেষ করে' গ্রীষ্মকালে পাহাড়ের ওপর ওঠা বেশ কষ্টসাধ্য।

ভিশাখাপট্টম টাউন থেকে প্রতি আধঘণ্টা অন্তর বাস (৬-৭ নম্বর) ছাড়ে সিমাচলমের মুখে। সহরের উঁচু-নীচু রাস্তা বেয়ে, দুইপাশে ছোট বড় পাহাড়ের গায়ের ওপর দিয়ে কঙ্কোট আর পিচের পথ। কখনও উপত্যকার মধ্য দিয়ে, বিশাখসঙ্কুল অরণ্যানী ছিন্ন করে' দুই একটি বসতির পাশ দিয়ে এগিয়ে গেছে পথচিহ্ন। আধঘণ্টার মধ্যেই বাস পৌঁছে দেয় যথাস্থানে।

বাস-স্ট্যাণ্ডের পাশ দিয়ে নৃসিংহ পাহাড়ের ওপরে সর্পিল পথে উঠে গেছে সহস্রাধিক সোপানাবলী। এই সুপ্রশস্ত সোপানগুলির পাশে কলা, আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের গাছ এবং নানারকম ভেষজ বৃক্ষ। মাঝে মাঝে সিঁড়িগুলি বাঁক ঘুরে এক একটি সমতল চত্বরে গিয়ে পৌঁছেছে। পরিশ্রান্ত তীর্থযাত্রীরা এর ছায়া-শীতল বক্ষে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে' আবার ওপরে উঠতে থাকে।

নৃসিংহ পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় ১১০০ ফুট। এরই কক্ষে প্রায় ৮৫০ ফুট ওপরে ঝর্ণা গঙ্গাধর। অমৃত প্রবাহিনী এই জলসূত্র যেন কঠিন পাষাণের মধ্যে কোমল প্রাণ-প্রতীক, সমস্ত পাহাড়ের একমাত্র প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। যাত্রীদের সুবিধার জন্যে ঝর্ণার চার পাশের কিছু জায়গা বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। অমৃত, অনির্বচনীয় এই জলের স্বাদ। এর শীতল স্পর্শ প্রত্যেকের মনে এক মধুর তৃপ্তি এনে দেয়, নানারকম ভেষজগুণসম্পন্ন এই জল পান করতেও অনেকে এখানে আসেন। প্রত্যেক তীর্থযাত্রীই প্রথমে এখানে এসে স্নান করেন এবং এর জল পান করেন। বৃক্ষলতা-পরিবেষ্টিত, ছায়া-সমাকীর্ণ এই স্থানটি ওপরে ওঠার-সমস্ত ক্লান্তি দূর করে' দেয়।

স্নানের শেষে যাত্রা বিগ্রহদর্শনে। এর জন্যে প্রায় ৫০ ফুট নেমে আসতে হয়। প্রথমে পড়ে প্রাচীন ভগ্নাবশেষের স্বাক্ষর। কতকগুলি বিক্রেতা ফলমূল সাজিয়ে বসে আছে। দেবতার পূজোর জন্যে প্রত্যেক তীর্থযাত্রী একটি নারকেল, দুইটি কলা, দুইটি ধূপকাঠি এবং সামান্য কিছু কর্পূর এখান থেকে কিনে নেয়। এর জন্যে পার্বণী দিতে হয় মাত্র সোয়া পাঁচ আনা। পুরী অথবা উত্তর ভারতের আর সব তীর্থক্ষেত্রের মত এখানে পাণ্ডাজাতীয় লোকের অত্যাচার নেই।

ডানদিকে পড়ে বিরাট এক দুর্গপ্রাচীরের ভগ্নাবশেষ। কথিত আছে এককালে এই স্থানটি দুর্গপরিবেষ্টিত ছিল। কিন্তু মুসলমানদের আক্রমণের ফলে এইটুকুই তার বর্তমান। প্রাচীরের সম্মুখে বিরাট এক নাটমন্দির—পাথরের তৈরী। নাটমন্দিরের পরে সুপ্রশস্ত একটি চত্বর। তার পাশে প্রধান মন্দির, মন্দিরের প্রধান দ্বার মোটা সোনার পাতে মোড়া এবং এর মেঝে মূল্যবান কষ্টিপাথরের তৈরী। এই দ্বারের এক পাশে বসে রয়েছেন মন্দির ট্রাস্টের কেরাণী। এখানে বিগ্রহদর্শনের জন্য তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে মাথা পিছু দশ পয়সা প্রবেশ-মূল্য আদায় করা হয় ও তার জন্যে টিকিট দেওয়া হয়। এই টিকিট দেখে দেব-মন্দিরের প্রধান দ্বারী দেবদর্শনের অনুমতি দেন।

মুখ্যমন্দিরের মধ্যে কষ্টিপাথরের তৈরী আর একটি নাটমন্দির। তারপর বিগ্রহের

আসন, সোনার থালাতে মোড়া একটি আবেষ্টনীর মধ্যে। প্রচলিত রীতি অনুসারে এই আসনকে পাঁচবার প্রদক্ষিণ করে পূজার সামগ্রী উপস্থিত পূজারীর হাতে দিতে হয়।

দেব-বিগ্রহ চন্দনে আবৃত থাকে বৎসরের প্রত্যেকটি দিন। শুধুমাত্র অক্ষয় তৃতীয়ার মুখ্য দেবদর্শন সম্ভব। ঐদিনে দেবের 'নিজস্ব স্বরূপ' প্রত্যেক ভক্তকে দেখানো হয়। বৎসরের অন্যদিনে চন্দনাবৃত বিগ্রহকে শিবলিঙ্গের মত দেখায়। এই বিগ্রহকে কেন্দ্র করে বাৎসরিক যে উৎসবগুলি অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলি হোল : চৈত্রমাস একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত কল্যাণ উৎসব ; অক্ষয় তৃতীয়ার চন্দন-যাত্রা ; বৈশাখী পূর্ণিমা উৎসব ; বৈশাখী চতুর্দশীতে নরসিংহ জয়ন্তী ; আষাঢ়ী পূর্ণিমায় গিরি-প্রদক্ষিণম্ ; বিজয়া-দশমী ; মকর-সংক্রান্তি উৎসব ; পৌষের বেহুলা-অমাবস্যার দীপ উৎসব এবং মুক্তি-একাদশী উৎসব।

মন্দিরের চারদিকে চত্বর। মন্দিরের গায়ে এবং চত্বর-প্রাচীরে পালি এবং প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় বহু লিপি খোদিত আছে। এগুলি থেকে মন্দিরের এবং মন্দিরের স্বার্থে যাঁরা আত্মত্যাগ করেছেন তাঁদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় মেলে।

এখানে রক্ষিত স্থলপুরাণ গ্রন্থ থেকে এই মন্দিরের কথা জানা যায়। এই গ্রন্থে উক্ত হয়েছে যে, হিরণ্যকশিপু পরম বিষ্ণুভক্ত পুত্র প্রহ্লাদের ওপর ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর ওপর বহু অত্যাচার করেন। বিষ্ণুর চিরশত্রু হিরণ্যকশিপু যখন বহু অত্যাচার করেও পুত্রকে বিষ্ণুনাম ত্যাগ করাতে পারলেন না, পুত্রের ওপর ক্রোধাগ্নি ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। স্থলপুরাণে উক্ত হয়েছে যে, এই সিমাচলম্ থেকেই প্রহ্লাদকে সাগরের জলে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু এতেও যখন প্রহ্লাদের মৃত্যু হোল না, তখন হিরণ্যকশিপু তাঁর প্রধান রক্ষীবর্গের সাহায্যে তাঁকে সিমাচলম্ পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে প্রস্তর এবং অরণ্য সমাকীর্ণ গভীর উপত্যকায় নিক্ষেপ করেন। কিন্তু শ্রীবিষ্ণু ভক্তকে রক্ষা করার জন্যে এখানে আগমন করেন এবং ঐ পাহাড়ের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে পাহাড়টিকে কাত করে ধরেন। ফলে প্রহ্লাদ তাঁর অঙ্গে গড়িয়ে যান ও রক্ষা পান। এরপর বিষ্ণু বরাহ-নরসিংহ মূর্তির রূপধরে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। উত্তরকালে দেবের প্রসাদে প্রহ্লাদ কর্তৃক এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরবর্তীকালে মহাতীর্থ এবং বহু দেবারাধ্য এই পবিত্র ক্ষেত্রটি কালের বিবর্তনে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিমজ্জিত হতে থাকে এবং ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এইভাবে অতিক্রান্ত হতে থাকে কয়েক শতাব্দী। তারপর, কথিত আছে রাজা পুরূরবা এবং তাঁর প্রিয়তমা মহিষী উর্বশী স্বপ্নে শ্রীবিষ্ণুর দর্শন পান। শ্রীবিষ্ণু তাঁর মন্দির সংস্কারের জন্যে তাঁকে আদেশ করেন। তাঁকে এ কথাও জানান যে, একমাত্র অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ব্যতীত তাঁর মূর্তিকে যেন চন্দনে আবৃত রাখা হয়। ঐ বিশেষ দিন ব্যতীত অন্যদিনে তাঁকে দর্শন করলে সকলের সমূহ ক্ষতি হবে। এর পর রাজা এবং রাণীর চেষ্টায় সেই স্থানটিকে পরিষ্কার করা হয় এবং বিগ্রহ পূজার সমস্ত ভার তাঁরা গ্রহণ করেন।

স্থলপুরাণের নির্দেশ অনুসারে আজও অক্ষয় তৃতীয়ার দিন পবিত্র চন্দন-যাত্রা উৎসব পালিত হয়ে থাকে। ঐ দিনে বিগ্রহ-গাত্রের সমস্ত চন্দন সরিয়ে ফেলা হয় এবং দেবের 'নিজ স্বরূপ' ভক্তবৃন্দকে দেখানো হয়। এ এক পবিত্র দিন। বহুদূর থেকে সহস্র সহস্র

ভক্ত দেবের নিজস্বরূপ দেখার জন্যে এখানে সমবেত হয়। স্কন্দপুরাণে উক্ত হয়েছে, দেবের এই স্বরূপ দর্শন সকলকে মোক্ষ ফল দান করে। অবশিষ্ট দিনগুলিতে তাঁকে চন্দন দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। এই উদ্দেশ্যে মন্দির ট্রাষ্ট ১২।১৩ জন লোক রেখেছেন। মন্দিরের পাশের চত্বরে এরা বড় বড় চন্দন কাঠ ঘষে' চলেছে সব সময়।

তবে, যদিও সিমাচলমের এই পবিত্র বরাহ নরসিংহ অবতারের আবির্ভাব আজও রহস্য এবং পুরাণ কথার মায়াজালে সীমাবদ্ধ, কিন্তু এর চত্বর অথবা মন্দিরগাত্রে খোদিত লিপিগুলি থেকে এই মন্দিরের অস্তিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিক সত্যতার কিছু আভাস মেলে। এরই ভেতর দিয়ে আমরা পাই প্রাচীন দাক্ষিণাত্যের এক মৌলিক ইতিহাস-সত্তাকে; হিন্দু নৃপতিদের বীরত্ব, ধর্মভাব এবং আদর্শকে। সুপ্রাচীন এই মন্দির বহুকারুকার্যশোভিত, তার কোথাও বা দেব-দেবীর মূর্তি, কোথাও অবতারের বিভিন্ন স্বরূপ, কোথাও প্রাকৃতিক চিত্রাবলীর এক অপূর্ব শিল্প-নৈপুণ্য। এরই মধ্যে রয়েছে মূল মন্দির শীর্ষে এক স্বর্ণচূড়।

প্রাচীর গাত্রের লিপিগুলি থেকে জানা যায়, ১০২১ শকাব্দে (১০৯৯ খৃঃ অব্দ) চোলরাজ কুলটাঙ্গের (যিনি কলিঙ্গ জয় করেন) সময়ে এই মন্দির তীর্থরূপে অভিহিত ছিল। আর একটি লিপিতে জানা যায় ভেলেনাড়ুর রাজা ৩য় গোঙ্কার (১১৩৭-৪৬) রাণী এই মূর্তি স্বর্ণপত্রে আবৃত করেন। কলিঙ্গরাজরাও এই মন্দির পরিশোভন করে বহু অর্থ ব্যয় করেন। রাজা ১ম নৃসিংহ এই মন্দিরের মূলমণ্ডপ, নাটমণ্ডপ এবং বহিরাবেষ্টনী নির্মাণ করেন। এই উপলক্ষে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন এবং মূল্যবান কৃষ্ণপ্রস্তর ক্রয় করে' মন্দিরে দান করেন। এগুলির নির্মাণ ১২৬৭-৬৮ খৃঃ অব্দে শেষ হয়। রাজমুন্দ্রির রেড্ডিরা, অন্ধ্রাদির মধ্যাশ, পকনরলের বিষ্ণুবর্ধন চক্রবর্তীকুল এবং কটকের সূর্যবংশীয় গজপতিগণ ভক্তিতে বিভোর হয়ে এই মন্দিরের উন্নতিসাধনে যত্নবান হন। ষোড়শ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্ধে বিজয়নগর রাজ্যের খ্যাতনামা রাজা কৃষ্ণদেব রায়, উড়িষ্যারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র রায়ের সঙ্গে সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধের সময় ১৫১৬ এবং ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে দুইবার এই মন্দিরে আগমন করেন এবং ভগবান নৃসিংহের পূজা অর্চনা করেন। এই সময়ে এই মন্দিরকে তিনি বহু মূল্যবান অলঙ্কারাদি এবং প্রস্তর দান করেন, বিগ্রহের নিয়মিত ভোগ প্রভৃতি পরিচালনার জন্যে কয়েকটি গ্রামও মন্দিরকে উপহার দেন। প্রসিদ্ধ নৃপতি পটচলপটক প্রভৃতি প্রদত্ত বহু মূল্যবান অলঙ্কারাদি এখানে আজও বিদ্যমান। এই অলঙ্কারগুলির মধ্যে উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে শুধু মূল্য নয়, প্রাচীন অন্ধ্রপ্রদেশের শিল্পীমানস আর অকৃত্রিম শিল্প সাধনা ও শিল্প সৌন্দর্যবোধ।

উড়িষ্যার গজপতিদের পতনের পর (যাঁরা এই অঞ্চলের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্রাট কৃষ্ণরায়ের ওপর ন্যস্ত করেন) এই অঞ্চল গোলকুণ্ডার কুতব সাহেবদের অধীনে গিয়ে পড়ে। এঁদের রাজত্বকালে এঁরা এই মন্দির অপবিত্র করেন, লুণ্ঠন করেন এবং মন্দিরদুর্গ ধ্বংস করেন। এই ধ্বংসের এক অংশ হনুমান দ্বারের কাছে আজও বিদ্যমান। পরবর্তীকালে গোলকুণ্ডার সুলতানদের পতনের পর ভিজিয়ানাগ্রামের শাসকরা সীমাচলমের হৃতগৌরব এবং প্রতিষ্ঠা ফিরিয়ে আনেন এবং এই মন্দিরের নিরাপত্তার এবং পরিচালনার ভার তাঁরা গ্রহণ করেন। এঁরা মন্দিরকে বহু অর্থ, অলঙ্কার এবং জমি দান করেন। বর্তমানেও এই মন্দির এঁদেরই

তত্ত্বাবধানে। মাননীয় শ্রীরাজা পুষপতি ভিজিয়ানাগ্রাম গজপতি বাহাদুর এম. এল. এ. এখন এই মন্দিরের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক।

মন্দিরের মূল সম্পত্তি হোল কতকগুলি পাহাড় এবং তার আশপাশের প্রচুর জমি। বিগ্রহের নিজস্ব যে স্বর্ণ অলঙ্কারাদি আছে তার মূল্য প্রায় ছয় লক্ষ টাকা। এই অলঙ্কারগুলির মধ্যে প্রধান: একটি স্বর্ণ কঙ্কণ; এর ওজন প্রায় ৮০০ তোলা এবং মূল্য ৭২,০০০ টাকা। এ ছাড়াও ১৫৫৩ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যারাজকে যুদ্ধে পরাজিত করে' বিজয় উৎসব উপলক্ষে বিজয়নগর-রাজ শ্রীকৃষ্ণদেব রায় এই বিগ্রহকে একটি মূল্যবান পদ্মরাগমণি দান করেন। এর মূল্য প্রায় ৫০,০০,০০ টাকা।

নীরব পর্বতবেষ্টিত সিমাচলম্। যুগ যুগ ধরে ভক্ত এবং তীর্থঙ্করদের উপাসনার স্থল। ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার, মানবতার মহামিলনের এই সঙ্গম চিরদিন সকলকে মুগ্ধ, বিস্মিত এবং ভক্তিপ্লুত করে তুলেছে।

ভারত-আত্মার বাণীমূর্তি

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

মহামানবের দেশ ভারতবর্ষ। যুগে যুগে মহামানবের চরণস্পর্শে ভারতবর্ষের মাটি পূত-পবিত্র হ'য়ে উঠেছে। ধর্ম-বিকৃতি আর সমাজ-গ্লানিতে যখনই ভারতের রাষ্ট্রদেহ আবিলতায় আচ্ছন্ন হ'য়েছে; শান্তি আর কল্যাণের জন্য তখনই আবির্ভাব ঘটেছে এক একজন মহামানবের। সমসাময়িক যুগে সমকালীন আবহাওয়ার মধ্যে যিনি অপরিমেয় শক্তির ঐশ্বর্যে সর্বমানবের শ্রেয়সাধনে বদ্ধপরিকর, যিনি সত্যের জন্য মৃত্যুকে পর্যন্ত ভয় করেন না, নীচাসক্ত অবিবেকী মনকে যিনি আপন মনের লাভ দিয়ে গ'ড়ে তোলেন সুন্দর ক'রে, তিনিই তো মহামানব, মহাত্মা, মহৎ-হৃদয়, মহাপুরুষ—তিনিই তো ভারত-আত্মার প্রকৃত বাণীমূর্তি! যুগে যুগে ভারতবর্ষের মাটিতে আবির্ভাব ঘটেছে এই মহামানবের। স্নেহ দিয়ে তাঁরা এক অখণ্ড আত্মীয়তাসূত্রে বেঁধেছেন মানুষকে, প্রেম দিয়ে জয় ক'রেছেন জগৎকে, ভালোবাসা দিয়ে জয় করেছেন শত্রুকে, অহিংসা আর ত্যাগ দিয়ে তাঁরা জয় করেছেন হিংসা আর লালসাকে, সর্ব-মানবের যোগে একদেহে একাত্ম হ'য়ে উঠেছেন তাঁরা। তাঁদের বাণী শান্তির বাণী, তাঁদের জীবনই তাঁদের বাণী: ধূলিধূসরিত এই মাটির পৃথিবীতে তাঁরা আসেন শান্তির দূত হ'য়ে, তাঁদের প্রভাব শুধু সমকালে বা সীমাবদ্ধ কোনো দেশের মধ্যেই মাত্র সঞ্চারিত নয়, সে প্রভাব আচ্ছন্ন করে সমগ্র পৃথিবীকে। সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তাই মুগ্ধচিত্তে বিস্মিত ভাবাবেগে অনুসরণ করে তাঁদের। সমগ্র পৃথিবীর মুক্তির পথ, পরিত্রাণের পথ খুলে দিয়ে যান তাঁরা, মানুষের বন্ধনমুক্তির জন্য তাঁরা এসে দাঁড়ান নির্যাতনের পথে, হাসিমুখে তাঁরা গ্রহণ করেন দুষ্কৃতকারীদের সাদর উপহার—ক্রুশ, গুলী আর ফাঁসির দড়ি; দুষ্কৃতকারীর তাড়নায় বিতাড়িত হন তাঁরা দেশ থেকে দেশান্তরে।

তবু মানুষেরই ভাগ্যবিধাতার কাছে তাঁদের আকুল প্রাণের প্রার্থনা নিয়ে পৌঁছায় : 'কল্যাণ করো মানুষের, শুভবুদ্ধি দিয়ে মানুষের হৃদয়কে করো কুসুমকোমল।'—মহামানবের ঐতিহাসিক পটক্ষেপে এম্‌নি করেই যুগবিবর্তনে ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়েছেন বুদ্ধ, নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ; জন্মলাভ করেছেন রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজী। শান্তি আর মৈত্রীর বাণী নিয়ে এলেন তাঁরা পৃথিবীতে। কিন্তু সেই পৃথিবী কোন্ পৃথিবী? সে পৃথিবী হিংসায় গর্জিত, যুদ্ধোন্মাদনায় বিকৃত, পাপে কলুষিত, স্বার্থসর্বস্ব হিংস্র শ্বাপদের মতো সে পৃথিবী শ্মশানযজ্ঞে প্রেতের ন্যায় ঘূর্ণ্যমান। সে-পৃথিবীতে মুষ্টিমেয় অর্থবান লোকের স্বার্থে বার বার ঘটে দুর্ভিক্ষ, বৃহত্তর সমাজ-জীবনের ক্ষুধার খাদ্য কেড়ে নিয়ে আত্মসুখে লালায়িত গণ্ডীবদ্ধ মুষ্টিমেয় জীবন। সে-পৃথিবীতে ভাই ছুরিকাঘাত করে ভাইকে, নারী লাঞ্ছিতা হয় নরপিশাচদের হাতে, অগ্নিকাণ্ডে, দস্যুতায়, আর লুণ্ঠনরাজে সে-পৃথিবী শ্মশানভূমির মতো চিতাগ্নিময়। শিশুহত্যায়, নারীধর্ষায় সে-পৃথিবীর চোখ চিকিয়ে ওঠে কশাইয়ের মতো,—পরধনলালসা, পরস্বাপহরণ আর পরদেশকে ছলে বলে কৌশলে আপনার করতলগত করার মোহে সে-পৃথিবীর স্বার্থবাদী মানুষ আর দেশের চক্রান্ত চলে অন্ধকার নিশীথের আড়ালে।—সত্যকে হারিয়ে, মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়ে, জীবনের মূল ধর্মকে ভুলে এম্‌নি করেই এক একটা যুগে মানুষ প্রমাদ সৃষ্টি করে পৃথিবীতে। সেই পৃথিবীতে মহামানবেরা আবির্ভূত হ'য়ে মানুষকে ধর্মের কথা শুনিয়ে, জ্ঞানের কথা শুনিয়ে বিচ্ছিন্ন সমাজ-জীবনকে আবার গেঁথে দেন প্রেমের গ্রন্থিতে। তাঁদের বাণী প্রেমের বাণী, মৈত্রীর বাণী, শান্তির বাণী। বুদ্ধদেব এসে পৃথিবীর মানুষকে ব'ল্‌লেন :

'সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স,
সব্বেসং জীবিতং পিয়ং।
অত্তানং উপমং কত্বা
ন হনেয্য ন ঘাতয়ে।'

অর্থাৎ—'সকলেই দণ্ডকে ভয় করে; জীবন সকলেরই প্রিয়। অতএব নিজের মতো ভেবে অপর কাউকে হত্যা করবে না, কাউকে আঘাত ক'রবে না।'

'অক্কোধেন জিনে কোধং
অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিয়ং দানেন
সচ্চেন আলিকবাদিনং।'

অর্থাৎ—'ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা জয় করবে, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করবে, কৃপণকে দান দ্বারা জয় ক'রবে, এবং মিথ্যাবাদীকে সত্য দ্বারা জয় করবে।'

তিনি ব'ল্‌লেন :

'যথাপি পুপ্‌ফরাসিম্‌হা কয়িরা মালাগুণে বহু।
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তব্বং কুসলং বহুং।'

অর্থাৎ—'যেমন রাশিকৃত পুষ্প থেকে অনেকপ্রকার মালা গাঁথা যেতে পারে, তেমনি মানবগণের দ্বারা অনেক সৎকাজ সাধিত হ'তে পারে।'

বুদ্ধদেব মানুষকে সত্যাশ্রয়ী হ'তে ব'লেছেন, কারণ পৃথিবীর কল্যাণ নির্ভর ক'রছে মানুষেরই উপর।

হজরৎ মহম্মদও একদিন মানুষকে কোরাণের শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন :

'অ-ইন্ আকাবতুম্ কা-আকেবু বেমেছলে
মা-উকিবতুম বিহি, অলাইন্ ছাপরতুম
লাহুয়া খায়রুলিছাবে রিন।'

অর্থাৎ—'যদি তুমি কারুর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হও, তা হ'লে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাইলে যে পরিমাণ আঘাত পেয়েছ, সেই পরিমাণ আঘাত করতে পারো। কিন্তু যদি ধৈর্যধারণ করে ক্ষমা করতে পারো, তবে তা ধৈর্যশীলের পক্ষে একান্তই কল্যাণকর।'

এ উক্তিরই সমার্থবাচক উক্তি র'য়েছে গান্ধীজীর বাণীতে। তিনি বলেন: 'যুদ্ধে শত্রুকে হত্যা করা এবং শত্রুর দ্বারা নিহত হওয়া সাহসের পরিচায়ক, কিন্তু শত্রুর আক্রমণ সহ্য করা এবং সেজন্য প্রতিশোধ গ্রহণ না করা তার চাইতেও বড় সাহসের কাজ।'

বুদ্ধ, নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ—প্রত্যেকেই দিয়েছেন এই বাণী। পাপাচারী জগাই-মাধাই-এর কলসীর আঘাত সহ্য ক'রেও শ্রীচৈতন্য হাসিমুখে কোলে টেনে বললেন :

'মেরেছ কলসীর কাণা,
তাই ব'লে কি প্রেম দেবো না?'

এই প্রেমের মূলে র'য়েছে অহিংসা আর সত্যোপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথ বললেন : 'জীবনে একটিমাত্র কথা ভাববার আছে যে, আমি সত্য হবো। আমি কবি হবো কি কর্মী হবো, সেটা নিতান্তই ব্যর্থ চিন্তা। সত্য হবো, এ কথার অর্থ এই—কোথায় আমার সীমা, সেটা নিশ্চিতরূপে অবধারণ করবো। চরাচরের প্রলোভনে সেইটে সম্বন্ধে যদি মন স্থির না করি, তবে সত্য-ব্যবহার হ'তে ভ্রষ্ট হবো।'

শ্রীরামকৃষ্ণ শেখালেন এই সত্যের দ্বারা মনকে মার্জিত করতে। যে মন কূপ-মণ্ডুকের মতো আপনার মধ্যে আপনি বিলীন, সত্যোপলব্ধির পরেই রয়েছে সেই বিলীয়মান মনের মুক্তি—যে মনের সার্থক গতি হবে বিশ্বকল্যাণের প্রয়াসে।

স্বামী বিবেকানন্দ নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন ভারতবর্ষকে, বললেন : 'হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন করো, সদর্পে বলো—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত

হইয়া সগর্বে ডাকিয়া বলো—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিনরাত—হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা, আমার কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর !'

গান্ধীজী বল্‌লেন, 'সত্যের আরাধনার জন্যই আমাদের অস্তিত্ব রয়েছে। সেইজন্যই আমাদের প্রত্যেকের প্রবৃত্তি, সেইজন্যই আমাদের প্রত্যেক শ্বাসপ্রশ্বাস বহে। যদি আমরা এটা করতে পারি, তা'হলে অন্যসকল প্রবৃত্তি সহজেই আমাদের বশে আসবে, তা পালন করাও সহজ হবে। সত্য ভিন্ন কোনো নিয়মেরই শুদ্ধ পালন অসম্ভব। অহিংসা ও সত্য এমন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত যে, তা একটা টাকার এপিঠ ওপিঠের মতো। তাকে যেদিকেই ওল্টাও, টাকা টাকাই থেকে যায়, তা হলেও অহিংসাকে সাধন ব'লে গণ্য করা চাই, সত্যকে সাধ্য জানবে। সাধন আমাদের হাতের জিনিষ। তার জন্যই অহিংসা পরমধর্ম হয়েছে। অভয় না হলে সত্যের অনুসন্ধান কেমন করে করা যায় ? ঈশ্বর লাভের পথ বীরের জন্যই, ভীরুর জন্য নয়। ভীরু যে, সে ভয়ে ভীত, আর বীর যে, সে ভয়মুক্ত ; সে তলোয়ারাদি অস্ত্রে সজ্জিত নয়। তলোয়ার বীরত্বের ব্যঞ্জক নয়, ভীরুতারই চিহ্ন। অহিংসা দুর্বলের অস্ত্র নয়, তা সর্বাপেক্ষা শক্তিমান লোকের হাতিয়ার।'

গান্ধীজীর চিরজীবনের সমস্ত কিছু আন্দোলনের মূলে ছিল এই অহিংসা আর সত্য-সাধনার অকুণ্ঠ ব্রত ; মুখে ছিল 'রঘুপতি রাঘবের' বিজয় প্রশস্তি। নিজের আত্মদর্শনে তিনি বলেছেন :

—'আমি যা পেতে চাই, যা আমি গত ত্রিশ বছর ধরে খুঁজে আস্‌ছি, সে তো আত্ম-দর্শন, সে তো ঈশ্বর সাক্ষাৎকার অথবা মোক্ষ। যা কিছু আমি বলি, যা কিছু আমি লিখি, সে কেবল ঐ একটি জিনিষের দিকে লক্ষ্য রেখে। ধর্ম ও নীতি একই। যা আত্মার দৃষ্টিতে ধর্ম, তাই নীতি। পরমেশ্বরের বিভূতি অগণিত, তাঁর সংজ্ঞাও অগণিত। এই প্রকাশ আমাকে আশ্চর্য ও স্তম্ভিত করে, ক্ষণিকের জন্যে মুগ্ধ করে। কিন্তু আমি সত্যরূপী পরমেশ্বরের পূজারী। এই এক সত্যই আছে, আর সব মিথ্যে। কেবল সত্যই আছে, তা ভিন্ন আর দ্বিতীয় কোনো বস্তু পৃথিবীতে নেই—এই বিশ্বাস দিনের পর দিন আমার বেড়ে যাচ্ছে। সত্যের অনুসন্ধানের উপায় বা সাধন যেমন কঠিন, তেমনই সহজ। তা আত্মাভিমানীর নিকট অসম্ভব বলে মনে হলেও একটি নির্দোষ বালকের পক্ষেও সম্ভব। সত্যের অনুসন্ধান যে করতে চায়, তাকে ধূলিকণা অপেক্ষাও নীচু হ'তে হয়। জগৎ ধূলিকণাকে পিষে ফেলে, কিন্তু সত্যের পূজারী যদি এমন দীন না হয়, যে ধূলিকণাও তাকে পিষে ফেল্‌তে পারে, তবে অভয় সত্যের দর্শন দুর্লভ। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের উপাখ্যানে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। খৃষ্টধর্ম ও ইসলামও এ বিষয়ের প্রমাণ দেয়।

মনের সম্পূর্ণ মুক্তি ভিন্ন মোক্ষ সম্ভব নয়। মনকে মুক্তির পথ দিতে হলে মনকে আগে সত্য হ'তে হয়। একমাত্র সত্যাশ্রয়ীর পক্ষেই অনায়াসলব্ধভাবে মুক্তি বা মোক্ষ সম্ভব।

সত্যের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাই মনকে মুক্তপক্ষ-বিহঙ্গের মতো তিনি প্রসারিত ক'রে দিয়েছিলেন মোক্ষলাভের অতুল প্রসাদের পথে : যেমন ক'রে দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, কনফুসিয়াস,—নানক, হজরৎ মহম্মদ আর শ্রীচৈতন্য,—শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ আর রবীন্দ্রনাথ। ধর্মান্ধজগতে যাদের প্রেমের কথা শুনিয়ে যীশু মহৎ জীবনের অধিকারী করে' তুলতে চেয়েছিলেন, তাদের হাতেই একদিন তিনি হ'লেন ক্রুশবিদ্ধ। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবার পূর্বে পরমেশ্বরের কাছে তাঁর শেষ প্রার্থনা ছিল : 'পিতঃ, এদের ক্ষমা কর, কারণ এরা জানেনা যে, এরা কি করছে!'

পৃথিবী সর্বশেষ এই ক্ষমার বাণী শুনতে পায় গান্ধীজির জীবনে।

ধূলির স্বার্থে মুক্তলিপ্ত এই পৃথিবী। আলেকজেণ্ডার আর তৈমুর থেকে সুরু করে হিটলার পর্যন্ত রক্তলিপ্সু যুদ্ধোন্মাদ মানুষেরা এসে বার বার পৃথিবীতে ঘটিয়েছে বিপ্লব। মানুষের জীবন-সংহারক তা'রা। তাদের সেই ধ্বংসোন্মত্ত তাণ্ডবের ধ্বস্ত আর সন্ত্রাসের মধ্যে ধ্বংস থেকে মানব-সমাজকে বাঁচাবার জন্য এমনি ক'রে যুগে যুগে সত্য, প্রেম আর অহিংসার আলোক-বর্তিকা হাতে নয় পৃথিবীর ধূলিধূসরিত পথে এসে দাঁড়ালেন মহামানবেরা ; পৃথিবীকে আবার তাঁরা নতুন করে গ'ড়ে তুললেন জ্ঞানে, সভ্যতায় আর মানবতায়। রবীন্দ্রনাথ শোনালেন :

"তা'রা ব'লে গেল ক্ষমা করো সবে, ব'লে গেল ভালোবাসো,
অন্তর হ'তে বিদ্বেষ-বিষ নাশো।"

আনবিক শক্তিতে যখন হিরোসিমার বুকে আগুন জ্বলছে, পাশ্চাত্যের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত ক'রে মানুষকে মহাভারতের বাণী শোনালেন তখন গান্ধীজী, বললেন : 'আপনারা যদি পশ্চিম মহাদেশকে কোনো বাণী দিতে চান, তবে তা হবে সত্য এবং প্রেমেরই বাণী। আমি শুধু আপনাদের অন্তর অধিকার করতে চাই।' —নিজেকে নানাভাবে বিশ্লেষণ ক'রে জীবনের আসল রূপকে ভুলে' ধরেছিলেন তিনি পৃথিবীর চোখের সামনে। তিনি ব'লেছেন : "জীবন একটা উপভোগের সমষ্টি নয়, তা কেবল কর্তব্য ও সেবার সমষ্টি। মানুষ যেখানে পশু থেকে আলাদা সেখানেই তার কর্তব্য ও সংযমের বন্ধন স্বীকার করবার আবশ্যকতা রয়েছে।—সত্যাগ্রহ সত্যের জন্য তপস্যা ভিন্ন আর কিছুই নয়। আমার মতো শত শত লোক নষ্ট হয়ে যাক্, তবু সত্যের জয় হোক্।"

ভারতের যে বিশাল ও সর্বাত্মক বিপ্লবী অভ্যুদয় সমগ্র বিশ্বকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছে, তারই মূর্ত প্রতীক গান্ধীজী। ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি আর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে তাঁর বিরাট কর্মজীবনের সাধনা একই সঙ্গে পল্লবিত হয়ে ওঠে। পূর্ববর্তী মহামানবদের সঙ্গে এইখানেই তাঁর আসল তারতম্য। বুদ্ধদেব প্রভৃতি প্রধানতঃ শুধু ধর্মসাধনার মধ্য দিয়েই জগতে পারমার্থিক সত্য প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন ; কিন্তু গান্ধীজী সেই ধর্মসাধনাকে জ্ঞানযোগের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন কর্মবাদে। সংগ্রাম-মুখর কর্মজগতে তিনি এসে দাঁড়ালেন প্রত্যক্ষ সৈনিকের মতো, অস্ত্র তাঁর—একহাতে বাহুবলধনের প্রতীক চরকা, অন্য হাতে মানব-মুক্তির বিজয় নিশান। পৃথিবী স্তম্ভিত নেত্রে তাকিয়ে দেখলো বিংশ শতাব্দীর বজ্রসিদ্ধ ভারতের প্রাণ-হিল্লোলের প্রমূর্ত বাণীমূর্তি মহাত্মাকে।

শ্রীমদ্ অভেদানন্দ বন্দনা-পঞ্চকম্

স্বামী চিন্ময়ানন্দ

ওঁ দিব্যমূর্তিধরং কৃপাঘৃতম্, বীরং যোগীশ্বরমতিপূতম্।
দেশিকেশ্বরবরং সর্বনুতং, নৌমি সদাচার্যাভেদানন্দম্ ॥ ১

সত্যং প্রেমময়ং সৌম্য-নিত্যম্, শিবং ক্ষমাময়ং শান্তচিত্তম্।
দানেষু বরেণ্যং জ্ঞানবিত্তম্, নৌমি সদাচার্যাভেদানন্দম্ ॥ ২

সদাব্রহ্মকথা-কৃতভাষম্, স্বভক্তদুষ্কৃতি কৃন্তনাশম্।
বদনকমলে ধৃতহাসম্, নৌমি সদাচার্যাভেদানন্দম্ ॥ ৩

কালীবেদান্তীতিখ্যাতবৃক্ষম্, দীপ্তানলসমং সদাশুদ্ধম্।
হেলয়া কুতর্ক কৃতভঙ্গম্, নৌমি সদাচার্যাভেদানন্দম্ ॥ ৪

মন্ত্রজং মন্ত্রদং যতিবরম্, রামকৃষ্ণলীলাসহচরম্।
শরণাগতেষু কৃপাকরম্, নৌমি সদাচার্যাভেদানন্দম্ ॥ ৫

ইতি বন্দনা-পঞ্চকম্।

শিক্ষা-প্রসঙ্গ

অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য এম. এ., টি. ডি. (লণ্ডন)

মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা ও শিক্ষা : সমাজ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নানাভাবে প্রকট, বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও দ্বন্দ্ব, পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব ও অসহিষ্ণুতা। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, প্রতিবেশী, সমাজ, রাষ্ট্র —সর্বত্র বিদ্বেষ ও অসহযোগিতার ফলে আজ নানা সমস্যার উদ্ভব হ'য়েছে।

চারিদিকে বিশৃঙ্খলা আজ জাতীয় উন্নতির পথকে রুদ্ধ ক'রে দিচ্ছে। পল্লীতে পল্লীতে সংকীর্ণ দলাদলি, নগরের অধিবাসীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ঔদাসীন্য। ফলে শিক্ষার্থীর মন শৈশব থেকেই স্বাস্থ্যকর পরিবেশ খুঁজে পায় না। সবখানেই তারা সহানুভূতি চায়, চায় স্নেহ, কিন্তু কি গৃহে, কি বৃহত্তর পরিবেশে এই স্নেহ-সহানুভূতিরই একান্ত অভাব।

দেশের যুবশক্তি উপযুক্ত নির্দেশের অভাবে আজ লক্ষ্যহীন। স্বাধীনতা, শ্রদ্ধা, উপকার-স্পৃহা, নৈতিক উৎকর্ষ যেন শিক্ষার গৌণ লক্ষ্য। যান্ত্রিকতা ও বাস্তববুদ্ধি শিক্ষার মানবিক লক্ষ্যকে যেন আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। তাই স্বাধীন ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন। দেশের শিল্প-ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক উৎকর্ষকে ও মানবিকতাকে শিক্ষার পরম লক্ষ্য ব'লে মেনে নিতে হবে। বিশ্বসংগ্রামের পর শান্তি ও অহিংসার মন্ত্র ভারত দিকে দিকে প্রচার ক'রেছে। তাই এই দেশের নাগরিকদের দায়িত্বও

আজ কম নয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈরাশ্য ও লক্ষ্যহীন জীবনযাত্রা। রাষ্ট্র যদি এ বিষয়ে উদাসীন থাকে তবে এই জটিল সমস্যার সমাধান সুদূর-পরাহত।

এই প্রসঙ্গে বৃটেনের সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কি ভাবে বৃটেন এই সব সমস্যার সমাধান ক'রেছে সেদিকে দৃষ্টি দিলে বোধ হয় লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে যদি তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কৈশোর থেকেই উদ্বেগের ছায়া পড়ে তবে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ যে ব্যাহত হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই রাষ্ট্র ও সমাজের আজ এই গুরু দায়িত্ব নেবার সময় এসেছে। আমাদের দেশের শিশুদের মধ্যে অধিকাংশই উপেক্ষিত। সমাজে-সংসারে জটিল অবস্থা সেজন্য মূলতঃ দায়ী। অধিকাংশ অভিভাবকই আজ সংসারের প্রয়োজন মেটাবার কাজে এতই ব্যস্ত যে, তাঁদের শিশুদের প্রতি দৃষ্টি দেবার অবকাশ অল্প। ফলে জীবনের এই প্রকৃষ্ট সময় হেলায় অতিবাহিত হয়। আর এই উপেক্ষা শিক্ষার্থীর ভাবী জীবনকে বিড়ম্বিত করে। তারপর জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা বাস্তবের সংঘাতে যখন বারবার প্রতিহত হ'তে থাকে, তখন উচ্চ আদর্শ ক্রমশঃ নির্বাসিত হয়। সমাজ-জীবনের ক্ষেত্রেও নানা সমস্যা আজ মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছে। একদিকে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা অন্যদিকে যোগ্য স্থানে যোগ্য ব্যক্তিত্বের অভাব। ফলে সততার মর্যাদা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। জীবনে সততা ও আন্তরিকতার পুরস্কার আছে এ কথা অনেকেই আজ স্বীকার করতে চান না। কিন্তু এই বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য দায়ী কে?

আজ মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যসূচীর সংস্কারের চেষ্টা চলেছে। নূতন বিষয়বস্তুর সংযোজন সুরু হ'য়েছে। যে কয়টি আবশ্যক বিষয় পাঠ্য তার মধ্যে সমাজ-বিজ্ঞান অন্যতম।

সমাজ-বিজ্ঞান কি?—মানবকেন্দ্রিক এই বিষয়টি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের চলার পথের সন্ধান দেবার প্রয়াসী। তাই এর মধ্যে ঠাঁই পেয়েছে মানব-সভ্যতার অভিযান, দেশ-কাল-জয়ী পদক্ষেপের ইতিবৃত্ত।

মানুষের মূল প্রয়োজন মেটাবার যা-কিছু প্রয়াস তার ধারাবাহিক আলোচনাও এই বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। স্থানীয় পরিবেশ, সমাজ ও আঞ্চলিক সমাজ-জীবন যেমন সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় তেমনই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানব-সমাজ ও তাদের জীবন-যাত্রা, প্রকৃতি ও পরিবেশ সব কিছুই সমাজ-বিজ্ঞানের উপাদান।

মোটকথা সমাজ-বিজ্ঞানের কোন নির্দিষ্ট পরিধি নেই—কারণ জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে তথ্য আহরণ করে মানবকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে তাকে উপস্থাপন করাই হ'ল এই বিষয়ের উদ্দেশ্য। কখনও ইতিহাস, ভূগোল, কখনও বা অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান, আবার স্বাস্থ্য ও সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্র থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী উপাদান আহরণ করে গড়ে তোলা হয়েছে এই নূতন বিজ্ঞান।

এই নূতন বিষয়বস্তুর প্রবর্তনের সার্থকতা সম্পর্কে আজও অনেকের মনে সংশয় আছে। তাঁদের ধারণা, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান পৃথক পৃথক ভাবে পড়ালে তাতে বোধহয় বিষয়বস্তুর জ্ঞান পূর্ণতর হ'ত। তাছাড়া মানুষকে ও তার সমস্যাকে সামনে রেখে বিষয়-বস্তুর উপস্থাপন করলে এই নূতন নামকরণের বোধহয় প্রয়োজন হ'ত না। তাছাড়া এই

বৈচিত্র্যময় বিষয়বস্তুকে পড়ানোর জন্তে শিক্ষকের একান্ত অভাব; কারণ সমাজ-বিজ্ঞানের শিক্ষককে একাধারে অনেক কিছুই জানতে হবে।

সমাজ-বিজ্ঞানের সার্থকতা : আবার অনেকে এই বিরোধী মনোভাবকে নানা যুক্তি দিয়ে খণ্ডিত করতে চান। আজ চারিদিকে যে সমাজ-সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সমাধান খুঁজতে হলে দেশের শিশু-কিশোরদের জীবনের সুরু থেকেই সুশিক্ষা দিতে হবে। যাতে গোড়া থেকেই তাদের বিচারবিশ্লেষণের ক্ষমতার উন্মেষ হয়, যাতে পুঁথিগত-বিদ্যার পরিবর্তে বাস্তব জ্ঞান ও সপ্রতিভ দৃষ্টির অধিকার জন্মে।

তাই সমাজ-চেতনা, পারস্পরিক সহানুভূতি ও প্রতিবেশী বা সহপাঠীর প্রতি কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তুলবার জন্তে সমাজ-বিজ্ঞান-পাঠনের সার্থকতা। এই কারণেই সমাজ-বিজ্ঞান-পাঠনের পদ্ধতি বৈচিত্র্যময় হবে। কেবল শ্রেণী-পাঠনের মধ্যেই আবদ্ধ থাকলে চলবে না। সমাজ-বিজ্ঞান-শিক্ষাকে প্রসারিত করতে হবে জীবনের ক্ষেত্রে, আর তার পরীক্ষা পদ্ধতিরও সংস্কার সাধন করতে হবে।

সমাজ-সমস্যার সমাধান ও শিক্ষা : শিক্ষা রাষ্ট্র ও সমাজের একটি বিশেষ যন্ত্র। শিক্ষাযন্ত্রের সুষ্ঠু প্রয়োগে অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভবপর। যেমন ক্রমবর্ধমান লোক সংখ্যা আজ একটি বিরাট সমস্যা। ক্রমশঃই প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অনুপাতে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা এতই বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, এই বৃদ্ধির হারকে ব্যাহত করার প্রয়াস একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু কি ভাবে তা সম্ভব হ'তে পারে এই হল প্রশ্ন।

আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তের ঘরে সন্তান-সন্ততি সাধারণতঃ বেশী। এর কারণও অজানা নয়। অনেকে মনে করেন যে, শিক্ষা ও পারিবারিক জীবনে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলছে। তাই বয়স্কদের জন্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পারিবারিক পরিকল্পনা সম্পর্কে শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন। এমন কি বিদ্যালয়-জীবন থেকেই বৃহত্তর সমাজ সংসারের জন্ত শিক্ষার্থীর প্রস্তুতির ব্যবস্থা করতে হবে।

এদিকে রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব কম নয়। আমাদের দেশে যে সম্পদ রয়েছে অনেক সময়েই তার সদ্ব্যবহার হয় না। ভারতের অধিকাংশ পল্লীই জনহীন ঘনাকীর্ণ। পল্লীবাসীর অনেকেই আজ গ্রামের মায়া ত্যাগ করে বছরে দুই একবার গ্রামে দর্শন দেন। ফলে পল্লী আজ নিরানন্দ। তাই পল্লীর উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর প্রতি সকলের দরদ জাগাতে হবে। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ই শিক্ষার্থীদের নিয়ে কয়েকটি ছোট পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনাকে বিদ্যালয়-জীবনের অংশরূপে গ্রহণ করতে পারে। রাষ্ট্রকেও এ বিষয়ে সহযোগিতা করতে হবে। এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে অনেক জীর্ণ পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়। বিরাট পরিধি নিয়ে এক একটি অট্টালিকা আজ শৃগালের আশ্রয়ভূমি। এমনি বহু ভূমি আজ পশ্চিমবঙ্গে অব্যবহৃত। এইসব ভূমিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করলে সমস্যার আংশিক সমাধান হবেই।

তাছাড়া দেশে কৃষি-ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কৃষি-শিক্ষার জন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট শিল্প গড়ে উঠলে গ্রামগুলিরও উন্নতি হয়, সহরের জনাকীর্ণ

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। যে ভাবে দেশের সহরগুলিতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই গ্রামগুলির সাথে সহরের যানবাহনের সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। সহরের এই অবস্থায় সেখানকার বিদ্যালয়ের অবস্থাও সহজে অনুমান করা যায়। আঞ্চলিক প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যালয়গুলি বিশেষ শাখা প্রবর্তন করলে ও সময়তালিকা প্রণয়ন করলে হয়ত তা সার্থক হবে। কয়েকটি মনস্তাত্ত্বিক সমস্যারও শিক্ষার মাধ্যমে সমাধান হয়। গোড়া থেকেই সুশিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে বিভিন্ন সংঘাতের অবকাশ থাকে না। এজন্যে বিভিন্ন সমিতি বা আলোচনা কেন্দ্রের সার্থকতা আছে। শিক্ষাকে বিভিন্ন স্তরে কার্যকরী করে তুলতে হবে—যাতে বয়স্ক, যুবক, অভিভাবক শিক্ষক, শিক্ষার্থী যে যার স্তর ও প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা পান।

সমাজের কথা বলতে গেলে সমাজ-সমস্যার কথাও এসে পড়ে: আর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার দায়িত্বের প্রসঙ্গও ওঠে। সমাজ ও শিক্ষার মধ্যে যে নিবিড় যোগাযোগ সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। তাই সমাজ সমস্যার প্রতিফলন শিক্ষাক্ষেত্রে, আর শিক্ষার প্রভাব সমাজ-জীবনে।

এমন অনেক সমস্যা আছে যেগুলিকে দূর করতে হলে শিক্ষার সহায়তা নিতে হয়। শিক্ষার স্বতন্ত্র সত্তাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি মনীষী। তাঁদের মতে শিক্ষা হবে এমন একটি শক্তিশালী যন্ত্র যা সমাজকেও নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। তাই কি সামাজিক, কি অর্থনৈতিক সব সমস্যার সমাধান হ'তে পারে যদি সুশিক্ষার সুযোগ ধনী-নির্ধন-নির্বিশেষে সকলকে দেওয়া হয়। পল্লীর পর্ণকুটিরেও জ্ঞানের আলোক পৌঁছে দিতে হবে। আর শিক্ষার আলো যাঁরা পৌঁছে দেবেন সেই শিক্ষাদাতা শিক্ষকদের বুকে আশা ও উদ্দীপনা জাগাতে হবে। শিক্ষকই জ্ঞান-যজ্ঞের হোতা। তাঁদের ব্যক্তিত্বের স্পর্শে শিক্ষার্থী সন্ধান পাবে নব নব আদর্শের।

তাই সমাজে শিক্ষকের বিশিষ্ট আসন দিতে হবে। আর যতদিন এই মর্যাদা তাঁরা না পাবেন ততদিন শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনা সহজ নয়।

জ্ঞান ও অজ্ঞান

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

বাইবেল শিখিয়াছেন যে, জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া আদি মানব আদমের প্রথম পতন হয়। অথচ গীতা বলিতেছেন, "ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে" অর্থাৎ জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র বস্তু জগতে কিছুই নাই। এই দুইটি বাণী কি পরস্পর বিরোধী নহে? আপাত-দৃষ্টিতে তাই মনে হয়, কিন্তু তলাইয়া দেখিলে বাইবেল ও গীতার প্রকৃত অর্থ আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। বাইবেল, মানবজাতির এক শৈশব-স্বর্গের বর্ণনা দিয়াছেন: শিশুর মন সরল—তাহা দেবতাবাপন্ন, তাহাতে পাপ স্পর্শ করে না। সে শুধু মাকেই জানে, জগতের

ভালমন্দ বিধাদ্বন্দ্ব তাহার সম্পূর্ণ অধিগত। বিশ্বসৃষ্টির এক অজ্ঞাত অধ্যায়ে, মানবের মধ্যে এই শিশুর সারল্য, এক বাল্য সত্যযুগ আনিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু ইহা পূর্ণ সত্যযুগ নহে; ইহাতেও অপূর্ণতা আছে। ইহা চিরস্থায়ী হইলে, সৃষ্টির অনেক বৈচিত্র্য বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারিত না। বাইবেল তাই শয়তানের আবির্ভাবের কথা লিখিলেন। শয়তান নারীর মাধ্যমে আদি মানবকে জ্ঞানবৃক্ষের ফলভক্ষণে প্রলুব্ধ করিয়া তাহার পতনের কারণ হইল। এই জ্ঞানবৃক্ষের স্বরূপই বা কি, তার ফলই বা কি? যে জ্ঞানের উদয়ে সকল দ্বন্দ্বের অবসান ও মানুষ যাহার আস্বাদনে পরম সত্যের ও অমৃতের পদ লাভ করে এই জ্ঞানবৃক্ষের স্বরূপ তো তাহা হইতেই পারে না। বস্তুতঃ বাইবেল বলিতে চান যে, জ্ঞানবৃক্ষের ফল হইতেছে—ভেদজ্ঞান, একের স্থলে দুইয়ের জ্ঞান, লিঙ্গভেদের প্রতীতি। এই জ্ঞানও পূর্ণ নহে—কেননা ইহাতে দুইয়ের বোধ আছে, কিন্তু দুই যে একেরই প্রকারভেদ সেই বোধ ইহাতে নাই। লিঙ্গভেদ লজ্জার ও পাপের সৃষ্টি করিল কিন্তু ভেদজ্ঞানের মধ্য দিয়া যুগলমিলনের অভেদ আনন্দ বিরচিত হইল না। বাইবেল বিপরীতের সামঞ্জস্য, ভেদের মধ্যে অভেদ, নর-নারীর সম্বন্ধের মধ্যে চূড়ান্ত প্রেমময় ঐক্য আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। বাইবেলের অতীত শিশুর স্বর্গ—তাহার ভবিষ্যতের স্বর্গোজ্জ্বল স্বর্গরাজ্যেও শিশুর সাম্রাজ্য। সাধারণক, আত্মপ্রতিষ্ঠ মানবের জ্ঞানঘন পরিপূর্ণতা বাইবেলের দৃষ্টির অতীত।

তথাপি বাইবেল সত্যের একটি বড় দিক্ দেখাইয়াছেন, যাহা ভারতীয় অধ্যাত্ম আদর্শে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ভারতীয় বেদ ও তন্ত্র বলিতেছেন—আদি জ্ঞানময় পুরুষ, অর্ধজ্ঞান ও ভেদজ্ঞানের মধ্যে আসিয়া বহুর বিভাগে বিভক্ত হইলেন—অজ্ঞানের পথেই ভেদজ্ঞানের উদ্ভব—কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইলেই, এই ভেদ জ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে—জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র জগতে কিছুই নাই। ভেদজ্ঞানের ফলে আমাদের যতকিছু বিধাদ্বন্দ্ব, লজ্জা ও পাপ। কিন্তু আদি শৈশবের সরল স্বর্গে ফিরিয়া গিয়া নিরবচ্ছিন্ন একত্বে আত্মলুপ্তিই মানবের চরম আদর্শ নহে—পূর্ণতর পূর্ণের জ্ঞান ও পূর্ণতার প্রাপ্তিই চরম আদর্শ। বৈদিক ও তান্ত্রিক জ্ঞান পূর্ণতার সন্ধান দিয়াছে। তাহা হইতেছে, ভেদের মধ্য দিয়া অভেদে পৌঁছানো, যখন মুক্ত ও সিদ্ধ মানব, সকল বৈচিত্র্যের মধ্যেও আত্মার ঈশ্বরত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে। আত্মবিদ্ ব্যক্তি শিশুর ন্যায় অসহায় নহে, সে পরমেশ্বরের বা পরমেশ্বরীর সহিত ঐক্যবোধে প্রতিষ্ঠিত। ইহাই তাহার সিদ্ধাবস্থা। সাধনাবস্থায় শিশু-মানব মায়ের আশ্রয়ে, অভয় শরণ লাভ করে—বাইবেল এই অবস্থার বর্ণনা দিয়াছেন—কিন্তু পূর্ণ সিদ্ধির কল্পনা বাইবেলে নাই। সিদ্ধ, জ্ঞানী পুরুষের কল্পনায় বাইবেল ভীত ও সঙ্কুচিত। ভারত যে পূর্ণ অবস্থার কল্পনা দিয়াছেন—তাহাতে মানব বিশ্ব-পিতা ও বিশ্ব-মাতার সহিত একাত্ম ও সোঽহং জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। এখানে লীলা আছে, দ্বন্দ্বে ভেদের লীলা নয়: অদ্বৈতের মধ্যেও দ্বৈতের অনির্বাণ অস্তিত্ব। শ্রীঅরবিন্দ এই অবস্থার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, অতি মানসিক অবস্থায় একের সহিত বিচিত্রের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি চিরবিকশিত—কেননা অতিমানস রাজ্য সত্য, ঋত ও বৃহতের রাজ্য। এখানে আদম ও ঈভের ন্যায় অসহায় নরনারী নাই। হরগৌরীর বা রাধাকৃষ্ণের দিব্য ছবিই এখানে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে; এক হইতেই যুগলের সৃষ্টি—আবার একের মধ্যেই এই যুগলমূর্তি চিরবিধৃত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গান

শ্রীরাজেশ্বর মিত্র

বর্তমান যুগের কাব্যসঙ্গীতের সঙ্গে রাগসঙ্গীতের যে সহযোগ সেটা গত যুগের মতো এত নিবিড় নয়। সঙ্গীতের মাধ্যমে এ যুগেও কাব্যকে প্রকাশ করা হ'চ্ছে, গত যুগেও হ'ত, কিন্তু দুটো রীতির মধ্যে তারতম্য আছে। এ যুগের সঙ্গীত এ যুগের অলঙ্কারের মতই পাতলা —সহজভাবে তা গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে; তার মধ্যে কোনো বাহুল্য নেই। অথচ এই হাল্কা জিনিসের ডিজাইন করতে মাথা ঘামাতে কম হয় না—কাব্যের মাপে মাপে সুরকে চলতে হয়। এখানে সুর একান্ত কাব্যাশ্রিত। গত যুগের আদর্শ কিন্তু এমন নয়। সেখানে সুরের ওজন অনেকটা বেশি এবং কাব্য অনেক পরিমাণে রাগকে আশ্রয় করে' আছে। এই কারণেই গত যুগের কাব্যকে রাগসঙ্গীতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে, কেননা রাগসঙ্গীতের মাধ্যমেই তার প্রকাশ। ছোট চার লাইনের টপ্পা গান ঠিক চার লাইনের সঙ্গেই শেষ হয় নি, তার আকৃতি, তার আবেদন, রাগসঙ্গীতে লীলায়িত হয়ে উঠছে। কিন্তু তাই বলে' সে সব গান খেয়াল নয়, ঠুংরী নয় বা হিন্দুস্থানী টপ্পাও নয়—তা একান্তভাবেই কাব্যসঙ্গীত। অন্ততঃ স্রষ্টারা সে সব গান কাব্যসঙ্গীত রূপেই সৃষ্টি করেছিলেন তবে ওস্তাদরা যদি তাকে ওস্তাদি সঙ্গীত করে' থাকেন তবে সে অন্য কথা।

এ যুগের কাব্যসঙ্গীতকে ফুটিয়ে তুলতে তান বিস্তারের আবশ্যক হয় না, কেননা এর সংগঠনই এমনি যে তার প্রয়োজনও হয় না। কিন্তু গত যুগের গানে তার প্রয়োজনীয়তা ছিল। সে প্রয়োজনীয়তা কি রকম তা বোঝাবার জন্য নিধুবাবুর একটি চার লাইনের গান উদ্ধৃত করি:

ঝিঁঝিট

ভাবিতেছিলাম যারে সেই আসি প্রকাশিল
সুখানল হ'তে মন সুখেতে ডুবিল।
বিচ্ছেদ বিষ জ্বালায় জ্বলিতেছিলাম তায়
হেরিয়ে তাহার মুখ সে যাতনা গেল।

এই গানের প্রতিটি লাইনে যে ভাবটি ফুটে উঠেছে সেটি ওই লাইনের দু-একটি কথা ধরে' বহুবার বহু রকম করে' গাইবার রীতি ছিল। এতে করে' গানের ভাবার্থটি সম্পূর্ণ হ'য়ে ফুটে উঠত। শুধু তাই নয় প্রতিটি পর্দায় পর্দায় আরোহণ অবরোহণের নিয়ম কানুন মেনে সুরের কাজ করা হ'ত। তা'তে কাব্যরূপের সঙ্গে সঙ্গে সুরের রূপটিও উদ্ভাসিত হ'য়ে যেত। কিন্তু রাগসঙ্গীতের এত প্রভাব থাকা সত্ত্বেও সে ছিল কাব্যসঙ্গীত। এ যুগের কাব্যসঙ্গীতের সঙ্গে গত যুগের কাব্যসঙ্গীতের তফাৎটা ছিল মুখ্যতঃ এইখানে।

ঊনবিংশ শতকের বাংলা গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে ব্যাপকতা—যাকে Suggestive-ness বলা হয়। এই ব্যঞ্জনার দিকটা বিস্তারের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হ'ত; আর তা না হলে এমন সুর নির্বাচন করা হ'ত যাতে কাব্যের মর্ম স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ রমাপতি রায়ের "যদি শ্যাম না এল" এই বিখ্যাত গানটির উল্লেখ করা যায়। গানটি দীর্ঘ। এর মধ্যে ছুটি সঞ্চারীও রয়েছে। বর্তমান যুগে এই ধরণের গান হ'লে তার

সুরের অনেক ঈশ্বর কাজ, অনেক কৌশল থাকত কিন্তু গত শতাব্দীতে তাঁরা প্রকাশের মাধ্যম ছিল রাগসঙ্গীত, (তাও আবার একটিমাত্র সাদামাটা রাগ, আজকালকার মত এমন চার পাঁচটা সুর মেশানো কুটরাগ নয়) সুতরাং সুরটা আরোপ করা হ'ত যথেষ্ট চিন্তা করে'। এই গানটিতে সুর দেওয়া হয়েছে বেহাগ। এই বেহাগের কোন অসাধারণত্ব নেই অথচ "শ্যাম না এল" গানটি এই সাদারণ বেহাগ সুরে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। ছাতুবাবুর রচিত গান "হেরিব না কালবরণ" এই বেহাগ সুরে একটা তীব্র আক্ষেপকে ফুটিয়ে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের রচনা ধরুন—"ও কেন চুরি করে চায়" বা "ওগো শোনো কে বাজায়"—এইসব গানে খুব যে কলা-কৌশল আছে এমন নয় কিন্তু সুরের মাধুর্য ছকুল ছাপিয়ে গেছে। এক খাঁচাতেই তো শত শত গান রচিত হয়েছে গত যুগে, অথচ সুরের প্রসাদগুণে সেঁ সব গান একঘেয়ে হ'য়ে ওঠবার অবকাশ পায় নি।

আপকতার কথা বলছিলাম। রাগসঙ্গীতকে ভিত্তি করে' এক একটা গানের কাঠামো এমনিভাবে তৈরী যে, হয়তো বিস্তার করে' না গাইলেও তার আবেদন গভীরভাবে ফুটে উঠবে। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীধর কথকের একটি বিখ্যাত গানের উল্লেখ করি :

কে তোমারে শিখায়েছে এ প্রেম ছলনা।
যে তোমারে শিখায়েছে সে বুঝি প্রেম জানে না।
পরের মন নিতে জান দিতে বুঝি নাহি জান।
এমনি করে' কতজনার ঘুরেছ প্রাণ বল না॥

মল্লারের ছোঁয়ায় "সে বুঝি প্রেম জানে না" বা "এমনি করে' কতজনার ঘুরেছ প্রাণ বল না" এসব উক্তি যে কত মর্মস্পর্শী হয়েছে তা বলে' বোঝাবার নয়।

এমন কি পাঁচালীর গানেও রাগসঙ্গীতের মাধ্যমে এই আপকতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ভারতচন্দ্র রায়ের বিখ্যাত গান "সজনী রাই অঙ্গ সাজায় দিয়ে কি ভূষণ" অথবা "ভাবনা করি মনে, মন কি মানে বাঁশি শুনে" বা রসিক রায়ের "সে গো কুন্দে আমার সে নারী সাজায়ে" প্রভৃতি গানের উল্লেখ করা যায়। এসব গানে লোকসঙ্গীত, রাগসঙ্গীত এবং কাব্যসঙ্গীত এই তিনের উত্তম সংযোগ হয়েছে।

বাংলায় একরকম বিভাষ প্রচলিত ছিল যার একটা বিশিষ্ট আবেদন ছিল। লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে এই সুরটি চমৎকার খাপ খেত। উদাহরণস্বরূপ নীলকণ্ঠের "তোমায় হেরে' অশ্রু জলে" গান উল্লেখ করা যেতে পারে। এই বিভাষ সুরে বহু আগমনী গানও প্রচলিত ছিল। গত শতাব্দীতে রাগসঙ্গীতের মাধ্যমেই এইসব গান রূপে রসে উচ্ছল হ'য়ে উঠেছে।

অথচ, গত যুগের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, রাগসঙ্গীতকে গ্রহণ করা হয়েছে বটে কিন্তু তাকে একান্তভাবে টেক্‌নিকাল করে' তোলা হয় নি। গত শতাব্দীর গানে যে একটা মানবিক ভাবধারা প্রবাহিত হয়েছে রাগসঙ্গীতের মাধ্যমে সেটিই প্রস্ফুটিত হয়েছে। রাগসঙ্গীতের এই দিকটি ভারতের অন্যত্র অবহেলিত হয়েছে কিন্তু বাংলার শিল্পীরা সেটি অনুসন্ধান করে' সেই যুগেই উত্তমরূপে নিয়োগ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই শিল্পীসুলভ সুরুচিজনিত প্রশংসা এ যুগে না করে' পারা যায় না।

স্বামী অভেদানন্দের বাণী

১। সাধারণ লোকেরা ধর্ম ব'লে যা বিশ্বাস করে ও মেনে চলে—সে সবের মধ্যে ধর্মের আসল ভাব (true spirit) নেই। ওসব হচ্ছে কতকগুলো যুক্তিহীন প্রথা ও আচার বিচার। সাধারণ লোকেদের মধ্যে আসল ধর্ম নেই—আছে ধর্মের নামে গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা ও দলাদলি।

২। ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা কখনই এক জিনিষ নয়। ধর্ম হচ্ছে সত্যনিষ্ঠা, সংযম ও পবিত্রতার ফলে সত্যকে উপলব্ধি করা। সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে ধর্মবিশ্বাসের নামে গোঁড়ামি কুসংস্কার ও যুক্তিহীন আচার-নিয়মে অভিভূত হ'য়ে থাকা।

৩। আসল ধর্ম হলো একেবারে non-sectarian and universal by nature (স্বভাবতঃই সার্বভৌমিক ও অসাম্প্রদায়িক)। সম্প্রদায়ের গোঁড়ামিতে অন্ধ হলে ধর্মলাভ কখনই হয় না।

৪। ধর্মকে জানতে হ'লে চাই ষোলআনা সাধন-ভজন। মনের ভেতরে কুভাব, কুচিন্তা, হিংসা থাকলে ধর্মলাভ শুধু কথার কথা। সত্য ও অসত্য গোঁজামিল দিয়ে ধর্ম হয় না।

৫। আত্মার তত্ত্ব উপলব্ধি করতে হ'লে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর উপদেশ ও যোগশাস্ত্রের নির্দেশ নিয়ে ধ্যান-ধারণা, বিবেক-বৈরাগ্য অভ্যাস করতে হবে। সত্যতত্ত্বের ধ্যানেই সত্যকে লাভ করা যায়। ভূতুড়ে কাণ্ড করলে কি আর আত্মসাক্ষাৎকার হয়, না—জীবাত্মার গতি জানা যায়। উপনিষদে যা বলা হয়েছে—আত্মতত্ত্বকে জানবার সেই হচ্ছে একমাত্র উপায়—"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।"—মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।১।৫)।

৬। তুমি যা ভাববে—পরিণামে তুমি তাই হবে। ভূত প্রেত ভাবতে ভাবতে লোকের শেষকালে অধোগতি হয়। ঈশ্বরের চিন্তায় ডুবে মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। যদি মুক্তি পেতে চাও তবে ঈশ্বরচিন্তায় ডুবে যাও।

৭। দেহই ধ্বংস হয়, আত্মা অবিনাশী। আত্মা নিত্যবস্তু, দেহ অনিত্য। আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

৮। দেহের সঙ্গে নিজেকে identified (একাকার জ্ঞান) করার জন্যেই মানুষের এই অশান্তি, দুঃখ ও ভবযন্ত্রণা। নিজের আসল স্বরূপের দিকে নজর নেই—ভাবছে "এই রক্তমাংসের দেহটাই আমি, আমি অমুকের ছেলে অমুকের মেয়ে—" সেইজন্যেই তো মানুষের এত দুঃখ, অশান্তি, এত শোকতাপ, জ্বালা যন্ত্রণা।

এই সবই অজ্ঞানতা। উপলব্ধি কর—"তুমি জন্মমৃত্যুহীন আত্মা—তুমি ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের অংশ।" এই উপলব্ধি যতক্ষণ না হবে—ততক্ষণ কেউই শান্তি পায় না। কিছুতেই ভবযন্ত্রণা দূর হয় না।

৯। আত্মসংযম ও আত্মজ্ঞানই ধর্মের আসল দিক (Essential parts)। নিজের দিব্যস্বরূপকে উপলব্ধি করার ফলে যে জ্ঞানলাভ হয়—তারই নাম 'আত্মজ্ঞান'। আর হীনসংস্কার ও পশুপ্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ জয় করার নামই 'আত্মসংযম'। পশুপ্রবৃত্তিকে জয় করতে পারলেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়।

১০। জপ-পূজা, প্রার্থনা, স্তব-স্তুতি এসব হচ্ছে ধর্মলাভের preparation (প্রস্তুতির উপায়); আসল ধর্ম আরম্ভ হয় ঈশ্বর-দর্শনের পর থেকে।

১১। কর্মকে বাদ দিয়ে ধর্ম হয় না। ধর্মলাভের প্রমাণ সমস্ত কর্মকে ঈশ্বরের উপাসনায় পরিণত করা। সমস্ত কাজের মধ্যে যদি ঈশ্বরের অনুভূতি ফুটে ওঠে তবেই ধর্মজীবনের সার্থকতার প্রমাণ। 'ধর্মজীবন' মানে সমস্ত জীবনটাকে ঈশ্বরীয়ভাবে পূর্ণ ক'রে ফেলা।

১২। ব্রহ্মকে এই জগৎ ব'লে ভ্রমই অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা। যার জন্যে আমাদের কাছে ব্রহ্মকে জগৎ ব'লে ভ্রম হচ্ছে—তাকেই 'মায়া' বলে। 'অবিদ্যা' মানে নিজের প্রকৃত স্বরূপ না জানার দরুণ অজ্ঞানের অবস্থা।

১৩। ব্রহ্মের দুই ভাব। নির্গুণ ও সগুণ। যখন অব্যক্ত তখন নিত্য ও নির্গুণ। যখন ব্যক্ত ও শক্তিসমন্বিত তখন তিনি সগুণ। ব্যক্ত অবস্থায় লীলা—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়। অব্যক্ত অবস্থায় নিত্য—তখন সকল গুণ ও লীলার অতীত।

১৪। ঈশ্বর সাকার, নিরাকার এবং তারও অতীত। তাঁর সীমা নাই। শিব, রাম, শ্রীকৃষ্ণ, কালী, দুর্গা এ-সমস্তই সেই ঈশ্বরের এক একটি রূপ। এই সমস্ত রূপে ঈশ্বরের এক একটি গুণ ও ভাবের প্রকাশ।

১৫। ধর্মজীবনের প্রথম অবস্থায় নির্গুণের ভাবনা করা যায় না। নিরাকার সগুণ ঈশ্বরের ধ্যানেও মন স্থির করা প্রথম অবস্থায় ভারী শক্ত, সেইজন্যে প্রথম অবস্থায় এই সমস্ত সাকার মূর্তির চিন্তা ও পূজা করা দরকার। সাকারে মন স্থির হয়ে গেলে তবে নিরাকার ভাবে মনকে স্থির করা যায়।

১৬। বেদান্তে কোন ভাবকেই বাদ দেওয়া যায় না। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত সব ভাবই বেদান্তে আছে। এই তিন অবস্থার সমন্বয়ই আমাদের আদর্শ।

১৭। ঈশ্বরকে লাভ করেছেন—এমন মহাপুরুষের কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁর উপদেশ মতন ষোল-আনা মন-প্রাণ ঢেলে সাধন করলে তবে ধর্মলাভ করা যায়। মুমুক্ষু, বৈরাগ্যবান, সংযমী লোকেরাই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। অশুদ্ধ আধারের লোকেরা সদ্‌গুরুর কাছে থেকেও কোন উন্নতি করতে পারে না।

১৮। ঈশ্বরকে যে দর্শন করেনি—সে আবার ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমাকে কি শিক্ষা দেবে? ভগবানকে যে দেখেনি—সে আবার ভগবানের কাছে যাবার পথ দেখাবে কি ক'রে? অন্ধ কখনও অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না—এই দেখনা, আমরা ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) কাছে গিয়েছিলুম ব'লেই ধর্মকে জানতে পেরেছি।

বর্ষাভিসারে

শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য, এম. এ., বি. টি., কাব্যতীর্থ, শাস্ত্রী

১

গগনে গরজে দেয়া নদী পারে বহু খেয়া
বিভোরা রাধিকা ;—বাঁশী বায়।
ঝর ঝর বারি ঝরে নিবারিতে নাহি পারে
জটিলা, কুটিলা আন চায়॥

২

মানস পটেতে রাখি শ্যামতনুখানি আঁকি
অধরে মুরলী দিয়া তাঁর।
চলে ধীরি ধীরি রাধা মানয়ে না কোন বাধা
গলেতে দুলিছে ফুল হার॥

৩

খেয়ায় সে পীতধড়া শিরেতে মোহন চূড়া
চরণে নূপুর বাহার।
মেঘেতে বিদ্যুৎ খেলে ধরণী আঁধারে দোলে
ক্ষণিকের বাট চারিধার॥

৪

কপোলে তিলক সাজে বনমালা গলে রাজে
রাধিকা মোহন শ্যামরায়।
নীল সাড়ী চলে ধীরি বিজলী যেমন ধীরি
মিলনে মধুর মনে ভায়॥

৫

নিতি নিতি এই রীতি চরম পরম প্রীতি
মানসে রহুক আমার।
রাধাশ্যাম যুগ যুগ চরণ কমল যুগ
হৃদে দীন যাচে অনিবার॥

তোমাকে

শঙ্কর গুপ্ত

তোমার তরে এখানে দিন-সন্ধ্যা গেল,
পাহাড়ে-বনে গন্ধ নিয়ে ফুলেরা ফোটে।
আকাশ-বুকে লক্ষ তারা ছড়ায় আলো,
ভোরের নীড়ে পাখীর গানে সূর্য ওঠে।

মাটির মনে মেঘের ছায়া ভাগ্যে সাড়া,
নদীর পায়ে নূপুর শুনি, হৃদয় তাই
সারাটি রাত সারাটি দিন চেতনা দিয়ে
ধ্যানের দীপ রেখেছে জেলে, তোমাকে পাই।

তোমার ডাকে সাগরে বান দেখেছি আসে,
নেমেছে ধারা তপ্ত মরুর তৃষিত প্রাণে;
অন্ধকারের রুদ্ধ দুয়ার কখন খুলে
এনেছ হাসি, আনন্দ গান, কেইবা জানে।

নয়ন মেলে তোমাকে দেখি বিস্তৃত মনে
চেতনা-গড়া ঢেউয়েরা ভাঙে সাগরে খালি;
উতলা ঝড় নামেনা আর হৃদয়ে কোনো
স্তব্ধ রাত-তীর্থ জেগে প্রদীপ জ্বালি।

আলো-ছায়া

শান্তলীল দাশ

কালো মেঘ মাঝে মাঝে ভেসে আসে মনের আকাশে
চারিদিক ভরে যায়, যেদিকে তাকাই শুধু কালো।
চোখ খুলে, চোখ বুঁজে; স্পর্শে, প্রাণে, নিশ্বাসে নিশ্বাসে,
কালোর সমুদ্র শুধু—কোথা পাই এতটুকু আলো!

অন্ধ হয়ে অন্তহীন এ আলোর মাঝে সন্তরণ,
রুদ্ধ হয়ে আসে শ্বাস; অস্থির, অশান্ত, নিরুপায়।
ছিন্ন করে দিয়ে যাবে আঁধারের এ মূঢ় বন্ধন—
কার কাছে ছুটে যাব? পথ কোথা? দৃষ্টি অসহায়।
সহসা প্রদীপশিখা জ্বলে ওঠে সে ঘন আঁধারে,
কে জ্বালায় দেখি না কো, শুধু দেখি বিমূঢ় বিস্ময়ে
সব কালো সরে গেছে—আলোকের বন্যা চারিধারে;
কোথা ছিল এত আলো? কোথা গেল কালো লীন হয়ে!

আলোকের ধারা স্নানে তৃপ্ত হয় আমার ভুবন,
মুছে যায় সর্ব-গ্লানি, পরিতৃপ্ত আমার এ মন।

বিশ্ববার্তা

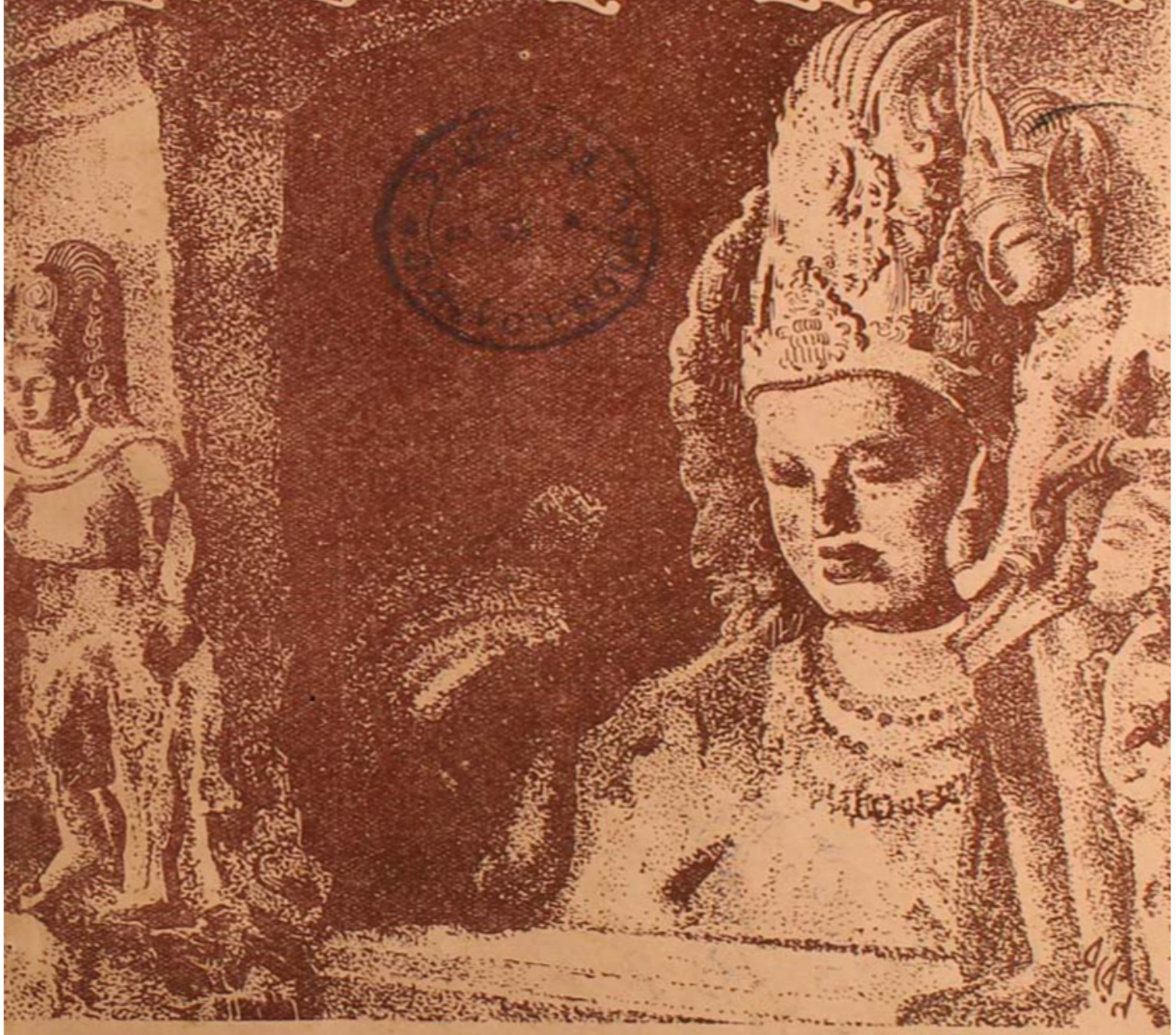

প্রতিষ্ঠাতা : স্বামী অভেদানন্দ

ঊনবিংশতি বর্ষ—প্রথম সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৬৩

বার্ষিক মূল্য চারি টাকা চারি আনা

প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট; কলিকাতা-৬ : ফোন : ৫৫—১৮০৫

সম্পাদক স্বামী সদাত্মানন্দ

১৯নি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে ব্রহ্মচারী বসন্তকুমার কর্তৃক প্রকাশিত
এবং ৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, মানসী প্রেস হইতে শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

বিশ্ববাণী—ফাল্গুন, ১৩৬৩

সূচীপত্র

১।	অভ্যাস	(কবিতা)	
২।	বর্ষারাতের ভাবনা		
৩।	ভারতীয় ঐতিহ্য	স্বামী অভেদানন্দ	
৪।	[illegible]	শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়	
৫।	বিবেক-বাণী [illegible]	শ্রীঅনিলকুমার হালদার	
	[illegible]	শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন বসু	
৭।	বিবেকানন্দ (কবিতা)	শ্রীপ্রকৃতি দেবী	১৬
৮।	সাধন চন্দ্রিকা	... বিবিধ	১৭

সদ্য প্রকাশিত !

বাংলা জীবনী-সাহিত্যের বিশিষ্ট কীর্তি

শঙ্করনাথ রায়ের—

ভারতের সাধক

১ম খণ্ড মূল্য—৫৲ ২য় খণ্ড মূল্য—৭৲

ব্রহ্মপুরুষ ও সাধুসন্তদের চরিত সঙ্কলন গ্রন্থ। যোগী, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, মহর্ষিগ প্রভৃতি মহাপুরুষদের লৌকিক ও অলৌকিক জীবনের রসমধুর কাহিনীতে ভরপুর। একাধারে এতে রয়েছে প্রামাণ্য জীবনতথ্য, অধ্যাত্মরসের প্রস্রবণ, অলৌকিক আখ্যান ও ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান।

- প্রতি খণ্ড স্বয়ংপূর্ণ। প্রত্যেকটিতে সাত-আটটি করে পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত জীবনচরিত রয়েছে, আর রয়েছে সাধুমহাত্মাদের অপরূপ চিত্রাবলী।
- পড়বার, বারবার পড়ে সঞ্চয় করে রাখবার ও প্রিয়জনকে উপহার দেবার মত বই। রঙীন সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে মোড়ানো, ছাপা বাঁধাই অনবদ্য।
- সাধারণ পাঠাগার ও ব্যক্তিগত গ্রন্থভাণ্ডারের পক্ষে অপরিহার্য চরিত-কোষ গ্রন্থ।

শিবনাথ শাস্ত্রীর—

মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে

স্বনামধন্য মনীষী ও আচার্যের—

'মেন্ আই হাভ সীন'-এর সার্থক অনুবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির রেখাচিত্র অপরূপভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রকাশক—রাইটার্স সিণ্ডিকেট, ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
৯।	সারদা-স্মরণে (কবিতা)	শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	১৯
১০।	'যা আসে-যায় তা থাকে না—'	শ্রীপথিক	২১
১১।	বাংলা সাহিত্যে ছড়া	শ্রীসৌরেন্দ্র বসু	২২
১২।	গুরু-তত্ত্ব	স্বামী জগদীশ্বরানন্দ	২৪
১৩।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (কবিতা)	শ্রীধর্তীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য	৩১
১৪।	প্রেমধর্ম—দার্শনিক তত্ত্ব	ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত	৩৩
১৫।	সভ্যতার ইতিহাসে সহজাত প্রবৃত্তির স্থান ...	অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য	৪১
১৬।	প্রাচীন বাংলা কাব্যে ভণিতা	শ্রীসন্তোষকুমার কুণ্ডু	৪৭
১৭।	সংঘবার্তা		৬৭

বিশ্ববাণীর গ্রাহকগণের প্রতি

নিবেদন

গত মাঘ মাসের বিশ্ববাণীতে অষ্টাদশ বর্ষের বিশ্ববাণীর বর্ষ-সূচীর ৪র্থ পৃষ্ঠায় 'ঙ' বিভাগের কয়েকটি লেখা ভুলক্রমে বাদ পড়ায় আমরা দুঃখিত। নিম্নে সেইগুলি প্রকাশ করা হইল।

কোন গ্রাহক ইচ্ছা করিলে অংশটুকু যথাস্থানে (বর্ষ-সূচীর ৪র্থ পৃষ্ঠায়) লিখিয়া অথবা ইহা কাটিয়া পেষ্ট করিয়া লইতে পারিবেন।

ভুবনাথ...শ্রীসুরাবলপুরী...১২২
ত্যাগ ও শান্তি...শ্রীপাচকড়ি বাগচী...৫২০
তারাশঙ্করের ছোটগল্প...শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত...৪৪১
তত্ত্ব ও বেদান্তের সমন্বয়...শ্রীউমাপদ মুখার্জী... ৫১
তারকা...শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবর্তী...৪৫০
তীর্থ...শ্রীবরুণ প্রকাশ মিত্র...৪৪৭

কার্যাধ্যক্ষ, বিশ্ববাণী

'বিশ্ববাণী'-র নিয়মাবলী

১। 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে। বৎসরের যে কোন সময়ে আপনি গ্রাহক হইতে পারেন। তবে প্রথম বা সপ্তম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

২। ফাল্গুন ১৩৬৩, বিশ্ববাণীর ১৯শ বর্ষ আরম্ভ। ইহার বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা চারি আনা, প্রতি সংখ্যা আট আনা। ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ—এই ছয় মাসেরই জন্য গ্রাহক হইতে হইলে সডাক দুই টাকা চারি আনা এবং ভাদ্র হইতে মাঘ—এই ছয় মাসেরই জন্য গ্রাহক হইতে হইলে সডাক তিন টাকা লাগিবে। মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

৩। কোন গ্রাহকের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্তিত হইলে তিনি স্থানীয় ডাকঘরে তাহা নির্দেশ দিবেন; বেশদিনের জন্য হইলে পূর্ববর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে বিশ্ববাণী অফিসে উহা জানাইবেন।

৪। 'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহক মূল্য মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। কোনও মাসের বিশ্ববাণী সেই মাসের ২৭ তারিখের মধ্যে না পাইলে সে সংবাদ সেই মাসের ২৭ তারিখ হইতে পরের মাসের তিন তারিখের মধ্যে বিশ্ববাণী অফিসে আসা চাই। নচেৎ ঐ পত্রিকা সরবরাহ করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

৫। 'বিশ্ববাণী'-র জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইবার কালে বড়অক্ষরে নাম-ঠিকানা যেন তাহাতে বেশ স্পষ্টাক্ষরে সন্নিবেশিত থাকে। 'বিশ্ববাণী'তে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হয়। প্রবন্ধাদি হারাইয়া যাইলে বা কোন প্রকারে নষ্ট হইলে আমরা দায়ী থাকি না। প্রবন্ধ স্বল্পায়তনে, কুলপেপ **চার পাতার মধ্যে,** রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘাকার প্রবন্ধ ছাপা অসম্ভব। কোনও লেখা প্রকাশিত করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপেক্ষ। ইহার জন্য সম্পাদক কোনও কৈফিৎ দিতে বাধ্য নহেন।

৬। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। ছয়মাস পরে অযাচিত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৭। কাহারও কোন বিষয় জানিতে হইলে (গ্রাহক হইলে, গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া) সর্বদা **রিপ্লাই কার্ডে** অথবা ডাক-টিকিট সমেত পূর্ণ নাম-ঠিকানা পাঠাইতে হইবে। অন্যথায় উত্তর দেওয়া হয় না।

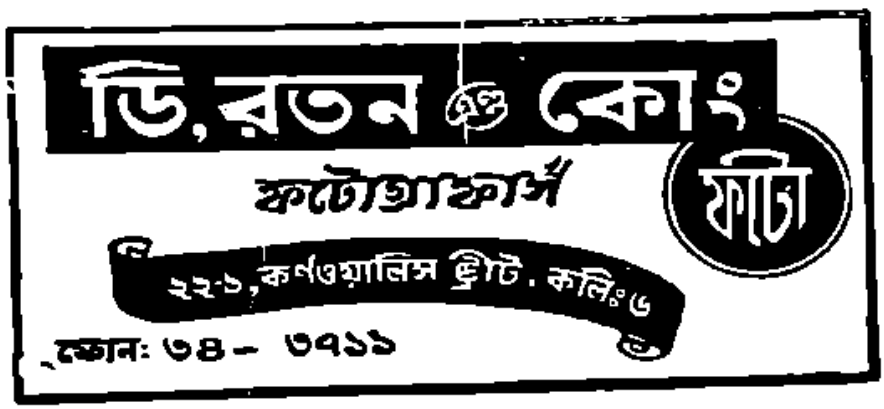

ঊনবিংশতি বর্ষ | ফাল্গুন—১৩৬৩ | প্রথম সংখ্যা

॥ অভ্যাস যোগ ॥

"দুই রকম আছে। বিচার পথ,—আর অনুরাগ বা ভক্তির পথ। সৎ অসৎ বিচার। একমাত্র সৎ বা নিত্য বস্তু ঈশ্বর, আর সমস্ত অসৎ বা অনিত্য। বাজীকরই সত্য, ভেল্কি মিথ্যা। এইটি বিচার।

বিবেক আর বৈরাগ্য। এই সৎ অসৎ বিচারের নাম বিবেক। বৈরাগ্য অর্থাৎ সংসারের দ্রব্যের উপর বিরক্তি। এটি একবারে হয় না—রোজ অভ্যাস করতে হয়। কামিনীকাঞ্চন আগে মনে ত্যাগ করতে হয়; তারপর তাঁর ইচ্ছায় মনের ত্যাগও করতে হয়, বাহিরের ত্যাগও করতে হয়। কলকাতার লোকদের বলবার যো নেই 'ঈশ্বরের জন্য সব ত্যাগ কর'—বল্‌তে হয় 'মনে ত্যাগ কর।'

অভ্যাস যোগের দ্বারা কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ করা যায়। গীতায় এ' কথা আছে। অভ্যাস দ্বারা মনে অসাধারণ শক্তি এসে পড়ে; তখন ইন্দ্রিয় সংযম করতে—কাম, ক্রোধ বশ করতে—কষ্ট হয় না। যেমন কচ্ছপ হাত, পা টেনে নিলে আর বাহির করে না; কুড়ুল দিয়ে চারখানা করে কাট্‌লেও আর বাহির করে না।

বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ না করলে চৈতন্যই হয় না—ভগবান লাভ হয় না। থাক্‌লেই কপটতা হয়। সরল না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না।

যারা বিষয়কর্ম্ম করে, অফিসের কাজ কি ব্যবসা করে, তাদেরও সত্যেতে থাকা উচিত। সত্য কথা কলির তপস্যা।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

'বিশ্ববাণী'র ঊনবিংশতি বর্ষ

বর্তমান ফাল্গুন হইতে বিশ্ববাণী ঊনবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিল। বিগত ও আগত বৎসরের এই সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আজ অতীতের কৃতকৃতির ও আগামী আশা-আকাঙ্ক্ষার হিসাব করিতে বসিয়া শুধু জীবন ও জগতের বিচিত্র রহস্যের কথা ভাবিয়া আমরা চিত্তালোড়ন অনুভব করিতেছি। সৃষ্টির আদি ও অন্তের অবগুণ্ঠিত অনন্ত প্রহেলিকা মানব-চেতনাতে ক্ষণেক্ষণে যে পরম জিজ্ঞাসার উদ্রেক করে, তাহাতেই যেন জীবনের অসীম মাধুর্য নিহিত: এ' পৃথিবীতে যাহা যতই অজ্ঞাত তাহা ততই বুঝি মনোহর। সুতরাং প্রকাশ ও বিলয়, প্রবেশ ও প্রস্থান, জন্ম ও মৃত্যুর স্বরূপ উদ্ঘাটন যেদিন হইবে সেদিন পৃথিবীর আকর্ষণ-বিকর্ষণ তথা লীলা-বিলাসেও যবনিকা পড়িবে, ইহাই সম্ভব।

বাস্তব বিগত বর্ষের এক কঠিন স্মৃতির ভারে আমাদের চিত্ত বিহ্বল। 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু র্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ'—জন্ম হইলে মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর জন্ম সুনিশ্চিত। ইহা জানিয়াও পরম প্রিয়জনের দ্রুতমান চিরবিচ্ছেদে প্রাণটা হা হা করিয়া উঠে। বিশ্ববাণীর অন্যতম সম্পাদক স্বামী বেদানন্দজীর অকাল প্রয়াণ বিশ্ববাণীর পক্ষে সবেদন কৃতজ্ঞ-অন্তরে স্মরণ আজ অপরিহার্য। তাঁহার অমর আত্মার সাহচর্য 'বিশ্ববাণী' আগত ও অনাগত বর্ষে কায়-মনে উপলব্ধি করিতে যেন বিস্মৃত না হয়; তাহার যাত্রাপথ তাঁহার অশরীরী শুভ দৃষ্টিপাতে নিবিঘ্ন হউক, ইহাই কামনা করি।

অতীতের সাফল্যে অতি হৃষ্ট আর বৈফল্যে উদ্বেলিত না হইয়া, প্রতিকূল পরিপার্শ্বের বিভীষিকায় হতোদ্যম না হইয়া আমরা যেন অসংমূঢ় স্থিরবুদ্ধিতে ক্রমোন্নতির লক্ষ্যপথে বিশ্ববাণীর অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখিতে পারি। জ্ঞানই আলোক, জ্ঞানই পবিত্র—'নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং ইহ বিদ্যতে।' জ্ঞানেই মুক্তি, আনন্দ, জীবনের পরম সার্থকতা। ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সংস্কৃতি ও কলায় ভারতীয় তথা সত্য মানবিক ভাবাদর্শের নিদর্শন ও জ্ঞানের প্রচার করিতে চায় 'বিশ্ববাণী'। এই ব্রত প্রতিপালনে বিশ্ববাণীর পক্ষ হইতে আমরা ভাবসমৃদ্ধ, চিন্তাসমৃদ্ধ ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদির জন্য জ্ঞানী-গুণী-বিদগ্ধ মনীষীমণ্ডলীর সহযোগিতা সর্বদাই আশা করি।

লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা—যাঁহারা বিশ্ববাণীকে ভালবাসিয়াছেন, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মিগণ—যাঁহারা শ্রমদ্বারা বিশ্ববাণীর সেবায় সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের জন্য আমাদের আন্তরিক শুভ কামনা জানাই।

"ভগবানে বিশ্বাস হওয়া ভারী কঠিন। ঠিক ঠিক ঈশ্বর-বিশ্বাস ক'জনের আছে? লোকের মুখে শুনে কিম্বা বই পড়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস হয় না। এ সব প্রত্যক্ষ অনুভূতির ব্যাপার। বিশ্বাস ভক্তি সবই অন্তরের জিনিষ। সৎসংস্কার নিয়ে না জন্মালে ঠিক মতন সাধু হওয়া যায় না।"

—ব্রহ্মানন্দ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী অভেদানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

যিশুখৃষ্টের হাজার হাজার বছর আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন: 'যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে তখন অধর্মকে বিনাশ করে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানব রূপে আমি আবির্ভূত হয়ে থাকি।'

শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও এই আপ্তবাক্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। যদি আমরা বিশ্বের ধর্ম-ইতিহাস যত্নের সঙ্গে পর্যালোচনা করি তা হলে আমরা দেখতে পাব শ্রীকৃষ্ণের পরও বিশ্ব-মানুষের আধ্যাত্ম জীবনে বহু উজ্জ্বল নক্ষত্রের উদয় হয়েছে। সেই সব বিরাট আধ্যাত্ম পুরুষেরা প্রবক্তা, শিক্ষা-গুরু কিম্বা মুক্তিদাতারূপে গণ্য হয়ে থাকেন। নানাদেশে, নানাকালে একের পর এক তাঁরা আবির্ভূত হয়েছেন। কালানুসারে তাঁদের কয়েক জনের কথা ইতিপূর্বে আমি বলেছি।

প্রথমেই এলেন—বিশ্ব-বিনন্দিত বুদ্ধ। তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। তাঁর সমসাময়িক কালেই এশিয়ার দুই প্রান্তে প্রায় যুগপৎ আবির্ভূত হয়েছিলেন আর দু'জন মহান প্রবক্তা—একজন হচ্ছেন পারস্যের জরথুষ্ট্র, অন্যজন চীনের লাউৎ-সে। উভয়েই স্ব-স্ব দেশে গণ্য হয়ে থাকেন মানবজাতির মুক্তিদাতা রূপে। তারপর, বুদ্ধের ছ'শ বছর পরে জন্ম নিলেন আর একজন মহান লোকপরিত্রাতা। তিনি মানব-পুত্র যিশু।

যিশুর আট'শ-বছর পরে আবার নতুন করে আধ্যাত্মিকতার জোয়ার জাগলো এই ভারতভূমিতে; তখন আবির্ভূত হন বিশ্বখ্যাত দার্শনিক এবং বেদান্তের অদ্বৈতদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করাচার্য। শঙ্করাচার্যের কয়েক শত বছর পর থেকে একের পর এক সারা ভারত জুড়ে আবির্ভূত হন আরও ক'জন বিখ্যাত মহামানব। তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য,—দক্ষিণ ভারতের রামানুজ, বাংলার শ্রীচৈতন্য এবং পাঞ্জাবের গুরু নানক। এঁদের ছাড়াও আরও প্রখ্যাত লোকনায়কেরা জন্মগ্রহণ করেছেন ভারতবর্ষে। নানা কারণে এঁদের প্রতিষ্ঠিত ভাবধারায় মাঝে মাঝে অবনতি দেখা দেয়। প্রথম কারণ হিসাবে উল্লেখ করতে পারা যায়—ভারতবর্ষে পশ্চিমী সভ্যতার অনুপ্রবেশ। ইউরোপের, বিশেষ করে ইংলণ্ডের বস্তুতান্ত্রিক এবং বণিক-ভাবাদর্শ তখন ব্যাপকভাবে ভারতের অন্তর্লোকে অনুপ্রবিষ্ট হতে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের শিক্ষা-ধারায় তখন বস্তু-তান্ত্রিকতার প্রভাব পড়তে সুরু করেছে। ফলে স্বভাবতঃই শিক্ষার্থীদের জীবনাদর্শ ক্রমে ক্রমে প্রাণহীন এবং বস্তুতান্ত্রিক হয়ে উঠলো। তারা ভুলে যেতে বসল ভারতবর্ষের মহান আধ্যাত্মিক আদর্শকে। মোটকথা, তাদের শিক্ষা তখন হয়ে উঠল নাস্তিকতায় পরিপূর্ণ। তার সঙ্গে কোন যোগ ছিল না ধর্মের। তার ওপর খৃষ্টান মিশনারীগণ ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে। এসব নানা কারণে সারাদেশে হিন্দু জন-সাধারণের মনে এক নিদারুণ সংশয় উপস্থিত হলো। নিজেদের পিতৃপুরুষের ধর্মকে পরিত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্মমতকে গ্রহণ করে দলে দলে এসে সমবেত হতে লাগলো খৃষ্টধর্মের পতাকা তলে। ভারতবর্ষে তখন বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক সমীকরণ বিশেষ প্রয়োজন হয়ে ওঠে। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেও তখন কূপমণ্ডুকতা দেখা দেয়।

নিজ নিজ বিশ্বাসে অন্ধ হয়ে তাঁরা অন্য ধর্ম এবং অন্য গোষ্ঠী-পন্থীদের বেপরোয়া আক্রমণ সুরু করেন।

তাঁরা পরস্পরের নিন্দাবাদ এবং সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। বৈষ্ণবগণ শৈব এবং শাক্তদের নিন্দা করতে লাগলেন, শৈব-শাক্তরাও তাঁদের ছেড়ে কথা কইলেন না। তাঁরাও বৈষ্ণবদের কুৎসা রটাতে লাগলেন। এখানেই শেষ হলো না। বৈষ্ণবগণ আবার বৌদ্ধদেরও অখ্যাতি করতে লাগলেন; হিন্দুরা নিন্দা করতে লাগলেন খৃষ্টানদের, খৃষ্টানেরা হিন্দুদের। তারপর খৃষ্টান মিশনারীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নবগঠিত ব্রাহ্মসমাজ গোড়া হিন্দুধর্মকে আক্রমণ সুরু করলেন। মোটকথা, এইসব আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের ফলে ভারতীয় সমাজ-জীবনে এক অনাচ্ছলতা দেখা দিল। স্বভাবতঃ এই সংকট মুহূর্তে ধর্মনিষ্ঠ জনসাধারণের মনে পড়লো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি, 'যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে তখনই অধর্মকে বিনাশ এবং ধর্মকে রক্ষা করার জন্য যুগে যুগে আমি নবরূপে আবির্ভূত হইব।' তাঁর এই মহান প্রতিশ্রুতিকে পূর্ণ করে বাংলার এক অখ্যাত পল্লীতে তখন আবির্ভূত হলেন এক বিরাট আধ্যাত্ম পুরুষ। পরবর্তীকালে তিনিই বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হয়েছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নামে।

হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হয়। তাঁর পিতামাতা ছিলেন দীন-দরিদ্র কিন্তু অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ। তাঁদের পরিবারটিও ছিল উচ্চ এবং সম্ভ্রান্ত হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবার। রামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় গোঁড়া এবং ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। অত্যন্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শানুযায়ী তিনি জীবন যাপন করতেন। কখনও কোন অসত্য বাক্য তাঁর মুখ থেকে বহির্গত হোত না। বাক্যসিদ্ধ পুরুষ হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। অর্থাৎ তিনি যা বলতেন—তাই নিশ্চিতভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হতো। তার ওপর তিনি কখনও কোন ব্যক্তি বা নিম্নশ্রেণীর শূদ্রদের নিকট থেকে কোন কিছু গ্রহণ করতেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণের জননীও ছিলেন তুল্য ধর্মপ্রাণা এবং ভক্তিমতি। তিনি ছিলেন সরলতা এবং সহৃদয়তার প্রতিমূর্তিস্বরূপ। পার্থিব কামনা বাসনা, গরিমা এবং অহংবোধ থেকে তাঁর মন সম্পূর্ণ নির্মুক্ত ছিল। বিশ্বের এক অজ্ঞাত কোণে এমন এক ধার্মিক পিতা-মাতার সন্তান হিসাবে জন্মগ্রহণ করে গদাধর তাঁর জন্ম-গ্রামেই শৈশব অতিবাহিত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যনাম ছিল গদাধর। তাঁর বাল্য-জীবনের এমন অনেক কাহিনী আমরা জানি যা থেকে সহজেই বুঝা যায় গদাধর শৈশবেও অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন; তখনই তাঁর অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি ছিল।

গদাধরের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে সাবেকী ধরণের গ্রাম্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করলেন। সেখানে তিনি লিখতে পড়তে শিখলেন বটে, কিন্তু অঙ্কের প্রতি তাঁর অত্যন্ত বিতৃষ্ণা দেখা গেল। বিশেষ করে কোন সংখ্যা থেকে অন্য কোন সংখ্যাকে বিয়োগ করতে বললে তাঁর মন বিরূপ হয়ে উঠতো। পক্ষান্তরে তিনি এক সংখ্যা অন্য সংখ্যায় যোগ করতে খুব আনন্দ পেতেন। কিন্তু যোগ দেওয়া বা বিয়োগের বেলাতেই ছিল তাঁর যত অপছন্দ। তাছাড়া বইপত্র পড়ার দিকেও তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। তার চেয়ে বরং, উপান্তে —যেখানে একখানা নির্জন আমবাগান ছিল—বেড়াতে যেতে বেশি ভালবাসতেন তিনি। সেখানে তাঁর ক্রীড়া-সঙ্গীদের নিয়ে শিশুসুলভ আনন্দ এবং মধুর সঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার অনুকরণে সারাদিন কাটিয়ে দিতেন তিনি। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত সুমিষ্ট এবং যে কোন গান একবারমাত্র শুনে হুবহু অনুকরণ করতে পারতেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে যেমন করতেন, কখনও কখনও তিনিও তেমনি কৃষক বালক বালিকাদের তাঁর চার পাশে জমায়েত করে আনন্দে নৃত্যগীত করতেন। তিনিই ছিলেন এই সব বালক বালিকার নেতা, পরিচালক।

তাঁর সমস্ত শিশুসুলভ ক্রিয়া-কৌতুকের সঙ্গে পুরাণে বর্ণিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার এক আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। গদাধরের বাক্‌ভঙ্গী ছিল মধুকর। তিনি একবারমাত্র শুনে যে কোন নাটক অক্ষরে অক্ষরে আদ্যোপান্ত বলে যেতে পারতেন। স্থানীয় যাত্রাদলের অভিনেতাদের প্রতিটি ভঙ্গী এবং ভাবকে তিনি হুবহু অনুকরণ করতে পারতেন। ললিতকলায় জন্ম থেকেই গদাধর প্রতিভাবান ছিলেন। কখনও কখনও তিনি একাকী চলে যেতেন বনে। সেখানে কোন বৃক্ষতলে নির্জনে বসে আপন মনে কাদামাটি দিয়ে তৈরি করতেন—নানা দেবদেবী এবং হিন্দুসাধু-সন্তদের মূর্তি। তারপর সেগুলো তিনি পরমানন্দে বিলিয়ে দিতেন তাঁর বন্ধুদের মধ্যে। আবার কখনও কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি কাটিয়ে দিতেন ফুল, পশু, পাখী—এগুলোর রেখাচিত্র অঙ্কনে। এমন কি রঙ্গীন প্রতিকৃতি বা চিত্র অঙ্কনের অভ্যাস তাঁর ছিল।

এইসব আশ্চর্য গুণের জন্যে বাল্যকালেই গদাধর আশেপাশের গ্রামের বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলের আকর্ষণ-কেন্দ্র হয়ে উঠেন। ক্রমে ক্রমে এমন জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন তিনি যে, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সবাই তাঁকে নিজ নিজ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতে লাগলেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজনগণের বিরূপতা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের প্রত্যেকের আমন্ত্রণই গ্রহণ করতেন এবং তাঁদের জাতি, ধন বা সামাজিক প্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্র বিবেচনা না করে সবার নিমন্ত্রণই রক্ষা করতেন তিনি। তাঁর ব্যক্তিত্বের এক অদ্ভুত যাদুকরী ক্ষমতা ছিল। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, হাসিমাখা মুখাবয়ব, সুমধুর কণ্ঠস্বর এবং সুসমঞ্জস-দেহগঠন তদুপরি নিস্পৃহ প্রেমপূর্ণ অন্তঃকরণের সংস্পর্শে একবার যাঁরা এসেছেন তাঁরাই বিমুগ্ধ এবং বিহ্বল হয়ে গেছেন। রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বকে এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য ছিল না কারও।

গদাধরের বয়স তখন ছ' বছর। একদিন সহসা তাঁর চোখে পড়ল ভাসমান একখণ্ড মেঘের পরিপ্রেক্ষিতে এক সারি ডুবার-শুভ্র বলাকা। সঙ্গে সঙ্গে সকল সুখ, প্রজ্ঞা ও জীবনের উৎস স্বরূপ সচ্চিদানন্দের সঙ্গে যোগ হয়ে গেল তাঁর অতিচেতন মন। স্বর্গীয় আনন্দে তাঁর প্রাণ মন ভরে গেল। এই অপরূপ দৃশ্যটি তাঁর মনে জাগিয়ে তুলল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ অঙ্গের কথা। গদাধরের মনে হলো—শ্রীভগবান যেন স্বর্গোদ্যানের একখানি অপরূপ বনফুলের মালা গলায় ধারণ করে রয়েছেন। রামকৃষ্ণের জীবনে এই দিব্য আনন্দানুভূতিই তাঁর প্রথম ঈশ্বরানুভূতি। অবশ্য পরবর্তীকালে এই ভগবানই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যলীলা সহচর বালকৃষ্ণরূপে। সেই আনন্দময় দৃশ্যটির কথা তিনি কোনদিন ভুলেন নি। পরবর্তী জীবনে প্রায়ই শিষ্যদের কাছে তিনি সেই কাহিনীটি বলতেন। যা হোক্, অতিপ্রাকৃতের এই পরম উপলব্ধি তথা পরমাত্মা বা ঈশ্বরের সঙ্গে মানবাত্মার এই যোগ -যা যোগীরা দীর্ঘ এবং কঠিন সাধনার অন্তে লাভ করে থাকেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগ্যে তা এসে গেল অতি সহজেই—প্রকৃতির দান হিসেবে।

কখন কখন শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিত, বিজ্ঞ দার্শনিকদের আলোচনাসভায় যোগ দিতেন। গভীর মনোযোগ দিয়ে তিনি তাঁদের বিচার বিতর্ক শুনতেন এবং থেকে থেকে যত্রতত্র উক্তি করে বসতেন। কিন্তু এমন দৃঢ় প্রত্যয়শীল ছিলেন তিনি যে, তাঁর উক্তিই চূড়ান্ত বলে প্রমাণিত হতো। তাছাড়া শ্রোতাদের মনেও গভীর রেখাপাত করতো তাঁর কথা। প্রবীণ বিজ্ঞজনদের আলোচনার মধ্যে এমনই সঠিক যথাযথ উক্তি করার সামর্থ্য থেকে নিশ্চিতভাবে বুঝা যায়, এই অদ্ভুত বালকটির মধ্যে কি অসীম জ্ঞান, প্রত্যক্ষানুভব তথা গভীর দূরদৃষ্টি ছিল। এমনি করেই সর্বজনের আন্তরিক প্রীতির মধ্যে গদাধরের বাল্য অতিবাহিত হয়।

গদাধরের বয়স যখন সাত বছর তখন তাঁর বর্ধিষ্ণু পিতা বিগত হলেন। এ ঘটনায় তাঁর

মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলল। পার্থিব বস্তুর অসারতা এক গভীর ছাপ দিয়ে গেল তাঁর মনে। তিনি প্রায়প্রায়ই চলে যান সেই আম্রকুঞ্জের কাছে, শ্মশানভূমিতে। সেখানে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর কেটে যায় নীরব সমাধিতে। জগন্নাথের পথে পরিব্রাজক সাধু সন্ন্যাসীরা তাঁদের গ্রামে এলে গদাধর স্বচ্ছন্দে তাঁদের সঙ্গে মিশে পড়েন, তাঁদের মত করে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন। যেন তিনিও সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছেন। এমন কি, এই বাল্যবয়সেই গদাধরের মন মায়ার বন্ধন কাটিয়ে উঠার জন্য ছটফট্ করতে লাগল। তিনি সমস্ত পার্থিব আসক্তির হাত থেকে মুক্তি লাভ করতে চাইলেন। প্রায়প্রায়ই তাঁর সমাধি হয়। তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন, দেহ নিশ্চল এবং পেশীসমূহ শক্ত হয়ে উঠে। আত্মীয় বন্ধুরা ভাবলেন বোধ হয় ছেলেটিকে কোন ভূতপ্রেত ভর করেছে।

গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হলেও গদাধরের মন ছিল সব কুসংস্কার থেকে মুক্ত। তথাকথিত অধস্তন বর্ণের মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র ঘৃণাভাব ছিল না তাঁর মনে। বরং তিনি ভাবতেন সব নরনারীই যখন পরম পিতা ঈশ্বরের সন্তান, তখন স্বভাবতঃই তারা পরস্পরের ভাই বোন মাত্র। তাই কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে উপনয়নের পর তিনি নির্বিকার চিত্তে ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এক শূদ্রাণীর হাত থেকে। বৃদ্ধা ছিল গ্রামের এক কর্মকারের ঘরণী। গদাধর তাকে তাঁর ধর্মমাতা বলে গণ্য করতেন। স্বভাবতঃই এই ঘটনায় গ্রামবাসিদের মধ্যে, বিশেষ করে তাঁর আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা দিল। তাঁরা ভাবলেন, সে কি কথা, এমন উচ্চকুলে যার জন্ম, যার পিতা ছিলেন সকলের শ্রদ্ধাভাজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তাঁর ছেলে নীচু জাতের শূদ্রাণীর কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করবে, আর তাকেই বলবে ধর্মমাতা! তারা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁদের অসৌজন্যমূলক বাক্যাদিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না গদাধর। বরং তাঁর কৃতকর্মের জন্য নিরতিশয় আনন্দ হলো তাঁর মনে। এমনি করে বাল্যকাল থেকেই গদাধর পরোক্ষে সবাইকে জানিয়েছেন যে, তাঁর আবির্ভাব হয়েছে হিন্দুধর্মের সর্বশ্রেণীর মধ্যে ঐক্য এবং সমন্বয় সাধনের জন্য। সত্যই, যে অনন্ত প্রেমের আধার ছিলেন তিনি, মানব কল্যাণে সেই প্রেমকে কর্মে এবং বাক্যে কোনদিন তিনি প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন নি।

গদাধরের বয়স তখন দশ বছর। সেবার শিবরাত্রি উপলক্ষে গ্রামেই এক যাত্রানুষ্ঠান হবে। তাঁকে জোরজবরদস্তি করে দেওয়া হলো শিবের ভূমিকা। অনুষ্ঠান আরম্ভ হলো। মহাযোগীর বেশ ধারণ করে গদাধর যখন এসে দাঁড়ালেন দর্শকদের সম্মুখে, তাঁর দেহ নিশ্চল, দরদর করে অশ্রু বইছে তাঁর চক্ষু দিয়ে। যেন স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবের আত্মাই তাঁর দেহমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়ে গেল। অতিচেতনতার আবেশে তিনি মগ্ন হয়ে পড়লেন। দর্শকরা যেন তখন সাক্ষাৎ শিবকে প্রত্যক্ষ করছেন। শ্রদ্ধার ভক্তিতে তাঁরা এসে লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পায়ে। এর পর থেকে প্রায়ই এমনি ঈশ্বরাবেশ ঘটে তাঁর। যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন তখন বৃন্দাবনের সেই প্রভুর অলৌকিক আত্মা তাঁর সমস্ত সত্তাকে রসাপ্লুত করে দিয়ে যান। কখনও তিনি আপন মনে গান করেন। সে গান আধ্যাত্ম ভাবযুক্ত ধর্ম-সঙ্গীত। কখনও নিজেকে নারীরূপে, মাতৃভাবে ভাবেন তিনি। কখন মনে হয় শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সহচরী শ্রীরাধা যেন স্বয়ং উপস্থিত তাঁর মধ্যে। সতের বছর বয়স অবধি এমনি নানা লীলার মধ্যে দিয়েই তাঁর দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। আশে-পাশের গ্রামবাসীরা তখন তাঁর সম্পূর্ণ অনুগত। এই মানবজীবনের যাদুকরের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে আর কারও মনেই কোন সংশয় নেই। গদাধর

তখন তাদের সকলের নিকটতম আত্মীয়, প্রিয়তম বান্ধব।

এই সময়ে গদাধরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার একটি টোল খুলেন। সেখানে ন্যায়শাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব, সংস্কৃত-সাহিত্য, জ্যোতির্বিদ্যা, হিন্দুদর্শন ইত্যাদি বিষয় শিখান হয়। রামকুমার ভাবলেন, গদাধর এসব বিষয়ে যোগ্য শিক্ষা লাভ না করে মিছিমিছি মূল্যবান সময় ও সুযোগ হারাচ্ছে। তাঁদের মত এমন উচ্চব্রাহ্মণ পরিবারে অশিক্ষিত শাস্ত্রনিরক্ষর কেউ থাকবে এটা তাঁর কাছে অত্যন্ত লজ্জা এবং অপমানের কথা বলে মনে হলো। তাছাড়া অশিক্ষিত গদাধর রুজি-রোজগার করতে পারবে না, ফলে পরিবারের বোঝা হয়ে থাকবে তাই অনেক ভেবেচিন্তে রামকুমার ছোট ভাইকে নিয়ে এলেন কোলকাতায়। গদাধর কোলকাতায় এসে রামকুমারের কাছেই বাস করতে লাগলেন। রামকুমার অনেক সাধ্যসাধনা করে তাঁর টোলে গদাধরকে পড়াতে লাগলেন।

গদাধর টোলে ভর্তি হয়েছেন বটে কিন্তু এসব লৌকিক শিক্ষার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সৎ পরামর্শেও কোন কাজ হোল না তাঁর মধ্যে। তিনি ভাবতে লাগলেন, কি হবে তাঁর এই শিক্ষা নিয়ে। তাঁর জীবনাদর্শের সঙ্গে তুলনা করে দেখলেন তিনি, এই বিদ্যা লাভের ফলাফল। মনে মনে ভাবলেন,—এমনি লৌকিক শিক্ষা অবশ্যই রুজি রোজগারের পক্ষে উত্তম শিক্ষা। যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, পার্থিব সমৃদ্ধি, সবই হয়ত পাওয়া যায় এই শিক্ষায়। কিন্তু এসবের কোনটিই তো তাঁর দরকার নেই। তিনি চান—শাশ্বত সত্যকে উপলব্ধি করতে। সেই পরম জ্ঞান লাভ করে তিনি জাগতিক সব বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে চান। এই আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার জন্য পরাবিদ্যা লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর অন্তরে ক্রমে এমন তীব্র হয়ে উঠলো যে, তিনি বিদ্যা লাভের—পুঁথিগত শিক্ষার প্রতি একেবারে উদাসীন হ'য়ে উঠলেন। তাঁর মন সেই বিদ্যা লাভের জন্য উন্মুখ হ'য়ে উঠলো যা তাঁকে ঐহিক ঐশ্বর্য কিংবা খ্যাতি দেবে না,—দেবে এই বিশ্বের পরমসত্যকে উপলব্ধি করার শক্তি।

গদাধরের মনোভাবে সহসা এমনি পরিবর্তন দেখে রামকুমারের মন ভেঙ্গে গেল। তিনি অত্যন্ত নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়লেন। গদাধরের আধ্যাত্ম-ভাবাপন্ন সত্যানুসন্ধী মন যেখানে খাপ খেতে পারে, তিনি তাঁর জন্য এমনি কোন কাজের সন্ধান করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁর টোলের কাছেই কোলকাতার ঝামাপুকুর অঞ্চলে কোন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের পারিবারিক পুরোহিতের একটা কাজ পাওয়া গেল। রামকুমার গদাধরকে সেখানে বসিয়ে দিলেন। গদাধর প্রায় দু'বছর এ কাজে ছিলেন। এই দু'বছর তিনি নিষ্ঠাভাবে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন।

ইতিমধ্যে রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে কালী মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের কাজ নিয়েছেন। কোলকাতা থেকে চার মাইল উত্তরে, গঙ্গার ধারে—দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির। এই পরম সুন্দর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন ধর্মপ্রাণা সাধ্বী রাণী রাসমণি। তাঁর ন্যায় দানশীলা নারী দুর্লভ। একুশ একর জায়গা জুড়ে বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি মহামায়া কালীর নামে। নয় লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল তাতে। শুধু কালীমন্দির নয়, বিস্তীর্ণ অঙ্গনে আরো রয়েছে—তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমন্দির এবং বারোটি শিবমন্দির। এই বিরাটাকার মন্দিরটির কাজ সম্পূর্ণ হ'তে সময় লেগেছিল প্রায় আট বছর।

এখানে এই মন্দির প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা দরকার। খৃষ্টানদের চার্চ বা মুসলমানদের মসজিদ যেমন জনসাধারণের অর্থে নির্মিত হয়, হিন্দুদের মন্দির তা নয়। এগুলো প্রধানতঃ ধর্মকর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে থাকে অর্থশালী ব্যক্তিদের দ্বারা। তারপর এগুলো কোন পৌরাণিক দেব-দেবী অথবা অবতারের নামে ভক্তি ভরে উৎসর্গ করা

হয়। যে দেবতার যে ঈশ্বরাবতারের নামে মন্দিরটি উৎসর্গীকৃত হয়, তাঁর একখানা প্রতিকৃতি, প্রতিমূর্তি কিংবা সেই দেবতার অন্য কোন প্রতিভূ মন্দিরাভ্যন্তরে বেদীর উপর স্থাপন করা হয়। সাধারণতঃ এই সব মন্দিরের সঙ্গেই থাকে অন্নসত্র। হাজার হাজার দরিদ্রকে প্রতিদিন ভোজন করান হয় সেখানে। পুরোহিতের কর্তব্য হচ্ছে—যার জন্য মন্দির, সেই দেবতার প্রতি, তথা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি অন্তরের ভক্তিকে উৎসারিত করে তাঁর আরাধনা করা এবং বাড়ীতে অতিথি-সমাগম হলে অতিথি-পরায়ণ ধার্মিক হিন্দুরা যেমন প্রিয়তম বস্তুসম্ভারে তাঁকে আপ্যায়িত করে থাকেন, তেমনি পুরোহিতেরও কর্তব্য সেই আরাধ্য দেবতার নামে, তাঁর স্মৃতিতে সমস্ত ভোজ্যবস্তু নিবেদন করা। তবে পুরোহিতকে মনে করতে হবে, যেন সত্যই সেই দেবতা তাঁর প্রার্থনাকে শ্রবণ করে তাঁর নৈবেদ্যকে গ্রহণ করার জন্য সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছেন।

১৮৫৫ সালের ২১শে মে দক্ষিণেশ্বরের মা-কালীর মন্দিরটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকুমার। আর, তাঁর উপরই অর্পিত হয়েছিল প্রধান পুরোহিতের এই সব দায়িত্ব। গদাধরের ভাগ্যেও এক সুযোগ এসে গেল। ভাইকে তাঁর কর্তব্যপালনে সহায়তা করার জন্য তিনিও তাঁর সঙ্গেই এলেন দক্ষিণেশ্বরে।

কিছুদিনের মধ্যেই তরুণ গদাধরের ব্যক্তিত্ব রাণী রাসমণি এবং তাঁর জামাতা মথুরবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। মথুরবাবু গদাধরের মধ্যে এক অসাধারণ আধ্যাত্মশক্তির বিকাশ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। তিনি স্থির করলেন, তাঁর উপরই অর্পণ করবেন মা কালী পূজার ভার। তা হলে তাঁর ভক্তিপূর্ণ প্রাণের ডাকে—জগন্মাতা কালী জাগ্রত হয়ে উঠবেন এই মন্দিরে, সর্বলোক ধন্য হবে তাঁর সাক্ষাত দর্শন লাভ করে'। মনে মনে এমনি সংকল্প করে' মথুরবাবু গদাধরকে অনুরোধ জানালেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মন ছিল স্বাধীনতাপ্রিয়। তাই প্রথমে তিনি পুরোহিতের কঠিন-বাঁধা কাজের বন্ধনে আটকে পড়তে চাইলেন না। কিন্তু ভাগিনা হৃদয়রাম রাজী হলেন তাঁকে সাহায্য করতে। তখন তিনি রাধা-গোবিন্দের পুরোহিতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। কালীমন্দিরের কাজ চালিয়ে যেতে হলো তাই রামকুমারকেই।

প্রায় এক বছর এই ব্যবস্থানুযায়ীই চললো সব। সহসা রামকুমারের মৃত্যু হ'লো। শোকে-দুঃখে অভিভূত শ্রীরামকৃষ্ণকেই বাধ্য হয়ে তখন নিতে হলো কালীমন্দিরের দায়িত্বও। কিন্তু পার্থিব জগতের পরিবর্তনশীলতা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। জগন্মাতার প্রসাদে তিনি উপলব্ধি করলেন, মানব জন্মের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ কি।

শ্রীরামকৃষ্ণ পুরোহিতের দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদন করে চলেছেন। প্রতিদিন জগন্মাতার আরাধনা করেন, ফুল বিল্বপত্রে তাঁর পূজা করেন। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে আরতি করেন। কয়মাস এমনি করে অতিবাহিত হয়ে গেল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তমন এতে তৃপ্ত হলো না। তাঁর সত্যানুসন্ধী আত্মা ব্যগ্র হয়ে উঠলো আরো কিছুর জন্য। মনে মনে জিজ্ঞাসা দেখা দিল তাঁর,—'কেন এ সব, কিসের জন্য? আমি কি একখণ্ড প্রাণহীন প্রস্তর মূর্তির সামনেই এসব করছি, না সত্যই মহামায়া আমার এই প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন, গ্রহণ করেন আমার নিবেদিত অর্ঘ্য?' বলা বাহুল্য, মনের এই জিজ্ঞাসাই এই তরুণ পুরোহিতের জীবনে নিয়ে এলো যুগান্তর। এই জিজ্ঞাসাই তাঁর মধ্যে জাগ্রত করে তুলল এতদিনের সুপ্ত আত্মাকে। নতুন পথে পা বাড়াতে বাধ্য হলেন তিনি। এই পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়—দুস্তর, স্বভাবতঃই অনুগামীর সংখ্যাও স্বল্প। রামকৃষ্ণের নির্দিষ্ট এই পথের লক্ষ্য—সর্ব মানুষের মধ্যে ভগবানকে জাগিয়ে তোলা; নিজের অন্তরাত্মাকে জীবন্ত ঈশ্বরে পরিণত করা।

সারাদিন তিনি মহামায়ার ভজনা করেন। বারবার তাঁর কাছে আকুতি জানান জীবন্তরূপে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হওয়ার জন্য। কখনও হয়ত বা ঝরঝর করে অশ্রু বইছে তাঁর চোখ দিয়ে। তিনি কেঁদে কেঁদে বলছেন, 'মাগো, তুমি কি এখানে? আমি যা বলি তোমায়, শুনতে পাও কি তুমি? কি করে আমি জানবো কোথায় তুমি আছ? তুমি তো সর্বভূতে বর্তমান, তবুও তোমায় কেন দেখতে পাইনা আমি? কি করে আমি বুঝতে পারবো তোমার উপস্থিতি, তোমার স্বর্গীয় অবয়ব? যদি তুমি সবার জননী হও, তবে কি আমি সন্তান নই তোমার? তবে কেন তুমি আমার কাছে আস না, কেন আমাকে তোমার প্রকৃত রূপ প্রত্যক্ষ করাও না? আমি নিতান্ত অশিক্ষিত। আমি শাস্ত্রপাঠ জানিনা, তুমি আমায় শিক্ষা দাও, মা আমার, আমায় তুমি শিখিয়ে দাও।' এমনি করে তিনি কান্নাকাটি করেন, আকুতি-মিনতি করেন। দিনের পর দিন শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃসন্ধান তীব্রতর হয়ে উঠলো। তাঁর মধ্যে ব্যাকুলতারূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে। আর এ দুনিয়ার কোন-কিছুর ক্ষমতা নেই তাঁকে নির্বাপিত করে। তাঁর অন্য সব কামনা, সব চিন্তা-ভাবনা গ্রাস করে নিল এই অগ্নিশিখা। তাঁর আর দিনরাত্রির বোধ নেই। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি শুধু এই এক ভাবনা তাঁর মনে—'মা-কে দেখবো'। বন্ধুদের প্রবোধ কিংবা আত্মীয়দের উপদেশ বৃথাই তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলো। প্রবলবেগে তাঁর অন্তর মধ্যে বয়ে চলেছে তখন মাতৃভাব। তাকে প্রতিরোধ করে, এমন সাধ্য কার! খাওয়া-পরার দিকে তাঁর বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নেই, নেই কোন আরাম-আয়াস। এমন কি নিদ্রাও পর্যন্ত ত্যাগ করেছে তাঁকে। পুরোহিতের কাজ আর তাঁকে দিয়ে চলবে কেমন করে? বাধ্য হয়ে ঐ দায়িত্ব ত্যাগ করলেন তিনি।

মন্দিরের কর্মচারিগণ ভাবলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বোধ হয় উন্মাদ হয়ে গেছেন। তারা তাঁর জন্য দুঃখ করেন, সহানুভূতি প্রকাশ করেন—তাঁর মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করেন। কিন্তু সবই বৃথা। আত্মীয়রা ভাবলেন, তাঁকে যদি কোনমতে বিয়ে করান যায় তবে হয়ত আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন তিনি। কিন্তু কাজটি সহজ নয়। প্রথমতঃ সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং মর্যাদা থেকে চ্যুত কোন মন্দির-পুরোহিত ব্রাহ্মণের কাছে কেউ কন্যাদান করতে চাইবে না। তাছাড়া সবাই তাঁকে উন্মাদ বলে জানে; তাঁর কাছে কোন্ সম্ভ্রান্ত পিতামাতা কেন বিয়ে দেবেন নিজেদের কন্যাকে? অবশেষে বহু অনুসন্ধান করে তাঁরা একটি নিতান্ত অল্পবয়সী পাত্রীর সন্ধান পেলেন। তাঁর মা বাবার তেমন আপত্তি নেই। এই কন্যাটিকেই বাগ্দান করা হলো। তখন তাঁর বয়স মাত্র পাঁচ বছর। এদিকে রামকৃষ্ণ তখন তেইশ বছরের যুবক। যাহোক বাগ্দান অনুষ্ঠানের বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না রামকৃষ্ণের মধ্যে। তিনি আগের মতোই আছেন। কখনও কাঁদেন, কখনও প্রার্থনা করেন; কখনও পঞ্চবটির বিরাট অশ্বত্থ-তলে বসে যোগমগ্ন হয়ে থাকেন; কখনও রাত্রিতে নির্জন স্থানে গাছের তলে বসে থাকেন প্রায় বিবস্ত্র হয়ে।

"ঠিক ঠিক ভক্তি বিশ্বাস তখনই হয় যখন দেখা যায় ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা। ঈশ্বরকে দেখতে পেলে তবে তো বিশ্বাস হবে তিনি আছেন। তা ছাড়া আর যে রকম বিশ্বাস তা মোটেই স্থায়ী হয় না। সাধারণ লোকেদের ঈশ্বর বিশ্বাস শুধু কথার কথা। ওর ভেতরে একটুও Sincerity (আন্তরিকতা) নেই। ও রকম বিশ্বাসের দাম কাণাকড়িও নয়।"

— ব্রহ্মানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমূর্তি

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

নাম ও রূপ নিয়ে এই জগৎ। এই জগতে রূপের অনন্ত মেলা মানব-মনকে আকৃষ্ট করে নানাভাবে। মানুষ যখন নামরূপের রাজ্য ছেড়ে সমাধির রাজ্যে প্রবেশ করে, তখন তার কাছে থাকে না নামরূপ, থাকে না জগৎ; থাকে তখন এক চৈতন্যসত্তা—যা বাক্য-মনের অগোচর। সেই অরূপ সত্তা থেকেই রূপের সত্তা, 'এক' থেকেই 'অনেক'। যখনই মনের দ্বারা বিচার, তখনই দ্বৈত; প্রথমতঃ মন, দ্বিতীয়তঃ বিচার্য-বিষয়। মন হয় ইন্দ্রিয়ে নিবিষ্ট ও সেই মনযুক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুর রূপদর্শন, শব্দের শ্রবণ, রসের আস্বাদন, গন্ধের ঘ্রাণ ও স্পর্শ দ্বারা শীতোষ্ণাদির অনুভব সম্ভব হয়। যতক্ষণ মন আছে, ততক্ষণ জগৎ আছে, আছে জগতের নানা রূপ, নানা জীব। মনের নাশে জগৎ নেই।

রূপ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন রকম। এই তিন রকম রূপ মানব-মনে তিন রকম ভাবের রেখাপাত করে। কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সাত্ত্বিক রূপ অন্তরে পবিত্রভাবের উদ্রেক করে। জননীর স্নেহময়ী মূর্তি, মুক্তপুরুষের জ্ঞানময় তনু, অন্তহীন আকাশের গম্ভীর শোভা, দিবা ও নিশার সন্ধিক্ষণ, পর্বতমালার ধ্যানমগ্ন মূর্তি, স্রোতস্বিনীর আবেগময় প্রবাহ, জলধির ক্রীড়াচঞ্চল তরাল বিগ্রহ প্রভৃতি সাত্ত্বিক রূপ। এই সব রূপের দর্শন ভাবুক মানুষের মনকে নিয়ে যায় এক ভাবরাজ্যে, মন তার স্বাভাবিক চাঞ্চল্য হ'তে সাময়িকভাবে মুক্ত হ'য়ে এক অচঞ্চল ধ্যানমগ্ন অবস্থায় হয় উপনীত; সে তখন এই বহুর মধ্যে পায় একের সন্ধান—যে 'এক' সকল রূপের জমাটবাঁধা এক চিরসত্তাময়, আনন্দময় রূপ। ক্রোধান্ধ ব্যক্তির ভ্রূকুটি, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র প্রাণীর চক্ষুর দীপ্তি, অটিকার প্রবহণ, বিজলীর ক্ষণস্থায়ী প্রভা প্রভৃতি রাজসিক রূপ। এই 'রূপ' ভীতির সঞ্চার করে, মানবমনে। এ 'রূপ'-এর সান্নিধ্য হ'তে দূরে সরে যেতে চায় মানুষ। কামিনীর মোহিনী মূর্তি ও কামাসক্ত পুরুষের আঁখির ভঙ্গিমা—এই দু'টি তামসিক রূপ। ইহা মানব-মনকে নামিয়ে আনে তুচ্ছ ভোগের রাজ্যে।

যতক্ষণ আমরা রূপের রাজ্য ছেড়ে অরূপ সত্তায় যেতে সক্ষম না হব, ততক্ষণ সংখ্যাহীন রূপ-মধ্য হ'তে এমন এক পবিত্র সত্ত্বময় রূপে আমাদের মনকে নিবিষ্ট রাখতে চেষ্টা করব, যা আমাদের মনকে পবিত্র ও আনন্দময়ভাবে পূর্ণ ক'রে রাখতে সক্ষম হয়। মানুষ চায় শান্তি ও আনন্দ। এই শান্তি ও আনন্দের আশায় মানুষ অনাদিকাল হ'তে শ্রীভগবানের প্রেমময় রূপের ধ্যান ও চিন্তা ক'রে আসছে। শ্রীভগবানের রূপ যে কি রকম তা কেউই বর্ণনা করতে সক্ষম হয় না, তাই কল্পনারই সাহায্য নিতে হয় প্রথমে। অনেকে বিশ্বজননী মা কালী, মা জগদ্ধাত্রীর মূর্তি কল্পনা করেন ও সেই মূর্তির ধ্যানে তন্ময় হ'য়ে যেতে করেন চেষ্টা। কেহ বা শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ বা শ্রীযীশুর মূর্তি চিন্তা ক'রে থাকেন। কিন্তু সেই প্রাচীনকালে বিজ্ঞানের উৎকর্ষাভাবে উল্লিখিত কোন অবতার পুরুষেরই ছায়াচিত্র গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না; কাজেই ভক্তগণ, এমন কি ভাবুক চিত্রকরগণও কল্পনার সাহায্য ব্যতীত তাঁদের মূর্তি চিন্তায় আনতে সক্ষম হ'তেন না। ধন্য বিজ্ঞানশাস্ত্র, যার উৎকর্ষে বৈজ্ঞানিকগণ কোন ব্যক্তির বা দৃশ্যের ছায়াচিত্র গ্রহণে সক্ষম হয়েছেন। তাই গত উনবিংশ শতাব্দীতে গৃহীত হয়েছিল নরাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছায়ামূর্তি যা আজ আমরা বাহ্য চক্ষে দর্শন করতে সক্ষম হচ্ছি। ধর্ম-স্থাপন বা ধর্মগ্লানি দূর করবার জন্যে শ্রীভগবান পূর্ব পূর্ব যুগে নর বা নারী-বিগ্রহ ধারণ ক'রে জগতে অবতীর্ণ হ'য়েছেন সত্য, কিন্তু প্রকৃত কি রূপ তাঁরা ধারণ করেছিলেন তা এখন কারও জানবার

উপায় নেই। তবে বর্তমান যুগে শ্রীভগবান ঠিক যে মূর্তিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার অবিকল ছায়াচিত্র (ফটো) থাকায় আমরা স্বচক্ষে তা দর্শন ক'রে ধন্য হচ্ছি। এইবার শ্রীরামকৃষ্ণ-মূর্তি সম্বন্ধে কে কি বলেছেন তার উল্লেখ করতে চেষ্টা করব।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ লীলাপার্ষদ শ্রীমৎ অভেদানন্দ স্বামিজী বলেন "একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গভীর সমাধিমগ্ন বসা-মূর্তির ফটো দেখে ভাবমুখে বলে উঠেন, 'এ অতি উচ্চ যোগাবস্থার মূর্তি। এটা ধ্যান করবে। এর পর ঘরে ঘরে এ মূর্তির পূজো হবে।' ঐ মূর্তিতে তিনি স্বয়ং পুষ্পাঞ্জলিও প্রদান করেছিলেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গিনী, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার মাধুর্যবর্ধিনী করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা বলেছেন, "যে ঠাকুরের চিন্তা করবে, তার কখনো কষ্ট হবে না। তাঁকে স্মরণ করলে কোন দুঃখ থাকে না। ধ্যান নাই বা হ'ল, ঠাকুরের ছবি দেখলেই হবে; তা-ই দেখবে, তা হলেই হবে।" ঠাকুর নিজ ফটো সম্বন্ধে ভক্তবর নবগোপাল ঘোষের স্ত্রীকে যা বলেছিলেন, তা ভগ্নী দেবমাতা প্রণীত 'Sri Ramkrishna & his disciples' নামক বইতে যেভাবে লিপিবদ্ধ আছে তার মূলটি উদ্ধৃত করার প্রলোভন সম্বরণ করা গেল না। উহা এই: "This picture will travel in railway carriages and on ocean steamers and by bearers and people will carry it in their pockets and even on their watch chains." (অর্থাৎ এই ছবি রেলগাড়ীতে, ষ্টীমারে, লোক-বাহনে - দেশ বিদেশে পরিভ্রমণ করবে; লোকের পকেটে পকেটে এমন কি ঘড়ির চেনে চেনে বাহিত হবে।) দেবমাতা তারপর নিজে বলছেন:

"This seems a prophecy in the light of what has happened since. In France & Switzerland, Italy, Germany, Holland, Sweden, Denmark and Norway, in England and Russia there are homes where a picture of Sri Ramkrishna stands in reverend apartness. It has found its way to Canada & to every part of the United States. It has gone around the world with more than one devout travellor and it is appearing with growing frequency in Western books on India"

(অর্থাৎ বাস্তবে যা ঘটছে, তদৃষ্টে এই কথাকে ভবিষ্যদ্বাণী বলে মনে হচ্ছে। ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালি, জার্মানী, হলাণ্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, নরোয়ে, ইংলণ্ড ও রুষিয়াতে বহু বাড়ী আছে—যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি পরম শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে রক্ষিত আছে। এই ছবি কানাডা তথা যুক্তরাজ্যের সর্বত্র পৌঁছে গেছে; অগণিত পর্যটকের সঙ্গে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। আজকাল ভারত সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের লিখিত পুস্তকগুলিতে প্রায়শঃ এই ছবি দৃষ্ট হয়। পূর্বে কিন্তু এরকম দেখা যেতো না। এখন ঐ ধরণের বইতে এই ছবি দেওয়া ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে।)

এর কারণ—এবার ভগবান তাঁর পূর্ণতম শক্তি নিয়ে এসেছিলেন। "দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব, কিন্তু সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।" এটি শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখের উক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বপ্রধান শিষ্য সত্যদ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমূর্তি সম্বন্ধে বলেছেন, "তাঁর মুখ সাধারণ মানুষের মত ছিল না। উহাতে বালকবৎ কমনীয়তা, গভীর নম্রতা ও অদ্ভুত প্রশান্ত ও মধুর ভাব প্রকাশ পাইত। কেহ তাঁহার মুখ দেখিয়া বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারিত না।" বাস্তবিক শ্রীরামকৃষ্ণ-মূর্তির মাধুর্য ভাষায় প্রকাশ করবার নয়, ধ্যান ও চিন্তার যোগ্য। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, "তিনি যখন মানুষ হ'য়ে অবতীর্ণ হন, তখন ধ্যানের খুব সুবিধা। অবতারকে দেখাও যা, ঈশ্বরকে দেখাও তা।" শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ, জ্ঞান ও প্রেমের প্রত্যক্ষ বিগ্রহ মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ বলেছেন, "তাঁর মধুর জীবন্ত মূর্তিই জীবের ধ্যেয়। জগদম্বার জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণকে ঠিক ঠিক জানা হলেই সব জানা ও পাওয়ার শেষ হবে।" শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি সম্মুখে রেখে তৎপ্রতি চেয়ে তাঁর চিন্তা করলে নিশ্চয়ই

ধ্যান হবে।···বহুলোকের কল্যাণের জন্য যিনি পরব্রহ্ম, তিনি এই রামকৃষ্ণ রূপ ধরে এ যুগে এসেছেন।" "মনকে স্থির করার একমাত্র প্রধান ও সহজ উপায় শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমূর্তির সামনে বসে তাঁর দিকে দৃষ্টি রেখে তাঁর নাম জপ করা ও মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, ঠাকুর তোমার দিকে দেখছেন, তোমার জপ শুনছেন ও তোমায় কৃপা করবার জন্যে বসে আছেন।" কি চমৎকার সাধন ইঙ্গিত। তবে রূপের সাধনই শেষ নয়, তাই মহাপুরুষজী বলছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ নাম ও শ্রীরামকৃষ্ণ রূপই তাঁর সেই নামরূপাতীত শান্তিময় অবস্থায় নিয়ে যায়।" শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়া-মূর্তি সম্বন্ধে পরমভক্ত কর্মবীর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী বলছেন, "Sri Ramkrishna's photograph is His living self. Do not think it to be a mere photograph. It is His living self." এর কারণ এই যে, এই ফটোগ্রাফে শ্রীভগবান সাক্ষাৎ যে মূর্তিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তারই ছায়া; এতে কোন কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয় নি। ত্যাগমূর্তি, 'বেদাগ' সাধু স্বামী অদ্ভুতানন্দজী বলেন, "ঠাকুরের ছবি দেখতে দেখতে তোমার মনের কামকামনাগুলো সব চলে যাবে জানো?" অতএব রিপুশ্রেষ্ঠের হাত হ'তে উদ্ধার পাবার এ অপেক্ষা আর সহজ উপায় কি হতে পারে? শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তির অন্তরালে এই শক্তি পূর্ণরূপে রয়েছে, কারণ তিনি তাঁর জীবনে কামকাঞ্চনবাসনাহীন পবিত্রতম আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন। জ্ঞানী শিরোমণি স্বামী তুরীয়ানন্দজী বলেছেন, "তাঁহাকে ফটোতে প্রত্যক্ষ করে সত্যজ্ঞানে তাঁর সেবাপূজা করে যাও, দেখবে সত্যই তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে যাবে।" এর কারণ, যে যাঁর চিন্তা করে, সে তাঁর সত্তা পায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-মূর্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী বলেন, "ঐ যে ছবি দেখছ, উহা ষট্‌চক্রভেদের মূর্তি। তিনি সব চক্র ভেদ করে আনন্দেতে ডুবে আছেন।···তাঁকে দেখলেই মনে হ'ত যেন ভেতরকার পবিত্র ভাব-সমূহের Living embodiment. তাঁর সর্বশরীরে Spiritual current বিদ্যুতের মত সদাই খেলত।"

যদি আমরা সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণের বাণীগুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করি ও শ্রীরামকৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বময় বিগ্রহের ধ্যানচিন্তা করি তা হ'লে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের মনকে পবিত্রতায় পূর্ণ করতে সক্ষম হব ও ক্রমশঃ শান্তি ও আনন্দের অধিকারী হতে পারব। শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞাতিপুত্রী শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী বলেছেন যে, ঠাকুরের গায়ে আলতা গোলা রং ছিল। সমাধি সময়ে তাঁর চারধারে একটা আলোক-রেখা দেখা যেত। তাই তাঁর ফটোতে দৃষ্ট মূর্তিকে তাঁর জ্যোতির্ময় জীবন্ত মূর্তি রূপে চিন্তা ও ধ্যান করাই পবিত্রতা, শান্তি ও আনন্দলাভের শ্রেষ্ঠতম উপায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মাত্র তিন রকমের ফটো নেওয়া হ'য়েছিল ও এই তিন রকম ফটোই প্রামাণ্য। (১) সমাধিস্থ বসা মূর্তির ফটো। এ ফটো নেওয়া হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে। এই বসা-মূর্তিরই সাধারণতঃ পূজা হয়। (২) জামা গায় ও ভাবাবস্থাঙ্গ হাত তোলা ফটো। এ ফটোটি ভক্তিভাজন কেশবচন্দ্র সেনের কল্‌কাতার বাড়ী 'কমল কুটিরে', তোলা হ'য়েছিল। (৩) কামিজ ও কোট গায়ে, কোঁচার কাপড়টি কাঁধে ফেলা ও একটি থামের ওপর ডান হাতটি রাখা অবস্থার ফটো। এ ফটোটি তোলা হ'য়েছিল কল্‌কাতা রাধাবাজারে। আজকাল শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির ন্যায় ঠাকুরেরও নানারকম কল্পিত ও কৃত্রিম ছবি বাজারে ও গৃহস্থ বাড়ীতে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের আসল ফটো থাকতে তাঁর ছবি প্রকাশে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা যায় না। কল্পিত ছবি বাজারে চালু থাকলে কোন্ ছবি আসল ও কোন্ ছবি নকল ও কল্পনাপ্রসূত তা বোঝা পক্ষে জনসাধারণের বিভ্রান্তি ঘটতে পারে।

বিবেকানন্দের সন্ন্যাস-জীবন

শ্রীঅনিলকুমার হালদার

বিবেকানন্দের জীবনদিগন্ত যখন লোকচক্ষে প্রতিভাত হলো, তখন তিনি গৈরিকবসনে গৃহ-পরিত্যাগী, বীর্যবান সন্ন্যাসী ; ধর্মের ঐকান্তিকতার জ্যোতির্বলয়ে জ্ঞানভিক্ষু তপস্বীর ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের পদতলে আসীন—সেই গুরুশিষ্যের যুগপ্রেরণা বিশ্বকে অকস্মাৎ চমকিত করে তুলেছে। তাঁর প্রাক্‌সন্ন্যাস-জীবনে অর্থাৎ বাল্যকালে যে সন্ন্যাস-সম্ভাবনার অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল তা ছিল তাঁর আপন চরিত্রের মূলগত এবং সেখানে দু'টো জিনিষ দেখতে পাই—অদম্য মানসিক কৌতূহল এবং প্রাণচঞ্চল তেজস্বিতা। দেহের রহস্যে যাঁরা ঐ অনম্য কঠোরতাই তাঁর সারা জীবনের ক্রিয়াকর্মের অন্তরালে এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, বাঙালীর স্বভাবজ কোমলতাকে ধিক্কার দিয়ে তিনি বলেছেন, "দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে যাবি দেখবি খোল করতালই বাজছে! ঢাক ঢোল কি দেশে তৈরী হয় না? তূরী ভেরী কি ভারতে মেলে না? ঐ সব গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। ছেলেবেলা থেকে মেয়েমানুষী বাজ্‌না শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল!"

বিবেকানন্দ যাঁর শিষ্য, তিনি ছিলেন কালী-সাধক। রহস্যের বাতাবরণে ভাস্বরমানা এই খাণ্ডাখর্পরধারিণী, লোলচামুণ্ডা, দিগম্বরা মসীকৃষ্ণ দেবতাটির পদতলে শবাকৃতি ভৈরব অচৈতন্য—রহস্য এইজন্য যে, ঐ রণরঙ্গিণীই ভক্তের চোখে বরাভয়-দাত্রী, কোমলকান্ত-জগন্মাতা। বিবেকানন্দ তাঁকে মৃত্যুরূপা মাতা (Kali the Mother) বলেছেন :

'সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ,
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।'

সন্ন্যাসগ্রহণের পরেই প্রকৃতপক্ষে বিবেকানন্দের জীবনারম্ভ। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ঘোর নাস্তিকের জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে ; কিন্তু চারিত্রিক দৃঢ়তা উত্তরোত্তর বেড়েই গেছে। ১৮৬৩ খৃঃ তাঁর জন্ম, ১৮৮৩-তে সাক্ষাৎ, তারপরেই পরিবর্তন : অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর সেই নবজাগৃতির পূর্বাহ্নে যেন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। রামমোহনের অভ্যুদয়ে দেশব্যাপী চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলেও বিশিষ্ট শৃঙ্খলাকে সে সহজে স্বীকার করে নি ; তাই ব্রাহ্মধর্ম পৃথক সমাজের যেমন জন্ম দিল, তেমনি সনাতন হিন্দুধর্মের বহির্দ্বারেও আঘাত এলো খৃষ্টান মিশনারীদের কাছ থেকে। আবার বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবে বাংলার আকাশে যুগপৎ রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক ঘনঘটা সঞ্চারিত হওয়ায় ধর্মের ক্ষীণ দীপশিখাটি বাহ্যানুষ্ঠানের অঞ্চলতলে কোনমতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হলেও ওদিকে আমাদের মানসিকতায় বজ্রের মত আঘাত হান্‌লেন মধুসূদন, —বিদ্রোহী আত্মার অমর ক্রন্দন কাব্যরূপে বাঙালীর মনোহরণ করলো। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র—সংগঠনশীলতার মূলতলে আত্মসাক্ষাৎকারের বীজ উপ্ত হলো তাঁর হাতে। বিপ্লব-সমাচ্ছন্ন জনমানসে, কুসংস্কারবদ্ধ তথাকথিত পণ্ডিতসমাজে সাহিত্য-প্রীতির সঙ্গে স্বদেশ ও স্বধর্মানুরক্তির মন্ত্র বঙ্কিম যে বাংলায় প্রচার করেছেন—সেই নূতন বাংলার বলাধান করলেন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ।

দেশের দারিদ্র্য বিবেকানন্দকে যত না ব্যথিত করেছে, এর দারিদ্র্য, কুসংস্কার, জাতিভেদপ্রথা আর দুঃখার্ত্ত তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে সর্বাধিক।

সন্ন্যাস-জীবনেও তিনি সেই ভগবানকে বিশ্বাস করতেন না, যে ভগবান স্বর্গে অনন্ত ঐশ্বর্য্যদাতা কিন্তু ইহলোকে একমুষ্টি অন্ন দিতে অপারগ; তাই তাঁর ভগবান ছিল অবহেলিত, অপাংক্তেয়, অন্ত্যজ মানুষগুলো—যারা যুগের পর যুগ উপবাসক্লিষ্ট, বুভুক্ষু। ধর্ম্মের ঐশ্বরিক বুলিতে বীতরক্ত এই বীর সন্ন্যাসী এই ধর্ম্মের দেশে সর্ব্বপ্রথম অধর্ম্মীয় কথা উচ্চারণ করেছিলেন, 'খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না'। শুধু তাই নয়, পুরোহিত সম্প্রদায়কে বোধ হয় তিনিই একমাত্র লোক যিনি যৎপরোনাস্তি গালি দিয়ে তাঁদের আটলান্টিক মহাসাগরে চুবিয়ে মারার পক্ষপাতী ছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন হরিজনের মুক্তিদিন সন্নিকটে। আপন আধ্যাত্মিক মুক্তি-পিপাসায় অধীর হওয়া দূরের কথা, সেই আকাঙ্ক্ষাও তাঁর ছিল না; এই দেশের উন্নতির জন্য, মুক্তির জন্য তিনি ইতরযোনিপ্রাপ্তিকেও সৌভাগ্য বলে মনে করতেন। তাঁর জন্মভূমির অতীত গৌরবের স্মৃতি অসহ্য পুলকের সৃষ্টি করলেও বর্ত্তমানের দুরবস্থা সেই পুরুষবীরকে বৃশ্চিকদংশনের জ্বালার মত জর্জ্জরিত করে তুলেছে: মুচি মেথর ছিল তাঁর ভাই, তাঁর রক্ত।

ঐ দেশপ্রীতির অন্তরালে ছিল এক কঠিন যুক্তিনিষ্ঠ মন, ভাবাবেগের অতিরেকে যা' কখনও অবলম্বন করেনি এবং সেজন্যই সত্যের প্রখর আলোকে সেই শাশ্বতকে অহর্নিশি তিনি সন্ধান করেছেন—তবু বিবেকানন্দের সারা জীবন ক্রন্দনময়, তাঁর সমস্ত রচনাবলীর অন্তরালে আছে একটা শৃঙ্খলবদ্ধ, যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত দেবশিশুর আর্ত্তস্বর; অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার অভিচেতনায় প্রমেথিয়ুসের মত সেই আমৃত্যু পর্ব্বতের শিখরমালায় তিনি মাথা কুটে মরেছেন।—"আমি যদি সেই রকম বারজন যুবক পেতাম"?—এই তাঁর দুঃখ: মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও তাঁর দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়; যদি আর একজন বিবেকানন্দ থাকতো, তবে বুঝতো বিবেকানন্দ কি করেছে'—If there were any other Vivekananda, he would have understood what Vivekananda has done." মানুষ গড়াই ছিল তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য, তাঁর ধর্ম্মপ্রচারও ঐ মানুষ সৃষ্টির জন্য। (Man-making religion)। ত্যাগ ও তিতিক্ষার পথে আত্মোন্নতির পূর্ব্বে দৈহিক গঠনশীলতাকে শ্রদ্ধা করেছেন অনেক বেশী, এই হিসাবে তিনি উপনিষদের সেই "নায়মাত্মাবলহীনেন লভ্যঃ"—পন্থানুসারী। আবার বিবেকানন্দ ছিলেন চিন্তাশীল বক্তা ও লেখক, যদিও সাহিত্যের দিক দিয়ে আমি তাঁকে কেবলমাত্র নূতন লেখনশৈলীর আবিষ্কর্ত্তা বলেই স্বীকার করি এবং সে শৈলীও তাঁর ব্যক্তিত্বের যুক্ত বিধৃত অর্থাৎ ওজঃপূর্ণ। ঊর্জ্জস্বল চরিত্রবান্ এই ব্যক্তিটি গভীরভাবে চিন্তা করেছেন সর্ব্ববিষয়ে—স্ত্রী শিক্ষার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই, অবশ্য সেই শিক্ষাও সাধারণ অর্থে শিক্ষা নহে: বিবেকানন্দের নিকট শিক্ষা অর্থে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের অভিব্যক্তি। 'আমাদের দেশের পুরুষগুলা নারীকে কেবলমাত্র পুত্রোৎপাদনের যন্ত্র করে রেখেছে,' তাই নারীর অভ্যুত্থান ব্যতীত উন্নতি অসম্ভব—বিবেকানন্দ উপমা দিয়েছেন, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।

দুর্ব্বলতাই সবচেয়ে বড়ো পাপ; অজ্ঞানতার চেয়ে ঘৃণ্যতম অপরাধ আর নেই। আমি যখনই বিবেকানন্দকে ভাষার চেষ্টা করেছি প্রতিবারই দেখেছি পরিব্রাজক বেশে তিনি সারা পৃথিবীতে পরিভ্রমণের সময় মুষ্টি সহ চীৎকার করেছেন, শক্তি, শক্তি, শক্তি, —'strength, strength, it is that what we want so much in this life.' তাঁর সেই দীর্ঘ ও ততোধিক দীর্ঘ মুখমণ্ডল থেকে, তা' যেন মেঘ-আকৃতি গর্জ্জনের মত প্রতিধ্বনিত হয়। বিবেকানন্দ ধর্ম্ম-প্রচারক, দার্শনিক, সমাজ-সংস্কারক, যুগপ্রবর্ত্তক সাহিত্যিক ছিলেন সবই সত্য; কিন্তু সর্ব্বোপরি তিনি ছিলেন মানুষ, সে মানুষের বহিরাবরণে সন্ন্যাস মূর্ত্তি,

অন্তরে বজ্রের কঠোরতা ও কুসুমের মৃদুতা : প্রবল আত্মবিশ্বাসের শিলাতটে রুদ্ধশ্বাসে রাত্রিদিন প্রার্থনা করেছেন জগদম্বার কাছে। দৈবশক্তির অলৌকিকতাকে নস্যাৎ করে আত্মশক্তির পাষাণভিত্তিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য ; আমি জানি না তিনি জীবনে ক'টা অলৌকিক কাজ করেছিলেন—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ রাজযোগের বিবৃতির মধ্য দিয়ে তামসিকতা ও সাত্ত্বিকতা নয়, যা প্রচার করেছেন তা হোল রাজসিকতা, সেই শক্তি, বীর্য্য ! অর্থাৎ—'হে আমার যুবক বন্ধুরা, তোমরা আগে বলবান হও—ধর্ম্ম তারপরে আস্‌বে'। সুতরাং বিবেকানন্দের সন্ন্যাস-দীক্ষা একটা বিশেষ ব্রত-উদ্‌যাপনের জন্যই ; এই জীবনের ক্রান্তিরেখায় আত্মিকবৃদ্ধির স্পর্শ নেই, ধ্যানতন্ময়তার অতীন্দ্রিয়লোকে ঊর্দ্ধাগমনের ষড়যন্ত্র করে মন্ত্রজপের ঘটা নেই। তিনি কথামালার সিংহের মতই ভেড়ার পাল থেকে আমাদের উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন, তাঁর মনোমুকুরে প্রতিবিম্বিত আমাদের আত্মাকে দেখার চেষ্টা করলেই কথাটা হৃদয়ঙ্গম হবে। ধার্মিক ক্লীব অপেক্ষা অধার্মিক শক্তিমান অধিকতর ক্ষম্য। তাই বিবেকানন্দের বাণী :

"You will be nearer to heaven through football than through the study of Gita".

১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই স্বামিজীর জীবন-দীপ নির্ব্বাপণের তারিখ, অর্থাৎ মাত্র ৩৯ বৎসর তাঁর জীবনকাল, তথাপি এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তিনি পৃথিবী কাঁপিয়ে তুলেছিলেন : ঐশীশক্তির উন্মেষ হয়ত তাঁর পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু জ্ঞানমঞ্চের পাদপ্রদীপে তিনি পুরুষকার, তথা মানুষী-শক্তিকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন এবং সেই পথে আপন অমরত্বাম্বকে আমোল দেন নি ; কর্ণের মতই তাঁরও বীর্যমন্ত্র—

"সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা কো বা ভবাম্যহম্
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম্।"

তাঁর সারাজীবনের দুশ্চর তপশ্চর্য্যার পশ্চাতে ঐ ভাব ছিল সক্রিয়, আরাধনার উদ্দেশ্য ছিল যেমন স্পষ্ট, আরাধ্যও তেমনি ছিল অনাবৃত। আমরা তাঁকে আজ দেবতা করে তুলে ধূপধুনা গুগ্‌গুলের ধোঁয়ায় অন্ধকার করে দিয়েছি—মূর্ত্তিটাই বড় ভাল দেখা যায় না। কল্পনা করতে কৌতুক লাগে যে, তাঁর তথাকথিত ভক্তমণ্ডলীর বাহ্যিক পূজার ক্রিয়াকলাপ দেখে তাঁর আত্মা শিউরে ওঠে কিনা, কারণ পূজা পাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তাঁর ছিল না, এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীলেখককে তিনি উপদেশ দিচ্ছেন, —"সর্ব্বপ্রকার অলৌকিকতা সযত্নে বর্জ্জন করিবে।"

মানুষের আত্মসাক্ষাৎকারের অপূর্ব্ব উন্মাদনার জন্যই তিনি প্রাণপাত করেছেন, তাঁর সন্ন্যাস-জীবন সংগ্রামের কাহিনীতে পরিপূর্ণ, আর তিনিও সন্ন্যাসী নন, সৈনিক। তাঁর কাছে জীবন ছিল সংগ্রামের নামান্তর।

হৃদয়-দীপ

শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন বসু

মাটীর প্রদীপ শুধু নিভে নিভে যায়
এ ধরার ক্ষণিকের ঝড় ও ঝঞ্ঝায় :
একা বসি দুঃখে তুমি যত কাঁদ, আহা—
আবার না আসাইলে জ্বলিবেনা তাহা।

বাহিরের দীপালোক তমসায় শেষ
থাকে নাক' এতটুকু রঙ্ রেখা রেশ,
জ্বেলে দেব' দীপ-শিখা হৃদয়ের মাঝে
চির অনির্বাণ তাহা, কভু নিভে না যে।

বিবেকানন্দ

শ্রীপ্রকৃতি দেবী

নীল সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গ পেরিয়ে
চিকাগোর ধর্মসভায় যেদিন তুমি হাজির হলে
হে দিগ্বিজয়ী বিবেকানন্দ!
বিশ্বের ঘাটে ঘাটে সেদিন নতুন অভ্যর্থনার
ভেরী উঠ্‌ল বেজে।
তার আগে ভারত ছিল অবজ্ঞার ধূলিতে লুণ্ঠিত,
গোঁড়ামির কালো রঙে ঢাকা ছিল তার সর্বাঙ্গ
সেই গাঢ় অন্ধকার ছিন্ন করে
সূর্যের মত উদিত হলে
হে সূর্যতপস্বী বিবেকানন্দ।
চঙ্, চঙ্, চঙ্—মন্দিরে সান্ধ্যারতির
প্রহর ঘণ্টা বেজেই চলেছিল:
পুরোহিত পড়েছিল মন্ত্র, আকাশ ছোঁয়া প্রাচীর তুলে
নিজের চারদিকে।
দেবতার দীর্ঘশ্বাস ব্যথিত করছিল বাতাসকে।
ঘুম ভেঙে তাকিয়ে দেখি গৈরিক বেশে তুমি
জোর গলায় হেঁকে চলেছ—
"তিমিরাবসান—আর নিদ্রা নয়
জাগো, জাগো, জাগো,
জাগো অমৃতের পুত্র,
জাগো ঋষির সন্তান
জাগো ধরিত্রীর প্রাণসর্বস্ব,—
মানুষ হও।"
জাগল কই?
একশতাব্দীর ব্যবধানে আজ তাকিয়ে আছি নির্নিমেষে।
তোমার আবির্ভাব হবে না আবার?
আবার শুনব না সে বজ্রকণ্ঠ?
দিগন্ত-কাঁপানো সে হুঙ্কার?
তবু আজ তোমার জন্মদিনে
আলো আর আঁধার যেখানে মিশে গেছে
সৃষ্টি আর প্রলয়, ধ্যান আর চৈতন্য
জগৎ আর জগদাত্মা
যেখানে একাকার নিশ্চিহ্ন,
সেই অমরাবতীর দ্বারপ্রান্তে
শুধু অঞ্জলিভরা চোখের জল রেখে গেলাম।
তুমি গ্রহণ করো,
হে মানবপ্রেমী, অমৃতসাধক বিবেকানন্দ।

সাধন ইঙ্গিত

বিদেহ

মানুষ সাধন ভজন করে, লক্ষ জপ করে, তবু আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে ওঠে না কেন? এর কারণ সে ভিতরে ডুবতে পারে না তাই ভিতরে কাজ হয় না। স্থূলকে অতিক্রম করে ভাবরাজ্যের আভাষ না পাওয়া পর্যন্ত প্রকৃত সাধনায় আরম্ভ হয় না, তখন সবই থাকে মুখস্থ। ইষ্টের প্রতি গভীর ভালবাসা থাকলে সাধক ভিতরে ডুবতে পারে তখন বাহিরের সাহায্যের প্রয়োজন বেশী থাকে না, সাধক অনুভব করে ভিতর থেকে আর একজন তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সে নিজে কিছুই করছে না। সত্যিই নিজে মানুষ কিছুই করতে পারে না। নিজেকে মুছে ফেলা, আমিত্ব ছেড়ে দেওয়া এই হল স্থূলকে অতিক্রম করবার উপায়। নিজেকে ছেড়ে দিতে পারলে তবেই অন্তর দেবতা তাঁর কাজ ভিতরে করেন আর কৃপার দোয়ারে সাধককে ভাসিয়ে নিয়ে যান।

সাধনার দুটো দিক আছে, একটা নিয়মের দিক আর একটা ভাবের দিক। নিয়ম হল কি করতে হবে কি ছাড়তে হবে, এই সব হিসেব করে চলা। আর ভাবের দিক হল অনুরাগের প্রেরণায় তাঁর দিকে লক্ষ্য রেখে চলা; তাতে জীবন-ধারা যেদিক দিয়েই যাক না কেন শেষে ভগবানেই পৌঁছায়। শুধু নিয়ম দিয়ে কখনো এগোতে পারা যায় না, নিয়ম পালনই সার হয়।

যে মনে করে আমার এখনই হোক, তার কিছু হয় না। এ সব তাড়াহুড়োর জিনিষ নয়। অসীম ধৈর্য দরকার। চাকা একদিকে ঘুরছিল তার গতি ধীরে ধীরে কমিয়ে অন্যদিকে ঘোরাতে হবে। সে ত একদিনের কাজ নয়। হতাশ হবার কিছু নেই, তবে সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। ফুল কখনো জোর করে ফোটানো যায় না, জোর করে ফোটালে গন্ধ থাকে না, নিজের স্বাভাবিক নিয়মে ফোটবার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। তবে, কাজের ফল আছেই, জপধ্যান করলে মনের ভিতর যে একটি নীরবতার ভাব জাগে তাতে অনেকখানি শান্তিতে জীবন কেটে যায়। বাইরের অভাব ছাড়াও ভিতরে একটা অভাব আছে ধ্যানধারণায় সে অভাব-বোধ চলে যায়। ভগবানের কৃপা এলে ধরে রাখবার শক্তি হয়। এই সব হল সাধনার ফল।

জগতে সব জিনিষের ভিতর যে তাঁরই প্রকাশ এটা বোঝবার জন্যই যত সাধনা। প্রথম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব বিষয় থেকে সরে গিয়ে ত্যাগ তপস্যার দ্বারা মন শুদ্ধ করতে হয়। সেই শুদ্ধ মনে অনুভব হয় সব কিছুতে তাঁরই প্রকাশ। তখন সব কাজই হয় পূজাস্বরূপ।

সাধনার দ্বারা ইচ্ছাশক্তিকে বাড়াতে হয়। নিজের ইচ্ছাশক্তিকে একমুখী করতে পারলেই তাকে ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত করতে পারা যায়।

যতদিন মন তৈরী না হয় ততদিন সাধনভজনে খুব কাজ হয় না। যে মন বাহিরের দশটা বিষয় নিয়ে থাকে, চোখ বুজে বসলেও তখন ভিতরে সেই মনেরই ক্রিয়া চলে। স্বভাবের পরিবর্তন না হলে প্রকৃত ভজন হয় না, সেজন্য বিচার সর্বদা রাখতে হয়, ভজন, বিচার দুটোই সমানভাবে রাখতে হয়। আর একটা বাধার ভাব মনে সর্বদা জাগিয়ে রাখতে হয়। ধ্যান করবার সময় মনে একটা বাধা বা কঠোরতার ভাব জাগালে খুব সহজে মন স্থির হয়।

সাধনকালে মনের সহিত শরীরকেও অনুকূল করে নিতে হয়। দেহের প্রত্যেক অঙ্গের আলাদা

সংস্কার, তাদের বশে এনে একমুখী করতে হয়, আমরা যে অনেকক্ষণ একাসনে স্থির হয়ে বসতে পারি না তার কারণ আমাদের দেহ শুদ্ধ নয়। জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবার জন্য শরীরকে জয় করতে হয়। জগতের সঙ্গে শরীর নিয়েই সম্বন্ধ। বহু সংস্কারে আবদ্ধ এই শরীর সকল মলিনতার আকর। তপস্যা দ্বারা এই দেহকে ক্ষীণ করলে নূতন দেহের সৃষ্টি হয় আর সেই দেহই হয় ভগবানের আবাস-মন্দির। শরীর যেমন বাধা, আবার তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত আত্মীয়স্বজনও তেমনি বাধা। নিজের দেহেরই যেন পৃথক এক একটি রূপ আত্মীয়-স্বজন। তাদের ভালবাসা মানে নিজেকেই ভালবাসা। যখন নিজের দেহ এবং সংসারের আত্মীয়কে শত্রু মনে হবে তখনই হবে ব্যাকুলতা ও ইষ্টের প্রতি ভালবাসা।

মৃত্যুকে সর্বদা স্মরণ রাখা সাধনার একটি অঙ্গ। সময় চলে যাচ্ছে এটা অনুভব হয় তখনই, যখন মানুষ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়। এ জীবনের জন্য আধ্যাত্মিক-তার প্রয়োজন কিছু নেই কিন্তু মৃত্যু ত আছেই। সেই শেষ সময়ের জন্য প্রস্তুত হওয়াই সাধনা।

যদি একটুও আন্তরিকভাবে কেউ তাঁকে চায় তবে তার উপায় বলে দেবার লোকের অভাব হয় না। গুরু তার কাছে আপনি আসেন। যখন পথে চলবার প্রেরণা কেউ দেয়, তখন বুঝতে হবে গুরুই প্রেরণা দিচ্ছেন। চাইলে কিছুই বাধা হয় না কিন্তু এই পথে চলতে কে চায়? ভগবানকে চাই আর কিছু চাই না—বোলে মানুষ জীবন আরম্ভ করে, পরে কিছুদিন বাদে দেখা যায় সে ভগবান ছাড়া আর সব কিছুই চায়।

বহু সঙ্গে মন বিক্ষিপ্ত হয় তার ফলে তামসিক ভাব ও অবসাদ আসে। সাংসারিক চিন্তা বা সেই প্রসঙ্গ মনের সব ভাল ভাব নষ্ট করে দেয়; এ জন্য সাধককে এ সব থেকে একেবারে দূরে থাকতে হয়। তবে লক্ষ্য ঠিক থাকলে কোন কিছুই মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। একটু মনে জোর আনলেই সব উড়ে চলে যায়।

ভবিষ্যৎ না ভেবে বর্তমান নিয়ে চলাই হল সাধনার একটি ইঙ্গিত। ভগবানে বিশ্বাস থাকলে সর্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে হয়। দুইভাবে চলা যায়; এক জ্ঞানের দৃষ্টিতে—সব কিছু থেকে নিজেকে আলগা রেখে আত্মার দিক থেকে দ্রষ্টার মত সব দেখে যাওয়া। আর না হয় ভক্তির দৃষ্টিতে সব তাঁকে সমর্পণ করে তাঁর ইচ্ছার অনুগত হয়ে চলা।

সাধকের আর একটি লক্ষণ হল অপরকে মর্যাদা দান। যে অন্যের গুণ দেখতে পায় না তার কখনও উন্নতি হতে পারে না। অন্যকে মর্যাদা দিলে, তার গুণ দেখলে সেই গুণ নিজের মধ্যে জেগে যায়, আবার দোষ দেখলে দোষ আসে; তাই পরনিন্দা, পরচর্চা কখন করতে নেই।

যদি একদিনও আন্তরিকভাবে তুমি ভগবানকে স্মরণ করে থাক তবে সেদিনই তিনি তোমার ভার গ্রহণ করেছেন। তাঁর দিকে চলা তোমার সুরু হয়ে গেছে। একদিন তুমি গন্তব্যে পৌঁছাবেই। যদি একটি মুহূর্তও তাঁর সাথে সত্যিকারের যুক্ত হয়ে থাক সেই মুহূর্তটি তোমার জীবনের গতি ঠিক করে দিয়েছে। সকলেই সেই পথের যাত্রী; সাধক চলে জ্ঞাতসারে, অপরে চলে অজ্ঞাতসারে। তাঁকে স্মরণ করতে পারাটাই কি কম লাভ! মানুষ বেশীর ভাগ দুঃখ পায় অপরের অনুকরণের ফলে। কিন্তু এক নিয়ম সকলের পক্ষে খাটে না। প্রকৃতি বিভিন্ন, সাধনাও বিভিন্ন। সবাই দশ ঘণ্টা ধ্যান করতে পারে না, এ সব অনুকরণের জিনিষ নয়। সত্যিই পথে চললে দুঃখ অবসাদ কখনো আসতে পারে না। তা এলে বুঝতে হবে অন্য কোন বাসনা ভিতরে জেগেছে।

সাধনা যখন সহজ হয়ে যায় তখন ঘুমন্ত অবস্থাতেও সাধনার বিরাম হয় না। স্বপ্নে অনেক অনুভূতি হয়, কারণ তখন দেহ থেকে মনটা আলগা

হয়ে যায়। প্রকৃত ধ্যান হলেও মন এই রকম আলগা হয়।

হৃদয় সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ, নিজের ইষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা, আর তাঁর নামই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র। হৃদয়ে ইষ্টকে বসিয়ে তাঁর নাম জপ দ্বারাই সব কিছু হতে পারে। ইষ্ট-মূর্তিকে স্পষ্ট দেখতে পেলে তাঁর চোখের দৃষ্টি দেখা যায়, তাঁর কথা শোনা যায়, শেষে মনে হয় জীবন্ত হয়ে সাথে সাথে তিনি চলাফেরা করেন। বেশী কিছুই করতে হয় না, সর্বদা শুধু একটা মনের যোগ রাখা দরকার। পথ খুব দীর্ঘ বটে কিন্তু পথের সাথে যুক্ত হলে আর দীর্ঘ থাকে না। তখন সব সহজ হয়ে যায়।

সারদা-স্মরণে

শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

[যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় "মা ডাক শুনতে শুনতে একদিন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে"
—সেই 'মা', শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ-জননীর পবিত্র জন্মতিথি স্মরণে।]

.....উনবিংশ শতকের মধ্যাহ্ন প্রভায়—
যবে ছিল তীব্র অভিশাপ—জীবনের পাতায় পাতায়,
যেথা শুধু মর্মরিত হত কাতর বিলাপে—সমাজের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা,
হে জননী! ধর্মের দোহাই দিয়ে মন্দিরে মন্দিরে
শোষণের নিদারুণ পরিহাসে শিহরি' উঠিত তব পাষাণ প্রতিমা;
—হৃদয়ের সরসতা মাথা খুঁড়ে মরে গেছে, প্রতিধ্বনি তুলেছে প্রার্থনা;
মানদণ্ডে ছিল ভেদনীতি,—রাজদণ্ড, ব্যর্থতায়, হতাশার দীর্ঘশ্বাসে
—দীনের জীবনে—হত শুধু রক্ত ঝরা অশ্রুর তর্পণ;
কে জানিত ও মা!
শান্তিময়ী! নিজে এসে দিয়ে যাবে সকল সান্ত্বনা,
—সব ব্যথা করিবে হরণ,
দীনের কুটীর হতে সুরম্য প্রাসাদে
—দিবে তুমি অমৃতের হৃদ্যতা প্রাণ,
নিজ হাতে খুলে দিবে স্নেহের ভাণ্ডারে—সর্বসাধারণে, চণ্ডাল-ব্রাহ্মণে,
সর্বব্যাপি ভালবাসা মধু মমতায়
এক করি দিয়ে যাবে সকল সন্তানে।

তাই কি মা আজি
স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের অভিব্যক্তি বাহি তোমার স্মরণে,
প্রস্তানত শিরে, আপনার ভক্তি অর্ঘ্য মাতৃতীর্থে সাজাইয়া আনে,
শত শত ভক্ত, গৃহী, ত্যাগী ও সন্ন্যাসী—
কেহ মঠে কেহবা মন্দিরে—কেহ গৃহকোণে
কামনার শতদলে নিষ্কাম করিয়া—লিখে নিয়ে শুধু মাতৃনাম
সঁপে দেয় তোমার চরণে।
আজি এই শুভক্ষণে—স্মরণ, মনন, আলাপনে
মাতৃহারা সন্তানের হৃদয় বিদারী মহা হাহাকারে
নাদ-বিন্দু-কলাতীত মহানাম মহামন্ত্র
সকল প্রাণের যন্ত্র হতে
উঠিতেছে গগন গম্ভীরে ;
মিশে মিশে চলে—সৃষ্টি হতে লয়ে,
লয় হতে সর্ব চরাচরে।

অনাদিকালের মাতা! যুগারাধ্যা! হে শুভদা! সন্তান জননী!
বন্দনার সব ছন্দ আজি তোমা খুঁজে খুঁজে ফিরে
চাহে শুধু একটু অভয়, একটু করুণা,
—চরণের ধূলিকণা যাকে একটি আশার নীড়ে
একটু সান্ত্বনা।
সর্বহারা সন্তানের সর্বংসহা কল্যাণী জননী!
জগতের আনন্দ সঙ্গীতে, আপনারে মিলাইয়া দিতে ;
—দাও শুধু শুভাশীষ,
বন্দনার সুরে মাগো দাও এবে তৃপ্তি একখানি,
হে বরদে! দাও আজ অভয়ের বাণী
হে মাতা, হে সত্য সনাতনী।

"কচ্ছপ জলে চ'রে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জান?—আড়ায় পড়ে আছে। যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারের সব কর্ম ক'র্‌বে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখ্‌বে।"
—শ্রীরামকৃষ্ণ

"যা আসে-যায় তা থাকে না…"

শ্রীপথিক

শিরোনামার কথাগুলি হচ্ছে—"যা আসে-যায় তা থাকে না ; যা থাকে তা আসে-যায় না।" আপাত-দৃষ্টিতে কথাগুলি দ্বিরুক্তিদোষদুষ্ট ব'লে মনে হ'লেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গূঢ় রহস্যের একটি দ্বারোদ্ঘাটক সূত্র বলা যায়। এর অন্তর্নিহিত গভীর ভাব যে সত্যকে প্রকাশ করছে তা বিশ্বপ্রকৃতির সকল স্তরেই ধরা পড়ে।

পল্লব সুশোভিত যে-কুসুমটি মনোরম প্রভাতে ফুটে উঠে নয়ন-মন বিমোহিত করে, সন্ধ্যার ম্লান সান্নিধ্যে এসে সে অবলুপ্তির পথে যাত্রা সুরু করে ; নদ-নদী-স্রোতস্বিনীর খরধারা, বজ্র ঝাপদের আস্ফালন যে মৌনগম্ভীর অচল গিরির স্থির অবস্থানকে বিচলিত করতে পারে না, কালের কঠোর হস্ত তারও বিলুপ্তি সাধন করে। বৈজ্ঞানিকরা আশঙ্কা করছেন যে, পৃথিবী সহ সৌরজগৎ সুদূর অতীতকাল হ'তে নীহারিকাপুঞ্জে আপন অস্তিত্ব বজায় রেখে এসেছে বটে, কিন্তু তা চিরকাল থাকবে না ; কয়েক কোটী বৎসর পরে তার অবলুপ্তি ঘটবে এবং তখন যথেষ্ট তাপের অভাবে পৃথিবী থেকে প্রাণীসমূহের বিলোপ হবে।

অন্তর-জগতেও আসা-যাওয়ার এই অভিনয় চলছে। শৈশবের অভিরুচি যৌবনে হাস্যকর মনে হয়। যৌবনের আবেগ-উচ্ছ্বাস পরপারের যাত্রার কাছে অকারণ বৈ ত নয়। যে ধন জন-যৌবন-কামনার উগ্র নেশায় নিঃশেষিত হয়ে শুধু অন্তরের প্রবল প্রদাহই উপার্জিত হয় তাও তো আসা-যাওয়ার বস্তু ; কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

ইতিহাসের পাতায় ও স্মৃতিসৌধে অতীতের দিকে অগ্রসরমান ঘটনাপুঞ্জকে ধ'রে রাখবার যে চেষ্টা হয় কালক্রমে তাও নিশ্চিহ্ন হয়ে মহাকালের অমোঘ বিধানকে বরণ করে। কথায় বলে, 'সে রামও নেই আর সে অযোধ্যাও নেই'। যে রামচন্দ্রের সুশাসনে সুখ-শান্তিতে দেশ ভরপুর ছিল, অযোধ্যার পথঘাট যার যশোগাথায় দিবারাত্র মুখরিত থাকতো সেই রামচন্দ্রের সোনার অযোধ্যার আজ কি চিহ্ন বর্তমান। রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপের যে শেষ চিহ্নটুকু আছে, তা থেকে তাঁর মহিমার কিছুমাত্র উপলব্ধি সম্ভব নয়। ইতিহাসের পাতায় রামরাজত্ব এখন উপকথায় পরিণত হয়েছে এবং ভাবীকালে এ সকলও মুছে দিয়ে আসা-যাওয়ার পর্বই সম্পূর্ণ করবে।

এই যদি সমস্ত কিছুর পরিণাম হয়, শুধু আসা-যাওয়াই কি তাহলে সত্য ? বৌদ্ধদের ক্ষণিকবাদই কি তাহলে একমাত্র কথা ? না ; দৃশ্যের পর দৃশ্য যা চলে যায় তার অন্তরালে থাকে এক অবলম্বন যা চিরস্থির ও অচঞ্চল, যা সকল কালেই থাকে, যা আসেও না, যায়ও না। সুন্দর ফুলটি ফুটে সত্য করে গেল সত্য, কিন্তু ফুলের মধ্যে যে আপনাকে ধরা দিয়ে গেল তা আগেও ছিল, তখনও থাকল। ফুল তার সৌরভ আর সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে সত্য শিব সুন্দরকে ইঙ্গিতে প্রকাশ ক'রে গেল। এই যে রূপে-অরূপে মেশানো এক সৌন্দর্যলোক, তার আবারের আসা-যাওয়া নেই, তার পরিচয়ের কোন ভাষা নেই। তাই বিশ্বকবি বলেছেন :

"কে সে ? জানিনা কে। চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে
ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে আপনারে ধরিয়া সাবধানে
অন্তরপ্রদীপখানি।"

ভাষার সীমার মধ্যে এই চিরবিদ্যমান সচ্চিদা-

নন্দের স্বরূপকে ধরা গেল না, তার ইঙ্গিত রইল স্নায়ুশৈল আর জীবকুলে। পৃথিবী হয়ত একদিন বিলীন হবে, আর জীবকুল থাকবে না, কিন্তু যে চৈতন্য তাদের প্রকাশ করেছিল তার বিলয় নেই। ইতিহাস চিরকাল ঘটনাপ্রবাহকে ধ'রে রাখতে পারবে না, স্মৃতিসৌধের ইটপাথর একদিন ধ'সে পড়বে কালের প্রবাহে, কিন্তু তখনো থাকবে সেই চৈতন্যস্বরূপ যা আসে যায় না, চিরন্তন হ'য়ে বিরাজ করে। যদি এই সচ্চিদানন্দস্বরূপকে জীবনে রূপায়িত করা যায় তবেই জীবন সার্থক হয়, তখন আসা-যাওয়ার বিধানে নিশ্চিহ্ন হলেও তা চৈতন্যস্বরূপ হয়ে চির অবস্থান করবে।

বাংলা শিশুসাহিত্যে ছড়া

শ্রীসৌরেন্দ্র বসু

রেখা রঙ ধ্বনি নিয়ে যে রসসৃষ্টি সেই রসায়ত বিতরণই হলো সাহিত্যের গোড়ার কথা। অভিধা লক্ষণা ব্যঞ্জনা বা তাৎপর্য-শক্তি নিয়ে সাহিত্যের মূল্যাবধারণ পণ্ডিতের রাজ্যে তর্কচঞ্চুদের উপাদেয় উপাদান, কল্পনাপ্রবণ শিশুমনের নয়। তাই শিশু-রাজ্যের সাহিত্য হলো সহজ সরল ধ্বনিময় ছড়া। পল্লী-সঙ্গীতের মতই এগুলো অত আলাপ-গমকের ধার ধারে না, একেবারে শিশুমনের অন্তরমহলে প্রবেশ করে। শিশুদের ভাব বা কল্পনারাজ্যের সঙ্গে একীভূত হওয়ার মাঝেই শিশুসাহিত্যের সার্থকতা। ছড়ার এই বিশিষ্টতাই শিশুমন জয় করেছে, যেখানে শিশুরা তাদের মনের মতো রঙ পেয়ে আপন মন রঙিয়ে নিতে পারে।

শাস্ত্রে আছে 'নাদব্রহ্ম' অর্থাৎ শব্দই ব্রহ্ম। শব্দের মাঝে আছে ছন্দ যা স্বাভাবিকভাবেই সকলকে আকৃষ্ট করে। তিন চার মাস বয়স থেকেই নানান শব্দে শিশুরা আনন্দ পেতে থাকে। খুব চীৎকার করে কাঁদছে, শব্দ হলো ঝুমঝুমির, একবার শোনা—আর একেবারে চুপ। নয়তো ঠাকুমা দিদিমার ছড়ার সুরতরঙ্গে দোদুল দোলায় দুলতে দুলতে একেবারে নিদ্রাদেবীর অঙ্কগ্রহণ করে শিশুরা। 'খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে', আর 'ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসী, ঘুম দিয়ে যাও' থেকেই শিশুর কাণে ঝুমঝুমি-ঝঞ্ঝনীর মতো সুর বাজতে থাকে। তখন 'আয়রে আয় ছেলের দল মাছ ধরতে যাই, মাছের কাঁটা পায়ে ফুটলো দোলায় চেপে যাই'-র অর্থোপলব্ধির ক্ষমতা থাকে না, তবুও তাদের মনের সাথে মিল খায়। Susan Isaac-এর 'Social Development In Young Children'এ আছে "It may make a great difference to a child's nervous health whether he is surrounded by soft encouraging voices and quiet steps or by harsh and shrill tones, frequent scoldings and banging of doors' —"কোমল, সস্নেহ বাক্য ও ধীর গতিভঙ্গীর অনাবিল শান্তি এবং রূঢ় ও কঠোর কণ্ঠস্বরে অনবরত তিরস্কার ও বিরক্তিব্যঞ্জক ব্যবহার (যেমন সশব্দে পদচারণা অথবা সজোরে দ্বার রুদ্ধ করার শব্দ) এই দুইটি বিভিন্ন পরিবেশের দ্বারা শিশু-জীবনের মানসিক স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়।"

ছড়ার ঐ কোমল মনভোলানো ছন্দ ও সুর শিশুদের অন্তরে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে যখন ছড়ার সহিতত্ব ভাবটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভাষা

বোঝবার আগেই ছন্দের প্রভাব শিশুমনকে আকৃষ্ট করে যা ছড়ার মাঝে অন্তর্নিহিত। রবীন্দ্রনাথ এই ছড়ার ছন্দকে 'বাংলা প্রকৃতি ছন্দ' বা 'প্রাকৃত বাংলা ছন্দ' নামে অভিহিত করেছেন। চল্‌তি ভাষার উচ্চারণে যে প্রস্বর বা শ্বরাঘাত তাতেই এই ছন্দ নেচে ওঠে।

তাই সাঁঝের ঘুম ভাঙাতে শিশুর কাজল মাখা চোখে কপালে ও কপোলে আঁচল বুলিয়ে দীর্ঘ আঙুল দিয়ে—

'আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা'—
অথবা—"মাছ কাইলে মুড়ো দেবো
ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো" ছড়ার সুরে

বাংলা দেশের মায়েরা শিশু-সাহিত্য গড়ে তোলেন। রামধনুর মতো শিশুমন। চোখে তার রঙের নেশা, মনে তার রঙের স্বপ্ন। তাই শরৎ মেঘের মতো বন্ধনহীন কল্পরাজ্যে তাদের বিচরণ। আর অনাস্বাদিতপূর্ব অদৃষ্টপূর্ব এক সৌন্দর্যের তরী এই ছড়াগুলিতে তা'রা হাল ধ'রে আনন্দ পায়।

"নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে
ওপারেতে মেঘের দল নাইতে নেমেছে।"
"বকমামা বকমামা' কুল দিয়ে যাও
নারকোল গাছে কড়ি আছে গুণে নিয়ে যাও।"

এর স্বপ্নে তারা বিপুল আনন্দে বিভোর হয়। এইসব ছড়াগুলির মাধ্যমেই তারা পরিচিত হয় ফুল-পাখী-ফলের সঙ্গে, চাঁদ-তারা-মেঘের সাথে।

'হাঁটি হাঁটি পা পা' শেষ ক'রে 'আগডুম্ বাগডুম্ ঘোড়ার ডুম্ সাজের' পরই 'বুটশার্ট, হাফপ্যান্ট বল নিয়ে বিকেলে' খেলার মাঠে এসে পড়ে। তখন অজানাকে জানার নানান পশুপাখীর পরিচয়ে কৌতূহল-দীপ্ত হয় শিশুরা।

'হট্টিমা টিম টিম
তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের ঘাড়া দুটো শিং
তারা টিমা টিম্ টিম্।
[illegible] বাহুর চাল্‌তা বাহুড়
কলা বাহুড়ের যে
টোপর মাথায় দে'
দেখতে যাবে কে ?
চামচিকেতে বাজনা বাজায়
খ্যাংরা কাঠি দে।'

অরে ও কত ছড়া আছে যাতে শিশুমনের পোরাক জুটে যায়। কখনো খোকা রথে চড়ে, ব্যাঙ্ হয় সাদাখি ; খোকা শ্বশুরবাড়ী যাবে, হলো বেড়াল কোমর বাঁধে ; নয়তো ক্ষীর নদীর কূলে মাছ ধরতে যাবার স্বপ্ন দেখে তারা। যখন কুকুর টুমটুমি, বানর ঢোল আর ইঁদুরভায়া টুনটুনিয়ে খোল বাজায় তখন যুক্তিতর্কের বালাই থাকে না 'চালে নাচে ফিঙের মতো নেচে' মাগুরের মতো শিঙে বাজাতেই মশগুল্ হয়ে ওঠে শিশুরা।

'আমপাতা জোড়া জোড়া, মারবো চাবুক চড়বো ঘোড়া।'

এই বলার সাহসও সঞ্চয় করে ঐ ছড়ার মাধ্যমে।

এই সব ছড়ার মাঝেই কখনো ঘুম পাড়ানীয়া সুর, প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য, খেলা ধুলোর কথা, পশুপাখীর কথা, নয়তো হাস্যরসামৃত বিতরণ করা হয় যুক্তিবাদী বৃদ্ধ তরুণের অজ্ঞাতে। অলীক ঘটনাবস্তু নয়, নিত্যদিনের পরিচিত মা-মাসীপিসী, লেজঝোলা পাখী, রোদ জল, চাঁদ তারার ছবিগুলোই কল্পনাময় শিশু-মনে অসংলগ্ন অসম্ভব ঘটনার সৃষ্টি করে আর সাথে সাথে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঐসব ছবি ছন্দ সুর।

"সুক্তনিতে কাল দিয়েছে অম্বলেতে ঘি
ছি-ছি-ছি-ছি রাণী রাঁধতে শেখেনি।"

অথবা—'হৈ হৈ রৈ রৈ,
বিয়ে বাড়ী হৈ চৈ,
কেহ খায় দৈ খৈ, কেহ বলে দে দৈ,
হাতে দই পাতে দই,
তবু বলে কৈ কৈ।'

এই ধরণের ছড়ায় হাস্তরস উপভোগ করার মতো। কাম্বুড়ীর দিদিশাশুড়ীর পাঁচবোন কালনায় থেকে যখন হাঁড়িগুলো আলনায় রাখে, নুন দিয়ে ছাঁচি পান সাজে, ডালনায় চুণ দেয় আর বেতের ঝুড়ি চড়ে বুড়ী বাড়ন কাঁটা হাতে নিয়ে আকাশ-ছাতে ঝুল ঝাড়তে যায় তখন ছ'-সাত বছরের শিশুরা কেবল নয় সকলেই বেশ মজা পায়।

প্রকৃতির রাজ্যে বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব হয় আর মানবের মনোরাজ্যে তার প্রভাব পড়ে। তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেক কথা ছড়ার আকারে বেরিয়ে আসে। আকাশে মেঘ জমে উঠলেই 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেবো মেপে' আর কম্বমিয়ে বাদল ঝরলেই 'যা বৃষ্টি থেমে যা, লেবুপাতা করমচা,' সকল শিশুর মুখে এসে পড়ে। কবে কোথায় কখন এসব ছড়া লেখা হয়েছে তা বলা যায় না। জীবনের সঙ্গে জীবনের মিল হলেই অন্তরে খুশির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তেমনি প্রকৃতি আর মনের মিলনে যে খুশী তার স্বতঃস্ফূর্ত স্ফুরণই হলো এই ছড়াগুলো। অনেক দূরে নদীর জলে সবুজ বরণ ঘাসপাতা, লাল শিমুল ফুল আর 'সুয্যি মামা' দেখে আনন্দে কড়াইশুঁটি আর কলির ক্ষেতে লুটোপুটি খাবার ইচ্ছা জাগে। নীল টিয়া কাছে না এলেও, বোয়াল-দেখা-ডোঙা ফিরে তাকালেও নিত্যকালের খোকন নেচে যাবে ছড়ার তালে তালে। যেখানে ফুলের বনে মৌমাছিরা মৌ খুঁজে বেড়ায়, পানকৌড়ি দেখে বাঘা কুকুর ভৌ ভৌ করে ডাক ছাড়ে আর মেঠো পথে ডুলি চলে, চাঁদ-মুখে রোদ্দুর লাগে সেখানেই শিশুর মন পড়ে থাকে। তাই 'আয় ঘুম আয়' বলতেই খোকা পড়ে ঘুমিয়ে কিন্তু মায়ের মুখের ছড়ার রেশ জেগে থাকে শিশুদের মুখে ও চোখে।

রবীন্দ্রনাথই বলেছিলেন—"ছড়াগুলিই শিশু-সাহিত্য—তাহারা মানব মনে আপনি জন্মিয়াছে। তাহাদের ভারহীনতা, অর্থবন্ধনশূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্যবশতঃই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে।"

(সঙ্কলন—ছেলেভুলানো ছড়া)

এখন "আমার কথাটি ফুরোলো
নটে গাছটি মুড়োলো।"

গুরু-তত্ত্ব

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

'কুলমূলাবতার বজ্রসূত্র' নামক তন্ত্রগ্রন্থের টীকাগত কুলাগমে এই ছয় স্তরের গুরু উল্লিখিত : প্রেরক, সূচক, বাচক, দর্শক, শিক্ষক ও বোধক। প্রেরক প্রথম স্তরের গুরু, যিনি শিষ্যের 'হাতে খড়ি' দেন। সূচক দ্বিতীয় স্তরের গুরু, যিনি ধর্মপথ নির্দেশ-পূর্বক কিঞ্চিৎ অগ্রসর করাইয়া দেন। তৃতীয় স্তরের গুরু বাচক, যিনি নিয়মিত শিক্ষাদান ও দোষ-ত্রুটি সংশোধন করেন। চতুর্থ স্তরের গুরু দর্শক, যিনি দূরবর্তী গন্তব্যস্থল প্রদর্শক। শিক্ষক গুরু পঞ্চম স্তরের, যিনি শিষ্যকে সর্বতোভাবে চালিত করেন। এই পাঁচ শ্রেণীর গুরু ষষ্ঠ স্তরে লইবার জন্য শিষ্যকে প্রস্তুত করেন। বোধক গুরু ষষ্ঠ স্তরের এবং কারণ গুরু নামেও অভিহিত। ইনি মুমুক্ষু শিষ্যকে পূর্ণরূপে উদ্বুদ্ধ ও প্রস্তুত করেন সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য। হায়! কলিযুগে মুমুক্ষু শিষ্য বা মুক্ত গুরু কোথায়? দীক্ষাগুরু এক হইলেও শিক্ষাগুরু বহু হইতে

পারেন। যেমন দৃশ্য গুরু বিদ্যমান, তেমনি অদৃশ্য গুরুও বর্তমান। অদৃশ্য গুরু কখনের জন্য বিদ্যুৎবেগে আসিয়া শিষ্যকে আবশ্যকীয় শিক্ষাদানান্তে অন্তর্হিত হন। হয়ত, তাঁহার সহিত শিষ্যের আর সাক্ষাৎ হইল না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, গুরু তিন প্রকার—উত্তম, মধ্যম ও অধম। অধম গুরু দীক্ষাদান করিয়াই ক্ষান্ত হন। মধ্যম গুরু শিষ্যকে শাস্ত্রবাক্য ব্যাখ্যা করিয়া যুক্তিতর্ক সহায়ে নানাভাবে তত্ত্ব বোঝাইতে চেষ্টা করেন। উত্তম গুরু বল-প্রয়োগপূর্বক অর্থাৎ শাসন ও তিরস্কারাদির মাধ্যমে শিষ্যকে সাধন-পথে প্রবর্তিত করেন। সদ্বিষয় শিক্ষাদাতাই সদ্‌গুরু। যিনি স্বীয় সিদ্ধি ও শক্তি প্রয়োগ পূর্বক শিষ্যকে লক্ষ্যস্থলে টানিয়া লইয়া যান তিনি সমর্থ সদ্‌গুরু। ছত্রপতি শিবাজীর গুরু রামদাসকে সমর্থ সদ্‌গুরু বলা হয়। রামদাস প্রণীত 'দাসবোধ' গ্রন্থ তত্ত্বপূর্ণ ও মারাঠী ভাষায় রচিত। উহার হিন্দী অনুবাদ পাঠে আমি ধন্য হইয়াছি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহশিষ্য দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার যে সুললিত গুর্বাষ্টক লিখিয়াছেন তাহা গৃহে গৃহে, মঠে মঠে সর্বশ্রেণীর নরনারী কর্তৃক অধুনা পঠিত হয়। উহার শেষ অংশটী এইরূপ :

'জয় সদ্‌গুরু ঈশ্বর-প্রাপক হে
ভবরোগ বিকার বিনাশক হে।
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে॥'

কুলগুরুপ্রথা বর্জনীয় নহে। তবে কুলগুরুতে বিশ্বাস না হইলে অন্য গুরু গ্রহণীয়। বৈষ্ণব সমাজে কুলগুরু প্রথা সর্বাপেক্ষা প্রচলিত। গুরু যে সাধন শিক্ষা দেন তাহাই দীক্ষা। দীক্ষা=দী+ক্ষা। দী=জ্ঞানদান এবং ক্ষা=পাপক্ষয়। 'দীয়তে বিমলং জ্ঞানং ক্ষীয়তে কর্মবাসনা তেন দীক্ষেতি প্রোক্তা।' দীক্ষা দ্বারা বিমল জ্ঞানলাভ ও কর্মস্পৃহা ক্ষয় হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, যেমন স্বাতি নক্ষত্রের জলবিন্দু পাইলে ভাসমান শুক্তি সমুদ্রের অতল গহ্বরে যাইয়া মুক্তা তৈয়ার করে তদ্রূপ সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষালাভান্তে যোগ্য শিষ্য সাধন-সাগরে ডুব দেয়। রামপ্রসাদ গাইলেন :

'মন রে কৃষিকাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা॥
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে ভক্তি-বারি সেচে দেনা।
ওরে একা যদি না পারিস্ মন
রামপ্রসাদকে সঙ্গে লেনা॥'

সিদ্ধ গুরুর নিকট দীক্ষালাভ হইলে মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী। এই সম্বন্ধে সারদা দেবী বলিতেন, "দীক্ষা নিয়ে সাধন ভজন না করলেও শেষ কালে ইষ্টদর্শন হয়। তবে সাধন ভজন করলে অনুভূতির অপার আনন্দ ভোগ হয়। যেমন—কোথাও যাবার জন্য কেউ টিকিট করে ট্রেণে উঠে ঘুমিয়ে পড়লেও সে গন্তব্য স্থলে পৌঁছায়, আর যদি সে ট্রেণে বসে জেগে থাকে পথে নানা স্থান দর্শনের আনন্দ পায়।" দীক্ষাকালে গুরু জপ্য মন্ত্র ও ধ্যেয় মূর্তি বলে দেন এবং শক্তি সঞ্চার করেন। মন্ত্রজপ ও ইষ্টধ্যান যতই করা যায় ততই গুরুশক্তি প্রকাশিত হয়। যদি শিষ্য ষোল আনা আত্মসমর্পণ করে দীক্ষার পরে গুরুশক্তি তন্মধ্যে সক্রিয় হয়। দীক্ষা বহুবিধ—চাক্ষুষী, মানসী, শাম্ভবী, স্পার্শী, মান্ত্রী ইত্যাদি। দৃষ্টিপাত, স্পর্শমাত্র বা শুদ্ধবাক্য উচ্চারণ দ্বারাও দীক্ষা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় শিষ্যবৃন্দের জিহ্বায় অঙ্গুলি দ্বারা বীজমন্ত্র লিখিয়া দিতেন। তিনি কাহারো বুকে বা পিঠে হাত বুলাইয়া প্রসুপ্তা ভুজগাকারা কুণ্ডলিনী মহাশক্তি জাগ্রতা করিতেন। বুদ্ধদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তিম শয্যায় কোন কোন প্রার্থীকে দৃষ্টিমাত্র দীক্ষাদান করেন। সিদ্ধ গুরু দীক্ষা দানার্থ কোন পূজা ও হোমাদি অনুষ্ঠান করেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যবৃন্দ কেহ কেহ বিনা অনুষ্ঠানে দীক্ষা দিতেন, আবার কেহ কেহ পূজাদি করিতেন। মহীর গুরুদেব কোন শিষ্যকে বলিয়াছিলেন,

"তোমাকে ঠাকুরের চরণে অর্পণ করেছি এবং তিনি তোমাকে গ্রহণ করেছেন জানি। অন্য কিছু জানি না।" দীক্ষা বিবাহবৎ একটী সুস্থায়ী সংস্কার। বিবাহের পরে পরিণীতা পতি-পত্নী যেমন পরস্পর সপ্রেম সংযোগ রক্ষা করে তদ্রূপ দীক্ষান্তে গুরু-শিষ্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সযত্নে রাখিবেন; নচেৎ দীক্ষা অর্থহীন অথবা অনিষ্টকর হয়। জপক্রম সম্বন্ধে পূর্বোক্ত সন্ত দাদু বলেন :

'পহিলি শ্রবণ দুতিয়ে রসন তৃতীয়ে হিয়দই গাহি।
চৌথি মন মগন ভয়া যোম যোম লব লাহি॥'

প্রথম অবস্থায় জপকালে এমনভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হইবে, যাহা কাণে শোনা যায়। বৈষ্ণবগণ করতাল বাজায় নাম করিবার সময় এইজন্য যে, মন্ত্র ব্যতীত অন্য শব্দ কর্ণগোচর না হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় ঠোঁট ও জিভ নড়িবে, কিন্তু শব্দ হইবে না। তৃতীয় অবস্থায় মুখ ও জিভ স্থির থাকিবে ও নিরন্তর উচ্চার্যমান অনাহত ব্রহ্মনাদের সহিত মন্ত্র হৃদয়ে জপ্ত হইবে। শিষ্য যেন গুরুমুখ হইতে এই মন্ত্র শুনিতেছেন এরূপ অন্তর্মুখ হইবে। মন্ত্রজপের সহিত ইষ্টমূর্ত্তি ধ্যান চলিবে। চতুর্থ অবস্থায় মন ইষ্টে মগ্ন হয় ও জপ বন্ধ হয়। শেষে জপ ধ্যানে পরিণত হয়। অজপা জপ অভ্যস্ত হইলে প্রতি রক্তকণা, প্রতি লোমকূপ মন্ত্রজপ চলে। সারা বিশ্বে এই মন্ত্র শ্রুত হয়। ষোল আনা সমর্পণ না করিলে গুরুকৃপা পাওয়া যায় না। গুরুশক্তি অবতরণের প্রথম লক্ষণ গুরুবাক্যে অটল বিশ্বাস। গুরু-গীতাতে আছে :

'শরীরং যস্য বিজ্ঞানং বাসকর্মগুণান্ধনঃ।
গুরবর্থং ধরেৎ যস্ত স শিষ্যঃ নেতরাঃ জনাঃ॥'

অনুবাদ—যিনি দেহ, ধন, দাক্ষ্য, গৃহ, কর্ম, সদ্‌গুণ ও জীবন গুরু-পথে ধারণ করেন তিনিই শিষ্য, অন্য কেহ নহে।

সর্বস্ব অর্পণ দ্বারাই শিষ্যত্ব পূর্ণাঙ্গ হয়। সুশিষ্য আরুণি ইহার উত্তম উপমা। পুরাকালে যার যখন গুরুকুলে বাস করিয়া বেদপাঠ ও গুরুসেবা করিতে হইত। শিষ্যত্ব সাধনের ইহাই উৎকৃষ্ট উপায়। আরুণি গুরুকুলে বাসকালে গুরুর শস্যক্ষেত্র দেখিতে আদিষ্ট হন। তিনি আর্দ্র ক্ষেত্রে যাইয়া দেখেন, ক্ষেত্র হইতে জল বাহিরে চলিয়া যাইতেছে একস্থানে আল ভাঙ্গিয়া। ইহাতে চারা গাছগুলি ভাল ফসল দিবে না। ভগ্ন স্থান বাঁধিবার আবশ্যকীয় উপকরণ না পাইয়া তথায় শুইয়া পড়িয়া স্বীয় দেহ দ্বারা তিনি জলস্রোত বন্ধ করিলেন এবং ইহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। গুরুবাক্য পালনে প্রাণপণ করিতে পারিলে মুক্তি লাভ অবধারিত। গুরুকৃপায় অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স উভয়ই লাভ হয়। শুক্রাচার্য ভৃগুমুনির কৃপায় বলিরাজ ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করায় দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতির নিকট যান। পুরাণে আছে তখন দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন :

'জানামি মঘবন্ শক্রোন্নতেঃ অস্য কারণম্।
শিষ্যায়োপনতং তেজো ভৃগুভিঃ ব্রহ্মবাদিভিঃ।'

অনুবাদ—হে মঘবন্ (ইন্দ্র), তোমার শত্রুর এই উন্নতির (সাফল্যের) কারণ আমি জানি। ব্রহ্মবাদী ভৃগুমুনি স্বীয় শিষ্য বালিকে নিজ শক্তি দান করিয়া ত্রিলোক বিজয়ে সমর্থ করিয়াছেন।

মনুসংহিতা, ভাগবত পুরাণ, গুরুগীতা, মহানির্বাণ তন্ত্র, দাসবোধ, জ্ঞানেশ্বরী প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে সদ্‌গুরুর লক্ষণ বর্ণিত আছে। উপনিষৎ বলেন, সদ্‌গুরু শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ হন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিরক্ষর শাস্ত্রজ্ঞানহীন হইয়াও জগদ্‌গুরু পদে বৃত হইয়াছেন। তিনি শাস্ত্র পাঠ না করিলেও শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্র পড়া অপেক্ষা শাস্ত্র শোনাই ভাল। আবার শোনা অপেক্ষা দেখা ভাল। উপলব্ধিবলে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ ও ত্রিকালজ্ঞ হন। জগন্মাতার চরণে সরল শিশুবৎ নির্ভরশীল হওয়ায় মা তাঁহাকে জ্ঞানের রাশ ঠেলিয়া দিতেন। অপরা বিদ্যা গ্রন্থ পাঠে অর্জিত হয়, আর পরা বিদ্যা সাধনবলে লাভ হয়।

শাস্ত্রে আছে, জ্ঞানহীনো গুরুঃ ত্যাজ্যং মিথ্যাবাদী বিরক্তকঃ। গুরুগীতা বলেন, পাষণ্ডী, পাপরত, নাস্তিক, ভেদবুদ্ধিযুক্ত, স্ত্রী-লম্পট, দুরাচার, কৃতঘ্ন, বকবৃত্তিবান্, কর্মভ্রষ্ট, ক্ষমাহীন, নিন্দাতর্কবাদী, কামী, ক্রোধী, নিষ্ঠুর, শঠ, জ্ঞানদুপ্ত, হিংস্র ও দুষ্ট ব্যক্তিকে গুরু করিবে না। তত্ত্বনিষ্ঠ, অধ্যাত্মজ্ঞানী, বিবেকী, সাধুভাবসম্পন্ন, নির্মলচিত্ত, শুচি, কামক্রোধজিৎ জিতেন্দ্রিয়, প্রশান্ত মৃদুভাষী ব্যক্তিকে গুরু করিবে। গুরুগীতাতে আছে, পরম গুরু দুই প্রকার—মৌনী ও বাগ্মী। মৌনী গুরু ভগবদনুভূতির অসীমানন্দে নির্বাক্। ভগবান বুদ্ধদেব বোধি নির্বাণলাভের পর সাতদিন আদৌ কথা বলিতে পারেন নাই। বাগ্মী-গুরু স্বানুভব সুশিষ্যে সঞ্চারিত করিবার জন্য দুই চারিটি কথা বলেন। গুরুকৃপা বর্ষিত হইলে বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। শাস্ত্রে আছে, গুরুং বিনা ন জানাতি মূঢ়ো তৎ পরমং পদম্। শ্রীসারদা দেবী বলিতেন, গুরুকেও ন্যায্য কথা বলা চলে। পুরীধামে এক সুন্দরী বিধবা গোয়ালিনী মহাপ্রভুর সেবার জন্য নিত্য দুধ আনিত। তাহার একমাত্র শিশুপুত্রকে চৈতন্যদেব স্নেহ করিতেন ও প্রসাদ দিতেন। ইহাতে পাছে কোন অভক্ত কোন অপ্রিয় মন্তব্য করে সেজন্য গোবিন্দদাস মহাপ্রভুকে নিষেধ করেন উহাদের সহিত কথা বলিতে। অবশ্য অনর্থক গুরুনিন্দা মহাপাপ। শাস্ত্রে আছে, শিবে রুষ্টে গুরুঃ রক্ষেৎ, গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন। অর্থাৎ—শিব রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করেন, কিন্তু গুরু ক্রুদ্ধ হইলে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। গুরুর সন্তোষ বিধানে সর্বদা শিষ্য যত্নশীল হইবে।

রুদ্রযামল, দাসবোধ ও গুরুগীতা প্রভৃতি গ্রন্থে সুশিষ্যের লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। অর্থলুব্ধ, পিশুন (কৃপণ), অস্থির, ভক্তিশ্রদ্ধাহীন, গুরুসেবাবিমুখ ও অসত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি শিষ্য হইবার যোগ্য নহে। রুদ্রযামল তন্ত্রে আছে :

'বিচার্য যত্নাৎ বিধিবৎ শিষ্যসংগ্রহমাচরেৎ।
অন্যথা শিষ্যদোষেণ নরকস্থো ভবেৎ গুরুঃ ॥'

অনুবাদ—সযত্নে বিধিপূর্বক বিচার করিয়া সদ্‌গুরু শিষ্যসংগ্রহ করিবেন, নচেৎ শিষ্যপাপে গুরু নরকগামী হইবেন।

নীতিশ্লোকে আছে, 'শিষ্যপাপম্ গুরুং ব্রজেৎ।' প্রবাদ আছে যে, শিষ্যের পাপভার গুরুকে গ্রহণ করিতে হয়। অধুনা এই কথা সর্বক্ষেত্রে সত্য হয় না। আজকাল গুরুকে গুরুরূপে কয়জন শিষ্য গ্রহণ করেন? আবার কয়জন গুরুই বা শিষ্যকে শিষ্যবোধে দৃষ্টিপাত করেন। তবে সাধুকে পাপী পাদস্পর্শ পূর্বক প্রণাম করিলে কিছু পাপ যেমন শিষ্য হইতে গুরুতে যায় তেমনি গুরু হইতে কিছু পুণ্য ও পাপীতে আসে। সেইজন্য সিদ্ধ পুরুষগণ সাধারণতঃ কাহাকেও পা ছুঁইয়া প্রণাম করিতে দেন না।

সমাচার তন্ত্রে ও রুদ্রযামল তন্ত্রে নিম্নলিখিত সাতাইশ শিষ্যদোষ বিবৃত। রুদ্রযামল তন্ত্র অনুযায়ী-কাবুক, কুটিল, লোকনিন্দিত সত্যবর্জিত, অবিনীত, অসমর্থ, প্রজ্ঞাহীন, বিপুপ্রিয়, সদাপাপক্রিয়াযুক্ত, বিদ্যা-পুত্র ও জড়াত্মকব্যক্তি শিষ্যত্বের অনধিকারী। সমাচার তন্ত্রে আছে—অঙ্গহীন, সংস্কারবর্জিত, আশ্রমাচারহীন, মলিনচিত্ত, বিশ্বাসহীন, নীচ, খেয়ালী, প্রমাদী, দীর্ঘ-সূত্রী, অসচ্চরিত্র, ব্যভিচারী, অসামাজিক, রুগ্নদেহ, নিন্দারত, দ্বৈতচেত এবং দেবদ্বিজে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি শিষ্য হইতে পারে না। নীতিশ্লোকে আছে :

'মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥'

অনুবাদ—বীজমন্ত্রে, পুণ্যতীর্থে, ব্রাহ্মণে, দেবতায়, দৈবজ্ঞে, ঔষধে ও গুরুতে যাহার যেমন বিশ্বাস তদ্রূপ ফললাভ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে (১০।৬-৭) নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয়ে সুশিষ্যের বর্ণনা প্রদত্ত :

'অমানামৎসরো দক্ষো নির্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।
অসম্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়রমোঘবাক্ ॥
আত্মাপত্যগৃহক্ষেত্র-স্বজনদ্রাবিণাদিষু।
উদাসীনঃ সমং পশ্যন্ সর্বেষ্বর্থমিবাত্মনঃ ॥'

শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর স্বামী বলেন, "এইগুলি গুরুসেবকের ধর্ম বা শিষ্যের লক্ষণ। শিষ্য হইবে অমানী, দক্ষ (অনলস), নির্মম (জায়াদিতে মমতাশূন্য), অসম্বর = অবাগ্র, অমোঘবাক্ = ব্যর্থালাপহীন ইত্যাদি।" উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের অনুবাদ—"অভিমান, আলস্য, মাৎসর্য্য ও মমতা ত্যাগ করিবে। গুরুতে দৃঢ়রূপে সোহার্দ্য বন্ধন করিয়া থাকিবে। অবজ্ঞা ব্যগ্র হইবে না। পরমার্থ তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিবে এবং অসূয়া ও অনর্থক আলাপ পরিহার করিবে। স্বীয় প্রয়োজনকেই সর্বত্র সমান দেখিয়া স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, স্বজন ও ধনাদিতে উদাসীন হইয়া কেবল গুরুর উপাসনা করিবে।

গুরুগীতা ও ভাগবতে একাধিক গুরুকরণ সমর্থিত। গুরুগীতার ৮৯ শ্লোকে আছে:

'মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্বন্তরং ব্রজেৎ॥'

অনুবাদ—যেমন মৌমাছি মধুলোভে এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে ছুটিয়া যায় তদ্রূপ যোগ্য শিষ্য জ্ঞানলোভে এক গুরু হইতে অন্য গুরুতে গমন করে।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে (৯।১৩) আছে:

'নহ্যেকস্মাৎ গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ॥'

অনুবাদ—দেবকেতু, ভৃগুপ্রমুখ অনেকে বহু গুরু আশ্রয় করিয়াছিলেন। সুতরাং জ্ঞানপ্রদ গুরু এক হইলে শিক্ষাগুরুর বহুত্ব স্বীকার্য। অতএব এক গুরু হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান সুস্থির ও সম্পূর্ণ হয় না। ব্রহ্ম একমেব অদ্বিতীয় হইলেও ঋষিগণ কর্তৃক বহুভাবে বর্ণিত হন।

রোগচিকিৎসার সময় যেমন চিকিৎসক পরিবর্তন করা যায় তেমনি ধর্মজীবনেও প্রয়োজনবশে যেকোন যা সদ্গুরু পরিবর্তন করা চলে। তবে যেকারণবশে গুরু-পরিবর্তন অনিষ্টকর। দাক্ষিণাত্যে গুরুলাভের জন্য দক্ষিণামূর্তির পূজা ও উপাসনা প্রচলিত। মহারাষ্ট্রে দত্তচরিত্র পুঁথিপাঠ এই উদ্দেশ্যে বিহিত। উক্ত পুঁথিতে দত্তের তিন অবতারের বর্ণনা আছে। গুরুগীতাতে সদ্গুরুর নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদত্ত:

'করুণা-খড়্গপাতেন ছিত্ত্বা পাশাষ্টকং শিশোঃ।
সম্যক্ আনন্দজনকঃ সদ্গুরুঃ সোঽভিধীয়তে॥'

অনুবাদ—যিনি কৃপা-খড়্গ আঘাত করিয়া শিষ্যের ঘৃণা, শঙ্কা, ভয়, লজ্জা, নিন্দা, কুল, শীল ও ধন—এই অষ্টপাশ ছেদনপূর্বক তাহাকে বিমলানন্দের অধিকারী করেন তিনিই সদ্গুরু নামে সংজ্ঞিত।

শাস্ত্রে আছে, গুরুপূজা, গুরু প্রণাম ও গুরুভক্তি সিদ্ধি লাভের সহজ উপায়। 'মোক্ষ সাধন সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।' ইহার অর্থ—মোক্ষদায়ক সামগ্রীসমূহের মধ্যে গুরুভক্তি গরীয়সী। গুরু জীবিত থাকিলে তাঁহার ছবি পূজা করিলে গুরুর আনুকূল্য হয়। গুরুকে পিতা বা মাতার তুল্য শ্রদ্ধা ও সেবা করিতে হয়। একনিষ্ঠ গুরুভক্তির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিতেছি। শিবাজী-গুরু রামদাসের শিষ্য গুরুভক্ত দিবদাস গুরুকে রোজ হামান দিস্তায় পান থেঁতো করিয়া দিতেন। ইহাতে গুরুভাইদের হিংসা হইল। গুরুভাইরা হামান দিস্তা কাড়িয়া লইল। দিবদাস স্বীয় মুখে পান চিবাইয়া গুরুকে দিতেন, আর রামদাস তাহাই পছন্দ করিতেন। ইহা শুনিয়া শিবাজী স্বয়ং সোনার হামানদিস্তায় স্বয়ং পান ছেঁচিয়া গুরুকে দিতেন। শিষ্যেরা গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ হামান দিস্তা ভাল—এটা, না দিবদাসের?" গুরু বলিলেন, দিবদাসের। শিষ্যগণ গুরুকে উহা দেখাইতে চাহিলেন। শিষ্যগণের সম্মুখে দিবদাস শাণিত তরবারি দ্বারা নিজ মাথা কাটিয়া বলিলেন, এই হামান দিস্তা গুরুকে দেখাও। দিবদাসের গুরুভক্তি স্মরণীয়।

গুরুকৃপায় মুহূর্তমধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। গুরুদক্ষিণা দানের বিধি অদ্যাপি প্রচলিত। রাজা

জনক সমাহূত ঋষি-সভায় উঠিয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "সমবেত ব্রহ্মর্ষি মণ্ডলীর মধ্যে কে আমাকে ক্ষণকালের মধ্যে জ্ঞানদানে সমর্থ? ঘোড়ার পিঠে জিন চড়াইয়া এক রেকাবে এক পা রাখিয়া অন্য রেকাবে অন্য পদ দিতে যত সময় লাগিবে সেইটুকু সময়ের মধ্যে আমাকে জ্ঞান দান করিতে আপনাদের মধ্যে কে সমর্থ?" জনকের প্রশ্ন শুনিয়া ঋষিবৃন্দ নীরব রহিলেন। অষ্টাবক্র মুনি তাঁহার কুব্জ দেহ দুলিয়া বলিলেন, আমি পারি, কিন্তু দক্ষিণা কি দেবেন? রাজা যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, রাজ্য, সম্পদ প্রভৃতি আপনি যাহা চান তাহাই দিব। অষ্টাবক্র বলিলেন, "না রাজন্, এই সকল বস্তু আমি দক্ষিণাস্বরূপ চাহি না। আপনার মনটীই আমাকে দক্ষিণা দিতে হইবে।" রাজা সম্মত হইলেন এবং স্বীয় মন গুরুকে দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান মাত্রই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন। মন সমর্পণই শ্রেষ্ঠ সমর্পণ। অষ্টাবক্র সংহিতা বেদান্তের একখানি উত্তম পুস্তক।

শংকরাচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য পদ্মপাদ একনিষ্ঠ গুরুসেবক ছিলেন। একদা কাশীধামে আচার্যদেব সুরেশ্বর, পদপাদ প্রভৃতি শিষ্যবৃন্দ সহ অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি প্রত্যহ অন্তেবাসীবৃন্দকে বেদান্ত পড়াইতেন। একদিন নির্দিষ্ট সময় আগত হইলে সুরেশ্বর আচার্যকে উহা নিবেদন করিলেন। তখন পদ্মপাদ কার্যোপলক্ষে গঙ্গার অন্য পারে গিয়াছিলেন। আচার্য পদ্মপাদের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলে সুরেশ্বর অবজ্ঞাসূচক রূঢ় বাক্যে বলিলেন, ও কি বেদান্ত বুঝবে? পদ্মপাদ সুপণ্ডিত নহেন, অথচ সুরেশ্বর নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। আচার্যদেব সুরেশ্বরের নিন্দনীয় মনোভাব বুঝিলেন এবং তাঁহাকে গুরুসেবার মহিমা বুঝাইবার জন্য ডাক দিলেন, "পদ্মপাদ, অবিলম্বে এস। বেদান্তপাঠ আরম্ভ হবে।" আচার্যের আহ্বান শ্রবণমাত্র গুরুভক্ত পদ্মপাদ গঙ্গাবক্ষের উপর দিয়া চলিয়া আসিলেন এবং তিনি যেখানে জলের উপর পদ স্থাপন করিলেন সেই-খানেই এক একটি পদ্ম ভাসিয়া উঠিল ও তাঁহার শ্রীপদ ধারণ করিল। এইজন্য তাঁহার নাম পদ্মপাদ হইল। তিনি সিদ্ধ গুরু সমীপে আসিয়া ভক্তিভরে স্বরচিত গুরুস্তব আবৃত্তি করিলেন। গুরুকৃপায় তাঁহার কবিত্ব-শক্তি স্ফুরিত হইল। সুরেশ্বর বুঝিলেন, শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা গুরুভক্তি ধর্মজীবনে অধিকতর প্রয়োজনীয়।

কুলার্ণব তন্ত্রে আছে, গুরুনিন্দা করা যেমন মহাপাপ তেমনি গুরুনিন্দা শোনাও মহাপাপ। যে স্থানে গুরুনিন্দা হয় সেই স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবে এবং গুরু-নমস্মরণ দ্বারা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। মারাঠী মহাত্মা নামদেবের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিতেছি। নামদেব বিঠ্ঠলদেবের অনুরক্ত উপাসক ছিলেন এবং তাঁহার সাক্ষাৎকার পাইতেন। বিঠ্ঠলদেব তাঁহার ভক্তের সহিত কথাও বলিতেন। ইহা হইতে নামদেবের ধারণা জন্মিল যে, তাঁহার ঈশ্বরদর্শন হইয়াছে এবং অধ্যাত্ম জীবনে আর কোন কাম্য নাই। যখন তিনি উক্ত ভ্রান্তির বশীভূত ছিলেন তখন তিনি কোন সন্ত-সভায় যোগদান করিতে যান। তথায় অন্য সিদ্ধ সাধু গোরা কুম্ভর সমবেত সাধুমণ্ডলীর মধ্যে কে কে পাকা সাধু এবং কে কে কাচ্চা সাধু তাহা পরীক্ষা করিতে আসেন। পাকা পোড়ান হাঁড়িতে হাতুড়ির ঘা মারিলে শ্রুতিমধুর শব্দ উঠে, কিন্তু কাচ্চা মাটির পাত্রে আঘাত করিলে সেই ধ্বনি পাওয়া যায় না। গোরা কুম্ভর তাঁহার ছোট হাতুড়ি হাতে লইয়া প্রত্যেক সাধুর মাথায় মৃদুল আঘাত করিয়া বলিলেন, পাকা, পাকা। যখন তিনি নামদেবের কাছে গেলেন তখন নামদেব হাতুড়ির আঘাতের ভয়ে সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। তখন গোরা কুম্ভর বলিলেন, নামদেব কাচ্চা সাধু। সমস্ত সভাও কুম্ভরের কথায় বিশ্বাস করিলেন, কারণ তখনও নামদেবের গুরুলাভ হয় নাই। অনন্তর নামদেব বিঠ্ঠলের কাছে যাইয়া এইরূপ অভিযোগ করিলেন। বিঠ্ঠল তাঁহাকে বলিলেন, তুমি

সত্যই কাচা। নামদেব ভাবিয়াছিলেন, বিঠ্ঠলরূপে ঈশ্বর দর্শনই যথেষ্ট। কিন্তু বিঠ্ঠল বলিলেন যে, সর্বরূপে ইষ্টদর্শন না করিলে উপলব্ধি পূর্ণাঙ্গ হয় না। দেবতার নির্দেশে নামদেব বিসোবা কেশরকে গুরুপদে বরণ করেন এবং বলেন, ইষ্টদেব বিঠ্ঠল যেরূপে আমার কাছে আসুন না কেন, তিনি তাঁহাকে নিশ্চয়ই চিনিবেন। প্রথমে বিঠ্ঠল ভক্ত সমীপে হরিজন রূপে আসিলেন। সেই হরিজন সদ্য-নিহত মহিষের মাংস রান্না করিতেছিল। তৎপরে সেই স্বীয় পুত্রের মাংস সিদ্ধ করিতে লাগিল। নামদেব হরিজন মূর্তিতে ইষ্টকে চিনিতে পারিলেন না ও পরে বিঠ্ঠলের নিকট অভিযোগ করিলেন, আপনি আমাকে পরীক্ষা করিতে আসার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নাই কেন? বিঠ্ঠল হরিজন রূপ ধারণ করিয়াছিলেন শুনিয়া নামদেব চমৎকৃত হইলেন ও আর একটী পরীক্ষার প্রার্থনা জানাইলেন। নামদেব বিঠ্ঠল কর্তৃক কোন বৃক্ষতলে বসিয়া মূর্তিপূজা করিতে আদিষ্ট হন। তখন বিঠ্ঠল তৎসমীপে আসিবেন। বিঠ্ঠলের পরিবর্তে নামদেব তথায় দেখিলেন, অশ্বপৃষ্ঠে এক মুসলমান আসিয়া নামদেবের ইষ্টমূর্তি ও পূজাস্থল কলুষিত করিয়া পার্শ্ববর্তী পুষ্করিণীতে ঘোড়াকে জল খাওয়াইতে গেল। মুসলমান নামদেবের দিকে ক্রূর দৃষ্টিতে তাকাইয়া বিদায় লইল। পরদিন নামদেব বিঠ্ঠলের কাছে যাইয়া পূর্ববৎ অভিযোগ করিলেন, কেন তিনি তাঁহাকে দর্শন দেন নাই? সহাস্যে বিঠ্ঠল বলিলেন, যে মুসলমান তোমার পূজা মূর্তি ভগ্ন করিয়াছিল সে-ই আমি বিঠ্ঠল। নামদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি দেবমূর্তি ভাঙ্গিতে পারেন? বিঠ্ঠল বলিলেন, সর্বরূপে তোমাকে দর্শন দানার্থ আমি তদ্রূপ অসৎ কর্মেও পশ্চাৎপদ হইব না। বিঠ্ঠল তাঁহাকে সদ্গুরু বিসোবা কেশরের নিকট যাইতে বলিলেন। নামদেব বিসোবা কেশরের কাছে যাইয়া দেখেন, তিনি বৃদ্ধ হইয়াও পূজিত শিবলিঙ্গের উপর পাদুকা সহ পদ স্থাপন করিতেছেন। নামদেব তাঁহাকে অন্যত্র পদ রাখিতে অনুরোধ করিলে প্রবৃদ্ধ কেশর তাঁহার ঈর্ষাপদ অন্য স্থানে তুলিয়া রাখিতে তাঁহাকে নির্দেশ দিলেন। নামদেব যেখানে যেখানে তাঁহার পদ তুলিয়া রাখিলেন সেইখানেই এক এক লিঙ্গ মাথা তুলিলেন। গুরু শিষ্যকে বলিলেন, তুমি মনে কর যে, আমার পাদুকা অস্পৃশ্য ও শিবলিঙ্গটী পূজ্য। তোমার এই ভ্রান্ত ধারণা পরিবর্তনার্থ তুমি এখানে প্রেরিত হইয়াছ। কিছুকাল গুরু সেবা করিবার পর নামদেব স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন। তখন তাঁহার ভগবদনুভূতি পূর্ণাঙ্গ বলিয়া বিঠ্ঠলের পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইল। একদিন নামদেব আচারবান্ স্বজাতীয়দের সহিত আহারে বসিয়াছেন। পাল-পাতা পাতিয়া রুটী, তরকারী ও ঘৃতাদি আহার্য পরিবেশিত হইল। তখন হঠাৎ একটী কুকুর আসিয়া নামদেবের পাতা হইতে একটী রুটি লইয়া পলাইল। তখন গোঁড়া ব্যক্তিগণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সব নষ্ট হইল, সব নষ্ট হইল। কিন্তু নামদেব নিজ পাতা লইয়া কিংকিং ঘৃতসহ কুকুরের পশ্চাতে ছুটিলেন এবং বলিলেন, "বিঠ্ঠল, শুধু রুটী খাইলে তোমার গলায় লাগিবে। একটু ঘৃত মুখে দাও।" ইহাতে অন্যান্য সকলে চমৎকৃত হইলেন ও নামদেবকে তিরস্কার করিলেন। মুহূর্ত মধ্যে কুকুর বিঠ্ঠলরূপ ধারণ করিলেন ও বলিলেন, "গুরুসেবার ফলে তুমি আমাকে কুকুর ও অন্যান্য জন্তুর মধ্যে দেখিতেছ। এখন তোমার জ্ঞান পূর্ণ হইয়াছে।"

গীতাতেও আছে, 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।' গুরুসেবা আত্মজ্ঞানের উত্তম উপায়। মদ্গুরু সদ্গুরু জগৎগুরু। আমার গুরুকে যেমন ভক্তি করিব, তেমনি অন্য গুরুকেও ভক্তি করিব। অন্য গুরুকে অশ্রদ্ধা করিলে মদীয় গুরুই অবজ্ঞাত হন। সর্বগুরু জগদ্গুরু প্রতিমূর্তি ও সর্বইষ্ট ভগবানের ভিন্নরূপ—ইহাই পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সরল বিশ্বাস ও কঠোর সাধন সহায়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াও শাস্ত্র ও গুরু দ্বারা তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিলেন। গুরুরূপকে ইষ্টরূপ বোধ করাই পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ। শাস্ত্রে আছে :

'ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্তিঃ পূজামূলং গুরোর্পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যম্ মোক্ষমূলং গুরোর্কৃপা।'

গুরুমূর্তি প্রত্যহ প্রণাম করিবে। গুরুপদ পূজনীয়। আষাঢ়ী গুরু-পূর্ণিমা তিথিতে গুরুপূজা প্রচলিত। গুরুবাক্যই মহামন্ত্র। গুরুকৃপাই মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ পথ। ইষ্টমূর্তি ধ্যান করিতে হয়। অসিদ্ধ-গুরুর মূর্তি ধ্যান করিলে গুরুর পাপ ও রোগ প্রভৃতি শিষ্যে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং সিদ্ধগুরু বা অবতার ব্যতীত অন্যমূর্তি ইষ্টরূপে ধ্যান করিবে না। তবে অসিদ্ধ গুরুর পূজা ও প্রণাম নিত্য করা উচিত। গুরুর শিষ্যাসক্তিও বর্জনীয়। উদাসী সাধু পূর্ণানন্দ বাংলায় বহু শিষ্য ও আশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি কোন সুন্দরী সরলা শিষ্যাকে এত অধিক স্নেহ করিতেন যে, দেহরক্ষার পরেও গুরু সূক্ষ্ম দেহে রোজ শিষ্যার পূজা-ঘরে আবির্ভূত হইয়া শিষ্যাকে সযত্নে গ্রন্থসাহেব পড়াইতেন ও শিষ্যা কর্তৃক ভক্তিভরে প্রদত্ত ফল মিষ্টি আহার করিতেন। উক্ত শিষ্যা বেলুড় গ্রামে লালবাবা আশ্রমে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এইরূপ অবৈধ আসক্তি গুরু ও শিষ্য উভয়ের পক্ষেই অনিষ্টকর। গুরুগিরি ব্যবসায়ে পরিণত হইলে উক্ত অনাচার ও অধর্ম ঘটিয়া থাকে। কলিযুগে গুরু ও শিষ্য দুইজন সাবধান হইয়া স্ব স্ব পথে চলিবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

বিশ্বভুবন আজি বাঙলার
গাহে বন্দনা-গান।
বাঙালী লভিল ধরণীর বুকে
শাশ্বত সম্মান।
অতীব দুঃস্থ হিন্দুপূজারী
সারা দুনিয়ার হয়েছে ভিখারী!
নিখিল হৃদয় করিয়াছে জয়
সেরা ধন করি' দান।
সহজ ভাষায় মাতিয়া উঠেছে
সর্বজাতির প্রাণ!

অক্ষরজ্ঞানবর্জিত এই
অতিমানবের মনে
মহামানবের জ্ঞান বিজ্ঞান
উদিল সঙ্গোপনে।
শক্তি পাইল পূজি' মহাকালী,
শ্মশানের মাঝে জ্বালালো দীপালী,
শব সম জীব করে' তোলে শিব,
আশা দিয়া জনে জনে!
অবিশ্বাসীরে দানিয়া অভয়
মিলায় মায়ের সনে।

সকল ধর্ম-মতের পথের
করিয়া সমন্বয়
মহামিলনের করিল সূচনা
আপাইয়া বিশ্বয়।
আজি বিশ্বের ধনী নিঃস্বের
দূরিতে দুঃখ ব্যথা জীবনের
প্রদানি' আলোক জাগালো পুলক
সারাটা জগৎময়!
তাই আপামর জনসাধারণ
আজি মোরে তাঁরি জয়!

বহু রাজা রাণী আছে সমানী
স্মরণীয় নহে সবে,
আশ্রয় মানি' রামমণি রাণী
অমর হয়েছে ভবে।
ঘুচিল সবার মনের সন্দ,
লভিল মোক্ষ বিবেকানন্দ,
জানিত কে বটে গঙ্গার তটে
নূতন তীর্থ হবে।
বিশ্ববাসীর মিলন-ক্ষেত্র
বাঙলার বুকে রবে!

দেশবিদেশের জ্ঞানী গুণী আসি
চরণ বন্দে যাঁর
আমি অযোগ্য মন্দভাগ্য
কি গুণ গাহিব তাঁর!
বিরাট্ পুরুষ বিশাল হৃদয়,
অতুল স্বভাব বুঝিবার নয়,
বিস্মিত আঁখি মেলি' চেয়ে থাকি,
ভাষা মোর মানে হার;
অক্ষম কবি বৃথা আঁকে ছবি,
স্বরূপ ফোটে না আর!

লক্ষ হস্তে লক্ষ বরষ
লক্ষ লেখনী ধরি'
বসি' অলক্ষ্যে লিখিলে তবু কি
আলেখ্য ওঠে গড়ি'!
মনোমন্দিরে বসায়ে আমার
মুক্তি ধেয়ান করিব তাঁহার,
আঁখি-বারি দিয়া পূজিয়া পূজিয়া
অন্তিমে যেন মরি!
জীবনের মোহ-মালিন্য মোর
যায় যেন অপসরি'!

বন্দি তোমারে শ্রীরামকৃষ্ণ,
বন্দি হে অবতার!
পুণ্যের পথে চলিতে মনের
ঘুচাও অন্ধকার!
বাঙালীর তুমি গৌরব-গিরি,
বাঙালার তুমি ফিরায়েছ ফিরি,
তুমি ভারতের বিজয়-কেতন,
ধরার অহঙ্কার!
নিখিল জনের জীবনানন্দ,
তোমারে নমস্কার!

প্রেমধর্ম—দার্শনিক তত্ত্ব

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

পূর্বে প্রেমধর্মের ঐতিহাসিক তথ্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রেমধর্মের সংবাদ বিষয়ে তা পর্যাপ্ত নয়। অনেক পাঠক আরও কিছু শুনতে চান বলে অনুরোধ করেছেন। যখন একটা ধর্ম বা অনুষ্ঠান উদ্ভূত হয়েছে, তখন তার ভিত্তিস্বরূপ একটা দার্শনিক তথ্যও সৃষ্ট হয়েছে। প্রেমধর্ম সম্বন্ধে এ দেশের একটা অদ্ভুত ধারণা আছে, সেজন্যই পূর্বোক্ত প্রবন্ধসমূহ লিখিত হয়েছিল। "প্রেমধর্ম" অর্থে এ দেশের লোকে উদ্দাম ও তাণ্ডব নৃত্য এবং নেড়ানেড়ীর কীর্তি বুঝেন। অশিক্ষিত বা মতলববাজদের অজ্ঞতা বা ব্যভিচার কোন ধর্মের উৎস নহে। তদ্দ্বারা কোন ধর্মকে বিচার করা যায় না। দুঃখের বিষয়, ধর্মের নকল বা ব্যভিচারকে সাধারণে আসল বলে মনে করেন। একটা ধর্মের অভিব্যক্তি ও তার পরিণতি ঐতিহাসিক দৃষ্টির প্রেক্ষণীয়।

বাঙ্গলায় বৈষ্ণব ধর্মের নামে অসভ্যভাবে অথবা কামোদ্দীপক নৃত্য, নর্তকদের বিদ্যা ও রুচিরই পরিচায়ক। চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ প্রবর্তিত নৃত্য-লীলার সহিত এই অসভ্য নৃত্যের কোন সম্পর্ক নাই। তদ্রূপ কনষ্টান্টিনোপলের "মেলভী দরবেশ" সম্প্রদায়ের নৃত্যের সহিত এই অসভ্য নৃত্যের কোন সাদৃশ্য নাই, যদিচ জন্মগত সম্বন্ধ আছে বলে আমরা অনুমান করি। দরবেশদের নৃত্য একটা দেখবার জিনিষ; তা একটা আর্ট বা চারু-কলা মধ্যে গণ্য হওয়া উচিৎ। এটা কি জাতিগত সভ্যতার পার্থক্যের পরিচায়ক? কে জানে!

তদ্রূপ, তাণ্ডবনৃত্যরত শিবের মূর্তি দেখে পাশ্চাত্য লোকেরা হাস্য করেন এবং আমরাও নাক সেঁটকাই যে এত আর্ট নেই। কিন্তু এই নৃত্যেরও একটা ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি আছে। তার ধারা আছে; তা ভারতীয় শিল্পকলার অভিব্যক্তির অন্তর্গত; আবার তার একটা দর্শন শাস্ত্রও আছে। এগুলিকে একসঙ্গে বিচার করে সর্ব অনুষ্ঠানগুলিকে একত্রিত করে তার সমন্বয় দ্বারা আমাদের দক্ষিণের শিবের তাণ্ডব নৃত্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হবে। গাঁজা খেয়ে ছয় হাত বার করে শিব লাফাচ্ছেন, এই দৃশ্য দেখে ভক্তরা ভক্তিতে গদগদ হচ্ছেন, এই তথ্য দ্বারা এই মূর্তির স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবে না।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগের সিন্ধুসভ্যতার ভগ্নস্তূপ মধ্যে মহেন-জো-দাড়ো নামক স্থানে একটা পিতলের ভাঙ্গা নৃত্যরত স্ত্রীমূর্তি পাওয়া গেছে। তাঁরা অনুমান করেন, এই মূর্তির এক পা ও হাত বেঁকিয়ে নৃত্যের ভঙ্গীই, বহুকালের পরবর্তী শিবের তাণ্ডব নৃত্যের জন্মদাতা। এতদ্দ্বারা বোধগম্য হয়, ভারতীয় নৃত্যের একটা ইতিহাস আছে, তার ক্রমবিকাশ আছে। তদ্রূপ প্রেম-ধর্মের বিকাশেরও একটা অভিব্যক্তির ধারা আছে, এবং তার একটা দর্শনশাস্ত্র আছে।

প্রেমধর্মের সাধকের ভগবদ্ভক্তিই তার সাধনার সোপান। এই সোপান নানা স্তর দিয়া অগ্রসর হয়। সাধনার এই ক্রমবিকাশ এবং স্ফূর্তি অবশ্য মনস্তত্ত্বের বস্তু, তা জড় বা বস্তুতন্ত্রীয় নয়। প্রাচীন কালে এই সাধনার সোপানকে অলৌকিক বা ঐশ্বরিক শক্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। মধ্য-যুগে তার মনস্তাত্ত্বিক বিচার আলোচনা হয়েছে; কিন্তু তাকে ভগবৎ শক্তির বিকাশ বলা হয়েছে বা সত্য ঘটনা বলে ধার্য করা হয়েছে। বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশসমূহে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা তার স্বরূপ নির্ধারণ করা হচ্ছে।

ভারতে প্রেমধর্ম মধ্যযুগে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। বোধহয় গুপ্তযুগেই তা পরিপুষ্ট লাভ করে' "জাতে" উঠে। কিন্তু এর দর্শনশাস্ত্র আমরা 'পাঞ্চরাত্র' পুস্তক রচনা কালেই পাই। তখন ভারতীয় প্রেমধর্ম, 'ভাগবৎ' ধর্ম নাম ত্যাগ করে' "পাঞ্চরাত্রের দলের ধর্ম" এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। মহাভারতের 'শান্তিপর্ব' বহু পরে সংযোজিত হয় বলে' পণ্ডিতেরা বলেন। এতে নারদের শ্বেতদ্বীপে গমন বৃত্তান্তে পাঞ্চরাত্র দলের দর্শনশাস্ত্রের সহিত আমরা পরিচিত হই। কিন্তু ইহা দর্শনের কেবল কটকটে সূত্র মাত্র। এতে প্রেমধর্মের সাধনার কথা নাই। মহাভারত রচনার পরে আমরা "খিল মহাভারত" অর্থাৎ "হরিবংশ" লিখিত হতে দেখি। কিন্তু এতে যদুবংশেরই বৃত্তান্ত আছে। অবশ্য পরে অনেক বৈষ্ণব পুরাণ, উপনিষদ ও ভক্তিমার্গীয় পুস্তক রচিত হতে দেখি। কিন্তু প্রেমধর্মের মূল উৎস হচ্ছে, "শ্রীমদ্ভাগবত" বা "ভাগবৎপুরাণ"। এর তারিখ নিয়ে গোলযোগ আছে। আমী দয়ানন্দ একে ১৭শ শতাব্দীতে দেবগিরির বোপদেব শাস্ত্রীর লিখিত বলেন। অন্য লোকে এর তারিখ ১১শ শতাব্দী বা তদূর্ধ্বে বলতে চান। অবশ্য, শঙ্করাচার্য এই পুস্তক এবং যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের নামোল্লেখ তাঁর পুস্তকে করেন নাই। যাই হউক শ্রীমদ্ভাগবত সেইকালে রচিত হয়েছিল, যখন বৃন্দাবনে রাধা, চন্দ্রাবলী, আয়ান ঘোষ, বৃন্দাদূতী প্রভৃতি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের কৃষ্ণখণ্ডে উক্ত গল্পগুলি উদ্ভূত হয়নি। এমনে অনুমান নির্দেশ করে' বক্তব্য যে, শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার যেসব গল্প উপরোক্ত পুরাণ দ্বারা বঙ্গে প্রচলিত আছে, তা ভারতের আর কোথাও নাই। রাধা ভাগের (৩০০ খৃঃ) "রাসলীলা" নাটকে নাই, রাধা শ্রীমদ্ভাগবতে নাই। রাধা প্রথমে স্থান পেয়েছেন উপরোক্ত পুরাণে যা বাঙ্গলায় বিরচিত হয়েছিল বলে' বিবেচিত হয়। দক্ষিণে একটা পুস্তকে রাধার উল্লেখ আছে; কিন্তু ভাণ্ডারকার প্রভৃতিরা বলেন, উহা বল্লভাচার্যীয় সম্প্রদায় কর্তৃক হালের লিখিত, সুতরাং প্রক্ষিপ্ত। যাই হউক ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে স্থান পেয়ে রাধা বাঙ্গলায় কায়েমী হয়েছেন। এক্ষণে, এই রাধাকে অনেকে বেদেও খুঁজতে চান!

রাধার কথা এ স্থলে উল্লিখিত হল যেহেতু ভারতের অন্য প্রদেশে প্রেমধর্ম বা বৈষ্ণব ধর্ম রাধাকে বাদ দিয়েই চলে। বাঙ্গলায় পূর্বে একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছিল; মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেনদেব নিজেকে "পরম বৈষ্ণব" বলে পরিচয় দিয়েছেন; তাঁর সভাসদ জয়দেব 'গীতগোবিন্দম্' কবিতা পুস্তক রচনা করেন, ইত্যাদি। এই কাব্যে রাধার নাম আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য আর এক সম্প্রদায় যে বাঙ্গলায় পূর্বে ছিল, তার প্রমাণ অনেক আছে। এখনও অনেক বংশ আছেন যাঁরা বৈষ্ণব কিন্তু গোস্বামী শিষ্য নন। যাঁরা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত নন। উত্তর বাঙ্গলার "কৃষ্ণ-ধামা-লী" গানসমূহ এবং নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাসের "কৃষ্ণকীর্তন" পুস্তক তারই প্রমাণ। কিন্তু এসব গীতি-কাব্যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের "রাধা" আছেন। দেখা যায় রাধা বাঙ্গলারই নিজস্ব।

তৎপর, চৈতন্যদেবের উদয় হয়। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় "শ্রীমদ্ভাগবত"কে প্রামাণ্য শাস্ত্র বলে মেনে নেন। এই সম্প্রদায় বৃন্দাবনের "কিশোর গোপাল"কে সাধনা করেন। এ তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রকট হয় পুরীতে যখন বল্লভাচার্য চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। তিনি স্বরূপ দামোদরকে বলেন, তিনি বালগোপালের উপাসক। কিন্তু পদাবলীতে আমরা "চিকণকালা, গলায় মালা, বাজে নূপুর পায়" এই গীতও পাই; "ননীচোরা কৃষ্ণে"র সংবাদও পাই। যাই হউক, গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে আঁকড়িয়ে ধরলেন, কাজেই বৃন্দাবনলীলার একটা দর্শন রচনা করতে হবে।

সাকর মল্লিক ওরফে সনাতন গোস্বামী সে অভাব পূরণ করলেন। তাঁর রচিত "ভগবদ্ভক্তি রসামৃত" পুস্তক ভারতীয় আর্ষ কৃষ্টি মধ্যে বাঙ্গালার এক অপূর্ব দান। এই লীলাবর্ণনায় বৃন্দাদূতী নাই, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নাই। আছে কেবল প্রেমাস্পদের সহিত প্রেমিকাদের যূথ বেঁধে নৃত্য; এতে কাম-গন্ধ নাই। পূর্বেই উক্ত হয়েছে—লেখকের অনুমান যে, ইহার মধ্যে ইস্‌লামীয় সুফীভাবের প্রভাব দৃষ্ট হয়।

জ্ঞাতব্য এই, পূর্বে কোন লোককে পরকালে উন্নত করতে হলে, তাকে "দিবি আরোহণ" করান হ'ত, অর্থাৎ নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে তার স্থান নির্দিষ্ট করা হত। পরে, পৌরাণিক যুগে, ব্রাহ্মণ্য-বাদীরেরা এবং মহাযানী বৌদ্ধেরা তাঁদের পবিত্র ও মহৎ লোকদের জন্য "লোক" কল্পনা করেন। এটা হোমারের Elysian field (পরলোকের একটি মরদান) এবং টিউটনজাতির Valhalla নামক পরলোক, যজুর্বেদের পরলোক, উপনিষদের 'পিতৃযান' ও 'দেবযান' অপেক্ষা ঐতিহাসিক অগ্রগমনশীল কল্পনা। পৌরাণিক যুগে, সামন্ততন্ত্র প্রভাবযুক্ত সমাজে স্তরভেদ হয়েছে—পদানুযায়ী লোকের স্থান নির্দিষ্ট হ'ত। কাজেই, তার প্রতিবিম্ব পরলোকে পড়ে। মর্যাদানুযায়ী লোকেও পরকালে "লোক" পেতে থাকে।

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা অন্য ব্যবস্থা করলেন। তাঁরা অমূর্ত আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এমন এক স্থান কল্পনা করলেন—যথায় ভগবান, যিনি সকলের ঈপ্সিত এবং প্রেমাস্পদ, তিনি কিশোর-কৃষ্ণরূপে আছেন; আর যাঁরা তাঁকে অভিলাষ করেন, তাঁরা কৃষ্ণের প্রেমিকা, তাঁরা সকলে দল বেঁধে কৃষ্ণের সহিত নৃত্য করছেন। এস্থলে কথা উঠবে, তাহলে পুরুষের কি সাধনায় অধিকার নাই? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছে। যাঁরা বড় বড় ভক্ত-সাধক, তাঁরা এই বৃন্দাবনে "দিবি আরোহণ" করে বিরাজ করছেন। রাধার সখীমহলে তাঁদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। তাঁরা একটী বালিকা-দলের নেতা—"যূথপতি"। এই প্রকারে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর, তাঁর গুরু শ্রীনিবাস আচার্য বৃন্দাবনে স্ত্রীলোকদের যূথপতি রূপে বিরাজ করছেন। তাঁরা প্রেমাস্পদের প্রেমিকা, অতএব রাধার সখীর দলে তাঁদের স্থান।

এই বর্ণনাটি একটী দৃষ্টান্ত দিয়ে এস্থলে বুঝাবার চেষ্টা করা হবে। "ভক্তি-রত্নাকর" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, একদিন শ্রীনিবাসাচার্য ধ্যানমগ্ন হয়ে আর জাগেন না। লোকজন ভয়ে তাঁর রাজা-শিষ্য বীর হাম্বীরকে খবর দেয়। রাজা হাতী চড়ে শশব্যস্তে এসে হাজির। ক্রমে আচার্যের জ্ঞান এল। আজকাল এই অবস্থাকে trance বা সমাধি বলা হবে। কিন্তু বৈষ্ণবকবি তা বলেন নি। আচার্য সম্বিৎ পেয়ে বললেন, "শ্রীমতী রাধা আজ কৃষ্ণের সঙ্গে রসক্রীড়ায় বড় মত্ত হয়েছিলেন, তাতে তাঁহার কাণের দুল জলে পড়ে যায়। তিনি আমাকে তা কুড়িয়ে উদ্ধার করতে বলেন, খুঁজতে এত দেরী হল, তাই ধ্যানভঙ্গেরও দেরী হল।" এতদ্দ্বারা আমরা এই দেখি, প্রেমিকের ও প্রেমাস্পদের লীলাই হচ্ছে বৈষ্ণবের সাধনা। অবশ্য এই সাধনার নানা স্তর আছে। যথা—পূর্বরাগ, বিপ্রলম্ভ, মাথুর (বিচ্ছেদ) মিলন, সম্ভোগ। এগুলিকে আমরা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারের অন্তর্গত করতে পারি। এই সাধনার পরিণতি হবে যখন সাধক স্বেদ, হাস্য, পুলক, কম্পন, নৃত্য দ্বারা নিজেকে চেতনাশক্তির উপর (supraconsciousness) আধিপত্য স্থাপন করবে।

ভারতের বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা হচ্ছে, প্রেমাস্পদ ভগবানের সহিত মিলন। তা সখ্য, শান্ত, দাস্য প্রভৃতি নানাভাবে সাধনা করা যায়। এই সাধনার অঙ্গগুলি শ্রীজীবগোস্বামী তাঁর "ভক্তি রসসিন্ধু" পুস্তকে বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, পরে রূপগোস্বামী প্রবর্তিত

"কিশোরী ভজন", "পরকীয়া তত্ত্ব" প্রভৃতি প্রচার দ্বারা সাধনার মান নীচু স্তরে চলে যায়। শেষে এল, বল্লভাচারীদের "পুষ্টিমার্গ" রূপ মত। এসব ব্যভিচারকে ধর্মের আবরণে প্রচ্ছন্ন করার চেষ্টা মাত্র। যে চৈতন্যদেব বলেছিলেন :

"বৈরাগী হয়ে করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহারই বদন।"

সেই সম্প্রদায়ে নানা দোষ এসে পড়ে। এরই ফলে, বৈষ্ণবধর্ম শিক্ষিতদের মধ্যে এত নিন্দনীয় হয়েছিল। বল্লভাচারীদের "গুরুপ্রসাদী" বা "গুরুগাঁই" প্রথার বিষয়ে একজন ইউরোপীয় পাদরী মন্তব্য করেছেন : "কৃষ্ণের ধর্ম কেবল ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের জন্য সৃষ্ট (Ballavacharya defamation case নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য)।" কালের কি অদ্ভুত গতি! বড় বড় জিতেন্দ্রিয় বৈরাগীদের ধর্মের এই অবনতি!

একবার চরণদাস বাবাজীর এক শিষ্যকে লেখক বলেছিলেন, "মহাশয়, কেশবসেন ও তাঁর শিষ্যেরা, এবং পরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্যেরা খোল বাজিয়ে কীর্তনাদি করা শিক্ষিত সমাজে প্রচলন করার ফল আপনারা ভোগ করছেন"। তিনি স্বীকার করলেন, "হ্যাঁ, পূর্বে বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব ধর্মের নামে লোকের কি কুৎসিৎ ধারণা ছিল"। চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের যে একটা বৈপ্লবিক শক্তি ছিল, ইহা বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের বিপুল পরিবর্তন সাধন করেছে তা কয়জন উপলব্ধি করেন?[১]

এটা হল গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ব্যাপার। কেন প্রাচীনকাল হতে বাঙ্গলার শ্রীকৃষ্ণের প্রেমধর্ম আদিরসের উদ্গারে পরিণত হল, তা সমাজ-বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধানের বস্তু। দুর্বল শরীর-সর্বস্ব ইন্দ্রিয় দৌর্বল্যই কি এর জন্য দায়ী? বাংলার বাইরকার শ্রীকৃষ্ণ গৃহীত হল না, বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ কেন আজও আসন পেতে আছে এটা কি অনুসন্ধানের বস্তু নয়? ইন্দ্রিয়-দৌর্বল্য এবং তৎসঙ্গে পরাধীনতা কি-কিশোরী-ভজন, পরকীয়া-তত্ত্ব, সহজ-পন্থা, নব-রসিকগণ প্রভৃতির সৃষ্টি করে নি? বাঙ্গলা এবং তার নিম্ন আসাম ও উড়িষ্যা মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ কি? এটা কি কেবল সমাজ-তাত্ত্বিক টার্ডের (Tarde) অনুকরণ নীতি অনুযায়ী সংঘটিত হয়েছে? উড়িষ্যার বর্তমান নেতারা বলেন, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মই উড়িষ্যার সামরিক শক্তির অবনতির কারণ। ধর্মের নামে কামোদ্গার কি সমাজের ক্ষতিকারক হয় নি? ধর্মের নামে আজ যত অনাচার, কদাচার, ব্যভিচার চলছে, সমাজ তদ্বিষয়ে অবহিত নয় কেন? ইসলামীয় ও খৃষ্টীয় সমাজ ইহা সহ্য করে না। আশ্চর্য ঘটনা, প্রেমধর্মের নামেই এ সব অনাচার চলেছিল বা চলেছে! লেখক নবদ্বীপে ৺ হরিদাস গোস্বামী মহাশয়কে গুরু-গাঁই প্রথার হেতু জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন,—'গুরুকে সর্বস্ব দান করলাম'—এইভাব থেকেই এটা এসেছে। প্রেমধর্মের "পুষ্টিমার্গ" মত দ্বারা পুষ্ট হয়ে এই কদাচার গুজরাট ও রাজপুতানার দুর্বল বেনিয়া জাতিদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল যা এখনও আছে। অথচ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, হৃদয়-দৌর্বল্য ত্যাগ করতে। দুর্বল-হৃদয় থেকেই ইন্দ্রিয়-দৌর্বল্য আসে, এটা বৈজ্ঞানিক সত্য।

অন্যদিকে রামাইৎ-বৈষ্ণবদের আচার অন্য প্রকারের। তাঁদের উপাস্য হচ্ছেন, বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্র ও তাঁর সাধ্বী স্ত্রী সীতাদেবী। এই একপত্নিক বীরপুরুষ প্রজারঞ্জন জন্য একমাত্র প্রেয়সী স্ত্রীকে বনবাস দিলেন, তাঁকে অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা যাচাই করে তবে ঘরে তুলে নেন, এই আদর্শের মধ্যে কি আদিরসের স্থান থাকতে পারে? আশ্চর্য কথা, অযোধ্যা জেলাতেই রামাইৎ-বৈষ্ণবদের প্রধান আড্ডা; তুলসীদাসের মতন ত্যাগী

১। লেখকের 'বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজ তত্ত্ব' দ্রষ্টব্য।

বৈরাগী এই ধর্মের প্রবর্তক; এঁদের আদর্শ-ভক্ত হচ্ছেন বীর হনুমান। আর এইসব হতেই বড় যোদ্ধার দল ইংরেজের পল্টন শ্রেণীতে ভর্তি হত এবং এখনও জাতীয় সৈন্যদলে আছে। এ স্থলের ব্রাহ্মণেরাও বড় যোদ্ধা; তারাও সেপাহীদলে ভর্তি হয়।

১৯৪৬ খৃঃ অযোধ্যা দর্শন করবার কালে হনুমানজীর মন্দির পরিদর্শন করতে লেখক যান। তথাকার এক মহান্তের সহিত লেখকের পরিচয় ছিল; তিনি একজন বড় পালোয়ান এবং সোসালিষ্ট দলের সভ্য। কথায় কথায় 'গঙ্গ-কাটা দাঙ্গার' কথা উঠল। তিনি বললেন, গোলমালে হলে ৩০০ জন পুষ্ট পালোয়ান বৈরাগী এই জায়গা হতে অযোধ্যাকে বাঁচাবার জন্য বের হবে। পূর্ব-ভারতের কোন আখড়ায় কি এমন প্রকার পালোয়ান বৈরাগী পাওয়া যাবে? মূল-জাতিভেদ (Race) বা বাহ্যিক বাতাবরণ কি এই পার্থক্যের কারণ?

একদল, বিষ্ণুর অবতার রামের যুদ্ধের বর্ণনা পড়েন ও তাঁর একপত্নীত্বের প্রশংসা করেন; আর একদল, বিষ্ণুর আর এক অবতারের ৬৪ হাজার গোপিনীর সহিত ক্রীড়ার কথার গল্প শুনে—রাধা বলছে: "লম্পট! কাল রাত্রে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাত্রি যাপন করেছিল" *। আর বাঙ্গালার কিশোর কিশোরী, যুবক যুবতী তা শুনে' আধ্যাত্মিকতার ভাবে গদগদ হয়! পার্থক্য এস্থলে, বাতাবরণই (Environment) এর একটা প্রধান কারণ। প্রেমধর্ম বললে লোকে এসব ইন্দ্রিয়-বিকারকেই বুঝেন, তাই এসব কথা এস্থলে উল্লিখিত হল।

লেখকের অনুমান এই যে, গুপ্তযুগে যখন সমস্ত ধর্মপুস্তক ব্রাহ্মণাধিপত্যের পক্ষে নূতনভাবে সংকলিত হতে লাগল, তখন দুই শ্রেণীর বৈষ্ণব-লেখক মহাভারত ও রামায়ণে নিজেদের মত ও আদর্শ প্রক্ষিপ্ত করে। এই দুই মহাকাব্যের তুলনামূলক পাঠেই তা উপলব্ধি হবে। মহাভারতে, বেদের দশমণ্ডলের শান্তনু রাজা হতে সপ্তম খৃষ্টাব্দের চোল, পাণ্ড্যরাজাদের সময় পর্যন্ত ভারতীয় আর্যজাতির সামাজিক ব্যবস্থা, রীতিনীতি, বীভৎস আচার খুলে লেখা হয়েছে। অন্যদিকে, অযোধ্যার রাজা দশরথ মধ্যযুগীয় রাজা যাঁর তিন রাণী আর সাড়ে তিনশত কামপত্নীর উল্লেখ আছে। এই সঙ্গে প্রজাদের মধ্যে (প্রকৃতপক্ষে) 'শ্রেণী' প্রথা (Guild-system) বিদ্যমান বলা হয়েছে। শেষে কাব্যের নায়ক রামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতাদের একপত্নীক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ইঁহারা সকলেই সংযত চরিত্রের লোক। উদ্দাম চরিত্রগত হৈহয়রোড়ের কোন সংবাদ এতে নেই। অবশ্য এতে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য বিশেষভাবে অঙ্কিত করা হয়েছে, "রাম-রাজত্ব" মানে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্থাপন। কিন্তু মহাভারতের ন্যায় এতে বীভৎস বর্ণনা নেই। অযোধ্যা হতে লঙ্কাপুরী বেশী বৈদিক কৃষ্টি ভাবাপন্ন। তথায় শিব মন্দির ও শৈব সাধুদের বাহুল্য দেখা যায়। রাবণ একজন নৈষ্ঠিক বৈদিক ব্রাহ্মণ বলে স্পর্দ্ধা করছেন, ইত্যাদি। রামায়ণে যে বৃত্তান্ত সুন্দরকাণ্ডে রাবণের দিগ্বিজয় বর্ণনাতে ধরা পড়ে, কিন্তু আসল পুস্তক পাঠ করলেই ধরা পড়ে যে লঙ্কাকাণ্ড হয়ে মহাকাব্য শেষ হয়েছে। শেষে "সুন্দরকাণ্ড" সংযোজিত হয়। এতে গুপ্ত রাজাদের সাম্রাজ্য-বাদীয় রাজনীতির অনুসরণ রাম দ্বারা করান হয়েছে। এ পুস্তকের সর্বত্রই ইন্দ্রিয়-চর্চার কথা দাবিয়ে রাখা হয়েছে।

বৈষ্ণবদের মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের আদর্শগত পার্থক্য ভারতের সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু নানা ঐতিহাসিক কারণ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ-ধর্ম ভারতে বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে। এই ধর্ম অতি প্রাচীন; বৈদিক সাহিত্যে আমরা "সাত্বত"

*কলিকাতায় এক বৈষ্ণব মন্দিরে বালিকা ও কিশোরীদের দ্বারা অভিনীত যাত্রায় এক কিশোরী দ্বারা ইহা উক্ত হয়। লেখক তথায় উপস্থিত ছিলেন।

ধর্মের উল্লেখ দেখি। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ, সাত্বতী, সুভদ্রাকে সাত্বতধর্মীয় বলা হয়েছে। পুনঃ "কুল-নিদ্দেশ" নামে প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থকে আমরা "বাসুদেবধর্ম", "বলভদ্রধর্ম" প্রভৃতির উল্লেখ দেখি। তৎপর, গুপ্তযুগে আমরা "ভাগবত" ধর্মের উল্লেখ দেখি (সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত নিজেকে "পরম-ভাগবত" বলেছেন)। শেষে ঐতিহাসিক যুগে এই ধর্মের নামকরণ হয় "বৈষ্ণব ধর্ম" (মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেব নিজেকে "পরম বৈষ্ণব" বলেছেন)। কিন্তু এই বিষ্ণু-পূজা যা' অনেকের কাছে কৃষ্ণ-পূজায় পরিণত হয়, তাহা "সুফিয়ানা"তে (ইহার অর্থ, নিরামিষাশী—"আইন আকবরী") কবে পরিণত হল এটাই অনুসন্ধানের বস্তু। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, কবে কৃষ্ণ-পূজা "বাবাজীর ডোল"তে পরিণত হল তা জ্ঞাতব্য। হরিবংশ ও মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ ঘোর মাংসাশী ও মদ্যপ। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে কৃষ্ণার্জুনের বর্ণনা করে বলছেন:

"উভৌ তৌ মাধ্বিকরতৌ, উভৌ তৌ চন্দনচর্চিতৌ।
এক পর্য্যঙ্কাসীনৌ দৃষ্টা কৃষ্ণার্জুনৌ॥"

তৎপর, গুপ্তসম্রাটেরা এবং লক্ষ্মণসেন যে সুফীসাধক-দের ন্যায় নিরামিষাশী ছিলেন তার কোন সংবাদ নাই। বরং নুলো পঞ্চানন বলে গেছেন:

"বিষ্ণুপূজায় কৃতক্লীব শাস্ত্রের বিধান" ("সম্বন্ধ-নির্ণয়" দ্রষ্টব্য)। তাদের রাসলীলাতে দামোদরকে (এই নামে কৃষ্ণ উল্লিখিত হয়েছেন); ষাঁড়রূপী অরিষ্টাসুরের সহিত লড়াই করতে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত ও হরিবংশে কৃষ্ণ যোদ্ধা ছিলেন। প্রভাস-তীর্থের অনর্কেলী ও মদ খেয়ে হুল্লোড় চমকপ্রদ বর্ণনা। ৺ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছেন, এই বর্ণনা পড়ে অসভ্য টিউটনদের ভালহাল্লার বর্ণনা বলে মনে হয় ("The Indo-Aryans")। পুনঃ একাদশ শতাব্দীতে লিখিত "শিশুপাল বধং" কাব্যে প্রভাস-তীর্থের পথে যাদব যাদবীদের মদ খেয়ে হুল্লোড়ের বর্ণনা আর তৎকালীন বাঙ্গলার শ্রীমতী রাধার অভিসার বর্ণনাতে কি প্রভেদ!

"সুফীয়ানা" থেকে বৈষ্ণব ধর্মের উদয় কবে হল, তা'ই বিবেচ্য। শ্রীগুপ্ত বলেন, তুর্কী আক্রমণের পরে চতুর্দশ শতাব্দীতে দক্ষিণ হ'তে আরম্ভ ক'রে ভারতের সর্বত্র একটা নব-বৈষ্ণবধর্মের আলোড়ন হয়। ইহা বৌদ্ধধর্ম হতে 'অহিংসাবাদ' ও জাতিভেদ বর্জন এবং ইসলাম থেকে সগুণ ভগবানের ভাব গ্রহণ করে।* কেবল ইহা পর্যাপ্ত নয়। ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, এই নব-বৈষ্ণববাদ প্রসারের ফলে ভারত থেকে বৌদ্ধরা অন্তর্হিত হলেন। তাঁরা এই নব ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সঙ্গে তাঁরা মাংসখেকো সহিংস বৈষ্ণব ধর্মে অহিংসাবাদ, মুণ্ডিত-মস্তক ভিক্ষুক, বৈরাগী-গিরি সশরীরে আনয়ন করেন। মুসলমানের কাছ থেকে সগুণ ভগবান-ধারণা, যে ভগবান ভক্তের শত্রু বিনাশ করে, যে ভগবান যুদ্ধ করে, সেইভাব বৈষ্ণব ধর্মে আনয়ন করেন। পুনঃ, বোধ হয় আলখাল্লাধারী বৈরাগী বাবাজীও মুসলমান ফকীরের অনুরূপ; এই সাদৃশ্যের জন্যই অনেক মুসলমান বৈষ্ণবভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এইজন্যই ঠাকুর হরিদাস কাজীকে বলেছিলেন:

"শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর"।

আর বর্ধমানের মুসলমান-বৈষ্ণবকবি বলেছিলেন:

"আগম নিগম বেদ পুরাণ,
লীলায় করত গোঠ বিহার,
নাদীর মাহমুদ করত আশ,
চরণে শরণ দেও রে।"

বিষ্ণুপুরাণ মধ্যযুগীয় বৈষ্ণবধর্মের একটা প্রামাণিক ধর্মশাস্ত্র। এতে ভগবান বা পরব্রহ্মকে নিরাকার, নির্গুণ এবং সাকার ও সগুণ উভয়ই বলা হয়েছে। প্রথম মত দ্বারা ভগবানকে অরূপ ও

---

* "Mediaeval Hindu India" দ্রষ্টব্য।

নিষ্ক্রিয় অবস্থাপন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বোধ হয় তৎকালীন মূর্তিপূজার বাহুল্য দেখে ভগবানকে ইহজগতের মধ্যে এনে রূপ প্রদান করা হয়েছে এবং গুণও আরোপ করা হয়েছে। এই উপায়ে ভগবানকে ভক্তের বাহ্যবস্তুর অন্তর্গত করা হয়। ভগবান যখন সাকার, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে জগতে অবতীর্ণ হন; আর যখন তিনি গুণযুক্ত তখন ভক্তের বাঞ্ছাপূর্ণ করেন, তার শত্রু বিনাশ করেন।

এই সগুণ (Personal) ব্রহ্মের উপাসনা নব-বৈষ্ণবেরা বিশেষভাবে প্রচার করেন। এই জন্যই রামানুজী এবং পরবর্তীদল শঙ্করাচার্যকে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ" আখ্যা প্রদান করেন। এঁদের কাছে ভগবান কৃষ্ণ বা রামরূপে শত্রু বিমর্দন করেন। জয়দেবের "দশ-অবতার" স্তোত্রে বুদ্ধদেব ব্যতীত সব অবতারই, অসুর, মূর, কেশী বিমর্দনকারী, ম্লেচ্ছনিধন-কারী।

এই সব হল বৈষ্ণবদের বাহ্য জগতের তথ্য। কিন্তু আভ্যন্তরীণ তথ্য কি? আধ্যাত্মিক সাধনের তথ্য কি, তাই বিবেচ্য। প্রেমাস্পদের সহিত মিলন তা যে ভাবেই হউক তাই কাম্য। এ বিষয়ে চৈতন্যদেবের সহিত রামানন্দ রায়ের কথোপকথন বিবেচ্য। বৈষ্ণবেরা গোড়া থেকেই কীর্তন, গীত বাদ্যাদি দ্বারা সজন প্রার্থনা করে' সাধন ব্যবস্থা দিয়েছেন। যখন রাজা রামমোহন রায়কে গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা আক্রমণ করে' বলল: "তুমি তোমার ব্রহ্মসভায় প্রচলিত সজন প্রার্থনার সমর্থন কোন্ শাস্ত্রে পেলে?" তখন তিনি বৈষ্ণব শাস্ত্র উদ্ধৃত করে' নিজপক্ষ সমর্থন করলেন।

এই কীর্তন ও গীত-বাদ্য দ্বারা ভজনা বাঙ্গলায় চৈতন্যদেব প্রচলিত করলেন। বোধ হয়, পূর্বেকার বৈষ্ণব ও সহজযানী বৌদ্ধদের মধ্যে ইহা প্রচলিত ছিল। ইহা গৌরাঙ্গদেবের স্বকপোলকল্পিত নয়। শ্রীবাস অঙ্গনে তিনি যখন দল বেঁধে কীর্তনাদি করতেন, তখন তিনি কোন দেশছাড়া অনুষ্ঠান করেন নি। জয়ানন্দের "চৈতন্য মঙ্গল" গ্রন্থে উল্লেখ আছে নিত্যানন্দপ্রবর্তিত কীর্তন প্রথায় চৈতন্যদেব আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু "চৈতন্য-ভাগবত" মতে তিনি নিজেই নবদ্বীপে কীর্তন করছেন এবং এতদ্দ্বারাই "কাজীদলন" করেন; পুনঃ পুরীতে জগন্নাথের "রথযাত্রা" দিবসে সাতসম্প্রদায়ের মধ্যে নিজে কীর্তন করতেন।

এক্ষণে কথা উঠে সাধন দ্বারা সাধকের অবস্থা কি প্রকারের হয়। কোথাও উল্লেখ নেই যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বৈষ্ণবেরা যোগ-বিদ্যার চর্চা করেছেন। এই বিষয়ে বৌদ্ধেরাই বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু ভক্তিই যাঁদের সাধনার একমাত্র সোপান, তাঁরা যোগমার্গ কি প্রকারে অবলম্বন করবেন? কলিযুগে সহজ পন্থা, যথা—কীর্তন, গীতাদি একমাত্র উপায় (নিত্যানন্দের উক্তি—জয়ানন্দ)। ভক্তির দ্বারাই যাঁরা ভগবানে লীন হতে চান তাঁদের কাছে অন্য পন্থা নাই। অবশ্য দেশের বাতাবরণানুযায়ী তাঁরা সাধকের মধ্যে অধিকারী ভেদ সৃষ্টি করলেন। পুনঃ সাধনের অবস্থা দ্বারা ঈশ্বরের নৈকট্য স্থাপন বিষয়ে সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য স্তর সৃষ্টি করেন। এটা হল ভক্তের সাধনার মাপ-কাঠির কথা; কিন্তু সাধকের সাধনার লক্ষণ কি? এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত বলছে "ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুত চিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ; নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।" ইহার অর্থ—"ভক্তেরা সেই বিনাশহীন ঈশ্বরের চিন্তাতে কখন রোদন করেন, কখন হাসেন, কখন আনন্দিত হন, কখন অলৌকিক কথা বলেন, কখন নৃত্য করেন, কখন তাঁর নামগান করেন, গানের অনুশীলন করেন, কখন তাঁর গুণকীর্তন করতে করতে তূষ্ণীভাবে অঙ্গ বিসর্জন করেন।"

এটাই হল বৈষ্ণব সাধকের সাধনার শেষ কথা। এরই মধ্যে ভাবমগ্নতা বা সমাধি এবং মিলন, উভয়ই

নিহিত আছে। অবশ্য, মুসলমানযুগে এই বিচ্ছেদ ও মিলন ভাব আমরা উভয় ভারতে পাই, তা পরাধীনতাজনিত হা হুতাশ ক্রন্দন এবং সুফী সাধকের মতের (যার পিছনে একই তথ্য নিহিত আছে) প্রভাব বলে মনে হয়। স্বাধীনকালের বৈষ্ণবগ্রন্থে এই ভাবপ্রবাহ দেখা যায় না। মাথুরের বিচ্ছেদের পালা সংস্কৃত বৈষ্ণব সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। এটা বাঙ্গলার পরাধীনতাজনিত মর্মবেদনারই বহির্বিকাশ।

বৈষ্ণব সাধনা বিষয়ে আলোচনায় ক্ষান্ত হয়ে আমরা সুফী সাধনার অনুসন্ধান করব। সুফী মতবাদ বিশেষভাবেই বিভিন্ন জাতিসমূহ মধ্যে উদ্ভূত হয়। এর সাধনার একটা অঙ্গ 'যীকর' অর্থাৎ দম বন্ধ করে প্রাণায়াম সাধনা করা। উপস্থিত ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে যে, ৮ম-৯ম খৃঃ জুনেইদ নামক এক কুর্দী সাধক সিন্ধুদেশে এসে আবু আলী নামক একজন মুসলমানের কাছ থেকে প্রাণায়াম প্রক্রিয়া শিক্ষা করেন। তদবধি সুফীদের মধ্যে এই প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে। (১) পুনঃ 'দাবীস্তান' নামক পুস্তকে উল্লিখিত আছে মুসলমান যুগে হিন্দু মুসলমান, পার্সী এদের মধ্যে যোগ-চর্চা সমভাবে বিরাজ করত।

যাই হউক, সুফিদের সাধনার মধ্যে বিচ্ছেদ (হিজরা) ও মিলন (ওয়াসল) ভাব আছে। কবি হাফেজ বলছেন :

"বয়াদে আয় আফতাব সুবহ উমেদ।
কহ দর দস্ত হিজরান আসিরম।

এর ভাবার্থ—সূর্যের উদয় হউক প্রাতঃকাল আশা করছি। কারণ, রাত্রি তার শক্তি দিয়ে আমার বিরহের বেদনা দিচ্ছে।

কবি পুনঃ বলছেন :

"মজদহ্ ওয়াসল তু কো কজ সর জান বরখেজম।
তায়ের কুদসম ওয়া অজ দাম জহান বরখেজম।"

এর অর্থ—তোমার সঙ্গে মিলনের শুভ সংবাদ কোথায়, যাতে আমি উঠব? অর্থাৎ প্রাণের চিন্তা দূর করব। আমি পবিত্র পাখী এবং জগতের জাল হতে উড়ে উঠব।

এখন খৃষ্টান প্রেমধর্মের সাধনার কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করব। প্রাচীন কালের অর্থাৎ প্রথম যুগের খৃষ্টানদের শারীরিক কঠোরতা অতি প্রসিদ্ধ ছিল। খৃষ্টান সাধুরা ভীষণ কঠোরতা দ্বারা ঈশ্বর প্রাপ্তির চেষ্টা করতেন। মিশর দেশই এই কঠোর ব্রতীদের প্রধান আড্ডা ছিল।

কিন্তু ইউরোপের মধ্যযুগে আর এক প্রকারের সাধকশ্রেণী উত্থিত হলেন। এদের Mystic বা অতীন্দ্রিয়বাদী বলা হত। এই শতাব্দীর প্রারম্ভেও এই প্রকার সাধক আবির্ভূত হয়েছিলেন। এঁরা সকলেই গরীব শ্রেণীর লোক। এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট নামশালী ছিলেন জার্মানীর Master Eckhart। এঁদের মধ্যে অনেকেই স্ত্রীলোক ছিলেন। ইহাদের অনেকে নিজেদের সাধনার অভিজ্ঞতা বিবৃত করে গেছেন। সেজন্য এই খৃষ্টান অতীন্দ্রিয়বাদী সাধকদের সাধনা হতে আমরা অতীন্দ্রিয়বাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা বুঝতে পারি। বর্তমানের বৈজ্ঞানিকমহলে এই নিয়ে অনেক মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা হচ্ছে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

(১) লেখকের 'ভারতীয় সমাজপদ্ধতি', ৩য় খণ্ড, দ্রষ্টব্য।

সভ্যতার ইতিহাসে সহজাত প্রবৃত্তির স্থান

অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য

আদিসভ্যতার যুগ হইতে আজ পর্যন্ত মানবের কৃষ্টিগত অভিযান বিভিন্ন স্তর ভেদ করিয়া ক্রম-পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। স্মরণাতীত যুগের অসভ্য মানুষ আর বিকট সভ্যতার পূজারী মানুষের মধ্যে কি বিপুল ব্যবধান! কিন্তু এই ব্যবধানটুকুর মধ্যে যোগসূত্র রচনা করিয়াছে কে?

দেখা যায় যে, মানুষ তাহার সহজাত প্রবৃত্তিকে ঘুরে ঠেলিয়া কোনদিনই চলিতে পারে না। কতক-গুলি প্রবৃত্তি বহু আবর্তনের ফলে ক্রমে সংস্কারের পর্যায়ে উপনীত হয় এবং মানবজীবনকে নেপথ্য হইতে নিয়ন্ত্রিত করে। তাই এই প্রবৃত্তিগুলি বরাবরই রহিয়া যায়, কেবল রুচির পরিবর্তন ঘটে। মানুষের প্রাণশক্তি নানা খাতে বিভিন্ন ধারায় বারংবার পথ খুঁজিতে থাকে। তাই সেই বিগতদিনের ইতিহাসের আলোচনার প্রয়োজন।

সেই স্মরণাতীত যুগে মানুষ যখন প্রথমে জীবন-যাত্রা সুরু করিল তখন মানুষের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি ছিল সর্বাপেক্ষা প্রবল। তারপর একে একে এই আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়া বহু সহজাত প্রবৃত্তি সভ্যতার ইতিহাস রচনা করিয়া চলিয়াছে। প্রবৃত্তিগুলির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি হৃদয়াবেগও যেন অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত দেখা যায়। তাই সেগুলির যথাযথ বিন্যাসের প্রয়োজন:

	প্রবৃত্তি	আবেগ		প্রবৃত্তি	আবেগ
(১)	পলায়ন	ভীতি	(৮)	আত্মসমর্পণ	হীনতা বোধ
(২)	যুদ্ধ	ক্রোধ	(৯)	আত্মপ্রকটতা	গরিমাবোধ
(৩)	বিমুখতা	বিরক্তি	(১০)	সঙ্গনিপ্সা	নির্জনতাবোধ
(৪)	বাৎসল্য	সুকুমার বৃত্তি	(১১)	আহার্যান্বেষণ	ক্ষুধা
(৫)	আবেগন	কষ্ট	(১২)	সঞ্চয়	অধিকার
(৬)	স্ত্রীসঙ্গ	লালসা	(১৩)	নির্মাণ	সৃজনপ্রিয়তা
(৭)	কৌতূহল	বিস্ময়	(১৪)	বিক্রম	আনন্দবোধ

আরও কতকগুলি প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে এতই প্রকট যে, তাহাদের মূলে বিশেষ কোন আবেগ না থাকিলেও তাহাদিগকে সহজাত প্রবৃত্তির নিকট স্থান দেওয়া চলে।

মানুষের মন একটি জটিল গ্রন্থিবিশেষ। ইহা বহুবিধ সহজাত ও জটিল প্রবৃত্তির সমন্বয়।

এখন দেখা যাউক সভ্যতার ক্রমপরিণতির পথে এই প্রবৃত্তিগুলি কিভাবে ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। প্রথম মানুষ ছিল আত্মকেন্দ্রিক, তাই—তখন জীবনের গতি প্রতিকূল পরিবেশে অনবরত ব্যাহত হইতেছিল। কি জড়প্রকৃতি, কি জীবজন্তু সকলেই যেন তাহার জীবনযাপনকে ব্যাহত করিতে চায়।

তাই কিছুদিন ধরিয়া সে অসহায়ের ন্যায় বিহ্বল হইয়া পড়িল—কিন্তু বুভুক্ষা তাহার অন্তরে দুর্নিবার গতি সঞ্চার করিল—তাই সে বন হইতে বনে—পর্বত হইতে পর্বতে, পথে ও প্রান্তরে হৃদয়ের ক্ষুধা লইয়া উন্মাদের ন্যায় ছুটিতে লাগিল। ক্ষুধার তাড়নায় আহার্যান্বেষণের প্রবৃত্তি এই বুভুক্ষা মিটাইবার পথে সৃষ্টি করিল অগণিত বাধা ও বিপত্তি। জীবনের বন্ধুর পথে বহু প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে সুরু হইল তাহার কঠোর সংগ্রাম ও নিরন্তর হানাহানি। তাহার নয়নে দেখা দিল ক্রোধের বহ্নিশিখা ও হৃদয়ে জাগা

বাঁধিল সংগ্রামের প্রবৃত্তি। কিন্তু যতই সে অগ্রসর হইতে থাকে ততই তাহার মনে জাগে বিস্ময় ও ভীতি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটায়, পারিপার্শ্বিক শ্বাপদের গর্জনে তাহার হৃদয় দুরু দুরু করিয়া দুলিয়া উঠিল। এ ভীতির অন্তরালে উঁকি দিল এক দুর্নিবার কৌতূহল ও অজানা রাজ্যের প্রতি ঔৎসুক্য। চারিদিক যেন তাহার কাছে নিতান্তই অপরিচিত —সে যেন একেবারেই নিঃসঙ্গ। এই নিঃসঙ্গবোধের প্রবৃত্তি যতই প্রবল হইতে লাগিল ততই মানুষের সঙ্গলিপ্সা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এইবার সে যাযাবর-জীবনের অবসান করিয়া সংঘবদ্ধভাবে ঘর বাঁধিবার স্বপ্ন দেখিল। জীবন-নিয়ন্ত্রণ ও শৃংখলার পথে অনেকখানি অগ্রগতি ঘটিল সত্য—কিন্তু অনেক গরমিলও রহিয়া গেল। একত্রে বাস করিয়া তাহার প্রয়োজনবোধ ক্রমশঃই বাড়িতে থাকিল—তাই ক্রমশঃ প্রস্তর-গুহা হইতে ঘর নির্মাণ ও অস্ত্র প্রস্তুত ইত্যাদি সুরু হইল। এইবার দেখা গেল যে, প্রয়োজনের তাগিদে সে যে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি অর্জন করিল, সেই প্রবৃত্তির দ্বারা অধিকৃত পাষাণ, বৃক্ষ, চর্ম প্রভৃতি উপাদানের দ্বারা গৃহ ও কুটির নির্মাণে সে সৃজনের আনন্দের আস্বাদন অনুভব করিতে লাগিল।

তাহার পর এই সৃষ্টির আনন্দ ও যৌনলালসার নেশায় বিভোর হইয়া মানুষ রহস্যময়ী নারীর জীবনে পদক্ষেপ সুরু করিল। তাহার মনে হইল জগতের সৃষ্টি-রহস্য কত গভীর, কত রোমাঞ্চকর। কিন্তু জীবনাহরণে তাহার এই নূতনতম প্রয়াস দিল তাহাকে সুখস্বপ্ন। নারীকে লইয়া দেখা দিল এক বিরাট অভিযান ও আত্মশক্তি প্রকাশের দুর্দান্ত প্রয়াস। কাহারও আত্মশক্তি নানা প্রচেষ্টার ফলে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং কাহারও মনে জাগিল পরাজয়জনিত নৈরাশ্যের গ্লানি। জীবনের এই জয়পরাজয়ে কোলাহল বাড়িয়াই চলিল—ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবার-জীবনের প্রতিষ্ঠা। এক একজন ব্যক্তি এক বা ততোধিক নারীর লালন পালন বা ভোগ উপভোগের ভার গ্রহণ করিল।

তারপর নব নব প্রভাতে নব নব অতিথি মন-ভোলানো চপলতা ও অপার্থিব রূপরাশি লইয়া তাহাদের গৃহকোণে পদার্পণ করিতে লাগিল। নব নব শিশুর আবির্ভাবে নরনারীর চিত্ত পরমতৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। ইহাদের কেন্দ্র করিয়া তাহারা প্রকৃত প্রেমের প্রতিষ্ঠা করিল। যৌনক্ষুধার পরিবর্তে উঁকি দিল বাৎসল্য, স্নেহ এবং হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিনিচয়। এইরূপে উগ্র লালসার স্থান অধিকার করিয়া লইল স্নিগ্ধ প্রীতি ও অপার স্নেহ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই প্রীতি ও বাৎসল্যই পারিবারিক জীবনের ইঙ্গিত দিল ও সভ্যতর সমাজের পটভূমিকা রচনা করিল।

২

সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয় যে, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিনিচয় যতই উন্মেষের পথ খুঁজিয়া পাইল—পারস্পরিক সংঘাতের ফলে ইহারা যতই সংহত হইতে লাগিল ততই সভ্যতার পথে মানুষের অগ্রগতি ঘটিতে লাগিল।

সভ্যতার সংজ্ঞা লইয়া আজ বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু যে কয়েকটি মূল উপাদানকে বাদ দিলে সভ্যতার তাৎপর্য থাকে না তাহাদের উল্লেখ করিতেছি। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, 'সভা' বা 'সমাজ' শব্দ হইতে 'সভ্য' বা 'সভ্যতা' কথাটির সৃষ্টি হইয়াছে ; অতএব যাহা মানব-সমাজকে কল্যাণ ও অগ্রগতি অর্পণ করে তাহাকে সভ্যতা বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না।

গতিই সমাজের প্রাণ। প্রত্যেকটি সমাজের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আজ যে সব প্রতিষ্ঠান মানব কল্যাণের জন্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মূলে আছে সমাজের আবর্তন ও মানব প্রবৃত্তির তাড়না। এই মানব-প্রবৃত্তি যতই মার্জিত ও সংহত আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে ততই

সমাজের মঙ্গল সাধিত হইতেছে। কিন্তু এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে যে, মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলি চিরতরে নির্বাসিত হইয়াছে ও কতকগুলি উন্নত প্রবৃত্তি সেই স্থান দখল করিয়াছে। প্রবৃত্তিগুলির মূলতঃ কোন পরিবর্তন হইতেছে না, কেবল বাহিরের রূপের বিবর্তন ঘটিতেছে।

তাই জীবনের পটভূমি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনবোধ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলে পারিবারিক জীবনের সুখ-সাচ্ছন্দ্যই মানুষের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া অনুমিত হইল না। সে গড়িতে চাহিল নানা প্রকার প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত জীবনে যাহা অতৃপ্ত, যাহা অপূর্ণ, যাহা দুঃখসূচক—সর্বমানবের জন্য সে তাহা অনুভব করিল। ফলে নানারূপ প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইল।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান—(১) পরিবার (২) সাধারণ ক্লাব (৩) নানাবিধ আনন্দ-নিকেতন (৪) পল্লীগঠন-কেন্দ্র (৫) মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ইত্যাদি (৬) হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় (৭) জনসেবাসমিতি (৮) শিশুমঙ্গল ও নারীকল্যাণ সমিতি (৯) ডাকঘর (১০) রেল (১১) আদালত (১২) ব্যাঙ্ক ও ঋণসালিসী বোর্ড।

প্রতিষ্ঠানগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে তাহার নিজের ও সম্প্রদায়ের সকল প্রকার সুখসুবিধা, শান্তি ও সাচ্ছন্দ্যের ঐকান্তিক কামনাই তাহাকে এই সব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে প্রণোদিত করিল। কিন্তু ক্রমশঃই ইহা অনুভূত হইল যে, বাহিরের সুখসাচ্ছন্দ্য ও শান্তিই মানুষের মধ্যে স্থায়ী কল্যাণ আনিতে পারে না:—ইহার জন্য চাই অন্তরের জ্ঞানোন্মেষ—চাই শিক্ষা। তাই পরিবারের মধ্যেই জনক জননী বা গৃহশিক্ষক প্রথমতঃ তাহাদিগের পুত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে চাহিল। কিন্তু তাহার দ্বারা শিক্ষার ব্যাপক সমস্যার সমাধান হইল না। ইহার পূর্ণ সমাধানকল্পে জন্ম নিল বিভিন্ন শিক্ষায়তন। যথা—সাধারণ বিদ্যালয় ও নানারূপ কার্যকরী বিদ্যালয়, শরীরচর্চা কেন্দ্র ইত্যাদি।

কিন্তু এইখানেই মানুষের প্রয়োজন মিটিল না। শিক্ষার আলোকে অন্তরের অজ্ঞান ও অহমিকা যতই ক্ষীণ হইতে থাকিল ততই সে বিপুল ধরণীর ও নিখিল বিশ্বের অন্তরালে এক অলক্ষ্য সত্তা উপলব্ধি করিতে লাগিল। সে অনুভব করিল যে, সমগ্র জীবনকে ঘেরিয়া এক বিরাট শক্তি জীবের সমগ্র গতিবিধি ও ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সেখানে মানুষ যে অসহায় ও নিরুপায় এই মনোভাবের ফলেই রূপ নিল আত্মসমর্পণের প্রবৃত্তি ও সেই বিপুল শক্তির নিকট নতিস্বীকার। ইহাই যে ধর্মের পটভূমিকা রচনা করিয়া মানবসমাজকে সেই অলক্ষ্য শক্তির আরাধনা করিতে প্রণোদিত করিল, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই। বেদনামুখর জীবনে এই নূতন অধ্যায়ের প্রবর্তনের দ্বারা মানুষ শান্তি ও মানসিক শক্তি আহরণের জন্য আকুল হইয়া উঠিল।

প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দেখা দিল বিভিন্ন ধর্মকেন্দ্র ও ধর্মপ্রতিষ্ঠান। কতশত মন্দির, মঠ, মসজিদ, গির্জা নির্মিত হইল; আর মানবসেবার দ্বারা ঈশ্বরের তুষ্টি-সাধনের জন্য গড়িয়া উঠিল অগণিত সেবাসংঘ, মিশন, ধর্মশালা ও সাহায্য-কেন্দ্র।

* * *

জীবনে আনন্দ ও উপভোগের কামনা তাহার মনের স্বাভাবিক অঙ্গ। তাই শিক্ষা ও ধর্মের প্রভাবকে উপেক্ষা করিয়া যেন তাহার এই আদিম প্রবৃত্তিগুলি বারবার পথ খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু তখন সমাজের জন্ম হইয়াছে। তাই যথাযথভাবে ইহাদের প্রকাশ ভিন্ন মানুষ এই প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার পথে নিরন্তর বাধা পাইতে লাগিল। সামাজিক অনুশাসন, মানবত্বের বিধান বিপুল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল।

ফলে মানুষের অতৃপ্ত কামনা-বাসনা, লালসা ও

কৌতূহলের প্রবৃত্তি ক্রমশঃ সমাজের অনুমোদিত সরণি বাহিয়া সাহিত্য, শিল্প, কলা ও অভিনয়ের মারফৎ আত্মপ্রকাশ করিতে থাকিল। অমার্জিত বাসনাকে সমাজবিধানের উত্তাপে গলাইয়া সে তাহা হইতে গড়িয়া তুলিল এক অপরূপ মূর্ত্তি।

কামনাবাসনার তরঙ্গ-চঞ্চল হৃদয়-যমুনার উপকূলে জন্ম নিল এক অনবদ্য সৃষ্টি। সাহিত্য, কলা ও শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের যে কল্পনার সৌধ সৃষ্ট হইল তাহা তাহার এই সুপ্ত প্রবৃত্তির নীরব সাক্ষ্য দিতেছে।

সভ্যতার পথে মানুষের এই যে অভিযান বৈচিত্র্যময় স্তর ভেদ করিয়া ক্রমপরিণতি লাভ করিতেছে, বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহার মূলে আছে বিভিন্ন প্রকৃতির আলোড়ন ও কঠোর ভাবসংঘাত। স্মরণাতীত যুগের সেই আদিম মানবের নগ্নরূপ হইতে আজ বিবর্তনের মধ্য দিয়া যে উন্নত স্তরে মানব উপনীত হইয়াছে, ইহা হইতে হৃদয় আশা ও আশ্বাসে ভরিয়া ওঠে। মনে হয় যে একদিন সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে এমনি করিয়াই মাটির পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য নামিয়া আসিবে—হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীতে অখণ্ড অনাবিল শান্তি বিরাজ করিবে। সেই মহালগ্নের, সেই মাহেন্দ্রক্ষণের সূচনার প্রতীক্ষা সার্থক হউক।

প্রাচীন বাংলা কাব্যে ভণিতা

শ্রীসন্তোষকুমার কুণ্ডু

বাংলা কবিদের ইতিহাস নেই, তাঁদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানাও যায় না সেজন্যে। যেটুকু জানা যায়, তা কাব্যান্তে কবির আত্মপরিচয় বা ভণিতা থেকে। ভণিতার মধ্যে কবিরা বেঁচে থাকার প্রয়াস পেতেন। এমন কি একজন আধুনিক কবিও এ প্রথায় আত্মপরিচয় রেখে গেছেন :

"স্বপ্ন মঙ্গলের কথা অমৃত সমান
গৌড়ানন্দ কবি ভণে শুনে পুণ্যবান॥"

[হিং টিং ছট]

রামায়ণ ও মহাভারতের পাঠকদের কাছে কাশীরামদাস ও কৃত্তিবাস পণ্ডিত সুপরিচিত। আলোচ্য প্রবন্ধে ভণিতা ব্যবহারের বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা ক'রবো। ভণিতা পাঠকালে ব্যক্তি, সমাজ ও যুগপ্রবৃত্তি প্রকট হ'য়ে পড়ে। আমি এখানে মুদ্রিত পুস্তকের ভণিতা ব্যবহার ও আলোচনা করছি না। কয়েকটি পুথির ভণিতাই আমার প্রধান অবলম্বন।

কতকগুলি ভণিতায় আত্মজীবনী প্রকাশের ইচ্ছা সমধিক। পিতামাতার নাম ছাড়াও গ্রাম ও দেশের নাম দিতেন কবিরা। এ সম্পর্কে কৃত্তিবাসের আত্মজীবনীর অংশ-বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন :

"পিতা বনমালি মাতা মেনকার উদরে।
জন্ম লভিলা কৃত্তিবাস ছয় সহোদরে॥
বলভদ্র চতুর্থ্যুগ অনন্ত ভাস্কর।
নিত্যানন্দ কৃত্তিবাস ছয় সহোদর॥
পঞ্চ ভাই পণ্ডিত কৃত্তিবাস গুণশালি।
অনেক শাস্ত্র পড়িয়া রচে শ্রীরামপাঁচালী॥
শুনিতে অমৃত যার লোকেত প্রকাশ।
ফুলিয়াতে বৈসেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥"

[রামায়ণ আদিকাণ্ড। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পুথি নং ১২]

আর একজন কবি কাব্যের অন্তে নিজের বাড়ী, পরগণা, থানা, সাল-তারিখ সব দিয়েছেন ; লোকে

পাছে বুঝতে ভুল করে সেজন্যে সেকালের বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এই সমস্ত কাব্যের সাধারণ মূল্য ছাড়াও ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। পুথিটি বীরভূমে সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কিত। ভণিতা হোল :

"কাএস্ত কোলে জন্ম মোর রাইকৃষ্ণ দাস।
কুলকুড়ি গ্রামে ঘোর হয় জে নিবাস॥
জেলা বীরভূম তাহে লোনি পরগণা।
লাউরাম তাহে লাগলের থানা॥
১২৬২ সাল এই গোলমাল বড় ভাবনা মনে।
কুলকুড়ি লোট হয় ২০ শ্রাবণে॥"

[ব. সা. প., পুথি নং ২৬।]

আর একজন গ্রন্থকার নিজের গ্রামকে সর্বাগ্রে স্থান দিতে চান। বীরভূমের অন্তর্গত পাড়ই গ্রামের কবি মাধবেন্দ্র তাঁর 'ভাগবতামৃত'র ভণিতায় বলেছেন :

"ভণে দ্বিজ মাধবেন্দ্র পাঁড়এ নিবাস।
ভাগবত ভাষা কৈলা পয়ারে প্রকাশ॥"

[শিবরতন লাইব্রেরী, পুথি নং ১২৮]

পৌরাণিক কাহিনী সম্বলিত কাব্যের কবি ভণিতায় প্রায়শঃই অলৌকিকত্বের অবতারণা করতেন। আরাধ্য দেবতার আশীর্বাদ ভিন্ন কাব্য-রচনা অসম্ভব ছিল। গোবিন্দ মঙ্গলের কবি দ্বিজ কবিচন্দ্র বলেছেন :

"দ্বিজ কবিচন্দ্রে কন ব্যাসের আদেশে।
স্বপ্নে যারে কৈলা কৃপা ব্রাহ্মণের বেশে॥"

[শিবরতন লাইব্রেরী, পুথি নং ৫৭]

এইসব কবিরা কাব্যের উৎপত্তি সম্পর্কে যেমন অলৌকিকত্বের অবতারণা করেছেন, ফলশ্রুতিতেও কম যান নি। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কিছুই বাদ দেননি। এ ধরণের কয়েকটি ভণিতা দেওয়া হোল :

"শ্রবণে পরম সুখ পাপের বিনাশ।
আশ্চর্য্য পর্ব্বের কথা কহে কাশীদাস॥"

[মহাভারত,আশ্চর্য পর্ব। শি. র. লা. পুথি নং ৫৯]

"দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় পালা হৈল সায়।
ধন পুত্র লক্ষ্মী হএ জেজন গাও আএ॥"

[মাতাকর্ণ। সা. প., পুথি ৯৪]

চট্টগ্রামে প্রাপ্ত এক মনসাপুথির কবি ভূতের উপদ্রব কমাবার উপায় নির্ধারণ করেছেন :

"ভণে গুণানন্দ সেনে কাহির বড়াই।
ভূত পুজা খওাইব খাবাইয়া গাই॥"

[সা. প. পুথি, নং ১৫৩]

কোন কবি কেবল নিজের নাম নিয়েই সন্তুষ্ট হননি। কোন্ প্রদেশের লোক তাও উল্লেখ করেছেন। সাবল নামক একজন উৎকল দেশবাসী কবি বাংলা ভাষায় 'বৃহদ্ বিরাট' গ্রন্থ রচনা করেন। ভণিতায় তিনি 'উৎকলের' কথা উল্লেখ করেছেন :

"শারদায় পাদপদ্ম করিলা স্মরণ।
রচিল সাবল কবি উৎকল ব্রাহ্মণ॥"

[শিবরতন লাইব্রেরী, পুথি নং ১২৮]

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর বাংলাদেশে ভক্তির ঢেউ খেলে যায়। প্রেমের বন্যায় জাতি-কুল-মান কোথায় ভেসে গেল। 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা'-র আদর্শে সকলেই অনুপ্রাণিত হন। বিশেষ করে বিদগ্ধজনের অন্তরে ভক্তির স্রোত অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত হ'তে থাকলো। এই সময়কার সব কবিরা নিজেদের দৈন্য প্রকটরূপে প্রকাশ করেছেন। কেবল বৈষ্ণব কবিরাই নন— কবিমাত্রেই সাধারণভাবে এই ভাব বজায় রেখে-ছিলেন। কয়েকটি ভণিতার উল্লেখ করা যাক্ :

"শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্মে করি আশ।
নারদসংবাদ কথা কহে কৃষ্ণদাস॥"

[নারদসংবাদ। সা. প., পুথি নং ৭৪]

কেবল হিন্দু কবিরাই যে মহাপ্রভুর ভাবে ভাবিত হয়ে কাব্য রচনা করেছেন, তা নয় ; অনেক মুসলমান কবিও ভণিতায় নিজেদের দীনতা প্রকাশ করেছেন। এগুলি যে সে যুগের বৈশিষ্ট্য সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সমস্ত কাব্যজগতের উপর বৈষ্ণব প্রভাব সূচিত করে। কবি 'নছরোল্লাখান' 'জঙ্গনামা' অর্থাৎ একটি যুদ্ধকাহিনী রচনান্তে লিখেছেন :

"হীন পদ পাইকা মস্তকেত বান্ধিয়া।
হীন নছরোল্লা করে পাঞ্চালী রচিয়া॥"

[সা. প., পুথি নং ৫৩]

আলাওল বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত কবি। তিনিও ভণিতায় বৈষ্ণবোচিত হীনতা দেখিয়েছেন। তিনি শেষ বয়সে রোসাঙ্গরাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মার অমাত্য সৈয়দ ছোলেমানের অনুরোধে 'ওইফা' নামক একটি কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের ভণিতায় কবি বলেছেন:

"তাকে বলি সাধু ব্যক্তি শেষে রহে যার কীর্তি,
তার মৃত্যু জীবন সমান।
হীন আলাওল ভাণ শ্রীযুত ছোলেমান
পুণ্যাকৃতি রসের নিধান॥

[সা. প., পুথি নং ৪৩]

কেবল আলাওয়াল নয়, অনেক মুসলমান কবির কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব সুপরিস্ফুট। কবি নালির মহম্মদ তাঁর 'রাগমালা' গ্রন্থের ভণিতায় রাধাকৃষ্ণ ভজনার আশা ব্যক্ত করেছেন:

"শুনিয়া বাঁশির তান, ত্যজে মানীর মান
প্রতিদিন নিত্য তথা যায়।
কহে নালির মহম্মদে ভজ রাধেশ্যাম পদে
বিলম্ব করিতে না যুয়ায়।"

[আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংগৃহীত পুথি নং ২]

গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের আমলে বাংলাভাষা সংস্কৃতির কদর বাড়ে। তাঁর সভাসদ্‌দের মধ্যে কয়েকজন কবি ছিলেন। যশোরাজখান উপাধির অন্তরালে একজন কবি হোসেন শাহের দরবারে থেকে কাব্য রচনা করতেন। তাঁর নামাঙ্কিত একটি মাত্র পদ পাওয়া গেছে। তিনি ভণিতায় অন্নদাতা হোসেন সাহের গুণকীর্তন করেছেন।

"শ্রীযুত হসন জগত ভূষণ
সোই ইহ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগপুরন্দর
ভনে জয়রাজখান॥

[রসমঞ্জরী। ৩১ পত্র। সা. প., পুথি নং ১২৯]

কতকগুলি ভণিতায় লেখকের গুণকর্ম প্রকাশ পায়। জনৈক কেরাণী চট্টগ্রাম প্রদেশের এক মহাভূতের ঝড়ের বর্ণনাসূচক এক কাব্য রচনা করেন। কাব্যটির নাম "বাত্যাবর্ত বিবরণ"। কাব্যের ভণিতায় কিন্তু কবি নিজ বৃত্তির উল্লেখ করতে কার্পণ্য করেন নি:

"নরোত্তম কেরাণী বোলে এই বিবরণ।
শাকের নিয়ম যত কহিল বিধান॥"

[সা. প., পুথি নং ১০৫]

চট্টগ্রামের বিখ্যাত চৌধুরী বংশীয় ফৌজদারের গুণলিপি 'ফৌজদার কীর্তিগাথা'র কবি শ্রীরামতনু কেবল লিখেই নিজের কর্তব্যের ইতি করেন নি, পাঠকের নামোল্লেখও করেছেন ভণিতায়:

"শ্রীরামতনু কহে আশীর্বাদ করি।
কবিতা পূর্ণিত শ্রীযুত চৌধুরীর বাড়ী॥
ইসানচন্দ্র বাবাজিরে পঠন পরাইতে।
খোসনামি প্রকাশি জথ ভিহিত্ত পাইতে॥"

[সা. প., পুথি নং ১৬০]

প্রাচীনকালে ধনীরা কবি পুষতেন। কেবল কবিতা লেখার জন্যে চাকরী দিতেন কবিদের। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এমন অনেক চাকুরিয়া কবির দেখা মেলে। অধিকাংশ কবিই রাজানুগ্রহের কথা বলেছেন,—কিন্তু এমন দু'একজন কবি ছিলেন, যাঁরা কবিতা লেখাই যে তাঁর চাকরী, একথা কাব্যে ব্যক্ত করেছেন। গোকুলচন্দ্র বৈদ্যের পুত্র নিত্যানন্দ কোন ধনীর বাড়ীতে কবিতা লেখার চাকরী পেয়েছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্য 'নীলার বারমাস্যা'। এ এক প্রাগ্য নীলা—লৌকিক কাব্যের গ্রাম্যনায়িকা। কবি ভণিতায় কাব্যসমাপ্তির পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন:

"শুনহ সকল বাপু কহি সাবহিতে।
বারমাস লিখন আমি প্রথম চাকরিতে॥
প্রথম চাকরিতে আমি বারমাস লিখন।
অশুদ্ধ থাকিলে শুদ্ধ করিতে যোগন॥
সমাপ্ত করি বারমাস নিবেদন করি।
সন বারশ ছএ ষষ্টি যাএ বরি॥

"চৈত্র মাসের চৈত্র দিনে একেবারে হইলো।
মৈত্তানের পরে মাত্র এক প্রহর ছিল।
আমার নাম নিত্যানন্দ গোকুলচন্দ্র বৈদ্যের সুত।
পড়িতে পারিলে বারমাস বুদ্ধিএ মজবুত।"

[সা. প., পুথি নং ১৮৪]

বাংলার দ্বিতীয় গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করলেন। জমিদারির মারপ্যাচ সাধারণের বুদ্ধির অগম্য ছিল। সাধারণের বোধগম্য করার জন্য দ্বিজ রামানন্দ জটিল ভূপরিমাণ বিদ্যাকে কাব্যে গ্রথিত করলেন। কাব্যের নাম 'জমাবন্দীর বচন'। ভণিতাও হোল সেই ধরণের:

"জমিদারির তোলাএ তোলা জানিবে নিশ্চয়।
পয়ার রচিয়া দ্বিজ রামানন্দ কএ।"

[সা. প., পুথি নং ১৭৮]

বাংলাদেশে যেমন অসংখ্য পুথি পাওয়া যায়—তাদের বৈচিত্র্যও তেমনি। ভণিতার সম্যক্ আলোচনায়—ইতিহাস, সমাজনীতি, কাব্যরীতি, কবিমানস, যুগপ্রকৃতি ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতারা এদিকে দৃষ্টি দেবেন। এই সব ভণিতার মধ্যে অনেক স্থানে রাজনৈতিক গুপ্ত ইতিহাস প্রোথিত আছে। রহস্যের বন্ধনমুক্ত করতে পারলে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

সংঘ-বার্তা

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব: গত ৯ই মাঘ ১৩৬৩ (ইং ২২শে জানুয়ারী, ১৯৫৭) মঙ্গলবার কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের পঞ্চনবতিতম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি ও পূর্বাহ্নে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রসাদ-বিতরণ আরম্ভ হয় সাড়ে এগার ঘটিকা হইতে। এইদিন প্রায় এক হাজার ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বেলা আড়াই ঘটিকা হইতে সংগীতাচার্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বিবেকানন্দ প্রশস্তি গান ও সারদা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ স্তবস্তুতি করিয়াছিল। তিন ঘটিকা হইতে সংগীতবিশারদ শ্রীধীরেশ্বর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ভজন ও রামনাম কীর্তন হইয়াছিল। সাড়ে চারটা হইতে কথকশিরোমণি শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে কথকতা করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময়ে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের লাইব্রেরী হলে ও প্রাঙ্গণে একটী জনসভা হইয়াছিল। মাননীয় ডক্টর শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংগীত-বিশারদ শ্রীধীরেশ্বর চক্রবর্তী উদ্বোধন সংগীত গাহিবার পরে শ্রীমৎ স্বামী দুর্গানন্দজী শান্তিবাচন করিয়াছিলেন। ডাঃ কালিদাস নাগ, অধ্যাপক সমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমুদবন্ধু সেন প্রভৃতি বিশিষ্ট বক্তাগণ স্বামিজীর অলোকসামান্য চরিত্রের আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন। সভাপতি ডক্টর দাশগুপ্ত মহাশয় মনোজ্ঞ ভাষণে শ্রোতাদের তৃপ্তিদান করেন। সভান্তে কয়েকজন বিশিষ্ট গায়ক শ্যামা-সংগীতাদি করেন। প্রসিদ্ধ বংশীবাদক শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ শীল কর্তৃক বংশীবাদন হইবার পর অধিক রাত্রে উৎসব সমাপ্ত হয়।

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা-দিবস পালন: গত ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫৭ (১২ই মাঘ, ১৩৬৩) শনিবার প্রাতে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মঠাধ্যক্ষ

শ্রীমৎ স্বামী সদাত্মানন্দজী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ছাত্র ও শিক্ষকগণ 'বন্দেমাতরম্' ও 'জয় হিন্দ্' ধ্বনি দ্বারা পতাকার প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করেন। তৎপরে তাঁহারা জাতীয় পতাকাসহ জাতীয় সংগীত গাহিতে গাহিতে এক সুশৃঙ্খল সুদীর্ঘ শোভাযাত্রায় নগরীর কয়েকটী পথ পরিক্রমান্তে বিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন করেন বেলা ১॥ ঘটিকায়। বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে শোভাযাত্রীগণকে ও দর্শকমণ্ডলীকে 'মিষ্টি মুখ' করান হয়।

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা : ২২শে মাঘ ১৩৬৩ (ইং ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭) মঙ্গলবার কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের আনন্দোৎসাহের মধ্যে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সংগীতাচার্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক সরস্বতী-বন্দনা-গান, সুরসহযোগে 'সারদা-স্তোত্র' আবৃত্তি এবং শত শত ভক্তের সমস্বরে মন্ত্রোচ্চারণসহ পুষ্পাঞ্জলি দানের সময় অতি মনোরম আনন্দময় পরিবেশের অবতারণা হইয়াছিল। দেবীর সন্ধ্যারাত্রিকের পর সাতটা হইতে প্রায় দশটা পর্যন্ত ভরতবাগান বালিকা সম্মিলনীর সভ্যবৃন্দ "ভক্ত তুলসীদাস" নাটক অভিনয় করেন। নাটকের ভক্তি-ভাব, সুরুচি ও কলাকুশলতায় সকলেই আনন্দিত হন। শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা ছয় শতাধিক ছিল।

উক্ত নাটকের সদাশয় অভিনেতাগণ নিজেদের অনেক অসুবিধা স্বীকার করিয়াও দূর দূর স্থান হইতে আসিয়া স্কুলের ছাত্রদের, শিক্ষকদের ও ভক্ত জনসাধারণের মনে যে নির্মল আনন্দ দিলেন, তাহার জন্য স্কুল ও সমিতির কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ধর্মালোচনা : পণ্ডিত শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বৈষ্ণবদর্শনাচার্য সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় সোমবার হইতে শুক্রবার প্রতি সপ্তাহে পাঁচদিন সন্ধ্যা সাতটা হইতে আটটা কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

প্রতি শনিবার বেলা তিনটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত সংগীতবিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তীর পরিচালনায় এখানে শ্রীশ্রীরামনাম-কীর্তন ও বিবিধ ভজন গান হইতেছে।

কথকতা : প্রতি রবিবার সন্ধ্যারতির পরে সংগীতাচার্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত" কথকতা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব : ১৯শে ফাল্গুন ১৩৬৩ (৩রা মার্চ ১৯৫৭) রবিবার শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২২তম শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে ঐদিন পূর্বাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজানুষ্ঠান, ভজন গান, মধ্যাহ্নে প্রসাদ বিতরণ, অপরাহ্নে রামলীলা-গানও কথকতা। সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় ডক্টর সুশীল কুমার দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী জনসভা, রাত্রি আট ঘটিকা হইতে 'কল্পতরু-মিলন-মন্দির'-এর সভ্যগণ কর্তৃক কালীকীর্তন ইত্যাদি।

ভ্রম সংশোধন

বর্তমান সংখ্যায় অনবধানতাহেতু নিম্নোক্ত যে মুদ্রণপ্রমাদ ঘটিয়াছে তাহা সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল :

১ম পৃষ্ঠায়	১৩ পংক্তিতে	'কুড়ল'	স্থলে	'কুড়ুল' হইবে।
৪র্থ „	১৬ „	'নবরূপে"	„	'নররূপে' „
১৪শ „	২৯—৩১ „	'তাঁর সেই দীর্ঘ... মেঘ আকৃতি গর্জনের'	„	'তাঁর সেই দীর্ঘ আকৃতি ...মেঘ গর্জনের'—হইবে।

বিশ্ববাণী

প্রতিষ্ঠাতা : স্বামী অভেদানন্দ

ঊনবিংশতি বর্ষ—দ্বিতীয় সংখ্যা

বার্ষিক মূল্য চারি টাকা চারি আনা

চৈত্র, ১৩৬৩

প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট; কলিকাতা-৬ : ফোন : ৫৫—১৮০৫

সম্পাদক স্বামী সত্যব্রতানন্দ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে ব্রহ্মচারী বসন্তকুমার কর্তৃক প্রকাশিত

এবং ১৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, প্রবর্তী প্রেস হইতে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

বিশ্ববাণী—চৈত্র, ১৩৬৩

সূচীপত্র

	বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
১।	গৃহস্থাশ্রমে কি ভগবান লাভ হয় (শ্রীরামকৃষ্ণবাণী)				৪৯
২।	ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ	...	স্বামী অভেদানন্দ		৪০
৩।	সত্যবাণী (কবিতা)		শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত		৪৪
৪।	আমার অনুভূতি		শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়		৪৫
৫।	ভারত-মানস		শ্রীবালকরাম ভট্টাচার্য		৫৭
৬।	শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণাম (কবিতা)	...	শ্রীযতীশচন্দ্র মিত্র		৬২
৭।	ভারত-পথিক রামমোহন	...	শ্রীভজন গোপাল সান্যাল		৬৩
৮।	সত্যানুভব (কবিতা)	...	শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী	...	৬৭

জামসেদপুর—ব্রাঞ্চ

সদ্য প্রকাশিত!

বাংলা জীবনী-সাহিত্যের বিশিষ্ট কীর্তি

শঙ্করনাথ রায়ের—

ভারতের সাধিক

১ম খণ্ড মূল্য—৫৲ ২য় খণ্ড মূল্য—৫৲

ব্রহ্মপুরুষ ও সাধুসন্তদের চরিত-সঙ্কলন গ্রন্থ। যোগী, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, মরমিয়া প্রভৃতি মহাপুরুষদের লৌকিক ও অলৌকিক জীবনের রসমধুর কাহিনীতে ভরপুর। একাধারে এতে রয়েছে প্রামাণ্য জীবনকথা, অধ্যাত্মরসের প্রস্রবণ, অলৌকিক আখ্যান ও ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান।

- প্রতি খণ্ড স্বয়ংপূর্ণ। প্রত্যেকটিতে সাত-আটটি করে পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত জীবনচরিত রয়েছে, আর রয়েছে সাধুমহাত্মাদের অপরূপ চিত্রাবলী।

পড়বার, বারবার পড়ে সঞ্চয় করে রাখবার ও প্রিয়জনকে উপহার দেবার মত বই। রঙীন সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে মোড়ানো, ছাপা বাঁধাই অনবদ্য।

সাধারণ পাঠাগার ও ব্যক্তিগত গ্রন্থভাণ্ডারের পক্ষে অপরিহার্য চরিত-কোষ গ্রন্থ।

শিবনাথ শাস্ত্রীর—

মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে

স্বনামধন্য মনীষী ও আচার্য্যের—

'মেন্ আই হ্যাভ সীন'-এর সার্থক অনুবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির রেখাচিত্র অপরূপভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রকাশক—রাইটার্স সিণ্ডিকেট, ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
৯।	শ্রীঅরবিন্দের কর্মযোগ ...	শ্রীঅবনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	৬৮
১০।	যাউঁশিলার পথে	শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়	৭১
১১।	অমরা (কবিতা)	শ্রীকল্যাণী মজুমদার	৭৭
১২।	প্রেমধর্ম — দার্শনিক তত্ত্ব	ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত	৭৮
১৩।	তুমি (কবিতা)	শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত	৮৫
১৪।	সৌন্দর্য-বিচার	শ্রীদীরানন্দ ঠাকুর	৮৬
১৫।	চুঁচুড়ার সংগীত-শিল্পী	শ্রীবিপ্রদাস নন্দী	৯০
১৬।	জ্ঞান ও বিজ্ঞান		৯২
১৭।	গ্রন্থ-সমালোচনা		৯৩
১৮।	সংঘবার্তা ...	....	৯৫
১৯।	বিবিধ সংবাদ ...	...	৯৬

ভারতীয় সংস্কৃতি

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

INDIA AND HER PEOPLE নামক

সুবিখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

আমেরিকা যুক্তরাজ্যে সেখানকার খৃষ্টান-মিশনারী-সঙ্ঘ এবং ভারতবিদ্বেষী অন্যান্য সমস্ত দলের ভারতবর্ষ এবং হিন্দুজাতির বিরুদ্ধে মিথ্যা কাহিনী ও কুৎসা প্রচারের সুযোগ্য প্রত্যুত্তর-পূর্ণ বক্তৃতামালা।

'ক্রকলীন ইনিষ্টিটিউড অফ আর্টস এ্যাণ্ড সায়েন্স' প্রতিষ্ঠানে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ প্রদত্ত ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অসংখ্য তথ্যপূর্ণ ও জ্ঞানপ্রদ বক্তৃতাবলী

বাঙলা অনুবাদে—ফুটনোটে এবং পরিশিষ্টে আরও অনেক নূতন তথ্য এবং বক্তব্য বিষয়ের সমর্থক প্রামাণ্য উক্তি ও উদ্ধৃতি সংযোজিত হইয়াছে

ডবল ক্রাউন ষোল পেজী ৩৯৭ পৃষ্ঠা,

মূল্য চারিটাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা-৬

'বিশ্ববাণী'-র নিয়মাবলী

১। 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে। বৎসরের যে কোন সময়ে আপনি গ্রাহক হইতে পারেন। তবে প্রথম বা সপ্তম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

২। ফাল্গুন ১৩৬২, বিশ্ববাণীর ১১শ বর্ষ আরম্ভ। ইহার বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা চারি আনা, প্রতি সংখ্যা আট আনা। ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ—এই ছয় মাসেরই জন্য গ্রাহক হইতে হইলে সডাক দুই টাকা চারি আনা এবং ভাদ্র হইতে মাঘ—এই ছয় মাসেরই জন্য গ্রাহক হইতে হইলে সডাক তিন টাকা লাগিবে। মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

৩। কোন গ্রাহকের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্তিত হইলে তিনি স্থানীয় ডাকঘরে তাহা নির্দেশ দিবেন; বেশীদিনের জন্য হইলে পূর্ববর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে বিশ্ববাণী অফিসে উহা জানাইবেন।

৪। 'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহক মূল্য মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। কোনও মাসের বিশ্ববাণী সেই মাসের ২০ তারিখের মধ্যে না পাইলে সে সংবাদ সেই মাসের ২৪ তারিখ হইতে পরের মাসের তিন তারিখের মধ্যে বিশ্ববাণী অফিসে আসা চাই। নচেৎ ঐ পত্রিকা সরবরাহ করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

৫। 'বিশ্ববাণী'-র জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইবার কালে রচয়িতার নাম-ঠিকানা যেন তাহাতে বেশ স্পষ্টাক্ষরে সন্নিবেশিত থাকে। 'বিশ্ববাণী'তে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হয়। প্রবন্ধাদি হারাইয়া যাইলে বা কোন প্রকারে নষ্ট হইলে আমরা দায়ী থাকি না। প্রবন্ধ স্বল্পায়তনে, ফুলস্কেপ **চার পাতার মধ্যে**, রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘাকার প্রবন্ধ ছাপা অসম্ভব। কোনও লেখা প্রকাশিত করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপেক্ষ। ইহার জন্য সম্পাদক কোনও কৈফিৎ দিতে বাধ্য নহেন।

৬। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৭। কাহারও কোন বিষয় জানিতে হইলে (গ্রাহক হইলে, গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া) সর্বদা **রিপ্লাই কার্ডে** অথবা ডাক-টিকিট সমেত পূর্ণ নাম-ঠিকানা পাঠাইতে হইবে। অন্যথায় উত্তর দেওয়া হয় না।

ডি. রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফটো
২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি-৬
ফোন: ৩৪- ৩৭১১

STUDENTS
.COM

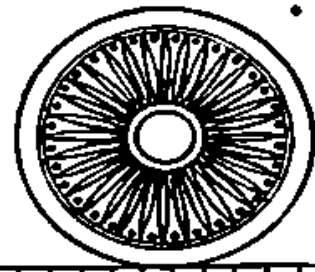

বিশ্ববাণী

উনবিংশতি বর্ষ | চৈত্র—১৩৬৩ | দ্বিতীয় সংখ্যা

॥ গৃহস্থাশ্রমে কি ভগবান লাভ হয় ? ॥

"কেন হবে না ? পাঁকাল মাছের মত থাকো। সে পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁক নাই। আর ঘুস্‌কির মত থাকো। সে ঘরকন্নার সব কাজ করে, কিন্তু মন উপপতির উপর পড়ে থাকে। ঈশ্বরের উপর মন ফেলে রেখে সংসারের কাজ সব কর। কিন্তু বড় কঠিন। আমি ব্রহ্মজ্ঞানীদের বলেছিলুম, 'যে ঘরে আচার তেঁতুল আর জলের জালা সেই ঘরেই বিকারের রোগী! কেমন করে রোগ সারবে ? আচার তেঁতুল মনে করলে মুখে জল সরে। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক আচার তেঁতুলের মত। আর বিষয়তৃষ্ণা সর্ব্বদাই লেগে আছে ; ঐটি জলের জালা। এ তৃষ্ণার শেষ নাই—। বিকারের রোগী বলে, এক জালা জল খাব। বড় কঠিন। সংসারের নানা গোল। এদিকে যাবি, কোঁস্তা ফেলে মারবো ; ওদিকে যাবি, ঝাঁটা ফেলে মারবো ; এদিকে যাবি, জুতো ফেলে মারবো।' আর নির্জ্জন না হলে ভগবান্ চিন্তা হয় না। সোণা গলিয়ে গয়না গড়াবো, তা' যদি গলাবার সময় পাঁচবার ডাকে, তা'হলে সোণা গলানো কেমন ক'রে হয় ? চাল কাঁড়ছো একলা বসে কাঁড়তে হয়। এক একবার চাল হাতে করে তুলে দেখ্‌তে হয়, কেমন সাফ হলো। কাঁড়্‌তে কাঁড়্‌তে যদি পাঁচ বার ডাক্‌বে, ভাল কাঁড়া কেমন করে হয় ?

যদি তীব্র বৈরাগ্য হয়, তাহলে হয়। যা মিথ্যা বলে জানছি, রোক্ করে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ কর।···কি জান, সংসার করলে মনের বাজে খরচ হয়ে পড়ে। এই বাজে খরচ হওয়ার দরুণ মনের যে ক্ষতি হয়,—সে ক্ষতি আবার পূরণ হয়, যদি কেউ সন্ন্যাস করে। বাপ প্রথম জন্ম দেন ; তারপর দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নের সময়। আর একবার জন্ম হয় সন্ন্যাসের সময়।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ

(উত্তরার্ধ)

স্বামী অভেদানন্দ

এর আগেও অতীতে আরও ক'জন শিক্ষাগুরু আবির্ভূত হয়েছেন বিশ্বে। তাঁদের মধ্যে আড়াই হাজার বছর আগে গৌতম বুদ্ধ চরমতম কৃচ্ছ্রসাধন করে গেছেন তাঁর জীবনে। সে কাহিনী আমাদের অজ্ঞাত নয়। তাঁর নির্দিষ্ট পথ ছিল তাঁর কালের উপযোগী। যে পরম সত্যের আবিষ্কার করেছিলেন তিনি, তা তৎকালীন মানুষের প্রতিদিনের জীবন সংগ্রামে নিঃসন্দেহে সহায়তা করেছে। অগণিত মানুষ তাঁর পথকে অনুসরণ করে শান্তি, সুখ তথা মুক্তি লাভ করেছে। গৌতম বুদ্ধ যেমন তাঁর কালের মানব জাতির আধ্যাত্মিক প্রয়োজনকে পূর্ণ করে গেছেন, মানবপুত্র যীশু কিংবা শ্রীচৈতন্যও তেমনি স্থান কাল তথা জনসাধারণের প্রয়োজন অনুযায়ী পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন।

অনুরূপভাবে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও আবির্ভূত হয়েছিলেন বিংশ শতকের বিশ্বের এক বিরাট প্রয়োজনকে পূর্ণ করার জন্য। মানব জাতিকে যুগোপযোগী শিক্ষা দিতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। গৌতম বুদ্ধের মহান ত্যাগ নিঃসন্দেহে বিশ্বে অতুলনীয়। কিন্তু এই ত্যাগ তথা পরিবর্জনেরই এমন আর এক রূপ আছে—যা বিশ্বের অন্য কোন অবতার কিংবা প্রবক্তা নিজ জীবনে সম্ভব করতে সক্ষম হননি। সম্ভবতঃ ঐশ্বর্য কিংবা স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে ত্যাগ করার চেয়েও কঠিন এই বস্তুটি। কথিত আছে দীর্ঘ ছ' বছর চরম সন্ন্যাস এবং কৃচ্ছ্রসাধনের পরও বুদ্ধ দেখতে পেয়েছিলেন যে, তাঁর মন থেকে স্ত্রী-পুত্রের ভাবনা তখনও একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে আশ্চর্য ব্যাপার এই, তিনি কামিনী-কাঞ্চন সম্পূর্ণ ভাবে জয় করেছিলেন, দূরে পালিয়ে গিয়ে নয়—তার মধ্যেই বাস করে। প্রতি মুহূর্তে এসব দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও তাঁর আত্মা এসব পার্থিব বস্তুকে ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে উন্নীত হতে সক্ষম হয়েছিল। এখানেই রামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য।

তিনি এই ঐশ্বর্যের মোহ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন এক অদ্ভুত সাধনা করে। তিনি এক হাতে নিতেন এক মুঠি ধুলো, আর হাতে কোন স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যমুদ্রা। তারপর বারবার বলতে থাকতেন—'টাকা মাটি, মাটি টাকা, টাকা মাটি—।' অর্থাৎ ঐশ্বর্য হচ্ছে ধুলো মাত্র। টাকা ও মাটি উভয়ের এক অভিন্নতা উপলব্ধি করে—তিনি টাকা-কড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিতেন গঙ্গার জলে। তারপর থেকে এই বিশ্বের আর কোন কিছুই মূল্যবান মনে হতো না তাঁর কাছে। বলা বাহুল্য, মানসিক শক্তি দিয়ে কি করে জয় করা যায় বস্তুজগতকে রামকৃষ্ণের এই সাধনা তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তখন থেকে এমন হলো তাঁর যে, তিনি কোন মুদ্রা কিংবা ধাতব বস্তুকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেন না। এসব তাঁর সহ্য হয় না। এমনকি অজ্ঞাতসারেও যদি কখনও কোন ধাতব বস্তুর স্পর্শ লেগে যেত তাঁর হাতে, সঙ্গে সঙ্গে ফুলে উঠতো তাঁর হাতের অঙ্গুলি, শুদ্ধ হয়ে যেত সমস্ত দেহযন্ত্রী। রাত্রিকালে ঘুমের মধ্যেও যদি কোন ধাতু দিয়ে স্পর্শ করা যেত তাঁর দেহ তা হলেও একই ব্যাপার ঘটত সঙ্গে সঙ্গে। এমনি করেই ঐশ্বর্যকে পরিত্যাগ করেছিলেন তিনি। কেন করেছিলেন? কারণ, ঐশ্বর্যের কিংবা ধন-দৌলতের প্রতি আসক্তি হচ্ছে ঈশ্বরোপলব্ধির পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক। আজকের এই বস্তুতান্ত্রিক যুগে মানুষ ধন-দৌলতের প্রতি এমন আসক্ত হয়ে পড়েছে যে, তারা অর্থ তৈরির যন্ত্রে পরিণত হয়ে

গেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাদের অধিকাংশেরই বিশ্বাস—অর্থের অধিকারী হওয়াই হচ্ছে জীবনের চরমতম লক্ষ্য। শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। এজন্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ এই অলৌকিক সাধনা দিয়ে প্রথমেই কাটিয়ে উঠেছিলেন এই কাঞ্চন লোভ। নিরাসক্তি তথা পার্থিব বস্তুর প্রতি আকর্ষণ হীনতায় তিনি এক অতুলনীয় আদর্শ।

মাতৃজাতি—তা তরুণী কিংবা বৃদ্ধা যিনিই হোন না কেন তাঁর কাছে ছিল জগন্মাতার প্রতিমূর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই জয় করেছিলেন—নারীর প্রতি কামনা ও আকর্ষণকেও। তিনি প্রতিটি নারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করতেন সেই পরমা প্রকৃতিকে,—তাদের মাতৃভাবে ভজন করতেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে পালিয়ে যান নি, বরং তাঁর সঙ্গে থেকেই মাতৃরূপে আরাধনা করেছেন তাঁকে। এমনকি মথুরবাবু একবার তাঁকে কোন এক রূপোপজীবিনীর গৃহে নিয়ে যান। রামকৃষ্ণ তাকে দেখে বলে উঠেছিলেন এই অপবিত্র রমণীর রূপেই আজ এসেছেন আমার মা। এ কথা শুনে সেই হতভাগ্যা নারী পড়েছিল তাঁর পুণ্য পদপ্রান্তে। নারীর প্রতি লালসা এবং কামনাকে জয় করার পক্ষে—তাঁদের প্রতি এবম্বিধ আচরণই হচ্ছে নিশ্চিত এবং কার্যকর পন্থা। শ্রীরামকৃষ্ণ এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন আমাদের।

পূর্ববর্তী হিন্দু অবতার, এমনকি দেবাদিদেব মহাদেবেরও পত্নী ছিল, সন্তানাদি ছিল। শ্রীচৈতন্য দুইবার দারপরিগ্রহ করেছিলেন, তবে তাঁর কোন সন্তান ছিল না। আবার শঙ্করাচার্য, যীশুখৃষ্ট প্রমুখ জগদ্গুরুগণ ছিলেন পবিত্রজীবনাচারী, তাঁরা অবিবাহিত ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে বাস করেও শ্রীরামকৃষ্ণ যে অপূর্ব সংযম দেখিয়েছেন তার তুলনা হয় না। বিবাহিত পত্নী হয়েও তাঁর স্ত্রী আজীবন থেকে গেছেন কুমারী।

আজকের, এই পার্থিব লালসা এবং কামনার যুগে নরনারীর মধ্যে আত্মসংযমের নিদর্শন ধারণাতীত। ব্রহ্মচর্য তাদের কাছে প্রায় এক বিস্মৃত কাহিনী মাত্র; অথচ এই যুগেই ভগবান রামকৃষ্ণ এবং তাঁর সাধ্বী পত্নী সারদাদেবী তাঁদের জীবনে বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে গেছেন আজও সম্পূর্ণতঃ আধ্যাত্মিক আদর্শের, আত্মিক মিলনের আদর্শে নরনারীর পরিণয় সম্ভব।

তদুপরি শ্রীরামকৃষ্ণ একজন অসামান্যা নারীকে * নিজ গুরুরূপে স্বীকার করে নিয়ে নারীজাতির প্রতি তাঁর চরম সম্মান প্রদর্শন করে গেছেন। এই মহিলাটি ছিলেন একজন ব্রহ্মচারিণী। তিনি নানা গুণ-বিভূষিতা ছিলেন এবং হিন্দুশাস্ত্রাদিতে রীতিমত বিদুষী ছিলেন। রামকৃষ্ণের বিভিন্ন সাধনার সময় তিনিই সহায়তা করেছেন তাঁকে। তিনিই সর্বপ্রথম জনসাধারণের মনে এই বিশ্বাস জন্মান যে, শ্রীরামকৃষ্ণ উন্মাদ কিংবা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি নন। এই বিশ্বের অধিকর্ত্রীর সঙ্গে যোগ হয়েছে তাঁর, তিনি সিদ্ধপুরুষ। তিনিই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেছিলেন যে, বৃন্দাবনে শ্রীরাধা এবং নবদ্বীপে গৌরাঙ্গপ্রভুর মধ্যে যে ভাব দেখা গিয়েছিল একত্রে—সেই মহাভাব জাগ্রত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরেও। পার্থক্য এই শ্রীরাধা কিংবা শ্রীচৈতন্য সাধনার এই উন্নত মার্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন—অনেক সাধনার অন্তে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ অতি অনায়াসে।

এই ব্রহ্মচারিণী কয়েক বছর দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। এ সময়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বহু যোগাভ্যাস শিক্ষা দিয়েছেন। বিস্ময়কর এই, প্রতিটি সাধনায়ই শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধিলাভ করেছেন অতি অল্পকালের মধ্যে।

অবশ্য দক্ষিণেশ্বরে এই ব্রহ্মচারিণীর আগমনের আগেও রামকৃষ্ণের সাধনার বিরাম ছিল না। বহু পথে সিদ্ধির সন্ধান করেছেন তিনি। প্রথম অবস্থায়

* এই নারীর নাম ভৈরবী যোগেশ্বরী। তাঁর নির্দেশমতই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তান্ত্রিক সাধনা করেছিলেন।

তাঁর একমাত্র বাসনা ছিল—জগন্মাতার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ। এজন্যে কখনও গঙ্গার তীরে পঞ্চবটীতে নীরবে বসে থাকেন তিনি। কখন মাতৃদর্শনের জন্য ছোট ছেলের মত কাঁদেন, আকুতি মিনতি করেন। কখনও মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি যান, উন্মুক্ত মাটিতে শিরাঘাত করেন। যেন মৃত্যুযন্ত্রণা হচ্ছে তাঁর। যতক্ষণ অভীপ্সিত দর্শনলাভ না ঘটেছে ততক্ষণ এই যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি নেই।

একদিন তিনি উন্মত্তের মত ছুটে প্রবেশ করলেন কালী-মন্দিরের অভ্যন্তরে। বার বার কালীর কাছে অনুনয় বিনয় করলেন—তাঁর সম্মুখে প্রকাশিত হওয়ার জন্য। অবশেষে বললেন—'আজও যদি তোমার করুণা না হয়, আজও যদি তুমি তোমার সত্যরূপে প্রকাশিত না হও আমার সম্মুখে, তবে, এখানে—এই মুহূর্তেই জীবননাশ করবো।' এই কথা বলেই তিনি তখুনি মন্দিরগাত্রে বিলম্বিত একখানা কৃপাণ টেনে নিলেন আত্মঘাতী হওয়ার জন্য। কিন্তু এ কি! কৃপাণ খসে পড়ল তাঁর হাত থেকে। অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়লেন মন্দিরের মেঝেতে। দুই গণ্ড বেয়ে দরদর করে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হলো। এবার সত্যই তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছেন জগন্মাতা। তারপর তাঁকে আশীর্বাদ করে আবার বিলীন হয়ে গেছেন—প্রস্তর-মূর্তির মধ্যে। এখন থেকে মাঝে মাঝেই দিন রাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনলাভ করেন তাঁর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি সমাধি-মগ্ন হয়ে থাকেন। উন্মাদের মত আচার আচরণ করেন। কেউ জানে না—কি ঘটে গেছে তাঁর মধ্যে।

সাধনার অন্য এক স্তরে ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের মনে হলো ব্রাহ্মণদের বর্ণশ্রেষ্ঠত্বের ধারণা প্রকৃত ঈশ্বরোপলব্ধির পথে এক মস্ত প্রতিবন্ধক। তখন তিনি চলে যেতেন একজন পতিত ব্যাদ্ধদ্যারের বাড়ীতে। নিজের হাতে, এমনকি তাঁর মাথার দীর্ঘ কেশরাশি দিয়ে তিনি—তার ঘরদোর ঝাঁট দেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন। এমনি করেই এই পরম পুরুষ জয় করেছিলেন—যাবতীয় আত্মাভিমান তথা অহং।

সাধনার আর এক স্তরে এসে মনে হলো তাঁর, এই বিশ্বে নানা ধর্মের নানা মত। প্রত্যেকেই ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য নিজ নিজ পথ নির্দেশ করে গেছেন। তিনি স্থির করলেন—নিজে তাদের প্রত্যেকটি পথ অনুযায়ী সাধনা করে দেখবেন কোন পথে কি ফল লাভ হয়। এই ভেবে সেই ব্রাহ্মণী ব্রহ্মচারিণীর নির্দেশমত তান্ত্রিক শাস্ত্রাদি এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রাদি বর্ণিত বিভিন্ন পথে একের পর এক বিভিন্ন মতানুযায়ী সাধনা চালালেন তিনি। প্রতিবারেই এক একজন বিচক্ষণ সাধক এসে হাজির হলেন তাঁকে যথাযথ নির্দেশ দেওয়ার জন্য। কিন্তু তাঁরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে দেখলেন রামকৃষ্ণ ক' দিনের মধ্যেই সমস্ত কিছু আয়ত্ত করে ফেলেন। অথচ সে স্তরে উত্তীর্ণ হতে তাঁদের এক একজনের কেটে গেছে কত দীর্ঘকাল।

এই সময়ে বিখ্যাত অদ্বৈতবাদী তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নির্দেশমত অদ্বৈতবেদান্ত মতে সাধনা সুরু করলেন। তিন দিনের মধ্যেই নির্বিকল্প সমাধি লাভ করলেন তিনি। নির্বিকল্প সমাধির অর্থ —সমস্ত বাহ্য কল্পনা বা ইন্দ্রিয়-চৈতন্যের বিলুপ্তি। দ্বৈতরূপের সকল বিভেদ তাঁর মন থেকে দূর হয়ে গেল, তাঁর আত্মা 'আমি' 'আমার' বা 'আমাকে' ইত্যাদি অহংবোধকে বিস্মৃত হয়ে একাত্ম হয়ে গেল সচ্চিদানন্দে। অনন্ত আনন্দ সাগরে হারিয়ে গেলেন তিনি। নির্বাণ সুখ লাভ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের সহসা রূপান্তর দেখে তোতাপুরী বিস্মিত, হতবাক্। তিনি বললেন, 'তোমার মধ্যে এ কোন দৈবীমায়ার লীলা! তিনদিনের মধ্যে যে সিদ্ধিলাভ করলে তুমি—তার জন্য আমার লেগেছিল দীর্ঘ চল্লিশ বছর। আহা কি অবাক কাণ্ড। এ কি বিস্ময়কর ব্যাপার!'

এর পর সুরু হলো শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম ধর্মানুযায়ী নব সাধনা। আল্লা বা ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য নিষ্ঠাবান ভক্ত মুসলমান যা করে থাকেন, রামকৃষ্ণ ভক্তিভরে তাই করলেন। গোবিন্দ নামে একজন মুসলমান ফকিরের নির্দেশমত তিনি আল্লার নাম নেন, নিয়মিত নমাজ পড়েন। মুসলমানের মতই পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করেন। এবারও তিনদিনের মধ্যেই তাঁর সিদ্ধি হয়ে গেল। তিনি খোদাতাল্লাকে উপলব্ধি করলেন, এমনকি একবার মোহম্মদের দর্শনও লাভ করলেন তিনি।

বলা বাহুল্য, ইসলাম এবং খৃষ্টান মতে সাধনভজন করে শ্রীরামকৃষ্ণ গোঁড়া হিন্দুধর্মের সীমানার বাইরে পা দিয়েছেন। ইতিপূর্বে আর কেউ তা করতে সক্ষম বা সমর্থ হননি।

এমনি করে সমস্ত ধর্মের পথে সাধনা করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আদর্শকে উপলব্ধি করার পর শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝতে পেলেন সব ধর্মের লক্ষ্যবিন্দুই এক, সকলেরই গতি সেই পরমাত্মার দিকে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় তাঁকে বিভিন্ন নাম দিয়েছে মাত্র। তিনি বুঝতে পারলেন বিভিন্ন ধর্মমত হচ্ছে বিভিন্ন পথের মত; অন্তে সকলেরই লক্ষ্য ঈশ্বর সমীপে উপনীত হওয়া। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ভাগবত গীতায় বলেছেন, 'যে যে পথেই আসুক, যে ভাবেই আমার সাধনা করুক, পরিশেষে আমাতেই উপনীত হয়। লোকেরা অহেতুক সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে লড়াই করে মরছে। সব মত ও সাধনার শেষ হয়েছে আমার মধ্যে (আত্মোপলব্ধিতে) এসে।' শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভগবদ্-বাণীর সত্যতা প্রমাণিত করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম হচ্ছে নদীর মত। এক একটী উত্থিত হয়েছে এক এক অঞ্চলে। তারপর—কেউ একেবেঁকে, কেউ সোজাসুজি চলেছে—একই সাগরে মিলিত হওয়ার জন্য। বিভিন্ন ধর্মমতও তাই। এক এক জাতির মধ্যে জন্ম নিয়েছে এক একটী ধর্মমত। কেউ বন্ধ পথে, কেউ সরল মার্গে নিত্য বয়ে চলেছে সচ্চিদানন্দস্বরূপ অনন্ত সাগরের দিকে। সেখানে গিয়ে পতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যাবে তাদের নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক রূপ।

সাধনা দিয়ে রামকৃষ্ণ সনাতন হিন্দুধর্মের এই পরম সত্যটীকেই উপলব্ধি করেছিলেন এই যুগে। সাধনার অন্তে, সিদ্ধিলাভ করে তিনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা, নিজের উপলব্ধিকেই তাঁর বাণীরূপে ঘোষণা করলেন বিশ্ববাসীর সম্মুখে। নানা জাতির পণ্ডিত এবং বিজ্ঞজন এসে সমবেত হলেন তাঁকে দর্শন করার জন্য। তাঁর নিজ মুখের কথামৃত পান করার জন্য, সমবেত হলেন সহস্র সহস্র নরনারী। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনার উদাহরণ দিয়ে অতি সহজ সরল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে তত্ত্বালোচনা করেন। সাংসারিক লোকের মনেও অতি সহজেই স্পর্শ করে তাঁর কথা। তাঁর বাণীর মধ্যে নিহিত আধ্যাত্মিক গভীরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁদের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক আদর্শ গৃহীমানুষের অন্তরেও জাগিয়ে তোলে পরম পিপাসা।

আমরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখেছি—বিশ্বের সব মহান্ ধর্মের অনুরাগিগণ রামকৃষ্ণের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদের নিজ নিজ আদর্শকে। দেখে পুলকিত হয়েছি আমরা। আমরা দেখেছি, মানব-পুত্র যীশুর নাম শ্রবণ করা মাত্র সমাধিমগ্ন হয়ে যেতেন তিনি। তৎক্ষণাৎ স্বর্গীয় পিতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেত তাঁর আত্মা। কোয়েকারগণ, এমন কি গোঁড়া খৃষ্টানগণ পর্যন্ত লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পদপ্রান্তে। তারপর তাঁরা খৃষ্টরূপে সুরু করলেন তাঁর ভজনা। যেসব মুসলমান পীর তাঁর কাছে এসেছেন তাঁরাও অনুরূপভাবে লুটিয়ে পড়েছেন তাঁর পদতলে। কারণ ইসলামের সর্বোত্তম আদর্শকে তাঁরা প্রত্যক্ষ করে-ছিলেন তাঁর মধ্যে। বৌদ্ধগণ তাঁকে মনে করতেন স্বয়ং সমুদ্ধ। একদিন শ্রীচৈতন্যের নামে উৎসর্গীকৃত বেদীতে বসে পড়লেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সহস্র সহস্র বৈষ্ণব ভক্তিভরে প্রতিষ্ঠা করেছে এই বেদীটি।

তাঁরা এর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের গৌরাঙ্গ প্রভুর ভজনা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বসে পড়লেন সেখানে। বিন্দুমাত্র অসৌজন্য হয়েছে মনে হল না কারও। বৈষ্ণবাচার্যগণ এবং বৈষ্ণব ভক্তগণ পরমানন্দে স্বীকার করে নিলেন—তিনি তাঁদের দ্বিতীয় শ্রীচৈতন্য, নদীয়ার দ্বিতীয় অবতার।

কৃষ্ণমন্ত্রের উপাসকগণ তাঁর মধ্যেই প্রত্যক্ষ করলেন বৃন্দাবনের প্রভুর অলৌকিক গুণাবলীর পরিপ্রকাশ। জগদম্বার ভক্ত যাঁরা তাঁরা তাঁর মধ্যেই দেখতে পেলেন সেই বিশ্বজননীকে। শৈবগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁদের জীবন্ত বিগ্রহ বলে গ্রহণ করলেন। গুরু নানকের অনুরাগী শিখগণের আবার তিনিই প্রভু।

এইসব অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে তাঁর অনুরাগিগণ বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এই বহুমুখী ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করে তাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, রামকৃষ্ণ বিশ্বের পূর্ববর্তী সব অবতার এবং প্রবক্তাগণের শক্তির সমন্বয়: তাঁদেরই সকলের মূর্ত বিগ্রহ তিনি। তাঁর নানা কর্মের মধ্য দিয়ে তো বটেই, নিজ মুখেও এই ধারণাকে সংশয়াতীত করে তিনি বলে গেছেন 'আগে যাঁরা ছিলেন রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট কিংবা চৈতন্য তিনি এখন হয়েছেন রামকৃষ্ণ।' ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই সত্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাঁর প্রিয়তম শিষ্যবৃন্দ তথা জগদ্বাসীকে তিনি বহুবার একথা বলেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব যেমন বহুরূপী হয়েও মূলতঃ ছিল এক ও অখণ্ড তেমনি বিভিন্ন কর্মের অনুষ্ঠান করলেও তাঁর আবির্ভাব-উদ্দেশ্যও ছিল এক। তিনি এসেছিলেন জগদ্বাসীকে বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্যকে দেখিয়ে তাদেরকে বিশ্বধর্মে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। সম্প্রদায়গত ধর্ম সেই মহাধর্মের খণ্ডপ্রকাশ মাত্র। বিশ্বধর্ম ছাড়া পরিপূর্ণতা, ধর্মের সমগ্রতা কোন বিশেষ ধর্মের নেই। পৃথিবীর অন্যান্য পরিত্রাতাদের মত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনও তাঁর এই আবির্ভাবের, তাঁর আদর্শের জীবন্ত অনুলেখন।

আজকের এই বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে গেছেন কি করে আজকের এই জীবনেও সম্ভব ঈশ্বরোপলব্ধি তথা ঈশ্বরলাভ, তাঁর মত অন্য কোন অবতার কোনদিন নাস্তিক এবং সংশয়বাদীদের কাছে বার বার ঈশ্বরোপলব্ধির পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন নি। যাঁরা তাঁকে দর্শন করেছেন, বছরের পর বছর বাস করেছেন তাঁর সাহচর্যে, রাত্রিদিন প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর লীলা—তাঁরা বিশ্বের সম্মুখে আজ ঘোষণা করছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বের মহত্তম আধ্যাত্মিক আদর্শ। বিশ্বের বিভিন্ন জাতির শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে যে সব শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মপুরুষের বর্ণনা আছে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন তাঁদের মহত্তর প্রকাশ। সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বযুগের পরম পুরুষ, তিনি শ্রীভগবান।

সন্তবাণী

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

"আয়ে হ্যায় সো রাজা যায়েগে রঙ্ক ফকির,
এক সিংহাসনে চড়ে চলে এক বাঁধে ঘাত জিঞ্জীর।"
—কবীর

আমীর গরীব ফকির সবাই এসেছে এই ভবে
আপন আপন কার্য শেষে ফিরবে আবার সবে।

মাঝখানে কেউ সারাজীবন সিংহাসনে বসে
কাটিয়ে যাবে দিনগুলি তার, মজি' বিলাস রসে,
কেউবা আবার কর্মদোষে শিকল-পরা পায়
বন্দীশালায় জীবন তাহার কাটিয়ে যাবে হায়।

আত্মার অনুভূতি

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

আত্মাই নিত্য, তা ছাড়া সবই অনিত্য—এরূপ বিচার দিয়ে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির নামই আত্মার অনুভূতি। এটি নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার পথ আর এ পথের সাধককে জ্ঞানী বলে। বেদান্তবাদীদের মতে আত্মা বা ব্রহ্মস্বরূপ তাই নিত্য বা সত্য আর জগৎ অনিত্য বা মিথ্যা, কিনা যার সত্তা নাই; সুতরাং জগৎ-প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপলব্ধি যতদিন না হয়, ততদিন শুক্তিকাতে রৌপ্য বোধের ন্যায় জগৎ সত্য ব'লে মনে হয়। এর কারণ অজ্ঞান বা অবিদ্যা, কিন্তু জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে জগতের মিথ্যাত্বই প্রতিপন্ন হয়। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান রূপ বিচারের পারেই পরমতত্ত্ব বিদ্যমান। বিদ্যা বা জ্ঞান বিচার দ্বারা অবিদ্যা বা অজ্ঞানের নাশ হলে তবে জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে শেষে দুটি কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।" কারণ বিদ্যা সোনার শিকল ও অবিদ্যা লোহার শিকল, কিন্তু দুইই বন্ধন। অতএব বন্ধন মুক্ত হ'তে গেলে জ্ঞান অজ্ঞানের পারে যাওয়া চাই। অনাদি অনির্বাচ্যা অবিদ্যাই কারণ শরীর ও আত্মার উপাধি; সুতরাং স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর থেকে আত্মাকে ভিন্ন জানতে হয়। শরীর বা দেহ উৎপন্ন বস্তু ও পরিবর্তনশীল, সুতরাং এর নাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আত্মা বা দেহী সৃষ্ট বস্তু নয়। আত্মা অজর, অমর, অনাদি, অনন্ত ও অপরিবর্তনীয়। নিত্যানিত্য বিচার দ্বারাই আমরা আত্মজ্ঞান বা অমৃতের সন্ধান পাই ব'লে জ্ঞানই সাক্ষাৎ মোক্ষের কারণ, এবং কর্ম ও ভক্তি সহায়ক মাত্র। শাস্ত্র বলে, অবিদ্যার সহিত কর্মের বিরোধ না থাকায় অবিদ্যা ও কর্ম এক, সুতরাং কর্ম অবিদ্যাকে নিবৃত্তি ক'রতে অক্ষম, তাই জ্ঞানই একমাত্র অবিদ্যার নাশক। আলোক যেমন অন্ধকারকে দূর করে, জ্ঞানালোক তেমনি জীবের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করে, আর এই জ্ঞানপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্রকাশ আত্মাও স্বমহিমায় প্রকাশিত হন।

স্বচ্ছ স্ফটিক লাল পুষ্পের নিকট যেমন লাল ব'লে মনে হয়, শুদ্ধ আত্মাও সে রকম অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এই পঞ্চকোষের সঙ্গে মিশে থাকার জন্য তাদের অবস্থাই প্রাপ্ত হয়, আর তারই জন্য জীব-উপাধি লাভ করে। আত্মা কিন্তু আসলে অরূপ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিষ্কল ও সর্বব্যাপী। মেঘের গতিতে চন্দ্র যেমন চলমান ব'লে মনে হয়, বিবেক-বিচারহীন লোকের কাছে নিষ্কল আত্মাও তেমনি গতিশীল ব'লে মনে হয়। আত্মা কিন্তু সর্বব্যাপী হওয়ায় অচল ও গতিহীন, কারণ যিনি অনন্ত তাঁর আর গতি কিরূপে সম্ভব হয়, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির গতিই আত্মায় আরোপিত হয়। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম পঞ্চীকৃত অর্থাৎ এক হ'লে সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি হয়। সূক্ষ্ম শরীর পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন-বুদ্ধিযুক্ত ব'লে কর্মের দ্বারা সঞ্চিত, সুতরাং ভোগের সাধন, অর্থাৎ এই শরীর সুখ-দুঃখ ভোগের আশ্রয়। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে অবলম্বন ক'রে স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু অজ্ঞানের জন্য জীব সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মাতে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের গুণ আরোপ করে, এবং মনোরূপ উপাধির কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-রূপ ধর্ম আত্মাতে কল্পনা করে। বুদ্ধির বিদ্যমানে রাগ, দ্বেষ, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি অনুভূত হয়, কিন্তু সুষুপ্তিকালে বুদ্ধি যখন কারণে লয় প্রাপ্ত হয়, তখন রাগাদির বিলোপ সাধন হয়; সুতরাং রাগাদি বুদ্ধির ধর্ম, আত্মার

নয়। স্বয়ংজ্যোতিঃ আত্মা যখন বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন অজ্ঞানে জীব দেহাত্মবোধ করে এবং আপনাতে কর্তৃত্ব আরোপ ক'রে 'আমি, আমার' মোহে অভিভূত হয়। আত্মা স্বরূপতঃ কিন্তু নির্বিকার। বুদ্ধি জড়বস্তু, তাতে জ্ঞানশক্তি নাই। কোন কোন শাস্ত্রে উল্লেখ আছে: "রসরূপঃ পরমাত্মা জড়রূপা মায়া" অর্থাৎ পরমাত্মাই রসরূপ ও চেতন আর ইন্দ্রিয়নিচয় অচেতন। জীব অবিদ্যার মোহে নিজেকে জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা ব'লে মনে ক'রে রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় আত্মাতে জীবভাব পোষণ ক'রে জীবত্ব প্রাপ্ত হয়। জড় বুদ্ধ্যাদির দ্বারা আবৃত থাকার জন্য আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হয় না, আর তারই জন্য আসলে জীব তা বুঝতে অক্ষম। কিন্তু যখন সে আত্মতত্ত্ব অবগত হয় তখন তার সকল ভ্রম দূর হওয়ায় সে উপলব্ধি করে, আত্মা জড় বুদ্ধ্যাদির প্রকাশক, আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, আত্মা অন্য বস্তুর অপেক্ষা রাখে না, শরীরাদি দৃশ্য পদার্থ অবিদ্যাকল্পিত ও নশ্বর। এই অবস্থায় উপনীত হ'লে সাধক বলে, "আমি দেহ থেকে ভিন্ন, আমার দেহধর্ম, জরা, কৃশতা ও বিনাশাদি নাই। আমি ইন্দ্রিয় নহি, অতএব শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চ বিষয়ের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি মন নহি, সুতরাং মনোধর্ম—দুঃখ-রাগ-দ্বেষ-ভয়াদি আমাতে নাই।" মোট কথা—জ্ঞান পথে 'নেতি নেতি' বিচার সহকারে সাধক আত্মানুভূতি লাভ করে, আর তখনই পরিবর্তনশীল জগৎ তার কাছে চৈতন্যময় হয়। সে চেতনাদীপ্ত হ'য়ে মুক্ত বিহঙ্গের মতো মায়ার জগতে থেকেও মায়ার অতীত হয়।

আত্মোপলব্ধি সম্বন্ধে উপনিষদে একটি সুন্দর গল্প আছে। এক সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুররাধিপতি বিরোচন আত্মতত্ত্ব জানার জন্য পিতামহ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: "আত্মা কি?" পিতামহ ব্রহ্মা বললেন, "তুমিই সেই" নিজে চিন্তা ক'রে দেখ। বিরোচনের অসুরস্বভাব। তাই দেহকে আত্মা ব'লে জ্ঞান ক'রে প্রচার করলেন: "দেহই আত্মা, অতএব খাও, দাও, আমোদ কর"। ইন্দ্রের দেবভাব, তিনি বিচার ক'রে দেখলেন, "আত্মা দেহ হ'তে পারে না, কারণ দেহের নাশ আছে, কিন্তু আত্মা অজর অমর।" পুনরায় তিনি ব্রহ্মার নিকট গমন ক'রে বললেন, "পিতামহ! এই অনিত্য দেহ তো আত্মা হ'তে পারে না?" ব্রহ্মা তদুত্তরে ওই একই কথা বললেন: "তুমিই সেই—চিন্তা ক'রে দেখ"। ইন্দ্র পর পর বিচার ক'রে দেখলেন: মন প্রাণ সবই পরিবর্তনশীল। কিন্তু আত্মা যখন অপরিবর্তনীয়, তখন 'আমিই' সেই অজর অমর আত্মা; আমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। এরূপে 'আত্মতত্ত্ব' অবগত হ'য়ে, ইন্দ্র পরম আনন্দ লাভ ক'রলেন। গল্পটি রূপক। আসল বক্তব্য এই যে, মানুষের ভাবা উচিত —আমি দেহ নই, আমি শুদ্ধ-বুদ্ধমুক্তস্বরূপ আত্মা, আর এই জ্ঞানেই সে পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি ক'রে ধন্য হয়। এই উপলব্ধির নামই আত্মার অনুভূতি। মানবমাত্রেরই এই অনুভূতি লক্ষ্য হওয়া উচিত।

"মুখে ভগবান ভগবান বলে চীৎকার করলে কি হবে? ভগবান যে আছেন এটা মনে প্রাণে জানতে পারলে তবে তাঁর ওপর বিশ্বাস আসে। অন্তর শুদ্ধ না হলে ভগবান যে আছেন তা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। বাইরে ফোঁটা-মালা-তিলক আর ঐ সব ভড়ং দেখালে কী হ'বে? মনের ভেতরে অনুক্ষণ ভোগবাসনার জঞ্জাল গাদা হয়ে জমে আছে। ঐ সমস্ত জঞ্জাল জমিয়ে রাখলে কি আর ভগবানের দিকে মন যায়? মনের ঐ সব জঞ্জালকে আগে দূর করতে হবে। যুক্তকীর্তে ঈশ্বর লাভ হয় না। সাধারণ লোকের মন সব সময়ে ভোগের দিকে ছুটেছে। তাই তো তাদের মন ভগবানের দিকে যায় না।" —ব্রহ্মানন্দ

ভারত-মানস

শ্রীবালকরাম ভট্টাচার্য

ভারতীয় সংস্কৃতির ঠিক যথার্থ দিকটা কোন রকম ভাবে 'ক'রে উঠে' না, 'হ'য়ে উঠে'। ক'রে উঠার যে ইতিহাস তার পরিণামে আছে খণ্ডতা এবং এই 'ক'রে উঠার' মধ্যে যে প্রতিজ্ঞাকে লক্ষ্য করি তা' বিশ্ব ব্যাপারের গোড়ার বা শেষের জিনিষও নয়।

বিশ্ব ব্যাপারের নানা পদার্থের ও তথ্যের বিচিত্র টানা-পোড়েনে যে ভাব ও ব্যাপার ঘটে উঠে সেই ঘটে উঠার একটা স্থির ও স্থায়িত্বসূচক বিন্দু হতেই এই 'ক'রে উঠার' প্রতিজ্ঞার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ঐ স্থির ও স্থায়িত্বসূচক বিন্দু হচ্ছে মানুষের ব্যাপার, গভীর বিশ্লেষণে ধরা পড়ে আরও অনেক আদিতত্ব। আধুনিক যুগের মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিকদের গবেষণাই তার বড় প্রমাণ। যে চেতন মনকে নিয়ে 'ক'রে উঠার' ভিত্তি দৃঢ় হয়েছে মনস্তাত্ত্বিকরা সেই চেতন মনের পশ্চাতে অবচেতন মনের নানা বিচিত্র রাজ্যসমূহ আবিষ্কার করেছেন। বৈজ্ঞানিকেরাও ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে তা'দেরও পিছনে আরও বিরানব্বইটা মূল পদার্থ আবিষ্কার করেছেন।

'ক'রে উঠার' উপর প্রতিজ্ঞা হয় কেন, তারও কারণ আছে। তাকে দুই ভাগে ফেলা যায়, একটা প্রাকৃতিক এবং একটা ব্যবহারিক। যেটা প্রাকৃতিক সেটা সম্ভব হয়েছে বাইরে বিশ্ব সংসারের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতায়, চলার নিয়মে বিচিত্র ভুলের সংশোধনে এবং আর একটি সম্ভব হ'য়েছে জৈব বুদ্ধির জন্য।

চলার পথে বাইরের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় নানা ভুলের সংশোধন হতে হতে যখন বহির্মুখী জৈব-বুদ্ধিসম্পন্ন চিত্ত তারই সঙ্গে একটা স্থিতিসূচক সামঞ্জস্যে আসে তখন সেইখান থেকেই আরম্ভ হয় ঐ 'ক'রে উঠার' প্রতিজ্ঞা।

বাইরে চলার পথে নানা ভুলের সংশোধনের মধ্যে জৈববুদ্ধিসম্পন্ন চিত্তের সঙ্গে তার যে সামঞ্জস্য ঘটে, সেই সামঞ্জস্য সম্ভব হয় বিশ্ব ব্যাপারে পারম্পর্য ও কার্য-কারণ বোধের ফলশ্রুতায়। বহির্মুখী চিত্ত নানা ভুলের সংশোধনের মধ্যে বাইরের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ঐ বোধকে আয়ত্ত করে ব'লেই তার মধ্যে সংশয়াত্মক মনোবৃত্তির জন্ম হয়। এই সংশয়াত্মক মনোবৃত্তি যে জিজ্ঞাসার জন্ম দেয় তার পরিণতিকে আমরা বিশ্লেষণাত্মক মনোবৃত্তির মধ্যে লক্ষ্য করি। এই বিশ্লেষণী বৃত্তি বাইরের জগতের সঙ্গে যেমন আমাদের প্রয়োজনের নিদর্শন করে সেই রকম অন্তর জগতের সঙ্গে বহির্জগতের আপেক্ষিক সম্বন্ধ নির্ণয় করে। ঐ বিশ্লেষণী বুদ্ধি যেখানে বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনের নিদর্শন করে সেইখানেই আমরা জৈব বুদ্ধির নানা বিচিত্র দিককে বুঝি এবং যেখানে আপেক্ষিক সম্বন্ধ নির্ণয় করে সেইখানেই তথ্য বুদ্ধিকে লক্ষ্য করি। তবে ঐ উভয় বুদ্ধিই সংশয়শীলতার মধ্যে স্ফুরিত বলেই বিশ্বব্যাপারের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য নির্ণয়ে তার জিজ্ঞাসার অন্ত নেই।

সংশয়শীলতার মধ্যে এই যে জিজ্ঞাসা, এ একটা বিশেষ মানসিকতার, আমাদের মধ্যে উদ্বোধন করে। তা' হচ্ছে অব্যবহিত ও আসন্ন বিশ্ববোধে (জৈবিক বিশ্ববোধ) পূর্ণ এবং ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ পরিণামে বহুদৃষ্টিসম্পন্ন।

চিন্তা ও বোধের খণ্ডতায় ঐ বিশ্লেষণী বুদ্ধি একটা সহজ সামঞ্জস্য খুঁজে পায় ঐ অব্যবহিত ও আসন্ন বিশ্ববোধের সহিত। এই অব্যবহিত ও আসন্ন বিশ্ববোধের সহিত ঐ বিশ্লেষণী বুদ্ধির সামঞ্জস্য সিদ্ধ হলে ক্রমে তা একটা মূল্য ও মর্যাদা বোধে প্রতিষ্ঠিত হয়। কার্য-কারণ ও পারম্পর্য অন্বেষণ

ক'রে ফলদর্শিতার জীবন-যাত্রা সম্ভব হয়েছে বলেই বাইরের জগতের বহির্মুখী ইন্দ্রিয় জ্ঞানকেই বিশ্বব্যাপারে প্রায় সর্বেসর্বা ধরা হয়। খণ্ডিত বুদ্ধি ও খণ্ডিত চিন্তার বিশ্লেষণের সাহায্যে আমরা বহির্মুখী ফলদর্শিতাকে জীবন-যাত্রার ব্যাপারে উপলব্ধি করি বলেই তার সম্বন্ধে একটা অনড় ধারণাকে পোষণ করি। এইভাবে বাইরের জীবন-বোধে আমরা প্রতিষ্ঠিত।

এই বাইরের জীবনবোধ বিশেষ মর্যাদা ও মূল্য লাভ করেছে নানা তত্ত্ব ও তথ্য উদ্ভাবনে, যা মানুষের জীবন-যাত্রার সর্বতোভাবে উপযোগী। এই উপযোগিতা বোধে যেমন বৈষয়িক মূল্যবোধ সুস্পষ্ট, তেমনি নানা তত্ত্ব ও তথ্য উদ্ভাবনের পিছনে যে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী বুদ্ধিবৃত্তি বর্তমান, সেই বিশ্লেষণী বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশশীলতার মানসিক মূল্যবোধও সুস্পষ্ট। এইরূপে উভয় মূল্যবোধের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাইরের জীবন সর্বাঙ্গীন মানুষী মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

এই বাইরের জীবনবোধের কাঠামো হিসাবে যে স্থূল থেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু প্রত্যয় রেখা বর্তমান, তার অনিবার্যতা আমাদের বহির্মুখী ইন্দ্রিয়ে বর্তমান। এই বর্তমান প্রত্যয় রেখার দ্বারা নানা চিন্তায়, বুদ্ধিতে এবং তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে বিচিত্রভাবে প্রকাশশীল। এই প্রকাশের দ্বারা আমাদের সমগ্র মানসভূমিকে একটা গভীর এবং ব্যাপক বাস্তব বোধে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই সমগ্র বাস্তব বোধটাই আমাদের মানসে বাইরের জগতের 'ক'রে উঠার' ব্যাপার। এই 'ক'রে উঠার' ব্যাপারটা আর কিছু নয় তা নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং বস্তুবোধে প্রকাশের জন্য বাইরের বস্তু প্রত্যয়রেখার জগত থেকে নানাবিধ উপায়ের অন্বেষণ বা আপাত পরিণামে আবদ্ধ ও খণ্ডিত। এই বস্তু প্রত্যয়রেখার জগত একদিক দিয়ে যেমন কঠিন ও নীরন্ধ্র বস্তুজগতকে অতি স্পষ্টভাবে জীবনবোধ থেকে পৃথকরূপে নিজেকে প্রকাশ করে সেই রকম এই পার্থক্যবোধ থেকেই উদ্ভব হয়েছে নানা ভ্রান্তি ও অসঙ্গতির প্রবাহ।

বাইরের বস্তু প্রত্যয়রেখার জগত সর্বদাই মানুষ হতে পৃথকভাবে নিজেকে প্রকাশ করে বলেই তার সম্বন্ধে মানুষের বোধ সর্বদাই খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন। বিশ্লেষণী বুদ্ধিই প্রকৃতির কার্য ও ঘটনাবলীর অনুধাবন দ্বারা এবং কার্য-কারণের অনুসন্ধান দ্বারা ঐ খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন বস্তু প্রত্যয়রেখাকে নানা তথ্যের সমাবেশে এরকম ভাবে ঘোষনা করে। সেই-জন্যই নানা সংশয় ও ভ্রান্তি ভাব ঐ সম্পর্কে আমাদের বুদ্ধিতে অনুস্যূত থাকে। তা হলেই আমরা বুঝতে পারলাম যে, নীরন্ধ্র বস্তু প্রত্যয়রেখা এমন একটা স্থূল এবং আমাদের বুদ্ধির অব্যবহিত অনুভবী জগত, যা শুধু বাইরের উপায়ের দ্বারা সঞ্জীবিত থাকে।

এই উপায়বোধ বাইরের বস্তুজীবনে একটা সর্বাত্মক আপেক্ষিক প্রকাশশীলতাকে সমস্ত রকম কার্য-কারণ ও পারস্পর্য বোধের মধ্যে অনুস্যূত রাখে। এই আপেক্ষিক প্রকাশশীলতাই হচ্ছে 'ক'রে উঠা'। এটা সর্বদাই নিজেকে নিজের অন্তরঙ্গ বোধের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বস্তু প্রত্যয়রেখাকে অব্যবহিতভাবে অনুভব করে বলেই অখণ্ডতা ও ব্যাপকতার দৃষ্টিকে বুঝতে পারে না।

বাইরের উপায়বোধ দ্বারা আগ্রত আপেক্ষিক বস্তু প্রত্যয়রেখার জগতের মধ্যে জীবন সর্বদাই নিজেকে ভেঙ্গে দিয়ে দিয়ে একটা আপাত সহনশীল সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে চলে। এর মধ্যে যে প্রেরণায় সে সঞ্জীবিত থাকে সেই প্রেরণা হচ্ছে খণ্ডভাবে সৃষ্টি করবার প্রেরণা। নিজের পূর্ণ জীবনবোধকে সম্পূর্ণ-ভাবে সরিয়ে রেখে এই প্রেরণাকে উপভোগ করা। এই প্রেরণায় যে সৃষ্টি তাকে স্রষ্টার পূর্ণ মর্যাদায় বুদ্ধিবৃত্তিতে উপভোগ করা। এ ক্ষেত্রে সৃষ্টিটা হয় জড়ের মত, তার উপর স্রষ্টার উদাম স্পৃহা চরিতার্থ হবার প্রবণতা থাকে। এখানে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে

কোন প্রকার ব্যাপক আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপন হয় না। জীবনবোধের যে দিকটা আমরা মোটামুটি নির্দেশ করলাম, তা' জগতকে, জীবনকে স্বীকার করে বস্তুপ্রত্যয়রেখার দিক দিয়ে। এই বস্তুপ্রত্যয়রেখার দিক দিয়ে স্বীকার করার মধ্যে যে আপেক্ষিক সংস্কার তাকে উপায়বোধ বলা যেতে পারে। এই উপায়বোধের দ্বারা জীবনবোধ পরিচালিত হওয়াকেই আমরা 'ক'রে উঠা' বলে এসেছি।

মানুষের সংস্কৃতির যে দিকটা এই 'ক'রে উঠার' দ্বারা প্রভাবিত তা বিশেষভাবে তথ্যমূলক। এই 'ক'রে উঠার' পরম তথ্যমূলক দিকই হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞান। মানুষের সংস্কৃতির এই বিশেষ দিকটা বিশ্বব্যাপারে শুধু বাইরের দিকেই তাকিয়ে থাকে, বহির্বিশ্বের সঙ্গে নিজের জীবনবোধের কেবল আপোষ করেই চলতে থাকে।

এই আপোষ করার অভ্যাসে তার সুদূর মানসিক দিগন্তরেখায় খণ্ডতা, বিচ্ছিন্নতা ও আপাত পরিণামদর্শিতার আদর্শ ওতপ্রোত হয়ে থাকে।

'ক'রে উঠার' ইতিহাস আমরা সামান্য বুঝবার চেষ্টা করলাম। বিশ্বব্যাপারে এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিজের মানসিকতার সম্মুখে প্রতিদ্বন্দ্বী বস্তুবোধে। এটাই যেন একটা শুধু প্রস্তরখণ্ডবহুল, সঙ্কীর্ণ, অত্যন্ত অগভীর এবং স্রোতোবেগপূর্ণ পার্বত্য নির্ঝর; কোন পাত্রে জল নিয়ে তবে স্নান করা যায়, অবগাহন সম্ভব হয় না। তা বড় জলাশয় বা নদীতেই সম্ভব হয়। যে সর্বগ্রাসী প্রেরণা নিজেকে পর্যন্ত উৎসর্গ করে দেয় সেই প্রেরণা হচ্ছে অখণ্ড প্রেরণা। এই প্রেরণা নিজ থেকে স্বতঃপূর্ণ হয়ে একটা গভীর আত্মার সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনার নানা বিকাশ দেখে। এটাই হচ্ছে 'হ'য়ে উঠার' সূচনা।

এই 'হ'য়ে উঠার' বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এটা বস্তু প্রত্যয়রেখার নানা ভঙ্গী ও সঙ্কেতের অপেক্ষায় একান্তভাবে বসে থাকে না। এ সম্বন্ধে একটু নির্দেশ করা যাক।

'ক'রে উঠার' ইতিহাস আমরা দেখে এলাম। বাইরের যে বস্তু প্রকৃতি তা সর্বদাই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মনের যে-কোনও অহেতুক সংযোগকে বিচ্ছিন্ন করে চলতে চায়। বিশ্বকে সর্বদা দূর হতে শুধু কৌতূহলের দৃষ্টিতে এবং জড়ীয় অধ্যবসায়ের দ্বারা আলোচনা করতে চায়। নিজের যেটা গভীর অংশ তাকে অতি অন্তরঙ্গভাবে বিশ্ববোধে ওতপ্রোত করে দিয়ে এক করে দেখবার পরিপূর্ণ প্রেরণা উপরোক্ত বস্তুপ্রত্যয়রেখার মধ্যে মানুষ খুঁজে পায় না। যেখানে মানুষ এটা খুঁজে পায় সেখানেই সে 'হয়ে উঠে'। এই 'হ'য়ে উঠার' পিছনকার সোজা ইতিহাস হচ্ছে, যে বিশ্বটা তার কাছে আর জড় ও উপায় থাকে না, সেটা তার কাছে হ'য়ে উঠে আত্মস্থ ও উপেয়। এখানে বিশ্বকে খণ্ড খণ্ড করে দেখে শুধু কার্য-কারণ ও পারম্পর্যবোধের দ্বারা জোড়া দিয়ে কৃত্রিম ও জড়ভাবে একটা আপাত অখণ্ডতা দেখবার অবকাশ নেই, সমস্তটাই যেন অখণ্ডতা ও পূর্ণতার নানা অভিব্যক্তি বলে মনে হয়।

যে মনটা খণ্ড খণ্ড বিশ্লেষণে আপেক্ষিক সঙ্কীর্ণ বিষয়ী মন হয়ে পড়ে সেই মনটা এখানে গভীর আশ্লেষণে আপনা হতেই যেন বিষয়ন হয়ে পড়ে। এর মধ্যে সে কোন অসঙ্গতি বা অসম্ভাবনা দেখে না। সবটাকেই অত্যন্ত সহজভাবেই গ্রহণ করে। প্রাচীন ঋগ্বেদের ঋষি-কবিদের মন বিশ্ব সম্বন্ধে ঐ সহজ পূর্ণতাবোধে হয়ত প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বিশ্ব সম্বন্ধে যে ধারণাটা আমাদের মধ্যে 'ক'রে উঠে' তা একদিকে যেমন নিজের একান্ত জড় আধিপত্যবোধের দ্বারা সূচিত হয় সেই রকম নিজের ও বিশ্ব সম্বন্ধে শুধু নানা কার্য-কারণ ও পারম্পর্যের আপেক্ষিকতার সর্বদাই নিজের নিগূঢ় অংশটাই পিছনে রেখে পূর্ণতাবোধের সূচক চরম আত্মনিবেদনের পরম আনন্দ হ'তে আমাদের বঞ্চিত করে রেখেছে। ঐ 'ক'রে উঠার' মধ্যে সেই একই ধারার চিরন্তন পুনরাবৃত্তিকেই লক্ষ্য করি। বিশ্ব সম্বন্ধে যে সামগ্রিক

ও পূর্ণ অখণ্ডবোধ, তা একেবারে বিশ্বের গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সেখান হতে আমাদের সঙ্গে তার নিগূঢ় সম্পর্কটাকে একেবারে অখণ্ড অবস্থায় উপলব্ধি করে' বের হ'য়ে আসে। এই উপলব্ধির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এটা জগতের কোন তথ্য বা তত্ত্বকে একক বিচ্ছিন্ন ভাবে উপলব্ধি করে না—তার মধ্যেও পূর্ণতার একটা বিশ্বব্যাপী সম্ভাবনাকে আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হৃদয়ে লক্ষ্য করে। পূর্ণতাপ্রবণ হৃদয় ও মনের এই আকাঙ্ক্ষা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে একটা বিশিষ্ট ধরণ দান করে। পূর্ণতাপ্রবণ হৃদয় ও মনের এই বুদ্ধিবৃত্তিক ধরণই হচ্ছে আশ্লেষণী বৃত্তি। বুদ্ধির এই আশ্লেষণী বৃত্তি শুধু নিগূঢ় তত্ত্বকে উপলব্ধির চেষ্টায় নিয়োজিত হয় না, এটা বিশ্লেষণী বুদ্ধিবৃত্তির মত বাইরের সমাজ-জীবনে একটা বিশিষ্ট স্বভাব ও চিন্তাধারার উদ্ভাবন করে। আশ্লেষণী বৃত্তির এই চিন্তাধারাই 'হয়ে উঠার' পোষক।

বিশ্ববোধের মধ্য দিয়ে এই 'হ'য়ে উঠা' একটা বিশিষ্ট জীবনবোধকেও প্রভাবিত ও পরিচালিত করে। এই বিশিষ্ট জীবনবোধ নানা ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বিশ্বব্যাপারকে বিশ্বের বৃহৎ ও গভীর ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে চেষ্টা করে। 'ক'রে উঠার' বিশ্লেষণী বুদ্ধি নিয়তম স্তর থেকে কিছু তথ্য সম্বন্ধে কার্য-কারণ অনুসন্ধান করে পরস্পরের সঙ্গে ছোট ছোট সম্বন্ধযুক্ত করতে করতে শুধু ছোড়া-তাড়ার ইতিহাস লেখে বলে আশ্লেষণী বৃত্তিমূলক গভীর মানসে এর বিশেষ কোন সম্মতি খুঁজে পায় না। আশ্লেষণী বুদ্ধি প্রথমেই উপর থেকেই বিশ্বতত্ত্বের ব্যাপকতার ও অখণ্ডতার প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়ে ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণতত্ত্বে ও তথ্যে ব্যাপক ও অখণ্ড বিশ্বতত্ত্বের সহিত সম্বন্ধসূত্রকে অন্বেষণ করে।

এই অন্বেষণ করার ব্যাপারে তাকে ঐ 'ক'রে উঠার' বিশ্লেষণী বৃত্তির মত অসম্মতির বেড়াজালে পড়তে হয় না।

এ সম্বন্ধে কিছু নিদর্শন করা যাক্। ব্যাপক বিশ্বতত্ত্বের অখণ্ডতাকে আশ্লেষণী বৃত্তি দিয়ে অনুভব করবার সময় মানুষ ব্যাপক ও নিগূঢ় চৈতন্যের সর্বগতত্ত্বের আভাস পায়।

এই চৈতন্য নিজের নিগূঢ় শক্তিবলে বিশ্বের অণু-পরমাণুর মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে বিরাটের সঙ্গে তুচ্ছাতিতুচ্ছ পদার্থের সম্বন্ধ একটি সূত্রের মধ্যে বিধৃত রাখে। আশ্লেষণী বৃত্তি এটা সহজেই উপলব্ধি করে। কারণ চৈতন্যের পক্ষে জড়কে নানা বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করা সম্ভব হয়, কিন্তু জড়ের পক্ষে চৈতন্যকে নানা বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করা সম্ভব নয়। সেজন্যই 'হ'য়ে উঠার' আশ্লেষণী-বৃত্তি এই অখণ্ড সম্বন্ধ সূত্রটাকে ব্যাপকভাবে পূর্ণতার দিক দিয়ে যত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারে, 'ক'রে উঠার' বিশ্লেষণী বুদ্ধি সেই রকম উপলব্ধি করতেই পারে না। কারণ 'ক'রে উঠার' বিশ্লেষণী বুদ্ধি প্রথমেই জড়ের মাধ্যমে বিশ্বতত্ত্বকে কার্যকারণ ও পারস্পর্যবোধের দ্বারা খণ্ড খণ্ড ভাবে উপলব্ধি করতে প্রয়াস পায়।

এই যে আশ্লেষণী বৃত্তি তা' সর্বদাই একক ও অখণ্ড বিশ্বতত্ত্বের মাধ্যমে সমস্ত কিছু সম্বন্ধবোধকে বুঝতে চেষ্টা করে। এই বোঝার সব চেয়ে বড় সংজ্ঞা তার আছে। তা' প্রতি কর্মে ও চিন্তাধারার মধ্যে সর্বদাই একটা ব্যাপকতা ও অখণ্ডতার দ্বারা দ্যোতিত পরিপূর্ণ শান্ত সামঞ্জস্যের ইঙ্গিত করে। এই সংজ্ঞাটাই হচ্ছে 'শিবম্'।

এই 'শিবম্' কথাটাই ঠিক ভারতীয় সংস্কৃতিকে একটি পূর্ণ সংজ্ঞার প্রকাশ করতে পারে। ভারতীয় সংস্কৃতি, এই শিবমের একটা দিক বহুত্বে একত্বের মধ্যে এবং আর একটা দিক অখণ্ড ব্যাপক তত্ত্ববোধে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছিল। 'শিবম্' এই কথাটির মধ্যে যে অপরিমেয় শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান, তা' বোধ হয় পৃথিবীর কোন ভাষায় প্রকাশিত হয় না।

আমরা যাকে পূর্বে বলেছি 'হ'য়ে উঠা' তার সবচেয়ে গভীর আশ্রয় হচ্ছে ঐ 'শিবমের' মধ্যে। 'হয়ে উঠা' হচ্ছে পূর্ণতার আত্মপ্রকাশ। বিশ্বকে

একেবারে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করবার মধ্যেই 'হ'য়ে উঠার' সংঘটন সম্ভব হয়।

ভারতীয় চিন্তাধারার যে পার্থক্য বিশ্বের অপরাপর চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের বোধে ধরা দেয় তা' শুধু 'হ'য়ে উঠার' নয়, কারণ পৃথিবীর সমস্ত দেশেই অল্প-বিস্তর এই 'হয়ে উঠার' সাধনা আছে। এই 'হ'য়ে উঠার' প্রকাশের মধ্যে যে বিশিষ্ট বিশ্ববোধ ব্যাপক-ভাবে ধরা পড়ে সেই 'শিবম্‌ই' হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির নিগূঢ় বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষ ছাড়া বাইরের জগত 'হ'য়ে উঠার' সাধনায় সজাগ থাকলেও তাদের চিন্তাধারার লক্ষ্য ও আদর্শ হচ্ছে 'ক'রে উঠার' সামঞ্জস্য বা সৌন্দর্যতত্ত্বে পরিণত হয়ে 'হ'য়ে উঠার' মধ্যে নিগূঢ় ঐক্যকে দ্যোতনা করে। দৈনন্দিন কার্য ও চিন্তাধারার মধ্যেও এই ব্যাপক সৌন্দর্যবোধ তাদের নিগূঢ় মানসজীবনকে পরিচালিত করে। ভারতবর্ষীয় নিগূঢ় মানস জীবনকে পরিচালিত করে 'শিবম্'। এই 'শিবম্' হচ্ছে পূর্ণতার শান্ত রস এবং সৌন্দর্য-বোধ হচ্ছে আনন্দ-রস। সৌন্দর্যের মধ্যে যে ঐক্য, সামঞ্জস্য, ছন্দ ও লয়ের সুষমাকে লক্ষ্য করা যায় তার পারম্পর্য ক্রিয়াশীলতার মধ্যে 'ক'রে উঠার' বুদ্ধিকে নিগূঢ়ভাবে লক্ষ্য করে বলে ভারতের নিগূঢ় মানস কেমন যেন নিজের যথাযথ লক্ষ্য বা আকাঙ্ক্ষাটিকে তার মধ্যে পায় না।

ইউরোপের ঐ নিগূঢ় মানস চিন্তাধারা সাধারণ বহির্জীবনে শুধু বস্তু-প্রত্যয়রেখাকে নিজের থেকে (বিশ্ব সম্বন্ধের দিক দিয়ে) শুধু ব্যতিরেকভাবে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছে। তারই প্রতিক্রিয়া দৈনন্দিন জীবনেও শুধু ব্যাপক সম্বন্ধশূন্য কর্মশীলতার পরিব্যাপ্ত। কিন্তু ভারতের নিগূঢ় মানস চিন্তাধারা সাধারণ বহির্জীবনেও বস্তু প্রত্যয়রেখাকে নিজের থেকে বিশ্ব সম্বন্ধের দিক দিয়ে ঠিক ইউরোপের মত ব্যতিরেকভাবে ভাবতে অভ্যস্ত নয়। এজন্যই দেখি ভারতীয় চিন্তাধারায় নানা বিচিত্র কর্মপ্রেরণার মধ্যেও ইউরোপসুলভ রাজসিকতার স্থান নেই। সেই কর্মপ্রেরণার মধ্যেও ঐ বিশ্ব ও জীবনে একান্ত সম্বন্ধবোধ নিগূঢ়ভাবে আছে। কোন বিচ্ছিন্ন বস্তু প্রত্যয়রেখা তাতে নেই। এ জন্যই ভারতীয় চিন্তাধারায় শুধু তীক্ষ্ণ ও বিশ্লেষণী বুদ্ধিই কাজ করে না, তার সঙ্গেও কাজ করে সেই বুদ্ধিকে যে নিগূঢ়-ভাবে অনুপ্রাণিত করে ও পুষ্ট করে,—সেই মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা।

বুদ্ধিকে অতিক্রম করে এবং বুদ্ধির মধ্য দিয়েও বিচার করলে যে অহেতুক শুভেচ্ছা বিশ্ব ব্যাপারের প্রতি প্রসারিত তাই হচ্ছে মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা। এই মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা বিশ্ব ও জীবনে নিগূঢ় ঐক্যবোধে প্রতিষ্ঠিত। ঐ নিগূঢ় ঐক্যবোধ দৈনন্দিন জীবনেও একটা গভীর ও সূক্ষ্ম শুভা-কাঙ্ক্ষাকে পোষণ করে যা যান্ত্রিক ও বিচ্ছিন্ন বস্তু প্রত্যয়রেখার প্রভাবে বুদ্ধি সহজে বুঝে উঠতে পারে না। নীতিবোধের উপরেও এমন একটা নিগূঢ় সামঞ্জস্য বোধ ভারতীয় চিত্তকে সুচিরকাল ধরে প্রভাবিত করে আসছে যাতে করে সহজেই এটা প্রমাণিত হয় যে, ঐ নিগূঢ় ঐক্যবোধপ্রসূত মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা সেখানে কার্যকরী রয়েছে। প্রাচীন ভারতের দৈনন্দিন গার্হস্থ্যজীবনের প্রতি লক্ষ্য করলে ঐ মঙ্গল আকাঙ্ক্ষার প্রকাশকেই লক্ষ্য করি।

প্রাচীনকালে ভারতীয় আর্যদের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে যে পঞ্চ মহাযজ্ঞ এবং নানাবিধ ত্যাগস্বীকারের বিশিষ্টতা আমরা লক্ষ্য করি, তা শুধু নৈতিকতার প্রকাশ বলে আমাদের মনে হয় না। বিশ্ববোধের স্বাধীন মহিমায় ঐ সমস্ত বিধির প্রতিষ্ঠা। নিবিড় ঐক্যানুভূতিতে বিশ্বব্যাপী শিবতত্ত্বে পরিপূর্ণ হয়ে এই মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা নীতিতত্ত্বের চেয়ে আরও গভীর ও ব্যাপক সামঞ্জস্য ও ঐক্যতত্ত্বের ধারাকে বহন করে এনে নীতিবোধকে আরও গভীর ও একান্ত করে তুলেছে। বিশ্বের 'হ'য়ে উঠার' পিছনে যে নিগূঢ় সামঞ্জস্য, ধৃতি ও শান্তি বিদ্যমান সেই সামঞ্জস্য, ধৃতি ও শান্তিই বিশ্বব্যাপী শিবতত্ত্বের ভূমিকা। এই

শিবতত্ত্ব তার নিরন্ন বিশিষ্ট শান্তরসের স্থির ও অবিচ্ছিন্ন প্রেরণাটি খুঁজে পায় পরম ঐক্যানুভূতির মধ্যে।

এই পরম ঐক্যানুভূতি হচ্ছে গভীর আধ্যাত্মিক লোক। এই আধ্যাত্মিক লোকের যে বিশিষ্ট মানসানুভূতি, তা বুদ্ধির আনন্দ না হয়ে হয় বোধির আনন্দ। এই বোধির আনন্দের আশ্রয় হচ্ছে গভীর শান্তরস। বোধির আনন্দের মধ্যে যেমন আপেক্ষিক বিষয় নেই, তেমনি নেই শুধু পরিমাণগত ও বুদ্ধি-প্রসূত নানা বৈচিত্র্যের আকাঙ্ক্ষা। সেজন্যই স্বভাবতঃই সেই আনন্দানুভূতি হয়েছে নিগূঢ় শান্তরসের দ্বারা পরিপ্লুত। এটাই হচ্ছে পরিপূর্ণতার রস। এই পরিপূর্ণতার রসের বিশ্বব্যাপারে যে মানসানুভূতি তা 'শিবম্' এই কথাটির মধ্যে প্রকাশ পায়, 'সুন্দরম্' কথাটির মধ্যে নয়। এর মধ্যে সৌন্দর্যবোধও পরম স্ফূর্তিতে সংহত হয়ে আছে। ভারতীয় চিত্তে যে মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা তা শুধু শুষ্ক নীতিজ্ঞানের পরিচায়ক নয়। তার মধ্যে ঐ নিবিড় শিবভাবের দ্যোতনা স্পষ্টভাবে বর্তমান। এই মঙ্গল আকাঙ্ক্ষাই ভারতীয় দৈনন্দিন সমাজজীবন থেকে বৃহত্তর রাষ্ট্রজীবন পর্যন্ত প্রসারিত। প্রাচীন ভারতীয় সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সমস্ত প্রকার সংগঠনের মধ্যেই ঐ মঙ্গল আকাঙ্ক্ষার মূল সুরটি বিদ্যমান। মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা এবং ঐক্যানুভূতি ভারতীয় মনকে ও সমাজকে এমন একটা বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করেছে যাতে তাকে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য সমাজ থেকে সহজেই পৃথক করে বুঝতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণাম

শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র

বাংলা দেশে এসেছিলে
অপার করুণায়
প্রভু, নমি তোমায় পা'য়।
মধুমাসে এসেছিলে
শুক্লা দ্বিতীয়ায়
প্রভু, নমি তোমায় পা'য়।

এসেছিলে সঙ্গে করি
দিব্যলীলার সহচরী
সারদা মাতা'য়।
ভুবনজয়ী সেবক সকল
উজল প্রতিভায়
প্রভু, নমি তোমায় পা'য়।

তোমার দিব্য আবির্ভাবে
বিশ্ব নবীন জীবন পাবে
তোমার মহিমায়।
লুকানো আর নাই এ' বাণী
নিখিলের সভায়
প্রভু, নমি তোমায় পা'য়।

তোমার কাছে থাকি রত
যেন মন্ত্র-মুগ্ধবত
শ্রীপাদ পূজায়।
অন্তর আশীষ কণিকা দাও
আমাদের মাথায়
প্রভু, নমি তোমায় পা'য়।

ভারত-পথিক রামমোহন

শ্রীতরুণ গোপাল সান্যাল

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, নেতাজীর অমর গ্রন্থ—"My memories of I. N. A. and its Netaji". তাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু যে 'Foreword' লিখেছেন তাতে এক জায়গায় শ্রীনেহেরু বলেছেন: "Public memory is notoriously short and in any event the public mind could not function at that pitch for long." আজ বর্তমান ভারতের স্রষ্টা রামমোহনের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন তিনি দেশের স্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে গেছেন। ২২শে মে'তে, কেউ জ্বালে না শ্রদ্ধার প্রদীপ—বেজে উঠে না মঙ্গল শঙ্খ। কেবল দেশের দুষ্টিমের লোকেরা ২২শে মে একটু থমকে দাঁড়ায়। "ঐ মহামানব আসে, দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে, মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে"। তারপর ইতিহাস এগিয়ে চলে—সামনে, শুধুই সামনে!

ভারতের রাজনৈতিক আত্মচেতনা আনবার জন্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সকল মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে রাজা রামমোহনের স্থান যে সবার ওপরে, এটা আজ ঐতিহাসিক সত্য। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন—জাতির তরফ থেকে রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে —"Let it be remembered that Rammohan Roy was not only the founder of the Brahmo-Samaj and a pioneer of all social reforms in Bengal, but he was also the father of constitutional agitation in India."

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস কোন-দিনই ভুলবেনা রাজা রামমোহনের ১৮২৩ সালের "প্রেস অর্ডিনান্সের" বিরুদ্ধে যুগান্তকারী নেতৃত্বের কথা। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ। সেদিন তিনি এই "কালাকানুনের" বিরুদ্ধে তৎকালীন হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার ফ্রান্সিস্ ম্যাকনেকটনের কাছে একটি "স্মারকলিপি" (Memorial) পেশ করেন। হাইকোর্ট থেকে আবেদনটি বাতিল হয়ে যায়। তখন রামমোহন বিচারের আশায় চতুর্থ জর্জের কাছে দ্বিতীয় স্মারকলিপি পেশ করেন। যদিও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য রামমোহনের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হয়, তথাপি এই আন্দোলন তৎকালীন ভারতকে রাষ্ট্র-স্বাধীনতার দিকে অনেকখানি পথনির্দেশ করেছিল। আশা করি আধুনিককালের বিংশ শতাব্দীর সংবাদপত্রের ধারক ও বাহকরা রামমোহনের এই অবদানকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবেন।

উভয় স্মারকলিপিতে তিনি যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং অপূর্ব স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা ভারতবাসী কোনদিনই ভুলতে পারবে না। শুধু প্রতিবাদ করেই তিনি ক্ষান্ত হ'ননি। যখন তিনি দেখলেন যে, তাঁর স্মারকলিপিতে কোন কাজ হ'ল না, তখন তিনি তাঁর সাপ্তাহিক উর্দু পত্রিকা 'মিরাত-উল-আকবর' বন্ধ করে দেন।

এই সেদিন বাংলার আইনমন্ত্রী শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র শাসনবিভাগ থেকে বিচার বিভাগের 'আলাদা করণের' সংবাদ ঘোষণা করলে সংবাদপত্রে হৈ হৈ পড়ে গেল। চারিদিকে অভিনন্দনের জোয়ার বইতে লাগল। অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীতেই রামমোহন সাধারণ শাসন থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করবার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন বিশ্বাস না হয়—ইতিহাসকে জিজ্ঞেস করুন—দেখবেন উত্তর মিলবে ঠিকই। কেবল তাই নয়, অতি অল্পবয়স্ক তরুণদের "বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে" অবিজ্ঞোচিত নিয়োগের তিনি তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। ১৮২৭ সালের প্রারম্ভে "জুরী আক্টের" রামমোহনের তীব্র প্রতিবাদ আজও জাতির শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

কিন্তু রাজনৈতিক কার্যাবলী অপেক্ষা যে কর্ম-

প্রতিভাটি আজ রামমোহনের জীবনকে স্মরণীয় ও বরণীয় করে তুলেছে সেটি হোল তাঁর ইংরেজী শিক্ষা, —পাশ্চাত্য জ্ঞানের বিস্তারের অবদানের জন্য। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভারত-তীর্থের যে বাণী —"পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার" এই উপহার আনবার জন্যে সেদিন রামমোহন সমগ্র জাতিকে জ্বালাময়ী ভাষণে উদ্দীপ্ত করেছিলেন। লর্ড আমহার্ষ্টকে "Letter on Education"এ তিনি লিখলেন—জাতির তরফ থেকে প্রার্থনা জানালেন : —"A more liberal and enlightened system of instruction—embracing Mathematics, Natural philosop y, Chemistry, Anatomy with other useful sciences."

সংস্কৃত শিক্ষার প্রচারের জন্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তকে—"তেলে মাথায় তেল ঢালা" এইরূপ ব্যঙ্গোক্তি করে কঠোর সমালোচনা লিখলেন : "To impart such knowledge as was already current in India—would only load the minds of youths—with Grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use and the Sanskrit system of education would also keep this country in darkness." তাঁর এই যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা ও আন্দোলনের জন্যে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের ডিক্রিপ্রদান স্থাপনের পরিবর্তে "হিন্দু কলেজের" (বর্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজ) স্থাপনা সম্ভব হয়েছিল। কি বিরাট বিপ্লবী (রিভোলিউসনারী) তিনি ছিলেন যে, আজকের দিনে যখন দিকে দিকে ভারতে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা চলেছে, তখন আধুনিক ভারতের স্রষ্টা রামমোহনের ছবির দিকে তাকিয়ে মনে হয় "তুমি কি কেবলি ছবি শুধু পটে লিখা?"

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর রাজা রামমোহন হিন্দুদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারের জন্যে ১৮৩০ সালের ১৩ই জুলাইয়ে The Anglo Hindu School প্রতিষ্ঠা করেন।

কোন জাতি তার নিজের ধর্মকে বাদ দিয়ে কেবল পরানুকরণ করে বাঁচতে পারে না—এই মহা-সত্য উপলব্ধি করে রামমোহন ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে 'বেদান্ত কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দুধর্মের শিক্ষা এবং বেদান্তের অদ্বৈতবাদ প্রচারের জন্যই তিনি এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁরই এই কীর্তি থেকে আজ স্পষ্টই আমরা বিচার করতে পারি যে, রামমোহন চেয়েছিলেন পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের সাথে প্রাচ্যের দর্শনের সম্মিলনের ফলে একটি শক্তিশালী আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন মহাজাতির সৃষ্টি করা। তাঁর এই বিপ্লবী মনোভাব—"জাগো হে প্রাচীন প্রাচ!" আহ্বানেই "দিবে আর নিবে —মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে" এই ভবিষ্যবাণীর গৌরচন্দ্রিকা ছাড়া আর কি?

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের স্রষ্টা বলে স্বীকার করেছেন। বাস্তবিক রামমোহনের আগে বাংলা সাহিত্যে গদ্য বলে যা ছিল তা না থাকার মত! রামমোহনই প্রথম আদর্শ গদ্য-সাহিত্যের জনক। যখন তিনি সমগ্র জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক জনজাগরণের স্বপ্ন দেখছিলেন সেই স্বপ্নের মধুর এবং বাস্তব রূপায়ন করলেন তিনি গদ্যের মধ্যে দিয়ে। কবিতা ভাবের ও অনুভূতির বাহক। যুক্তির ধারক গদ্য। তাই তিনি দেশের সামাজিক ও নৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর সবল মত অসংখ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রবন্ধ লেখা ছাড়া তিনি ভারতের দর্শন, বেদ-বেদান্তের প্রাঞ্জল অনুবাদও বাংলাভাষায় করে গেছেন। ভবিষ্যৎ সাহিত্যের ইতিহাসে "অনুবাদ সাহিত্যে"র পথ বাস্তবিকই রামমোহন দেখান। এগুলো ছাড়া:—ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল এবং জ্যামিতির উপর তাঁর লেখা বইগুলির ঐতিহাসিক স্বীকৃতির এস্থলে প্রয়োজন।

বাঙালীর জাতীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে বর্তমানে

যে সংবাদপত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে তার প্রথম পথপ্রদর্শক কে? ইতিহাস উত্তর দেবে—রাজা রামমোহন রায়।

"প্রেস অর্ডিন্যান্সের" সেই উত্তেজনাকর দিনগুলিতে 'জুরী অ্যাক্টের' ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মাঝখানে, লর্ড আমহার্ষ্ট এবং রিপনের শাসনকালের স্মরণীয় মুহূর্তগুলিতে—"সংবাদ কৌমুদী" একমাত্র পত্রিকা ছিল—যেটা জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা ও দাবী ব্যক্ত করত,—জনমত গঠন করত। আজ বাংলা দেশের এত মাসিক ও দৈনিক সংবাদপত্র প্রচলনের দিনগুলিতে যদি মনে এই প্রশ্ন জাগে কে সেই মহাজীবন—"সংবাদ পত্রের গুরু"—সেটার উত্তর দেবার ভার বিশ্ববাণীর পাঠক পাঠিকাদের ওপরই ছেড়ে দিলাম।

ধরা যাক, আজ থেকে ৫০০ বছর পরে দেশ যদি রামমোহনের রাজনৈতিক, শিক্ষানৈতিক ও সমাজনৈতিক অবদানের কথা ভুলেই যায়—তবু সমাজসংস্কারক রামমোহনকে ইতিহাস কি কোনদিন ভুলবে? কালের পাতায় লেখা হয়ে গেছে—মহাকাল তার সাক্ষী। জাতি বলবে—ভবিষ্যত ভারতের বংশধররা বলবেন—"ভুলি নাই—ভুলি নাই—ভুলি নি তোমায়"।

কথিত আছে, রামমোহন যখন খুব ছোট্ট ছিলেন তখন একদিন তিনি শ্মশানে দেখতে পান যে, তাঁর আত্মীয়েরা জোর করে একজন আত্মীয়াকে "সহমরণের চিতায়" ঠেলে দেন। সেদিনের বালক রামমোহন তাড়াতাড়ি ছুটে যান—আত্মীয় স্বজনদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, এটা অমানুষিক বর্বর প্রথা—কিন্তু হায়। কাকস্য পরিবেদনা! শত অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও সেই সতীর নশ্বরদেহ জলন্ত চিতায় ব্যাকুল আর্তনাদের মাঝখানে জোর করে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। এক দৃষ্টিতে সেই চিতার দিকে তাকিয়ে রামমোহন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—এ বর্বর প্রথার লজ্জা থেকে, গ্লানি থেকে হিন্দু সমাজকে বাঁচাতেই হবে! তাই তৎকালীন গোঁড়া হিন্দুদের বিরুদ্ধাচরণ হয়েও তিনি কর্মে ঝাঁপ দেন এবং অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর আইন করে সরকার সতীদাহ বন্ধ করে দেন। আজ সেই কথা মনে করলে কবির কথায় কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে ইচ্ছা করে:

"তোমার আদর্শব্রত, তব বাণী, তোমার সাধনা
স্বপ্নময় বঙ্গভূমে অর্পিয়াছ সত্যের চেতনা—
রাজা-রাজ্য জনবিশ্ব, জাগে আর কোথা হয় লীন,
ভূরাজ্য বিহীন রাজা মনোরাজ্যে রাজে চিরদিন।"

* * *

রামমোহনই প্রথম ভারতীয়, যিনি সমগ্র হিন্দুসমাজকে "চ্যালেঞ্জ" দিয়ে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভারতবরেণ্য স্বামিজীর কথাও মনে পড়ছে।

ভারতের নির্যাতিতা এবং অবহেলিতা নারী জাতির জন্য রামমোহন ছিলেন অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত। "না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত হায় জাগে না জাগে না" এই সত্য তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহু বিবাহের তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন: "This horrible polygamy among the Brahmans is directly contrary to the Law given by ancient authors."

অষ্টাদশ শতাব্দী, তথা আজিকার নারীশিক্ষার উদ্গাতা রামমোহন। তিনি বুঝেছিলেন যে, নারীজাতিকে অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢেকে রাখলে এ জাতি কোনদিনই উন্নতি লাভ করতে পারবে না। তাই তিনি বারবার জাতিকে স্ত্রীশিক্ষার জন্য জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন: "Proper education and facilities for women would prove in no way inferior to men." এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার

করতে গিয়েছিলেন, তখন সে দেশের নারী-জাগরণ ও শিক্ষা দেখে অনেক চিঠি ও প্রবন্ধে তাঁরাও নারী-শিক্ষার প্রতি নূতন আলোকপাত করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর "চিঠিগুলির" অনেক জায়গায় আমেরিকার নারীদের শুভভাব দেখে তাঁদের বলেছিলেন, যেন তাঁরা "ম্যাডোনা"! অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামমোহন যে কেবল নারীজাতির শিক্ষার কথা চিন্তা ও আন্দোলন করেছিলেন তাইই নয়—তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধ: "Brief remarks regarding modern encroachments on the ancient right of females—according to the law of Hindu inheritance"—চিরদিন জাতির ইতিহাসে নারীজাতির প্রতি প্রাণভরা সহানুভূতির শ্রেষ্ঠ 'সনদ' হিসেবে বেঁচে থাকবে। রামমোহন তাঁর পত্রিকা মারফৎ একবার অর্থসংগ্রহের পরিকল্পনা করেছিলেন,—কারণ তিনি এ দেশের বিধবাদের উন্নতি মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন। কথিত আছে যে, বিলাত থেকে ফিরে রামমোহন বিধবাদের পুনর্বিবাহ দেবার আন্দোলন করবেন বলে ঠিক করেছিলেন। কিন্তু হায়! মহাকাল তাঁকে আমাদের মধ্যে থেকে সরিয়ে নিলে—তাই তাঁর অপূর্ণ সাধ ও আকাঙ্ক্ষা, পরবর্তী যুগের ঈশ্বরচন্দ্র প্রমুখ বংশধরেরা পূর্ণতায় নিয়ে গিয়েছিলেন, এটা আজ ঐতিহাসিক সত্য।

গোঁড়া হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও রামমোহন জাতিভেদের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। ভারতবাসী যদি সবচেয়ে কোন মহাপাপ করে থাকে—তবে সে হচ্ছে, একদিন মনুষ্যত্বের সম্মান না দেওয়া। স্বামিজীর কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, "একদিন যেন আমাদের ধর্মটা 'হাঁড়ির ধর্ম' হয়ে দাঁড়িয়েছিল।" রামমোহন যেন বিদ্রোহীর ন্যায় সত্য ও জ্ঞানের বেদীমূলে দাঁড়িয়ে "দুর্ভাগা দেশকে" সাবধান করে দিয়েছিলেন: "The distinction of caste system introducing innumerable divisions and subdivision, among them has entirely deprived of the patriotic feelings and the multitudious religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise."

সেদিনের 'ইঙ্গ বঙ্গের' দিনগুলি স্মরণ করে আজ স্বভাবতঃই ধর্মের ক্ষেত্রে রামমোহনের অবদানের কথা মনে জাগে। "ব্রাহ্ম সমাজের" প্রতিষ্ঠা সেদিন যেন আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীকে পরধর্ম অনুকরণের হাত থেকে যে কেবল বাঁচিয়েছিল তাই নয়, পরন্তু এ দেশে এক নবযুগের ও অরুণোদয়ের আলোকে ভ'রে তুলেছিল—'আলোর ঝরণাধারায়' সেদিন অন্তরের কালিমা বিদূরিত করেছিলেন তিনি সমগ্র জাতির, তাই আজও আমরা রামমোহনকে হিন্দুধর্মের একজন অন্যতম রক্ষক বলে শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম জানাই।

পরমপুরুষ ঠাকুর রামকৃষ্ণের—'যত মত তত পথের' উদ্গাতা ছিলেন রামমোহন। "Cows are of different colours but the colour of the milk they give is the same. Different teachers have different opinions but the essence of every religion is to adopt the true path." এই সঙ্গে স্বামিজীর সেই যুগান্তকারী বাণীর সাথে অদ্ভুত ও অপূর্ব মিল আছে। উদ্ধৃত করবার লোভটুকু সামলাতে পারলাম না। "To proclaim and make clear the fundamental unity, underlying all religions was the mission of my 'Master'. To the teachers have taught special religions which bear their names but this great teacher of nineteenth century left all religions undisturbed. Because he had realized that all religions are the part and parcel of that "one eternal religion."

সেইজন্য রামমোহন কোন ধর্মমতকেই অবজ্ঞা

করেননি, যদিও তিনি হিন্দু বলে ছিলেন গর্বিত। এই পরমতসহিষ্ণুতা অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে সত্যিই দুর্লভ। তাঁর ঐতিহাসিক ভবিষ্যবাণী আজ সত্য এবং বাস্তবতর রূপ লাভ করেছে। "Followers of every prevailing religion would reckon me after my death as one of their co-religionist. The Mohammedans would call me a "Zaburdust Moulavi"—the Hindus would call me a "Vedanta Keshori"—the Christians—"a Unitarian christian." স্বধর্মবিকৃত ধর্মের মাদকতার দিনে সেদিনের রামমোহনের কথাগুলি স্মরণ করে মনে হয়—জয়তু রামমোহন। তোমার আদর্শ ধীরে ধীরে ধর্মান্ধ লোকের অন্তরে প্রবেশ করুক।

তৎকালীন হিন্দুসমাজ রাজা রামমোহনকে "দেশদ্রোহী", "ধর্মদ্রোহী" বলে অপমানিত করেছিল। হিন্দুদের এই সঙ্কীর্ণ মনোভাব দেখে রামমোহন একটি ঐতিহাসিক অথচ বেদনাময় ভবিষ্যবাণী উচ্চারণ করেছিলেন :

"A day will come when my humble endeavours will be viewed with justice—perhaps acknowledged with gratitude."

অবশেষে সেই দিন আজ এসেছে। কেবল স্মৃতির মন্দিরে তাঁর কথা আমাদের অন্তরে জাগিয়ে রাখলেই চলবে না—তাকে শাশ্বত সনাতন রূপ দিতে হবে। বাংলার এই বিদ্রোহী সন্তানের একখানি ছবি সেদিন ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহেরু পশ্চিম বাংলার বিধানসভায় উন্মোচন করেছেন। কিন্তু আরও দারিদ্র বাংলার তথা পশ্চিম বাংলা সরকারের আছে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। রামমোহনের কোন মর্মর মূর্তি কলকাতায় আছে বলে আমার জানা নেই। আজও ব্রিটিশ থেকে তাঁর দেহাবশেষকে সরকারী মর্যাদায় আনা হয়নি। কবে হবে? কবে আত্মবিস্মৃত বাঙালী রামমোহনের স্মৃতি-মন্দিরে দাঁড়িয়ে চির বিপ্লবী হিন্দুস্তানকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবে? সেদিন কি আজও স্বাধীন ভারতে আসেনি? ইতিহাসের পাতায় আজও কি তিনি ঘুমিয়ে থাকবেন? সেদিনের কথা স্মরণ করে রামমোহনের প্রতি আদি আন্তরিক প্রণাম জানাই :

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ,
পশ্চাতে ফেলিয়া যায়, কীর্তিরে তোমার বারংবার"।

এবং—

"যতদূর চাই,—
নাই, নাই, সে পথিক নাই।"

সত্যানুভব

শ্রীকণিভূষণ চক্রবর্তী

বিশ্বমাঝে এক সত্য নিশিদিন করি অনুভব—
তুমি আছো নিত্য ভাসি। দৃশ্যমান্ যাহা কিছু সব
তোমারি প্রকাশ—তব নিপুণ সুচারু ছদ্মবেশ;
আপনারে আস্বাদিতে তোমার লীলার নাহি শেষ।
নবীন বিচিত্র রূপ ধরি' তুমি ওগো লীলাময়
খেলিতেছ চিরন্তন খেলা তব—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়।
সৃষ্টির মাঝারে স্রষ্টা লুক্কায়িত র'য়েছ গোপনে,
সৌন্দর্যে মাধুর্যে পাই তব স্পর্শ নিভৃত স্বপনে।
সুখের মাঝারে হেরি তোমার আনন্দময় হাসি,
দুঃখ-মাঝে শুনি তব করুণ রাগিণীভরা বাঁশি,
সাধনা-সঙ্গীত। ওগো হৃদয়বিহারী প্রভু মম,
সব চেয়ে সত্য তুমি,—জ্যোতিমান দিবাকর সম।

শ্রীঅরবিন্দের "কর্মযোগ"

শ্রীঅবনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

শ্রীভগবান বলিলেন, কোন অবস্থাতেই জ্ঞানী বা মূর্খ ক্ষণমাত্রও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, প্রকৃতিজ গুণসমূহ সকলকেই অবশ করিয়া কর্ম করাইয়া থাকে।

এই যে সকল অবস্থাতে জ্ঞানী বা মূর্খ প্রকৃতিজ গুণসকলের বশীভূত হইয়া ক্ষণমাত্রও অকর্মণ্য থাকিতে না পারিয়া কর্ম করিতেছে ইহার নিদান অন্বেষণ করিলে দেখা যায় সৃষ্টির অন্তরালে রহিয়াছে স্রষ্টার বহুত্বের বাসনা। এই বহুত্বের বিকাশ হইতেই বিচিত্রতার উদ্ভব হয় ও বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান—কর্মের গ্রন্থিতে সুচারু কর্মসম্পাদনে সাফল্যের জয়মাল্য লাভের অতুল আবেগ।

ইহা স্বীকার্য যে, প্রকৃতিজ গুণসমূহের দ্বারা সকলেই কর্ম করিতেছে, প্রকৃতির ভাঙাগড়া খেলার উপাদান হইতেছে, বহ্নিমকে ক্ষয় ক্ষত করিতে মূল্য-স্বরূপ সারাজীবন অদৃষ্ট প্রকৃতির হাতে সঁপিয়া দিতেছে। এই যে ক্রম আবর্তমান কর্মচক্রের মধ্যে সুখদুঃখ, ভালমন্দ, আলো-আঁধারের নিত্য ক্রিয়া চলিতেছে, ইহার আবর্তে আবর্তিত হইয়াও জীব কিরূপে মুক্তগতির স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করিতে পারে?

শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন,—"Our works are part of an indivisible Cosmic action; they are put or, more accurately, put themselves into their place in the whole out of which they arise and their outcome is determined by force, that overpass us!" —এই যে 'force' ইহার তালে তালে ছন্দ মিলাইয়া পদক্ষেপ করিতে পারিলেই কর্মের সাফল্য। কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে উপায় কি? উপায় হইল কর্মযোগ।

সাধারণভাবে কর্মযোগ বলিতে আমরা বুঝি কর্মের মাধ্যমে যোগ—সকল কর্মের উৎস যিনি তাঁহার সঙ্গে তাঁহারই মাধ্যমে যোগ। যেরূপ কর্মসম্পাদনের দ্বারা আত্মার পূর্ণতা সিদ্ধ হয় সেই কর্মকরণের চেষ্টাই কর্মযোগের অপরিহার্য উপকরণ। শ্রীঅরবিন্দের বাণী এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য,—"Action in the world is given us first as a means for our self-development and self-fulfilment". সুতরাং কোন কর্মকেই হেয় জ্ঞান করা উচিত নহে। ইহার ফলে, যে মানুষ লোকচক্ষে বড় কাজ করে বলিয়া প্রকাশ তদপেক্ষা যে মানুষ সাধারণ চক্ষে ছোট কর্ম করে সেই মানুষ ঐ কর্ম হেতু নীচ নহে; একজন মানুষকে তাহার বাহ্যিক কর্ম দেখিয়া বিচার করা উচিত নহে, তাহার কর্ম পদ্ধতির নৈপুণ্যের দ্বারাই সেই ব্যক্তি বিচার্য। সুতরাং কর্মপদ্ধতির নৈপুণ্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ইহা আমাদের আলোচ্য।

সর্বপ্রথমেই দেখা যায়, জীবের মধ্যে 'আমি কর্ম করিতেছি'—এইরূপ 'অহংকার' বিদ্যমান আছে। যিনি এই 'অহংকার'মুক্ত, তিনিই কর্মমুক্ত, বুদ্ধ, তিনিই চৈতন্যময় চৈত্যপুরুষের দ্বারা চালিত, সুখ-দুঃখাতীত আনন্দে প্রতিষ্ঠিত। এই আনন্দের উৎস সন্ধানেই জীব ভ্রান্ত পথের পথিক হইয়া নিরানন্দের অতল সাগরে নিমজ্জিত হয়। অতএব শুদ্ধ, মুক্ত, বুদ্ধ হইয়া নিষ্কাম কর্মযোগী হইলেই আনন্দলাভে সমর্থ হওয়া যায়। ইহার জন্য প্রয়োজন জীবের সচেতনতা—সকল পদার্থ ও সকল প্রবহমান ক্রিয়ায় স্বীকার করিতে হইবে আপন চৈত্যপুরুষকে—আপন চেতনাময় পুরুষকে যিনি স্থূল অহংকারের পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়া বুদ্ধিক্ষেত্রের বহির্ভূত জগতে নিরাসক্তরূপে কর্ম করিতেছেন। সর্বভূতের

আকর, জ্ঞান, প্রেম, জীবনীশক্তি, সর্বকর্মের সাফল্য-বিফলতা প্রদাতা যিনি স্রষ্টা তাঁহার সহিত সর্বভাবে সর্ব অস্তিত্বে, সাজ্রে, সূক্ষ্মে সকল কর্মে মিলিত থাকিতে পারিলেই কর্মযোগের সাধন হইবে।

আমাদের মধ্যে প্রকৃতির দ্বিধারাই কর্ম করিতেছে —ঊর্ধ্ব ও নিম্ন প্রকৃতির ধারা। প্রকৃতির ঊর্ধ্বমুখী ধারায় আমাদের সত্তা ঈশ্বর-শক্তির সহিত মিলিত হয় এবং নিম্নধারার প্রচাপে ঐ ঊর্ধ্বধারা ব্যাহতভাবে বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া বিষয়সুখ সম্ভোগে লালায়িত হয়। এই প্রকৃতির নিম্নধারায় ঘৃণা, পছন্দ-অপছন্দ, আসক্তি, সুবিধা-অসুবিধা, ভাল-মন্দ প্রভৃতি ভাবগুলি জীবের কর্মযোগের বাধাস্বরূপ হইয়া থাকে। এ হেতু, কর্ম-যোগীর পক্ষে এ ভাবগুলি বর্জনীয়, ইহার জন্য দৃঢ়তার প্রয়োজন। ভাগবতী প্রকৃতিতে আসুরিক বিকারকে ধ্বংস করিতে দৃঢ়তার প্রয়োজন অতীব স্বাভাবিক, কিন্তু জগতক্ষেত্রে জীবের পক্ষে দৃঢ়তা দ্যোতক রাগ, দ্বেষ বা ঘৃণার প্রশ্রয় দেওয়া নহে। কারণ কর্মযোগীর ভাবরাজ্যে লৌকিক বিষয়ের প্রতি থাকা চাই সমতা, অবিকম্পিত, অবিচলিত সমতা,—জীবনের পথে সুখে-দুঃখে সমভাব। সমতার জন্য অজ্ঞতা বা অন্ধতাকে বরণ করিয়া অবিচলিত থাকা উচিত নহে, মূল বিষয়ে সংস্কারের অস্বচ্ছতাকে প্রশ্রয় দেওয়াও অবাঞ্ছনীয়।

পূর্বেই স্বীকার করা হইয়াছে যে, বৈচিত্র্য বা পার্থক্যের প্রয়োজন আছে। এই প্রকাশ-বৈচিত্র্যকে সমর্থন করিলে বিচিত্রতার পশ্চাতে যিনি স্বয়ং-সম্পূর্ণ জীবের হৃদয়গুহায় লুক্কায়িত আছেন তাঁহাকেও সমর্থন করা অর্থাৎ সকল আগত করণীয় কর্মের মধ্যে তাঁহারই বাঞ্ছনা স্বীকার করিয়া সেই কর্ম সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিতে যত্নতৎপর হওয়া উচিত।

এই একই কারণে মানসিক, প্রাণিক, দৈহিক ও আত্মিক একতানতা রক্ষা করিতে হইবে,—হউক না কেন ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, সম্মান অসম্মান, সুযশ-অপযশ, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য প্রভৃতি বিজড়িত যে কোন ঘটনাই সংঘটিত, সকলকেই যেন আমরা সাদরে বরণ করিতে পারি অবিচলিত সমতার অচলায়তনে। ইহার অন্যথায় জাগতিক নিয়মের কবলিত অবস্থায় জীবের জন্য রহিয়াছে স্তরে স্তরে দুঃখ, নৈরাশ্য ও অসাফল্য। স্বামী অভেদানন্দ বলিয়াছেন, "A boat can stay on the water, but if the water gets into the boat, the boat is doomed. We can live in the world, but if the worldliness gets into us we are doomed!" ইহার জন্যই কর্মযোগীর এই সমতার অচ্ছিদ্রতরণীই ভবার্ণবের ভরাডুবি হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে।

এখন দেখা যাউক, সমতার পর কর্মযোগীর কিরূপ ভাব অবলম্বন করার সার্থকতা আছে। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "He (Karmayogin) must be always aware of a Force, a Presence, a Will that acts through his individual nature." সেই পূর্বোক্ত কথা, সাধারণ প্রকৃতি বহির্ভূত একটি মহত্তীশক্তিকে স্বীকার করা ও তাঁহার সামান্য ও ইচ্ছাধীন হইয়া কর্ম করা, ইহার দ্বারা 'অহম্'এর নিরসন ও স্বয়ং সত্তার পূর্ণ প্রকাশের পথ সুগম করণে সাহায্য করা হইবে।

কেহ কেহ এরূপ সন্দিগ্ধচেতা আছেন যাঁহারা কর্মের মাধ্যমে যোগের কথা শ্রবণ করিলে নাসিকা কুঞ্চনে কালক্ষেপ করিতে দ্বিধাগ্রস্ত হইবেন না বা নজির দেখাইয়া বলিবেন, কর্মযোগের সাধন করিয়া কেহ কি আনন্দলাভ করিয়াছে বা নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? সে সকল বস্তুতান্ত্রিক বোদ্ধাদের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলা হয়ত অবাঞ্ছনীয় হইবে না যে, বিশ্বস্ততার অভাবে কোন কর্মই কোন কালে সাফল্য লাভ করিতে পারে না। এই মনোভাবের সংশোধনে শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—"Whoever sincerely enters the path of works, must leave behind him the stage in which need and desire are the first law of our nature." বলা বাহুল্য, এই প্রকৃতি নিম্নপ্রকৃতির ধারার বিষয়েই উক্ত হইয়াছে। কর্মযোগীর হৃদয়ে

থাকিবে অসীম বিশ্বাস, মানসিক চাঞ্চল্য হইবে স্থির। বিশুদ্ধ জ্ঞানের নিকট কর্মযোগীর মনের সমর্পণ হইলে মানসিক চাঞ্চল্যের নিবৃত্তি হইবে সন্দেহ নাই এবং আপন গন্তব্যে পৌঁছাইবার নিমিত্ত আস্পৃহা ও তিতিক্ষা তাহার সহায় হইবে। ইহার সঙ্গে প্রয়োজন হইবে কর্মসাফল্যের নিমিত্ত অভ্রান্ত অভ্যাস; কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, "Practise unfalteringly with a heart free from despondency."

সর্বকালের মানুষের জন্য সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য যোগের পন্থা কর্মযোগ ব্যতীত আর কি নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে? এস্থলে বিশ্লেষিত কর্মযোগের সকল পালনীয় নির্দেশগুলি সকলের দ্বারাই অনুসৃত হইতে পারে। কর্মযোগীর নির্লিপ্ততা, আত্মসমর্পণ, বিশ্বস্ততা, সচেতনতা, সমতা, তিতিক্ষা ও নির্ভীকতা পৃথিবীর সকল মানুষেরই নিকট আদৃত হইবে সন্দেহ নাই। মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের 'পূর্ণযোগ'-এর মধ্যে কর্মযোগ যেহেতু সর্বোচ্চ স্থানলাভ করিবে ইহাই স্বাভাবিক। এই বিশ্বে জয়-পরাজয়ের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ও আশা-নৈরাশ্যের আরোহণ অবরোহণ সর্বত্রই প্রাহ্য—কর্মের শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় সাধারণ মানুষ প্রকৃতির এ নিয়মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না বলিয়াই কর্মযোগী কর্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া কর্ম করিয়া থাকেন। কর্মযোগীর নিরাসক্ত ভাবই মুক্তিপ্রদায়ক হইয়া থাকে—বাসনা তাঁহাকে নাগপাশে বন্ধন করিতে পারে না, Spiritual impersonality বা আধ্যাত্মিক অব্যক্তিত্বই তাঁহার ভীতি, জড়তা ও তমিস্রাচ্ছন্নতা দূরীকরণে বিদ্যমান হইয়া উঠে।

সুতরাং, হে কর্মী, হে কর্মযোগী, এই বিশ্বের বিরাট সত্তায় আপনাকে ক্ষুদ্র ভাবিবেন কেন—বিরাট স্বরাটের সঙ্গে একতার মিলনে আপনাকে জানিয়া বুঝিয়া কর্ম করিয়া আংশিকতা হইতে পূর্ণতার আস্বাদনে বিমুক্ত হউন। শ্রীঅরবিন্দের মহাবাণী স্মরণ করিয়া দেখিব তাঁহার বরাভয় বাণী অধুনা কিংকর্তব্যবিমূঢ় মানুষের অন্তরে কিরূপ আশার বারতার স্বনন তুলিয়া তাহাকে যথাযথ কর্মযোগী হইবার সুযোগ দান করে! শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন:

"Why shouldst thou limit thyself? Feel thyself also in the sword that strikes thee and the arms that embrace, in the blazing of the sun, and the dance of the earth, in the flight of the eagle, and the song of the nightingale, in all that is past and all that is pressing forward to become. For thou art infinite and all this joy is possible to thee."

ইহার বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন—আপন প্রকাশে আপনি সুন্দর, অনির্বচনীয়, অতর্ক্য, অমেয় ও শাশ্বত সত্য।

ঈশ্বর ও জীব যেমন জল ও জলের বিম্ব (বুদ্বুদ); ঈশ্বর আছেন বলেই জীব-জগৎ আছে। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। ঈশ্বর যেন সমুদ্র আর সমস্ত জীব সেই সমুদ্রের এক একটি ঢেউ। গাছ আর পাতার মতন, সূর্যের সঙ্গে কিরণের মতন আমরাও সব সময়ে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে আছি। তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনও কালেই ভেদ নেই। আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রাণ সমস্ত শক্তির মূলই তিনি। যেমন সমুদ্র না থাকলে ঢেউ থাকতে পারে না তেমনি ঈশ্বর না থাকলে কোনও জীবই থাকতে পারে না। কারণ ঈশ্বর যে সকল সত্তার মূল সত্তা।

—ব্রহ্মানন্দ

STUDENTS • COMMON-ROOM •

ঘাটশীলার পথে

শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়

সারা রাত জেগে বসে আছি। ঘুম আসছে না। বাংলার এক অখ্যাত ছায়া-ঘেরা পাখী-ডাকা গ্রামে আমার জন্ম। জন্মাবধি বাংলার বাইরে কখনও যাইনি। এবার তা যাব—ঘাটশীলায়। হৃদয়ে এক অজানা আনন্দ এসে বারে বারে নিদ্রাদেবীকে নাড়া দিয়ে দিচ্ছে। চারদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম, অন্ধকার। কেবল—"শূন্যে অনন্ত গগনে ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি, নক্ষত্রমণ্ডলী সারি সারি বসি আছে, স্তব্ধ কুতূহলী; নিঃশব্দ শিশুর মতো···," শেষ রাতের দিকে সামান্য একটু তন্দ্রা এসেছিল। নাম-না-জানা পাখীর কাকলিতে সেটুকুও ভেঙ্গে গেল। ঘড়িতে তখন ৫টা। ষ্টেশনের দিকে চল্লুম। গিয়ে দেখি শ্রীসন্তোষ দত্ত, দয়াল দত্ত ও সৌরেন্দ্র বসু আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সৌরেন যাবে না—আমাদের এই অভিযানে উৎসাহ দিতে এসেছে। গাড়ী ৫টা ৪৪ মিনিটে ছাড়লো ও যথাসময়ে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছল। এখান থেকে আমরা মটরবাসে হাওড়া ষ্টেশনে যাই। তখন ৭টা ৫৫ মিঃ বেজেছে। সকলের আগেই আমি ঘাটশীলাগামী গাড়ীতে উঠে জানালার ধারে গিয়ে বসলাম। ৮টা ৩০ মিনিটে ট্রেণখানি ছাড়লো। ট্রেণ থেকে দেখতে লাগলাম দু'পাশে বাংলার শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত মাটি—সীমাহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সে প্রান্তর শুষ্ক ও কঠোর। মনে হয় যেন কত যুগ যুগ ধরে অবহেলিতভাবে পড়ে আছে। তারি মাঝে কোথাও দু'একটী শালগাছ দাঁড়িয়ে আছে, ঊর্ধ্বাকাশে কয়েক মুষ্টি নিক্ষেপ করে এক জোটা জলের আশায়। ট্রেণখানি সব ষ্টেশনে না থেমে একেবারে থামলো বীরসিংপুর ষ্টেশনে এসে বেলা ১টা ৩৮ মিনিটের সময়। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী আবার ছাড়লো। কয়েকটী ষ্টেশন পরে সেই ভীষণ দামোদর নদ। একদা বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে এই নদ সাঁতরেই পার হোয়েছিলেন বীর জননীর পদপ্রান্তে ঠিক সময়ে পৌছানর জন্য। সেই কথা ভাবতে ভাবতে আপনা আপনি আমার হাত দুটি একবার কপালে গিয়ে ঠেকলো—সেই মহামানবের উদ্দেশ্যে। কিছুক্ষণ পরে দেখতে পেলাম সেই ছেলে-বেলার পড়া রূপনারায়ণ নদ। কি বিশাল সেতু! নদের একপাশে বহুদূর পর্যন্ত চরা পড়ে আছে, আর এক দিকে, ঢেউ-এর খুব মাতামাতি না থাকলেও, বেশ স্রোতের টান রয়েছে। গাড়ী এসে খোলাঘাট ষ্টেশনে থামলে, সেখানে সুরু হয়েছে মেদিনীপুর জেলা। যন্ত্রদানব আবার যাত্রা করলো তার সুদীর্ঘ চলার পথে। দু'পাশের সীমাহীন মাঠ দূরে দিক-চক্রবালের সাথে যেন মিশে গেছে। পাঁশকুড়া ষ্টেশনের পর সরু কাঁসাই নদী এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে। সাত আটটী ষ্টেশন অতিক্রম করে ট্রেণখানি এসে দাঁড়াল খড়্গপুরে। তখন ১১টা ৪৫ মিঃ। এতবড় প্ল্যাটফর্ম, এর আগে আমি আর দেখিনি। শুনেছি পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বড় প্ল্যাটফর্ম শোনপুরে। দ্বিতীয় এই খড়্গপুরে। আমাদের গাড়ী ইঞ্জিন বদলে পুনরায় নতুন উদ্যমে চলতে আরম্ভ করলো কয়েকটী ষ্টেশন পার হোয়ে ঝাড়গ্রাম ষ্টেশনে এসে গাড়ী দাঁড়াতেই বুঝতে পারলাম এইবার সুরু হবে আমাদের পার্বত্য অভিযান। কারণ, আশে-পাশে দেখছি গভীর শালের জঙ্গল। গাড়ী ছাড়লো। গিড্‌নী ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াতে হঠাৎ দেখতে পেলাম কালো জমাট মেঘ প্রায় সারা আকাশটার দিকে দিকে ছেয়ে ফেলেছে। মনে ভয় হতে লাগলো, পাহাড়ী দেশে যাচ্ছি, যদি বৃষ্টি পড়ে তাহলে বেড়ানো হবে না। সহসা সন্তোষদা দূরের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বললেন—"ঐ দূরে

যেগুলো মেঘের মত দেখতে, সেগুলো কিন্তু মেঘ নয়, পাহাড়।" আশ্বস্ত হলাম।

গভীর বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি দূরের ঐ কালো পাহাড়গুলির দিকে। মনে হচ্ছে কত কাছে, কিন্তু যত গাড়ী এগিয়ে চলেছে ততই পাহাড়গুলো দূরের দিকে সরে যেতে লাগলো। সঞ্জীবচন্দ্রের "পালামৌ"র কথা মনে পড়ে। দেখতে পাচ্ছি তিনি যা লিখেছিলেন তা বর্ণে বর্ণে মিলে যাচ্ছে। তারপর পাশে পাশে বিরাট শালবন হল সুরু। দু'পাশে সুউচ্চ খাড়াই পাহাড়, আর মধ্যে দু'খানা লোহার পাতের 'পরে যান-বাহনের অবিরাম অগ্রগতি। পাহাড়গুলো দেখলে মনে হয় কত যুগ যুগ ধরে কত কষ্ট সহ করে কোন অতীতের সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে। যেন মহাকালের প্রহরী। পাহাড়গুলোর গায়ে ছোট ছোট জঙ্গল। গাড়ী খলতুমে এসে দাঁড়ালে মনে হতে লাগলো পাহাড়গুলো কাছাকাছি। দূরে যেগুলো ছোট গাছের জঙ্গল বলে মনে হচ্ছিল সেগুলো এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে বিরাট শালের জঙ্গল। ষ্টেশন থেকে গাড়ী যখন ছাড়লো আমরা তৈরী হয়ে নিলাম। কেননা এর পরেই আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত ঘাটশীলা ষ্টেশন আসছে। সেখানে নামতে হবে। কতক্ষণ অধীর আগ্রহে বসেছিলাম —এই ঘাটশীলার কোলে যাবার জন্য। বেলা ঠিক ৪টার সময় গাড়ী এখানে পৌছালো ও আমরা সাগ্রহে নেমে পড়লাম। তারপর রিক্সায় করে হাহিগড়া গ্রামে সন্তোষবাবুর বন্ধু মন্মথবাবুর বাংলোয় গেলাম। যাওয়ার পথে চারপাশে অগণিত ছোট-বড় পাহাড় উদাস দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল ঘাটশিলা না প্রেতশিলা।

যাক্, সেদিন পূর্ণ বিশ্রাম নিতে শুয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙলো—বিচিত্র পাখীর কাকলীতে নয়—উষার নব আগমনের রক্তিম আভায়। পাহাড়ের বুকে সূর্যোদয়। প্রাতঃকৃত্য সেরে বেরিয়ে পড়লাম নব অভিযানের পথে। শুনেছিলাম, আমাদের প্রিয় সাহিত্যিক ৺বিভূতিবাবুর বাড়ী এই দাহিগড়ায়। মন্মথবাবুকে ৺বিভূতিবাবুর বাসভবনের কথা জিজ্ঞাসা করতে তিনি ঠিক আমাদের বাংলোর পিছনে গোল খোলায় ছাউনী একখানি পোড়ো বাড়ী দেখিয়ে দিলেন। তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এলাম। এক মিনিটের মধ্যে সেই পোড়ো বাড়ীর সামনে এসে গেলাম। বাড়ীর অবস্থা দেখে চোখ থেকে নেমে এল দু' ফোঁটা জল। বাড়ীটার একটা অংশ ভাঙ্গা। পিছন এবং পাশে পাহাড়ী জঙ্গলের দখল। একবারে ছাদ ভেঙ্গে পড়েছে। অতি সন্তর্পণে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। ঘরের জানালা দরজা কে বা কারা খুলে নিয়ে গিয়েছে। পাহাড়ী জঙ্গলের আধিপত্য দেখলাম ঘরের মধ্যেও বেশ খানিকটা। সামনে দেখলাম একটী স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে। শ্রদ্ধার ভক্তিতে

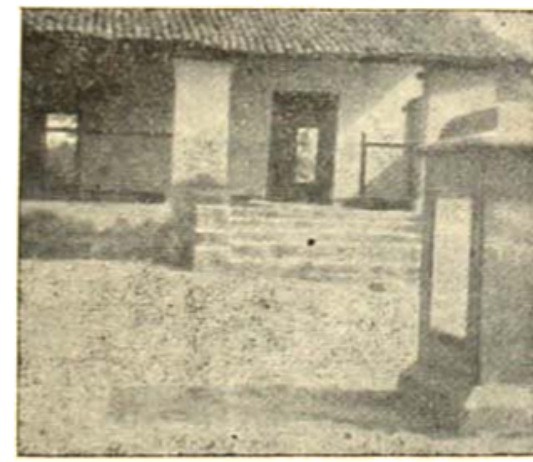

৺বিভূতিভূষণের স্মৃতি-ফলক

আমরা চোখের জলের সাথে হাত দুটী জোড় করে নমস্কার জানালাম তাঁর অমর আত্মার উদ্দেশ্যে। 'বরেণ্য বাঙ্গালী, বাংলার অমর কথাশিল্পী, বাংলার অমূল্য সম্পদ। হে মহান্, তুমি আবার ফিরে এসো আমাদের পল্লীমায়ের শ্যামল কোলে।' হৃদয়ে ছিল তাঁর উচ্চ উদ্দীপনা। তাই তিনি অন্ধকার রাত্রে ঘোড়ায় চড়ে দুর্গম জঙ্গলে, পার্বত্য পথে ঘুরে বেড়াতেন। যেন কোথাকার অমৃতলোকের সন্ধান

পেয়েছেন, অথচ কেন্দ্রটী খুঁজে পাচ্ছেন না। মনে পড়ে 'আরণ্যক' বইতে একস্থানে লিখেছেন "ঘর মনে থাকলে পথ চলা যায় না।" তিনি যে চিরকাল পথকে ঘর মনে করে এসেছেন তা' "আরণ্যক", "বনে পাহাড়ে" পড়লেই বোঝা যায়। পল্লীর সরল মনের ছবি, বাংলার মানুষের মন-খোলা হাসি "পথের পাঁচালী"তে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে লেখা রয়েছে :

"তাপস বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
আবির্ভাব : ২৮শে ভাদ্র, ১৩০১
তিরোভাব : ১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৪৭

'পথের পাঁচালী'তে গাহি অমর সঙ্গীত,
পথক্লান্ত অতি শ্রান্ত হে মোর পথিক।
অরণ্যের কোলে তুমি লভিছ বিশ্রাম,
'আরণ্যক' রচয়িতা লহ হে প্রণাম।
'দেবযান' সৃজয়িতা হে মহাতাপস,
চরণ-পঙ্কজে মোর হে মোর মানস
'দৃষ্টি প্রদীপে'তে মম দৃষ্টি দাও খুলে
'যাযাবর'-কে রেখ তুমি সদাই কুশলে।
মমার্জ্জিত পুণ্য যদি কণামাত্র থাকে
সকলি অর্পিনু আমি হে প্রিয় তোমাকে।

* * *

উভয়ের পুণ্য সহ পশ স্বর্গপুরে
হউক সুগম যাত্রা যোগিনীর বরে।
'অপরাজিত' কীর্ত্তি তব রাখি ভূমিতলে,
স্বর্গ-সুখে এ দাসীরে থেকো নাক ভুলে।

প্রতিষ্ঠা দিবস আত্মিক মিলনাকাঙ্ক্ষিনী
রথযাত্রা, ১৩৫৮ কল্যাণী —"

* * *

নব উদ্যমে বেরিয়ে পড়লাম সামনের রাস্তায়। চল্লাম নিকটের ফুলডুংরী পাহাড়ের পথে। সন্তোষদা, দয়াল ও আমি চলেছি, বিভূতিবাবুর সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। রাস্তাটী নিকটের সাঁওতাল পল্লীর মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে। ছোট ছোট কুঁড়েঘর। কি সুন্দর পরিষ্কার। প্রতিটী ঘর পাহাড়ী লাল মাটির রং দিয়ে লেপা। কোনটা লাল, কোনটা বা কালো আবার কোনটা সাদা। সাঁওতাল শিশু, যুবা, স্ত্রী, কুমারী প্রত্যেকেই বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কি সুন্দর নিটোল স্বাস্থ্য। খানিকটা দূরে গিয়ে দেখলাম একটা হলদে রংএর টিনের সিনেমা হল। নিকটের একটী দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এত নির্জন জায়গায় সিনেমা চলে কেমন করে?" দূরে যেখানে রেল লাইনটা বেঁকে গেছে আর একটা মিলের ধোঁয়া উঠছে, সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে দোকানী বল্লো, "মিলের লোকেরা এখানে দেখতে আসে।" কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে ফুলডুংরী পাহাড়ের কোলে বিরাট শালবন! কাছে ছোট ছোট বাংলো। এগুলো বনাধিকর্তাদের (foresters) জন্য। কুলিরা এখানে কাজ করছে। আমরা পাহাড়ে ওঠবার জন্য সামনের দিকে এগোতে লাগলাম। ওপরে ওঠবার জন্য ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাস্তা কাটা হয়েছে। আমরা একেবারে পাহাড়ের মাথায় উঠলাম। ওখানে বিরাট শালগাছ। ছোট ছোট নুড়ি পাথর এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। গাছটীর তলায় এসে বসে পড়লাম। পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের দৃশ্যটা অপূর্ব। চারদিকে পাহাড়ের বেড়া, মধ্যখানে আমরা। দূরে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে B. N. R. রেল লাইন বেঁকে কোথায় মিলিয়ে গেছে। এধারে পাহাড়ের কোল দিয়ে একটা লাল রাস্তা এঁকে-বেঁকে গিয়েছে কোন্ অচিন পুরের পথে···। মনে হয় যেন এই রাস্তা দিয়ে গেলে একদিন না একদিন 'কুঁচবরণ রাজকন্যা'র সন্ধান পাওয়া যাবে। জীবনে কোনদিন ভাবিনি বা বুঝতে পারিনি পাহাড়-নামে এত মাদকতা আছে। দেশ, ঘর, পরিজনের কথা ভুলিয়ে দেয় এই চিরনির্বাক পাথরের স্তূপগুলো। কত যুগ যুগান্তর ধরে পৃথিবীর বুকে এদের অধিষ্ঠান! দূরে দিগন্তের কোল ঘেঁষে যেন পাহাড়ের মালা সব।

ফিরে এলাম বাংলোর পথে। দুপুরবেলা আবার এলাম এই পাহাড়ের কোলে। একটা বড় শালগাছের তলায় সতরঞ্চি বিছিয়ে, নিলাম আস্তানা। বেলা ৪টা পর্যন্ত এখানে ছিলাম। এক দোকানদারের কাছে শুনেছিলাম বর্ধমানের রাজারা এখানে বেড়াতে আসতেন। এই পাহাড়ের চারপাশে মোটর গাড়ী যাবার মত রাস্তা তৈরী ছিল। আর তার ধারে ধারে বসানো থাকতো দেশী বিদেশী নানা ফুলের টব। পাহাড়ের চূড়ায় বসতো জলসা ও মিটিং। তাই এ পাহাড়ের নাম ফুলডুংরী। এটা ছিল সখের পাহাড়।

কথাপ্রসঙ্গে ধারাগিরি পাহাড়ের ঝরণার কথা উঠলো। আমি ও সন্তোষদা সেখানে যাব। কেননা অপর সঙ্গীটী আজ খুবই অসুস্থ বোধ করছে। পরদিন প্রভাতে আমরা দু'জন রওনা দিলাম সাইকেলে চড়ে। দশ মাইল দুর্গম রাস্তা পার হতে হবে, তবে ধারাগিরিতে পৌছান যাবে। ফুলডুংরী পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সেই লাল রাস্তা দিয়ে চলেছি এগিয়ে চড়াই উৎরাই করতে করতে।

রাস্তার অবস্থা বড়ই বিপজ্জনক; যে কোনও মুহূর্তে নীচে পড়ে যাবার আশঙ্কা। প্রায় ৪ মাইল পথ চলে এসেছি। জনমানবের সাড়াশব্দ নেই। শুধু পলকের জন্য দেখতে পেলাম একটী সাঁওতালী রমণী দুটো মোষ নিয়ে গভীর অরণ্যে মিশে গেল।

ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং। রাণার ছুটে চলেছে। রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে যা বল্লো তাতে মনে হল ফিরেই যাই। ক্রমেই উঁচুতে উঠছি। "লাখিয়া" পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলেছি। বন্ধুর পথ ধরে অনেকটা ওপরে চলেছি। হঠাৎ রাস্তার মোড় ঘুরে গেল। উঁচু থেকে নীচুতে নামতে লাগলাম। সামনে পাহাড়ীদের সুন্দর ছোট্ট ও শান্ত কুটীরগুলো দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। সেকালের মুনিঋষিদের পাতার কুটীরের কথা মনে এল। দেয়ালে সুন্দর সুন্দর আল্পনা। অন্ন পাহাড়ীদের এমন সৌন্দর্যজ্ঞান, এমন শিল্পকলার নিদর্শন দেখে ভারী আনন্দ পেলাম। আবার চলা সুরু হল। নীচে পাহাড়ীদের গ্রামটাকে ফেলে আমরা চলেছি উপরের দিকে। লালওল পাহাড় পার হয়ে দূরে আমাদের লক্ষ্যের ধ্রুবতারা ধারাগিরির গগনভেদী শৃঙ্গটা দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সাইকেল চালিয়ে চলেছি বটে কিন্তু পা আর পা-দানে থাকছে না। হাঁটু থেকে যেন অবশ হয়ে আসছে। একপাশে লালওল পাহাড়ের দেয়াল আর একপাশে গভীরবহ খাদ; একটু এদিক ওদিক হলে আর রক্ষা নেই। মনের জোর ক্রমশঃ কমে আসছিল। তখন কে যেন মনের মণিকোঠায় সাহস দিয়ে বল্লে, "ওরে যাত্রী এগিয়ে চল দূরে—আরো দূরে।" ওমনি মনটাকে হঠাৎ কে যেন নাড়া দিয়ে সচেতন করে তুল্লো—

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রিরা হুঁশিয়ার।"

চলতে চলতে এমন জায়গায় এসে পৌঁছলাম যেখানে গভীর শালবন আর তার চারধারে পাহাড়ের বেড়া। এদের মাঝে আমরা দু'জন পথক্লান্ত পথিক যেন দ্বীপান্তরের বন্দী। কোনও দিকে পথ খুঁজে পাচ্ছি না। তখন সত্যিই ভয় হ'তে লাগলো পথ কোথায়? বলে দেওয়ার কেউ নেই। জঙ্গলের আর আড়ালে হঠাৎ নজর পড়তে দেখি একটি মেয়ে আপন মনে মোষ চরাচ্ছে। আমাদের দিকে নজর পড়তেই সে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যে মিলিয়ে গেল আর তার কোনও হদিস্ পেলাম না। দূরে জঙ্গলের পাশ দিয়ে একজন দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমাদের বিপদ দেখে ভগবান যেন আমাদের কাছে তাকে পাঠিয়েছেন। আমরা ডাকতে সে কাছে এসে দাঁড়ালো। নাম জানলাম লক্ষ্মণ সিং। তাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চললাম ধারাগিরির ধারা দেখবার জন্য। কিছুদূর গিয়ে পাহাড়ীটা একটা গাছের নীচে আমাদের সাইকেল রেখে দিতে বল্লো। জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন?" জানালো, "পথ দুর্গম।"

বললাম, "সাইকেল চুরি হতে পারে।" বলে "না, পাহাড়ীরা খাবার বা কাপড় চোপড় চুরি করতে পারে বটে, তাই বলে সাইকেল চুরি করবে না।" আশ্বস্ত হয়ে আমরা কিটস্‌ব্যাগ আর সতরঞ্চিটা নিয়ে সাইকেল রেখে দিলাম। খানিকটা এগোতেই পৌঁছে গেলাম ধারাগিরির ঝর্ণার ধারে। বড় ঝর্ণা নয়। পাহাড়ের গা বেয়ে সরু জলের ধারা ঝির্‌ ঝির্‌ করে নীচে এসে একটা জায়গায় জমা হয়েছে। সামনে বয়ে গেছে, খুব বড় না হলেও ছোট নয়, পাহাড়ী নদী। বড় বড় পাথরের চাইতে বোল্ডার। পাহাড়ী সঙ্গী বল্‌লো, বর্ষাকালে এই নদী প্রবল হয়। যেখান থেকে জল পড়ছে সেখানে একটা বিরাট পাথর ঝুলছে, যে কোনও মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। সূর্যের আলো এখানে ভালভাবে প্রবেশ করতে পারছে না। আমাদের ক্যামেরার পাওয়ারফুল লেন্স এবং ফ্ল্যাশ বাল্ব ছিল না বলে ফটো তোলা গেল না। নিকটে একটা বড় পাথরের ওপর বসলাম। কাছেই যেখানে জল জমে আছে হঠাৎ সেই দিকে আঙুল নির্দেশ করে চীৎকার করে পাহাড়ী যা বল্‌লো তার অর্থ হল বাঘের পায়ের ছাপ। পায়ের ছাপ দেখতে গিয়ে হরিণের পায়ের ছাপও মিললো। বোঝা গেল, কাছাকাছি আর কোথাও জল না থাকায় পাহাড়ের সমস্ত জানোয়ার এখানেই জল খেতে আসে। আমার বেশ ভয় হতে লাগলো। মনে পড়ল মন্মথবাবুর ছেলের কথা। আমরা এখানে আসবার সময় সে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে আসতে। বেলা আড়াইটার পরই নাকি সন্ধ্যা হয়ে আসে। আমাদের মুখ চোখের অবস্থা দেখে লক্ষ্মণ সিং অভয় দিয়ে বল্‌লো, "বাবুজী, মৎ ডরাইয়ে" : দিনের বেলায় বাঘ বেরোয় না।

তার ঐ কথা শুনে ভয় আর আনন্দ আমার মনের চিন্তা ধারাকে পাল্টে দিয়েছে। শুধু মনে হচ্ছে, সারাটা জীবন যদি পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে পারি; আর এই সরল পাহাড়ীদের মতো ঐ দূরের ছোট ছোট পাহাড়ী গ্রামগুলোতে থাকতে পারি, আর লক্ষ্মণ সিং-এর মত যদি হতো,—

"পাহাড়ের পরে পাথরের ঘরে আমার জন্মস্থান,
বিজনে যেথায় বাদ্‌ বহে যায় বহিয়া বিহগ গান।"

আর তার সাথে সারা জীবনভোর কেবল—

'শিখর হইতে শিখরে' ছুটতাম,
'দূরের হইতে দূরে' লুটতাম,
'সে খল্‌ খল্‌ গেয়ে কল্‌ কল্‌
তালে তালে দিতাম তালি।'

তবে কী আনন্দ হতো। যাই হ'ক এখন পাহাড়ে উপরে ঠিক ঝরণার মাথার উপরে উঠতে আমরা সব তৈরী হয়ে নিলাম। লক্ষ্মণ সিং বল্লে, "জুতা খুল্‌না হোগা বাবুজী।" তাই হলো। পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠছি, লক্ষ্মণ সিং কেমন অদ্ভুত ভাবে ওপরে উঠে পড়লো। কি সুন্দর তার কৌশল। সন্তোষদা ও আমি দু'জনে উঠছি তখনও। তেনজিং, হিলারী ও হান্টের কথা মনে পড়লো। আমরাও তো তিনজনই। প্রায় ৫০০ ফিট্‌ ওপরে উঠে, সন্তোষদা ও

ধারাগিরির ঝরণার নিকট সন্তোষদা

পাহাড়ীকে ঠিক হয়ে বসতে বল্লাম। পাহাড়ীটা দাঁড়িয়ে রইল। একটা ফটো তুললাম। সময় কম; আর উপরে না উঠে নীচের দিকে নামতে লাগলাম।

তখন ১১-৫৫ মিঃ। তারপর পাথরের নদী পার

হয়ে শালের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। যেখানে আমাদের সাইকেল ছুটো ছিল সেখানে এসে গেলাম। আবার সেই সংকীর্ণ গিরিপথ। লক্ষ্মণ সিং কে ৵০ আনা পয়সা আর, সঙ্গে যে মাখন ও রুটী ছিল, তা দিয়ে দিলাম। এতে লক্ষ্মণ সিং খুব খুশী। ওদের কাছে ৵০ আনা তিনটে টাকার সমান। রাস্তার সম্বন্ধে খানিকটা নির্দেশ নিয়ে তাকে বিদায় দিলাম। সাইকেলে উঠে চলতে চলতে জানালাম "রাম রাম"। সেও জঙ্গলের মধ্যে মিশে গেল।

এবার ঘরমুখো আমরা···। দূর থেকে পাহাড়ের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে মনে মনে বল্লাম, "হে মহাস্থবির বিরাট পুরুষ, তুমি এখানে কত যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে আছ। তোমার কোলে আর কোনদিন আসতে পারবো কিনা জানিনে, তবুও যে তোমার সাথে, এক মধুর বন্ধনে এই কয়দিনের জন্যে আবদ্ধ ছিলাম, এ স্মৃতি ভুলবো না। এত লোভনীয় তোমার কোল। তোমায় জানাই বারংবার নমস্কার। সময় তখন ১২-১১ মিঃ। হু'-চাকার যান এবারে খুব জোরে ছুটলো। কারণ, সারা পথের অধিকাংশই ঢালু। ৫ মাইল চলে এসেছি। পিছনে ফেলে এসেছি লাবিয়া আর লালগুল পাহাড়ের চূড়া। পাঁপদা নামক এক সাঁওতাল পল্লীর একটি মহুয়া গাছের তলায় এসে দাঁড়ালাম। আর পারছি না। কাছে যে জল ছিল তা ফুরিয়ে গেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায়। পা আর সাইকেলে উঠতে চাইছে না। বসে পড়লাম সেই মহুয়া গাছের তলায়। কাছে কমলালেবু ছিল। কিন্তু তাতেও জলপিপাসা মিটলো না। নিকটের পল্লীর একটী সুন্দর স্বাস্থ্যবতী মেয়েকে জলের কথা বল্‌তে ছুটে গিয়ে জল নিয়ে এলো। বাঃ কি সুন্দর জল! এ বোধ হয় কোন স্বর্গীয় জল। একটা অদ্ভুত বাটিতে জল দিয়েছিল। বাটীটা চমৎকার ঝকঝকে তকতকে করে মাজা। মেয়েটির স্বাস্থ্য এত মজবুত আর তার সাথে যেন অপরূপ লাবণ্য। সহরে বাঙালী মা-বোনদের মধ্যে এমনটি কম চোখে পড়ে। জিজ্ঞাসা করলাম, নিকটের সাঁওতাল পল্লীতে কত লোক আছে। তার উত্তরে বল্লে, এটা সাঁওতাল পল্লী নয়। এটা "হো" পল্লী! কিছুক্ষণ পরে আবার সাইকেলে উঠলাম। এবার যেন একটু বল ফিরে এলো। পথে আসতে আসতে আবার হলো আর একটা বিভ্রাট। রাস্তা গুলিয়ে ফেলাম। এক জায়গায় দুইটি রাস্তার মোড়। আবার ফিরে এলাম পূর্বের রাস্তায়। রাস্তা ঠিক করে বিগুণ বেগে ছুটলাম। কিছুক্ষণ পর ঘুলডুবী পাহাড়ের চূড়োটা দেখতে পেলাম। এরপর ফিরে এলাম বাংলোতে।

বিকেল বেলা। পাহাড়ের বুকে সূর্যাস্ত। ঘুল-ডুংরী পাহাড়ে উঠে সূর্যাস্তের একটা ফটো তুলে নিলাম। সন্ধ্যাবেলা ফিরে এলাম। দোকান থেকে বাতি ও ধূপ কিনে এনেছিলাম। ৺বিভূতিবাবুর স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে ধূপ ও বাতি জেলে দিলাম। তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। চারিদিকের পাহাড়-গুলো আর দেখা যাচ্ছে না। আমরা তিন বন্ধু মিলে নমস্কার জানালাম। আর মনে মনে বল্লাম, "হে মহান্, আমাদের এই দীন অর্ঘ্য তুমি গ্রহণ করো।"

ভোরবেলা। পাহাড়ের বুকে সূর্যোদয় কি চমৎকার। সুবর্ণরেখা নদীর পাড় দিয়ে চলেছি। ভারি সুন্দর লাগছিল। নদীর পাড় ধরে এগিয়ে চলেছি। শুনেছিলাম, এই নদীর পাড়েই ৺বিভূতি-বাবুর শেষক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। খুঁজতে খুঁজতে চলেছি। আর বিভূতিবাবুর ভাইএর কথা ভাবছি। ছুটবিহারীবাবু বিভূতিবাবু যারা যাওয়ার পর থেকে প্রত্যহ এই নদীর ধারে বেড়াতে আসতেন। দাদার মৃত্যুতে তার প্রাণে খুব আঘাত লাগে। তাই তিনি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলেন। তিনিও এই পাথরের কোলে তাঁর জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে শোনা যায়—"বিভূতিবাবুর শ্রাদ্ধের আগের দিন ছুটবিহারীবাবু কলিকাতা হ'তে ফিরে এলেন অসম্ভব গম্ভীর হয়ে। তিনি সেইদিন সকালে বেড়াতে যান

সুবর্ণরেখা নদীর দিকে। সারাদিন বাড়ী আসেন নি। বিকালবেলা একটা 'হো' জাতির ছেলে খবর দেয় যে ভূটবিহারীবাবু পাথরে হেলান দিয়ে বসে আছেন। ডাকলে সাড়া দেন না। তাড়াতাড়ি লোকজন ছুটে গেল। গিয়ে দেখা গেল, তিনি কার্বনডাইঅক্সাইড খেয়েছেন। সারা দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ৺বিভূতিবাবুর সমাধির পাশে তাঁকে দাহ করা হয়।"

১২-৩৭ মিঃ কলকাতার ট্রেনে উঠে বললাম, "বিদায় খাউলীলা, বিদায়।"

আমরা

শ্রীকল্যাণী মজুমদার বি.এ., বি টি.

শিশুকাল হ'তে পাঠ নিই মোরা 'জীবন অনিত্য মায়া'
বিশ্বপ্রকৃতি কারণ সলিলে যেন প্রতিবিম্বিত ছায়া।
জীবন ভরিয়া স্বপ্নের খেলা, মৃত্যুই হেথা শুধু সত্য,
মায়ার বাঁধনে বেঁধে রাখে শুধু ধূলিময় এই মর্ত্য।
বরষে বরষে প্রলয় বন্যা আনিছে মৃত্যু ভয়ংকর,
রুদ্র ঝঞ্ঝা ভেঙে দেয় বারে বারে নরের আশার ঘর।
মড়ক আসিয়া শ্মশান করিছে মোদের নগর গ্রাম,
অসহায় ভাবে মরি মোরা আর জপি শুধু রাম নাম।
নিঠুরা মনসা নরের আত্মারে নিপীড়ন করে হায়,
চন্দ্রধরের আত্মশক্তি ধূসর ধূলায় লুটায়ে যায়।
তবুও আমরা হরষিত মনে করি সেই দেবী পূজা,
শক্তিহীনের শক্তি প্রতীক দশপ্রহরিণী দশভূজা।
ভাগ্যের পায়ে সঁপেছি নিজেরে বিদ্রোহী মোরা কভু নহি,
লজ্জাহীনের প্রার্থনা শুধু 'যশো দেহি' আর 'দ্বিষো জহি।'
তবু নেমে আসে ভাগ্য ললাটে ঘন অন্ধকার নিঃসীম,
ঊর্ধ্বে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করি তারপরে বা কি, 'ততঃ কিম্?'
তুমি হ'তে মোরা বঞ্চিত হ'য়ে তৃষা তার করি প্রার্থনা,
প্রবলের কাছে ভিক্ষা করেছি, যতই পেয়েছি লাঞ্ছনা।
জীবনে কিছুই না পেয়ে আমরা চাহিয়াছি নির্বাণ,
হৃদয়ের যত বেদনা ঢাকিতে উদাসীনতার ভাণ।
বিশ্ব প্রেমের জোর অভিযান করি যে ঈর্ষা দম্ভ ডেকে,
বাহিরের যত শত্রুদের মোরা বারবার আনি ডেকে।
তারপর মোরা লভেছি শাস্তি, নিঠুর যত চক্রীদল,
ততই আমরা লুকিয়েছি কোণে, ফেলেছি চোখের জল।
প্রতিক্রিয়া যতই করেছে নিঠুর পীড়ন নিরন্তর,
মুক্ত হস্তে তখনও বলেছি, প্রসাদোঽপি তবংকর।

প্রেমধর্ম—দার্শনিক তত্ত্ব

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

রোমান-কাথলিক সাধক ও সাধিকাদের কোন নির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী নেই। মধ্যযুগে লোকে বলত, স্বর্গীয় দেবদূতেরা এসে তাদের সহিত কথা বলছে, বারতা দিয়ে যাচ্ছে; পুনঃ অনেকে খৃষ্টের ক্রুসবিদ্ধ ক্ষত নিজেদের শরীরে প্রদর্শন করত (Stigmata)। এতদ্বারা লোকে বিশ্বাস করত যে, সে লোকটার উপর যীশুর দয়া হয়েছে। অবশ্য ক্ষতগুলি আসল বা নকল কিনা তা এস্থলে বিবেচ্য নয়। ইহা সেই আদিমকালীন "মানা" (Mana) বিশ্বাস অনুযায়ী অনুসৃত হয়। দেবতার গুণ ভক্তেতে অর্শায়, উচ্চ লোকের মনোশক্তি নিম্নশ্রেণীর লোককে স্পর্শ দ্বারা পবিত্র করে। তদ্রূপ, সাধক যীশুপ্রেমে যীশুভাবাপন্ন হয়ে তাঁর শারীরিক ক্ষত স্বীয় অঙ্গে গ্রহণ করে। কিন্তু এমন stigmata-যুক্ত লোকও প্রতারক বলে ধরা পড়েছে। এস্থলে, ফ্রান্সের বীর কুমারী 'জোয়ান অফ আর্ক' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলব। তিনি একজন অতি পবিত্র, এবং ধর্মাত্মা কুমারী ছিলেন। ডমরেমী গ্রামে পিতার ছাগল চরাবার সময় থেকেই তাঁর উপর দেব-দূতদের ভর হত। পরে দেশের দুঃখে বিগলিত হয়ে রাজার কাছে গিয়ে বলেন, দেবদূতেরা তাঁকে রাজা বলে নির্দিষ্ট করেছে। রাজাও রাজমুকুট পরলেন, বীর কুমারীও দেশে এক অলৌকিক বিশ্বাস স্থাপন করে অঘটন ঘটন করলেন। শেষে ইংরেজের হাতে পড়লেন। অলৌকিক ক্ষমতা বিষয়ে বীরকুমারীর এত বিস্ময়কর নাম যে, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট হঠাৎ কিছু করতে সাহস করেনি। তাঁকে নানাভাবে পরীক্ষা করা হয়; অতি নীচতার সহিত পরীক্ষা করা হয়। অবশেষে এই ইংরেজ-ভক্তকে ইংরেজভক্ত ফরাসী পাদরিদের দ্বারা heretic (নাস্তিক বা অবিশ্বাসী) রায় দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়। এখন বিচার্য এই: বীরকুমারী বলতেন, তিনি দিনরাত দেবদূত গ্রাব্রিয়েল প্রভৃতির আদেশ শুনছেন কিন্তু বিচারকালে তিনি নিজেই স্বীকার করেন, দেবদূতেরা আর তাঁর কাছে আসে না। এই বিষয়ে মহাভারতের কর্ণের এবং হোমারের হেক্টরের মৃত্যুকালীন উক্তির সহিত সাদৃশ্য আছে। কার্যকালে ধর্ম নিজের ভক্তকে ত্যাগ করেন।

বিখ্যাত ফরাসী নভেলিষ্ট আনাটোল ফ্রান্স, বীর কুমারীর এক বৃহৎ জীবনী লিখেছেন এবং ডাঃ ডুমাস্ নামক একজন চিকিৎসক দ্বারা এই দেবদূত ব্যাপারের গল্পটি বৈজ্ঞানিক যাচাই করে নিয়েছেন। ডাঃ ডুমাস্ বলেছেন, 'জোয়ান' বাঁ কাণে কেবল দেব-দূতদের কথা শুনত; সেই কাণে এক nerve-এর পীড়া ছিল। এরকম ঘটনা এদেশেও শুনা গেছে; লোকে অলৌকিক দেখছে, অলৌকিক শুনছে। আমরা তা' ব্যক্তিগতভাবে জানি; কিন্তু কোন psychiatrist দ্বারা তা' পরীক্ষা না করে আমরা বিরিকি বাঘা, গন্ধিবাবার গল্প শুনে আধ্যাত্মিকভাবে আপ্লুত হই।

বীর জোয়ানের কৃতিত্ব এবং যশ দেখে অনেক ছেলেমেয়ে এরূপ ভারাক্রান্ত হতে লাগল এবং stigmata দেখিয়ে নিজেদের যীশু সাদৃশ্য দেখাতে লাগল; কিন্তু ইংরেজ গোটাদুই মেয়েকে ধরে রোউয়েন নগরে পোড়াতে সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

এ প্রকারের দলকে খৃষ্টীয় প্রেমধর্মের অতীন্দ্রিয় সাধক বলা হয় না। তাঁরা আর একদল; অনেকেই মঠের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী। তাঁরা মঠে থেকে প্রার্থনা দ্বারা সাধনা করতেন। এই সাধকেরা দাবী করেন,

তাঁরা 'বাস্তব সত্তা' (reality) যাকে কোন কোন দার্শনিক "অনন্ত" (Absolute) এবং ধর্মযাজকেরা ঈশ্বর (God) বলেন তা' তাঁরা উপলব্ধি করেছেন [১]। তাঁরা মানব এবং এই সত্যের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। এই অতীন্দ্রিয়বাদী সাধকেরা দাবী করেন এবং তাঁরা সেই উপনিষদের ঋষির ন্যায় বলেন: "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ···"

"হে বিশ্বের অমৃতের পুত্রসকল! তোমরা শুন, আমি সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে দেখেছি।" এই মনস্তত্ত্বের অনুযায়ী রামকৃষ্ণ পরমহংস মশায় বলেছিলেন, "আমি ভগবানকে দেখেছি।" যুক্তিবাদীরা একথা বলতে সাহস করেন না।

অতীন্দ্রিয়বাদীর সাধনার মূল তথ্য একজন বিশ্বাসী মহিলা লেখিকা বলছেন: অতীন্দ্রিয়বাদী হওয়া মানে হচ্ছে—এ জগতে এবং উপস্থিত সময়ে অর্থাৎ সাধকের জীবদ্দশাতেই সম্পূর্ণভাবে যা মানুষের পক্ষে সাধ্য, তা' "বাস্তব সত্তা" এবং "অনন্ত" জীবনে অংশ গ্রহণ করা। [২]

এই সাধনার মূল উৎস বিষয়ে এই লেখিকা বলছেন, এটা গ্রীক, প্রাচ্য এবং আদিম খৃষ্টানসাধুদের ভাবধারা যা সাধু পল এবং যোহানের লেখায় পাওয়া যায়, তা' হতে এসেছে। পুনঃ প্রাচীন খৃষ্টান ধর্মস্তুতি-সমূহে এই ভাবধারা পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা বোধগম্য হয়, খৃষ্টানমণ্ডলী কি প্রকারে পুরাতন এসেনী, অফির এবং নব-প্লেটনিক ভাবসমূহ আত্মসাৎ করেছে।

এই বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা বুঝি যে, মধ্যযুগের খৃষ্টান মরমী সাধকদের সাধনার উৎস কোথা হতে এসেছে। প্রাচীন এবং রোমান যুগের মধ্য পশ্চিম-প্রাচ্যের মরমী সাধকদেরই ভাবধারা এঁদের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল। প্লটিনাসের নব-প্লেটনিক ভাব-ধারায় ভারতীয় ভাবের প্রভাব আছে। তৎপর, এসেনী এবং অন্ততঃ যোহানের মধ্যে কি তা' ছিল না? অনেকে তাই সন্দেহ করেন।

এস্থলে সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে এটাও দ্রষ্টব্য যে, সুপ্রাচীন অরফিয় দলের ন্যায় এবং বাঙ্গলার বাউলদের ন্যায় এই অতীন্দ্রিয় বা মরমীবাদ গরীব নিপীড়িত জনসমূহ মধ্যেই আবির্ভূত হয়। ভোগী বা বিলাসী অতীন্দ্রিয়বাদী সাধক হয় না। সে সখের কল্পনা করতে পারে, সাধনা নয়।

বর্তমান সময়ে অতীন্দ্রিয় বা মরমীবাদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের দ্বারা হচ্ছে; এঁদের মধ্যে অধ্যাপক লয়বার বিশ্লেষণ-বিখ্যাত। তিনি এত খোলাখুলি ভাবে বিচার করে লিখেছেন যে, আজ তা' পাশ্চাত্যদের দোকানে বিক্রয়ার্থ পাওয়া যায় না! আশ্চর্যের কথা, এই ধর্মান্ধ মনস্তত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যীয়েরা ভারতবাসী এবং প্রাচ্যীয়দের ধর্মান্ধ এবং কুসংস্কারাপন্ন বলে গালি দেয়। এজন্যই পাশ্চাত্যীয়দের উপাস্য যীশুখৃষ্ট বলেছেন: "লোকে ভাইয়ের চোখে কুটো থাকলে ধরে, কিন্তু নিজের চোখে কড়িকাঠ পড়ে আছে, তা' দেখ্‌তে পায় না!"

এক্ষণে খৃষ্টীয় মরমী সাধকদের সাধনার বিশ্লেষণ এস্থলে কিঞ্চিৎ দেওয়া যাবে। ইউরোপের মধ্যযুগের সন্ত টেরেসা নামক বিখ্যাত সাধিকা তাঁর সাধনার মনস্তত্ত্ব "Interior Castle" (আভ্যন্তরীণ দুর্গ) নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তা'তে সাধনার এই কয়টি ধাপ পাওয়া যায় (১) খৃষ্টকে প্রার্থনা কর, (২) মিলনের জন্য প্রার্থনা, (৩) ধর্মোন্মত্ততা (Ecstasy). (৪) আধ্যাত্মিক বিবাহ। অবশ্য এই সাধিকা স্ত্রীলোক ছিলেন বলে খৃষ্টের সহিত বিবাহ তাঁর কাম্য ছিল। বর্তমান যুগের এক সাধিকা কুমারী Ve (ভি); তাঁর সাধনার বৃত্তান্ত অধ্যাপক হুরনদ লিপিবদ্ধ করেছেন।[১] প্রথম জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের সময় সাধনার অবস্থা আর লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

এই সাধিকা প্রটেষ্টাণ্ট বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই সম্প্রদায়ের এক স্কুলের কর্ত্রী ছিলেন। বয়স পঞ্চাশের কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে! এঁর সতের বৎসর

১। Evelyn Underhill ; Mysticism. 1930. ২। ঐ

বয়সে, এক দুর্বৃত্ত তাঁকে বলাৎকার করে। এই সময় থেকে তাঁর ঈশ্বরের বিপক্ষে ভাব, তাঁর অত্যাচারীর উপর আরোপিত হয়। তা'কে কখনও তিনি ক্ষমা করেন নি।

মনোবীক্ষণ দ্বারা দেখা যায়, তাঁর ব্যক্তিত্ব আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল (partial dissociation of personality)। এক বৎসরের মধ্যে তাঁর পাশবিক স্বভাব (Animal nature) কয়েকদিনের জন্য জেগে ওঠে। এই সময়ে তাঁর কামেন্দ্রিয় জেগে উঠে এবং তিনি নানাপ্রকারের কল্পনা ও স্বপ্ন দেখেন। এই সময়ে তিনি অনুভব করতেন যে, তিনি নিজে পুনঃ জোয়ান হয়েছেন এবং নিজের ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিক আদর্শকে ঘৃণা করতেন। যদিচ তিনি ধর্মের ভাব দ্বারা অভিভূত হয়ে অন্ধ জীব হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মানসিক দ্বন্দ্বের অবসান হয় নি। তাঁর স্বভাবের অপবিত্র ভাব সাধারণতঃ চাপা রাখা হত। পর্যবেক্ষণকারী বলেন, কুমারী "ভি"র জীবনী থেকে বুঝতে পারা যায় কেন মহিলারা সন্ন্যাসিনী হয়। এতদ্দ্বারা যৌন-ভোগেচ্ছা আর অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সম্বন্ধে নির্দেশ পাওয়া যায়। কুমারী "ভি"র ধর্মোন্মাদনার (Ecstasy) অবস্থাতেও স্ত্রীজাতিসুলভ মানসিক কালীন ইন্দ্রিয়-ভোগেচ্ছা ও স্বপ্ন আবির্ভূত হত।

এই সঙ্গে এস্থলে এটাও বলা প্রয়োজন, যে সব লেখক এইসব সাধকের সাধনার অবস্থার মনোবীক্ষণ করেছেন, তাঁরা অনেক কথা চেপে গেছেন। হ্যাভলক এলিস, তাঁর যৌন-সম্বন্ধীয় পুস্তকে সাধিকা টেরেসার "আত্মস্বীকার" বিষয়ে বলেছেন যে, তিনি স্বপ্নে দেখছেন, সয়তান তাঁকে বলাৎকার করছে, ইত্যাদি। অবশ্য এসব স্বপ্ন যৌনেন্দ্রিয়-ইচ্ছা চাপা রাখার ফল স্বরূপ (Sex repression)। সাধনার এইসব অঙ্গ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় মানবসমাজের উপকারই হয়। ধর্ম মানবের শরীরের ক্রিয়াপ্রসূত, তা' অনৈসর্গিক ও অলৌকিক ব্যাপার নয়।

এই মনোবীক্ষণ দ্বারা প্রাচীনা বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনী-দের আত্মকথা বা 'থেরী গাথা' নামে প্রচলিত আছে, তা পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারি কেন লোকে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী হয়। আমাদের দেশে মানসিক বৈজ্ঞানিক বৃত্তিই নাই, সেইজন্য আমরা ধর্মের আধ্যাত্মিকতা অর্থে বিরিঞ্চিবাবা ও গন্ধিবাবার গেঁজেলী-গল্পে বিশ্বাস করি ও ভক্তিতে গদগদ হই।

অধ্যাপক লম্বরা [১] বলেন, বড় সাধিকা মাডাম গায়ঁ (Gayon) এবং জেনোবর সন্ত ক্যাথেরিন বিবাহ জীবনে অসুখী ছিলেন। অসহ্য জাগতিক অবস্থায় বিতাড়িত হয়ে স্বর্গীয় প্রেমিকের আলিঙ্গনে নিজেদের দান করেছিলেন। কুমারী ভির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। অনেক বৌদ্ধ থেরীর বিবাহিত জীবনও দুর্বিসহ হয়েছিল। পুনঃ তিনি বলছেন, অতীন্দ্রিয়-বাদের বিশিষ্ট লোকদের কেহই স্বাভাবিক বিবাহিত জীবন-যাপন করেন নি। [২] এজন্যই তাঁরা "খ্রীষ্টকে" (তাঁদের স্থলে বীশু) সর্বস্ব সমর্পণ করেছিলেন।

এক্ষণে সাধনার কথায় প্রত্যাবর্তন করা যাক। এতদিন ধর্মোন্মাদনা, অনৈসর্গিক দৃশ্য দেখা, সমাধি, কঠোরতা প্রভৃতিকে 'হিষ্টিরিয়া' বলে বৈজ্ঞানিকেরা উপেক্ষা করতেন। কিন্তু কেউ কেউ আজকাল বলছেন, এই খৃষ্টীয় সাধকেরা অতীন্দ্রিয়বাদীর জীবনকে জড়বাদীর বৈজ্ঞানিকাপেক্ষা ভাল উপলব্ধি করেছেন। এই মত 'লম্বরা' একজন ফরাসী লেখক থেকে উদ্ধৃত করে উল্লেখ করেছেন। এটা সত্য ঘটনা যে রোমান ক্যাথলিকেরাই 'মিষ্টিকবাদ' সম্মান-পূর্বক লিখেন। এজন্যই ফরাসী রোমান ক্যাথলিক রোঁমা রোলাঁ ভারতীয় ধর্মসংস্কার কর্মক্রমাপেক্ষা রামকৃষ্ণের সাধনা আদর করেছিলেন।

১। B. H. Thouless' "An Introduction to the Psychology of Religion."

১-২। J. H. Lemba "The Psychology of Religious mysticism," পৃঃ. ১১৯।

খৃষ্টীয় সাধকের প্রথম সোপান হচ্ছে প্রার্থনা। কথিত আছে, প্রার্থনা দ্বারা সাধক অব্যক্ত শক্তির, সাক্ষাৎ অনুভব করে এবং তার সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করে (১)। অবশ্য একথা স্বীকার্য 'প্রার্থনা'তে ভগবানের সহিত ব্যাপারদম্ভরী ভাব আছে।

দ্বিতীয় সোপান হচ্ছে নিষ্ক্রিয়তা (passivity)। এতদ্দ্বারা সে নিজেকে ঐশ্বরিক ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে (উত্তর গীতায় আছে: 'যয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি')। যখন মনে কোন চেষ্টা থাকে না এবং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করা হবে তখনই ঈশ্বর তার গোচর হবে। এস্থলে বাঙ্গলার প্রাচীন মরমী বৌদ্ধ-সাধক সরোরুহপাদের 'অদয়-বজ্র' টীকার কথা মনে পড়ে—

যদা ন ভাবো নাভাবো মতেঃ সন্তিষ্ঠতে পুরঃ।
তদাত্মগত্যভাবেন নিরালম্ব : প্রশাম্যতি॥
(বৌদ্ধগান ও দোহা)

ইহার অর্থ, ভাব ও অভাবের অবস্থাকে অতিক্রম করে মন 'নিরালম্ব' গ্রহণ করলে সিদ্ধির সোপান হয়।

এই নিষ্ক্রিয় বা নিরালম্ব মনের আনুসঙ্গিক স্বরূপ খৃষ্টীয় মিসটিকদের সন্ন্যাস-কঠোরতা (Asceticism) প্রয়োজন হয়। শরীরের ইচ্ছা এবং মনের (spirit) অহংকারকে দমন করা, নিষ্ক্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে যায়। এই মতানুযায়ী শরীরের মন্দ ইচ্ছা-সমূহ কেবল নিরোধ প্রয়োজন নয়, এই সঙ্গে নিজের উন্নতির চেষ্টাও নিষ্ক্রিয় করা দরকার। এই মত-বিষয়ে জার্মান মিস্টিক টউলারের বাক্য বড় সুস্পষ্ট; তিনি বলছেন: "যতদিন তুমি ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করতে ইচ্ছা কর, এবং এমনকি অনন্ত ভগবৎ প্রাপ্তির পরেও কোন ইচ্ছা থাকে, ততদিন তুমি যথার্থ নরীহ নও।" এটাকে আমাদের দেশে 'মর্কট বৈরাগ্য' বলে। এই দেহপীড়ন ও ইচ্ছার নিরোধ বৈষ্ণবধর্মের বিপরীত। অন্ততঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা দেহকে 'শ্রীকৃষ্ণের বিহারের স্থল' বলেন। বাইবেলে বলেছে Ye are the temples of God. তাহলে শরীর পীড়ন কি প্রকারে আসে? অনেকেই সন্দেহ করেন, এই বৈরাগ্যভাব পরোক্ষভাবে ভারত থেকে এসেছে। এই বিষয়ে লয়বা বলছেন "It seems probable that Christian mysticism owes something of its philosophy to India through the intermediary of Greece and the neo-platonists (২)।

এর অর্থ: এটা সম্ভব যে, খৃষ্টীয় মিস্টিসিসম্ গ্রীস ও নব-প্লাটনিষ্টদের মধ্যবর্তিতায় তার দর্শনের কিছু ভারত থেকে পেয়েছে।

তৎপর, এই নিষ্ক্রিয়তা এবং শরীর ও মনের কার্যের খর্বতার ফলস্বরূপ শরীরের ঘুম ঘুম ভাব আসে। কিন্তু ঈশ্বরের সহিত মিলনের জন্য যখন সাধন করা হয়, তখন ইহা "ধর্মোন্মত্ত" সমাধিতে' (ecstatic trance) পরিণত হয়। এটা হচ্ছে তৃতীয়াবস্থা। কোন কোন মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিত Ecstasy-কে trance বলে অভিহিত করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবৎ হতে আমরা এই ecstasy বা ধর্মোন্মত্ততার সংবাদ পাই। বৈষ্ণবদের তা' শেষ সোপান বলে বোধ হয়। Ecstasy এবং Trance এক কি-না তা'তে বিতর্কের অবকাশ আছে। যা'কে Trance বা সমাধি বলে তা' বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এটাকে তাঁরা suspended animation বলেন (৩)। ঐ বিষয়ে অধ্যাপক লয়বা বলেন, ঈশ্বর আরোহণের সোপান স্বরূপ এই মিসটিক এক্সটাসি, খৃষ্টান মরমী সাধকদের সৃষ্টি নয়, বরং মানব জাতির শৈশবকাল থেকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফল।

তৎপর, এই নিষ্ক্রিয়তা বিশিষ্টভাবে সাধনা করলে

(১) A. Sabatier: outlines of a philosophy of Religion based on Psychology and History'—1907.

(২) Leuba.—পৃঃ ৪৮-৪৯

(৩) "Lyon's Jurisprudence" দ্রষ্টব্য।

ধর্মোন্মত্ততা আসে। এই অবস্থাই হচ্ছে মিসটিসিসমের সার। এই অবস্থাই ঈশ্বরের সহিত মিলনের আশা প্রদান করে আর "জ্ঞান প্রকাশ" (Illumination) এবং 'ঈশ্বরের প্রকাশ' (Revelation) বিষয়ে বিশ্বাস আনে। এ স্থলে আমরা বৈষ্ণব ও অন্যান্য ভারতীয় সাধকদের সাধনার মধ্যে পার্থক্য দেখি।

লয়সা বলেন বৌদ্ধ ও মুসলমান মিসটিকদের সমাধি ও hypnosis খ্রিস্টানদেরই অনুরূপ। তৎপর আসে চতুর্থ অবস্থা: খ্রীষ্টীয় সাধিকার পক্ষে আত্মিক বিবাহ (spiritual marriage) বা ঈশ্বরলাভ (Deification): এই সময়ে আত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য থাকে না। সাধিকার মধ্যে কেবল ঈশ্বরই থাকে। সে সব সময়ই ঈশ্বরের সম্মুখে থাকে। এই ঈশ্বরের সহিত বিবাহ, বৈষ্ণবদের সহিত মিলে। অনেক বৈষ্ণবী সাধিকা কৃষ্ণকে আত্ম সমর্পণ করেন, অর্থাৎ কৃষ্ণের সহিত বিবাহ হয়।

বৈষ্ণবদের ঈশ্বরের সহিত মিলন হ'য়ে একাত্ম হ'য়ে যাওয়া তাঁদের দর্শনের বিপক্ষে, কারণ তাঁরা জীব ও ব্রহ্মকে পৃথকভাবে দেখেন। তাঁদের রাধা-কৃষ্ণের মিলনে, একজন আর একজনের মধ্যে নিমগ্ন বা অন্তর্হিত হয় না। সুফীদের "ওসালে" (মিলন) একের মধ্যে আর একজনের নিমজ্জিত হওয়ার কথা নেই, এটা কেবল অদ্বৈতবাদী মত।

এটাই হল খৃষ্টান প্রেমধর্মীয় সাধকের সাধনাবস্থার বিশ্লেষণ যা' বৈজ্ঞানিকরা করেছেন। অবশ্য মনস্তত্ত্ব-বিদেরা এ সব অবস্থার জড়বাদীয় কারণও আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা সবই চিত্তবৃত্তি ও মাদুর অবস্থার ব্যাপার বলেন।

খৃষ্টীয় সমাধি ব্যাপার কি তাহা বোধগম্য করবার জন্য বিখ্যাত ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের Tintern Abbey নামক কবিতা থেকে এস্থলে উদ্ধৃত করা হল:

"That serene and blessed mood,
In which the breath of this corporal form,
And even the motion of our human blood,
Almost suspended, we are laid asleep.
In body, and become a living soul.
While, with an eye made quiet by the power,
We see into the life of the god" (পৃঃ-২৩৭)।

এই কবিতাতে বর্ণিত হয়েছে—মন নিরবলম্ব হয়ে শরীর প্রায় নিশ্চল করে এবং সমাধিতে ঘুমিয়ে পড়ে' তা' জীবন্ত আত্মাতে পরিণত হয়। আর চক্ষু অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা ঈশ্বরকে দেখা যায়। এ'তে খৃষ্টীয় অতীন্দ্রিয় সাধকের সব অবস্থাই বোঝান হয়েছে।

ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের কথা এস্থলে উল্লিখিত হল, কারণ এর সঙ্গে বাঙ্গলার ধর্ম-আন্দোলনের এক রহস্যজনক সম্বন্ধ আছে। দেবেন্দ্রমোহন মিত্র নামক একজন রামকৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন। তিনি জেনেরাল এসেমব্লী কলেজে স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী ছিলেন (১)। তিনি এই গল্পটি লেখককে বলেছিলেন: একদিন ক্লাসে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পাঠকালে স্বচ্-অধ্যাপক চ'টোপাধ্যায় ও টেবিল ঠুকে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে প্রিন্সিপ্যাল হেষ্টির কাছে নালিশ করেন যে, ছাত্রেরা এত বোকা (stupid) যে উক্ত কবিকে বুঝতে পারছে না। দেবেন্দ্রমোহনবাবু বললেন, তিনি কোন কারণ বশতঃ ক্লাস-ঘর হতে বের হয়েছেন, তখন দেখেন গট গট করে প্রিন্সিপ্যাল হেষ্টি ক্লাসাভিমুখে আসছেন, তা' দেখে তিনি ক্লাসে প্রত্যাবর্তন করেন। হেষ্টি বললেন,—মিঃ অমুক বলছেন—ছাত্রেরা বড় বোকা (stupid), তা'রা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বুঝছে না। বোধ হয় তিনি নিজেই তাকে বোঝেন না। অতঃপর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সমাধির (trance) কথা বুঝিয়ে বলেন। শেষে বললেন, এ রকম একজন ব্রাহ্মণ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আছেন, তাঁর trance হয়, তোমরা গিয়ে তাঁকে দেখে এস।

অধ্যাপক লয়সার মতে, কবি টেনিসন এই সমাধিরূপ ধর্মোন্মত্ততা বিষয়ে সজ্ঞান ছিলেন। তাঁর

(১) B. N. Datta: Swami Vivekananda—Patriot—Prophet দ্রষ্টব্য

Holy Grail নামক কবিতার শেষে এইভাব ব্যক্ত করেছেন :

Let visions of the night or of the day.
Come as they will and many a time
they come.
Until this earth he walks on seems not
earth
This light that strikes his eye-ball is not
light
This air that smites his forehead is not air,
But vision—yea, his very hand and foot
In moments when he feels he cannot die,
And knows himself no vision to himself,
Nor the high God vision, nor that one
Who rose again : ye have seen what ye
have seen."

লয়রা বলেন, আমরা যা ecstasy ধর্মোন্মত্ততা বা সমাধির লক্ষণ বলে জানতে শিখেছি, তা' এই কবিতাতে আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ধর্মোৎমত্তের লক্ষণ বর্ণনাপেক্ষা এই কবিতাতে আমরা সেই সাধন অবস্থার সম্যক পরিচয় পাই বলে অনুমান হয়।

তৎপর আসে অনুপ্রেরণা (Inspiration) বা স্বর্গীয় আদেশ (Revelation)। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, অন্যান্য লোকের ন্যায় সাধকেরও এক বিষয়ে গভীর চিন্তা বা কল্পনা করলে অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ একটা নূতন ভাব বা চিন্তার অভাব আসে। এটা ঐশ্বরিক বা অনৈসর্গিক কিছু নয়। ধর্মক্ষেত্রে এ'কেই প্রত্যাদেশ, আপ্তবাক্য, ঈশ্বরের আদেশ, প্রেরণা ইত্যাদি বলে অভিহিত করা হয়।

তৎপর আর একটী ঘটনা সাধকের চক্ষে দৃষ্ট হয়। তার চক্ষে অদ্ভুত এক আলো বা উজ্জ্বল রূপ প্রকাশ পায়। একে photism বলা হয়। ধর্মোন্মত্ত সমাধিকালে এই প্রকারের আলোকদর্শন বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত বৈজ্ঞানিকেরা সংগ্রহ করেছেন (১)। বাইবেল-বর্ণিত, ঝোপে আগুনজ্বলা—যা মুসা দেখেছিলেন, পেন্টিকস্ট-পর্বে আগুনের আবির্ভাব এই photism এর অন্তর্গত যারা দৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়।

তৎপর, আকাশে উড়ে যাওয়ার ভাব বলে একটা অনুষ্ঠান কোন কোন সাধকের হয়। ধর্মোন্মত্ত সমাধিকালে কারো কারো ধারণা হয় যে, তা'র শরীর আপন ওজন হারিয়েছে এবং মাটির উর্ধ্বে উঠছে, কিংবা তা'র আত্মা শরীর থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধাত্মা (pure spirit) হয়েছে।

এই হচ্ছে খৃষ্টীয় মিসটিক-সাধকের সাধনার চিত্র। মোটামুটি এটা ভারতের বৈষ্ণব ও ইরাণী সুফী সাধকদের সাধনার বর্ণনার সহিত মিলে। তবে, খৃষ্টীয় সাধকের মনে বিচ্ছেদের ছায়া হতাশ নাই যা গৌড়ীয় সাধকদের মধ্যে উদিত হয়েছিল। কারণ, প্রথমোক্তেরা স্বাধীন জাতির লোক ছিল। গৌড়ীয় সাধকদের উদয় হয় পরাধীনতার আলোর মধ্যে, বিনষ্ট স্বাধীনতার মধ্যে, তাই মাধুর্যের এত ক্রন্দন রোল। প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যে তা'র অন্যান্য অভাব।

শেষে আছে, বাংলার নিম্ন-শ্রেণীর মরমী সাধকদের কথা। তাঁদের ভাব-ধারা আজও নিম্নশ্রেণীকে মুগ্ধ করে রেখেছে। এ বিষয়ে অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় যে অনুসন্ধান করেছেন তা' হতে কিঞ্চিৎ সংবাদ নিম্নে উল্লেখ করা গেল (২)। লেখক অন্যত্র আলোচনা করেছেন যে আউল, বাউল, সাঁই ধরবেশ প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলিকে অনেক বৈষ্ণব-নেতা চৈতন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বলে স্বীকার করতে চান না। কিন্তু অন্য একজন গোস্বামী, লেখককে বলেছিলেন, কেন, যখন তা'রা আমাদের মন্দিরে আসে, ঠাকুর প্রণাম করে, প্রসাদ খায়, তখন তাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলবনা কেন? গোস্বামী-শাসনের বহির্ভূত হলেই কি তাকে 'বৈষ্ণব' আখ্যা দেওয়া যাবেনা? চৈতন্যদেবের উদয়ের পূর্বেই বাঙ্গলায় বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে ছিল, তার প্রচুর দৃষ্টান্ত আজও আছে। "পরম বৈষ্ণব-মহারাজ লক্ষ্মণ সেনদেব" ও তাঁর সভাসদ্ জয়দেব, (উত্তর বাঙ্গলার 'কৃষ্ণ-যাত্রাদল' গীত), তিরাশ, এবং

(১) Myers, Gurney and Podmore. "Phantasms of the Living" vol. v. pp. 150—). Pro. Soc. for Psyo Researches, vol XIX, 1905, "The Welsh Revival.

(২) "বাংলার বাউল" পৃঃ ৪১

আজও বহু বৈষ্ণব বংশ বাংলায় আছেন, যাঁরা গোস্বামী-শিষ্য নন অথচ বৈষ্ণব।

এসব বাউল শ্রেণীর সাধকদের উৎপত্তি যা'ই হোক না কেন, এরা বাঙলার কৃষ্টির অনেকটা অধিকার করে আছেন। বৌদ্ধ সহজযানী সাধকদের ন্যায় এঁরা "মিস্টিক্"। এঁরা প্রেমধর্মী—জাতি ও সরকারী ধর্মের গণ্ডীর বাইরে। সেনমহাশয় বলেন, বাউলমতে, তীর্থ ব্রত, বিগ্রহ-মন্দির, বাগযজ্ঞ-উপবাস কিছুতেই কিছু হয় না। কায়াকে ক্লেশ দিয়েও লাভ নাই। বরং কায়াকে শ্রদ্ধা করলেই সব সত্যের সাক্ষাৎ মেলে। কায়ার তত্ত্ব শ্রদ্ধাভরে সন্ধান করতে হয় (১)। এই জন্যেই এরা দেহতত্ত্ববাদী।

দরবেশদের "বীরভদ্রের শিক্ষামূলক কড়চা" নামক পুস্তকে আছে যে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু তাঁর পুত্রকে প্রেমধর্ম শিখবার জন্য আরব দেশের মদীনা সহরে মাধব বিবির কাছে পাঠালে তথায় মাধব বিবি কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করে নগ্নশরীরের দিকে দেখান যে এই শরীরেই গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি খেলছে। "গোপী গোপী সহিত দেখনন্দের নন্দন" (২)—এতে ঐ প্রেমধর্মীদের "দেহতত্ত্ব" বিষয়েই জোর দেয়া হয়েছে। শ্রীক্ষিতিমোহন সেন বলছেন: "কায়াযোগই বাউলদের পরমতত্ত্ব। কবীরের মত দাদুর মধ্যেও কায়াতত্ত্বই সার। দাদুর কায়াবলীতে পাই: "কায়া মাঁহে সিরজন হার। কায়া মাঁহে ভীর্থ দেব। কায়া মাঁহে ওঁ কার। কায়া মাঁহে অলখ অভেব।

ইহার অর্থ: কায়ার মধ্যেই সৃষ্টিকর্তা। কায়ার মধ্যেই জন্ম মরে।

কায়ার মধ্যেই ওঁকার। কায়ার মধ্যেই চৌরাশি যোনিভ্রমণ করে।

বাউল সম্প্রদায়গুলি নিরাকারবাদী, এঁরাও হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই পোষাক পরেন, উভয়ের শাস্ত্রকেও বড় করে। এঁরা সরকারী ধর্মের কাঠামোর বাইরে। বাউলরাও সাধনাতে হঠাৎ ভাবে illumination (জ্যোতি) পান, তাতে সব জ্ঞান পরিষ্কার হয়। বাউলেরা সন্ধ্যাভাষার অর্থাৎ হেঁয়ালী ভাষায় গান বাঁধেন এবং মনের "অচিন পাখির" সন্ধান করেন। এই কারণ বশতঃ ব্রাহ্মণ-সন্তান লালন ফকীরের শিষ্য গগন বলছেন:

"আমার মনের মানুষ যেরে।
আমি কোথায় পাব তারে।" (৩)

বাউলমতের সম্বন্ধে শেষকথা, কায়াতত্ত্বের সন্ধানে গিয়ে তাঁদের অনেক সম্প্রদায় নৈতিক অধঃপতনে নেমে গিয়েছেন। মনুষ্য-বিগর্হিত কর্মকে তাঁরা সাধনার অঙ্গ বলে মনে করেন। এ বিষয় ৺অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়' দ্রষ্টব্য। তবে এই পাশবিক কর্মগুলি Abnormal psychology'র অন্তর্গত বলে psychiatricsদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বস্তু। এটা মানব-মনের বিকৃতিরই পরিচয়।

এস্থলে প্রেমধর্ম ও তার দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হ'ল। প্রেমধর্মের খৃষ্টীয় ও সুফী শাখায় নৈতিক দুর্বলতা ঢুকে নাই। কারণ মূলধর্ম বড় কড়া নজর রাখে। অবশ্য বুজরুগী, পৌরহিত্যবাদ, হাড়পূজা প্রভৃতি বাহ্যিক অনুষ্ঠান সৃষ্ট হয়েছে। স্বাধীনদেশে ধর্ম রাজধর্মের অনুশাসনে থাকে; যেমন অশোকের সময়ে ছিল, ও গুজরাটে জৈনরাজা কুমারপালের সময়ে ছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদীয় বর্মন, সেন রাজাদের শাসনকালে বাঙলায় তান্ত্রিক ও সহজযান প্রভৃতি ধর্ম ছিল। রাজশাসনের ফলে, অশ্লীল বৌদ্ধ দেব-দেবীর পূজা (যুগ্ম-কায় নগ্ন মূর্তি) অন্তর্হিত হয়। হরিবর্ম দেবের মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট যে নূতন পূজাপাঠ ও সংস্কার-পদ্ধতি রাজশক্তির সহায়ে প্রচার করলেন, তা আজও

(১) "বাঙলার বাউল" পৃঃ ৩১ (২) ঐ পৃঃ ৪০-৪১ (৩) রবীন্দ্রনাথের Hibbert Lectures হতে "বাঙলার বাউল" উদ্ধৃত।

হিন্দুসমাজে চলছে। ধর্মের নামে যে কলুষতা প্রচলিত তা পরাধীনতার যুগেই উদ্ভূত হয়। কারণ মাথার উপর নিষেধ করবার কোন শক্তি নাই। এটা প্রেমধর্মের দোষ নয়।

এ জন্য সমাজে কলুষতা নিবারণ রাজশক্তির কর্ম। ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে, উনবিংশ শতাব্দীতে সরকার, ধর্মের নামে যেসব কদাচার প্রচলিত ছিল, তা আইন দ্বারা বন্ধ করেন। সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে ছেলে-ফেলা, বাণফোঁড়া ও সহবাস-সম্মতি প্রভৃতি (C. Buckland : Bengal under Lt governors দ্রষ্টব্য) অনেক গর্হিত প্রথা, আইন দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমেরিকায় এ সব বিষয়ে কড়া আইন আছে। তথায় প্রাচ্য ধর্মের নামে অনেক গর্হিত অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান ছিল, তা' পুলিশ তুলে দিয়েছে। ধর্মের নামে ফাঁকি বা প্রতারণা (charlatanism) বর্জনীয় (লেখক এ সব বিষয়ে অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে জানেন)। নানা ছদ্মনামে পরিচিত একজন—নানাস্থানে ক্লাস খুলে পুলিশ দ্বারা তাড়া খেত। "মজুমদারীয়" সম্প্রদায়কে পুলিশ ছিন্নভিন্ন করে দেয়। 'স্বামী অগম্য-গুরু'র শিষ্যেরা নিউইয়র্কে এক আড্ডা খুললে, একজন মহিলা তার সেক্রেটারী হলেন। কিন্তু যখন সংবাদপত্রে ফাঁস হয়ে গেল, (এই গুরুই সেই লণ্ডনের জেলখাটা Tiger Mahatma) তখন সেই মহিলা পুলিশের ভয়ে আড্ডা ভেঙ্গে দেয়।

সর্বযুগেই সর্ব দেশেই সমাজ-বিগর্হিত কর্মের জন্য রাজশক্তির নিকট জবাব দিহি করতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতে ধর্মের নামে বিগর্হিত কর্ম চলে। সত্যকথা বললেই "ধর্মে হস্তক্ষেপ" বলে চিৎকার উঠে। গুপ্ত সত্য তথ্য উদ্ঘাটিত করবার জন্য লেখক অনেক ধর্মগুরুর কাছে গালাগালি খেয়েছেন। কিন্তু লেখক পুনঃ পুনঃ বলেছেন, এই সব গুপ্ত ব্যাপার পুলিশ দ্বারা অনুসন্ধান করে যদি সত্য বলে ধার্য হয় তবে তা যেন বন্ধ করা হয়। অলমিতি বিস্তারেন।

তুমি

শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত

আমার এ ভালবাসা তোমারই ভাল-লাগা
আমার এ পথচলা তোমারই পথ চিনে ;
তোমারই তরে শুধু নিথর রাতি জাগা,
তোমারই গান আমি গাহি যে নিশিদিনে !

জীবনে যত সুখ, দুঃখ, আলো-আশা,
পুণ্য-পাপে মোর পরাণ ভ'রে দিলে ;
দু'হাতে মুঠো মুঠো দিয়ে যে ভালবাসা
একটি পলকেই আপন ক'রে নিলে।

আমি যে বীণাখানি, তুমি যে বীণকার,
আমার এ প্রাণ প্রভু তোমারই গানে সুর ;
ভয় ও ভুলবুঝা, লজ্জা দীনতার —
কালিমা মুছে প্রাণ ও-গানে ভরপুর।

তোমারই বেদনায় রক্তপতদল
আমার দু'টি চোখে একটি জলকণা,
অধরে যত মোর হাসির কোলাহল
তোমারই গান হ'য়ে কানেতে যায় শোনা !

তোমারই ভাল-লাগা আমার এ ভালবাসা,
আমার এ পথচলা তোমারই পথ চিনে ;
তোমারই তরে প্রভু আমার এ কাঁদা-হাসা,
তোমারই গান আমি গাহি যে নিশিদিনে।

সৌন্দর্য-বিচার

অধ্যাপক বীরানন্দ ঠাকুর

সহজতই মানুষ দেখে, জানে, আর বোঝে যে এই নিখিল সৃষ্টিতে একদিকে আছে সে, অপরদিকে আছে সে-ছাড়া আর সব-কিছু। তার এই দেখা, জানা ও বোঝা মনের প্রতিবিম্বই হোক বা মন-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তার ফলই হোক অথবা, উভয়ের সহযোগিতার ফলেই হোক, মোটকথা, দেখা, জানা ও বোঝা কাজগুলো হয়ে চলেছে। দেখা, জানা, বোঝা প্রভৃতি কাজগুলো যখন আছে তখন দেখা, জানা, বোঝার বিষয়গুলোও নিশ্চয় আছে; সেগুলো না-থাকার কথা ভাবা যায় না কিছুতেই। তা সে ও-বিষয়গুলো মনেরই সৃষ্টি হোক, আর, স্বতন্ত্র সৃষ্টিই হোক।

ঐ ক্রিয়াগুলো এবং বিষয়গুলোও আবার রকমারি হতে দেখা যায়। এগুলোকে মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ করা যায়, ভালো ও মন্দ বা সুন্দর ও কুৎসিত। অর্থাৎ, কতকগুলো বিষয় ভালো লাগে, কতকগুলো খারাপ; কতকগুলো মানুষকে সুখ দেয়, কতকগুলো দেয় দুঃখ। স্থানকালপাত্র ভেদে অবশ্য একই জিনিসের ভালো-লাগা ও মন্দ-লাগা হতে পারে, কিন্তু, একথা কোনমতে অস্বীকার করা যায় না যে প্রাণমন থাকতে মানুষের ভালো-লাগা ও মন্দ-লাগাটা থাকেই। এইটাই মানুষের অভিজ্ঞতার স্বাভাবিক অবস্থা। এ ছাড়া অবশ্য অসাধারণ অভিজ্ঞতার কথাও জানা যায় যে, নিখিল সর্গের মূলে সব এক: ভেদ যা তা বাইরের। অতএব, ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দরের পার্থক্য এসব বাহ্যিক। আসলে সবই ভালো, সবই সুন্দর। এমন অসাধারণ অভিজ্ঞতার আর একটা দিক আছে। সেটা হচ্ছে এই যে ভালো বলে কোন বস্তু নেই; মূলে সবই মন্দ, সবই বিশ্রী।

এখানে তুলে ধরবার কথাটা এই যে সৌন্দর্য জিনিসটি মনেরই সৃষ্টি হোক, আর, স্বতন্ত্র সৃষ্টি হোক তা আছে। এমন-কি, একদল লোকের অস্বীকৃতির চেষ্টা সত্ত্বেও তা অনস্তিত্বক হয়ে যাচ্ছে না। বরং এক হিসেবে, তাতেই স্বীকৃতির প্রমাণ মিলছে।

সুন্দর-অসুন্দরের পার্থক্য বাহ্যিক হলেও তা আছে। আর, বাহ্যিকটাও তো কিছু কম গ্রাহ্য নয়! বাহ্যিককে অগ্রাহ্য করার কথা তুললে আভ্যন্তরিকটাকেও অগ্রাহ্য করবার উস্‌কুনি দেয়া হবে। পার্থক্য না থাকলে বিভিন্ন অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার কথাই উঠতে পায় না। অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের কথা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং বস্তুর অনৈক্য ও তারতম্যও অস্বীকার করবার নয়।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও প্রত্যক্ষ জগৎ এবং জীবনই মানুষের কাছে বেশি সত্য। বাহ্যিক বলেই বেশি সত্য। তাই ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিতের তফাৎটাও তার কাছে মোটেই মিথ্যা নয়। সৃষ্টির আন্তর লোকে যা সত্য বাহ্যিক লোকে তা সত্য নয়। যদি তা হত তা হলে অন্তর যা'র এক রূপে দেখা দিত; বা'র বলে তাহলে কি আলাদা লোকের স্বীকৃতি দরকার করত? বৈচিত্র্যই বাহ্য বিশ্বের বৈশিষ্ট্য। বৈচিত্র্য যদি না থাকত তো কোন-কিছু যে আছে তা ঠিক অনুভূত হওয়া কঠিন হত। একটা বস্তুর একটা-রূপ-পাওয়া দিয়ে তার অতীতে-না-থাকার কথা এবং তার রূপান্তরিত হওয়া দিয়ে তার থাকার কথাটা উপলব্ধ হয়। অথবা, একটার থাকা দিয়ে আর একটার, কি, কতকগুলোর থাকা দিয়ে আর-কতক-গুলোর থাকা অনুভব করা যায়। এমনি, একটার না-থাকা দিয়েও আর-একটার থাকা বা কতকগুলোর

না-থাকা দিয়ে আর কতকগুলোর থাকাটাও অনুভূত হয়। কুশ্রী আছে বলেই শ্রীর সত্তা, মন্দ আছে বলেই ভালোর সত্তা, দুঃখ আছে বলেই সুখের সত্তা অনুভব করার সুবিধা হয়। মানুষের মন থেকে যদি একথাকের ধারণা একেবারে মুছে যায়, তার কোন অনুস্মরণ যদি না থাকে তাতে তো বিপরীত কোটির বস্তুসমূহের সত্তা অনুভবনীয় হবে না যদি সে-সবের মধ্যে কোন তারতম্য না না থাকে। অবশ্য সুখানুভূতির জন্যে দুঃখ এবং সৌন্দর্যভোগের জন্যে কদাকার-কুৎসিতকে থাকতেই হবে, সেকথা নয়।

মোটকথা, মানুষের, সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা, সুন্দর ও অসুন্দর বলে জিনিস আছে।

কিন্তু, সৌন্দর্য কাকে বলে? সুন্দর বলতে কী বুঝি? একসময়ে এর সোজা জবাব ছিল এই: যা মানুষের ইন্দ্রিয়নিচয়কে সুখ দেয়, আনন্দ দেয় তাই সুন্দর; অর্থাৎ, দেহ-মনের সুখকর বস্তুই সৌন্দর্য। তখন সরল ছিল মানুষের সত্তা, তাই তার প্রশ্নগুলোও যেমন ছিল সহজ, জবাবগুলোও তেমনি। কিন্তু, দিনে-দিনে বেড়ে গেছে মানুষের, তা সে ভালোই হোক, আর মন্দই হোক। কালক্রমে মানুষের সত্তার ভিতর এসেছে বহু জটিলতা। তাই, তার কোন সওয়ালের জবাব সরল হতে পারে না। তাই, এখন আবার কূটকচালে প্রশ্ন হয়: যা দেহ-মনের সুখদায়ক তাই কি সুন্দর? যা দেহ-মনের সুখদায়ক নয়? এমনিতে সুন্দর নয় এমন কোন-কোন জিনিস কি সুখ দিতেই পারে না?

মানুষ অনেক দেখে অনেক ঠেকে শিখেছে যে কোন জিনিসকে হঠাৎ দেখে যেমনটি মনে হয়, আসলে তা অনেকসময় তেমনটি নয়। অর্থাৎ, মানুষের জ্ঞান হয়েছে এই যে হঠাৎ-মনে হওয়ার সঙ্গে সত্যিকার হওয়ার মিল কখনও-কখনও হয় না; এমন-কি, উলটোটাও ঘটতে দেখা গিয়ে থাকে। কিন্তু আপাতত ও পরিণামে যে বিরোধ হতে দেখা যায় তার ভেতর অনেক কথা আছে। আপাত-দৃষ্টিতে যাকে সুন্দর বলে মনে হয়েছিল তার অপর অসৌন্দর্য দেখে তাকে মানুষ পরিণাম-কুৎসিত বলে থাকে। তাতে কিন্তু প্রথম-দেখার সৌন্দর্যের অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হয় না। সেখানে লক্ষ্য-বিচারের ভ্রান্তি ঘটে। বাহ্যিক রূপ কখনও-কখনও আন্তর রূপের অনুরূপ হয় না। তাই, বাহ্যরূপের মানদণ্ড অভ্যন্তরীণ রূপের পরিমাপ করা ঠিক নয়। কিন্তু, অনেক জায়গায় সেইটেই করা হয়ে থাকে। পরিণাম দিয়ে যে সৌন্দর্যের বিচার তাও যে সবসময় অভ্রান্ত হয় তাও নয়। প্রথম দেখায় বা অগভীর দেখায় যে-সৌন্দর্য অনুভূত হয়েছিল তা যে-পরিমাণে সুখ বা আনন্দ দিয়েছিল সেই পরিমাণে ছিল সৌন্দর্যবান। তাতে কোন রমণীয়তা না পেলে তাকে সুন্দর বলে মনে-হওয়া সম্ভব ছিল না কিছুতেই। প্রথম দেখে সুন্দর মনে-হওয়া জিনিসকে পরিণামের অশুভঙ্করতা দেখে মানুষ যখন অসুন্দর বলতে চায় তখন তাতেও বিচারের এক ভুল ঢুকে পড়ে। সেখানে কল্যাণকারিতা দিয়ে সৌন্দর্যের মূল্য নিরূপণ করা হয়ে থাকে। কল্যাণকারিতা সৌন্দর্যের ভেতর থাকে থাক, না থাকে না থাক; থাকবেই, এমন ধারণা করে নিয়ে চলার উপায় নেই। সৌন্দর্যের বিচার সৌন্দর্যকে দিয়েই করতে হবে, শিবতা দিয়ে, নয়, সত্যতা দিয়েও নয়। অর্থাৎ, সৌন্দর্যের বিচার হবে নয়নকারিতা দিয়ে, সুখদায়কতা দিয়ে। আর সঙ্গে-সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে সব সুখদ বস্তু শুভদ, এবং সব শুভদ বিষয় সুখদ নাও হতে পারে। শুভঙ্করতা দিয়ে সৌন্দর্যের মূল্যায়ন করলে তাতে সৌন্দর্যকে ছোট করা হয়; সৌন্দর্যের প্রতি প্রত্যয়হীন আত্মসমর্পণের বিপুল আনন্দও পাওয়া যায় না তাতে। সুখ আর শুভকে একেবারে এক, সুখ আর সত্যকে অদ্বৈত বলে ভাবায় মত ভালগোল পাকিয়ে যায়। কখনও-কোথাও মিল যে এদের মধ্যে ঘটে না বা ঘটবে না সে-কথা বলা যায় না, হবে, এদের অভিন্ন ভাষাও সংগত হয় না।

সত্য শিব ও সুন্দর এই তিনটি বিষয়কে একার্থক রূপে দেখবার ও দেখাবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এরা কি তাই? এদের মধ্যে আংশিক মিল কখন-সখন ঘটলেও এদের সমর্থক বলে ধরা কি ঠিক? তাই যদি হয় তো এগুলোর স্বকীয়তা বা বৈশিষ্ট্য থাকে কি? যা সত্য তাই যদি শিব ও সুন্দর হয়, যা শিব তাই যদি সত্য ও সুন্দর, এবং যা সুন্দর তা যদি সত্য ও শিব হয় তবে এ তিনটি বিষয়ের স্বতন্ত্র সত্তা কল্পনা করার উপায় থাকে না। কিন্তু, তাতে কি বাস্তব সত্যের ঠিক নির্ধারণ হয়? তাতে যে একটা দিয়ে অপরটার মূল্য নিরূপণ করার ভ্রান্ত জটিল উপসংহারে গিয়ে পৌঁছতে হবে। সত্যের সত্যতা কি শিবতা ও সুন্দরতায়? শিবের শিবতা কি সত্যতা ও সুন্দরতায়? সৌন্দর্যের সুন্দরতা কি শিবতা ও সত্যতায়? তা তো মনে হয় না। বরং মনে হয়, সত্যের মর্যাদা সত্যতায়, শিবের মহিমা শিবতায়, আর সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য আসলে সুন্দরতায়। এদের ভিতর যে কিছু-কিছু সাদৃশ্য দেখা যায় সেটা গৌণ ব্যাপার। মানুষের পক্ষে সেটা উপরি পাওনা।

যা সুন্দর তা সত্য এবং শিব হবেই, এই ধারণা আগে থেকে মনে ঘরে রেখে দিলে সৌন্দর্যের বিচার নির্মোহ হবার সুযোগ থাকে না। তাতে এই হয় যে সৌন্দর্যের সুন্দরতা প্রমাণে সুন্দরতার চেয়ে শিবতা ও সত্যতার গুণলক্ষণ দিয়ে বিচার করা হয়। সৌন্দর্যের বিচারে বা ভোগে সৌন্দর্যের কথাটাই হবে গৌণ, আর, শিবতা ও সত্যতার কথাটাই হবে মুখ্য —এমন লক্ষ্যচ্যুত সিদ্ধান্ত কি আর হতে পারে? সৌন্দর্য কতটুকু চিত্তবিনোদন করেছে তাই দিয়ে হবে তার সত্যতা-নিরূপণ। চিত্তের বিনোদ যদি সত্যিই লাভ হয়ে থাকে তো তার মূল্য সেখানে। চিত্তপ্রসাদের সেই তৃপ্তিটুকুর জন্যে যদি পরিণামে কিছু ক্ষতির মূল্য দিতেই হয় তো সে হবে সৌন্দর্য-দেবতার উদ্দেশে প্রশস্ত দান। এই পরিণামক্ষতির হিসেবে সৌন্দর্যকে মিথ্যে বলা কি ঠিক হবে? যদি হয়ও তবু সে-মিথ্যের জন্যে সৌন্দর্যের শক্তিমহিমা ক্ষুণ্ণ হবার কোন কারণ ঘটবে না। তাতে বরং এই কথা বলার একটা ক্ষেত্র তৈরি হবে যে তথাকথিত মিথ্যা-বিশেষণে বিশেষায়িত হয়েও সৌন্দর্য সৌন্দর্য হতে পারে। যেমনি অনেক সৌন্দর্য মিথ্যে বলে বিচারিত হতে পারে, তেমনি, অনেক মিথ্যেও সুন্দর বলে স্বীকৃত হতে পারে। কোন জিনিস মিছে বলেই যে তার সুন্দর হতে বাধা থাকবেই, কি, সুন্দর বলে তার মিছে হওয়া চলবে না—এমন কথা বলা চলে না। মরীচিকা যে-হিসেবেই মিছে হোক, তার লোভনীয়তা বা সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায় না। উপকার-বোধ দিয়ে যদি সৌন্দর্যের মূল্যবত্তা ও সত্যতা মাপতে হয় তো কৌমুদীকে মিছে বলতে হয়। কিন্তু, মিছে হয় যদি তা, তো সুন্দর হয়েই তা মিছে অতীত সুখের অনুস্মৃতি, সুখস্বপ্নের কৃতি মিছে কিন্তু সুন্দর। সুতরাং, সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যাবে যে মিথ্যা ও সৌন্দর্য যে সর্বদাই বিরোধী তা নয়। মিথ্যে হলেই সুন্দর হতে আটকায় না।

অদেখা, অজানা জগতের কথাকে চরম বা একমাত্র সত্য বলে না ভাবলে, অর্থাৎ, দেখা ও জানা জগতের বিষয়গুলোকে উড়িয়ে দেবার বাহাদুরি না নিতে চাইলে বুঝতে পারা যাবে যে, সংসারে এমন অনেক সত্য আছে যেগুলোকে কোনমতেই সুন্দর বলা চলে না। জীবনে, দুঃখদারিদ্র্য, রোগজরা-মৃত্যু এমনি সব কতকগুলো জিনিসকে সত্য হতে দেখা যায়। তাই বলে কি তাদের সুন্দর বলে মেনে নিতে হবে? তবে, এ কথা মানতে হবে যে, এগুলোতে কোন কারণে সুখ অনুভূত হলে এগুলো সুন্দর বলে গণ্য হবে।

আয়তন, পরিমাণ ও গুণাগুণ ভেদে সৌন্দর্যের রূপ বহু। এর একটা রূপের সঙ্গে অপরটার মোটামুটি তুলনা চললেও একটার মাপকাঠিতে আর একটার বিচার ঠিকমতো করা যায় না। রূপের

সৌন্দর্য বিচার রূপের রীতিতে, গুণের রীতিতে নয়। তেমনি গুণের শ্রী যাপা গুণের নিক্তিতে, রূপের ওজনদাঁড়িতে নয়। তা না হলে বিচার পরিষ্কার হতে পারবে না ; সৌন্দর্যের স্বরূপনির্ণয় হওয়াও কঠিন হবে।

সৌন্দর্য-বিচারে সৌন্দর্য-বোধ একেবারে অপরিহার্য। সৌন্দর্য-তত্ত্বের জ্ঞান থাকলে ভালোই ; প্রতিভাবর ব্যক্তির পক্ষে তা না থাকলেও যে বিচার অসম্ভব হয় তা নয়। কিন্তু, সৌন্দর্য-সম্বন্ধে সহজাত সংপ্রতিভতা, অর্থাৎ, সূক্ষ্ম তিতিক্ষ অনুভূতি, সূক্ষ্ম ধারণাশক্তি, নিখিত বুদ্ধি, অকুণ্ঠ ধৈর্য ও অধ্যবসায়, অবিমূঢ় মন, এবং ইন্দ্রিয়শক্তির বিশেষ জ্ঞানেন্দ্রিয়-গুলির সজীবতা—এসব না হলেই নয়। তাছাড়া, চাই সৌন্দর্য-ভোগ। যে-সৌন্দর্যের বিষয় বিচারিতব্য সে-বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং সাক্ষাৎ লিপ্তি অনেকটা সহজ করে বিচারের কাজকে। একদিকে সহজাত সৌন্দর্য-রুচি ও অনুরক্তি, অপরদিকে সমজদারির অনুশীলন যথার্থ সৌন্দর্য-বিচারে খুব দরকার। একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে নন্দনতত্ত্ব বা ইস্থেটিক্স্-এর জ্ঞানের আধিক্য অনেকসময় সহজ সৌন্দর্যবোধকে ভোঁতিয়ে দেয় এবং তাতে করে সৌন্দর্যের আস্বাদনে ও সৌন্দর্য-বিচারে বাধা সৃষ্টি করে।

সৌন্দর্য-বিচারে বিষয়বস্তুর পার্থক্যে যেমন সৌন্দর্যসত্তার পার্থক্যের কথাটা ধরে রাখতে হবে তেমনি সৌন্দর্য-ভোক্তা ও বিচারকের ব্যক্তিত্ব-ভেদে উপলব্ধিভেদের কথাটাও। অবশ্য, কোন বিষয়েই বিভিন্ন ব্যক্তির সৌন্দর্যের উপলব্ধিতে যে মিল হবেই না তা নয়। মিল কখন কোথাও হতেও পারে, আবার, নাও পারে। মিলের ক্ষেত্রে কোন্ মত অভ্রান্ত বা সত্য তা বলা সহজ নয়। সেইজন্যে কোন মতকে চূড়ান্ত বলে মনে করায় লোকসান আছে। সেখানে আরও সৌন্দর্য-রসিকদের দিকে যাচাই করাই সমীচীন। তাছাড়াও, ভাবীকালের মতের অপেক্ষা রাখা উচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে।

পরিবেশের অর্থাৎ স্থান, কাল ও সমাজের কথাটা ধর্তব্য সৌন্দর্যবিচার-ব্যাপারে। একই সুন্দর বস্তু পরিবেশ-ভেদে একই ব্যক্তির উপলব্ধি ও ভিন্নতা ঘটায়। তাছাড়া, সেই সৌন্দর্যেরও প্রকাশে তারতম্য হয়ে থাকে পরিবেশের পার্থক্যে।

একদিকে বিশ্বের নিসর্গে আপনা-আপনি সৌন্দর্য-সৃষ্টি হয়ে-চলেছে ; অপরদিকে জীবনমাত্রে, কতক সজ্ঞানে, কতক অজ্ঞানে। কিন্তু, কি প্রাকৃতিক, কি জৈবিক সৌন্দর্যসৃষ্টি, সর্বত্রই সৌন্দর্য-নিরূপণের প্রথম অবধারিত নির্ণায়ক হচ্ছে সামগ্রীর রম্যতা ও নন্দনকারিতা। যার যত এই নন্দনকারিতা তার তত সুন্দরতা। অর্থাৎ, যে-নন্দনকারিতার ব্যাপ্তি, মানে, কালের দিক থেকে স্থায়িতা ও ব্যক্তির দিক থেকে বহুজনীনতা বেশি, সৌন্দর্যের বিচারে তার তত উৎকৃষ্টতা। সৌন্দর্য-বিচারের এ হচ্ছে একটা মোটা হিসেব। প্রেমের উদাহরণ নেয়া যেতে পারে। এর মত বহুকালীন ও বহুজনীন নন্দনকরতা আর কিসে আছে? তাই, প্রেমের মতো সুন্দর সামগ্রী আর নেই। কিন্তু, এ কথাও বলতে হয় যে, প্রেম যেমন হয় নন্দনকারী, নন্দনকারিতাও তেমনি হতে পারে অনুরাগ-সঞ্চারী।

সৌন্দর্য-বিচারের শেষ কথা হচ্ছে এই যে শেষ কথা নেই।

চুঁচুড়ার সংগীত-শিল্পী

শ্রীবিপ্রদাস মল্লী, এম. এ., সঙ্গীততত্ত্ব-বিশারদ

হুগলী জেলার কেন্দ্রস্থল চুঁচুড়ার শিল্পকলার নিদর্শন শুধু ডাচ্-স্মৃতি বিজড়িত হর্ম্যরাজির শিল্পনৈপুণ্যে নহে, ইহার আপন ঐতিহ্য সংগীতকলাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহা যদিও কালক্রমে বিস্মৃতির অতলতলে তলাইয়া গিয়াছে তথাপি অধুনা নবীন শিল্পীদের সমবেত চেষ্টায় পুনরায় আপন গৌরবময় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। এই সহরের উচ্চাংগ সংগীতের চর্চা প্রায় দুইশত বৎসরের (১৭৭৭ খৃঃ হইতে) ইহাই ইহার বিশেষত্ব। চুঁচুড়ার পার্শ্ববর্তী সহর চন্দননগরও সংগীতচর্চার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, কিন্তু সেই সহরের উচ্চাঙ্গ সংগীতের ইতিহাস একশত বৎসরেরও কম (১৮৮০ খৃঃ হইতে)।

বাঙলাদেশের মধ্যে বিষ্ণুপুর ও মুর্শিদাবাদ উচ্চাংগ সংগীতের কেন্দ্রস্থল ছিল এবং প্রাচীনত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে চুঁচুড়ারও স্থান তাহাদের অপেক্ষা ন্যূন নহে। অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে মান খাঁর ন্যায় উচ্চস্তরের গায়ক ও তাঁহার উপযুক্ত ছাত্র রামচন্দ্র নীলের প্রতিভার মিলন হইলেও চুঁচুড়ায় উচ্চাংগ সংগীতের কোন বিশেষ ঘরোয়ানার সৃষ্টি হয় নাই, যেরূপ বিষ্ণুপুরে বাহাদুর সেন ও তাঁহার ছাত্রগণ যথা গদাধর চক্রবর্তী, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য ও অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভার মিলনে বিষ্ণুপুর ঘরোয়ানা" ঞ্রপদের সৃষ্টি হয়। অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে, রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর চুঁচুড়ায় সংগীতক্ষেত্রে উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকের অভাব পরিলক্ষিত হয় যাহার ফলে সংগীতের ঐতিহ্য অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

চুঁচুড়ার বিখ্যাত ধনী শীল-পরিবারের উচ্চাঙ্গ সংগীতপ্রীতি কলিকাতার ঠাকুর-পরিবারের সংগীত পরিপোষণের তুল্য। শীল-পরিবারের জগমোহন ও কৃষ্ণমোহন ভ্রাতৃদ্বয় সংগীতের বীজ রোপণ করেন এবং রামচন্দ্র শীলের সাধনায় এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে রামচন্দ্রের সময় হইতেই সংগীতের চর্চার সূত্রপাত।

রামচন্দ্র শীল

জগমোহন শীল — কৃষ্ণমোহন শীল

রামচন্দ্র শীল

রামচন্দ্রের পিতা জগমোহন সংগীতপ্রিয় ও সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার অর্থপ্রাচুর্য থাকায় গোয়ালিয়র, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত সুর-কারদের যথোপযুক্ত সম্মানে নিমন্ত্রণ করিতেন ও বাঙলার বাহিরের যে সমস্ত কলাবিদ্‌রা কলিকাতায় আসিতেন তাঁহাদিগকে চুঁচুড়ায় সংগীত-জলসার আয়োজন করিয়া আপ্যায়িত করিতেন। তাঁহার এই সংগীতপ্রীতি চুঁচুড়ার সংগীতপ্রিয়দের শিক্ষা ও অনুশীলনের সুযোগ দিয়াছিল। জগমোহন নিজে পারমার্থিক বিষয়ে গান গাহিতেন এবং উত্তর-ভারতীয় সংগীতবিদ্‌দের সংস্পর্শে আসিয়া নিজে কিছু মার্গ সংগীত আলোচনা করিয়াছিলেন। জগমোহনের ভ্রাতা কৃষ্ণমোহন গায়ক ও হিন্দী ভাষায় সংগীত-রচয়িতা ছিলেন।

রামচন্দ্র ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে শীল-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ও খুল্লতাত সংগীতরসিক হওয়ায় রামচন্দ্রের সংগীত শিক্ষার সুযোগ সুবিধা যথেষ্ট ছিল। রামচন্দ্র শৈশব হইতে রাগ-রাগিণীর আবহাওয়ায় বর্ধিত হওয়ায় সংগীতানুশীলনের

অভিলাষ সহজাত হয়। পরন্তু পিতা সংগীতে অধিক অগ্রসর না হওয়ায় পুত্রকে আপন মানসপুত্ররূপে স্বজনের বাসনা করিয়া সংগীতে উৎসাহ দিতেন। জগমোহনের সংগীতাসরে বহু গুণীর সমাবেশ হইত, তন্মধ্যে তিনি গোপালিয়রের প্রসিদ্ধ সদারঙ্গবংশীয় ওস্তাদ মান খাঁকে পুত্রের গুরুরূপে নির্বাচন করেন। উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে রামচন্দ্র অল্পকাল মধ্যেই খেয়াল ও ধ্রুপদ সংগীতে জ্ঞান সঞ্চয় করেন এবং গুরুর আশীর্বাদভাজন হন।

প্রসঙ্গক্রমে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মান খাঁ ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় আসেন ও ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এই সহরেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। মান খাঁর খেয়ালগানে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ গায়ক গুরুপ্রসাদ মিশ্রের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত ছিলেন। গুরুপ্রসাদের নিকট রাধিকা-প্রসাদ গোস্বামী ও রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় খেয়াল গান শিক্ষা করিয়াছিলেন। মান খাঁ তৎকালে জনপ্রিয় গায়ক ছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁহার মৃত্যুতে যে শোভাযাত্রা হইয়াছিল তাহাতে বহু হিন্দু যোগদান করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্রের খ্যাতি কেবলমাত্র গীতকার হিসাবে নহে। তিনি মেসার্স পামার এণ্ড কোম্পানীর দেওয়ান ছিলেন। ইহা ভিন্ন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রেশমের একচেটিয়া ব্যবসার ত্যাগ করিলে রামচন্দ্র মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের বহু রেশমকুঠি ক্রয় করেন ও প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তিনি ব্যবসায় উপলক্ষে প্রায় মুর্শিদাবাদ যাইতেন এবং তৎকালে যে সমস্ত গুণী কলিকাতা বা মুর্শিদাবাদে আসিতেন তাঁহাদিগকে মজুরা দিয়া আপন সংগীতাসরে আমন্ত্রণ করিতেন। তিনি এই গুণীবৃন্দের জন্য জীবনে প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এইরূপ সদাশয় সংগীতভক্ত সংগীত-জগতে বিরল। সেই সময়ের সুপ্রসিদ্ধ কলাবন্তগণ, যথা—বড় মিঞা, ছোট মিঞা, হস্সু খাঁ, হদ্দু খাঁ, হীরা, বুলবুল প্রভৃতি রামচন্দ্রের আমন্ত্রণে চুঁচুড়ায় আসিয়া সংগীতরস পরিবেষণ করেন।

সাংসারিক জীবনে রামচন্দ্র ধর্মভীরু, নিরভিমান ও বিনয়ী ছিলেন। তাঁহার নিকট সংগীত-সাধন-মার্গের অবসান ছিল। ভারতের অন্যতম গুণী হইয়াও কখনও আত্মপ্রচারে সচেষ্ট হন নাই। তিনি যশের কাঙাল ছিলেন না, বরং যশই আপন বরমাল্য তাঁহাকে দিয়াছিলেন। তিনি নিজে উচ্চস্তরের সংগীত-রচয়িতা ছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় দখল থাকায় হিন্দুস্থানী সংগীত রচনা ও সুর-সংযোজনা করিতে পারিতেন। ইহার ফলে তাঁহার বহু গান ওস্তাদ মারফৎ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গুণীমহলে পরিবেষিত হইয়া সমাদর লাভ করে। সহজাত বিনয়ের ফলে তিনি কখনও অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিতেন না এবং নির্বিচারে সকল রসিককেই সংগীতরসে প্লাবিত করিতেন। তাঁহার রাগ-রাগিণীর আলাপ অপূর্ব ধরণের ছিল। তিনি খেয়াল, ধ্রুপদ ভিন্ন অন্যদেবের পদাবলী, সংস্কৃত দেবদেবীর স্তোত্র ও শ্লোকসমূহ সুর সহযোগে গাহিতেন।

রামচন্দ্রের সংগীতের খ্যাতি সমগ্র ভারতের গুণী-মহলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় প্রসিদ্ধ "রাগ-কল্পদ্রুম" প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগসাগর তাঁহার পুস্তক প্রণয়ন উপলক্ষে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ কালে চুঁচুড়ায় আসিয়া রামচন্দ্রের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণানন্দ রাগসাগর রামচন্দ্রের স্বরচিত ও সুর-সংযোজিত গীতসমূহের উচ্চ চংয়ে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কয়েকটি স্বরচিত গীত রাগকল্পদ্রুমে প্রকাশ করেন।

রামচন্দ্র অকাতরে সংগীত-বিদ্যা দান করিতেন। প্রয়োজনবোধে শিষ্যদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়া সঙ্গীতজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছিলেন। এইরূপ বদান্যতার দৃষ্টান্ত বিরল। রামচন্দ্রের রেশমের কুঠি ও কারখানা নৈহাটীর কাঁটালপাড়ায় থাকায় তিনি সময়ে সময়ে কুঠি পরিদর্শন করিতে যাইতেন এবং কৃষ্ণনগরের

মহারাজা ভারতচন্দ্র তথায় রামচন্দ্রের গান শুনিতেন। রামচন্দ্র কলিকাতার বিখ্যাত জমিদার ও সঙ্গীতরসিক ছাটুবাবু, লাটুবাবু প্রভৃতির সহিত পরিচিত ছিলেন।

রামচন্দ্রের বহু শিষ্য ছিল, তন্মধ্যে গোপালচন্দ্র পাঠক, পরাণ মুখোপাধ্যায়, জলধর মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ, স্বরূপ সরকার প্রভৃতি সুনামের অধিকারী। চুঁচুড়ার বিখ্যাত পালবংশের ভাণ্ডারবাসী ক্রপদ-গায়ক রাজকৃষ্ণ পাল তাঁহার সমসাময়িক গায়ক। রামকানাই মুখোপাধ্যায় ও গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরাও তাঁহার সমসাময়িক গায়ক। রামচন্দ্র চৌট্টা ৫৮ বৎসর বয়সে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে সুকৌশলে সম্বরণ করিয়া সাধনোচিত লোকে গমন করেন।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অস্ত্রোপচারের নব পদ্ধতি :

গ্রাফ্‌টিং অর্থাৎ রোগীর দেহের অঙ্গবিশেষ হইতে চামড়া কাটিয়া ক্ষতস্থানে উহা জুড়িয়া দেওয়া অস্ত্র-চিকিৎসার এক বিশেষ অবদান। বর্তমানে ইহাও পরীক্ষিত হইয়াছে যে, হাড় কাটিয়া উহার সঙ্গে ভাঙা হাড় জোড়া লাগানো সম্ভবপর। এযাবৎকাল ভাঙা কব্জোটি ইস্পাত সাহায্যে জোড়া লাগানো হইত। সম্প্রতি 'আমেরিকান্ সোসাইটি অফ্ প্লাষ্টিক অ্যাণ্ড রিকন্‌ষ্ট্রাকটিভ সার্জারি' মিয়ামি ফ্লোরিডার এক সম্মিলিত অধিবেশনে প্রমাণ করে যে রোগীর পঞ্জর কাটিয়া ইস্পাতের পরিবর্তে তাহা দ্বারা ভগ্ন কব্জোটি বা মস্তকের খুলি জোড়া লাগানো খুবই সম্ভবপর। প্রায় এগারোটি রোগীর উপর এইরূপ অস্ত্র চিকিৎসা চালানো হইয়াছে এবং ইহার ফলও হইয়াছে সাফল্যমণ্ডিত। পঞ্জর কাটিয়া লওয়ার পর রোগীর নূতন পঞ্জর লাগাইতে প্রায় ৩ ঘণ্টা লাগে। যে সব শিশুরা মস্তকের খুলিতে আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাহাদের পক্ষে এই নবতম পদ্ধতির অস্ত্রচিকিৎসার সাফল্য খুবই আশাপ্রদ।

দুই লক্ষ বৎসরের পুরাতন নর কব্জোটি :

ডক্টর হ্যাগ্‌স বার্গন্ নামক এক অষ্ট্রীয়ান নৃতত্ত্ব-বিদ্ পৃথিবীর প্রাচীনতম মানুষের কব্জোটি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং প্রাচীনতম সমাজের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া এপর্যন্ত তিনি দাবী করিয়া আসিতেছেন। আমেরিকার, কলোরিডোর দক্ষিণ অঞ্চলে ভ্রমণ করার সময়ে ইহা কোনো পর্যটকের দৃষ্টিগোচর হয়।

স্থানীয় এক কৃষক মাটি খনন করিতে করিতে পার্বত্য অঞ্চলের এক কবর-স্থানে একটি প্রস্তরীভূত মানুষের মস্তক প্রাপ্ত হয়। গবেষণার উপযুক্ত বলিয়া ইহা নৃতত্ত্ববিশারদ ডক্টর বার্গন-এর নিকট লইয়া আসা হয়। বিশেষজ্ঞগণ দীর্ঘকাল পরীক্ষা করিবার পর এই কব্জোটিকে দুই লক্ষ বৎসরেরও অধিক পুরাতন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সুপ্রাচীন নিয়ানডারথাল মানবেরও বহুপূর্বে এইশ্রেণীর মানবের আগমন ঘটে এবং তাহারা সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করিতে থাকে।

ডক্টর বার্গন-এর আবিষ্কার মানব সমাজের ইতিবৃত্তের উপর নূতন আলোকপাত করিতেছে।*

---

* 'বিয়াত্রি' ২১।২।৫৩

গ্রন্থ-সমালোচনা

পুস্তক সমালোচনার জন্য প্রত্যেক পুস্তকের দুইখানি করিয়া কপি পাঠাইলা বেওয়াই সাধারণ নিয়ম। অতঃপর গ্রন্থকার অথবা পুস্তক প্রকাশক মহাশয়দিগের প্রতি আমাদের নিবেদন—'বিচিত্রা'তে কোনও পুস্তক সমালোচনা করাইতে হইলে তাঁহারা আমাদের নিকটে সমালোচ্য প্রত্যেক পুস্তকের দুইখানি করিয়া কপি পাঠাইবেন।—সম্পাদক, 'বিচিত্রা'।

মাতৃগীতা—ডাঃ অনাথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এস্. এস্.। প্রাপ্তিস্থান: মহেশ লাইব্রেরী; ২১১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২; মূল্য—দুই টাকা।

ডাঃ অনাথনাথ জীবিকায় ছিলেন কৃতি চিকিৎসক। পরবর্তীকালে ১৩৮ শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য রূপে তিনি বৈজ্ঞানিক হইয়াও আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সাধনায় তিনি যে কতদূর সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—তাহা অনেকটা এই সঙ্গীত-পুস্তকখানি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়।

সাধক অনাথনাথ জীবনভর যে মায়ের সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন সেই শ্রীশ্রীবাগ্বাদিনীর শ্রীচরণে তিনি আজ আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। আজ তিনি আর ইহলোকে নাই। তাঁহার পুত্র শ্রীকৃত্তিনাথ পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া ভক্ত পিতার যে রূপটি আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিলেন, তাহাতে বহু অধম মাতৃপ্রেমের প্রেরণা লাভ করিয়া ধন্য হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

প্রেমযোগ (১ম ভাগ): স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসঙ্ঘ, ২১১এ, সিরিশ ঘোষ রোড, বেলুড়। মূল্য: একটাকা।

ধর্ম এবং তত্ত্বমূলক আলোচনার ক্ষেত্রে স্বামী জগদীশ্বরানন্দের নাম সর্বজনপরিচিত। ইতিপূর্বে ইহার রচিত বহু গ্রন্থ ভক্ত-পাঠকসমাজের সমাদর লাভ করিয়াছে। আশা করা যায় বর্তমান গ্রন্থটির ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। কারণ যেরূপ নিষ্ঠা ভক্তি এবং শ্রদ্ধা সহকারে স্বামিজী ধর্মীয় বিষয়বস্তু আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং যেরূপ যুক্তি ও সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিত আলোচ্য বস্তুকে পরিস্ফুট করিয়া তোলেন—তাহা বর্তমান পুস্তকটিতেও বর্তমান। অধিকাংশ কাহিনীগুলিই ইতিপূর্বে মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশিত কিংবা সভাসমাবেশে কথিত হইলেও ইহাদের মধ্যে সেই যুক্তি ও ভক্তিনিষ্ঠ মন সমভাবে উপস্থিত।

'প্রেম যোগ', রাসতত্ত্ব, শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা, কবীর, তুলসীদাস, অঙ্গাদিল প্রভৃতি পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক প্রেমযোগীদের কাহিনী ছাড়াও মহাকবি গ্যাটে, অপেক্ষাকৃত স্বল্পখ্যাত ধর্মনিষ্ঠ সাধক তথা সমাজ-সংস্কারক বলবেশ্বরের জীবন এবং সাধনা বিবৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বিষয়ক প্রবন্ধটি আয়তনে দীর্ঘ এবং আলোচনায় যথেষ্ট গভীর। রাসলীলা কি, কেন এবং ইহার তাৎপর্যই বা কি, স্বামিজী তাহা শ্রীমদ্ ভাগবত এবং অন্যান্য তত্ত্ব ও কাব্য গ্রন্থাদির সাহায্যে ভক্ত-পাঠকের উপযুক্ত করিয়া অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যান করিয়াছেন।

অন্যান্য প্রবন্ধগুলি তেমন বিস্তীর্ণ কিংবা ব্যাখ্যা-মূলক না হইলেও সংক্ষিপ্ত পরিসরেই পাঠক আলোচ্য প্রেমযোগীদের সর্বকাহিনী উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কারণ সব কয়টি কাহিনীই অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত।

পুস্তকটির বিশেষ আকর্ষণ—মিঃ ডানকান গ্রীনলজের ইংরেজি পুস্তিকা অবলম্বনে রচিত 'উইরে' নাট্যকাহিনীটি। বিশ্বের সাধারণ মানুষের মনে মনে যে অসাধারণ প্রেমধর্মের জন্য প্রবাহিত এই

এক অঙ্কের নাটিকাটিতে তাহা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বামিজী পাদটীকায় বলিয়াছেন —ঁহার এই অনুবাদ সম্ভবত প্রথম বঙ্গানুবাদ। বর্তমানে সমালোচকেরও তাহাই অভিমত।

আমার অভিমতে এই পুস্তকের দ্বিতীয় আকর্ষণ বোধহয়—বসবেশ্বরের কাহিনীটি। বসবেশ্বর দক্ষিণ-ভারতে দ্বাদশ শতকে আবির্ভূত হইয়া একটা সীমাবদ্ধ পরিধিতে হইলেও দেশকে তাহার মতকে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে নানাধিক হইতেই মধ্যযুগের অন্যান্য সাধকের তুল্য। আজ তাঁহার প্রবর্তিত বীর শৈবধর্মের অনুরাগী 'লিঙ্গায়তগণ' দক্ষিণভারতের একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়। স্বামিজী বাঙ্গালী ভক্তজনের নিকট তাঁহাকে আংশিকভাবে হইলেও যেরূপে পরিচিত করাইয়া দিয়াছেন তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

গ্যাটেকে প্রেমযোগীদের তালিকাভুক্ত করার জন্য আপত্তির কোন কারণ নাই বটে, তবে যেভাবে তাঁহাকে তিনি পরিচিত করাইয়াছেন তাহা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ বিধায় ভবিষ্যত সংস্করণে উহা বর্জন করিতে অনুরোধ জানাইব। আমার মতে পুস্তকের অন্যান্য কাহিনীগুলির মধ্যে সঙ্গতি রক্ষার্থে ইহা আবশ্যক।

যোগ্য হাতে রচিত এই প্রেমপুরুষগণের কাহিনীটির বহুল প্রচার আমরা কামনা করি।

MEAN YOU ! Swami Pratyagatmananda Saraswati. Price : Re. 1-4 As.

ধর্মমূলক ইংরেজী কবিতার বই। স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি ইংরেজী ভাষায় হইলেও বইখানা নিঃসন্দেহে—কবিতার বই। ভাবের দিক হইতে কবিতাগুলি মিস্টিক এবং এগুলোকে ভাগ করা যাইতে পারে তিন ভাগে। প্রথমত—বস্তুজগতের জীব আমি, দ্বিতীয়ত—রক্ত-মাংস, লাভ-লোভ ইত্যাদিতে ক্লান্ত আমি এবং তৃতীয়ত—সেই 'আমি'র জ্যোতির্লোকের স্পর্শ লাভ। স্বামিজী মাতৃভাষার মত ইংরেজীকে ব্যবহার করিয়া অতি স্পষ্ট একটি ভাবকে এমন সুন্দরভাবে প্রকাশে সমর্থ হইয়াছেন যে, ভক্ত কাব্যামোদীগণ তাঁহার দেওয়া বিশেষ ব্যাখ্যা ছাড়াই এগুলির মর্মকথা উপলব্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

বইখানাতে মোট তেরখানা কবিতা আছে। দুই রংয়ে ছাপা প্রতিটি কবিতাই কবিতা হিসাবে পাঠকের মনোজ্ঞ, সেই সঙ্গে পাঠককে বস্তুজগতের দৈন্য বিষয়ে চেতনাসম্পন্ন করিয়া তুলিবে। আমরা বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীনিখিল সরকার

নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ—স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী। মূল্য আড়াই টাকা। প্রকাশক—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, রাইটার্স সিণ্ডিকেট, ৮৭ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—৮৭।

বৈষ্ণব কবির কাব্যে দিব্য অনুভূতি, অতীন্দ্রিয় সাধনা, সুকণ্ঠের ভজন ও উপাসনা পদ্ধতিই ভাব ও ভাষার সাযুজ্যবন্ধনে মধুর হয়ে উঠেছে। স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী লিখিত 'নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ' গ্রন্থখানি সেইরূপ পদাবলী; ঐ গ্রন্থে ভক্তজনের আকুতি কবিকথার চাতুর্যে হয়ে উঠেছে; ধ্যানচৈতন্যের গভীর অনুভূতি-রস বাগ্-বিভূতিতে হয়ে উঠেছে মধুর। শ্রীগুরু, ইষ্ট ও সাধন—এই তিনভাগে স্বামিজী মূলসংস্কৃতশ্লোকের বঙ্গানুবাদও দিয়েছেন—যে সংস্কৃত যেমন সুন্দর অনুবাদও তেমনি প্রাঞ্জল। ভক্তজনের আদরের বস্তু যে এ'হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। আমরা এর বহুল প্রচার কামনা করি।

অ. ক. হ.

সংঘ বার্তা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব : বিগত ১৯শে ফাল্গুন ১৩৬৩ (ইং ৩রা মার্চ, ১৯৫৭) রবিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১২২ তম শুভ জন্মোৎসব প্রতিপালিত হইয়াছে। রবিবার ব্রাহ্মমুহূর্ত মঙ্গলারতি, তৎপরে যথাক্রমে শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। চণ্ডীপাঠ করিয়াছিলেন স্বামী দুর্গানন্দজী ও বিশেষ পূজা করিয়াছিলেন স্বামী আত্মানন্দজী। বেলা ১১টায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র সমস্বরে কয়েকটি ভজন সংগীত করে। সঙ্গীত বিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তীর পরিচালনায় বেলা ১২টা হইতে রামনাম কীর্তন ও ভজন-সংগীত হইয়াছিল। এই কীর্তন ও ভজন-সংগীতের সঙ্গে প্রসিদ্ধ বংশীবাদক শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের বংশী-বাদন অতি চমৎকার হইয়াছিল। অপরাহ্ণ চারটা ত্রিশ মিঃ হইতে দেড় ঘণ্টা যাবৎ বিখ্যাত কথক-শিরোমণি সঙ্গীতাচার্য শ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জীবনী কথকতা দ্বারা আগত ভক্তকে বিমল আনন্দ দান করেন। মধ্যাহ্ন হইতে প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। মনে হয় ঐ দিন প্রায় দুই হাজার ব্যক্তি প্রসাদ পাইয়াছিলেন। সন্ধ্যা ৬টার সময় সাধারণ সভায় অনুষ্ঠান হয়। পূর্ব-মনোনীত সভাপতি ডক্টর সুশীলকুমার দে এক অনিবার্য কারণে ঐ দিন সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় খুব দুঃখ প্রকাশ করেন। এমতাবস্থায় প্রবীণ ভক্ত শ্রীযুত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয়কে সভাপতি করা হয়। শ্রীমৎস্বামী ভাস্বানন্দজী, অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায় এবং অধ্যাপক সমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট বক্তাগণ যুগাবতার ঠাকুরের পুণ্যজীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। সভার প্রারম্ভে সঙ্গীত-বিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী উদ্বোধন সঙ্গীত গান করেন। স্বামী দুর্গানন্দজীর শান্তিবাচনের পরে সভার কার্য আরম্ভ হয়।

রাত্রি আট ঘটিকা হইতে এগার ঘটিকা পর্যন্ত কলিকাতা কল্পতরু মিলন মন্দির কালী-কীর্তন সম্প্রদায় তাঁহাদের কীর্তন দ্বারা পরিপূর্ণ আসরে আনন্দ পরিবেশন করেন।

পরদিন, ২০শে ফাল্গুন সোমবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকা হইতে প্রশস্ত মঞ্চপ্রাঙ্গনে সুসজ্জিত, সুরুচিত রঙ্গমঞ্চে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অতীব সাফল্যের সহিত 'গুরুদক্ষিণা' (একাঙ্কিকা) নাটক অভিনয় করে। মোটামুটি সকল ভূমিকাই সু-অভিনীত হইলেও একলব্যের ভূমিকায় ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান রবীন্দ্র চক্রবর্তী ও ভীমের ভূমিকায় ৩য় শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান চন্দন চক্রবর্তী বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। অভিনয় কালে দর্শকবৃন্দের অনেকে বিভিন্ন বালক-অভিনেতাকে পদকাদি দ্বারা পুরস্কৃত করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন।

অভিনয়কালে বিরাম এবং দৃশ্যান্তরের অবকাশে বিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের ছাত্রগণ শ্রীশ্রীসারদা স্তোত্র, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর প্রশস্তিগান দ্বারা অভিনয়ের সৌষ্ঠব যথেষ্ট বাড়াইয়া তুলিয়াছিল।

ইহার পরদিন, ২১শে ফাল্গুন মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকা হইতে প্রায় তিনঘণ্টা যাবৎ কলিকাতা গ্রে ষ্ট্রীট কালীকীর্তন সম্প্রদায় কর্তৃক মহামায়ার নাম গীত হইয়াছিল।

এইভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্য করিয়া ভক্তবৃন্দ উপর্যুপরি তিন দিবস একত্রিত হইয়া সুনির্মল ও সুপ্রচুর আনন্দ উপভোগ করেন।

Statement about ownership and other particulars about the journal 'Visvavani' (according to Form IV, Rule 8, circulated by the Registrar of Newspapers for India).

1.	Place of Publication	19B, Raja Rajkrishna St., Cal —6
2.	Periodicity of its publication ...	Once in a month
3.	Printer's name	Sri Sambhunath Banerjee
	Nationality ...	Indian
	Address	73, Maniktolla St., Cal.—6
4.	Publisher's name ...	Br. Basanta Kumar
	Nationality	Indian
	Address	19B, Raja Rajkrishna St, Cal.—6
5.	Editor's name	Swami Sadatmananda
	Nationality	Indian
	Address	19B, Raja Rajkrishna St., Cal.—6

6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital.

Visvavani, the organ of the Ramkrishna Vedanta Math, is managed by the Sannyasi Trustees of the R. K. Vedanta Math. The names and addresses of the Trustees are:

1.	Swami Sadatmananda,	19B, Raja Rajkrishna St., Cal.—6
2.	,, Sadrupananda,	Do
3.	,, Satyarupananda,	Do
4.	,, Durgananda,	Do
5.	,, Prajnanananda,	Do
6.	,, Br. Amar Chaitanya,	Do
7.	,, Swami Bhabesananda,	Do
8.	,, Girijananda,	Do
9.	,, Chitswarupananda,	Do

I, Brahmachari Basanta Kumar, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief

Date, 26th March, 1957

Signature of Publisher
Sd/ Br. Basanta Kumar.

অষ্টাদশ বর্ষ

(ফাল্গুন, ১৩৬২—মাঘ, ১৩৬৩)

সম্পাদক

স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী বেদানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বার্ষিক মূল্য চারি টাকা] [প্রতি সংখ্যা আট আনা

বিশ্ববাণী

অষ্টাদশ বর্ষ

(ফাল্গুন, ১৩৬২—মাঘ, ১৩৬৩)

বর্ষ-সূচী

বিষয়		লেখক-লেখিকা		পৃষ্ঠা
অ				
অতলস্পর্শী	...	শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত		৩১১
অতীতে আমেরিকায় ভারতীয়দের প্রসার				৯৪
অন্তিম কামনা (কবিতা)	...	শ্রীবিধুভূষণ সূর		৪৪০
অন্তিম শয়নে বুদ্ধদেব	—	শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী		৫৭০
অভাব		শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য		২৫৩
অভিশপ্ত প্রাণ এক (কবিতা)		শ্রীকালীপদ কোঙার		৫০১
অভেদানন্দ-বন্দনা (কবিতা)		শ্রীনলিনীবালা বসু		৩৯৮
অভেদানন্দ-স্মৃতি (কবিতা)		শ্রীপ্রফুল্লকুমার লাহিড়ী		৫৮৯
অস্তিত্ব (কবিতা)		শ্রীকালীপদ কোঙার		৫২৩
অহংতত্ত্ব		শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র কর		১৯১
আ				
আচার্য জগদীশচন্দ্র		স্বামী বেদানন্দ	...	৪৮৫
আচার্য শঙ্করের প্রতি (কবিতা)		শ্রীহরকুমার চক্রবর্তী	...	১৪৪
আজকের সাহিত্য	—	শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...২৬৫,	২৮৬
আত্মনিবেদনম্ (কবিতা)	...	শ্রীশ্রীনিবাসকান্ত কাব্য ব্যাকরণতীর্থ		৩১৭
আমাদের মা ও স্বামী অভেদানন্দ		শ্রীউপেন্দ্রকুমার দত্ত	...	৫৫৬
আরতি (কবিতা)		শান্তশীল দাশ		৩৬২
আমার বাণী (কবিতা)		রণজিৎ গুহ কাব্যভারতী		২৭২
আষাঢ়ে (কবিতা)		সচ্চিদানন্দ সান্যাল		১৯৩
ই				
ইহুদী জাতির পরিচয়				১৮
ঈ				
ঈজিপ্ট সাম্রাজ্যের ইতিবৃত্ত		শ্রীভুবনমোহন লাহিড়ী		
এ				
একটি স্মরণীয় ঘটনা		শ্রীভজন গোপাল সান্যাল		
এ্যাটম্	...	শ্রীমুরলীমোহন বিশ্বাস		
এস মা আর্তত্রাণকারিণী (কবিতা)		শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়		

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
ঐ		
ঐক্য ও সমন্বয়	স্বামী অভেদানন্দ	৯৯
ক		
কবি নবীনচন্দ্রের গদ্য-রচনা	অধ্যাপক সুবোধরঞ্জন রায়	৩৭১
কবি-প্রণাম (কবিতা) ...	শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবর্তী	১৩৮
কর্মযোগে রূপ জাগে তারি (কবিতা)	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৫২৬
কামাখ্যা তীর্থযাত্রী (কবিতা)	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৪২৩
কালীপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রীমীরা মিত্র	৪৬০
খ		
খৃষ্টবাণী-সঙ্কলন	শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়	৫১৫
গ		
গান (কবিতা)	শ্রীভাস্করচন্দ্র রায়	১৭৭
গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদৌলা'	শ্রীঅনিলকুমার হালদার	৫৩১
গীতার সাধনা	শ্রীকুমুদবন্ধু সেন	৪০১
গীতোক্ত স্বধর্ম	স্বামী জগদীশ্বরানন্দ	২৭৪
গুরু-কৃপা (শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী)		৫৫৩
গুরু-বিশ্বাস	শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়	৪৩৩
গুরু-তত্ত্ব	স্বামী জগদীশ্বরানন্দ	৫৫৮
গ্রন্থ-সমালোচনা	২৪, ২৭১, ৫০২, ৫৫০	
গ্রন্থাগার আন্দোলন	শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ ...	২৯১
গ্রীক ও হিন্দু	শ্রীবালকরাম ভট্টাচার্য	২০০
চ		
চণ্ডীদাস (কবিতা) ...	অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ	১২১
চব্বিশ পরগণার ইতিহাসে আমডাঙ্গা	শ্রীবিনয় গোপাল বসু	১৩৩
চলার পথে ...	শ্রীপথিক	২৪৭
ছ		
ছত্রিশ হাজার বৎসরের প্রাচীন বৃক্ষখণ্ড		২৩১
ছিন্ন কর সংশয়ের জাল (কবিতা)	শান্তশীল দাশ	৪৫৯
জ		
জন্মাষ্টমী (কবিতা) —	শ্রীযতীশচন্দ্র মিত্র ...	৩০৯
জীবন সমস্যায় বিবেকানন্দ ...	স্বামী দুর্গানন্দ ...	৫৯৭
জীবনের ধারা ...	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র শেঠ ...	৬২
জীবে প্রেম করে যেই জন	শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন বসু ...	২৭৮
জৈনধর্ম ও সংস্কৃতি	শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ ...	৪৯৪
ট		
টমাটোর মধ্যে গুরুত্ব পূর্ণ ঔষধ আবিষ্কার		৮৭

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
ত		
তুঙ্গনাথ	শ্রীসুব্রানন্দ পুরী	১২২
দ		
দক্ষিণমেরু অভিযানের নবতম পরিকল্পনা		৮৬
দনুজদলনী মা ...	শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়	৪১৬
দর্শনের ইঙ্গিত ...	শ্রীবালকরাম ভট্টাচার্য	২৮০
দীনের ভগবান (কবিতা)	শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য	২২০
দুর্গোৎসবে বাংলার বৈশিষ্ট্য	স্বামী প্রপন্নানন্দ	৩২৫
দেবতার অন্তরালে বাংলাসাহিত্য (সমালোচনা)	শ্রীঅনিলকুমার হালদার	২২৬
দেবতার মন্দির (কবিতা) ...	শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য	৫৭৬
দেহস্থ রক্তবাহী শিরার সঞ্চয় ভাণ্ডার		৮৭
ধ		
ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ	শ্রীভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৫
ধ্রুবচর্যা	স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ...	৪৪১
ন		
নব আগমনী (কবিতা)	স্বামী বেদানন্দ	৫০৬
নর নর, নারায়ণ (কবিতা)	শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন বসু	১২৯
নাটক	শ্রীঅনিলকুমার হালদার	১২৯
নাট্যকার দীনবন্ধু ও 'সধবার একাদশী' ...	শ্রীঅনিলকুমার হালদার	৩৬৬
নামমাহাত্ম্য না অনুরাগ (শ্রীরামকৃষ্ণবাণী) ...		২৭৩
নিত্যস্মরণ (শ্রীরামকৃষ্ণবাণী)		৪৫৭
নিম্নগামীর প্রণাম (কবিতা)	শ্রীঅঞ্জনকুমার দত্ত	৫৪০
নিরপেক্ষতা ও আন্তর্জাতিকতা	আদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত	১৩১
নির্দেশ (কবিতা)	শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবর্তী	৫৪৮
নিবেদিতা (কবিতা)	শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার	১৬৩
নূতন বৎসর (কবিতা)	শ্রীঅমরেশ মিত্র	৯৭
প		
'পথের পাঁচালী'র অপু	শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত	৩৯০
পরলোকে কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতবাসী	শ্রীবীরেন্দ্র দে	৭৯
পরলোকে ডাঃ গুণেন্দ্রনাথ সেন ...		৪৫
পরলোকে দানবীর রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার ...		৩১৮
পরলোকে ধীরেন্দ্রনাথ রায় ...		৫৯৮
পরলোকে মহেন্দ্রনাথ		৫৫৪
পূজ্যপাদ শ্রীঅভেদানন্দ মহারাজের প্রশ্নোত্তর		৬৯

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
পৃথিবীর বয়স নির্ধারণে বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টা		৮৫
প্রবচন ও ব্রতকথা ...	শ্রীজয়দেব রায়	৪৮২
প্রাচীনকালের প্রাসাদ ...	—	৯৩
প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে দেবতা ও মানুষ	শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত ...	১৪৭
প্রাণায়াম বিজ্ঞান	স্বামী জগদীশ্বরানন্দ	১৮৭, ২২৪
প্রেমধর্ম	ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত	৪৪৬, ৪৭১
প্রেমাভক্তি (শ্রীরামকৃষ্ণবাণী)		৫০৫
ফ		
ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল	শ্রীউমা মিত্র	২৯৩
ব		
বঙ্গগৌরব জীমূতবাহন	অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য	৪০৬
বঙ্গমাতা (কবিতা)	শ্রীমতী প্রমীলা কর্মকার ...	৫৭৩
বনলতা সেন ও জীবনানন্দ দাশ	শ্রীশ্যামাপ্রসাদ আচার্য	৩১৫
বরণীয় (কবিতা)	শ্রীঅমরেশ মিত্র	৪৯
বর্তমান সভ্যতায় মানুষ	শ্রীঅমিয়শঙ্কর নন্দী	৩১০
বরাহনগর (কবিতা)	শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী	৮৪
বলিদান (কবিতা)	রামেন্দু দত্ত	৫২৭
বাংলাকাব্য ও যুগমানস	শ্রীঅনিলকুমার হালদার	১৫৪
বাংলাভাষা সমস্যা	শ্রীঅনিলকুমার হালদার	২৮৮
বাংলা সাহিত্যে ছড়ার স্থান	শ্রীবিজয়গোপাল বসু	২২১
বাসন্তি পূর্ণিমা (কবিতা)	অধ্যাপক বীরানন্দ ঠাকুর	৫৪
বিচার ও বিবেক	শ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৫২১
বিজ্ঞানীর হাতে খনিজ তৈল	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র কর	৪৫১
বিজ্ঞানীর হাতে জল-বৃষ্টি	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র কর	৬০০
বিংশ শতক (কবিতা)	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	৩০৫
বিপ্লবী রামকৃষ্ণ	শ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায়	৪৫৮
বিবেকানন্দ (কবিতা)	হলধির গুহ, কাব্যভারতী	২২৩
বিবেকানন্দ (কবিতা)	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	১৪৫
বিবেকানন্দ স্মরণোৎসবে (কবিতা)	শ্রীবিনাকীরঞ্জন কর্মকার	৫৭০
বিশ্ববাণীর প্রচ্ছদপট পরিচয়		২৩২
বিশ্বলীলার ধারা	শ্রীমণিরত্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১০
বিশ্বশান্তি ও আধ্যাত্মিকতা	শ্রীনেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬২৯
বৃক্ষ (কবিতা)	শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন বসু	১৬

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
বুদ্ধদেবের অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান ...	শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী	২৪৯
বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ বিভাগ	শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী	৪৬৮
বুদ্ধপূর্ণিমা (কবিতা)	মণিমোহন পাল	১১৭
বেদানন্দ স্বামিজীর মহাপ্রয়াণে (কবিতা)	শ্রীঈতীশচন্দ্র মিত্র	৫৫১
বেদের স্বর	শ্রীঅযোধ্যানাথ শাস্ত্রী	৩০৯
বৈজ্ঞানিক সত্য	অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়	১১৮
বৌদ্ধ দর্শন	শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ	৩৪৪
ব্যাবিলনে ইহুদীদের নির্বাসন কাহিনী		১৭
ব্রহ্ম বিহার	শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়	১৮৬
ভ		
ভগিনী নিবেদিতা (কবিতা)	শ্রীশান্তিময় ঘোষ	৪৬৪
ভক্তিযোগে মুক্তি সাধনা	স্বামী অভেদানন্দ	৪
ভারতীয় সভ্যতায় দ্বিজত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব	শ্রীবালকরাম ভট্টাচার্য	৮৮
ভারতীয় দর্শন	শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ	৫৮৩
ভারতের ঐশ্বর্য	শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ	১২৫
ভালবাসি এ জীবনখানি (কবিতা)	শান্তশীল দাশ	২৫২
ভাষা ও উপভাষা	অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর	৩৬৩
ম		
মন ও মানব	শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ...	১৬৪
মরণ (কবিতা)	শ্রীনেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	৩১১
মরীচিকা (কবিতা)	শ্রীনেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	১৮১
মলিকিউল	শ্রীমুরলীমোহন বিশ্বাস	২৩০
মহাকবি শ্রীমধুসূদন দত্ত	শ্রীশ্যামাপ্রসাদ আচার্য	২০৮
মহাকবি হুইটম্যান ...	শ্রীমৎ পুরাগ্র পরমপন্থী ...	৫২৪
মহাবলী পুরম্ কাঞ্চীপক্ষীতীর্থ পথে (কবিতা)	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ...	৩৫৪
মহাযোগী পওহারীবাবা	...	১১১
মা ও ছেলে (শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী)	...	৪১৭
মাতৃপূজার অঞ্জলি	স্বামী ভজনানন্দ ...	৩৫৩
মাতৃ-বন্দনা (কবিতা)	শান্তশীল দাশ ...	৫৪৬
মাতৃ-বোধন-প্রসঙ্গ		৩২২
মানুষ-দেবতা কালীনাথ	শ্রীবিজয়গোপাল বসু	৫২০
মিছিপুলা	...শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ	৫৪৯
মুক্তি দাও (কবিতা)	শ্রীসদিৎ শেখর মজুমদার	৫১৪

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
মুক্তিদাত্রী দেবী সরস্বতী	স্বামী বেদানন্দ	৫৭৪
মেঘনাথ সাহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা	রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৩
য		
যতীন্দ্রনাথের কবিতা	শ্রীঅনিলকুমার হালদার	৭৬
যাবৎ জ্ঞান না হয় তাবৎ কর্ম	শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়	২৩৫
যীশুখৃষ্ট (কবিতা)	শ্রীশান্তিময় ঘোষ	৫১৯
যীশুখৃষ্ট ও রামকৃষ্ণ	হীরালাল বিশ্বাস	৩৬
যুগ-প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ	শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চক্রবর্তী	৫৬২
যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব (কবিতা)	নন্দলাল বাগচি	৬৮
যোগের রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রীপরিমলচন্দ্র কর	২৬২
র		
রতিই ভক্তির স্থায়ীভাব	শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪৬
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য সভ্যতা	সুশীলকুমার দাশগুপ্ত	১৩৯
রবীন্দ্রনাথের প্রতি (কবিতা)	শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবর্তী	২৬৪
রবীন্দ্রমানস ও সনাতনী সম্প্রদায়	শ্রীবালকরাম ভট্টাচার্য ...	৫২৬
রবীন্দ্র সংগীতে অতীন্দ্রিয় সাধনার প্রজ্ঞা	শ্রীঅজিত ঘোষ ...	৩৭৭
রাজস্থানে প্রস্তর যুগের কারখানা কেন্দ্র আবিষ্কার	...	৪৪
রাজা রামমোহন রায় ...	শ্যামাপ্রসাদ আচার্য ...	৫২৯
রাবণ বধের নেপথ্য ...	শ্রীযতীশ চন্দ্র মিত্র ...	৩৮৫
রামকৃষ্ণ শরণম্ (কবিতা) ...	স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী ...	৩৯৯
রামপ্রসাদের কবিত্ব ...	শ্রীঅনিলকুমার হালদার	৪২৩
রামেশ্বরম্ তীর্থপথে (কবিতা) ...	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	২৩৩
ল		
লহ হে লহ নমঃ (কবিতা)	সচ্চিদানন্দ সান্যাল	২৭০
শ		
শাস্ত্র ও সভ্যতা	শ্রীবালকরাম ভট্টাচার্য	৫৩৯
শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধভক্তি এক	শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়	৪১৮
শেষ আশা (কবিতা)	শ্রীকালীপদ কোঙার	১৪৯
শেষের বন্ধু (কবিতা)	শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী	৩৮৪
'শেষ সপ্তকে' সহজবাদ (পূর্বসূত্র)	অধ্যাপক বীরানন্দ ঠাকুর	৫৭৭
শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব	শ্রীঅসিতনাথ চন্দ্র	৩০৬
শ্রীবুদ্ধ স্মরণে	স্বামী দুর্গানন্দ	১৮৪
শ্রীমদ্ভাগবতে জ্ঞানযোগ প্রসঙ্গ	শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়	৩০১
শ্রীমা সারদাদেবী	শ্রীনলিনীবালা বসু	৪০৮

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
শ্রীরামকৃষ্ণ গীতিকা (কবিতা) ...	মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	৯৩,৫০১
শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ধর্মসমন্বয়	শ্রীযতীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	২৪
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ		১৯৪
শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী-বিতান ...		৪৩
শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাভূমি দক্ষিণেশ্বর (কবিতা)	শ্রীসুকুমার চক্রবর্তী	২
শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণে (কবিতা)	শ্রীকালীপদ কোঙার	২১২
শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার রহস্য	শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী	৫০
শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজার তথ্য ও তত্ত্ব	স্বামী জগদীশ্বরানন্দ	৫১৫
শ্রীশ্রীমা (সংকলন)	শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়	৫৪৪
শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষি (কবিতা)	শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার	৪৪৫
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ...	শ্রীতুলসী চরণ ঘোষ ...	১১৫
শ্রীশ্রীকেলাসনাথ বদরী-নারায়ণ পরিক্রমা	ব্রহ্মচারী অসীম চৈতন্য	১৭৩, ২১৩
স		
সকামের পূজা (কবিতা)	শ্রীদৌরেন্দ্রমোহন বসু	৩৪৩
সতীদাহ—কুপ্রথার উচ্ছেদ আন্দোলন	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র কর	১৬০
সত্য ...	শ্রীঅনা সমাদ্দার	১৬৯
সংঘবার্তা	৪৮, ৯৬, ১৪৪, ১৯২, ২৩২, ২৭২, ৩২০, ৪৫৫, ৫০৪, ৬০০	
সংশয় (কবিতা)	অধ্যাপক শ্রীসুবোধরঞ্জন রায় ...	১১০
সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন ইতিবৃত্ত	অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য ...	৫৯০
সংসার ও প্রকৃতি (কবিতা)	শ্রীমতী সুষমা ঘোষ	৪১৫
সমাজে নারীর ক্রমবিকাশ ...	অমিয় পাল	৩১২
সাকার না নিরাকার (শ্রীরামকৃষ্ণবাণী)		৩২১
সুন্দর (কবিতা) ...	বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫১৮
সেলিউকস্ কি পরাজিত ? ...	শ্রীকালীপদ হোড়	১৮২
সৌরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক খনন কার্য		৪৭
স্বর্গ কথা কয় (কবিতা) ...	শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭১
স্বরূপ-প্রাপ্তি (কবিতা) ...	শ্রীকালীপদ কোঙার	৩০
স্বামী অভেদানন্দের স্মরণে (কবিতা)	স্বামী বেদানন্দ	৩২৫
" নির্মলানন্দ মহারাজ ...	শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্তী	৪৬৫
" বেদানন্দ ...	শ্রীঅনিলকুমার হালদার	৫২৪
" বিবেকানন্দ (কবিতা) ...	শ্রীভোলানাথ গুপ্ত	৫৬৯
" ভজনানন্দ ...	শ্রীসেবক	৪০৫
" রামকৃষ্ণানন্দ ...	শ্রীতামসরঞ্জন রায়	২৩৮
হ		
হিন্দুধর্মের পূর্ণসংজ্ঞা	স্বামী জগদীশ্বরানন্দ	৩৪৬

স্বামী অভেদানন্দ

- মরণের পর মানুষ কি হয়, কোথায় যায়, কি অবস্থায় থাকে, মানুষের আত্মা থাকে কি থাকে না—এই সব জিজ্ঞাসা মানুষকে কোন্ আদিমকাল হতে যুগ যুগ ধরে ভাবিয়ে এসেছে। মানুষ-সমাজে যুক্তিশীল ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বেগে উঠবার পরও নিবৃত্তি হয়নি সে কৌতূহলের। তাই মানুষ এখনও সেই অজানা কথা জানতে চায়, শুনতে চায়, বুঝতে চায়। "মরণের পারে" বইখানিতে পরলোক ও বিদেহী আত্মারই নিখুঁৎ চিত্র এঁকেছেন স্বামিজী তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।
- মরণের পরের প্রেতাত্মাদের অসংখ্য নানান রকমের চিত্র-সম্বলিত।
- অটোমেটিক স্লেট রাইটিং।
- স্বামীজীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার চমকপ্রদ বিবরণ।
- মৃত্যুর পরে প্রেতাত্মাদের সঙ্গে মেলামেশা ও পরলোকের সম্বন্ধে অনেক কিছু বিস্ময়কর সংবাদ এই গ্রন্থে আছে।

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য পাঁচ টাকা।

স্বামী শংকরানন্দ

আজ পর্যন্ত যতগুলি প্রামাণিক জীবন-চরিত এই মহামানবকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, সকলগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিয়া অথচ আরও বহু নূতন উপকরণ দিয়া ইহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হইয়াছে। সহজ সরল ছন্দের মধ্য দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সহজ সরল কাহিনী ও বাণীই এই পুস্তকের বিশেষত্ব। ২৪০ পৃষ্ঠায়। মূল্য মাত্র দুই টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে পূজিত অস্ট্রিয়া দেশীয় বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী

ফ্রাঙ্ক ডোরাক অঙ্কিত

তৈলচিত্র হইতে ব্রোমাইড ফটো

শ্রীরামকৃষ্ণদেব—২৲ শ্রীশ্রীসারদা দেবী—১৷৹

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্যলহরী ঃ

পদ্যছন্দে লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী। প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা : সুন্দর বাঁধাই।

মূল্য ৫৷৷০ মাত্র। ভিঃ পিঃতে ৬৲

শ্রীবিবেকানন্দ কাব্যগীতি ঃ

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত "স্বামী বিবেকানন্দের পিতৃবংশের পরিচয়" সম্বলিত—স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী পদ্যছন্দে লিখিত।

মূল্য ৪৲ ভিঃ পিঃতে ৪৷৷০

প্রাপ্তিস্থান—**স্বামী শ্যামানন্দ** (গ্রন্থকার)
১নং উমেশ দত্ত লেন, (বিডন ষ্ট্রীট), কলিকাতা-৬
এবং—**শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ,**
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রম

কলিকাতা অফিস ও আউটডোর
২৯এ, বিবেকানন্দ রোড
ফোন : ৩৩-৪২২০
টেলিগ্রাম : "উন্মাদ আশ্রম"
হাসপাতাল—জগতগঞ্জ, কলিকাতা-৩০
ফোন : দমদম ১০৪
প্রতিষ্ঠাতা ও সুপারিন্টেণ্ডেন্ট
কবিরাজ, **অতুলবিহারী দত্ত,** বি-এস্‌সি,
কবিরত্ন

অগ্নেকল্পধ্বজ

বহুকাল অভিজ্ঞতালব্ধ কথায় পরিপক্ক বিশিষ্ট মাত্রায় ট্যাবলেট আকারে সংহত

সক্রিয় ষড়ঙ্গুণ মকরধ্বজ

চলন-বিজ্ঞানের ফলে ইহার ভেষজশক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে ফেরেও ইহা সর্ববিধ নির্ভরযোগ্য।

প্রতি শিশিতে ১৪ ট্যাবলেট (৭ পূর্ণমাত্রা) থাকে

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

শুভবিবাহে কালের উপযোগী আধুনিক রুচিসম্মত প্রাচ্যের অপূর্ব্ব সুসম্পন্ন নবকল্পিত সৌন্দর্য্যমণ্ডিত

বেনারসী

তসর, গরদ, মটকা
সিল্ক, টিস্, শাড়ী

জহরলাল পান্নালাল

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা
প্রাঞ্চ বেনারস, অমৃতগহর

ডাক্তার **ইন্দুমাধব মল্লিক**, এম্, এ, এম্, ডি, বি, এল, আবিষ্কৃত

পেটেণ্ট

ইক্-মিক্ কুকার

ইহাতে এক ঘণ্টার ভিতরে বিভিন্ন আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য অতি সহজে এবং সুলভরূপে রন্ধন করা যায়। যে কোন জ্বালানী দ্রব্যের দ্বারা বিনা তত্ত্বাবধানে অতি অল্প খরচে রান্না চলে। মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন। ম্যানেজার—ইক্-মিক্ কুকার প্রাইভেট্ লিমিটেড্, ২১১।১এ, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মোটর গাড়ীর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী

প্রাইভেট লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৮

হেড অফিস :—হাওড়া মোটর বিল্ডিংস্, পি ৬, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা-১ ফোন—২৩-১৮০৫ (৫ লাইন)

শাখা :— বম্বে, দিল্লী, পাটনা, ধানবাদ, কটক, গৌহাটী ও শিলিগুড়ি।

বস্ত্র শিল্পে মোহিনীর অবদান অতুলনীয়

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

— ১নং মিল — — ২নং মিল —

কুষ্টিয়া (পাকিস্তান) ● বেলঘোরিয়া (ভারত)

এই মিলে প্রস্তুত ধুতি শাড়ী লংক্লথ প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে সমভাবে সমাদৃত

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস :—২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

K.C.GANGULY
& CO.

Dealers in:-

WEST END • FAVRE-LEUBA
& ANGLO SWISS

★ REPAIRING OUR SPECIALITY

12-1 RADHA BAZAR ST. CAL-1

বিবাহে বা যে কোন উৎসবে—মনের মতন ক'রে সাজাইবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বোস ডেকরেটরস্

২০৪ রাসবিহারী এভিনিউ,

কলিকাতা-২৯

নূতন বই

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি

॥ গবেষণামূলক 'ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস' এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হলো। উত্তরভাগে (দ্বিতীয় খণ্ড) ভারতীয় সঙ্গীত এবং যন্ত্রতন্ত্র, মুদ্রা ও মূর্ছা মূর্ছার ব্যবহার প্রভৃতির সঙ্গে পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গীত ও সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা ॥

॥ বাঙলা ভাষায় এইরূপ একখানি পুস্তক গৌরবের দাবী রাখে ॥

॥ ডিমাই সাইজের ছয়শত পৃষ্ঠা এবং আড়াই শতাধিক প্রাচীন অপ্রকাশিত ভাস্কর্য-চিত্র ॥

প্রথম খণ্ড—মূল্য সাড়ে সাত টাকা। দ্বিতীয় খণ্ড—মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত অন্যান্য বই :

রাগ ও রূপ—৮৲, তীর্থরেণু—৩॥০, শ্রীদুর্গা—৩॥০

অদ্বৈতানন্দ দর্শন ৮৲, বাঙ্গলা ধ্রুপদমালা—১৸০

স্বামী বেদানন্দ প্রণীত

বাঙলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

সহজ ও সরল ভাষায় বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাধনার [illegible] এই বইখানিতে দেওয়া হয়েছে। বইখানিতে সাহিত্য ও ইতিহাস [illegible] বাংলাদেশের সংস্কৃতির চাক্ষুষ চিত্রের পরিচয় দানের সঙ্গে বাংলাদেশ [illegible] অপূর্ব সমন্বয়ের পরিচিতিও এই সুন্দর বইখানিতে দেওয়া হয়েছে। [illegible] দুই-তিন দেশ

মূল্য : দুই টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৮বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রাচীন ও আধুনিক
মতে অনুমোদিত

লিলি বার্লি

খাদ্যপ্রাণযুক্ত
খাঁদ্য, পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪